অনুবাদ: সমর সেন

বাংলা অনুবাদ · প্রগতি প্রকাশন · ১৯৫৭

সূচীপত্র

ইভান বুনিন

১৮৮৭ সালে পিটার্সবুর্গের একটি সাপ্তাহিকে বেরয় সতের বছরের ইভান বুনিনের প্রথম কবিতা। এক বছর পরেই তাঁর কবিতা ছাপা হতে থাকে 'ক্নিজ্কি নেদেলি' (সপ্তাহের বই) পত্রিকায়, যেখানে প্রায়ই প্রকাশিত হত লেভ তলস্তয়ের রচনা।

সেই থেকে ইভান বুনিনের কবিতা মাসিক ও সচিত্র পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে, অচিরেই বেরয় তাঁর প্রথম কবিতা গ্রন্থ।

১৮৯৪ সালে বুনিন গদ্যে কলম ধরেন। তাঁর প্রথম গল্প বেরয় 'রুস্কয়ে বগাৎস্তভো' (রুশী ঋক্থ) পত্রিকায়। পত্রিকার পরিচালক, খ্যাতনামা রুশী সমালোচক ন. ক. মিখাইলভ্স্কি তখন ভবিষ্যদ্বাণী

করেছিলেন যে কাহিনীকার একজন ‘বড়ো সাহিত্যিক’ হবেন। তাঁর কথা ফলেছে।

বুনিনের জন্ম ১৮৭০ সালের ১০ই অক্টোবরে। পিতা-মাতা বনেদী অভিজাত বংশের লোক। বুনিনের একজন পূর্বপুরুষ কবি ভ. আ. ঝুকোভ্স্কির পিতা। শ্রুতকীর্তি সাহিত্যিক কিরেয়েভস্কি ভ্রাতৃদ্বয় ও গ্রৎ বুনিন বংশের আত্মীয়।

বুনিনের পিতা লাম্পট্য ও জুয়ায় উদ্দাম দিন কাটিয়ে সম্পত্তি খুইয়ে ওরিওল গুবের্নিয়ার ইয়েলেৎস্ক উয়েজ্দের একটি খামার-বাড়িতে সপরিবারে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। ভবিষ্যৎ লেখকের শৈশব ও কৈশোর কাটে এখানেই। তিনি লিখেছেন: ‘এইখানে, মাঠের গভীরতম নিভৃতিতে, কালামাটির আসাধারণ উর্বরতায় সমৃদ্ধ আর বাহ্যত দীনাহীনা প্রকৃতির মাঝখানে, গ্রীষ্মে ঘরের দুয়োর পর্যন্ত বিছিয়ে যাওয়া শস্যক্ষেত আর শীতে ঢিপ হয়ে ওঠা তুষারস্তূপের মধ্যে কেটেছে আমার গোটা ছেলেবেলা, কেমন একটা বিষণ্ণ কবিতায় যা আচ্ছন্ন।’

এই খামার-বাড়ির জীবনে, চাকরবাকর পাড়াপড়শী ভূতপূর্ব ভূমিদাস চাষাভুষোর সঙ্গে অবিরাম মেলামেশায় সমৃদ্ধ হয় লেখকের ঝুলি। এখানেই তিনি প্রথম শোনেন

অতীতের নিরানন্দ কাহিনী, লৌকিক কথকতার কাব্যময়তা। রুশ জাতীয় ভাষার ঋদ্ধির সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের জন্য বুনিন চাষাভুষো আর চাকরবাকরদের কাছে ঋণী।

কৈশোরেই লিখতে শুরু করেন বুনিন. অনুকরণ করতেন লেরমন্তভ আর পুশকিনকে এমনকি. তাঁর স্বীকৃতিতেই. নকল করতেন তাঁদের হস্তলিপিও।

বিদ্যালয় বুনিন শেষ করেন নি। তবে পড়েছেন অনেক। তাঁর কথায় 'বই দেখা মাত্রই প্রায় একটা দৈহিক তৃপ্তি' বোধ করতেন। সংসারের ভগ্নদশা ক্রমেই প্রকট হতে থাকে, বুনিন বাড়ি ছেড়ে যাবেন ঠিক করেন। প্রথমে তিনি যান খারকভে, পরে আসেন ওরিওলে, কাজ নেন স্থানীয় সংবাদপত্রে, পলতাভার পৌরসংস্থায় চাকরি করেন। তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনা বেরয় এই সময়েই।

এই দিনগুলোতেই বুনিন 'একাগ্রচিত্তে পড়াশুনা. সফর করেছেন, ঘুরে বেরিয়েছেন মালোরাশিয়ায়', 'তৃষিতের মতো নিবিড় হতে চেয়েছেন তার প্রকৃতির সঙ্গে, তৃষিতের মতো কান পেতেছেন তার গানে আর অন্তরে।'

তবে অভাব-অনটন ও সন্ধানের দুঃসময় কেটে যায়. সাহিত্যিক সৌভাগ্যলাভে তিনি ব্যর্থ হন নি, সমালোচকেরা তাঁর গুণগ্রাহী হন. নাম দেন 'হেমন্ত,

বিযাদ আর বাবুদের বাসায় চারণ', তাঁর কাহিনীগুলির অপূর্ব রুশী ভাষার যোগ্য সমাদর করেন তাঁরা।

মস্কোর 'স্রেদা' (বুধবার) সাহিত্যচক্রের ঘনিষ্ঠ হন তিনি। সাহিত্যিক ন. দ. তেলেশভ এটির প্রতিষ্ঠাতা এবং মাক্সিম গোর্কি, লেওনিদ আন্দ্রেয়েভ, ইভান কুপ্রিন ছিলেন এর নিয়মিত সদস্যপদবাচ্য।

এই সময় ছোটো ছোটো লিরিক্যাল কাহিনী লেখেন বুনিন, তাতে প্লট বিশেষ থাকত না, শুধু ভাঙন-ধরা জমিদারী মহালে দিন ফুরিয়ে আসা অভিজাতদের ধ্বংস ও নিঃস্বতার বিষণ্ণ ছবি ফুটত। এই পর্বে তাঁর সেরা রচনা 'আপেলের সৌরভ' (১৯০০)।

বুনিনের সৃজনকালের এই পর্বটা প্রসঙ্গে আলেক্সেই মাক্সিমভিচ গোর্কি বলেছিলেন: 'বুঝি না, নিষ্প্রভ রুপোর মতো এমন অপূর্ব তাঁর প্রতিভাটা তিনি শানিয়ে ছোরা করে যথাস্থানে বেঁধাচ্ছেন না কেন।'

১৯০৫ সালের বিপ্লব নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করে তাঁর রচনাকে। তখন তিনি গোর্কির সান্নিধ্যে আসেন, গোর্কির পরিচালনায় 'জ্নানিয়ে' (জ্ঞান) নামে যে সংকলন বেরতে থাকে তাতে যোগ দেন।

গোর্কি তাঁর ওপর কী রেখাপাত করেছিলেন সেটা বোঝা যাবে 'গ্রাম' (১৯০৯-১৯১০) প্রকাশের পর

১৯১০ সালের ডিসেম্বরে গোর্কির নিকট লেখা তাঁর চিঠিতে। তিনি লিখেছিলেন: ''গ্রামের' পর বোধগম্য যদি কিছু লিখি তাহলে আপনার আছে ঋণী থাকব আলেক্সেই মাক্সিমভিচ।'

এই পর্বে বুনিনের লেখার উৎকর্ষ কিসে? গোর্কি এবং তখনকার গণতান্ত্রিক সমালোচকেরা কেন অত সমাদর করেছিলেন 'গ্রামের'?

বুনিনের 'গ্রাম' হল প্রাগ্‌বিপ্লব কালের নিরন্ন জর্জরিত কৃষক, লোলুপ নিষ্ঠুর কুলাক, ভূমিদাস প্রথার পরবর্তী ধ্বংস-পাওয়া মতিভ্রষ্ট বুড়ো ও জোয়ান অভিজাত-জমিদারদের অকরুণ নির্মম সত্যাশ্রয়ী বিবরণ।

১৯১১ সালে 'মীস্‌ল্‌' (চিন্তা) পত্রিকায় মার্কসবাদী সমালোচক ভ. ভরভ্‌স্কি একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন বুনিনের 'গ্রাম' নিয়ে, তাতে তিনি এটিকে অভিহিত করেন 'প্রতিভাদীপ্ত' অর্থাৎ 'সত্য সত্যই মর্মে মর্মে উপলব্ধ ও প্রতিভাবান শিল্পীর হাতে সততার সঙ্গে লেখা উপন্যাস' বলে। সেই সঙ্গে, লেখকের মতে, বুনিন নতুন গ্রামের জায়মান দিকগুলি দেখতে পান নি। তাঁর চোখে পড়েছিল কেবল পুরনো গ্রাম, 'নবীন গ্রাম' তখনো ক্ষীণ, 'ভূমির বিমূঢ় করা ক্ষমতার তলে বাধ্যের মতো

নিষ্পেষিত কোটি কোটির' সমুদ্রে তা বারিবিন্দুবৎ হলেও তা আত্মপ্রকাশ করেছে। গ্রামের দৈনন্দিন জীবনে এই বিন্দুটি তিনি লক্ষ্য করেন নি।

১৯১১ সালে বুনিন লেখেন 'সুখদল' উপন্যাস। ধ্বংসপ্রাপ্ত অভিজাতকুল আর মহালের প্রতি, প্রাক্তন মনিবদের প্রতি অনুরক্ত চাকরবাকরদের উদ্দেশে এক ধরনের অন্ত্যেষ্টি প্রার্থনা এটি।

যে শ্রেণী থেকে তাঁর আগমন, সখেদে তার ভাঙন ও ধ্বংসের ছবি এঁকেছেন বুনিন: 'যৌবনে আমরা দেখেছি জমিদারদের বিপুল দারিদ্র্যের সূত্রপাত,' লিখেছেন তিনি এবং নিঃসন্দেহেই তাঁর সহানুভূতি ছিল 'সুসভ্য' অভিজাতদের প্রাচীন পুরুষদের দিকে। আর ঠিক এই 'পুরনো কর্তা', নির্বাণোন্মুখ সাবেকী পুরুষের কথাই তিনি ব্যথিত হৃদয়ে অনাবৃত দরদে লিখেছেন আত্মজীবনীমূলক 'আর্সেনিয়েভের জীবন' উপন্যাসে। তবে বুনিনের সব উপন্যাসেই যে আমরা সাবেকী অভিজাত-জমিদারদের আদর্শায়ন দেখি এমন নয়। 'সুখদলের' দাদুর চরিত্র স্মরণই যথেষ্ট।

কিন্তু বনেদী মনিবদের বংশধরদের প্রতি বুনিন রুষ্ট ও নির্মম: '...অজ্ঞ, অকর্মণ্য, নিঃস্ব, এখনো ভাবছেন

তাঁরা নীল শোনিতের অধিকারী, একমাত্র সর্বোচ্চ মহিম্ন সম্প্রদায়।'

এমনি এক নবীন পুরুষ বলে ধরা যায় স্রেশনেভকে ('শেষ দেখা'), ছোটো জমিদার, অভিজাত, দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনায় খিটখিটে। বুড়িয়ে আসা প্রণয়িনীর কাছ থেকে চিরকালের মতো বিদায় নেবার সময় স্রেশনেভ তিক্ত ও কদর্য তিরস্কার বর্ষণ করে, একদা যাকে জানত সুন্দরী তরুণী, অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে তাকে, আত্মনির্যাতনের দমকে তাকে ও নিজেকে বলে 'অভিজাতের গর্ভস্রাব'।

'শেষ দেখার' নামটাই অপসৃয়মান শ্রেণীর অন্ত্যেষ্টি ঘণ্টার মতো শোকাবহ।

...অনেক ভ্রমণ করেছেন বুনিন, বহুদিন ছিলেন পশ্চিম ইউরোপে, গেছেন মিসর, সিরিয়া, উত্তর আফ্রিকা, সিংহল দ্বীপে।

রাশিয়ার কেন্দ্রাঞ্চলীয় নিসর্গের মিহি আঁচড় আর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় প্রকৃতির বর্ণাঢ্য ঔজ্জ্বল্য, উভয়েই লেখক সাড়া দিতে পেরেছেন কী ভাবে, দেখে অবাক লাগে। কেমন করে তিনি উঁকি দিতে পারেন ক্ষেতমজুর আভেরকি আর সিংহলের 'সাত নম্বর' রিক্‌শাওয়ালার অন্তরে।

বুনিন ভালো করেই জানতেন পরিব্রাজকদের বিলাসী হোটেলের রীতিনীতি, মহাসাগর পাড়ি দেওয়া প্রাসাদোপম জাহাজের ট্যুরিস্টদের হালচাল। তাঁর কাহিনীর নায়ক সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটি ঠিক সেইভাবেই চিত্তবিনোদনী বিশ্ব ভ্রমণ করে বেড়ান। হঠাৎ ঝট করে মারা গেলেন তিনি। আর কী মারাত্মক ব্যঙ্গেই না বুনিন এঁকেছেন কী ভাবে হোটেলের কর্তা সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটির মরদেহ থেকে নিস্তার পেতে চাইছে, অভ্যাগতদের প্রমোদে যাতে ব্যাঘাত না হয় তার জন্য গোপনে রাতে তাঁর দেহ পাচার করা হচ্ছে সোডা-ওয়াটারের বাক্সে। টাকাওয়ালা ট্যুরিস্টটি আর রইল না। যা পাবার চেষ্টা করা হয়েছে তা যখন পাওয়া গেল, ঠিক সেই মুহূর্তে যার দিন ফুরাল, এ যেন তার ওপর ভাগ্যের দণ্ডাদেশ। এই গল্পটিতে অর্থাধিপত্যকে কী তীব্র বিদ্রূপেই না বিদ্ধ করেছেন!

জনসাধারণের কাছ থেকে 'উঁচু মহলের' শাসক শ্রেণীর বিচ্ছিন্নতা দেখিয়েছেন বুনিন। বেঁচে থাকার সময় বড়োলোকটি যতবার এসেছে, ততবার তোয়াজ করতে হোটেলের যে চাকরবাকরেরা বাধ্য ছিল, মারা যাবার পর তার প্রতি তাদের মনোভাব তিনি ফুটিয়েছেন করাল শ্লেষের সঙ্গে।

...প্রেম নিয়ে, বিশেষ করে অসুখী বিয়োগাত্মক প্রেম নিয়ে বুনিন অনেক লিখেছেন। 'আর্সেনিয়েভের জীবন' উপন্যাস (তার শেষাংশ 'লিকা' উপাখ্যান), মানুষের চেতনার সবকিছু ওলট-পালট করে দেওয়া কামাবেগের কাহিনী 'সর্দিগর্মি', তুর্গেনেভের 'প্রথম প্রেম'এর প্লট অনুসরণে লেখা 'দাঁড়কাক', অসুখী প্রেমের সঙ্গে লেখকের প্রিয় প্রসঙ্গ অসাম্য নিয়ে লেখা 'ছায়া বীথি', যেখানে অভিজাত অফিসার আর তার প্রণয়িনী রূপসী ভূমিদাস-কন্যার মধ্যে দেখা দেয় অতল গহ্বর — সবই লেখা ভালোবাসা নিয়ে। লেখকের 'নিরুত্তাপ ওস্তাদি' নিয়ে যে একটা কথা চালু আছে, তা এসব কাহিনীর পদাবলীসুলভ মমতায় খণ্ডিত হয়ে যাবে।

বুনিনের পক্ষে, তাঁর রচনার পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল চেখভের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা। চেখভ সম্পর্কে তাঁর প্রাণ ঢেলে লেখা স্মৃতিচারণে বুনিন নিজেই বলেছেন চেখভের আলাপগুলির কথা, যা তাঁর রচনায় অক্ষয় ছাপ রেখে গেছে। চেখভের কাছ থেকে বুনিন শিখেছেন সংক্ষেপনের মূল্য। শেষ বয়সে নিজের রচনাসংগ্রহ প্রকাশের সময় বুনিনের কাছে যা-কিছু বানানো ও কৃত্রিম ঠেকেছিল তা সব তিনি নির্মম

হাতে ছেঁটে দেন, বাদ দেন উপমার কিছুটা চালিয়াতি।

চেখভ ও বুনিনের মধ্যে কিছুটা মিল থাকলেও তাঁদের শিল্পশৈলীর প্রভেদ স্বতঃস্পষ্ট। তার দৃষ্টান্ত হিশেবে চেখভ ('গুসেভ' গল্পে) ও বুনিনের ('চাঙ্গের ঘুম' গল্পে) ক্রান্তিবৃত্তে সূর্যাস্তের বর্ণনা তুলনীয়।

চেখভ লিখেছেন:

'...মেঘের তল থেকে বেরিয়ে আসছে প্রসারিত সবুজ কিরণ, পৌঁছচ্ছে আকাশের মাঝখান পর্যন্ত; তার কিছুটা পরেই দেখা গেল পাশে বেগুনী, তার পাশে সোনালী, তার পর গোলাপী... আকাশ হয়ে উঠল স্নিগ্ধ নীলাভ-রক্তিম। এই অপরূপ, মায়াময় আকাশ দেখে প্রথমটা ভ্রূকুটি করল মহাসাগর, কিন্তু অচিরেই তার রং হয়ে উঠল সোহাগ-লাগা, পুলকিত, রভসমন্দ্র, এমন যা মানবিক ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।'

আর বুনিনের লেখায় আছে:

'...সুরা-রক্তিম কিরণহীন সূর্য ঘোলাটে দিগন্ত ছুঁয়ে হঠাৎ টান-টান হয়ে উঠল, দেখাল যেন যাজকের কালচে-আগুনে টুপি... তাড়া করছিল সূর্য, তাড়া, সাগর যেন তাকে টেনে নিল, আর কেবলি ছোটো হয়ে আসছিল তা, হয়ে উঠল একটা লম্বাটে, গনগনে

কয়লার মতো, তারপর কেঁপে উঠে নিভে গেল, আর নিভতেই সারা বিশ্বে নেমে এল কেমন একটা বিষাদের ছায়া...'

দুটি বর্ণনা তুলনা করলে দেখব, কথা দিয়ে চেখভ একটি মোহন চিত্র এঁকেছেন, এ যেন গদ্যের কবিতা, সৈনিক গুসেভের মৃত্যু, তার সলিল-সমাধি সম্পন্ন হচ্ছে তাতে। একজন সাধারণ মানুষের শোচনীয় ভাগ্য, তার নিরানন্দ সংক্ষিপ্ত জীবন ও মৃত্যুর বৈপরীত্য হিশেবে, সমাপ্তি হিশেবে একটা অপরূপ গীতিকাব্যিক নিসর্গদৃশ্যের প্রয়োজন বোধ করেছিলেন চেখভ।

আর বুনিন আমাদের অবাক করেন তাঁর চোখ-ধাঁধানো রঙে, সূর্য তাঁর কাছে 'যাজকের কালচে-আগুনে টুপি', 'লম্বাটে গনগনে কয়লা', 'সুরা-রক্তিম' গোটা দৃশ্যটা এঁকেছেন চড়া রঙে, অভিনবত্ব দিয়ে সাজিয়ে তারপর যখন তা নিভে যায়, তখন কেমন একটা অস্পষ্ট বিষাদ নামে, আর কিছু না... বুনিনের নানা বয়সের রচনা পুনর্বার পড়লে সন্দেহ থাকে না যে, পরদেশে তিনি যে দীর্ঘ জীবন কাটালেন, শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন স্বদেশভূমি থেকে বহু দূরে, সেটা তাঁরই দোষ।

মৃত্যুর বহু আগে তিনি লিখেছিলেন: 'আমার ভেতরে ছিল বিষাদ ও আনন্দ আর ব্যক্তিগত অনুভূতির

অতি বিভিন্ন মিশ্রণ...' তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি তাঁকে প্রতারণা করেছে কম নয়। 'অভিজাতের গর্ভস্রাব' কী মূল্য ধরে সেটা জানা থাকলেও তিনি ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব সম্পর্কে, মানবেতিহাসের মহত্তম ঘটনাটি সম্পর্কে 'জমিদারী' মনোভাব ত্যাগ করতে পারেন নি। প্রবাসে থাকাকালে লেখা তাঁর প্রবন্ধাদি এবং কিছু গল্প ও উপন্যাস তাঁর প্রতিভার অযোগ্য।

তাহলেও সারা জীবন তাঁর মন কেমন করেছে স্বদেশের জন্য। ১৯২২ সালেই একটি কবিতায় তিনি সখেদে বলেছেন:

পশু-পাখিরো আছে বাসা,
ব্যথায় বুক থরোথরো
যখন বাড়ি ছেড়ে গিয়ে
বলেছি মোরে ক্ষমা করো।

পাখিপশুরো বাসা আছে,
বুক যে হাহাকার করে
যখন ঢুকি ঝুলি নিয়ে
পরের ভাড়া-করা ঘরে।

বলাই বাহুল্য এটা তাঁর ছেলেবেলাকার বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার স্মৃতিচারণ নয়, সেই পিত্রালয়ের কথা যার নাম স্বদেশ।

তিনি ছিলেন ফ্রান্সে। ফাশিস্টরা যখন তা দখল করে, তখন তিনি তাদের সঙ্গে কোনোরকম সহযোগিতায় অস্বীকৃত হন। নোবেল পুরস্কারের বিজয়ী বরং দারিদ্র্যই বরণ করে নেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সোভিয়েত জনগণের হাতে ফাশিজমের ধ্বংস তাঁর মনে খুবই রেখাপাত করে। সোভিয়েত লোকেদের সঙ্গে দেখা হলে আলাপে তিনি জিজ্ঞেস করতেন জন্মভূমির খবরাখবর, সোভিয়েত সাহিত্যের কথা, মন দিয়ে তা তিনি অনুসরণ করতেন। সোভিয়েত পাঠকদের জন্য তাঁর রচনা প্রকাশে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছিলেন তিনি। নিঃসন্দেহেই এটা লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির একটা পরিবর্তন, একটা পুনর্বিচারের পরিচায়ক।

তিরাশি বছর বয়সে, প্যারিসে, ১৯৫৩ সালের ৮ই নভেম্বর বুনিন তাঁর দেহরক্ষা করেন।

যেখানে তাঁর জন্ম ও প্রতিভার পরিস্ফুরণ সেই দেশ ও জনগণকে নিয়েই এই উঁচু দরের রুশী কথাকারের সেরা রচনা।

লেভ নিকুলিন

আপেলের সৌরভ

১

...সেই সুন্দর শরৎকালীন দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। আগস্ট মাসে ঝুরঝুরে কবোষ্ণ বৃষ্টি পড়েছে, ঠিক যেন শস্য বপনের জন্য, — বৃষ্টি নেমেছে সময় মতো, মাসের মাঝামাঝি, সেণ্ট-লরেন্স দিবসের মুখে। কথায় বলে না, 'হেমন্ত আর শীতের জোড় মেলে ভালো, নদীতে যদি বান না ডাকে, যদি বর্ষে সেণ্ট-লরেন্স দিবসে'। রোদে ভরা এই স্নিগ্ধ শরতে মাঠ ঘাট ভরে গেছে উর্ণনাভে। এটাও তো শুভলক্ষণ: 'এরকম দিনে যত বেশি উর্ণনাভ, শরতে তত বেশি লাভ'... মনে

পড়ে একটি নির্মল, ঝকঝকে, শান্ত ভোরের কথা... মনে পড়ে সেই বড়ো সম্পূর্ণ সোনালী ফলের বাগানটা একটু শুকনো, গাছের পাতা ঝরে পাতলা হয়ে গেছে, মনে পড়ে মেপ্‌ল বীথিকা, ঝরা পাতার মৃদু সুবাস আর — আন্তনভ্‌কা আপেলের মদির সৌরভ, মধু ও হৈমন্তী স্নিগ্ধতার তাজা গন্ধ। হাওয়া এত স্বচ্ছ যে মনে হয় হাওয়া নেই। সারা বাগানটা নানা কণ্ঠস্বর আর ঘোড়ার গাড়ির চাকার কিঁচকিঁচানিতে মুখর। ওরা তারখান*, ব্যাপারী-মালী, চাষীদের ভাড়া করে গাড়িতে আপেল বোঝাই করাচ্ছে, রাত্রেই পাঠাবে শহরে, — পাঠাতে হবে রাত্তিরেই, যখন কী ভালোই না লাগে মালের বোঝার ওপর শুয়ে পড়তে, তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে, তাজা হাওয়ায় আল্‌কাত্‌রার গন্ধ অনুভব করতে আর রাতের অন্ধকারে বড়ো রাস্তায় লম্বা সারির সব গাড়ির চাকার সন্তর্পণ কিঁচকিঁচ শব্দ শুনতে। গাড়ি বোঝাই করতে করতে কোনো চাষী হয়ত একটার পর একটা আপেল খেয়ে চলেছে রসালো শব্দে, কিন্তু তখন সাত খুন মাফ, ব্যাপারী বাধা দেবে না তাকে। উল্টে হয়ত বলবে:

ভ্রাম্যমাণ ফেরিওয়ালা; এদের কোনো কর দিতে হত না।

— খেয়ে নাও, বাপু, পেট পুরে খেয়ে নাও, বাবা, — কী আর করা যায়! মধু ঢালার সময়ে মধু খায় সবাই!

সকালের স্নিগ্ধ স্তব্ধতা ভাঙছে শুধু বাগানের গহন বনে প্রবাল-লাল এশবেরি গাছে থ্রাশ পাখির খুশিভরা কিচিরমিচির, মানুষের ডাকাডাকি, বালতি ও পিপেতে আপেল গড়িয়ে যাওয়ার ঘড়ঘড় শব্দ। পাতলা গাছের ফাঁকে দেখা যায় খড় ছড়ানো রাস্তাটা গিয়ে পড়েছে বড়ো একটা ঝুপড়ির দিকে, নজরে পড়ে ঝুপড়িটাও, গ্রীষ্মের ক'টা মাসে তার পাশে রীতিমত সংসার পেতেছে ব্যাপারীরা। সর্বত্রই আপেলের ঝাঁঝালো গন্ধ, এখানটায় — বিশেষ করে। ঝুপড়ির ভেতরে কয়েক জনের শোবার ব্যবস্থা, একটা একনলা বন্দুক, মরচেধরা সবুজ সামোভার, তার কোণে — হাঁড়িকুঁড়ি। ঝুপড়ির পাশে কয়েকটি মাদুর, বাক্স, ছেঁড়া কাপড়চোপড়; মাটি খুঁড়ে একটি চুলোও তৈরি করা হয়েছে। দুপুরবেলায় মাংসের রসালো জাউ বানানো হয় এখানে, সন্ধ্যেবেলায় জল ফোটানো হয় সামোভারে, আর তখন নীলচে ধোঁয়ার একটা লম্বা ফিতে ছড়িয়ে পড়ে বাগানের গাছগুলোর মধ্যে। উৎসবের দিনে ঝুপড়ির চারপাশে রীতিমত মেলা বসে যায়, গাছের ফাঁকে ফাঁকে ঝিলিক দিয়ে যায় রঙ-বেরঙের সাজসজ্জা। রঙের কড়া গন্ধে ভরা

সারাফান গায়ে সাবলীল মেয়েরা এখানে ভিড় করে; আসে মোটা কাপড়ের সুন্দর অদ্ভুত পোষাক পরা চাকরবাকররা, ঘুম জড়ানো চওড়া মুখে, গরুর মতো ধীরেসুস্থে আসে গাঁয়ের পাটোয়ারীর গর্ভবতী তরুণী স্ত্রী। মাথায় তার 'শিং' — মাঝখানে সিঁথি কাটা চুল দু'পাশে বিনুনী করে পিন দিয়ে বাঁধা, কয়েকটা রুমাল তার ওপর চাপানোয় মাথাটা মনে হয় প্রকাণ্ড। নাল লাগানো অনুচ্চ বুটে শক্তভাবে বসানো পাদুটো আড় করা; গায়ে হাতখোলা মখমলের ব্লাউজ, এ্যাপ্রনটা লম্বা, আর স্কার্টখানা ঘনবাদামি ডোরা কাটা বেগুনে রঙের, তার আঁচলে মোড়া প্রশস্থ সোনালী 'পাড়'...

— এই হল আসল ঘরণী! — মাথা নেড়ে বলে ব্যাপারী। — এরকমটা আজকাল বড়ো দেখা যায় না...

সাদা টুইলের শার্ট আর ছোট প্যাণ্ট পরে বাচ্চা ছেলেগুলোর আসার শেষ নেই। রোদে ঝকঝকে চুল না ঢেকে তারা আসছে দুয়ে-দুয়ে, তিনে-তিনে, আর ক্ষুদে খালি পায়ে চলতে চলতে ভয়ে ভয়ে উঁকি মারে আপেল গাছে বাঁধা ঝাঁকড়া-লোম কুকুরটার দিকে। ওদের মধ্যে খদ্দের বলতে অবশ্য একজনই, কেননা সব মিলিয়ে ওদের টাকাকড়ির দৌড় হল এক কোপেক বা ডিম একটা হয়ত; তবে খদ্দেরের অভাব নেই, কেনা-

কাটি চলেছে বেশ, আর লম্বা কোট পরনে, হলদে টপ বুট পায়ে ক্ষয়রোগাক্রান্ত ব্যাপারীটি খোশমেজাজে আছে। ধূর্ত হাবা, কথাবার্তায় গোল মেলে, নেহাৎ 'দয়ার বশে' রাখা ভাইয়ের সঙ্গে বেচার সময়ে ব্যাপারী ঠাট্টা ইয়ার্কি আর ভাঁড়ামী চালাচ্ছে, এমনকি মাঝে মাঝে তুলীয় এ্যাকর্ডিয়নটাও বাজাতে ছাড়ছে না, রাত না হওয়া পর্যন্ত বাগানে লোকের ভিড় কমে না, ঝুপড়িটির কাছে শোনা যায় হাসিহুল্লোড় ও কথাবার্তা, মাঝে মাঝে নাচিয়েদের পায়ের আওয়াজও...

রাত্তিরের দিকে বেশ ঠান্ডা লাগে। শিশিরও পড়ে। সারাদিন কেটেছে খামারে, বুক ভরে নেওয়া হয়েছে নিড়োনো নতুন রাই আর তুষের গন্ধ, এখন বাগান ঘেরা খাদের পাশ কেটে রাতের খাবার খেতে পা চালিয়ে চাঙ্গা মনে বাড়ি ফেরা। দূর গাঁয়ে মানুষের হাঁকাহাঁকি অথবা দরজা বন্ধ করার কিঁচকিঁচ শব্দ গোধূলির হিমেল হাওয়ায় চারিদিকে ছড়িয়ে গিয়ে শোনায় অদ্ভুত পরিষ্কার। অন্ধকার নেমে আসে। তখন আর একটি নতুন গন্ধ: বাগানে আগুন জ্বালানো হয়েছে, চেরি গাছের জ্বলন্ত ডালের সুগন্ধি ধোঁয়া। অন্ধকার বাগানের গভীরের দৃশ্যটি রূপকথার মতো: ঠিক যেন নরকের কোথাও, চারিপাশে অন্ধকার, মাঝখানে ঝুপড়ির কাছে

দাউদাউ করে জ্বলা লাল লেলিহান অগ্নিকুণ্ড, আর তার আশপাশে চলা ফেরা করছে আবলুশ কাঠে খোদাই করা কাদের যেন কালো কালো মূর্তি, এবং এগুলোর দানব ছায়া পড়ছে আপেল গাছগুলোতে। একবার দেখা যাচ্ছে কয়েক গজ লম্বা একটা কালো হাত গোটা গাছ জুড়ে পড়ে আছে, আরেকবার স্পষ্ট চোখে পড়ে দুখানি পা — যেন দুটো কালো থাম। তারপর হঠাৎ সবকটা ছায়া গড়িয়ে নেমে এল গাছ থেকে — এবং শুধু একটি দীর্ঘ ছায়া পড়ে রইল সারা বীথিকা জুড়ে, ঝুপড়ি থেকে একেবারে ঠিক ফটক পর্যন্ত...

গভীর রাতে, যখন গাঁয়ের জানলায় আলো নিভে যায়, যখন ঊর্ধ্বাকাশে জ্বলজ্বল করে হীরের মতো উজ্জ্বল সপ্তর্ষিমণ্ডল, তখন আবার বাগানে দৌড়ে ঢোকা, শুকনো পাতার শব্দ তুলে অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে যেতে হয় ঝুপড়িতে। ওখানে খোলা জায়গাটায় একটু জ্যোৎস্না, আর মাথার উপরে ছায়াপথের শুভ্র আলো।

— আপনিই নাকি, ছোট বাবু? — অন্ধকারে শোনা গেল কার যেন অনুচ্চ কণ্ঠস্বর।

— হ্যাঁ। তুই এখনো ঘুমোস নি, নিকলাই!

— আমাদের ঘুমোলে চলে না। তবে রাত বেশ হয়েছে, এ্যাঁ? ঐ তো, মনে হয়, গাড়িখানা আসছে...

অনেকক্ষণ কান পেতে শোনা যায় মাটিতে একটা গুরুগুরু স্পন্দন শুরু হয়েছে। সে স্পন্দন পরিণত হয় শব্দে, ক্রমশ তা জোরালো হয়ে উঠে, শেষ পর্যন্ত মনে হয় বাগানের ঠিক ওপাশে যেন চাকাগুলো সমচ্ছন্দে চলেছে দ্রুতগতিতে: এদিক ওদিক দুলে মুখর শব্দে ছুটে আসছে ট্রেনটা... কাছে, আরো কাছে, আরো মুখর ক্রুদ্ধ হয়ে... তারপর হঠাৎ আওয়াজ ক্ষীণ হতে শুরু করে, চাপা পড়ে যায়, যেন মিলিয়ে যায় ভূগর্ভে...

— বন্দুকটা কোথায়, নিকলাই?

— এই তো এখানে বাক্সটার পাশে।

সাবলের মতো ভারি একনলা বন্দুকটা ঝট করে তুলে এমনি একটা গুলি চালানো, আগুনের টকটকে লাল শিখা ঝলকে ওঠে কান ফাটানো শব্দে, ক্ষণিকের জন্য চোখে লাগে ধাঁধা, নিভে যায় তারাগুলো, আর শব্দের মুখর প্রতিধ্বনিটি প্রচণ্ড গর্জনে ছড়িয়ে পড়ে দিগন্তের দিকে, তারপর মিলিয়ে যায় নির্মল মৃদু বাতাসে দূরে, বহুদূরে।

— সাবাস, ছোট বাবু! — বলে উঠে লোকটি। — দিন ওদের পিলে চমকে, সত্যি দিন না, বেটারা জ্বালাতন করে মারছে! দেয়ালের পাশের ন্যাসপাতিগুলো আবার ঝাঁকিয়ে পেড়ে ফেলেছে...

আর কালো আকাশে আগুনের রেখা কাটে পড়ন্ত তারা। নক্ষত্রপূর্ণ ঘননীল গভীরতার দিকে তাকাই যতক্ষণ না পায়ের তলা থেকে মাটি যেন সরে যেতে আরম্ভ করে। তখন চটপট উঠে পড়ে কোটের আস্তিনে হাত গুঁজে বীথিকা হয়ে আবার তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হয়... কী ঠাণ্ডা, শিশির ভরা, আর কী খাশাই না দুনিয়ায় বেঁচে থাকা!

২

'রসালো আন্তনভ্কা আপেলের ভালো ফসল ভালো বছরের লক্ষণ'। আন্তনভ্কা খাসা হলে গাঁয়ের সব ভালো: মানে শস্যের ফসলও খাসা হবে... অপর্যাপ্ত ফসলের একটি বছর মনে পড়ছে।

ভোরের আলোয় মোরগগুলো যখন ডেকে চলে আর কুঁড়েঘরগুলো যখন ধোঁয়ায় অন্ধকার, তখন বেগুনী কুয়াসায় ভরা শীতল বাগানের দিকের জানলাটা খুলে ফেলি, কুয়াসার ফাঁকে ফাঁকে এখানে সেখানে ভোরের সূর্যের উঁকিঝুঁকি, — আর নিজেকে সংযত করতে না পেরে — তক্ষুণি ঘোড়া সাজাবার হুকুম দিয়ে তাড়াতাড়ি দৌড়ে যাই পুকুরে হাত মুখ ধুয়ে নিতে। পুকুরপারের উইলো গাছের ছোট ছোট পাতাগুলো

সব প্রায় ঝরে গিয়েছে, নিষ্প্রভ ডালের ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ে ফিরোজা আকাশ। উইলোর নীচে জল স্বচ্ছ কনকনে এবং মনে হয় ভারি। এই জলে এক পলকে রাত্রির আলসেমি কেটে যায়, আর হাত মুখ ধুয়ে রান্নাঘরে মজুরদের সঙ্গে বসে গরম আলু আর ভিজে ডেলা নুন ছড়ানো রাই-এর রুটি দিয়ে নাশ্তা, তারপর ঘোড়ায় চেপে ভীসেল্কি গ্রাম হয়ে শিকারে যেতে যেতে জিনের পিচ্ছিল ছোঁয়াচটা অনুভব করা কতই না মধুর। শরৎ — সে উৎসবের মরসুম, লোকজন এসময় বেশ ফিটফাট, খোশমেজাজ, গায়ের চেহারাও বছরের অন্যান্য সময় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ফসল যদি ভালো হয়ে থাকে সে বছরে, নিড়োনোর জায়গায় যদি গড়ে ওঠে সোনালী শস্যের কেল্লা আর সকালে নদীতে শোনা যায় পাতিহাঁসের উচ্চ শ্রুতিকটু প্যাঁক-প্যাঁক চীৎকার, তাহলে গাঁয়ের জীবনটা একেবারে মন্দ যায় না। তদুপরি আমাদের ভীসেল্কি গ্রামটি আদিকাল থেকে, সেই ঠাকুর্দার দিন থেকে সমৃদ্ধির জন্য বিখ্যাত। ভীসেল্কির বুড়োবুড়ি বাঁচে অনেক কাল — সমৃদ্ধশালী গ্রামের প্রথম লক্ষণ সেটা, — তারা সবাই দীর্ঘাকৃতি, নাদুসনুদুস আর বরফের মতো ধবধবে সাদা তাদের চুল। সব সময়েই শোনা যায়:

'এই তো আগাফিয়া, বয়স তো তিরাশির একটি দিনও কম নয়!' -- অথবা এ ধরনের আলাপ:

— তুই মরবি কবে, পান্‌ক্রাৎ? বয়স তো একশ' হতে চলেছে নিশ্চয়?

— কী বললেন, হুজুর?

-- বলছি বয়স কত হল!

-- তা তো জানি না, হুজুর।

— প্লাতন আপল্লনীচকে মনে আছে?

— তা আর থাকবে না? বেশ মনে আছে।

— দেখলি তো! তার মানে তোর বয়স একশ'র বেশী বই কম নয়।

মনিবের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বুড়ো দোষী-দোষী মুখ করে সবিনয়ে খানিক হাসে। কি আর করি, — দোষটা আমার বটে, মরার বয়স তো হয়েছে। সেণ্ট পিটার দিবসে গুচ্ছির পেঁয়াজ বেশী না গিললে বোধহয় আরো অনেক দিন বাঁচত।

ওর বুড়িকেও আমার মনে আছে। বারান্দায় একটা বেঞ্চের ওপর কুঁজো হয়ে সর্বক্ষণ বসে থাকত বুড়ি, বেঞ্চীর কোণ আঁকড়ে থাকত, মাথা ঠকঠক করে নাড়াত, নিঃশ্বাস ফেলত হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে, — সর্বদা কিছু একটা নিয়ে ভাবনা। 'নিজের টাকাকড়ির কথা নিশ্চয়,'

বলাবলি করত পাড়ার বৌয়েরা; সত্যি ওর সিন্দুকগুলোতে ছিল বিস্তর 'টাকাকড়ি'। কিন্তু মনে হত কথাটা বুড়িটার কানে যায় নি: বিষণ্ণ ভুরু তুলে আধো-অন্ধ চোখ মেলে তাকিয়ে থাকত দূরের দিকে, ঠকঠক করে নড়াত মাথা, যেন চেষ্টা করত কিছু একটা স্মরণ করার। বেশ দশাসই দেহ, কেমন যেন কালচে সব কিছু। স্কার্টটা প্রায় শ'খানেক বছরের, ন্যাকড়ার চটি জোড়াও মৃতের পায়ে যেমন পরিয়ে দেওয়া হয় তেমন, গলা হলদে আর হাড়গিলে. কাপড়ের বুটি বসানো ব্লাউজ সর্বদা ধব্ধবে সাদা, — 'এখনই কবর দেওয়া যায় খাসা'। বারান্দার কাছে বড়ো একটা পাথর: নিজের কবরের জন্য বুড়ি সেটা নিজের হাতে কিনেছে, কফন পর্যন্তও কেনা হয়ে গেছে, — কফনটা চমৎকার, তার পাড়ে দেবদূত, ক্রুশ আর প্রার্থনার মন্ত্র ছাপানো।

ভীসেল্কির বাড়িগুলোও বুড়োদের সঙ্গে বেমানান নয়। বাপঠাকুর্দাদের তৈরী পাকা বাড়ি। তবে অবস্থাপন্ন চাষী — সাভেলি, ইগ্নাৎ ও দ্রন্ — তাদের বাড়িগুলো বেশ বড়ো, ভেতরে ক'টি ঘর, কেননা ভীসেল্কিতে সংসার ভাগাভাগি করার রেওয়াজ তখনো আসে নি। এদের মতো লোকেরা মৌচাক রাখত, ছাই-নীল পালের ঘোড়া নিয়ে তাদের জাঁকের শেষ ছিল না, সংসার

চালানোয় বিচক্ষণ লোক তারা। নিড়োনোর জায়গায় ঘন সতেজ শণ ক্ষেত, — বিচালির স্তূপ আর খড়ে ছাওয়া মাড়াই ঘর গোয়াল এবং লোহার দরজা-দেওয়া গোলা, যেখানে রাখা হত কাপড়ের গাঁইট, চরকা, ভেড়ার লোমের নতুন কোট, রুপোর কাজ করা ঘোড়ার সাজ; আর তামার বেড় লাগানো মাপ। ফটক আর শ্লেজের ওপর দিককার কাঠে পুড়িয়ে ক্রুশের চিহ্ন আঁকা। মনে আছে, মাঝে মাঝে ভাবতাম চাষী হওয়াটাই ভারি মধুর ব্যাপার। কোন এক রৌদ্রস্নাত সকালে ঘোড়ায় চেপে গাঁয়ের মাঝখান দিয়ে যেতে যেতে বারবার মনে হত শস্য কাটা আর মাড়ানো কী চমৎকার, কী চমৎকার নিড়োনোর জায়গাটার কাছাকাছি খড়ের গাদায় ঘুমোনো, আর ছুটির দিনে আলো হবার সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ের গির্জার ঘণ্টার সুরেলা গভীর শব্দে জেগে ওঠা, তারপর কোনো একটা জলের পিপের পাশে দাঁড়িয়ে মুখ হাত ধুয়ে পরিষ্কার টুইলের শার্ট আর প্যাণ্ট চাপিয়ে নাল লাগানো অক্ষয় টপবুট পরে নেওয়া। এর ওপর যদি উৎসবের পোষাকে সুসজ্জিতা সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী স্ত্রীকে নিয়ে গাড়ি চেপে দুপুরে গির্জাগমন আর সেখান থেকে দাড়িওয়ালা শ্বশুরের বাড়ি, যেখানে মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য যদি থাকে কাঠের

থালায় ভেড়ার গরম মাংস, সুন্দর সাদা রুটি, মৌচাকের মধু আর বাড়ির চোলাই মদ — তাহলে তো স্বর্গসুখ!

সম্প্রতিকাল পর্যন্ত — এমনকি আমারও মনে আছে, বেশী দিনের কথা নয়, — মিতব্যয়িতা আর সেকেলে গ্রাম্য সমৃদ্ধির দিক দিয়ে ধনী চাষীদের জীবনযাত্রার ধরনের সঙ্গে যথেষ্ট মিল ছিল বেশীর ভাগ মধ্যবিত্ত অভিজাতদের। ভীসেল্‌কি থেকে প্রায় চার ক্রোশ দূরে আমাদের খুড়ী ঠাকরুণ আন্না গেরাসিমভ্‌নার জমিদারিটাও ছিল তেমনি। সেখানে পেঁাছতে পেঁাছতে বেলা হয়ে যায়। কুকুর সঙ্গে থাকলে তো ঘোড়া চালাতে হয় আস্তে আস্তে, আর সত্যি তাড়াহুড়োর ইচ্ছে পর্যন্ত হয় না — রোদে ভরা ঠাণ্ডা সকালে খোলা মাঠে থাকার আনন্দ কী অপরিসীম। জমিটা অবন্ধুর, অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। আকাশখানা হালকা, কী অবারিত আর অতল। সূর্যের উজ্জ্বল আলো রাস্তায় পড়ছে তেরছা হয়ে, আর বর্ষার পর গাড়ির চাকায় পালিশ করা, তৈলাক্ত পথটি রেলের মতো চকচক করছে। চারিদিকে ছড়িয়ে আছে বসন্তের ফসলের ঘন সবুজ সতেজ সম্ভার। স্ফটিক স্বচ্ছ হাওয়ায় হঠাৎ কোথা থেকে একটা বাচ্চা বাজপাখি উড়ে এসে ছোট ধারালো পাখা ঝাপটাতে

ঝাপটাতে একই জায়গায় হাওয়ায় ভেসে রইল। পরিষ্কার দিগন্তে দৌড়ে চলে যায় টেলিগ্রাফের খুঁটিগুলো, আর তাদের রুপোলি তার মিলিয়ে যায় নীলাকাশের ঢালুতে রুপোর সুতোর মতো। তারগুলোর উপর বসে আছে সোয়ালো পাখিরা — ঠিক যেন সাদা কাগজের রেখায় রেখায় ছোট ছোট কালো চিহ্ন।

ভূমিদাস প্রথা দেখে জানার সুযোগ জোটে নি আমার কখনো, তবুও মনে আছে, তা আমি অনুভব করেছি খুড়ী ঠাকরুণ আন্না গেরাসিমভনার বাড়িতে। ফটক পেরিয়ে প্রাঙ্গণে পা ফেলতেই সঙ্গে সঙ্গে টের পাওয়া যায় এখানে তা পুরোপুরি টিকে আছে। জমিদারিটি তত বড়ো নয়, তবে সবটা পুরনো, মজবুত, বহু প্রাচীন বার্চ আর উইলো গাছে ঘেরা। বার বাড়িগুলোর ছাত নীচু, কিন্তু সংখ্যায় তারা অনেক ও বেশ সুবিধের। সবকটা বাড়িই কালো ওক কাঠে যেন ঢালাই করা, ওপরে খড়ের ছাত। চোখে পড়ার মতো জায়গাটা হল ধোঁয়ায় কালো লম্বা বড়ো বসার ঘরটা, বেশ উঁচু বলে না, বরং লম্বা বলে; তার দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে ভূমিদাস আমলের চাকরবাকরদের কয়েকটি শেষ প্রতিনিধি — জরাজীর্ণ বুড়োবুড়ি আর ডন

কুইক্সোটের মতো দেখতে অবসরপ্রাপ্ত একটি স্থবির বাবুর্চি। উঠানে ঢুকলে পরে ওদের সবাই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বেশ নীচু হয়ে সেলাম জানায়। পক্ককেশ সইস ঘোড়া নিতে এসে আস্তাবলের দরজাতেই টুপি খুলে খালি মাথায় পার হয় প্রাঙ্গণটা। সে চালাত খুড়ী ঠাকরুণের গাড়ির সামনের ঘোড়াটা। তবে আজকাল তাঁকে শুধু গির্জায় নিয়ে যায়, শীতকালে ঢাকা শ্লেজে, আর গ্রীষ্মকালে লোহা-বাঁধাই মজবুত গাড়িতে; এমন গাড়িতে সাধারণত পাদ্রীরা যাতায়াত করে। খুড়ী ঠাকরুণের বাগানটির খুব নাম অযত্নে পড়ে থাকা এবং বুলবুল, ঘুঘু ও আপেলের জন্য; আর বাড়িটির নাম ছিল তার ছাদের জন্য। ভিটেমাটির প্রবেশপথেই বাড়িটা, বাগানের ঠিক কাছেই, — লাইম গাছের ডালপালা তাকে যেন করছে আলিঙ্গন, — বেঁটেখাটো, ছোট বাড়িটা, কিন্তু দেখে মনে হয় একশ' বছরও নয়,— কালের প্রকোপে কালো আর কঠিন হয়ে যাওয়া খড়ে ছাওয়া অদ্ভুত মোটা ও উঁচু চালটায় বাড়িটা মজবুত দেখাত। সর্বদা আমার মনে হত, বাড়ির সামনের দিকটা জীবন্ত: যেন প্রকাণ্ড টুপির নীচ থেকে কোনো বুড়োর মুখ চোখের কোটর দিয়ে তাকিয়ে দেখছে, — রোদে বৃষ্টিতে জীর্ণ, ঝিনুকের মতো দেখতে কাঁচের জানলা

দিয়ে। এই চোখগুলির দু'দিকে ছিল দুটো বড়ো পুরনো থাম-দেওয়া দাওয়া, এগুলোর ছাদের উপর সব সময়ে বসে থাকত পেট ভরা পায়রাগুলো, আর সেই সময় অসংখ্য চড়ুই বৃষ্টি ধারার মতো এক ছাত থেকে অপর ছাতে করত ওড়াউড়ি... এবং শরতের ফিরোজা আকাশের নীচের এই নীড়ে অতিথি কী যে আরাম পেত!

বাড়িতে ঢুকলে প্রথমেই পাওয়া যায় আপেলের সৌরভ, আর তারপর অন্যান্য গন্ধ: মেহগনির পুরনো আসবাবপত্র আর জুন থেকে জানলার ধারিতে ফেলে রাখা লাইম গাছের শুকানো ফুলের গন্ধ... সবকটা কামরায়ই — চাকরদের কামরায়, হলে, ড্রয়িং রুমে — ঠাণ্ডা, আলোর অভাব। তার কারণ বাড়ির চারপাশে বাগান, আর জানলার ওপরের শার্শিগুলো রঙীন কাঁচের — হয় নীল নয় বেগুনী। চারিদিক নিঝুম ও পরিষ্কার যদিও, মনে হয়, আরাম কেদারা, কারুকার্য করা টেবিল আর সরু, পল তোলা, সোনালী ফ্রেমে বসানো আয়নাগুলো কখনো জায়গা থেকে সরানো হয় নি। তাবপর কানে আসে ছোট্ট একটা কাশির শব্দ: আন্না খুড়ী বেরুচ্ছেন। লম্বা নন তিনি, তবে নিজেও আশেপাশের সব জিনিসেরই মতো মজবুত। কাঁধের

ওপর বড়ো ফারসী একটা শাল। গ্নর্নগম্ভীর চালে তিনি বের্নতেন বটে, তবে স্বাগত হাসির অভাব হত না; প্নরনো দিন, উইল আর উত্তরাধিকার নিয়ে অনর্গল বাক্যস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে অতিথির সামনে নানা ম্নখরোচক খাদ্যের আবির্ভাব হত: প্রথমে ন্যাসপাতি, চার ধরনের আপেল, আর তারপর এলাহি মধ্যাহ্ন ভোজ: মটরশ্নঁটি আর আগাগোড়া গোলাপী করে সেদ্ধ হ্যাম, প্নরে দেওয়া ম্নরগী, টার্কি আচার আর লাল ক্‌ভাস,— বেশ কড়া আর অসম্ভব মিষ্টি... বাগানের দিকের জানলাগ্নলো খোলা, কাজেই ঘরে আসে শরতের ঝরঝরে ঠাণ্ডা হাওয়া...

৩

হালে জমিদারবাব্নদের মিইয়ে পড়া মেজাজ চাঙ্গা হয়ে উঠত একটি মাত্র ব্যাপারে, — শিকারে।

খ্নড়ী ঠাকর্নণের ভিটেমাটি সে সব দিনে বিরল জিনিস কিছ্ন নয়। এমন ভিটেমাটিও অবশ্য ছিল যেগ্নলো ভাঙনের ম্নখে এসে পড়া সত্ত্বেও বিরাট ভূসম্পত্তি আর পঞ্চাশ একরের বাগান নিয়ে আগেকার দিনের ঠাট আঁকড়ে থাকত। সত্যি, কয়েকটি এখনো টিকে আছে, তবে ওগ্নলোতে আর প্রাণ নেই। ত্রোইকা

আর নেই, নেই 'কিরগিজ' ঘোড়া, শিকারী কুকুর, ভূমিদাস, এমনকি এ সমস্ত কিছুর মালিক পর্যন্ত উধাও — আমার বিগত শ্যালক আর্সেনি সেমিওনীচের মতো শিকারী-জমিদারবাবুও আর নেই।

সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে ফলের বাগান ও খেতখামার নির্জন হয়ে যায়, আবহাওয়াটাও দস্তুর মতো একদম বদলে যেত হঠাৎ। দিনের পর দিন গাছগুলো দমকা হাওয়ার উন্মত্ত ঝাপটায়, আর দিনরাতের বর্ষণে ভিজে গায়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মাঝে মাঝে বিকেলের দিকে বিষণ্ন নীচু মেঘের ফাঁকে ফাঁকে পশ্চিমে ফেটে পড়ে অস্তরবির কম্পমান সোনালি ঝিকিমিকি আলো, বাতাসে আসে একটা শুচি ও নির্মল আমেজ, হাওয়ায় দাপাদাপি করা পাতা আর ডালপালার মাঝখানে সূর্যের চোখ ধাঁধানো আলো। জলের মতো স্বচ্ছ নীল আকাশের হিম উজ্জ্বল আভা পড়েছে উত্তরে ধূসর সীসে-রঙা মেঘের ওপর, আর তাদের পেছন থেকে ধীরে ধীরে উঠছে বরফে-ঢাকা শৈলশিরার মতো সাদা মেঘ। জানলার সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয়: 'ভগবান করুন, হয়ত, আবহাওয়াটা ঠিক হয়ে যাবে।' কিন্তু হাওয়ার জোর কমা দূরের কথা, বাগানকে উত্যক্ত করে তুলে, বসার ঘরের চিমনি থেকে

এক নাগারে বেরনো ধোঁয়ার কুণ্ডলীকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে ভয়াল ভারি ধূসর মেঘগুলোকে তাড়িয়ে আবার একসঙ্গে জোট পাকিয়ে দেয় তা। মেঘগুলো বেশ নীচ দিয়ে তাড়াতাড়ি ভেসে চলে, — এবং অচিরেই আবার ঢেকে দেয় সূর্যকে। নিভে যায় তার ঝকঝকে আলো, ঝাপসা হয়ে আসে নীল আকাশ, আর বাগানের চেহারা বিষণ্ণ বিরস, এবং আবার নামে বৃষ্টি... প্রথমে ঝিরঝিরে নরম, তারপর ক্রমশ বেড়ে মুষলধারায়, ঝড় আর অন্ধকার। রাত্রি নামে, দীর্ঘ রাত্রি, অস্বস্তিতে ভরা...

এরকম দুর্যোগের পর বাগানের চেহারাটা দাঁড়ায় রিক্ত, জড়োসড়ো, সংকুচিত, ইতস্তত পড়ে থাকে ভেজা পাতা। কিন্তু মেঘ কেটে গেলে বাগানটা আবার কী সুন্দর দেখতে, অক্টোবরের প্রথম ক'টা স্বচ্ছ আর শীতল সে সব দিন, শরতের বিদায় সমারোহ! তখনো না ঝরা পতাগুলো ডালে ডালে টিকে থাকবে প্রথম তুষারপাত পর্যন্ত। শীতল ফিরোজা আকাশের পটে কালো বাগানখানা দীনভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে শীতের অপেক্ষায়, যেটুকু পারে শুষে নেবে সূর্যের আলো। এরই মধ্যে কিন্তু চষা মাঠে চোখে পড়ে কালো কালো ছোপ। আর ক্ষেতগুলো ভরে ওঠে উজ্জ্বল সবুজ বসন্তের ফসলে... এসে পড়েছে শিকারের দিনগুলো!

এবং চোখের সামনে ভেসে উঠছে

সেমিওনীচের ভিটেমাটি, সূর্যালোকিত, সিগারেট ও পাইপের ধোঁয়ায় ভরা প্রকাণ্ড বাড়ির হল-ঘরটা। অনেক লোকের ভিড়, — রোদে জলে পোড়া তাদের মুখ, পরনে পদ্দিওভ্কা*, পায়ে লম্বা বুট। এই মাত্র এলাহি ভোজন পর্ব শেষ হয়েছে, আসন্ন শিকারের সরব আলোচনায় সবাই উত্তেজিত, মুখ লাল; তবে ভোজন পর্ব শেষ হবার পরও কিন্তু ভোদকার গেলাস ভরে নিতে ভোলে নি তারা। শিকারের শিঙা বেজে উঠল উঠানে, শিকারী কুকুরগুলো চেঁচাতে লাগল নানা রকম গলায়। আর্সেনি সেমিওনীচের পেয়ারের দৌড়বাজ কুকুরটা টেবিলে উঠে থাল থেকে ঝলসানো খরগোশের ভুক্তাবশেষ তাড়াতাড়ি গিলতে আরম্ভ করে। কুকুরটা কিন্তু হঠাৎ বিকট চেঁচিয়ে টেবিল থেকে লাফ দিয়ে নামাতে গেলাস আর রেকাবীগুলো সব উল্টে গেল: শিকারের চাবুক আর রিভলভার হাতে স্টাডি থেকে বেরিয়ে এসে আর্সেনি সেমিওনীচ আচমকা কানে তালা লাগিয়ে দিয়ে রিভলভার ছুঁড়েছেন। হল্‌টা ঘন

* পদ্দিওভ্কা — লম্বা, কলারবিহীন কোট, কোমরে ফিতে বা বেল্ট দিয়ে বাঁধা।

ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে, কিন্তু আর্সেনি সেমিওনীচ দাঁড়িয়ে শুধু হাসছেন।

— এই যাঃ, ফসকে গেল! — চোখ নাচিয়ে বলেন তিনি।

লম্বা পাতলা চেহারার লোকটি, তবে কাঁধ চওড়া, সুঠাম দেহ, আর মুখটা — সুদর্শন জিপ্‌সীর মতো। চোখে তাঁর একটা অদ্ভুত দীপ্তি। রাস্পবেরি লাল সিল্ক শার্ট, মখমলের ট্রাউজার আর টপবুট পরাতে বেশ ফিটফাট দেখাচ্ছে। রিভলভার ছুঁড়ে কুকুর আর লোকজনের পিলে চমকিয়ে দিয়ে মোটা ভারি গলায় প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের গাম্ভীর্যে আবৃত্তি করলেন:

সাজাও সাজাও কসাকী ঘোড়াটি
ঝোলাও কাঁধেতে গমগমে শিঙা!

তারপর জোরে বললেন:

— বেশ, তাহলে আর মূল্যবান সময় নষ্ট করে লাভ নেই!

আজও মনে আছে ব্যাকুল লোভীর মতো তরুণ বুকটি ভরে নিতাম নির্মেঘ আর্দ্র দিনের সন্ধ্যার স্নিগ্ধতায়, যখন আর্সেনি সেমিওনীচের হুল্লোড়ে দলের সঙ্গে বনের মধ্যে শৃঙ্খলমুক্ত কুকুরের সুরেলা চীৎকারে

রোমাঞ্চিত হয়ে যেতাম কোথাও 'ক্রাসনি বুগর'* অথবা 'গ্রেমিয়াচি অস্ত্রভ'** জায়গাগুলোয় যার নামটাই শুধু শিকারীর পক্ষে যথেষ্ট চাঞ্চল্যকর। চলেছি একটা রাগী, তাগড়া কিরগিজ ঘোড়ায় চেপে, জোরে লাগাম ধরে সামলাতে সামলাতে মনে হত ওর সঙ্গে প্রায় এক হয়ে গিয়েছি। নাক দিয়ে আওয়াজ করে ঘোড়াটা, চার পা ফেলে ছোটার জন্য অধীর। কালো ঝরা পাতার পুরু খড়খড়ে গালিচায় ওর পায়ে পায়ে ওঠে খসখস শব্দ, এবং প্রতিটি শব্দের ফাঁপা প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যায় শূন্য, বৃষ্টিতে ভেজা, তাজা বনের গহনে। দূরে কোথাও চেঁচাল একটা শিকারী কুকুর, করুণ সুরে গভীর উত্তেজনায় তাকে সাড়া দিল অন্য একটা, যোগ দিল তৃতীয়টি আর হঠাৎ গোটা বনটা কাঁচের ঝনঝনানির মতো মুখর হয়ে উঠল মানুষের হৈহল্লা আর কুকুরগুলোর উদ্দাম ডাকে। হট্টগোল ছাপিয়ে বন্দুকের শব্দ — শুরু হল 'কাণ্ডকারখানা' আর গুরুগুরু একটা ধ্বনি গড়িয়ে যাচ্ছে দূরে।

— সামলে হে! — কার চীৎকারে মুখর হয়ে উঠল সারা বন।

* 'ক্রাসনি বুগর' — লাল টিলা।

** 'গ্রেমিয়াচি অস্ত্রভ' — গুরুগুরু ধ্বনিমুখর দ্বীপ।

'সামলে!' — মাতাল করা ভাবনাটা মাথায় ঝলক দিয়ে ওঠে। হো হো করে ঘোড়া তাড়িয়ে — যেন ঠিক শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে ঘোড়া তাড়িয়ে ছুটি পাগলের মতো বনের মধ্য দিয়ে, পথে যে কি আছে সে দিকে কোনো হুঁশ নেই। চোখের সামনে শুধু গাছের ঝিলিক, আর ঘোড়ার খুরে লেগে ছিটকে মুখে লাগছে কাদার ডেলা। বন থেকে ঝাঁপিয়ে বেরিয়ে দেখা যায় নানা জাতের কুকুর সবুজ ক্ষেতে ছড়িয়ে পড়েছে; জানোয়ারটাকে ধরবার জন্য ঘোড়াটাকে আরো তাড়া দিয়ে তীরের মতো চলি ছোট পথে মাঠ, চষা ক্ষেত আর শস্যের নাড়া পেরিয়ে; অবশেষে অন্য একটি দ্বীপে গিয়ে পড়ি। অদৃশ্য হয়ে যায় প্রাণপণে ডেকে চলা কুকুরের দল। তখন ঘর্মাক্ত, উত্তেজনায় কম্পিত দেহে রাশ টানি মুখে গাঁজলা ওঠা, হাঁপিয়ে পড়া ঘোড়াটার, বুক ভরে লোভীর মতো নিই বন্য উপত্যকার সোঁদা ঠাণ্ডা হাওয়া। দূরে মিলিয়ে যায় শিকারীদের চীৎকার, কুকুরের ডাক, আর চারিদিকে — মৃত্যুর মতো স্তব্ধতা। ছোট ঝাঁকড়া গাছ নেই, দীর্ঘ পাইনের বন নিশ্চল, মনে হয় যেন কোনো নিষিদ্ধ দেশে পা দিয়েছি। নালা থেকে আসছে ব্যাঙের ছাতা, পচা পাতা আর ভিজে গাছের ছালের কড়া আর্দ্র গন্ধ। খাত

থেকে ছড়ানো সিক্ততা হয়ে উঠছে আরো কনকনে, বনে ক্রমশ ঠাণ্ডা আর অন্ধকার হয়ে আসছে... বাড়ি ফেরার সময় হল। কিন্তু শিকারের পরে কুকুরগুলোকে একসঙ্গে জড়ো করা কঠিন, বনের মধ্যে শিকারীদের শিঙে বেজে চলে হতাশ ব্যাকুল সুরে, অনেকক্ষণ ধরে শোনা যায় চেঁচামেচি, গালি পাড়া, আর শিকারী কুকুরের কেঁউ-কেঁউ ডাক... শেষে, একেবারে অন্ধকার নেমে পড়লে শিকারীদের দল প্রায় অপরিচিত কোনো চিরকুমার জমিদারের বাড়িতে চড়াও হল। তারা সারা বাড়িটাকে বহু কণ্ঠের আওয়াজে সরগরম করে তোলে। অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্য জ্বালানো লণ্ঠন, মোমবাতি প্রভৃতির আলোয় ভিটেমাটি আলোকিত হয়ে ওঠে...

মাঝে মাঝে এমনও হত যে শিকারীর দলটা এমন অতিথিবৎসল প্রতিবেশীর বাড়িতে কয়েকটা দিন কাটিয়ে দিত। প্রভাতেই শীতের প্রথম স্যাঁতসেঁতে তুষার আর কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘোড়ায় চেপে চলে যেতাম বনবাদাড়ে; সন্ধ্যার আবছা আঁধারে ফিরতাম, সর্বাঙ্গে ধুলোকাদা, মুখগুলো টকটকে লাল, ক্লান্ত ঘোড়ার ঘাম ও নিহত জানোয়ারের লোমের গন্ধে জামাকাপড় ভরপুর, — আর শুরু হত মদ্যপান। কনকনে হাওয়ায় সারা দিন মাঠে ঘাটে কাটাবার পর

উজ্জ্বল ও লোকজমাট বাড়িটা বেশ আরামের। সবাই কোটের বোতাম খুলে এ ঘরে ও ঘরে যাচ্ছে, খানাপিনা চলছে গোলমেলে ভাবে, জোর গলায় চলেছে সেদিনের শিকারের গল্প; হলের মাঝখানে ফেলে রাখা নেকড়ের লাশটার ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া বিবর্ণ রক্তে মেঝে রাঙানো, দাঁতগুলো বেরিয়ে এসেছে, চোখ উঠে গেছে ওপরে আর তার ফুঁয়োফুঁয়ো নরম লেজটা প্রক্ষিপ্ত। ভোদকা আর খাবারের পর এত মধুর একটা অবসাদ, ক্লান্তি. এত মিঠে ঘুমের কী পরমসুখ, তখন মনে হয় যেন লোকের কথাগুলো শোনা যাচ্ছে জলের ভেতর দিয়ে। ফাটা মুখ চিড়বিড় করে উঠে, আর চোখ বুজলে — পায়ের তলায় সারা পৃথিবীটি ঘুরতে থাকে। কিন্তু কোথাও আইকন ও তার সামনের দীপ জ্বলা আদ্যিকালের একটা কোণের কামরায় গিয়ে পালকের নরম বিছানায় শুয়ে পড়লে, আগুন-রঙা শিকারী কুকুরগুলোর অপচ্ছায়া বিদ্যুতের মতো ভেসে আসে চোখের সামনে, সমস্ত শরীরটা ব্যথিয়ে ওঠে ঘোড়ায় চাপার অনুভূতিতে, আর কিছু বোঝার আগেই মধুর নিটোল ঘুম আচ্ছন্ন করে ফেলে, মুছে যায় এইসব ছবি আর অনুভূতি, এমনকি তখন মনেও পড়ে না যে এ ঘরটি কোন কালে একটা বুড়োর পুজোর ঘর

ছিল, যার নামটি ঘিরে প্রচলিত রয়েছে ভূমিদাস প্রথার সময়কার নানা ভয়াবহ গল্প, এই পুজোর ঘরেই, হয়ত এই বিছানাতেই, তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়।

পরের দিন যদি ঘুম ভাঙত দেরি করে, শিকারে যাবার সময় পেরিয়ে, তাহলে বেশ একটা আয়েস হত। জেগে উঠে অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকা। কোনো সাড়া শব্দ নেই সারা বাড়িতে। কানে আসে, মালি কত সাবধানে ঘরে ঘরে ঢুকে গরম করছে চুল্লীগুলো, যা থেকে ভেসে আসছে কাঠের চড়চড় হিসহিস আওয়াজ। সামনেই — এরই মধ্যে শীতকালের মতো নীরব হয়ে যাওয়া বাড়িটায় আরামের একটা দীর্ঘ দিন সামনেই। ধীরেসুস্থে জামাকাপড় চড়িয়ে বাগানে ঘোরার সময় সহসা দেখা যায় ভিজে পাতায় কারোর চোখে না পড়া একটা ঠান্ডা, সিক্ত আপেল, কেন জানি না মনে হয় জিনিসটা অদ্ভুত সুস্বাদু, এর জুড়ি আর নেই। তারপর ঠাকুর্দার আমলের বই নিয়ে বসা,— পুরু চামড়ায় বাঁধানো বই, মরক্কো চামড়ায় সোনালি তারা। মোটা হলদেটে পাতার বইগুলো দেখতে প্রার্থনা পুস্তকের মতো, খাসা একটা গন্ধ! পুরনো সেণ্টের সুবাস, ছাতাপড়ার প্রীতিকর ঝাঁঝালো গন্ধ। পাতার ধারে ধারে পালকের কলমে মোলায়েম, গোটা গোটা

করে লেখা নোটগুলোও বেশ সুন্দর। বই খুললেই চোখে পড়ে: 'প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকদের যোগ্য চিন্তা — বুদ্ধি ও গভীর অনুভূতির আলোক'... আর তখন একমনে বইটা পড়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। বইটির নাম — 'অভিজাত দার্শনিক', একশ' বছর আগে একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ছাপাখানায় 'অনেক অর্ডারে ভূষিত একটি ক্যাভালিয়ারের' খরচায় ছাপানো। 'মানুষের মগজের যোগ্য উচ্চ চিন্তাশক্তি ও হাতে সময় থাকাতে অভিজাত দার্শনিকটির অন্তরে একদিন জাগরিত হয়েছিল নিজের বিস্তীর্ণ জমিদারিতে বিশ্ব পরিকল্পনার বাসনা'... তারপর হয়ত চোখে পড়ে 'ভল্‌টেয়ার-মশায়ের ব্যঙ্গাত্মক ও দার্শনিক রচনাবলী', অনুবাদের মজার ভারিক্কি চালটা অনেকক্ষণ উপভোগ্য: 'মহাশয়গণ! দশে ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইরেসুমাস অনুগ্রহ করিয়া ভাঁড়ামীর সাধুবাদ করিয়াছিলেন (এখানে একটি সেমিকোলোন, — নাটকীয় বিরতি); আর আপনারা কিনা আমাকে বুদ্ধির প্রশংসা করিতে বলিতেছেন...' তারপর সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিনার আদিকাল থেকে অবতরণ রোমান্স, পঞ্জিকা আর অতিশয় দীর্ঘ ও ভাবপ্রবণ উপন্যাসের যুগে... ফাঁকা বাড়িতে আপনার মাথার ওপরে ঘড়ি থেকে বেরিয়ে আসে কোকিল, কানে আসে

তার বিষণ্ণ বিদ্রূপের ডাক। আর আস্তে আস্তে অন্তর ভরে জেগে ওঠে বিচিত্র মধুর বিষাদে...

তারপর হয়ত 'এলেক্সিসের গুপ্ত কথা' কিংবা 'ভিক্তর, বা অরণ্যে শিশু'র পাতা খুলে পড়া যায়: 'রাত বারোটার ঘণ্টা বাজিল! দিনের হট্টগোল ও গ্রামবাসীদের চঞ্চল গীতের পরিবর্তে পূত স্তব্ধতা। আমাদের অর্ধগোলকে নিদ্রাদেবী তাঁহার অন্ধকার পক্ষ বিস্তার করিলেন। তাঁহার পক্ষসঞ্চালনে ঝরিয়া পড়ে অন্ধকার আর স্বপ্ন... শুধু স্বপ্ন... কতই না ক্ষেত্রে স্বপ্ন কেবল দুর্ভাগার জ্বালাযন্ত্রণার পূর্বানুবৃত্তি মাত্র!..' আর চোখের সামনে চকিতে ভেসে আসে কত পুরনো প্রিয় শব্দ: পাহাড় ও কুঞ্জ, বিবর্ণ চাঁদ ও নিঃসঙ্গতা, ভূত ও প্রেত, 'পঞ্চশরের আক্রমণ', গোলাপ ও লিলি, 'ছোট ছেলেদের দুষ্টুমি ও চপলতা', লিলির মতো শুভ্র বাহু, লিউদ্‌মিলারা ও ইয়েলেনারা... আর নানা পত্রিকা, তাতে ঝুকভস্কি, বাতিউশ্‌কভ ও জিমনাসিয়ামের ছোকরা ছাত্র পুশকিনের নাম। উদাস মনে ভাবতে হয় ঠাকুর্মার কথা, ক্লাভিকর্ডে তাঁর বাজানো পলোনেজগুলির কথা, 'ইয়েভগেনি ওনেগিন' থেকে উদাস সুরে তাঁর কবিতা পাঠের কথা... চোখের সামনে ভেসে আসে সেই পুরনো, স্বপ্নালস জীবন... এসব

জমিদার মহালে একদা কী মধুর যুবতী ও মহিলারাই না থাকত! সেকেলে ধরনে অদ্ভুত খোপা বাঁধা সেই সব মহিয়সী-সুন্দর মহিলারা দেয়ালে টাঙ্গানো ছবির মধ্য থেকে আমার দিকে তাকিয়ে নম্র মেয়েলী ভঙ্গিতে বিষণ্ণ ও কোমল চোখের দীর্ঘ পল্লব নামালেন...

৪

জমিদার বাড়ি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে আন্তনভকা আপেলের সৌরভ। কত দিনই বা কেটেছে, অথচ মনে হয় তখন থেকে আমার মধ্যে শতাব্দীর ব্যবধান। ভীসেল্কির প্রবীণেরা আর নেই, দেহাবসান হয়েছে আন্না গেরাসিমভ্নার, আত্মহত্যা করেছেন আর্সেনি সেমিওনীচ... মালিকানা নিয়ে বসেছে ছোটখাটো জোতদাররা, তাদের অবস্থা প্রায় ভিখারীর মতন। কিন্তু এসব ছোটখাটো জমিদারিতে এমন নিঃস্ব জীবনযাত্রাও কী ভালো!

হেমন্তে আবার আমি সেই গাঁয়ে। দিনগুলো ঝাপসা নীল, মেঘলা। সকালে ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে পড়লে সঙ্গে থাকত মাত্র একটি কুকুর, কাঁধে বন্দুক, আর শিকারীর শিঙা। বন্দুকের নলে শিস দিয়ে আওয়াজ

তুলছে জোরালো হাওয়া, মুখে লাগছে হাওয়াটা, মাঝে মাঝে নিয়ে আসছে শুকনো বরফগুঁড়ো। সারাদিন ঘুরে বেড়াই জনহীন সমভূমিতে... গোধূলির সময়ে বাড়িতে ফিরে যাই, ক্ষুধার্ত, ঠাণ্ডায় জমে গিয়েছি, কিন্তু সুখের কী উষ্ণ অনুভূতিই না হয় যখন সামনে দেখি অন্ধকারে টিমটিম করা ভীসেল্‌কির সব আলো, নাকে এসে লাগে ধোঁয়া আর বাড়ির গন্ধ। মনে আছে, আমাদের বাড়ির লোকের ভারি পছন্দ হত 'গোধূলির' সময়টা, আলো না জ্বালিয়ে আধো-অন্ধকারে বসে বসে নরম গলায় তাঁরা আলাপ করতেন। বাড়িতে ঢুকে দেখি দু'পাল্লার জানলাগুলো এরই মধ্যে বসানো হয়েছে তাদের জায়গায়, তাই সবচেয়ে বেশী করে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারি শান্ত শীতের আলসেমির সঙ্গে। চাকরদের ঘরে আগুন জ্বালাচ্ছে কেউ, আর আমি, ঠিক ছেলেবেলাকার মতোই, শীতের ঝরঝরে গন্ধভরা একটি খড়ের গাদার পাশে উবু হয়ে বসে তাকিয়ে থাকি হয় দাউদাউ আগুনের দিকে, নয় জানলায়, যেখানে নীল হয়ে বিষণ্ণভাবে মিলিয়ে যায় আবছা আঁধারে আলো। তারপর যাই উজ্জ্বল আলোকিত বসার ঘরে, সেখানে গরম, বেশ ভিড়ও: রাঁধুনী মেয়েরা বাঁধাকপি কেটে চলেছে, ঝিলিক মারছে

দা'গুলো, বসে বসে শুনি তাদের সমতাল কচকচ আওয়াজ, সুন্দরভাবে মেলানো মেয়েদের গলায় গাঁয়ের উদাস অথচ ফূর্তিতে ভরা গান... মাঝে মাঝে কাছে পিঠের কোনো ছোট জোতদার আসেন, আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান অনেক দিনের জন্য... ছোট জোতদারের জীবনযাত্রাও খাসা!

বেশ ভোরে ঘুম ভাঙে তাঁর। আড়মোড়া ভেঙে উঠে পড়ে সস্তা কালো তামাক বা শুধু মাখর্কা দিয়ে একটা পুরু সিগারেট বানিয়ে নেন। নভেম্বরের প্রথম দিক, ভোরের বিবর্ণ আলোয় দেখা যায় সাদাসিধে পড়ার ঘর, দেয়ালে বিশেষ কিছু নেই, শুধু বিছানার ওপর টাঙানো গোটাদুয়েক হলদেটে ঠুনকো খেঁকশেয়ালের চামড়া, কসাক সালোয়ার ও ঢিলে, বেল্ট খোলা শার্ট পরিহিত একটি তাগড়া লোক, আর আয়নায় ছায়া পড়েছে ঘুমে ভারি তাতার ধাঁচের একটি মুখের। উষ্ণ, আধা-অন্ধকার বাড়িতে ঘোর স্তব্ধতা। বারান্দায় বুড়ি রাঁধুনীর নাক ডাকার পাতলা আওয়াজ, ছোটবেলা থেকে এ বাড়িতে সে কাজ করে এসেছে। কিন্তু তাতে কী, মনিব গলা ফাটিয়ে ভাঙা ভাঙা সুরে হাঁক দেন:

— লুকোরিয়া! সামোভার!

তারপর টপবুট চড়িয়ে, কাঁধে কোট ফেলে, শার্টের গলার বোতাম না আটকে, অলিন্দে বেরিয়ে আসেন তিনি। সারা রাত বন্ধ বিচালি ঘরটায় কুকুরের গন্ধ; অলসভাবে আড় ভেঙে, অল্প কিঁউ-কিঁউ করে আহ্লাদে তারা আসত মনিবের কাছ ঘেঁষে।

— ভাগ, বলছি! — মোটা গলায় প্রশ্রয় মাখানো স্বরে আস্তে আস্তে বলে বাগান হয়ে তিনি যান মাঠের দিকে। বুক ভরে নেন ভোরের ধারালো হাওয়া আর রাত্রের শীতে নিথর রিক্ত বাগানের গন্ধ। বার্চ বীথির অর্ধেক গাছ এরই মধ্যে কেটে ফেলা হয়েছে; বীথির মধ্যে গেলে হেমন্তে ঠাণ্ডায় কালো ও কুঁকড়ে যাওয়া পাতার খসখসানি পায়ের তলায়। বিষণ্ণ মেঘলা আকাশের পটে গোলার ছাতের ওপর পালক ফুলিয়ে ঘুমিয়ে থাকে দাঁড়কাকগুলো.. শিকারের দিনই বটে! এবং বীথির মাঝখানে দাঁড়িয়ে মনিব অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখেন হেমন্ত দৃশ্যটি। বাসন্তী ফসলের নির্জন সবুজ মাঠ, যেখানে ঘুরে বেড়ায় কয়েকটি বাছুর। দুটো শিকারী কুকুর পায়ের কাছে কেঁউ-কেঁউ করতে থাকে আর জালিভাই কুকুরটি তো বাগানের বাইরে খাবলা খাবলা নাড়ার মধ্যে দাপাদাপি করছে, যেন মনিবকে ডাকছে, মাঠে যেতে চাইছে। কিন্তু শিকারী কুকুর নিয়ে

কী লাভ এখন? বনে হাওয়ায় পাতার খসখসানিতে ভয় পেয়ে জন্তু জানোয়ার তো এখন বেরিয়ে এসেছে কালো মাঠে... ইস, কয়েকটা দৌড়বাজ কুকুর যদি থাকত!

গোলাঘরে মাড়াই আরম্ভ হচ্ছে। ক্রমশ জোরে চলতে শুরু করে মাড়ানির কল ভনভন গোঁ-গোঁ শব্দ তুলছে। দাঁতওয়ালা চাকাগুলোকে ঘোরাচ্ছে ঘোড়াগুলো; হেলে দুলে ঘুরছে অলসভাবে দড়ি টেনে, গোবর ছড়ানো পথে পা ফেলে। মাড়াইয়ের খুঁটিতে লাগানো ছোট একটা টুলে চালক বসে একঘেয়ে সুরে বারবার ঘোড়াগুলোকে হেঁকে চলেছে, চাবুকটা কিন্তু পড়ছে খয়েরী রঙের খাসী ঘোড়াটার পিঠে, যেটা সবচেয়ে আলসে ও চলেছে ঝিমোতে ঝিমোতে, তাছাড়া কী আর করবে — তার চোখদুটো যে বাঁধা।

— ওহে মেয়েরা, পা চালিয়ে! — শণের ঢিলে শার্টটি চাপাতে চাপাতে ধীরস্থির প্রকৃতির কলচালক কড়া সুরে হাঁকে মেয়েদের।

মেয়েরা তাড়াতাড়ি মাড়াইয়ের জায়গাটা সাফ করে ঝাঁটা আর বারকোষ নিয়ে ছুটোছুটি করতে থাকে।

— জয় ভগবান! — বলে কলচালক, আর রাইশস্যের প্রথম গোছাটা তীরের মতো কিঁচকিঁচে মুখর পিপেতে

পড়ে ছিটকে বেরিয়ে আসে ফুলঝুরির মতো। পিপের শব্দ ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠে, কাজ চলে দ্রুতগতিতে, কিছুক্ষণের মধ্যে সব আওয়াজ মিলিয়ে যায় মাড়াইয়ের প্রীতিকর শব্দে। গোলাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মনিব দেখছেন ভেতরের অন্ধকারে ঝলকাচ্ছে লাল আর হলদে রুমাল, হাত, কাঁটা ও খড়ের ঝিলিক, পিপের গর্জন, কলচালকের একঘেয়ে হাঁকডাক আর চাবুকের শপাং-শপাং শব্দের সঙ্গে তাল রেখে সব কিছু চলেছে ব্যস্তভাবে। ঝাঁকে ঝাঁকে ভূষি দরজায় উড়ে এসে গায়ে পড়াতে মনিবের দেহটা সাদা হয়ে যাচ্ছে। ঘন ঘন উঁকি মারছেন তিনি ক্ষেতের দিকে... খুব শীগগিরই ক্ষেতগুলো বরফে সাদা হয়ে যাবে, শীগগিরই প্রথম হিমকণা ঢেকে ফেলবে এগুলো...

হিমকণা, বছরের প্রথম তুষারপাত! দৌড়বাজ কুকুর নেই, নভেম্বরে শিকার করে লাভ নেই, তবে শীতকাল তো এসে পড়ল, তখন শিকারী কুকুরগুলোই 'কাজে' লাগে। এবং আবার আগেকার দিনের মতোই, ছোটখাটো জোতদাররা এ-ওর বাড়ি গিয়ে মদ্যপান করে শেষ কড়িটিও ফুঁকে দেয়, দিনগুলো কাটায় বরফ-ঢাকা মাঠে। আর শীত রাত্রির অন্ধকারে, নিঝুম কোনো একটা গণ্ড গ্রামে জমিদার বাড়ির বার-বাড়িতে জানলায় দেখা

যায় আলো, সেখানে ধোঁয়ার মেঘে আচ্ছন্ন ঘরে জ্বলে চর্বিবাতির ক্ষীণ শিখা, সুর বাঁধা হয় গিটারে...

আঁদিতে উঠল আঁধিয়ারা
হাট করে খোলে কপাট, --

ভরাট টেনর কণ্ঠে গান হয় শুরু আর সবাই ঠাট্টা তামাশার ভান করে ধুয়া ধরে বেতালে বিষণ্ন হতাশ বেপরোয়ায়:

হাট করে খোলে কপাট,
তুষারকণায় ঢেকে গেল পথঘাট...

১৯০০

সুখদল

১)

সুখদলের প্রতি নাতালিয়ার টান আমাদের বরাবর অবাক করে দিয়েছে।

আমাদের বাবাকে দুধ খাইয়ে যে ঝি বড়ো করেছিল তার মেয়ে নাতালিয়া, বাবার সঙ্গে বরাবর সে এক বাড়িতে মানুষ হয়, আট বছর কাটায় আমাদের সঙ্গে লুনিওভোতে, থাকে আপনজনের মতো, গৃহদাসীর মতো নয় মোটে। আর, ওর নিজের কথায়, পুরো আট বছর যে সুখদল আর সেখানকার সমস্ত দুর্ভোগের ধকল থেকে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। কিন্তু নেকড়েকে যতই খাওয়াও, তার মন পড়ে থাকে বনে কথাটা মিছিমিছি

নয়: আমাদের বড়ো করার পর নাতালিয়া আবার ফিরে গেল সুখদলে।

ছেলেবেলায় তার সঙ্গে কথাবার্তার কয়েকটা টুকরো মনে আছে:

— তোমার বাপ-মা নেই, তা না নাতালিয়া?

— হ্যাঁ। মুনিবদের সঙ্গে আমার মিল আছে এ ব্যাপারে। তোমাদের ঠাকুমা, আন্না গ্রিগরিয়েভনা, খুব অল্প বয়সে চোখ বোজেন। আমার বাপ-মার মতো।

— তোমার বাবা-মা — কেন তারা অল্প বয়সে মারা যায়?

— মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছিল, তাই।

— কিন্তু এতো অল্প বয়সে কেন?

— ভগবানের ইচ্ছে। মুনিব বাবাকে শাস্তি দেবার জন্য ফৌজে পাঠিয়েছিলেন; আর টার্কিছানার জন্য মা অকালে মারা গেলেন। আমার অবশ্য মনে নেই, তখন নেহাৎ ছোট ছিলাম কিনা, পরে লোকের মুখে শুনেছি: মা হাঁস-মুরগী-টার্কির দেখাশোনা করতেন, কত যে টার্কিছানা ছিল বলার নয়, আর একদিন মাঠে শিলাবৃষ্টির ঘা খেয়ে সবকটা মারা গেল, সবকটা... মা ছুটে গেলেন মাঠে, দেখলেন, দেখেই আত্মারাম খাঁচাছাড়া!

— তুমি বিয়ে করো নি কেন?

— আমার বর জন্মায় নি এখনও।

— সত্যি বলো না, কেন করো নি?

— লোকে বলে, আমাদের দিদি ঠাকরুন, তোমাদের পিসী, আমার বিয়ে মানা করে দিয়েছিলেন। তাই আমার নাম রটেছিল 'বাবুর মেয়ে'।

— যা, কী যে বলো, তুমি আবার বাবুর মেয়ে কী!

— একেবারে বাবুর মেয়ে! — মৃদু হেসে, বুড়ো কালচে হাতে ঠোঁট মুছে নিয়ে নাতালিয়া বলল। — জানো তো, আর্কাদি পেত্রভিচ আর আমি যে এক আয়ের দুধ খেয়ে মানুষ, — তোমাদের প্রায় পিসী গো...

সুখদল নিয়ে আমাদের বাড়িতে যা কিছু বলা হত বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো মনোযোগ দিয়ে শুনতাম: আগে যা সব মাথায় ঢোকে নি এখন তা অনেকটা সাফ, সুখদলে জীবনযাত্রার অদ্ভুত বৈচিত্র্যগুলোর চেহারা এখন স্পষ্টতর। নাতালিয়া তার অর্ধেক জীবন কাটিয়েছে বাবার সঙ্গে, — প্রায় তাঁর আপনার লোকের মতো, সে যে সত্যি আমাদেরই একজন, কুলীন বংশের ক্রুশ্চভদের একজন, এটা আমরা অনুভব করব না তো আর কে করবে! আর এখন দেখা যাচ্ছে বাবুরাই ওর বাবাকে ফৌজে দিয়েছিলেন ভাগিয়ে, আর ওর মা

বাবুদের এত সাংঘাতিক ডরাত যে টার্কিছানাগুলোকে মরতে দেখেই অক্কা পায়।

— অবিশ্যি, ওরকম বেপাকে পড়লে বাঁচা দায়, — নাতালিয়া বলল। — না হলে মাকে কোনো একটা পাণ্ডববর্জিত ঘুপচি জায়গায় চালান করে দিতেন!

তারপর সুখদলের বিষয়ে যা শুনলাম সেটা আরো বিচিত্র: ওখানকার বাবুদের মতো সহজ আর দয়ালু লোক 'সারা দুনিয়ায় মেলা ভার', সঙ্গে সঙ্গে এও শুনলাম অবশ্য যে ওঁদের মতো 'বদরাগী' লোকও ছিলেন না; জানা গেল পুরনো বাড়িটা ছিল অন্ধকার থমথমে, আমাদের উন্মাদ ঠাকুর্দা পিওত্র কিরিলীচ সেখানে নিজের জারজ সন্তান, আমাদের পিতৃ বন্ধু ও নাতালিয়ার খুড়তুতো ভাই গের্ভাস্কার হাতে খুন হন; আমাদের তনিয়া পিসী হতাশ প্রেমে পাগল হয়ে যান অনেক দিন আগে, এখন তিনি জীর্ণ জমিদার বাড়ির কাছাকাছি একটি পুরনো কুঁড়েতে থাকেন আর অতি পুরনো একটা বেসুরো ঝনঝনে পিয়ানোয় গভীর উচ্ছ্বাসে écossaise বাজান; শুনলাম নাতালিয়া নিজেও একবার পাগল হয়ে যায়, অল্প বয়সে আমাদের বিগত খুড়োমশাই পিওত্র পেত্রভিচের প্রেমে পড়েছিল — সেই হল তার প্রথম ও শেষ প্রেম — আর তিনি তাকে

নির্বাসনে পাঠিয়ে দেন সশ্কি খামার বাড়িতে... সুখদলের বিষয়ে অধীর স্বপ্নের জাল বুনে চলার যথার্থ কারণ ছিল আমাদের। আমাদের কাছে সুখদল ছিল শুধু অতীতের রোমাণ্টিক স্মৃতিস্তম্ভ। কিন্তু নাতালিয়ার কাছে? সেই তো একবার যেন নিজের অন্তরের কোনো প্রশ্নের জবাব দিয়ে গভীর তিক্ততায় বলে উঠেছিল:

— হ্যাঁ! সুখদলে এমনকি খেতে বসার সময় ওঁদের কাছে থাকত তাতার চাবুক! ভাবলে এখনো গা শিউরে ওঠে।

— মানে চাবুকের কথা বলছ? — আমরা জিজ্ঞেস করলাম।

— সব সমান, — ও বলল।

— কিন্তু চাবুক কেন?

— যদি ঝগড়া বাধে।

— সুখদলে সবাই ঝগড়া করত বুঝি?

— ওরে বাবা! লড়াই নেই এমন দিন যেত না! সবাই ছিলেন ভয়ানক বদরাগী — একদম বারুদের মতো।

নাতালিয়ার কথায় রোমাঞ্চ হত আমাদের, গভীর গদগদভাবে এ-ওর দিকে চাইতাম: আর অনেকক্ষণ

আমাদের হানা দিত একটি বিরাট বাগানের ছবি, বিরাট জমিদারি, ওক কাঠের তৈরী বাড়ি, খড়ে ছাওয়া বিরাট ছাত সময়ের ছাপে মসীবর্ণ -তারপর হলে খানাপিনা: টেবিল ঘিরে বসেছে সবাই, খেয়ে হাড়ের টুকরো ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে শিকারী কুকুরগুলোকে, এ-ওর দিকে তাকাচ্ছে কটমট করে — আর প্রত্যেকের কোলে একটা চাবুক: স্বপ্ন দেখতাম কবে বড়ো হয়ে আমরাও কোলে চাবুক রেখে বসব খেতে। অবশ্য এটা বুঝতে বাকি ছিল না যে চাবুকগুলো থেকে কোনো আনন্দ পেত না নাতালিয়া। তবু তো লুনিওভো ছেড়ে ও চলে গেল সুখদলে, তার ভয়াবহ সব স্মৃতির পীঠস্থানে। সেখানে না ছিল মাথা গোঁজার মতো জায়গা, না আপনার বলতে কেউ; পুরনো কর্ত্রী, তনিয়া পিসীর কাজ সে করত না এখন, কাজ করত বিগত পিওত্র পেত্রভিচের স্ত্রী ক্লাভদিয়া মার্কভনার কাছে। কিন্তু তা হলে কী হয়, সুখদল ছেড়ে টিকে থাকতে পারে নি নাতালিয়া।

— আমি নাচার, ভাই: স্রেফ অভ্যেস, — নম্র সুরে সে বলল। — যেখানে ছুঁচ, সেখানেই সুতো। যেখানে জন্ম, সেখানেই বাসা...

ওরই যে শুধু গভীর টান সুখদলের প্রতি তা নয়। হায় ভগবান, সুখদলের প্রত্যেকেরই সেরকম তীব্র

আসক্তি, সুখদলের স্মৃতিতে তাদের অনুরাগ সমান গভীর!

একটা কুঁড়েঘরে দুঃখে কষ্টে সময় কাটাচ্ছেন তনিয়া পিসী। সুখদলে অবসান ঘটে তাঁর সুখের, মানসিক স্বাস্থ্যের, মানবিক মর্যাদার। কিন্তু আপনার নীড় ছেড়ে লুনিওভোতে আসার কথা ভুলেও ভাবেন না তিনি, যদিও বাবা তাঁকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করতেন।

— না, তার চেয়ে বরং পাথর ঘাটায় গিয়ে পাথর ভাঙব! — তনিয়া পিসী বলতেন।

বাবা ছিলেন গাঝাড়া প্রকৃতির মানুষ; মনে হত কিছুতে তাঁর কোনো টান নেই। কিন্তু তাঁর সুখদলের গল্প যখন বলতেন তখন তাঁর মধ্যে আসত গভীর বিষণ্ণ একটা সুর। সুখদল ছেড়ে আমাদের ঠাকুর্মা ওলগা কিরিলভনার লুনিওভো জমিদারিতে তাঁর আসার পর অনেক, অনেক বছর বিগত, তবু প্রায় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি আক্ষেপ করতেন:

— এই দুনিয়ায় খ্রুশ্চভদের কেবল একজনই টিকে রইল! আর সেও সুখদলে নেই!

অবিশ্যি এমনও প্রায়ই ঘটত যে কথা বলার পরই তিনি চিন্তান্বিত হয়ে জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকতেন

মাঠের দিকে, তারপর হঠাৎ ঠাট্টার হাসি হেসে গিটারটা দেয়াল থেকে টেনে নিয়ে বলে উঠতেন:

— সুখদল জায়গাটা বেড়ে ছিল বটে, গোল্লায় যাক! — মিনিট খানেক আগে যেমন আন্তরিকভাবে বলেছিলেন, বলতেন ঠিক তেমনি সুরে।

কিন্তু তাঁর অন্তর ছিল সুখদলেরই — সে অন্তরে কত না স্মৃতির গভীর প্রভাব, স্তেপের আর সেখানকার গয়ংগচ্ছ জীবনযাত্রার প্রভাব, সেই প্রাচীন গোষ্ঠিভাব, যাতে করে গ্রাম, চাকরদের মহাল আর জমিদার বাড়ি সব মিলে অভিন্ন হয়ে যেত। আমরা ক্রুশচভরা অবশ্য প্রাচীন কুলীন বংশের লোক। আমাদের নাম আছে অভিজাতদের ষষ্ঠ কুলপঞ্জীতে, আমাদের অনেক সুখ্যাত পূর্বপুরুষ ছিলেন হয় লিথুয়ানীয়, নয় তাতার রাজকুমারদের ঔরস জাত। কিন্তু আবহমান কাল থেকে ক্রুশচভদের রক্তে মিশেছে চাকরবাকর আর গ্রামবাসীদের রক্ত। পিওত্র কিরিলীচের জন্মদাতা কে? এ বিষয়ে নানা কাহিনী আছে। তাঁকে যে খুন করেছিল সেই গের্ভাস্কার বাবা কে? ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি তিনি হলেন পিওত্র কিরিলীচ। বাবা আর খুড়োর স্বভাবে এত অদ্ভুত গরমিলের কারণ কী? তারও নানা ব্যাখ্যা আছে। তারপর আবার নাতালিয়া আর বাবা

একই বুকের দুধ খেয়ে বড়ো হয়েছেন, এদিকে বাবা গের্ভাস্কার সঙ্গে ক্রুশ-বিনিময় করেন... চাকরবাকর আর গ্রামবাসীদের সঙ্গে আত্মীয়তার খেই বের করার সময় হয়েছে বই-কি ক্রুশচভদের!

সুখদল ও তার ইতিহাসের প্রতি মোহ, সুখদলের প্রতি ব্যাকুলতা অনেক দিন পর্যন্ত ছিল আমার ও আমার বোনের মধ্যে। চাকরবাকরেরা, গ্রাম আর জমিদার বাড়ি — এই নিয়ে সেখানে ছিল একটি একান্নবর্তী সংসার। সে সংসার চালিয়ে গেছেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা, সেটা অনেক দিন টিকে আছে বংশধরদের মনে। একটি পরিবারের, গোষ্ঠীর, কুলের ইতিহাস গভীর ও জটিল, রহস্যময় এবং প্রায়ই ভয়ংকর হয়। কিন্তু তার শক্তির উৎসই হল এই সব অতল রহস্য, উপকথা আর ইতিহাস। পুঁথিপত্র বা অন্যান্য স্মৃতিচিহ্নের কথা যদি বলেন, তাহলে বাশকির স্তেপের একটা যাবাবর গ্রামের চেয়ে সুখদল এমন কিছু সমৃদ্ধ নয়। রাশিয়াতে পুঁথিপত্র ইত্যাদির জায়গা নেয় উপকথা। অথচ স্লাভমানসের কাছে উপকথা আর গান — বিষের মতো! আমাদের পূর্বতন চাকরবাকরেরা ছিল বেপরোয়া আলসে লোক আর স্বপ্নবিলাসী, — আমাদের বাড়ির মতো জায়গা আর কোথায় তারা পাবে

যেখানে মন উজাড় করে দেওয়া যায়? সুখদলের কর্তাদের একমাত্র বংশধর হয়ে দাঁড়ান বাবা। আমরা প্রথম কথা বলতে শিখি সুখদলের ভাষায়। প্রথম যে গল্প, প্রথম যে গান আমাদের মনে নাড়া দেয় তাও — সুখদলের, নাতালিয়ার, বাবার। বাবা গাইতে শেখেন চাকরদের কাছে, — 'অনুরাগিণী ছলনাময়ীকে' নিয়ে গান তাঁর মতো বন্ধনহীন বিষণ্ণতায়, কোমল অনুযোগ আর অসহায় আন্তরিকতার সুরে আর কে গাইতে পারত? নাতালিয়ার মতো গল্প বলতে পারত কেউ? সুখদলের চাষীদের মতো আমাদের এত আপনার জন আর কে বা হতে পারে?

অনেকদিন ধরে একসঙ্গে থাকলে বহুলোকের পরিবারে যেমন হয়, ক্রুশ্চভরাও তেমনি — ঝগড়াঝাটি আর বাগ্‌বিতণ্ডার জন্য স্মরণীয় কাল থেকে বিখ্যাত। আমাদের শৈশবে সুখদল ও লুনিওভোর মধ্যে এমন একটা ঝগড়া বাধে: যার ফলে বাবা দশ বছর নিজের বাড়ির চৌকাঠ ডিঙ্গান নি। তাই ছেলেবেলায় সুখদলের সঙ্গে ভালো করে পরিচয় হয় নি আমাদের: একবার শুধু গিয়েছিলাম সেখানে, তা-ও জাদনস্ক যাবার পথে। কিন্তু কখনো কখনো সত্যের চেয়ে স্বপ্ন বেশী জোরালো। আর গ্রীষ্মের সেই দীর্ঘ দিনটা আমাদের মনে অস্পষ্ট

অথচ অক্ষয় একটা স্মৃতি রেখে গিয়েছে, কী একটা ঢেউখেলা মাঠ, চওড়া নিঝুম একটা রাস্তা, আমরা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম; তার বহরে আর এখানে-ওখানে টিকে থাকা কোটরাকীর্ণ উইলো গাছে; রাস্তা থেকে বেশ দূরে, শস্যক্ষেতের মধ্যে উইলো গাছে একটা মৌচাকের কথা মনে আছে, — নিঝুম রাস্তার ধার ঘেঁষা ক্ষেতে ভাগ্যের হাতে সমর্পিত একটি মৌচাক; তাছাড়া মনে আছে দীর্ঘ ঢালুতে একটা লম্বা বাঁক, প্রকাণ্ড রিক্ত মাঠ, চারিধারে চিমনীবিহীন ছন্নছাড়া কুঁড়েঘর, পেছনে হলদে পাহাড়ে খাত, খাতের নীচে সাদা নুড়ি আর ভাঙা পাথর... যে ঘটনায় আমরা সাংঘাতিক ভয় পাই প্রথম, সেটাও ঘটে সুখদলে: যখন ঠাকুর্দা খুন হন গের্ভাস্কার হাতে। আর খুনের গল্প শুনতে শুনতে হলদে খাতগুলো নিয়ে কল্পনার জাল বোনার শেষ হত না আমাদের: কেবলি মনে হত ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের পর গের্ভাস্কা উধাও হয় ওই পথে, 'সমুদ্রের গভীরে টুপ করে পড়া পাথরের মতো'।

সুখদল থেকে চাষীরা লুনিওভোতে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসত চাকরবাকরের চেয়ে একেবারে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে, বেশীর ভাগ সময় চাষীরা আসত এক টুকরো জমির তাগিদে; কিন্তু তারাও আমাদের বাড়িতে

ঢুকত আত্মীয়ের মতো। সসম্মানে বাবাকে সেলাম জানিয়ে প্রথমে হাতে চুমু খেত, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে ঠোঁটে তিনবার, তারপর নাতালিয়া আর আমাদের দুজনকে চুমু খাবার পালা। সঙ্গে ভেট আনত মধু, ডিম আর বাড়িতে বোনা তোয়ালে। আর খোলামেলা জায়গায় মানুষ হয়েছি বলে আমরা যেমন গান আর উপকথা ঠিক তেমনি সুবাস আর গন্ধের বিষয়েও সজাগ ছিলাম। সুখদলের মানুষদের চুমো খাবার সময় শণের কথা মনে করিয়ে দেওয়া তাদের গায়ের সেই অদ্ভুত, প্রীতিকর গন্ধ কখনো ভুলে যাই নি: আর ভুলে যাই নি তাদের ভেটের গন্ধ: স্তেপের প্রাচীন গ্রামের মুকুলিত বাক-হুইট আর পচা ওক বনের মৌচাকের গন্ধ — মধুতে, তোয়ালেগুলোতে — শণের বস্তা আর ঠাকুর্দার আমলের ধোঁয়াটে কুটিরের গন্ধ... সুখদলের চাষীরা কোনো গপ্পটপ্প বলত না। ওরা বলবে কী! পুরুষানুক্রমে বলার মতো কিংবদন্তীও ছিল না ওদের। ওদের কবরে নামের বালাই নেই। আর জীবন ওদের সবারই ভারি একরকম, ভারি অস্বচ্ছল, কোনো চিহ্ন রেখে যেত না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পেত রুটি, রোজকার সেই মামুলি রুটি। অনেকদিন আগে শুকিয়ে যাওয়া কামেন্‌কা নদীর পাথর গর্ভ খুড়ে ওরা অবশ্য পুকুর

5•

কাটার চেষ্টা করে। কিন্তু পুকুরে তো আর মুশকিল আসান হয় না — পুকুর শুকিয়ে যায়। ঘর বানাল ওরা। কিন্তু সে ঘরের আয়ু কত দিন: সামান্য স্ফুলিঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে যায়... তবু আমাদের সক্কলের এত টান কেন এই রিক্ত চারণভূমির প্রতি, এই সব কুঁড়েঘর, খাত আর উৎসন্নে যাওয়া সুখদল জমিদারির প্রতি?

২

সেই জমিদারি, যেটা গড়ে নাতালিয়ার মানসকে, সারা জীবন চালায় তাকে, যে জমিদারির বিষয়ে কত না শুনেছি, সেই সুখদলে থাকার সুযোগ এল কৈশোরের শেষে।

স্পষ্ট মনে আছে, যেন কালকের ব্যাপার। দিনের শেষে গাড়ি করে যখন সুখদলে পৌঁছলাম তখন বৃষ্টি নেমেছে মুষলধারায়, বাজে কানে তালা লেগে যায় আর ক্ষিপ্র জ্বলন্ত সাপের মতো চোখ ধাঁধানো বিদ্যুতের ঝিলিক। আকাশের অর্ধেকটা জুড়ে একটি ঘন বেগুনি রঙের বজ্রগর্ভমেঘ মন্থর ভারি চালে চলেছে উত্তর-পশ্চিমে। তার বিরাট পটভূমিকায় শস্যের সবুজ গালিচাটা দেখাচ্ছে বিরস, স্পষ্ট আর মৃত্যুর মতো

বিবর্ণ, বড়ো রাস্তার ছোট ভিজে ঘাস চকচকে, অসাধারণ সরস। ভিজে ঘোড়াগুলো যেন হঠাৎ রোগা হয়ে গিয়ে নীলচে কাদা ঠেলে চলেছে নালের ঝিলিক তুলে, চাকার খস্‌খস আওয়াজটা কেমন যেন ভিজেভিজে... সুখদলের দিকে মোড় নিয়েছি, হঠাৎ চোখে পড়ল এক দীর্ঘ বিচিত্র মূর্তি, পুরুষ না স্ত্রীলোক বোঝা ভার, গায়ে ড্রেসিং-গাউন, মাথায় আবরণ, উঁচু রাইশস্যের ভিজে ক্ষেতে দাঁড়িয়ে গাছের ডাল দিয়ে পিটোচ্ছে শিং ভাঙা ছোপ রঙের গরুকে। আমরা কাছে গিয়ে পড়াতে দেখলাম একটি বুড়ী, আরো জোরে সে ডাল চালাতে গরুটা লেজ নাড়িয়ে হুড়বড় করে এসে পড়ল রাস্তায়। কী একটা যেন চেঁচাতে চেঁচাতে বুড়ী গাড়ির কাছে এল, গলা বাড়িয়ে ফ্যাকাসে মুখে তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে। ওর কালো, উদভ্রান্ত চোখে আতঙ্কে চোখ রেখে, ঠান্ডা ছুঁচলো নাকের ছোঁয়াচ আর কুঁড়েঘরের কড়া গন্ধ পেয়ে চুমো খাওয়ার পালা শেষ করা গেল। এ কি ডাইনী বুড়ী? কিন্তু এর মাথায় ময়লা কাপড়ের উঁচু আবরণ, নগ্ন শরীরের ওপর চাপানো ছেঁড়াখোড়া ড্রেসিং-গাউন কোমর পর্যন্ত ভিজে, দেখা যাচ্ছে শুষ্ক দুটি স্তন। এমনভাবে চেঁচাচ্ছে যেন আমরা কালা, কিম্বা যেন ওর ইচ্ছে একটা জোর

ঝগড়া বাঁধানো। আর চীৎকার শ‍ুনে ব‍ুঝলাম: ইনিই হলেন তনিয়া পিসী।

ক্লাভদিয়া মার্কভনাও চেঁচালেন বেশ জোরে, কিন্তু তাঁর চেঁচানিটা ফ‍ূর্তির, স্কুলের মেয়ের মতো, ছোটখাটো, মোটাসোটা মহিলাটি, সাদাটে একটু দাড়ির ছাপ ম‍ুখে, চোখদ‍ুটো অসাধারণ সজীব। দ‍ুটো বড়ো বারান্দাওয়ালা বাড়িতে খোলা জানলায় বসে মোজা ব‍ুনছিলেন তিনি, চশমা কপালে তুলে তাকিয়ে দেখছিলেন চারণভূমিটা যেটা এখন মিশে গেছে উঠানের সঙ্গে। ডান দিকের বারান্দায় নাতালিয়া মাথা নীচু করে, রোদে পোড়া, মমতায় ভরা ম‍ুখে নম্র হাসি এনে আমাদের অভ্যর্থনা করল — পায়ে বাকলের জ‍ুতো, পরনে লাল পশমের স্কার্ট আর কালচে, কুঞ্চিত কণ্ঠ ঘিরে চওড়া করে কাটা ছাই-রঙা ব্লাউজ, মনে আছে ওর গলা, বেরিয়ে-আসা কণ্ঠার হাড়, শ্রান্ত বিষণ্ণ চোখ দেখে ভেবেছিলাম: এই নাতালিয়া অনেক, অনেক দিন আগে মান‍ুষ হয়েছিল বাবার সঙ্গে এক সাথে, আর ঠিক এ জায়গাটায় দাঁড়িয়ে থাকা এই কুৎসিত বাড়িটা হল ঠাকুর্দার ওক কাঠের তৈরী বাসস্থানের ভগ্নাংশ, প‍ুরনো সেই বাড়িটা কত বার না প‍ুড়ে ছাই হয়ে যায়, প‍ুরনো বাগানের মধ্যে আছে শ‍ুধ‍ু কয়েকটা ঝোপঝাড়,

বার্চ আর পপলার গাছ; খানা-বাড়ি আর চাকরদের মহাল বলতে পড়ে আছে — শুধু একটি কুটির, গোলা একটা, একটা মাটির গুদামঘর আর একটি বরফ-ঘর, সোমরাজ আর বেতোশাকে আচ্ছন্ন... নাকে এল সামোভার ধরাবার গন্ধ, দুই পক্ষে জিজ্ঞাসাবাদ চলেছে; প্রাচীন আলমারিটা থেকে বেরিয়ে এল জামের স্ফটিকপাত্র আর মেপলের পাতার মতো ক্ষয়ে যাওয়া সোনার চামচ, অপ্রত্যাশিত অতিথিদের জন্য রাখা কিছু চিনির মণ্ডা। বহু দিনের ঝগড়ার পর ইচ্ছে করে হৃদ্য কথাবার্তা জমে উঠেছে, এদিকে আমরা থমথমে ঘরগুলোয় ঘুরছি, খুঁজছি বারান্দা, বাগানে যাবার কোনো দরজা।

নীচু ফাঁকা ঘরগুলোর সবকিছু কালের প্রকোপে কালো, সবকিছু সাদাসিধে আর মোটা, তাদের বিন্যাস ঠিক ঠাকুর্দার আমলের মতো; বাস্তবিক, যে সব ঘরে তিনি থাকতেন তাদেরই পড়ে থাকা অংশগুলো কোনক্রমে জোড়াতালি দিয়ে এগুলো বানানো। চাকরদের ঘরের এক কোণে ঝোলানো স্মলেন্‌স্কের সেণ্ট-মার্কিউরির একটি প্রকাশু, ময়লা আইকন, সেই তিনি, যাঁর লোহার পাদুকা আর শিরস্ত্রাণ রক্ষিত আছে স্মলেন্‌স্কের প্রাচীন গির্জায়। শুনেছিলাম: সেণ্ট-

মার্কিউরি ছিলেন প্রখ্যাত ব্যক্তি, নিজের আইকন থেকে অপাপবিদ্ধ কুমারী মেরি তাঁকে ডাকেন, তাতারের হাত থেকে স্মলেন্‌স্ক্‌ অঞ্চলকে উদ্ধারের আহ্বান জানান। তাতারদের হারিয়ে দিয়ে সেণ্টটি ঘুমিয়ে পড়েন, তখন শত্রুরা তাঁর শিরচ্ছেদ করে। আর তিনি করলেন কী, নিজের মুণ্ডু হাতে নিয়ে শহরের ফটকে এসে লোকজনকে জানিয়ে দিলেন ব্যাপারটা... এক হাতে শিরস্ত্রাণ ঢাকা মৃত্যুনীল মাথা, অন্য হাতে অপাপবিদ্ধ কুমারী মেরির আইকন — প্রাচীন সুজ্‌দালে আঁকা এই মুণ্ডুহীন মূর্তিটি দেখে গা ছমছম করে উঠল আমাদের। শুনেছিলাম ঠাকুর্দার বড়ো আদরের এই ছবিটি বার কয়েক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে চিড় খেয়ে যায়, ভারি রুপার পাতে ছবিটি বসানো, পেছন দিকে স্লাভোনিকে ক্রুশ্চভদের কুলপঞ্জিকা লেখা। আইকনটির সঙ্গে খাপ খাইয়ে যেন ভারি দরজাগুলোর ওপর আর নীচে ভারি লোহার হুড়কো। মেঝের তক্তা অসম্ভব চওড়া, কালো আর পেছল, জানলার শার্সিগুলো ছোট, ওপরে তোলা যায়। হল-ঘরটা আয়তনে এখন মূল ঘরের অর্ধেক হলেও এখানেই একদা শিকারের বেত নিয়ে খেতে বসতেন ক্রুশ্চভরা। এ ঘর হয়ে গেলাম ড্রয়িং-রুমে। সেখানে বারান্দার দরজার অন্য দিকে

এককালে ছিল সেই পিয়ানোটা, যেটা পিওত্র পেত্রভিচের অফিসার বন্ধু ভৈৎকেভিচের প্রেমে পাগলিনী তনিয়া পিসী বাজাতেন। যেতে যেতে দেখলাম বসার ঘরের খোলা দরজা আর কোণের সেই কামরাটা যেখানে থাকতেন ঠাকুর্দা...

বিরস সন্ধ্যা। কেটে ফেলা ফলের বাগান, ভেঙে পড়া খামার আর রুপোলী পপলার গাছের ওপারে মাঝে মাঝে চমকানো বজ্রগর্ভ মেঘের বৈশাখী বিদ্যুতে নিমেষের জন্য জেগে উঠছে আলোর গোলাপী-সোনালী পাহাড়। বাগানের পেছনে খাতের ওধারে পাহাড়ে অন্ধকার হয়ে আসা ত্রশিন বনে বৃষ্টি হয় নি বোধ হয়। সেখান থেকে আসছে ওক গাছের শুকনো উষ্ণ গন্ধ, বারান্দার কাছাকাছি বাকি বার্চ গাছগুলো, উঁচু বিচুটি, চোর কাঁটা আর ঝোপঝাড়ের ওপর দিয়ে আসা আর্দ্র মধুর হাওয়ায় সে গন্ধ মিশে যাচ্ছে উদ্ভিদের গন্ধের সঙ্গে। আর সন্ধ্যা, স্তেপ, গহন রাশিয়ার বিপুল স্তব্ধতা চারিধারে...

— চা দেওয়া হয়েছে, — মৃদু গলায় কে যেন ডেকে বলল।

বলল নাতালিয়া, এই জীবনের সমস্তটায় যে যোগ দিয়েছে, যে হল এর সাক্ষী, এর প্রধান কথক। তার

পেছনে দেখা গেল কর্ত্রীকে, ক্ষ্যাপা চোখে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটু ঝুঁকে কেতাদুরস্তভাবে কালো মসৃণ মেঝে হয়ে সাবলীলভাবে এলেন তিনি। মাথার আবরণটা তখনো খোলা হয় নি, তবে ড্রেসিং-গাউনের বদলে গায়ে চাপিয়েছেন একটা সেকেলে ধরনের পোষাক, কাঁধে রঙ-চটা সোনালি সিল্কের শাল।

— Où êtes-vous, mes enfants?* — সুষ্ঠু হাসি হেসে হাঁকলেন তিনি, কাকাতুয়ার মতো পরিষ্কার তীক্ষ্ম সে গলা অদ্ভুত প্রতিধ্বনি তুলল ফাঁকা অন্ধকার ঘরগুলোয়...

৩

হৃতৈশ্চর্য জমিদারিটির একটি মোহ ছিল, ঠিক যেমন ছিল সুখদলের মানুষ নাতালিয়ায়, তার চাষীসুলভ সরলতায়, তার অপরূপ আর করুণ অন্তরে।

মেঝের তক্তা বেঁকে যাওয়া পুরনো ড্রয়িং-রুমে জুইফুলের গন্ধ। সিঁড়ি নেই বলে পুরনো নড়বড়ে ধূসর নীল বারান্দা থেকে নামতে হয় লাফিয়ে, বারান্দাটা ভরে গেছে বিছুটি, এলডর আর বুনো লতার

* বাছারা, কোথায় তোমরা? (ফরাসী)

ঝাড়ে। গরমের দিনে কাঠফাটা রোদ যখন পড়ত বারান্দায়, হাট করে খুলে দেওয়া হত কাঁচের বসে যাওয়া দরজাগুলো, চিকচিকে ঝকঝকে কাঁচের চৌখুপীর ছায়া পড়ত সামনের দেয়ালের লম্বাটে আয়নায়, তখন আমাদের মনে পড়ে যেত তনিয়া পিসীর পিয়ানোটার কথা, এককালে যেটার স্থান ছিল আয়নার নীচে। এককালে তো শিরোনামায় কারুকাজ করা হলদেটে স্বরলিপির দিকে তাকিয়ে পিয়ানো বাজাতেন পিসী, আর **তিনি** দাঁড়িয়ে থাকতেন তাঁর পেছনে, বাঁ হাত কোমরে রেখে, দৃঢ় চিবুকে, ভুরু কুঁচকে। সুন্দর প্রজাপতি সব উড়ে উড়ে আসত ঘরে, — কারো গায়ে ঝকঝকে সুতীর ফ্রক, কেউ বা পরছে জাপানী কিমোনো, কেউ বা কালো-বেগুনী মখমলের শাল। আর ঠিক চলে যাবার আগে হঠাৎ চটে উঠে তিনি একটাকে মেরে বসেন, ফুরফুর করে সেটা সবে বসেছিল পিয়ানোর ঢাকনায়। রুপোলী গুঁড়ো শুধু পড়ে রইল সেখানে। কিন্তু কিছুদিন পরে বোকার মতো ঝিরা গুঁড়োগুলো ঝেড়ে ফেলতে হঠাৎ তনিয়া পিসীর হিস্টিরিয়া হয়... ড্রয়িং-রুমের দরজা হয়ে বারান্দায় এসে উষ্ণ তক্তায় বসে — ভাবতাম আর ভাবতাম। বাগানে ছোটাছুটি করা হাওয়ায় বার্চ গাছের মখমল

মসৃণ খস্‌খসানি, গাছগুলোর গুঁড়ি কালো কাজ করা সাদা সাটিনের মতো, ডালপালা সবুজ আর ছড়ানো, মাঠ থেকে শোঁশোঁ ছুটেছে হাওয়া — সাদা ফুলের ওপর দিয়ে তীরের মতন বেগে সবুজ সোনালি একটি কলকণ্ঠ পাখি ফূর্তিভরা তীক্ষ্ন ডাকে ধাওয়া করেছে বাচাল কাকগুলোকে, অসংখ্য আত্মীয়কুটুম নিয়ে তাদের আস্তানা ভেঙে পড়া চিমনী আর অন্ধকার চিলেকোঠায়, যেখানে পুরনো ইঁটের গন্ধ, স্তূপীকৃত ধূসর, কালচে লাল ছাইতে সোনালি ছিটে লাগছে চিনে জানলা থেকে আসা আলোতে; হাওয়া পড়ে গেল, বারান্দার ধারে ফুলগুলোয় গুটি গুটি গিয়ে ঘুম জড়ানো মৌমাছিরা তাদের কাজ করে চলেছে আলস্যভরে, — স্তব্ধতায় শুধু কানে আসে রুপোলি পপলার পাতার গুঞ্জন চলেছে টুপটাপ একটানা শব্দে, ঝিরঝিরে অবিরাম বৃষ্টির ধ্বনি যেন... বাগানে ঘুরতে ঘুরতে চলে যেতাম একেবারে প্রান্তে, যেখানে আরম্ভ হয়েছে শস্যক্ষেত। সেখানে প্রপিতামহের ভাঙাছাদ গোসলখানা, এককালে পিওত্র পেত্রভিচের আয়না চুরি করে এখানে লুকিয়ে রেখেছিল নাতালিয়া, এখন সেখানে সাদা খরগোসের আস্তানা। হালকা পায়ে লাফিয়ে চৌকাঠে ওঠে, গোঁফ আর চেরা ঠোঁট কাঁপিয়ে তারা ড্যাবড্যাবে চোখে

বিটকেল টেরা চাউনি হেনে তাকিয়ে থাকত উ'চু কাঁটা গাছ আর ব্ল্যাকথর্ন ও চেরি গাছ ছেয়ে ফেলা বিছুটির দিকে! আধো-খোলা মাড়াইঘরে একটা বাদামি পে'চার বাসা। বেড়াজালের উপর যতটা সম্ভব একটা অন্ধকার জায়গা বেছে নিয়ে কান উঁচিয়ে বসে থাকত পে'চাটা, দৃষ্টিহীন হলদে চোখজোড়া বিস্ফারিত — দেখাত বুনো, শয়তানের মতো। বাগান ছাড়িয়ে বহুদূরে শস্যক্ষেতের সমুদ্রে ডুবে যেত সূর্য, মদির প্রশান্ত সন্ধ্যা; গ্রশিন বনে একটা কোকিলের ডাক, বহুদূরে ঘাসের মাঠে বুড়ো রাখাল স্তিওপার বাঁশীর সকরুণ সুর... পে'চাটা বসে থাকত রাত্রির অপেক্ষায়। রাত্রে সবাই নিদ্রামগ্ন — মাঠঘাট, গ্রাম আর জমিদার বাড়ি। কিন্তু পে'চাটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ডেকে চলত। গোলাঘর নিঃশব্দে ঘুরে বাগান হয়ে যেত তনিয়া পিসীর কুটিরে, আস্তে ছাদে বসেই অসুস্থ চীৎকার ছাড়ত একটা... চুল্লির পাশের বেঞে ঘুমন্ত তনিয়া পিসী জেগে উঠতেন চমকে।

— প্রভু রক্ষা করুন আমায়, — দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ফিসফিসিয়ে বলতেন তিনি।

অন্ধকার গরম কুটিরটা, ছাদের কাছে মাছির নিদ্রালস বিরক্ত ভনভনানি। রোজ রাত্রে কিছু না কিছু একটা

তাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়। হয়ত কুটিরের দেয়ালে গরুটা গা ঘষল; নয়ত একটা ইঁদুর পিয়ানোর চাবির ওপর দিয়ে তড়তড় করে যাওয়াতে প্রখর টুংটাং শব্দ, তারপর কোণে তনিয়া পিসীর সযত্নে রাখা ভাঙা কাঁচের বাসনের গাদায় পা ফসকে পড়ে গেল ইঁদুরটা, ঝন ঝনাৎ করে উঠল; কিম্বা হয়ত সবুজচোখো কালো বেড়ালটা কোথা থেকে যেন নিশুতি রাতে বাড়ি ফিরে ভেতরে ঢোকার জন্য অলসভাবে মিউ-মিউ শুরু করে দিল; নয়ত পেঁচাটা আবার ছাতে বসে চিৎকার করে ভবিষ্যদ্বাণী করতে লাগল আসন্ন বিপদের। আর ঘুমের ভাব কাটিয়ে, অন্ধকারে মুখে-চোখে ভিড় করা মাছি তাড়িয়ে তনিয়া পিসী বেঞ্চে হাতড়ে হাতড়ে দড়াম করে দরজা খুললেন — আর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তারাভরা আকাশের দিকে এলোপাতাড়ি ছুঁড়ে মারলেন তাঁর বেলনাটা। পাখা দিয়ে খড় খসখসিয়ে পেঁচাটা ঝটকে উড়েই — ডুব দিল গভীর অন্ধকারে। প্রায় মাটিতে গা লাগিয়ে স্বচ্ছন্দে গোলাবাড়ির দিকে উড়ে গিয়ে ওপরে উঠল, বসল ছাতের কোণে। আবার বাড়ির দিকে হাওয়ায় ভেসে আসছে তার কান্নার সুর। কী একটা যেন মনে করার চেষ্টায় বসে আছে সে, — তারপর হঠাৎ একটা বিস্ময়ের আর্তনাদ; স্তব্ধতা — আবার হঠাৎ ভূতে

পাবার মতো ডাক হল শুরু, খ্যাঁকখেঁকে হাসি আর চীৎকার; ক্ষণিকের জন্য থেমে আবার গোঙানি, নাকি সুরে কান্না আর ফোঁপানি... কিন্তু ছোটছোট বেগুনি মেঘের উষ্ণ অন্ধকার রাত্রিগুলো শান্ত, প্রশান্ত। ঘুমন্ত পপলারের ঘুম জড়ানো একঘেয়ে মর্মর। ব্রশিন বনের ওপর নিদাঘ বিদ্যুতের সাবধানী চমক — হাওয়ায় ওক গাছের শুকনো গরম গন্ধ। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে, বনের কাছে জই ক্ষেতের সমভূমির ওপরে রুপোলি ত্রিভুজে বৃশ্চিক নক্ষত্রমণ্ডলীর দ্যুতি, ক্রুশের ওপর ছোট ছাদ দেওয়া যেন সমাধি পাথর...

বাড়ি ফিরতে দেরী হয়ে যেত। বুক ভরে শিশির, তাজা মাঠঘাট, বুনো ফুল আর ঘাসের গন্ধ নেওয়া হয়ে গেলে আস্তে আস্তে প্রবেশপথের সিঁড়ি বেয়ে যেতাম অন্ধকার হল-ঘরে। প্রায়ই দেখতাম সেণ্ট-মার্কিউরির প্রতিকৃতির নীচে প্রার্থনারত নাতালিয়াকে। আইকনের সামনে ক্ষীণ দেহে, খোলা পায়ে, করজোড়ে দাঁড়িয়ে ফিসফিসে গলায় কী বলে ক্রুশচিহ্ন করে হেঁট হয়ে প্রণাম করত অন্ধকারে অদৃশ্য দেবতাকে, — আর সবই কী সহজে, যেন বাড়ির কারো সঙ্গে, ওরই মতো সহজ সাধারণ, ভালোমানুষ, মমতাময় কারো সঙ্গে কথা বলছে।

— নাতালিয়া ? — আস্তে আমরা ডাকতাম।

— আজ্ঞে ? — প্রার্থনা থামিয়ে মৃদু সহজ কণ্ঠে সাড়া দিত ও।

— এখনো শুতে যাও নি যে ?

— মনে হচ্ছে প্রাণভরে ঘুমোব কবরে...

তারপর আমরা জানলার ধারিতে বসে খুলে দিতাম জানলাটা; বুকে হাত মুড়ে দাঁড়িয়ে থাকত নাতালিয়া। নিদাঘ বিদ্যুতের রহস্যঘন ঝিলিকে আলো হয়ে উঠত অন্ধকার ঘরগুলো, শিশির সিক্ত স্তেপে অনেক দূরে ডাকত একটা ভারুই পাখি, জেগে উঠে উৎকণ্ঠায় পুকুরে প্যাঁক-প্যাঁক করে উঠত একটা হাঁস...

— বেড়াতে গিয়েছিলে ?

— হ্যাঁ।

— তা বেশ, কচি বয়সের ব্যাপার... আমরাও সারা রাত্তির বাইরে কাটাতাম... সূর্য ডুবে গেলে বাইরে বেরিয়ে পড়া, সূর্য উঠলে ফিরে আসা...

— তখনকার কালে জীবন কাটত ভালো ?

— তা কাটত বৈকি।

এরপর অনেকক্ষণ কোনো কথা নেই।

— পেঁচাটা ওরকম করে চেঁচায় কেন, বল না ধাই-মা ? — জিজ্ঞেস করত আমার বোন।

— ওর ডাকটা অলক্ষুণে, চুলোয় যাক ও। গুলি ছুঁড়ে ওকে তাড়িয়ে দিলে বোধহয় ভালো হয়। ডাকলে গাটা ছমছম করে ওঠে, মনে হয়: একটা কিছু সর্বনাশ ঘটবে। ওর ডাকে দিদিমণিও ভয় পান। সবকিছুতে ভীষণ ভয় পান উনি!

— ওঁর অসুখ হল কেন?

— যেমনভাবে হয়: খালি কান্না আর শোক... তারপর ধর্মে মন দিলেন... ঝিদের সঙ্গে ব্যবহার ক্রমশ খারাপ হয়ে গেল, ভাইদের ওপর রাগ দিনে দিনে বেড়ে গেল...

চাবুকের কথাটা মনে পড়ে যাওয়াতে আমরা জিজ্ঞেস করলাম:

— তার মানে ওঁদের মধ্যে বনিবনা ছিল না?

— বনিবনা! ওরে বাবা! বিশেষ করে দিদিমণির অসুখ, ঠাকুর্দার মৃত্যু, দাদাবাবুদের বয়স বাড়ার আর বিগত পিওত্র পেত্রভিচের বিয়ে হবার পর যা কাণ্ডটা হত! ওঁরা ছিলেন সাক্ষাৎ অগ্নিশর্মা — বারুদের মতো একদম!

— চাকরবাকরদের প্রায়ই চাবকাতেন?

— না, সেরকমটা কখনো হয় নি এখানে, কখনো নয়। আমার কথাই ধর না কেন। আমি যা করেছিলাম! শাস্তি কী হল? পিওত্র পেত্রভিচের হুকুমে মাথা মুড়িয়ে

দেওয়া হল ভেড়ার লোম কাটার কাঁচিতে, একটা বিছুটির জামা গায়ে পরিয়ে ভাগিয়ে দেওয়া হল ছোট খামার বাড়িতে।

— কিন্তু কী করেছিলে তুমি?

সরাসরি জবাব তক্ষুণি পেতাম না সব সময়। মাঝে মাঝে নাতালিয়া কিছু না ঢেকে তার সব কথা বলত আশ্চর্য খোলাখুলিভাবে; কিন্তু মাঝে মাঝে আবার তোতলিয়ে থেমে পড়ে কী একটা ভেবে মৃদু নিশ্বাস ফেলত, প্রদোষের অন্ধকারে ওর মুখ দেখা যেত না, কিন্তু গলা শুনে টের পেতাম ও হাসছে বিষণ্ণ হাসি:

— কী আর করব, যা করেছিলাম তাই... আগেই তো বলেছি... বয়স ছিল কম, বুদ্ধি ছিল না ঘটে... 'গাইল কোকিল সারা বাগান, পাপের, সর্বনাশের গান'... আর, জানোই তো, কুমারী মেয়ের ব্যাপার...

বেশ মিষ্টি সুরে আমার বোন ওকে অনুনয় করল:

— কবিতাটার বাকিটুকু আমাদের শোনাও ধাই-মা।

বিব্রত হত নাতালিয়া।

— এটা কবিতা নয়, গান... সবটা মনে নেই এখন।

— বাজে কথা। মনে আছে নিশ্চয়।

— বেশ, তাই যদি চাও তবে...

আর তাড়াতাড়ি গানটা আওড়াত সে:

— 'কেন যে কোকিল'... না, 'গাইল কোকিল সারা বাগান, পাপের, সর্বনাশের গান — সে গানে কেবল পোড়ায় মন... সারা রাত ঘুম না জানে নয়ন...'

জোর করে লজ্জা কাটিয়ে আমার বোন শুধাত:

— জ্যেঠামশাইকে তুমি খুব ভালোবাসতে?

আর নাতালিয়া ফিসফিস করে সংক্ষেপে বলত:

— হ্যাঁ, খুব।

— প্রার্থনা করার সময় সর্বদা তাঁকে মনে পড়ে?

— সর্বদা।

— লোকে বলে সর্শাকিতে নিয়ে যাবার সময় তুমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে?

— তা হয়েছিলাম। আমরা, ঝিরা, তখন ছিলাম ভারি নরম — শাস্তিতে অল্পই ভেঙে পড়তাম... চোয়াড়ের সঙ্গে কি আমাদের তুলনা করা যায়! ইয়েভ্‌সেই বদুলিয়া আমাকে নিয়ে রওনা হল। ভয়ে দুঃখে একেবারে অসাড় হয়ে গিয়েছিলাম... সেই প্রথম শহরে গিয়ে অনভ্যাসে দম বন্ধ হবার জোগাড়। তারপর স্তেপেতে গিয়ে পড়লাম, ভয়ানক দুর্বল আর বিষণ্ন লাগল! হঠাৎ একজন অফিসারকে দেখলাম ঘোড়া হাঁকিয়ে আসছেন আমাদের দিকে, দেখতে কর্তার মতো, — চেঁচিয়ে উঠে তক্ষুণি অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

জ্ঞান ফিরে আসাতে দেখলাম গাড়িতে শুয়ে আছি, ভাবলাম: আমার কত না সুখ এখন, যেন সশরীরে স্বর্গলাভ!

— খুব কড়া লোক ছিলেন উনি?

— ওরে বাবা, তা আর বলতে!

— কিন্তু পিসী ছিলেন সবচেয়ে খামখেয়ালি, তাই না?

— তা ছিলেন বই-কি। তোমাদের বলি: এমনকি সাধুর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওনাকে? সত্যি, আমাদের কত না ভোগান্তি হয় ওনার জন্য! এমন দিনে ওনার সুখে শান্তিতে ঘর করার কথা, কিন্তু খুব গরব ছিল ওনার, মাথা বিগড়ে গেল... আর ভৈৎকেভিচ সত্যি দিদিমণিকে কত না ভালোবাসতেন! কিন্তু দ্যাখো কাণ্ড!

— আর দাদু?

— তিনি আর কি! পাগল ছিলেন তো! মাঝে মাঝে অবশ্য তাঁরও মেজাজ বিগড়ে যেত। তখনকার দিনে সবাই তো আর ঠাণ্ডা মেজাজের লোক ছিলেন না... কিন্তু কর্তারা তখন আমাদের মতো লোক নিয়ে খুঁতখুঁত করতেন না... কখনো সখনো দুপুরের খাবার সময় তোমাদের বাবা গের্ভাস্কারও সাজা দিতেন, — উচিত

শাস্তিই দিতেন! — সন্ধ্যেবেলায় আবার দুজনে মিলে উঠানে কী ফূর্তি, কী বালালাইকা বাজানো...

— আচ্ছা, উনি, মানে ভৈৎকেভিচ — দেখতে সুন্দর ছিলেন?

কী যেন ভাবত নাতালিয়া।

— না, মিথ্যে কথা বলব না: দেখতে উনি ছিলেন কালমিকের মতো। কিন্তু স্বভাবটা ছিল ভারিক্কি, নাছোড়বান্দা। দিদিমণিকে কবিতা পড়ে শোনাতেন আর ভয় দেখাতেন: মরে তাঁর কাছে ফিরে আসবেন...

— আচ্ছা, দাদুও তো প্রেমে পড়ে পাগল হয়ে যান?

— সেটা হয় তোমাদের ঠাকুমার জন্য। সেটা একেবারে আলাদা ব্যাপার দিদিমণি। তাছাড়া বাড়িটা এত ছমছমে ছিল — হাসিখুশি হবার মতো জায়গা নয় মোটে; আহা বেঁচে থাক সবকিছু। আচ্ছা, আমার বোকা-বোকা কথা যদি শুনতে চাও তাহলে বলি...

আর তার দীর্ঘ, অতিদীর্ঘ কাহিনী ধীরেসুস্থে, নীচু গলায় বলতে শুরু করত নাতালিয়া...

৪

ইতিবৃত্ত মানতে হলে, আমাদের ধনী প্রপিতামহ কুর্স্ক থেকে যখন সুখদলে আসেন তখন তাঁর তিনকাল

গিয়ে এক কালে ঠেকেছে: বন জঙ্গলে ভর্তি অতিদূরে জায়গাটা তাঁর পছন্দ হয় নি। কিন্তু ‘আগেকার দিনে আগে পিছু চারিধার শুধু বন বাদাড়’ — কথাটা তো এখন চলতি হয়ে দাঁড়িয়েছে... দু’শ বছর আগে আমাদের এলাকায় পথিকদের যেতে হত গভীর বনের মধ্য দিয়ে। বনে হারিয়ে যেত সবকিছু — কামেন্‌কা নদী, উজানির অঞ্চল, আমাদের গ্রাম, জমিদারি আর চারিধারের বন্ধুর মাঠঘাট। ঠাকুর্দার আমলে কিন্তু সেরকমটা ছিল না। জায়গাটার চেহারা তখন আলাদা: তরঙ্গিত স্তেপ, ফাঁকা পাহাড়, ক্ষেতে — জই আর গম, রাস্তার দু’পাশে — দলছাড়া কোটরাকীর্ণ উইলো গাছ, আর সুখদলের চড়াইয়ে শুধু সাদা পাথর-নুড়ি। অরণ্য বলতে যা রয়ে গিয়েছিল সেটা হল ব্রশিন বন। বাগানটা সুন্দর ছিল অবশ্য: চওড়া বীথির দু’ধারে প্রসারিত-শাখা সত্তরটা বার্চগাছ আর বিছুটিতে ঢাকা চেরি গাছ, রাস্পবেরি, বাবলা আর লাইলাক ঝোপের ছড়াছড়ি, আর বাগানের শেষ দিকটায়, যেখানে শস্যক্ষেতের শুরু, সেখানে রুপোলী পপলারের প্রায় একটি কুঞ্জ। ঘন, কালো, শক্ত খড়ে ছাওয়া বাড়ির ছাদ। জানলাগুলোর সামনের আঙিনা ঘিরে খানা-বাড়ি আর সার বেঁধে চাকরদের মহালের দীর্ঘ কাঠের বাড়ি, তাতে

অনেক ভাগ, আঙিনা পেরিয়ে সীমাহীন সবুজ মাঠ আর জমিদারির ছড়ানো গ্রাম, আকারে বড়ো, গরীব বটে, কিন্তু — ভাবনা-চিন্তার বালাই নেই।

— এ বিষয়ে কর্তাদের সঙ্গে মিল ছিল সত্যি, — বলত নাতালিয়া। — তাঁরাও ছিলেন বেপরোয়া — পাকা জমিদার নন, লোভী নন। সম্পত্তি ভাগ করেন সেমিওন কিরিলীচ, তোমাদের ঠাকুর্দার দাদা, বড়ো আর ভালো অংশটা, পৈতৃক জমিদারিটা নিজের জন্য রেখে আমাদের দিলেন কেবল সশাকি, সুখদল আর শ'চারেক ভূমিদাস চাষী। কিন্তু চার শ'র প্রায় অর্ধেকই পালিয়ে গেল...

আমাদের ঠাকুর্দা পিওত্র কিরিলীচ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে মারা যান। বাবার মুখে অনেকবার শুনেছি, একবার ঠাকুর্দা একটা আপেল গাছের নীচে গালচে পেতে ঘুমোচ্ছিলেন, প্রবল দমকা ঝড়ে এক গাদা আপেল তাঁর মাথায় পড়াতে পাগল হয়ে যান। নাতালিয়া কিন্তু বলে চাকরদের মহালে ঠাকুর্দার মাথা খারাপ হয়ে যাবার বিষয়ে অন্য কথা হত: তাদের মতে, সুন্দরী স্ত্রীর মৃত্যুশোকে তিনি পাগল হয়ে যান, সে ঘটনাটির আগের দিন সুখদলে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টির প্রকোপ হয়। আর তাই, কালো-চুল, কুঁজো, ময়লা রঙ, অনেকটা তনিয়া

পিসীর মতো কালো একাগ্রচোখ পিওত্র কিরিলীচ জীবনের শেষ দিনগুলো কাটান শান্ত পাগলামিতে। নাতালিয়ার মতে, সে সময়ে তাঁদের এত পয়সা ছিল যে উড়িয়ে শেষ করা যেত না, মরক্কো চামড়ার টপবুট পায়ে, গায়ে বাড়িতে পরার রঙীন জামা, ঠাকুর্দা নিঃশব্দে উৎকণ্ঠায় এ-ঘর ও-ঘর করে বেড়াতেন, সাবধানে চারদিক দেখে নিয়ে কাঠের দেয়ালের ফাঁকে গুঁজে দিতেন স্বর্ণমুদ্রা। কেউ ধরে ফেললে বিড়বিড় করে বলতেন:

— তনিয়ার বরপণের কথা ভাবছি কিনা। এ সব জায়গা নিরাপদ, অনেক নিরাপদ, বুঝলে কিনা... কিন্তু ব্যাপারটা বলতে গেলে — তোমাদেরই হাতে: যদি বলো — তাহলে আর করব না...

আবার চলত টাকা গুঁজে রাখা। নয়ত হল-ঘর আর ড্রয়িং-রুমের ভারি আসবাবপত্র সরাতে লেগে যেতেন, সর্বদা তাঁর আশা কোনো অতিথি এল বুঝি, যদিও প্রতিবেশীরা সুখদলে আসত কালেভদ্রে; কখনো-সখনো ক্ষিধে পেয়েছে বলে ঘ্যান ঘ্যান করে মাংস কুচির একটা ঘ্যাঁট নিজে বানিয়ে নিতেন, কাঠের পাত্রে কাঁচা পেঁয়াজ বিদ্ঘুটেভাবে কেটে কুচিয়ে তাতে রুটির টুকরো ফেলে ঘন ফেনিল সুরোভেতস ঢেলে এত বেশী

মোটা ধূসর নুন ছড়িয়ে দিতেন ওপরে যে জিনিসটা একেবারে তেতো হত, মুখে দেওয়া ভার। দুপুরের খাবার পর বাড়ি চুপচাপ, সবাই যে-যার প্রিয় জায়গায় লম্বা ঘুম দিতে গিয়েছে, সে সময় একাকী পিওত্র কিরিলীচ, রাত্তিরেও তাঁর ভালো ঘুম হত না, বুঝতে পারতেন না একা একা নিজেকে নিয়ে কী করবেন। একলা অসহ্য হয়ে পড়লে শোবার ঘর আর অন্যান্য সব ঘরে উঁকি মেরে যারা ঘুমোচ্ছে তাদের সাবধানে ডেকে বলতেন:

— আর্কাশা, ঘুমোচ্ছ বুঝি? তানিয়া, সোনা, তুমিও ঘুমোচ্ছ নাকি?

'দোহাই আপনার বাবা, আমাদের আর বিরক্ত করবেন না!' — ক্রুদ্ধ চীৎকার শুনে তিনি তাড়াতাড়ি স্তোক দিয়ে বিড়বিড় করে বলতেন:

— আচ্ছা, আচ্ছা, ঘুমোও, সোনা। আর বিরক্ত করব না...

আবার শুরু হত তাঁর ভ্রমণ, — শুধু আর্দালি মহালের ত্রিসীমানায় যেতেন না তিনি, কারণ ওরা অত্যন্ত বেয়াড়া প্রকৃতির, — আর মিনিট দশেকের মধ্যে শোবার ঘরে ফিরে এসে আগের চেয়ে সাবধানে ঘুমন্তদের ডেকে মন-গড়া একটা কিছু খবর দিতেন:

গাড়ির ঘণ্টা বাজিয়ে গাঁয়ের রাস্তায় কে যেন আসছে, — ‘ফৌজী দল থেকে ছুটি নিয়ে পেতেন্‌কা নয় তো’, — কিম্বা বলতেন শিলামেঘ জমছে ঈশান কোণে।

— কর্তা ঝড়-বৃষ্টিকে কী না ডরাতেন, — নাতালিয়া বলত। — মাথায় ঝুঁটি বাঁধা নেহাৎ বাচ্চা ছিলাম তখন, কিন্তু ও কথাটা ভুলি নি। বাড়িটা ছিল বেজায় অন্ধকার... গোমরামুখো, কী আর করা যায়। আর গরমের এক-একটা দিন — যেন এক-একটা বছর। এন্তার চাকরবাকর... কেবল আর্দালি ছিল পাঁচটা... হ্যাঁ, কী বলছিলাম, দাদাবাবুরা দুপুরের খাবারের পর ঘুমোতে যেতেন, আর আমরা, বাধ্য ঝি-চাকরেরা কী আর করি, শুয়ে পড়তাম তাঁদের মতো। তখন পিওত্র কিরিলীচ আমাদের কাছাকাছি না এলেই ভালো, — বিশেষ করে গের্ভাস্কার কাছে। ‘কী হে আর্দালিরা, ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি?’ জিজ্ঞেস করতেন তিনি। আর তক্ষুণি গের্ভাস্কা তোরঙ্গ থেকে মাথা তুলে বলত: ‘প্যাণ্টে বিছুটি ঢুকিয়ে দেব, তাই চাও কি?’ — ‘বদমাস, কার সঙ্গে কথা বলছিস খেয়াল আছে!’ — ‘ঘুমের ঘোরে বাস্তুভূতের সঙ্গে, হুজুর।’ আর পিওত্র কিরিলীচ খাবার ঘর এবং ড্রয়িং-রুমে ফিরে গিয়ে জানলা দিয়ে বাগানে মুখ বাড়িয়ে দেখতেন:

ঝড় আসছে কিনা? অবশ্য, সেসব দিনে ঝড় হত ঘন ঘন। আর কী প্রচণ্ড ঝড়! দুপুরের খাবারের পর হয়ত একটা ওরিওল পাখি ডাকতে শুরু করল আর বাগানের পেছন থেকে গুঁড়ি মেরে উঠতে লাগল মেঘ... অন্ধকার হয়ে গেল বাড়িটা, ঘাস আর মরা বিছুটির খস্‌খসানি, বারান্দার নীচে লুকোত মাদি টার্কিগুলো বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে... অতিষ্ঠ হবার মতো ব্যাপার, সত্যি। আর কর্তা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্রুশচিহ্ন করে চেয়ারে উঠে আইকনের সামনে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে তাঁর বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সেই পুণ্য তোয়ালেটা দিতেন টাঙিয়ে—তোয়ালেটা দেখলে আঁতকে উঠতাম আমি!—কিম্বা হয়ত জানলা দিয়ে কাঁচি ছুঁড়ে দিতেন। প্রথমেই সেটা করা চাই, মানে কাঁচি ছোড়া: তাহলে ঝড়ে কোনো ক্ষতি হবে না...

সুখদলের বাড়িতে ফরাসীরা থাকার সময় দিনগুলো ছিল বেশী আমোদের — প্রথমে ছিলেন কে এক লুই ইভানভিচ, স্বপ্নালু নীল চোখ, ইয়া বড়ো গোঁফ, নেড়া মাথার টাক ঢেকে এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত চুল আঁটা, পেণ্টুলেনটা অতিশয় লম্বা আর নীচের দিকে

সরু, তারপরে এলেন মাঝবয়সী একজন ভদ্রমহিলা, Mademoiselle সিজি, হামেশা তাঁর কাঁপুনি লেগে থাকত; আর সবকটা ঘর গমগম করে উঠত লুই ইভানভিচের বাজখাই গলায়, আর্কাশাকে তিনি বকতেন: 'চলে যান বলছি, আর কখনো ফিরবেন না যেন!' — হয় পড়ার ঘরে শোনা যেত: 'maître corbeau sur un arbre perché'* — আর তনিয়া দিদিমণি শিখতেন পিয়ানো বাজানো। ফরাসীরা সুখদলে ছিল আট বছর, ছেলেপিলেরা পড়তে শহরে চলে গেল, তখনো তারা রয়ে গেল পিওত্র কিরিলীচকে সঙ্গ দেবার জন্য, বিদায় নিল শুধু তখনি যখন ওরা শহর থেকে তৃতীয় গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে এল। কিন্তু ছুটির শেষে আর্কাশা বা তনিয়াকে আর কোথাও পাঠালেন না পিওত্র কিরিলীচ, তাঁর মতে শুধু পেতেন্‌কা স্কুলে গেলেই যথেষ্ট আর তাই ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া এগোল না, অনাদৃত তারা পড়ে রইল... নাতালিয়া বলত:

— ওদের সবায়ের ছোট ছিলাম আমি। গের্ভাস্কা আর তোমাদের বাবা প্রায় এক বয়সী বলে দুজনের মধ্যে খুব ভাব। কিন্তু লোকে বলে না, — বাঘে ছাগলে

---

* 'গাছে বসা দাঁড়কাক'। (ফরাসী)

এক সঙ্গে ঘর করতে পারে না। আর তাই, ওদের বন্ধুত্ব হল বটে, গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করল যে সে বন্ধুত্ব আমরণ থাকবে, এমনকি ক্রুশের বিনিময় হল পর্যন্ত, কিন্তু শীগগিরই খেল দেখালো গের্ভাস্কা: তোমার বাবাকে আর একটু হলে পুকুরে ডুবিয়ে মেরেছিল আর কি! ক্ষুদে নোংরা একটা ছোঁড়া হলে হবে কি, শয়তানী বুদ্ধিতে একেবারে ওস্তাদ। দাদাবাবুকে একদিন বলল, 'বড়ো হলে আমাকে চাবকাবে?' — 'তা চাবকাব বই-কি।' — 'না, না।' — 'কেন করব না?' — 'এমনি...' আর গের্ভাস্কা শীগগিরই একটা ফন্দী কষল: পুকুরের ওপরে টিলায় একটা পিপে ছিল, আর্কাদি পেত্রভিচকে বলল পিপের মধ্যে ঢুকে গড়িয়ে টিলা থেকে নামতে। 'প্রথম সুযোগ তোমার দাদাবাবু, তারপর আমি...' দাদাবাবুকে যা বলা হল তাই করলেন: পিপের মধ্যে ঢুকে একটা ধাক্কা, তারপর টিলা থেকে গড়গড়িয়ে নেমে ঝপাং করে সটান জলে... হায় মা! শুধু ধুলোর ঘূর্ণি, আর কিছু নজরে পড়ে না!.. ভাগ্যিস কয়েকটা রাখাল কাছাকাছি এসে পড়েছিল...

ফরাসীরা থাকার সময়ে বাড়ির চেহারাটা ছিল হব্যভব্য। ঠাকুমা যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন সুখদলে

ছিল শাসন করার মতো লোক, নিয়মকানুন আর বাধ্যতা, পোষাকী ও থাকার ঘর, ছুটির দিন, কাজের সময়। এ সবের একটা ঠাট ছিল ফরাসীরা থাকার সময়েও। কিন্তু ওরা চলে যাবার পর বাড়িতে মনিব বলতে কেউ রইল না। ছেলেমেয়েরা যতদিন ছোট ছিল ততদিন বাইরের দিক দিয়ে পিওত্র কিরিলীচ বাড়ির কর্তা। কিন্তু কী বা তাঁর করার ছিল? কে কাকে শাসন করবে: তিনি চাকরদের চালাতেন না চাকরেরা চালাত তাঁকে? পিয়ানোটা বন্ধ হয়ে গেল, ওক কাঠের টেবিলের ঢাকনা গেল উধাও হয়ে, — ঢাকনা বিনাই ওরা খাওয়া-দাওয়া সারত, যখন-তখন বাড়িতে ঢোকার জায়গা জুড়ে সব সময় এক পাল দৌড়বাজ কুকুর। বাড়ি দেখাশোনা করার কেউ রইল না, — ছাই-রঙা কাঠের দেয়াল, মেঝে আর ছাদ, ছাই-রঙা ভারি দরজা আর দরজার কাঠামো, খাবার ঘরের একটা দিক ভরে দেওয়া সন্তের ছবি-আঁকা সুজ্‌দালের পুরনো আইকনগুলো কিছু দিনের মধ্যেই একেবারে কালো হয়ে গেল। রাত্রিতে বাড়ির চেহারাটা ভয়াবহ, — বিশেষ করে ঝড়ের রাতে যখন ঝড়বৃষ্টিতে বাগানটা উঠত গর্জিয়ে, কোণে আইকনের সন্তদের মুখে পড়ত বিদ্যুৎ ঝলক, গাছের ওপর কম্পমান আকাশ ফেটে

পড়ে দেখা যেত গোলাপি-সোনালি আভা আর অন্ধকারে ভীষণ শব্দে হত অশনিসম্পাত। দিনের বেলায় — বাড়ির চেহারাটা ঘুম জড়ানো, শূন্য, বিরস। বছরের পর বছর পিওত্র কিরিলীচ দুর্বল থেকে দুর্বলতর, অকিঞ্চিৎকর থেকে আরো অকিঞ্চিৎকর হয়ে যেতে লাগলেন, বাড়ি চালাত বুড়ী দারিয়া উস্তিনভ্না, ঠাকুর্দার স্তন্যদায়ী ধাত্রী। তার ক্ষমতা ছিল প্রায় ঠাকুর্দার সমান, নায়েব দেমিয়ান গেরস্থালীর কাজে হাত দিত না: তার মাথায় শুধু খামার পরিচালনার চিন্তা, মাঝে মাঝে ধীর হাসি হেসে সে বলত: 'মনিবদের কোনো ক্ষতি আমি কি কখনো করতে পারি...' আমার বাবার বয়স তখন কম, সুখদল নিয়ে মাথা ব্যথা তাঁর ছিল না: তিনি পাগল ছিলেন শিকার আর বালালাইকা নিয়ে, আর গের্ভাস্কাকে নিয়ে. নামে সে আর্দালি হলেও তার সঙ্গে সারা দিন কাটাতেন মেশ্চরার কোন এক জলায় শিকারে, বা গাড়ি-ঘরে বালালাইকা বা বাঁশির নতুন নানা কসরৎ শিখতেন।

— ব্যাপারটা আমাদের গা সওয়া হয়ে গেল, — নাতালিয়া বলত, — উনি বাড়িতে আসতেন শুধু শুতে। তাও যদি না আসতেন, — তার মানে হয় গাঁয়ে আছেন নয় গাড়ি-ঘরে, নয়ত শিকারে বেরিয়েছেন:

শীতকালে—খরগোশ, হেমন্তে—শেয়াল, গ্রীষ্মকালে—ভারুই, হাঁস বা বাসটার্ড পাখি; তড়তড়ে দ্রশকিতে চেপে কাঁধে বন্দুক ফেলে শিস দিয়ে দিয়ানকাকে ডেকে চলে যেতেন: সেরিওদ্‌নায়া মিলে কোনো দিন, পরের দিন মেশ্চরার জলায়, তার পরের দিন স্তেপে। সঙ্গে সারাক্ষণ গের্ভাস্কা। সে ছিল দলের পাণ্ডা কিন্তু এমন ভাব দেখাত যেন কর্তার ইচ্ছেয় সব তাকে করতে হচ্ছে। আর্কাদি পেত্রভিচ তাঁর এই শত্তুরটিকে সত্যি সত্যি ভাইয়ের মতো ভালোবাসতেন, কিন্তু যত দিন যেতে লাগল তত তাঁকে নিয়ে বিচ্ছিরি সব কাণ্ড করতে শুরু করল গের্ভাস্কা। দাদাবাবু হয়ত বললেন: 'এই গের্ভাস্কা, বালালাইকা বাজানো যাক এবার, দোহাই তোর, আমাকে সেই গানটা শিখিয়ে দে '**গাছের আড়ালে রক্ত সূর্য গেল ডুবে** .' আর তাঁর দিকে তাকিয়ে নাক দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে জাঁকের হাসি হেসে গের্ভাস্কা উত্তর দিত: 'তার আগে আমার হাতে চুমো খেতে হবে।' মড়ার মতো ফ্যাকাসে হয়ে গিয়ে আর্কাদি পেত্রভিচ লাফিয়ে উঠে প্রাণপণে তার গালে কষতেন এক চড়, কিন্তু সে কেবল মাথা ঝাঁকিয়ে মুখটা আরো কালি করে গুণ্ডার মতো ভ্রূকুটি করত। 'ওঠ্ বলছি, বদমাস!' দৌড়বাজ কুকুরের মতো গা টান করে,

ভেলভেটিনের পেণ্টুলেন আলগা ঝুলিয়ে ও দাঁড়িয়ে উঠত... মুখে কোনো কথা নেই। 'ক্ষমা চা বলছি!' — 'ঘাট হয়েছে, হুজুর।' কিন্তু রাগে দাদাবাবুর দম প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়ে — কী বলবেন ভেবে পেতেন না। চেঁচিয়ে উঠতেন — 'ঠিক বটে, "হুজুর"! আমি চাই তোকে নিজের সমান করে দেখতে, বদমাস কোথাকার, মাঝে মাঝে মনে হয়: তোর জন্য নিজের প্রাণ পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারি... আর তুই? ইচ্ছে করে আমাকে চটিয়ে দেবার ফন্দি শুধু, তাই না?'

— মজার ব্যাপার! — বলত নাতালিয়া। — দাদাবাবু আর ঠাকুর্দাকে জ্বালাতন করত গের্ভাস্কা, আর তনিয়া দিদিমণি আমাকে যন্ত্রণা দিতেন। তবু দাদাবাবু আর সত্যি বলতে ঠাকুর্দাও — গের্ভাস্কাকে নিয়ে পাগল ছিলেন আর আমি — তনিয়া দিদিমণিকে নিয়ে... সশকি থেকে ফিরে, আমার পাতকের পর যখন কিছুটা হুঁশ হল তখন থেকে...

৫

ঠাকুর্দার মৃত্যু, গের্ভাস্কার পালানো, পিওত্র পেত্রভিচের বিয়ে আর যীশুর বধূ হিসেবে অপ্রকৃতিস্থ তনিয়া পিসী নিজেকে উৎসর্গ না করা আর সশকি

থেকে নাতালিয়ার ফিরে না আসা পর্যন্ত লোকে কিন্তু চাবুক হাতে খেতে বসত না। তনিয়া পিসীর মাথা খারাপ হয়ে যাওয়া আর নাতালিয়ার নির্বাসন — দুয়েরি মূলে ছিল প্রেম।

নবীন কর্তাদের যুগ শুরু হয়েছিল, কেটে গিয়েছিল ঠাকুর্দার আমলের বিরস, বদ্ধ জীবনযাপন। সবাইকে অবাক করে দিয়ে সৈন্যবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করে সুখদলে প্রত্যাবর্তন করেন পিওত্র পেত্রভিচ। তাঁর আগমনের ফল নাতালিয়া ও তনিয়া পিসী দুজনেরই পক্ষে বড়ো ভয়াবহ হয়।

প্রেমে পড়ল দুজনেই। কেমন করে ঘটল সেটা দুজনেই জানত না।

প্রথম প্রথম শুধু ওদের মনে হয়েছিল যে 'জীবন আগের চেয়ে আনন্দের হয়ে দাঁড়িয়েছে'।

গোড়ার দিকে বাবুজনোচিত চটক আর আরামের নতুন ধারা একটা সুখদলে প্রবর্তন করলেন পিওত্র পেত্রভিচ। সঙ্গে এলেন ভৈৎকেভিচ আর এল একটি বাবুর্চি, দাড়িগোঁফহীন চাঁচাছোলা মুখ নেশাখোর লোকটি জেলি করার ছাতাধরা সবুজ ছাঁচ আর ভোঁতা সাদাসিধে ছুরি-কাঁটার দিকে তাকাত তাচ্ছিল্যভরে ভুরু কুঁচকে। বন্ধুর কাছে নিজেকে অতিথিবৎসল, দিলদরাজ

ও বড়োলোক বলে জাহির করার ইচ্ছে পিওত্র পেত্রভিচের, আর সেটা তিনি করতেন — আনাড়িভাবে, ছেলেমানুষের মতো। কিন্তু সত্যি তো তিনি তখনো নেহাৎ কমবয়সী, দেখতে নরম আর সুন্দর হলেও স্বভাবদোষে কর্কশ ও নিষ্ঠুর, চেহারায় খুব আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন ছোকরা বটে, কিন্তু অতি সহজেই তিনি ভেবাচেকা খেয়ে প্রায় কেঁদে ফেলতেন, আর যে তাঁকে ভেবাচেকা খাইয়ে দিত তার বিরুদ্ধে বহুদিন আক্রোশ পুষে রাখতেন অন্তরে।

বাড়ি ফিরে এসে খেতে বসে প্রথম দিনই তিনি বললেন:

— আমার যেন মনে হচ্ছে আর্কাদি, মনে হচ্ছে আমাদের মাদেইরা মদ ছিল কিছু, মোটেই খারাপ ছিল না সেটা।

ঠাকুর্দা লাল হয়ে উঠে কী একটা বলতে গিয়ে সাহসে কুলোল না শেষ পর্যন্ত, অস্থিরভাবে কোটের কলারটায় টান দিয়ে চুপ করে গেলেন। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল আর্কাদি পেত্রভিচ:

— কোন মাদেইরা?

গের্ভাস্কা ঢেঁটা দৃষ্টিতে পিওত্র পেত্রভিচের দিকে তাকিয়ে অবজ্ঞার হাসি একটা হাসল।

অবজ্ঞার ভাব চাপার কোনো চেষ্টা না করে বলল আর্কাদি পেত্রভিচকে:

— আপনি ভুলে গেছেন, হুজুর। মাদেইরা কলসী কলসী ছিল আমাদের সত্যি, কিন্তু আমরা চাকরবাকরেরা চুরি করে সাফ করে দিয়েছি। সরাবটা বাবুদের যোগ্য, কিন্তু আমরা ক্‌ভাসের বদলে ওটাকে গিলে গিলে খতম করেছি।

রাগে মুখ কালো করে হাঁকলেন পিওত্র পেত্রভিচ:

— কী বলছিস! চোপরাও!

উচ্ছ্বসিত হয়ে সায় দিলেন ঠাকুর্দা:

— ঠিক, ঠিক, পেতেন্‌কা, এই তো চাই! বাহবা! — সরু গলায় সানন্দে চেঁচিয়ে প্রায় কেঁদে ফেলার জোগাড়। — ও আমায় কিরকম অপমান করে ভাবতে পারবি না! একবার নয়, বারবার ভেবেছি: বেটার কাছে চুপি চুপি গিয়ে হামানদিস্তে দিয়ে মাথাটা ওর গুঁড়ো করে দিই... সত্যি বলছি, গুঁড়ো করে দেব! পাঁজরায় বসিয়ে দেব ছুরি!

জবাব দিতে এক মুহূর্ত দেরী করল না গের্ভাস্কা:

— ওটা করলে বেজায় সাজা পেতে হয় শুনেছি, হুজুর, — ভুরু কুঁচকে বলল সে। — আমার কেবলি মনে হয় যে কর্তার স্বর্গলাভের বয়স হয়েছে!

পিওত্র পেত্রভিচ বলতেন, এই অপ্রত্যাশিত বেয়াড়া জবাব শোনার পর তিনি নিজেকে সামলান অতিথির খাতিরে শুধু। গের্ভাস্কাকে শুধু বললেন: 'বেরিয়ে যাও এখান থেকে এক্ষুণি!' পরে সত্যি চেঁচানোর জন্য লজ্জিত বোধ করে তাড়াতাড়ি ভৈংকেভিচের কাছে মাপ চেয়ে, মৃদু হেসে তার দিকে তাঁর সেই সুন্দর চোখে তাকালেন যার কথা তাঁর পরিচিতরা কখনো ভুলতে পারত না।

নাতালিয়াও অনেকদিন ভুলতে পারে নি সে চোখজোড়ার কথা।

নাতালিয়ার সুখ টেঁকে অতি অল্প দিন — আর কে জানত সে সুখের পরিণামে যেতে হবে সশকিতে, যেখানে যাওয়াটা তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা?

সশকি এখনো টিকে আছে, যদিও কয়েক বছর ধরে তার মালিক তাম্‌বভের একজন ব্যবসাদার। বন্ধ্যা ভূমিতে কাঠের লম্বা কুটির একটা; শস্য ভাণ্ডার, বালতি নামাবার লম্বা খুঁটিসুদ্ধ কূয়ো, আর ফুটির ক্ষেত ঘেরা গোলাঘর। সবকিছু অবশ্য ঠাকুর্দার আমলের মতো, সুখদল ও সশকির মধ্যিখানের নগরের চেহারাও বদলায় নি বেশী। নিজের অপরাধে নাতালিয়া নিজেই অত্যন্ত বিস্মিত হয়, পিওত্র পেত্রভিচের রূপোর

ফ্রেমে বসানো ভাঁজ করা ছোট্ট আয়নাটা চুরি করেছিল ও।

আয়নাটা দেখামাত্র — তার সৌন্দর্যে এত মুগ্ধ হয়ে যায় সে, — অবশ্য পিওত্র পেত্রভিচের যাবতীয় জিনিস সম্বন্ধে তার মনোভাব ছিল এরকম, — যে চুরি করার লোভ সামলাতে পারে নি। আয়নাটা নেই লোকে টের না পাওয়া পর্যন্ত কয়েকটা দিন তার কাটে অপরাধের বোধে, নিজের ভয়াবহ গোপন কথা ও ধনের চাপে মন্ত্রমুগ্ধের মতো, ছোট লাল ফুলের সেই কাহিনীর মেয়েটির মতো অবস্থা। ঘুমোতে যাবার আগে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করত রাত যেন কেটে যায় শীগগির, সকাল সকাল ভোর হয়: তখন উৎসবের ছোঁয়াচ লেগেছে নতুন অপরূপ জিনিসে জীবন্ত হয়ে ওঠা বাড়িতে. সে জিনিস এনেছেন রূপবান মনিব, ফিটফাট ছোকরা, চুলে সুগন্ধি মলম, উঁচু লাল কলার দেওয়া টিউনিক, মুখ তামাটে হলেও মেয়েদের মতো মধুর; এমনকি যে করিডরে তোরঙ্গের ওপর ঘুমোত নাতালিয়া, সেখানেও উৎসবের আবহাওয়া, ভোরে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে মনে হত পৃথিবীতে কত না আনন্দ, দরজার বাইরে সাফ করার জন্য রাখা টপবুটজোড়া কী সুন্দর, রাজপুত্রের পায়ের যুগ্যি। কিন্তু সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আর

উৎসবমুখর জায়গা হল বাগানটা পেরিয়ে, পরিত্যক্ত গোসল-খানায়, যেখানে লুকোনো রয়েছে রুপোর ভারি ফ্রেমে ভাঁজ করা সেই আয়না, সেখানে বাগান পেরিয়ে শিশিরে ভেজা ঝোপঝাড় হয়ে চোরের মতো তাড়াতাড়ি যখন যেত নাতালিয়া তখনো কেউ বিছানা ছেড়ে ওঠে নি; গোপন ধন নিয়ে তার কী আহ্লাদ, দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে সকালের উত্তপ্ত আলোয় সেটা খুলে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত মাথা ঘুরতে থাকত, তারপর অত্যন্ত সাবধানে সেটাকে লুকিয়ে রেখে আবার তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা তাঁর সেবায় যাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহস পর্যন্ত হয় না, যাঁর জন্য সে আয়নায় নিজের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত পাগল করা আশায় যে তাকে তাঁর মনে ধরবে হয়ত।

কিন্তু ছোট্ট লাল ফুলটির কাহিনী ফুরোতে দেরী হল না, ফুরোল বড়ো তাড়াতাড়ি সত্যি। পরিণামে এত অপমান আর লজ্জা যে ভাষায় বলা যায় না, অন্তত তাই মনে হয়েছিল নাতালিয়ার... পরিণামে পিওত্র পেত্রোভিচ স্বয়ং হুকুম দিলেন মাথা মুড়িয়ে দেওয়া হোক ওর যাতে চেহারাটা কুৎসিত দেখায়। আর এতদিন কিনা ওর চলেছিল নিজেকে সাজানো, ছোট্ট আয়নার

সামনে দাঁড়িয়ে ভুরুজোড়া কালো করা, দুজনের মধ্যে একটি মধুর গোপন অন্তরঙ্গতার কল্পনা বিলাস। চুরি ধরা পড়ল তাঁরই কাছে, তিনি ধরে নিলেন এটা নেহাৎ ছিঁচকে চুরি, বোকা চাকরানীর দুষ্কর্ম একটা — তাই মোটা কাপড় গায়ে, কেঁদে কেঁদে ফোলা চোখে মেয়েটি উঠল সারাটানা গাড়িতে, সমস্ত চাকরবাকরের চোখের সামনে; কলঙ্কিনীর যা কিছু প্রিয় তা থেকে হঠাৎ ছিনিয়ে পাঠানো হল সুদূর স্তেপের একটি অদ্ভুত ভয়াবহ ছোট খামার বাড়িতে। তার জানতে বাকি ছিল না: সেখানে তাকে তদারক করতে হবে মুরগী, টার্কি আর ফুটির; ঝাঁঝা রোদে পুড়ে যাবে দেহ, তার কথা ভাববে না দুনিয়ার কেউ; সেখানে স্তেপেতে এক একটি বছরের মতো যখন দিকচক্রবাল ঢাকা পড়বে চিংকচিংকে কুজ্ঝটিকায়, সবকিছু এত চুপচাপ, এত গুমোট যে সারা দিন মড়ার মতন পড়ে পড়ে ঘুমোনো যায়, কিন্তু না, শুকিয়ে ওঠা মটরের আওয়াজে কান না দিলে চলবে না, শুনতে হবে তপ্ত বালুতে মোরগের ব্যস্তসমস্ত সাড়াশব্দ, টার্কিগুলোর শান্ত বিষণ্ন ডাক, একটা বাজপাখির ছমছমে ছায়া হঠাৎ দেখে লাফিয়ে উঠে সরু গলায় টেনে টেনে হাঁকতে হবে: ‘হু-উ-স!..’ আর সেই ভয়ঙ্করী ইউক্রেনীয় বুড়ীটা, যার হাতে নির্ভর

করছে নাতালিয়ার জীবন মরণ, সেই বুড়ীটা যে খামার বাড়িতে অধৈর্য হয়ে নিশ্চয় অপেক্ষা করছে তার শিকারের! ফাঁসিকাঠে যাদের নিয়ে যাওয়া হয় তাদের চেয়ে একটি মাত্র সুবিধে ছিল নাতালিয়ার: ইচ্ছে করলে গলায় দড়ি দিতে পারে সে। নির্বাসনের পথে, তার মতে চিরনির্বাসনের পথে, যেতে যেতে শুধু এইটুকু তার সান্ত্বনা।

জেলার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে এই যাত্রায় দেখার মতো অনেক কিছু ছিল। কিন্তু দেখার মতো অবস্থা তার নেই। শুধু মনে হয়েছিল, অনুভব করেছিল বরং: তার জীবন শেষ, তার অপরাধ ও কলঙ্ক এত বিপুল যে পুরনো জীবনে ফেরার এতটুকু আশা নেই! তবু তো এখনো সঙ্গে আছে নিজের লোক, ইয়েভ্‌সেই বদুলিয়া, কিন্তু সেই ইউক্রেনীয় বুড়ীর হাতে তাকে সমর্পণ করার পর কী ঘটবে? সে রাতটা ঘুমিয়ে ইয়েভ্‌সেই বদুলিয়া তো বিদায় নেবে, অপরিচিত জায়গায় আমরণ থাকতে হবে তাকে। কেঁদে কেঁদে আর যখন পারে না, তখন ক্ষিধে পেতে লাগল। অবাক হয়ে দেখল যে ইয়েভ্‌সেই বদুলিয়ার কাছে সেটা অস্বাভাবিক মনে হল না, দুজনে খাবার সময় এমনভাবে কথা বলতে লাগল যেন কিছু ঘটে নি। তারপর ঘুমিয়ে

পড়ল নাতালিয়া — শহরে না পেঁাছনো পর্যন্ত সে ঘুম ভাঙল না। আর শহরটা দেখে মনে হল বিরস, ধূলিধূসর, যন্ত্রণাকর, সেখানে কী যেন একটা আছে যেটা ঝাপসা ভয়াবহ, মন ব্যাকুল করে দেয় সেটা, যে স্বপ্ন কথায় বলা যায় না তার মতো। সে দিনটার কথা যা মনে আছে তা শুধু এই. স্তেপে দিনটা অত্যন্ত গরম, গ্রীষ্মের দিনের চেয়ে অশেষ আর বড়ো সড়কের চেয়ে দীর্ঘতর দুনিয়াতে আর কিছু নেই। মনে আছে শহরের কয়েকটা রাস্তা পাথরের, তাতে গাড়ির অদ্ভুত ঘড়ঘড়ে আওয়াজ, মনে আছে দূর থেকে আসা শহরের লোহার ছাদের গন্ধ, আর বাজারের চকে, যেখানে তারা জিরিয়ে নিয়ে ঘোড়াটাকে খাইয়েছিল তখনকার মতো ফাঁকা 'সস্তাখানা' চালাগুলোর কাছে, — ধুলো আর আলকাতরা আর পচা খড়ের গন্ধ, চাষীরা যেখানে থামে কিছুক্ষণ সেখানে গোবরে সর্বদা খড়ের আঁটি গুঁজে রেখে যায়। ঘোড়া খুলে ইয়েভ্‌সেই তাকে বাঁধল গাড়ির সঙ্গে খাওয়াবার জন্য; গরম টুপিটা মাথার পেছনে ঠেলে, জামার হাতায় ঘর্মাক্ত কপাল মুছে চলল সস্তাখানার দিকে, রোদে পুড়ে গিয়েছে একেবারে সে। নাতালিয়াকে জোর হুকুম দিয়ে গেল সবকিছুর ওপর 'নজর রাখতে', আর, কিছু ঘটলে যেন গলা ফাটিয়ে

চেঁচায়। নাতালিয়া বসে রইল নিথর হয়ে, বাড়িঘর দোরের অনেক ওদিকে নতুন তৈরী গির্জার বড়ো রুপোলি তারার মতো ঝকঝকে গম্বুজ থেকে চোখ আর ফেরাল না সে, — এভাবে বসে রইল ইয়েভ্‌সেই ফেরা না পর্যন্ত, ফুর্তির মেজাজে ফিরল সে, কী একটা চিবোতে চিবোতে, বগলে সাদা একটা পাঁউরুটি, ঘোড়াটাকে নিয়ে আবার গাড়িতে জুততে লাগল।

— একটুখানি দেরী হয়ে গেছে, রাজকন্যে! — খুশিতে বিড়বিড় করে সে বলল, সম্বোধনটা হয় নাতালিয়া নয় ঘোড়ার উদ্দেশ্যে। — যাক গে, সে জন্য আমাদের লটকে দেবে না! অত তাড়া কিসের... ফিরতি পথেও তোকে আর হিমসিম খাইয়ে দেব না, — মুনিবের ঘোড়ার দাম আমার কাছে অনেক বেশী তোর নোংরা মুখের চেয়ে, — শেষের উল্লেখটা দেমিয়ানের উদ্দেশে। — আমাকে খালি মুখের চোপা করা: 'খবরদার! যদি এখ্‌খুনি হুঁশো ভাব না দেখাস তো মজাটা টের পাওয়াব তোকে...' তবে রে! — ভাবলাম আমি... অপমানে রাগে গা'টা ঘুলিয়ে উঠল। কর্তারা কখনো আমার এত হেনস্তা করেন নি... আর তোর এত চাড় কিসের... বেটা হামদোমুখো... বেটা বলে কিনা

'হ্ঁশোভাব দেখা!' — হ্ঁশোভাব দেখাব কেন রে? আমি তোর চেয়ে হাঁদা নই বোধহয়। ইচ্ছে যদি করে — আর ফিরবই না তোদের কাছে: ছ্ঁড়ীটাকে পেঁাছিয়ে দিয়ে সোজা রাস্তা ধরব, আর কখনো আমার টিকিটি পর্যন্ত দেখবি না... আর ছ্ঁড়ীটাও আমাকে তাজ্জব করে দিয়েছে: কী নিয়ে বোকাটার মাথা ব্যথা? প্রলয়কাল এসে পড়েছে না কি? ব্যাপারী আর ব্ড়োগ্লোর আসা যাওয়ার অভাব তো হবে না খামারে — ম্খ ফুটে বললেই হল: প্রনো রস্তভ ছাড়িয়ে অনেক দ্র সরে পড়তে সময়ও লাগবে না... তখন ধর্ক দিকি ওকে!

আর নাতালিয়ার ম্ড়নো মাথায় 'গলায় দড়ি দেবার' চিন্তার বদলে এল — পালাবার কথা। গাড়িটা ক্যাঁচকোঁচ করে দ্লে উঠল। চুপ মেরে গিয়ে ইয়েভ্সেই ঘোড়াটাকে নিয়ে গেল চকের মাঝখানের কূয়োটায়। যেদিক থেকে তারা এসেছে সেদিকটায় মঠের বড়ো বাগানের পেছনে স্র্য অস্ত যাচ্ছে. মঠের উল্টোদিকে রাস্তার ওপারে হলদে জেলখানার জানলাগ্লো স্র্যাস্তের আলোয় সোনালি। জেলখানা দেখে নিমেষের জন্য পালাবার কথাটা আরো বেশী করে মনে হল। পালিয়ে থেকে বাঁচা তো যায়। অবশ্য লোকে বলে

বুড়োগুলো চুরি করা ছেলেমেয়েদের চোখ টগবগে গরম দুধ দিয়ে পুড়িয়ে তাদের দিয়ে ভিক্ষে করায়, আর ব্যাপারীরা ওদের খপ করে সরিয়ে সমুদ্রের কাছে নিয়ে গিয়ে বেচে দেয় নোগাইদের কাছে... মাঝে মাঝে আবার মুনিবেরা পালিয়ে যাওয়া বান্দা-বাঁদীদের ধরে এনে শেকলে বেঁধে জেলে কয়েদ করে রাখে... কিন্তু মনে হয় জেলের সিপাইগুলো মানুষ, পশু নয়, গের্ভাস্কা তো তাই বলত!

কিন্তু জেলখানার জানলায় প্রতিফলিত আলো মিলিয়ে যেতে নাতালিয়ার সমস্ত চিন্তা গোলমেলে হয়ে গেল, — না, পালিয়ে যাওয়াটা আরো ভয়ংকর, গলায় দড়ি দেওয়ার চেয়ে ভয়ংকর! আর ইয়েভ্‌সেইও শান্ত হয়ে চুপ করে রয়েছে।

— আমাদের দেরী হয়ে গেছে রে, — অস্বস্তিতে বলে সে লাফিয়ে উঠল গাড়ির ধারে।

বড়ো রাস্তায় পড়ে আবার গাড়িটার ঝাঁকুনি আর দোলানি, পাথরের ওপর মুখর শব্দ... ভাবা ততটা নয় যতটা অনুভব করল নাতালিয়া: 'আহা, গাড়িটা আবার ফিরে গেলে কত ভালো না হত — সুখদলে চকিতে গিয়ে যদি কর্তার পায়ে পড়তে পারতাম!' কিন্তু ইয়েভ্‌সেই তো চাবকিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়েছে।

বাড়িঘরদোরের পেছনের সেই তারাটা আর চোখে পড়ে না। সামনে পড়ে আছে শুধু সাদা রাস্তা, সাদা ফুটপাথ আর সাদা বাড়িগুলো — আর সবকিছু শেষ হয়েছে প্রকাণ্ড সাদা গির্জাটায়, ধাতুর তৈরী গম্বুজটা নতুন আর সাদা, ওপরে আকাশ বিরস, নীলচে সাদা... আর ওদিকে, বাড়িতে ইতিমধ্যে শিশির পড়া শুরু হয়েছে, বাগান থেকে উঠছে ঠাণ্ডা সৌরভ, রান্নাঘর থেকে গরম একটা গন্ধ; শস্যের সমুদ্র পেরিয়ে অনেক দূরে, বাগানের প্রান্তে রুপোলি পপলারগুলোর ওধারে, সেই পূত পুরাতন স্নানের ঘর ছাড়িয়ে সূর্যাস্তের আভা মিলিয়ে যাচ্ছে. এদিকে ড্রয়িং-রুমে বারান্দার দরজাগুলো খোলা, কোণে লাল-বেগুনি আলো একাকার হয়ে যাচ্ছে ছায়ার সঙ্গে, আর দেখতে ঠাকুর্দা ও পিওত্র পেত্রভিচ দুজনেরই মতো কালো-চোখ, শ্যাম-পীত রঙের জমিদার-কন্যা সূর্যাস্তের দিকে পিছন ফিরে বসে আছেন স্বরলিপিতে চোখ রেখে, কমলা-রঙা ঢিলে পাতলা সিল্কের গাউনের হাতা বারবার টেনে নামিয়ে পিয়ানোর হলদে চাবিতে আঘাত দিয়ে ঘর ভরিয়ে দিচ্ছেন ওগিনস্কির পলোনেজের গম্ভীর সুরেলা মধুর হতাশার কলিতে, দেখে মনে হয় তাঁর খেয়াল নেই যে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে, বাঁ হাত কোমরে রেখে বলিষ্ঠদেহ, ময়লা রঙের

অফিসারটি একাগ্র বিষণ্ণ চিত্তে তাকিয়ে আছেন তাঁর ক্ষিপ্র হাতের দিকে...

'ওঁর ভালোবাসার জন আছে, আমারও আছে নিজের মানুষ,' — এসব সন্ধ্যায় দুরুদুরু হৃদয়ে ভাবার চেয়ে অনুভব বেশী করত নাতালিয়া, আর ঠাণ্ডা শিশিরসিক্ত বাগানে, বিছুটি ও স্যাঁতসেঁতে উগ্রগন্ধ কাঁটাঝোপের মাঝখানে দৌড়িয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত অসম্ভবের প্রত্যাশায়,—কখন ছোটবাবু বারান্দার সিঁড়ি হয়ে নেমে বাগানে আসবেন, তাকে দেখে হঠাৎ ঘুরে পা চালিয়ে তাড়াতাড়ি কাছে আসবেন — ভয়ে আর আনন্দে অসাড় তার মুখ থেকে এতটুকু শব্দ বেরোবে না...

কিন্তু ঘড়ঘড়িয়ে গাড়িটা চলেছে তো চলেছে। চারিধারে শহর শুধু, গরম আর দুর্গন্ধে ভরা, সেই শহর এককালে যাকে রূপকথার দেশ বলে সে কল্পনা করত। ব্যথিত বিস্ময়ে নাতালিয়া তাকিয়ে রইল ছিমছাম পোষাক পরা লোকগুলোর দিকে, ঘরদোরের সামনে ফুটপাথে তারা আসছে আর যাচ্ছে, দাঁড়িয়ে আছে ফটকে আর দোকানঘরের হাট করা দরজায়... 'ইয়েভ্সেই এ রাস্তাটা ধরল কেন,' ভাবল সে, 'গাড়ি খটখটিয়ে এ পথে যাবার সাহস তার এল কোথা থেকে?'

এবার তারা পেরিয়ে গেল গির্জাটা, উঁচু নীচু ধুলোভরা রাস্তা ধরে কামারশালা আর ক্ষুদে ব্যবসায়ীদের ভেঙে-পড়া কুঁড়ে পেরিয়ে এসে পড়ল অগভীর নদীতে... আবার কবোষ্ণ জল, পলি মাটি আর মাঠঘাটের সান্ধ্য স্নিগ্ধতার পরিচিত গন্ধ। অনেক দূরে সামনের টিলায় ক্রসিঙের পাশের নিঃসঙ্গ ছোট বাড়িটাতে সাঁঝের প্রথম বাতির শিখা... তারপর খোলা জায়গায় এসে পুল পার হয়ে ক্রসিঙের কাছে পোঁছে — দেখল ঝাপসা-সাদা একটি পাথরের ধুধু রাস্তা তাকিয়ে আছে তাদের চোখে, সীমাহীন দিগন্তে, স্তেপের ঠাণ্ডা রাত্রির নীলে অদৃশ্য হয়ে গেছে রাস্তাটা। ঢিমে তালে চলে ক্রসিঙ পার হয়ে ঘোড়াটার গতি হল অত্যন্ত মন্থর, পায়ে হাঁটার মতো। আবার শোনা যায় কতো স্তব্ধ রাত্রি, পৃথিবী আর আকাশ, — শুধু দূরে কোথায় যেন একটা ছোট্ট ঘণ্টার বিষণ্ণ ধ্বনি। ক্রমশ জোরালো আর সুরেলা হল শব্দটা — অবশেষে একটা ত্রয়কার তালে তালে চলার ভারি আওয়াজ, রাস্তায় খুরের সমান খটখট আর গাড়ির চাকার ঘড়ঘড়ানি ছাপিয়ে শোনা গেল সেটা... ত্রয়কার সইস হল মুক্ত একটি ছোকরা, গাড়িতে বসে আছেন একজন অফিসার, হুড দেওয়া ফৌজী ওভারকোটের কলারে চিবুক গুঁজে। ওরা পাশাপাশি

এসে পড়াতে মুহূর্তের জন্য মাথা তুললেন তিনি — আর হঠাৎ নাতালিয়ার চোখে পড়ল লাল কলার, কালো গোঁফ, বালতির মতো দেখতে শিরস্ত্রাণের নীচ থেকে তার দিকে তাকিয়ে থাকা তরুণ চোখের ঝিলিক... চীৎকার করে উঠল সে, মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল, জ্ঞান হারাল...

ক্ষেপার মতো সে ভেবেছিল মানুষটি হলেন পিওত্র পেত্রভিচ, আর তার সেই অস্থির দাসীহৃদয়ের যন্ত্রণা ও মমতায় হঠাৎ নাতালিয়ার উপলব্ধি হল কী সে হারিয়েছে: হারিয়েছে তাঁর সান্নিধ্য... বাইরে গেলে যে বালতিটা সঙ্গে থাকে সেটা থেকে আঁজলা আঁজলা জল তাড়াতাড়ি তার মুড়োনো, ঝুলে পড়া মাথায় ছেটাল ইয়েভ্‌সেই।

বমির ধমকে জ্ঞান ফিরে এল নাতালিয়ার — সঙ্গে সঙ্গে মুখ বাড়িয়ে দিল গাড়ি থেকে। তার ঠাণ্ডা কনকনে কপালে তাড়াতাড়ি হাত রাখল ইয়েভ্‌সেই...

একটু ভালো বোধ করে তারপর নাতালিয়া কম্পিত দেহে চিৎ হয়ে শুয়ে তাকিয়ে রইল তারার দিকে, ব্লাউজের গলা ভিজে গেছে। আতঙ্কে মূক ইয়েভ্‌সেই, তার ধারণা ও ঘুমিয়ে পড়েছে, — শুধু মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে, — তাড়াতাড়ি, আরো তাড়াতাড়ি

ঘোড়া ছোটাল সে। গাড়ি ছুটে চলল হেলেদুলে। আর মেয়েটির মনে হল দেহ বলে তার কিছু নেই — আছে শুধু প্রাণ। আর সে প্রাণে ঠিক যেন 'স্বর্গসুখ'...

রূপকথার বাগানে ফোটা ছোট্ট লাল ফুলের মতো তার ভালোবাসা। কিন্তু সেই প্রেম সে নিয়ে গেল স্তেপে, সুখদলের দূরত্বের চেয়েও ভয়ংকর দূরত্বে, যাতে সেখানে নিঃসঙ্গ বিজনে তার মধুর তীব্র প্রথম বেদনা কাটিয়ে উঠতে পারে, তারপর নিজের সুখদলীয় হৃদয়ের গভীরে চাপা দিয়ে রাখতে পারে দীর্ঘ দিন, চিরকাল, মৃত্যু না আসা পর্যন্ত।

৬

সুখদলে প্রেমের গতি বিচিত্র। তেমনি বিচিত্র ঘৃণার গতিও।

সে বছরেই খুন হলেন ঠাকুর্দা, তাঁর সমাপ্তিটা তাঁর খুনীর পরিণাম যেমন, বলতে গেলে সুখদলে যারা মারা যায় তাদের প্রত্যেকের সমাপ্তির মতোই বিদ্ঘুটে। সুখদলের কুলসাধু দিবস হল কুমারী মেরির অনুরোধ-প্রার্থনা উৎসব, কয়েকজন অতিথিকে খেতে ডেকেছিলেন পিওত্র পেত্রভিচ—অত্যন্ত অস্থির ভাব তাঁর: অভিজাত-

প্রধান আসবেন বলে কথা দিয়েছেন, তিনি সত্যি আসবেন তো? তাছাড়া ঠাকুর্দা বেশ খুশি আর উত্তেজিত, কারণটা কী বোঝা গেল না। অভিজাত-প্রধান এলেন — আর খাসা জমল পার্টি। বেশ হৈচৈ আর ফূর্তি, সবচেয়ে ফূর্তি — ঠাকুর্দার। ২রা অক্টোবর ভোরবেলায় দেখা গেল ড্রয়িং-রুমের মেঝেতে তাঁর মৃতদেহ পড়ে আছে।

সৈন্যবাহিনীতে ইস্তেফা দেবার সময় পিওত্র পেত্রভিচ এটা জানাতে কসুর করেন নি যে তিনি আত্মত্যাগটা করছেন ক্রুশ্চভ কুল, বংশের আর জমিদারির মর্যাদা রাখার জন্য। জানাতে ভোলেন নি যে জমিদারি দেখাশোনা করার ভার 'অনিচ্ছা' সত্ত্বেও তিনি নিতে বাধ্য। তাঁকে জেলার সবচেয়ে সুশিক্ষিত আর ফয়দাওলা অভিজাতদের সঙ্গে মেলামেশা ও সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে, আর বাকি লোকেরা — তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ না হয় শুধু সেটা দেখা চাই। গোড়ার দিকে, ঠিক নিজের পরিকল্পনা মতো তিনি চলেন, দেখা করলেন ছোটখাটো সব জোতদারদের সঙ্গে, এমনকি হানা দিলেন খুড়ী ওলগা কিরিলভনাকে, সেই মাতঙ্গিনী বৃদ্ধাকে যাঁর ঘুমের ব্যামো ছিল, যিনি দাঁত মাজতেন নস্যি দিয়ে। বাদশার মতো একাধিপত্যে

পিওত্র পেত্রভিচ জমিদারি শাসন করছেন, হেমন্ত আসতে না আসতে এ ব্যাপারটা কারো বিস্ময় উদ্রেক করল না আর। সত্যি, তখন তাঁর চেহারাটা আর ছুটিতে আসা ফুলবাবু ছোকরা অফিসারের মতো রইল না, তিনি তখন কর্তালোক, নবীন জমিদার। অল্পতে বিব্রতভাবে আর লাল হয়ে ওঠেন না তিনি। একেবারে ফিটফাট মানুষ, গায়ে গত্তি লাগল, দামী ঘরোয়া কোট পরনে, ছোটখাটো পায়ে নরম লাল তাতার চটি, ছোট হাতে ফিরোজা আংটির বাহার। ভাইয়ের কালো চোখে তাকাতে লজ্জা হত আর্কাদি পেত্রভিচের, কী নিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করবেন ভেবে পেতেন না, প্রথম প্রথম তার সমস্ত কথা মেনে নিয়ে শিকার করে সময় কাটাতেন।

যে ভোজের কথা বলা হয়েছে তাতে পিওত্র পেত্রভিচ চেয়েছিলেন নিজের অতিথিবৎসলতায় সবাইকে মুগ্ধ করে দেবেন, তাছাড়া বাড়ির কর্তা যে তিনি সেটা জাহির করার অভিলাষ ছিল তাঁর। কিন্তু যত আপদ ঠাকুর্দাকে নিয়ে। আহ্লাদে তিনি আটখানা হলেও বুদ্ধির পরিচয় বেশী দিলেন না, ক্রমাগত বকবকানি, মাথায় সেই পুরনো পুত ছোট মখমলের টুপি, বাড়ির দরজির বানানো নীল নতুন কোটটা বড্ডো বড়ো, সব

মিলিয়ে হাস্যকর। তাঁরও ধারণা যে গৃহকর্তা হিসেবে তিনিও কম নন, অতিথি সম্বর্ধনার জন্য একটি নির্বোধ অনুষ্ঠানের উদ্ভাবনে সকাল থেকে তাঁর ব্যস্ততা। খাবার ঘরের বারান্দার দিকের দরজার একটি পাল্লা কখনো খোলা হত না, কিন্তু তিনি নিজে তলার আর ওপর দিকের লোহার হুড়াকা সরিয়ে, একটা চেয়ার টেনে, থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে চড়লেন তার ওপর; পাল্লাগুলো হাট করে খুলে দিয়ে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি, লজ্জায় আর রাগে পিওত্র পেত্রভিচের বাকরোধ হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু তিনি ঠিক করেছিলেন সবকিছু সইবেন, তার বাক্যহীনতার সুযোগ নিয়ে ঠাকুর্দা শেষ অতিথি না আসা পর্যন্ত স্থানত্যাগ করলেন না। সামনের দরজায়, — কী একটা প্রাচীন প্রথানুযায়ী সেটাকেও হাট করে খুলে দিতে হয়েছিল, — তাঁর চোখ যেন এঁটে বসে গিয়েছে, উত্তেজনায় পা ঘষছেন, এক একটি অতিথিকে দেখামাত্র আপ্যায়িত করতে ছুটে গিয়ে নাচের ভঙ্গিতে তাড়াতাড়ি একটা পা এগিয়ে হেঁট হয়ে নমস্কার জানিয়ে সবাইকে রুদ্ধশ্বাসে বলছিলেন:

— আহ্, আমি যে কী খুশি হয়েছি! বেজায় খুশি হয়েছি! অনেকদিন পরে আমাদের বাড়িতে পা দিলেন! আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক!

ঠাকুর্দা লোক নির্বিশেষে সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছিলেন যে তনিয়া লুনিওভোতে গিয়েছে ওলগা কিরিলভনার সঙ্গে থাকতে, তাতে ভয়ানক চটছিলেন পিওত্র পেত্রভিচ। 'তনিয়ার মন খারাপ বলে অসুস্থ, তাই শরৎকালটা খুড়ীর ওখানে কাটাতে গিয়েছে' — এই অযাচিত খবরটবর শুনে কী ভাববেন অতিথিরা? কারণ, ভৈৎকেভিচের সঙ্গে তার ব্যাপারটা জানতে কারো বাকি নেই। তনিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলত যে, ডুয়েট বাজাত এক সঙ্গে, ধরা গলায় তাকে পড়ে শোনাত 'লিউদমিলা', কিম্বা হয়ত বিষণ্ন চিন্তামগ্নভাবে বলে উঠত: 'প্রতিজ্ঞার পূত বন্ধনে তুমি বাগদত্তা মৃত্যুর কাছে...' সেই ভৈৎকেভিচের হয়ত সত্যি ন্যায়নিষ্ঠ অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু নিজের মনোভাব প্রকাশের চেষ্টা করামাত্র তনিয়া ক্ষেপার মতো তেলে বেগুনে জ্বলে উঠত, তা সে চেষ্টা যতই নির্দোষ হোক না, — যেমন, তার জন্য একটা ফুল নিয়ে আসা, — তারপর হঠাৎ ভৈৎকেভিচ চলে গেল। তার প্রস্থানের পর রাত্রে আর ঘুম হত না তনিয়ার, যেন শুধু তারই জানা একটি মুহূর্তের প্রত্যাশায় বসে থাকত খোলা জানলার ধারে অন্ধকারে, তারপর হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠত — ঘুম ভেঙে যেত পিওত্র পেত্রভিচের। অনেকক্ষণ জেগে জেগে

ঠোঁট চেপে তিনি শুনতেন তনিয়ার ফোঁপানি আর অন্ধকার বাগানে পপলারগুলোর নিদ্রালস গুঞ্জন, শব্দটা অশ্রান্ত ঝিরঝিরে বৃষ্টির মতো। তারপর যেতেন তাকে সান্ত্বনা দিতে। ঘুমজড়ানো চোখে সান্ত্বনা দিতে আসত বাড়ির ঝিরা, মাঝে মাঝে ঠাকুর্দাও আসতেন দ্রুত পায়ে, উৎকণ্ঠিতভাবে। তখন মাটিতে পা ঠুকে তীক্ষ্ন গলায় চেঁচাত তনিয়া: 'আমাকে রেহাই দাও তোমরা, আমার জন্ম শত্রু তোমরা!' — সবকিছু শেষ হত কুৎসিত গালাগালিতে, প্রায় মারামারির মতো ব্যাপারে। ঝিদের আর ঠাকুর্দাকে তাড়িয়ে, দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দরজার হাতল চেপে ধরে পিওত্র পেত্রভিচ উন্মত্ত হিসহিসিয়ে বলে উঠতেন:

— শোনো, একবার ভেবে দেখো, একবার শুধু ভেবে দেখো, শয়তানী, লোকে কী বলবে!

-- উঃ! — পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠত তনিয়া। — বাবা, দেখো, ও আমাকে গালিগালাজ করছে, বলছে আমার পেট হয়েছে!

দুহাতে মাথা চেপে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেন পিওত্র পেত্রভিচ। পার্টির দিন গের্ভাস্কাকেও নিয়ে তাঁর বিশেষ উদ্বেগ: তাঁর ভয় সাবধানে না থাকলে সে হয়ত বেয়াড়াপনা করে বসবে।

শরীরে গের্ভাস্কা ভয়ংকর বেড়েছে। প্রকাণ্ড বেঢপ চেহারা, কিন্তু চাকরবাকরদের মধ্যে সেই সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো, বুদ্ধিতে তার জুড়ি নেই, তারও পরনে নীল কোট, নীল পেণ্টুলেন, পায়ে ছাগলের চামড়ার নরম গোড়ালিবিহীন টপবুট। শীর্ণ তামাটে গলায় বেগুনি রঙের পশমী সুতোর একটা রুমাল জড়ানো। ঘন হালকা কালো চুল পাশে টেরি কাটা, কদমছাঁট করতে সে রাজী হয় নি — চারপাশে হালকাভাবে কাটা বড় চুল। দাড়িগোঁফ কামাবার বালাই নেই, কারণ চিবুকে কোঁকড়ানো দু'তিনটে মোটা কালো চুল আর প্রকাণ্ড হাঁ-র দুদিকে দুটো গাছি ছাড়া আর কিছু তার নেই: 'হাঁ-টা তো আকর্ণবিস্তৃত একটা ফালি মাত্র' — বলত লোকে। হাড় বের করা চওড়া ছাতি, ছোট মাথা, কোটরগ্রস্ত চোখ, ছাইয়ের মতো নীলচে পাতলা ঠোঁট, বড়ো নীলচে দাঁত হ্যাংলা চেহারার এই প্রাচীন আর্যটিকে, সুখদলের এই পারসীককে ইতিমধ্যে নাম দেওয়া হয়েছিল: 'শিকারী কুকুর'। তার দন্তবিকশিত হাসি দেখে, কাশি শুনে অনেকে মনে মনে ভাবত: 'শীগগিরই তুই পটল তুলবি!' তবু সামনাসামনি এই ছোকরাটিকে সম্মান করে গের্ভাসি আফানাসিয়েভিচ বলে ডেকে অন্য চাকরবাকরদের সঙ্গে তফাৎ করা হত।

বাব্রা পর্যন্ত ভয় পেত তাকে। মনিব আর চাকরবাকরদের মধ্যে একটা মিল ছিল: হয় তারা শাসন করবে নয় শিঁটিয়ে থাকবে। পিওত্র পেত্রভিচের আগমনের দিনে ঠাকুর্দাকে ঢেঁটা উত্তর দেওয়াতে গের্ভাস্কার কোনো সাজা না হওয়াতে চাকরবাকরেরা অবাক হয়ে গিয়েছিল। সংক্ষেপে শুধু আর্কাদি পেত্রভিচ তাকে বলেছিলেন: 'তুই একটা আস্ত শুয়োর!' — প্রত্যুত্তরটা ঠিক তেমনি সংক্ষিপ্ত: 'ওঁকে আমি সইতে পারি নে, হুজুর!' কিন্তু পিওত্র পেত্রভিচের কাছে গের্ভাস্কা গেল আপনা থেকে: অসম্ভব বড়ো পেণ্টুলেনে ঢাকা বেঢপ লম্বা পায়ে একটু হেলে পড়ে, বাঁ হাঁটুটা এগিয়ে দিয়ে দরজায় তার সেই অভ্যস্ত, অযাচিত গায়ে-পড়া ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে অনুরোধ জানাল তাকে যেন বেতপেটা করা হয়।

— আমি, হুজুর, বেজায় বদরাগী আর বেয়াড়া লোক, — বলল নিরাসক্তভাবে, বড়ো বড়ো কালো চোখে ঝিলিক এনে।

আর 'বদরাগী' কথাটায় কী একটা আভাস পেয়ে ভয় পেলেন পিওত্র পেত্রভিচ।

— দেখা যাবে, অনেক সময় আছে, অনেক সময় আছে! — কড়া হবার ভাণ করে হাঁকলেন তিনি। —

চলে যা এখান থেকে! দেখতে পারি না তোর মতো বেয়াড়া লোককে!

কিছু না বলে মুহূর্তখানেক দাঁড়িয়ে রইল গের্ভাস্কা। তারপর বলল:

— আপনার যা মর্জি।

ওপরের ঠোঁটের একগাছা মোটা চুল পাকাতে পাকাতে, কুকুরের মতো নীলচে দন্তবিকশিত করে, ভাবাবেগহীন মুখে আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে গেল সে। ঘটনাটা থেকে তার দৃঢ় ধারণা হল যে, ভাবাবেগহীন মুখ করে থাকা এবং যতটা সম্ভব সংক্ষেপে জবাব দেওয়া হল—সবচেয়ে ভালো পন্থা। আর পিওত্র পেত্রভিচ যে শুধু গের্ভাস্কার সঙ্গে কথাবার্তা এড়িয়ে চললেন তা নয়, এমনকি তার মুখের দিকে তাকাতেন না পর্যন্ত।

পার্টির দিন গের্ভাস্কার ব্যবহার ঠিক তেমনি নিরাসক্ত আর অবোধ্য। খানার বন্দোবস্তে সবাই ছুটোছুটি করছে, চলেছে হুকুম দেওয়া নেওয়া, দিব্যি গালাগালি, ঝগড়া, মেঝে ধোয়ামোছা; আইকনগুলোর ভারি, ময়লা রুপো সাফ করাতে খড়িগুলো নীল, বাড়িতে নাক গলাবার চেষ্টা করাতে কুকুরগুলো লাথি খাচ্ছে, সবায়ের ভাবনা জেলিটা হয়ত ঠিক দানা বাঁধবে না, কাঁটায়

কুলিয়ে ওঠা যাবে না হয়ত, পড়ে যাবে কেক আর মিঠাই; একমাত্র গের্ভাস্কার মুখে অবজ্ঞার ধীর হাসি; ভীষণ উত্তেজিত মদখোর বাবুর্চি কাজিমিরকে সে বলল: 'ধীরে, পাদ্রীবাবাজী, ধীরে, না হলে কাপড় খসে পড়বে যে!'

অভিজাত-প্রধানের কথা ভাবতে ভাবতে পিওত্র পেত্রভিচ অন্যমনস্কভাবে গের্ভাস্কাকে বললেন:

— দেখ আজ আবার নেশা করে বসিস না।

— জীবনে কখনো মাল টানি নি, — যেন সমকক্ষের সঙ্গে কথা বলছে এমনভাবে জবাব দিল গের্ভাস্কা। — ওতে মজা নেই কিছু।

তারপর সব অতিথি যখন হাজির তখন গের্ভাস্কাকে তুষ্ট করার চেষ্টায় সবাইকে শুনিয়ে পিওত্র পেত্রভিচ হেঁকে বললেন:

— গের্ভাসি! ডুব দিস্ না, দোহাই তোর! তুই না থাকলে যে মারা পড়ব!

অত্যন্ত ভদ্র ও ভারিক্কি গলায় জবাব দিল গের্ভাস্কা:

— কিছু ভাববেন না, হুজুর। বান্দা হাজির।

এত ভালোভাবে কাজকর্ম এর আগে কখনো করে নি গের্ভাস্কা। তার সামনে অতিথিদের যা বললেন পিওত্র পেত্রভিচ তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য:

— দানবটা কত মুখফোড় হতে পারে বললে বিশ্বাস করবেন না! কিন্তু সত্যি ক্ষমতা আছে লোকটার! হাত নয়ত, একেবারে সোনা!

তিনি কি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন যে তাঁর এই কথায় কানায় কানায় ভরা সর্বনাশের পাত্র এবারে ছলকে পড়বে? কথাটা কানে গেল ঠাকুর্দার। কোটের গলা টানতে টানতে তিনি হঠাৎ টেবিলের একেবারে অন্য প্রান্তে বসা অভিজাত-প্রধানকে চেঁচিয়ে বললেন:

— হুজুর! আমাকে উদ্ধার করুন! বাপের কাছে ছেলের মতো আপনাকে অনুরোধ করছি! আমার এই চাকরটার বিরুদ্ধে নালিশ জানাচ্ছি আপনাকে! এই যে, এই লোকটা — গের্ভাসি আফানাসিয়েভিচ কুলিকভ! আমাকে উঠতে বসতে তাচ্ছিল্য করে লোকটা! ও...

কথাটা শেষ করতে পারলেন না তিনি, অতিথিরা স্তোক দিয়ে তাঁকে শান্ত করল। উত্তেজনার চোটে তিনি কেঁদে ফেলেছিলেন কিন্তু অতিথিরা এত বন্ধুভাবে আর সসম্মানে, সেটা প্রহসন গোছের ব্যাপার অবশ্য, তাঁকে সান্ত্বনা দিল যে তুষ্ট হয়ে শিশুর মতো আবার খুশি হয়ে উঠলেন তিনি। চোখ না তুলে, মুখ একটু ঘুরিয়ে দেয়ালের পাশে অনড় দাঁড়িয়ে রইল গের্ভাস্কা।

ঠাকুর্দা দেখলেন দানবটার মাথা বেজায় ছোট, চুল ছোট করে ছাঁটলে আরো ছোট হয়ে যেত, দেখলেন মাথার পেছন দিকটা অত্যন্ত চোখা, ঘাড়ের চুল অত্যন্ত ঘন — রুক্ষ, যেমন-তেমন করে ছাঁটা চুল সরু ঘাড়ের ওপর খুঁচিয়ে বেরিয়ে আছে। শিকারের সময় রোদে আর হাওয়ায় পুড়ে মুখের চামড়া জায়গায় জায়গায় খসে গিয়ে ফিকে বেগুনি রঙের ছোপছোপ দাগ। থেকে থেকে অস্বস্তিতে আর ভয়ে তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলেন ঠাকুর্দা, তবু অতিথিদের আনন্দে চেঁচিয়ে বলতে ছাড়লেন না:

— বেশ, বেশ, ওকে ক্ষমা করছি! কিন্তু একটি মাত্র সর্তে, বন্ধুগণ, আপনাদের তিন দিন যেতে দেব না! কিছুতেই যেতে দেব না! বিশেষ করে সন্ধ্যে বেলায় যাবেন না, দোহাই আপনাদের। অন্ধকার হয়ে গেলে আমি আর আমি থাকি না: কী বিষণ্ণ হয়ে যায় সব, কী ভয়াবহ! আকাশে মেঘ জমছে, লোকে বলে নাপোলিওনের দলের দুটো ফরাসী আবার ধরা পড়েছে ব্রশিন বনে... রাত্রে আমার কপালে নির্ঘাত মরণ লেখা, — শুনে রাখুন কথাটা! এটা মার্তিন জাদেকার ভবিষ্যদ্বাণী...

কিন্তু তাঁর মৃত্যু ঘটল ভোরের দিকে।

শেষ পর্যন্ত তিনি যা চেয়েছিলেন তাই হয়: 'ওঁকে খুশি করার জন্য' অনেকে রাত্রে থেকে যান; সারা সন্ধ্যে চলল চা-পান, নানা ধরনের জ্যাম পরিমাণে এত বেশী ছিল যে লোকে এসে এসে একটার পর আরেকটা চাখছিল; তারপর পাতা হল আরো টেবিল, জ্বালানো হল স্পার্মাসেটির বাতির ঝাড়, আলো ঠিকরে পড়ল আয়নায়, দামী তামাকের সুগন্ধ আর হৈহৈ গল্পগুজবে ভরা ঘরগুলো গির্জার মতো ঝকঝকিয়ে উঠল সোনালি আভায়। সবচেয়ে বড়ো কথা হল, অনেক অতিথি রয়ে গেলেন রাত কাটাবার জন্য। তার মানে আর একটা প্রীতিকর দিনের সম্ভাবনা, আর সঙ্গে সঙ্গে অনেক ঝামেলা আর মাথাব্যথার পালা: সত্যি তো, তিনি, পিওত্র কিরিলীচ না থাকলে পার্টিটা কখনো এত জমত না, ভোজপর্বটা হত না এত এলাহি আর আনন্দের!

শোবার ঘরে সরু মোমবাতি জ্বালানো স্তোত্রবেদীর সামনে কোট খুলে দাঁড়িয়ে, সেণ্ট-মার্কিউরির অন্ধকার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে উত্তেজনায় তিনি সে রাত্রে ভাবছিলেন: 'হ্যাঁ, পাপীর সর্বনাশ ঘটুক... আমাদের ওপর ক্রোধে সূর্য যেন অস্ত না যায় কখনো!'

তারপর মনে পড়ল সম্পূর্ণ আলাদা একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করার অভিপ্রায় ছিল তাঁর; একটু কুঁজো

হয়ে, পঞ্চাশের স্তোত্র ফিসফিস করে আউড়ে, ঘরে পায়চারি করতে লাগলেন তিনি, বিছানার পাশের টেবিলে ত্রিকোনো পাশ তিলের গন্ধটা একটু ছেঁটে স্তোত্রগ্রন্থটা তুলে নিয়ে খুশির আবেশে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মুণ্ডহীন মহাত্মার দিকে আর একবার তাকালেন। হঠাৎ খেই-হারিয়ে-যাওয়া কথাটা মনে পড়াতে মৃদু হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখ:

— হ্যাঁ, ঠিক তাই, ঠিক তাই: বৃদ্ধকে পেলে — খুন করতাম, না পেলে — কিনে নিতাম!

ঠিক সময় ঘুম না ভাঙলে জরুরী সব হুকুম জারি করা যাবে না, তাই উৎকণ্ঠায় বলতে গেলে ঘুম এল না চোখে। ভোরবেলায়, তখনো ঘরগুলো সাফ করা হয় নি, তামাকের গন্ধে তখনো ভরপুর ঘরগুলোতে পার্টির পরের সকালের সেই বিশেষ একটা নিঝুম স্তব্ধতা, পা টিপে টিপে সাবধানে খালি পায়ে ড্রয়িং-রুমে গিয়ে, সবুজ তাসের টেবিলের কাছে মেঝেতে পড়ে থাকা কয়েকটা খড়ির টুকরো সন্তর্পণে তুলে নিয়ে তিনি কাঁচের দরজা থেকে চাইলেন বাগানের দিকে, আর বিস্ময়ে মুখ হাঁ হয়ে গেল: হিমনীল ঝক্‌ঝকে স্বচ্ছ আকাশ, বারান্দা আর বারান্দার রেলিং ঢাকা পড়েছে সকালের রুপোলি হিমকণায়, ঢাকা পড়েছে বারান্দার নীচে বিরল

ঝোপঝাড়ে তামাটে পাতা। দরজা খুলে হাওয়া শুঁকলেন ঠাকুর্দা: ঝোপঝাড়ে তখনো হৈমন্তী ক্ষয়ের তীব্র গেঁজানো গন্ধ, কিন্তু শীতের তাজা হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে সেটা। আর সবকিছু নিথর, প্রশান্ত, প্রায় মহিমামণ্ডিত। গ্রামের পেছন থেকে উঁকি মেরে সূর্য আলো ছড়াল ছবির মতো দেখতে পথের দুধারে অর্ধনগ্ন বার্চ গাছগুলোর মাথায়, আর পাতলা ছোট সোনালি পাতায় ছাওয়া, নীল আকাশের গায়ে স্বচ্ছ সেই সব সাদা-সোনালি গাছের মাথায় কী মধুর, আনন্দোজ্জ্বল লাইলাক আভার লুকোচুরি! বারান্দার নীচে ঠাণ্ডা ছায়ায় ছুটে চলে গেল একটা কুকুর, তার পায়ের তলায় মচমচ করে উঠল যেন ছড়ানো নুনের মতো হিমকণায় দগ্ধ ঘাস। শব্দটা মনে করিয়ে দেয় শীতকালের কথা — আর, সানন্দ প্রত্যাশায় কাঁধ অল্প ঝাঁকিয়ে ঠাকুর্দা ড্রয়িং-রুমে ফিরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে ভারি আসবাবপত্র সরাতে লেগে গেলেন, সরাবার সময় গুরুগুরু একটা আওয়াজ, থেকে থেকে আয়নায় প্রতিফলিত আকাশের দিকে তাকাতে লাগলেন। হঠাৎ নিঃশব্দ ক্ষিপ্র পায়ে ঘরে ঢুকল গের্ভাস্কা — গায়ে কোট নেই, ঘুমের ঘোর তখনো কাটে নি, 'আর মেজাজটা শয়তানের মতো', এটা সে নিজে বলেছিল পরে।

ঘরে ঢুকে কড়া স্বরে হিসহিসিয়ে বলে উঠল:

— থামাও এসব! অন্যদের কাজে কেন নাক গলাও?

উত্তেজিত মুখ তুলে ঠাকুর্দা সারা সন্ধ্যা আর সারা রাত্রির মতো সমান সদয়স্বরে অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন:

— দেখ দিকি, গের্ভাস্কা নিজের মূর্তিটা! কাল রাত্তিরে তোকে মাফ করে দিলাম, আর তুই কিনা মনিবের কাছে কৃতজ্ঞ না হয়ে...

মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে গের্ভাস্কা বলল:

— তুমি আমায় জ্বালিয়ে মারলে, তোমার নাকি কান্না অসহ্য! টেবিলটা ছাড়ো দিকি!

সভয়ে ঠাকুর্দা একবার তাকালেন গের্ভাস্কার মাথার পেছন দিকটায়, সাদা শার্টের ওপরে সরু গলা থেকে সেটা অত্যন্ত খুঁচিয়ে আছে মনে হল, কিন্তু তেলে বেগুনে জ্বলে তিনি দাঁড়ালেন গের্ভাস্কা আর তাসের টেবিলের মাঝখানটায়, টেবিলটা একটা কোণে নিয়ে যাবার ইচ্ছে ছিল তাঁর।

মুহূর্ত খানেক ভেবে নিয়ে তিনি চেঁচালেন, কিন্তু বিশেষ জোরে নয়:

— ছাড় দিকি ওটা! মনিবের কথা মানা উচিত তোর। আমাকে এত চটিয়ে দিচ্ছিস: পাঁজরায় দেব বসিয়ে ছুরি!

— বটে! — দাঁত খিঁচিয়ে সখেদে কথাটা বলে গের্ভাস্কা বেশ জোরে ঘা বসাল তাঁর বুকে।

পালিশ করা ওক কাঠের মেঝেতে পা পিছলে পড়ে গেলেন ঠাকুর্দা হাতদুখানা ছড়িয়ে — পড়ার সময় টেবিলের ছুঁচলো কোণে রগ ঠুকে গেল।

রক্ত, শিবনেত্র আর হাঁ-হয়ে-যাওয়া মুখ দেখে গের্ভাস্কা ঠাকুর্দার তখনো উষ্ণ গলা থেকে ছিনিয়ে নিল সোনার পূত ফলক আর ময়লা সুতোয় বাঁধা রক্ষাকবচ... পেছন দিকে একবার তাকিয়ে কড়ে আঙুল থেকে ঠাকুর্দার বিয়ের আংটিটিও নিয়ে নিল। তারপর দ্রুতপায়ে নিঃশব্দে ড্রয়িং-রুম ছেড়ে — সেই যে চলে গেল একেবারে নিরুদ্দেশ।

সুখদলের একটি মাত্র মানুষ এরপর তাকে দেখেছিল, সে হল নাতালিয়া।

৭

সশকিতে নাতালিয়া থাকার সময় সুখদলে আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে: পিওত্র পেত্রভিচের বিবাহ এবং ক্রাইমিয়ার যুদ্ধে দুই ভাইয়ের স্বেচ্ছায় যোগদান।

দু'বছর পর ফিরে আসে নাতালিয়া: তার কথা তখন কারো মনে নেই। ফিরে এসে সুখদলকে সে চিনতে পারল না, ঠিক যেমন সুখদল চিনতে পারে নি তাকে।

গ্রীষ্মের সেই সন্ধ্যায় যখন জমিদার বাড়ি থেকে তাকে আনতে পাঠানো গাড়িটা কিঁচকিঁচ শব্দে থামল কুঁড়েঘরের সামনে, আর নাতালিয়া বেরিয়ে এল দোরগোড়ায়, ইয়েভ্‌সেই বদুলিয়া অবাক হয়ে বলে উঠল:

— আরে, সত্যি তুই নাকি, নাতালিয়া?

— তা ছাড়া আর কে? — প্রায় দেখা যায় না এমন মৃদু হেসে জবাব দিল নাতালিয়া।

ইয়েভ্‌সেই মাথা ঝাঁকিয়ে বলল:

— চেহারাটা বেজায় খারাপ হয়ে গিয়েছে কিনা!

কিন্তু নাতালিয়াকে শুধু দেখাচ্ছে অন্য রকম: এই যা, মাথামুড়োনো, গোল মুখ, উজ্জ্বল চোখ মেয়েটি আর নেই, সে এখন অনতিদীর্ঘ পাতলা দোহারা চেহারার যুবতী, প্রশান্ত, সংযত ও নম্র। পরনে ইউক্রেনের ডোরাকাটা পশমের স্কার্ট আর সূচীর কাজ করা ব্লাউজ, রুমালটা ছাই রঙের হলেও আমরা যেমনভাবে পরি তেমনভাবে পরা। চামড়া একটু রোদে-পড়া, জোয়ারি রঙের ছোট ছোট মেচেতার দাগ মুখে। কিন্তু সুখদলের

খাস লোক ইয়েভ্‌সেইয়ের কাছে ছাই-রঙা রুমাল, রোদে-পোড়া চামড়া আর মেচেতা কুৎসিত মনে হবেই তো।

সুখদলের পথে ইয়েভ্‌সেই বলল:

— এবার তো তোর বিয়ের বয়স হয়েছে। বিয়ে করার ইচ্ছে হয়েছে নিশ্চয়, অ্যাঁ?

মাথা নেড়ে শুধু নাতালিয়া বলল:

— না, ইয়েভ্‌সেই খুড়ো, বিয়ে কখনো করব না।

— তোর হল কী? — এত অবাক লাগল ইয়েভ্‌সেইয়ের যে মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে নিল।

ধীরেসুস্থে নাতালিয়া তাকে বোঝাল: বিয়ে সবায়ের কপালে লেখা নেই, ওকে তনিয়া দিদিমণির হেফাজতে রাখা হবে হয়ত, কিন্তু তনিয়া দিদিমণি তো ভগবানের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছেন, তার মানে তিনি নাতালিয়াকেও বিয়ে করতে দেবেন না; তাছাড়া এমন সব স্বপ্ন সে দেখেছে যা থেকে এটা স্পষ্ট যে বিয়ে করাটা তার কপালে নেই...

— সে আবার কী স্বপ্ন? — ইয়েভ্‌সেই জিজ্ঞেস করল।

— এমন আহামরি কিছু নয়, — নাতালিয়া বলল। — সে বার গের্ভাস্কার কাছে খবরটা পেয়ে ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম কিনা, খবরটা নিয়ে খালি ভাবতাম... তাই স্বপ্ন দেখি।

— ও সত্যি সকালে তোদের সঙ্গে থেকে খাওয়া দাওয়া করেছিল? গের্ভাস্কার কথা বলছি।

একটু ভাবল নাতালিয়া:

— হ্যাঁ, তা করেছিল। এসে বলল: তোর কাছে বিশেষ একটা জরুরী কাজে কর্তা আমাকে পাঠিয়েছেন, কিন্তু প্রথমে কিছু খেতে দে তো। ওর বিষয়ে মন্দ কিছু না ভেবে টেবিলে খাবার দিলাম। খাওয়া শেষ করে বাইরে গিয়ে ও ইশারায় আমাকে ডাকল। দৌড়ে গেলাম, বাড়ির পেছনে গিয়ে সব কথা আমাকে খুলে বলল, হ্যাঁ, তারপর চলে গেল...

— তুই লোকজন ডাকলি না কেন?

— ডাকব কেন। ডাকলে খুন করে ফেলবে বলেছিল। রাত্তিরের আগে কাউকে বলা বারণ ছিল। আর ওদের ও বলল, — চালাঘরে গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নিই...

নাতালিয়া ফিরে আসাতে ওকে দেখার বিশেষ আগ্রহ সুখদলের সব চাকরবাকরের। পুরনো বান্ধবী আর বাড়ির ঝিদের প্রশ্নবাণে ও জর্জরিত। বান্ধবীদের খুব সংক্ষেপে নাতালিয়া জবাব দিল, যেন যে ভূমিকায় নিজে অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তার বেজায় আনন্দ।

— ভালোয় ভালোয় কেটেছে সব, — কয়েকবার সে বলল।

একবার বলল তীর্থযাত্রী বুড়ীর মতো গলায়:

--- ভগবানের অসীম কৃপা। ভালোয় ভালোয় কেটেছে সব।

আর শান্তভাবে, কালবিলম্ব না করে বাড়ির মামুলী দৈনন্দিন কাজের ভার আবার নিল নাতালিয়া, ঠাকুর্দা আর নেই, দাদাবাবুরা স্বেচ্ছায় চলে গেছেন যুদ্ধে, তনিয়া দিদিমণি 'ক্ষেপার মতো' ঠাকুর্দাকে নকল করে ঘরে ঘরে ঘোরেন, সুখদলে শাসন করছেন একেবারে অচেনা একটি কর্ত্রী, — বেঁটে মোটা অতি চঞ্চল গর্ভবতী একটি মহিলা, এ সবে যেন অবাক হবার কিছু নেই...

খাবার ঘর থেকে কর্ত্রী হাঁকিলেন:

— এখানে আসতে বলো ওকে... কী যেন ওর নাম? — নাতাশ্কাকে।

আর দ্রুতপায়ে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল নাতালিয়া, ক্রুশচিহ্ন করে কোণের আইকনগুলোকে প্রথমে, তারপর কর্ত্রী ও দিদিমণিকে প্রণাম জানিয়ে দাঁড়িয়ে রইল — জিজ্ঞাসাবাদ ও আদেশের প্রতীক্ষায়। প্রশ্ন অবশ্য শুধু করলেন কর্ত্রী — তনিয়া দিদিমণি একটি কথাও বললেন না, তিনি লম্বা আর রোগা হয়ে গেছেন, নাকটা ধারালো, অসম্ভব কালো চোখে বিরস স্থির দৃষ্টি। কর্ত্রী তাকে বললেন

তনিয়া দিদিমণির সেবা করতে। আর মাথা নুইয়ে নাতালিয়া শুধু বলল:

— আচ্ছা, মা।

সেই সমান নিরাসক্ত নিথর দৃষ্টিতে তনিয়া দিদিমণি সেদিন সন্ধ্যেবেলায় হঠাৎ দারুণ রেগে চোখ পাকিয়ে নিষ্ঠুর আনন্দে নাতালিয়ার চুল ধরে টানতে লাগলেন — জামাকাপড় ছাড়াতে গিয়ে মোজায় বিচ্ছিরি একটা টান দিয়েছিল বলে। ছোট মেয়ের মতো কেঁদে ফেলল নাতালিয়া, কিন্তু কিছু বলল না; ঝিদের ঘরে গিয়ে জানলার তাকে বসে ছেঁড়া চুল বাছতে বাছতে সত্যি সত্যি তার অশ্রুসিক্ত চোখের পাতার নীচে দেখা দিল মৃদু হাসি।

— বাবা, একেবারে চামুণ্ডা দেখছি! — বলেছিল সে। — হাড়ির হাল হবে আমার।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে অনেকক্ষণ বিছানা ত্যাগ করলেন না তনিয়া দিদিমণি, আর দরজার পাশে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে নাতালিয়া এক-একবার আড়চোখে চাইতে লাগল তাঁর ফ্যাকাসে মুখে।

— কী, কী স্বপ্ন দেখা হল? — এমন উদাসীনভাবে তনিয়া দিদিমণি জিজ্ঞেস করলেন যেন অন্য কেউ তাঁর হয়ে কথা বলছে।

জবাবে নাতালিয়া বলল:

— কিছু না, বলার মতো কিছু না।

তখুনি ঠিক আগেকার রাতের মতো হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে তনিয়া দিদিমণি বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে চায়ের পেয়ালাটা ছুঁড়ে মারলেন নাতালিয়ার দিকে, তারপর বিছানায় ধড়াস করে শুয়ে শুরু হল ফুঁপিয়ে কান্না আর চীৎকার। সরে গিয়ে নাতালিয়া পেয়ালাটা এড়াল — খুব চটপট এড়াবার কায়দাটা আয়ত্ত করে ফেলতে বেশী সময় লাগল না তার। জানা গেল, আগের রাত্রের স্বপ্নের কথা জিজ্ঞেস করাতে বোকা ঝিগুলো 'কিছু না দিদিমণি' বললে তনিয়া দিদিমণি মাঝে মাঝে তাদের চেঁচিয়ে বলতেন: 'মিথ্যে কথা না হয় বল একটা!' কিন্তু মিথ্যে কথায় নাতালিয়া ওস্তাদ ছিল না বলে এড়াবার ফন্দিটা তাকে শিখেপড়ে নিতে হল।

শেষ পর্যন্ত তনিয়া দিদিমণিকে দেখতে ডাক্তার ডাকা হল। অনেক বড়ি আর মিক্স্চার তিনি দিলেন। তনিয়া দিদিমণির ভয় তাঁকে বিষ খাওয়াবে, তাই প্রথমে নাতালিয়াকে দিয়ে ওষুধগুলো চাখিয়ে নিলেন — একটার পর একটা সবগুলো খেয়ে ফেলল সে বাধ্যের মতো। ফিরে আসার অল্প কিছুদিন পরে সে শুনল তনিয়া দিদিমণি তাঁর অপেক্ষায় ছিলেন, যেন সে 'এক

টুকরো আলো' : বাস্তবিক তার কথা ভেবেছিলেন তিনিই— সশংকি থেকে গাড়িটা আসছে কিনা দেখার জন্য ব্যগ্র চোখ মেলে বারবার সবাইকে বলছিলেন গভীর আবেগে যে নাতালিয়া ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একেবারে সেরে উঠবেন। নাতালিয়া ফিরে এল — তখন তাঁর সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য। হতে পারে নাতালিয়াকে নিয়ে হতাশ হয়েছিলেন বলে তাঁর কান্না পেত? কথাটা ভেবে একদিন নাতালিয়ার বুকটা মুচড়ে উঠল। বারান্দায় বেরিয়ে একটা তোরঙ্গের ওপর বসে সে কাঁদতে লাগল।

কেঁদে কেঁদে ফোলা চোখে ঘরে যখন এল, তনিয়া দিদিমণি জিজ্ঞেস করলেন:

— কী, ওষুধটা খেয়ে ভালো লাগছে?

— হ্যাঁ, দিদিমণি, — ফিসফিস করে বলল নাতালিয়া, যদিও সবকটা ওষুধ খেয়ে তার হৃৎস্পন্দন ঢিমে হয়ে গিয়েছে, মাথা ঘুরছে, তনিয়া দিদিমণির কাছে এসে হাতে চুমো খেল সে আবেগে।

আর তারপর অনেক দিন সে মাথা নীচু করে ঘুরে বেড়াত, তনিয়া দিদিমণির দিকে মুখ তুলে তাকাবার সাহস নেই, তাঁর জন্য সে এত ব্যথিত।

— ইউক্রেনের কেউটে কোথাকার! — একবার বাড়ির ঝিদের একজন, সলশ্‌কা, তাকে খেঁকিয়ে ওঠে,

নাতালিয়ার অন্তরঙ্গ সখি সে, তার ভাবনাচিন্তা গোপন কথার দোসর হবার সবচেয়ে বেশী চেষ্টা ছিল তার, কিন্তু তার সব আগ্রহের জবাবে শুধু মিলত সংক্ষিপ্ত, মামুলী উত্তর, সখিসুলভ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের কোনো আমেজ ছিল না তাতে।

বিষণ্ন হাসি হাসল নাতালিয়া। ভাবতে ভাবতে বলল:

— তা বেশ, ঠিক বলেছ। যাদের সঙ্গে থাকা তাদেরই মতো হয়ে যেতে হয় তো। সত্যি বলতে ইউক্রেনের লোকেদের জন্য থেকে থেকে যতটা মন কেমন করে বাপ-মার জন্য ততটা নয়...

সর্শাকিতে যাবার পর প্রথম প্রথম নতুন পরিবেশের কোনো হুঁশ তার হয় নি। ভোরবেলায় সেখানে পেঁাছিয়ে — প্রথমে যেটা তার কাছে অদ্ভুত ঠেকে সেটা হল যে কুঁড়েঘরটা বেজায় লম্বা আর সাদা, সমভূমির মধ্যে অনেক দূর থেকে চোখে পড়ে, চুল্লি-জ্বালানো স্ত্রীলোকটি মিষ্টিভাবে কথা বলল তার সঙ্গে, আর পুরুষটি ইয়েভ্‌সেইয়ের গল্পগুজবে কান দিল না। ক্রমাগত বকবক করে চলেছে ইয়েভ্‌সেই — কর্তাদের কথা, দেমিয়ানের কথা, পথের গরম আর শহরে কী খেয়েছিল তার কথা, পিওত্র পেত্রভিচ, আর অবশ্য

আয়না চুরিটার কথা, — সুখদলে 'ব্যাজার' বলে পরিচিত শারি নামের ইউক্রেনীয় লোকটি শুধু মাথা নেড়ে চলল. ইয়েভ্‌সেই থামলে পর অন্যমনস্কভাবে একবার তার দিকে চেয়ে, বিশেষ একটা খুশির ঝিলিক চোখে, অনুচ্চ অনুনাসিক সুরে গান ধরল: 'বরফের ঝড় খাক ঘুরপাক'... আস্তে আস্তে ধাতস্থ হয়ে এল নাতালিয়া — সশঙ্কি দেখে সে অবাক, ক্রমশ জায়গাটা তার কাছে সুখদলের তুলনায় বেশী মধুর আর আলাদা ধরনের মনে হতে লাগল। কুঁড়েঘরটাই তো দেখার মতো — ধবধবে সাদা দেয়াল, খাগড়ায় সুন্দর ছাওয়া মসৃণ চাল! আর ভেতরটা কেমন করে সাজানো, সুখদলের সেই ছন্নছাড়া কুঁড়েঘরগুলোর তুলনায় কত সমৃদ্ধ! দেখার মতো জিনিস বটে কোণে ঝোলানো, রাঙতা মোড়া, কাগজের ফুলের সুন্দর মালা দিয়ে ঘেরা আইকনগুলো, ওপরে ঝোলানো সূচীর কাজ করা রঙীন তোয়ালে! আর ফুলকাটা টেবিল-ঢাকনাগুলো! চুল্লির পাশে তাকে সারি বাঁধা নীল কাঁচের বাটি আর ঘটি! কিন্তু সবচেয়ে বড়ো আশ্চর্যের বিষয় হল ইউক্রেনীয় দম্পতিটি।

কেন ওরা আশ্চর্য সেটা ঠিক ধরতে পারে নি নাতালিয়া, কিন্তু অনুভব করেছে বরাবর। শারির মতো পরিচ্ছন্ন, ধীর, নির্ভুল চাষী আগে কখনো তার চোখে পড়ে নি।

লোকটা লম্বা নয়, সরুগোছের, মাথায় কদম ছাঁটে বেশ পাক ধরেছে, — দাড়ি নেই, — কিন্তু তাতারী পাতলা গোঁফজোড়াও পাকা, মুখ আর ঘাড় রোদে পুড়ে কালো আর গভীর বলিকীর্ণ, রেখাগুলো পরিচ্ছন্ন স্পষ্ট আর কেন জানি না মনে হয় প্রয়োজনীয়। লিনেনের পেণ্টুলেনের নীচে খুব ভারি টপবুট পরার জন্য চলার ধরনটা অস্বস্তিকর; পেণ্টুলেনে গোঁজা লিনেনের শার্ট — বগলের কাছটায় ঢিলে, কলার ওলটানো। হাঁটার সময় একটু ঝুঁকে পড়ে সে। কিন্তু না হাঁটন, না বলিরেখা, না পাকা চুল তাকে বুড়িয়ে দিয়েছে: আমাদের শ্রান্তি আর অবসাদের কোনো ছাপ নেই তার মুখে; একটু ছোট চোখের দৃষ্টিটি তীক্ষ্ন, ব্যঙ্গের স্বল্প আভাস তাতে। তাকে দেখে নাতালিয়ার মনে পড়ত সেই সার্বীয় বুড়ো লোকটির কথা যে একবার বেহালা-বাজিয়ে একটি বাচ্চা ছেলের সঙ্গে সুখদলে এসেছিল।

ইউক্রেনীয় স্ত্রীলোকটির নাম মারিনা, কিন্তু সুখদলের লোক তাকে উঠন-ঠেঙ্গা বলে ডাকে, বয়স পঞ্চাশ, লম্বা দোহারা চেহারা। গালের হাড় উঁচু, মুখের নরম ত্বক হলদে-তামাটে, সুখদলসুলভ নয়, মুখটা একটু কর্কশ হলেও পরিষ্কার গড়ন আর কঠোর চোখের দীপ্তির জন্য দেখতে প্রায় সুন্দর — চোখজোড়া সুলেমানী পাথর বা

হলদে-ধূসর রঙের, বেড়ালের চোখের মতো রঙ বদলায়। লাল ছোপ দেওয়া কালো-সোনালি রঙের রুমাল মাথায় চুড়ো করে বাঁধা; পায়ে আর পেছনে আঁটো করে বসা খাটো কালো স্কার্ট, সাদা ব্লাউজটা আরো সাদা দেখায় তাতে। নাল লাগানো জুতো, মোজার বালাইবিহীন পায়ের গোছ গোলগাল হলেও পাতলা গোছের, রোদে পুড়ে তাতে তামাটে চকচকে কাঠের মতো একটা ভাব। কাজ করতে করতে ভুরুজোড়া কুঁচকিয়ে, জোরালো ভরাট কণ্ঠে যখন সে গাইত পচায়েভে যবন আক্রমণ আর ঈশ্বর জননী কর্তৃক পবিত্র মঠ রক্ষার সেই গানটা —

পচায়েভের দেয়াল পারে
সান্ধ্য আভা গেল নেমে,

তখন তার গলায় একাধারে আসত এমন একটা বিষণ্ণ হতাশা, মহিমা ও বলিষ্ঠ প্রতিরোধের ঝঙ্কার যে তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারত না নাতালিয়া, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত ভয়েভক্তিতে মন্ত্রমুগ্ধভাবে।

ওদের ছেলেপুলে ছিল না; আর নাতালিয়া তো বাপ-মা হারা। সুখদলীয় কোনো দম্পতির কাছে থাকলে তারা কখনো তাকে 'পুষ্যি মেয়ে' আবার কখনো 'ছিঁচকে চোর' বলে ডাকত, একদিন সোহাগ আর পরের দিন

গালিগালাজ। তার সঙ্গে ইউক্রেনীয় সেই দম্পতির ব্যবহার কিন্তু ছিল প্রায় নিস্পৃহ অথচ সঙ্গত। না ছিল তাদের অতিমাত্রায় কৌতূহল, না ছিল বকবকানি। হেমন্তে কালুগা থেকে শস্য কাটা আর মাড়াইয়ের জন্য ভাড়া করে আনা হত গুটি কতক কিশোরী আর বয়স্থাকে, ফুলকাটা রঙীন সারাফানের জন্য তাদের বলা হত 'খুকুমণি'। এই খুকুমণিদের সঙ্গ এড়িয়ে চলত নাতালিয়া: লোকে বলত ওদের চরিত্র খারাপ, কুৎসিত, নানা রোগে ওরা দুষ্ট, ভরাট-বুক, বেয়াড়া ও নির্লজ্জ তারা, খিস্তিখেউর আর অশ্লীল ছড়া কাটার বিরাম নেই, পুরুষদের মতো করে বসে পাগলের মতো ঘোড়া ছোটায়। পরিচিত পরিবেশে মনের কথা খুলে বলতে পারলে, অশ্রুজলে আর গানে, তার বিষাদ হয়ত কেটে যেত। কিন্তু এখানে মনের কথা বলার মতো কে বা আছে, কে বা আছে যার সঙ্গে গান গাওয়া যায়? কর্কশ গলায় খুকুমণিরা হয়ত গান ধরল একটা, আর বাকি সবাই সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিত তালকাটা চড়া গলায়, চলত চীৎকার আর শিস দেওয়া। নাচের ঠাট্টার ছড়া ছাড়া আর কিছু গাইত না শারি। আর মারিনা গান গাইলেও, হোক না কেন প্রেমের গান, চেহারাটা তার রয়ে যেত কঠোর, গর্বিত ও চিন্তায় বিষণ্ণ।

উইলো আমি পু'তেছিলাম জলের কিনারে
কুলকুল গভীর নদীর পারে, --

হতাশ করুণ স্বরে হয়ত সে আওড়াত, তারপর গলা নামিয়ে যোগ দিত কঠিন নিরাশায়:

নেইকো আমার
মনের মানুষ
ভালোবেসেছি যাকে...

আর নিরালায় নির্জনে অপরিতৃপ্ত প্রথম প্রেমের তিক্ত-মধুর বিষ ধীরে ধীরে আকণ্ঠ পান করল নাতালিয়া, জ্বালা সইল লজ্জা আর হিংসার, রাত্রে দেখা নানা শঙ্কিত মধুর স্বপ্নের, ধুধু স্তেপের নিঃশব্দ দিনে তাকে দগ্ধে দেওয়া কত ব্যর্থ কল্পনা আর আশার। থেকে থেকে অন্তরের জ্বালা মিলিয়ে গিয়ে আসত — মধুর কোমলতা, তীব্র আবেগ ও হতাশার জায়গায় বল্যতা, ওঁর কাছাকাছি নগণ্য, তুচ্ছভাবে থাকার বাসনা, ভালোবাসার কামনা, যে ভালোবাসা কখনো ধরা পড়বে না দুনিয়ার চোখে, কোনো দাবীদাওয়া বা প্রত্যাশা নেই যে ভালোবাসার। সুখদল থেকে আসা খবরাখবরে কিছুক্ষণের জন্য মনটা স্থির হয়ে যেত। কিন্তু অনেকদিন কোনো খবর না আসাতে সুখদলের জীবনযাত্রার মামুলি দিকটার কথা তার মনে রইল না — আর মনে হতে লাগল

সে জীবনটা কত সুন্দর, আর সে জীবনের প্রতি তার ব্যাকুলতা এত তীব্র যে নিজের নৈঃসঙ্গ আর বিষাদের ভার প্রায় অসহ্য হয়ে উঠল... তারপর হঠাৎ গের্ভাস্কার আবির্ভাব। সুখদলের সব খবর এক নিঃশ্বাসে তড়বড় করে জানালো তাকে, আধঘণ্টায় যা বলল সেটা বলতে অন্য লোকের গোটা দিনের বেশী লাগত, — সবকিছু বলল, এমনকি ঠাকুর্দাকে সেই 'মারাত্মক ধাক্কার' কথাটাও, তারপর দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করল:

— এবার চিরতরে বিদায় নিচ্ছি।

তারপর হতভম্ব নাতালিয়াকে প্রকাণ্ড চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টিতে পুড়িয়ে রাস্তায় যেতে যেতে ডেকে বলল:

— তোরও বোকামি ঝেড়ে ফেলার সময় হয়েছে! ওর তো বিয়ে হল বলে, আর মাগী হিসেবেও ওর কোনো কাজে তুই লাগবি না... ঘটে বুদ্ধিশুদ্ধি আন তুই।

আর তাই করল সে। ভয়াবহ খবরটা সইয়ে সামলে নিল — ঘটে বুদ্ধিশুদ্ধি ফিরে এল।

তারপর বিরস বিষণ্ণ দিনগুলো আর কাটে না যেন, দিনগুলো তীর্থযাত্রী স্ত্রীলোকদের মতো, যারা বড়ো রাস্তা হয়ে মন্থর পায়ে খামার পেরোয়, মাঝে মাঝে জিরোবার জন্য থেমে অনেকক্ষণ কথা বলে তার সঙ্গে, বলে ধৈর্য ধরো, পরমেশ্বরে আস্থা রাখো, পরমেশ্বরের

নামোচ্চারণ করে বিরস একটা অভিযোগের সুরে, বলে, সবচেয়ে বড়ো কথা হল: কিছু না ভাবাই।

— যাই ভাবো না কেন — আমাদের ভাবনা মতো তো কিছু হয় না, — তারা বলত, গাছের ছালের জুতো আবার বেঁধে নিয়ে, ফ্যাকাসে মুখ কুঁচকিয়ে অন্তহীন স্তেপের দিকে সখেদে তাকিয়ে। — ঈশ্বরের করুণা অপার... চুপিচুপি কয়েকটা পেঁয়াজ এনে দাও তো, এই তো লক্ষ্মী মেয়ে. .

এমন সব তীর্থযাত্রীও অবশ্য ছিল যারা তার পাপের কথা, পরলোকের কথা তুলে ধর্মভয় জাগাত তার মনে, ভয়াবহ নানা দুর্বিপাক ঘটার ভবিষ্যদ্বাণী করত। তখন একবার দুটো ভয়ংকর স্বপ্ন সে দেখে, বলতে গেলে একটার পর একটা। মনটা সর্বদা পড়ে থাকত সুখদলে,— গোড়ার দিকে সুখদলের কথা না ভাবা কঠিন ছিল বই-কি! — মাথায় ঘুরত তনিয়া দিদিমণি আর ঠাকুর্দার কথা, নিজের ভবিষ্যতের কথা, গণনা কবত তার বিয়ে হবে কিনা, আর হলে কবে এবং কার সঙ্গে হবে... ভাবনাচিন্তা অজান্তে একাকার হয়ে গেল স্বপ্নে একটি রাত্রে, পরিষ্কার দেখল ধুলোভরা উত্তপ্ত আর শশংক হাওয়ায় দামাল একটি সন্ধ্যায় দুটো বালতি হাতে জল আনতে পুকুরে দৌড়চ্ছে সে — হঠাৎ শুকনো কাদার

তালুতে চোখে পড়ল প্রকাণ্ডমাথা বিকট একটা বুড়ো বামন, ছিন্নভিন্ন টপবুট পায়ে, টুপি নেই, লাল উসকো-খুসকো চুল হাওয়ায় এলোমেলো, টকটকে লাল, বেল্ট-না-বাঁধা শার্ট হাওয়ায় উড়ছে পেছনে। 'মা গো, আগুন লেগেছে নাকি?' — ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে। গরম হাওয়ায় চাপা কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল বামনটাও: 'সর্বনাশ, সব খতম! ভয়ংকর মেঘ ঘনাচ্ছে! বিয়ের কথা ভুলেও ভাবিস না!..' অন্য স্বপ্নটি আরো ভয়াবহ: ফাঁকা, গরম একটা কুঁড়েঘরে দুপুরবেলায় সে দাঁড়িয়ে, বাইরে থেকে কে একজন দরজাটা বন্ধ করে রেখেছে শক্ত করে, সে রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষায় আছে কীসের যেন — হঠাৎ চুল্লির পেছন থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল একটা প্রকাণ্ড ছাই-রঙা ছাগল, পেছনের পায়ে দাঁড়িয়ে — সটান এল তার দিকে, উত্তেজনায় অশ্লীল, চোখদুটো জ্বলছে কয়লার টুকরোর মতো, আনন্দে পাগল আর কাকুতিমিনতিতে ভরা। 'আমি তোর নাগর!' — মানুষের গলায় চেঁচিয়ে দ্রুতপায়ে লাফাতে লাফাতে এল তার কাছে, পেছনের পায়ের ছোট ছোট খুরে চকিত খটখট শব্দ তুলে, তার-পর ঝপাং করে সামনের পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার বুকে...

এরকম স্বপ্নের পর বারান্দার খাটে লাফিয়ে উঠে

হৃৎপিণ্ডের দাপানিতে, অন্ধকারের আতঙ্কে আর এই ভাবনায় যে, কারো কাছে তার যাবার নেই, নাতালিয়া প্রায় মরে মরে।

— হে যীশু! হে ঈশ্বর জননী! দোহাই তোমাদের মুনি ঋষিরা! — তাড়াতাড়ি ফিসফিসিয়ে বলে উঠত সে।

কিন্তু যে সব মুনি ঋষিদের কথা মনে হত তারা সবাই সেণ্ট-মার্কিউরির মতো কবন্ধ আর ঘোর তামাটে রঙের, আতঙ্ক তাই বেড়ে যেত।

পরে স্বপ্নগুলোর কথা ভেবে দেখাতে মনে হল তার যৌবন বিগত, কপালে যা ঘটবার তার নড়চড় হবে না কখনো, — মনিবকে ভালোবাসার মতো অসাধারণ ঘটনা ঘটেছে তার বেলায়, এটা খামোকা! — সামনে আরো অনেক বাধা বিপদ, তার উচিত ইউক্রেনীয় দম্পতির সংযম ও তীর্থযাত্রী স্ত্রীলোকদের সহজ বিনয় অনুকরণ করা। আর নিজেদের কল্পিত কিছু একটা ভবিতব্য বলে ধরে নিতে, নাটকীয় ভূমিকায় নিজেদের দেখতে সুখদলবাসীরা ভালোবাসে বলে নাতালিয়াও নিজের জন্য বেছে নিল একটা ভূমিকা।

৮

সেণ্ট-পিটার দিবসের আগের দিন সন্ধ্যায় প্রবেশপথে দৌড়িয়ে এসে যখন নাতালিয়া বুঝল যে তাকেই নিতে

এসেছে বদ্বলিয়া, চোখে পড়ল স্বখদলের ধ্বলিধ্বসর ছাকড়া গাড়িটা আর উসকো-খ্বসকো মাথায় জীর্ণ টুপি, রোদে চকচকে জটপাকানো দাড়িওয়ালা ক্লান্ত ও উত্তেজিত বদ্বলিয়ার ম্বখ, সে ম্বখ অকালে ব্বড়ো আর কুৎসিত হয়ে গিয়েছে, এমনকি বেমানান ও হীন ম্বখাবয়বের জন্য অদ্ভুত হয়ে দাঁড়িয়েছে, যখন দেখল শ্বধ্ব বদ্বলিয়া নয়, স্বখদলের সবাইকার মতো দেখতে সেই ঝাঁকড়া লোম ব্বড়ো কুকুরটা, যার পেছন দিকটা নোংরা ছাই রঙের, ব্বক আর ঘাড় যেন চিমনিবিহীন কুঁড়েঘরের ধোঁয়া আর ঝুলিতে কালো হয়ে গিয়েছে, তখন আনন্দে নাতালিয়ার হাঁটু দ্বমড়ে যাবার জোগাড়। কিন্তু তাড়াতাড়ি নিজেকে সে সামলে নিল। স্বখদলের পথে বদ্বলিয়া উদ্দেশ্যহীন ভাসা-ভাসাভাবে বকবক করে চলেছে ক্রাইমিয়ার য্বদ্ধের কথা, একবার য্বদ্ধটা নিয়ে মহাখ্বশি আবার পরম্বহ্বর্তে বেজার, নাতালিয়া ব্বদ্ধিমানের মতো মন্তব্য করল:

— যাই বল, ওদের বেশ একটা শিক্ষা দেওয়া তো আমাদের উচিত, ফরাসীদের কথা বলছি...

বহ্বদ্বরে স্বখদলে যেতে যেতে সারা দিন তার মনে অদ্ভুত একটা অন্বভূতি — নতুন চোখে দেখল প্বরনো পরিচিত সব জিনিস, আগেকার বাসার কাছাকাছি এসে

আবার ফিরে আসছে তার আগেকার জীবন, চোখে পড়ছে আশেপাশে কত না অদলবদল, চেনা মুখ। বড়ো রাস্তাটা যেখানে মোড় ঘুরে চলে গিয়েছে সুখদলে সেখানে হলদে ফুলে ভরা ফেলে রাখা জমিতে ছুটোছুটি করছে দু'বছর বয়সের একটা ঘোড়া। একটি ছেলে দড়ির লাগামটা খালি পা দিয়ে মাটিতে চেপে ঘোড়াটার ঘাড় আঁকড়ে অন্য পা দিয়ে লাফিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে পিঠে, কিন্তু ঘোড়াটা নারাজ, লাফালাফি করে ঝাঁকিয়ে ফেলছে তাকে। ছেলেটি ফম্‌কা পান্তিউখিন, চিনতে পেরে নাতালিয়ার সে কী আনন্দ! তারপর দেখল একশ' বছরের বুড়ো নাজারুশ্‌কাকে। ফাঁকা গাড়িতে বসে আছে পুরুষের মতো করে নয়, স্ত্রীলোকের মতো, --- পাদুটো সটান সামনে ছড়িয়ে, — আড়ষ্ট দুর্বলভাবে উঁচু হয়ে আছে কাঁধ, চোখজোড়া করুণ বিষণ্ণ, নিষ্প্রভ; এত রোগা যে 'কফিনে রাখার পদার্থ নেই আর', মাথায় টুপি নেই, জীর্ণ লম্বা কামিজটা চুল্লির তাকে অনবরত শুয়ে শুয়ে ঝুলকালিতে রঙচটা নীলচে। আর নাতালিয়ার বুকটা শিঁটিয়ে উঠল তিন বছর আগেকার সেই ঘটনাটা মনে করে, — সব্জীবাগানে একটা মুলো চুরি করে হাতেনাতে ধরা পড়েছে নাজারুশকা, সেই দুর্লভ দয়ালু ও দিলদরিয়া মানুষ আর্কাদি পেত্রভিচের ইচ্ছে তাকে

চাবকানো, ভয়ে আধমরা বুড়ো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে, চারপাশে জমায়েত চাকরবাকর হো হো করে হাসছে আর চেঁচাচ্ছে:

— আর কী হবে, দাদু, কান্না থামাও! মনে হচ্ছে পেণ্টুলেনটা খুলে ফেলতে হবে! রেহাই পাবে না তুমি!

গাঁয়ের চারণ-ভূমি, কুঁড়েঘরের সারি — আর জমিদার বাড়ি: বাগান, বাড়ির উঁচু ছাদ, চাকরদের মহলের খিড়কির দেয়াল, গোলাঘর আর আস্তাবল এবার চোখে পড়াতে বুক কী ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। দেয়াল, উঁচু ঘাস আর কাঁটা গাছের কাছ ঘেঁষে এসেছে শস্যফুলের ঘন ছোপ ধরা হলদে রাইক্ষেত; সাদা তামাটে ছোপের একটা বাছুর জইক্ষেতের গভীরে দাঁড়িয়ে শস্যফুল চিবিয়ে চলেছে। সবকিছু, শান্তিময়, সহজ সাধারণ -- যাকিছু অসাধারণ, যাকিছু, ব্যাকুলতা শুধু তার মনে, গাড়িটা গড়গড়িয়ে ঢুকল চওড়া আঙিনায়, এখানে-ওখানে ঘুমন্ত দৌড়বাজ কুকুরের সাদা সাদা ছোপ, কবরখানায় পাথরের সাদা ফলক যেন, দু'বছর পর মোমবাতি আর লাইমফুলের প্রিয় গন্ধমাখানো ঠাণ্ডা সেই বাড়িটায় যখন সে ঢুকল, সেই ভাঁড়ার ঘর, সামনের হলে বেঞ্চের ওপরে পড়ে আছে আর্কাদি পেত্রভিচের কসাক জিনসাজ, জানলায় ভারুই পাখিগুলোর শূন্য খাঁচা, —

আর ঠাকুর্দার ঘর থেকে হলের কোণে স্থানান্তরিত সেণ্ট-মার্কিউরির মূর্তিটা ভীতভাবে দেখে তার মন একেবারে অসাড় হয়ে গেল...

বাগান থেকে রোদের ঝলক ছোট ছোট জানলা দিয়ে ঢুকে অন্ধকার হল-ঘরটাকে ঠিক আগেকার মতো খুশিতে আলো করে দিয়েছে। একটা মুরগীর ছানা ভুলক্রমে বাড়িতে ঢুকে পড়ে এখন ড্রয়িং-রুমে ঘুরে ঘুরে অসহায় ভাবে ডাকছে। লাইমফুল শুকিয়ে গিয়ে জানলার উত্তপ্ত উজ্জ্বল ধারিতে সৌরভ ছড়াচ্ছে.. মনে হল তার চারিপাশের সমস্ত পুরনো জিনিসের বয়স কমে গিয়েছে, এরকমটা সাধারণত মনে হয় সেই বাড়িতে যেখানে সবে কেউ মারা গিয়েছেন। সবকিছুতে, সমস্ত কিছুতে — বিশেষ করে ফুলের গন্ধে — মনে হল লেগে আছে তার আপন সত্তার, তার শৈশব, কৈশোর, প্রথম প্রেমের রেশ। আর দুঃখ হল তাদের কথা ভেবে যাদের বয়স হয়েছে, যারা মৃত, যারা বদলে গেছে — দুঃখ হল নিজের জন্য, তনিয়া দিদিমণির জন্য। সমবয়সী বন্ধুদের বয়স হয়েছে, মাঝে মাঝে চাকরদের মহলের দোরগোড়া থেকে বাইরের পৃথিবীর দিকে বিরস দৃষ্টিতে তাকাত যেসব বুড়োবুড়ী, বয়সের দরুন নড়বড় করত যাদের মাথা, তাদের অনেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে ইহলোক থেকে।

দারিয়া উস্তিনভ্না আর নেই। ঠাকুর্দা বিদায় নিয়েছেন, সেই ঠাকুর্দা যিনি মৃত্যুকে ভয় পেতেন ছেলেমানুষের মতো, ভাবতেন মরণ আসবে আস্তে আস্তে, ভয়াল মুহূর্তের জন্য প্রস্তুতির সময় দিয়ে, আর মৃত্যু ভেঙে পড়ল তাঁর মাথায় কী অপ্রত্যাশিত আচমকা। বিশ্বাস করা কঠিন তিনি নেই। চোর্কিজভো গাঁয়ে গির্জার কাছাকাছি একটা মাটির স্তূপের নীচে পচে গেছে সাক্ষাৎ তাঁরই দেহ। বিশ্বাস করা কঠিন যে এই কালো, রোগা, চোখানাক মহিলাটি, যিনি এ মুহূর্তে উদাসীন, পরমুহূর্তে উন্মত্ত, অস্থির বকুনতুড়ে যিনি মাঝে মাঝে তার সঙ্গে সমকক্ষের মতো খোলাখুলি বাক্যালাপ করেন, আবার মাঝে মাঝে তার চুল টেনে ছিঁড়ে দেন, -- তিনিই হলেন তনিয়া দিদিমণি। কালো গোঁফের রেখা মুখে বেঁটেখাটো ঝগড়ুটে জনৈক ক্লাভদিয়া মার্কভনা বাড়ি দেখাশোনা কেন যে করছেন বোঝা ভার... একদিন সভয়ে তাঁর শোবার ঘরে তাকিয়ে নাতালিয়া দেখল রুপোর ফ্রেমে বসানো সর্বনেশে সেই আয়নাটা -- আর বুকটা মুচড়িয়ে উঠল মধুর ব্যথায়, তার পুরনো সব আতঙ্ক, আনন্দ, স্নিগ্ধতা, অপমান আর স্বর্গসুখের প্রত্যাশা, গোধূলির আলোয় শিশিরসিক্ত চোরকাঁটার গন্ধ আচ্ছন্ন করে দিল তাকে... কিন্তু নিজের সমস্ত অনুভূতি আর

চিন্তাভাবনাকে গোপন রাখত সে, চেষ্টা করত তাদের দাবিয়ে রাখার। তার শিরায় শিরায় প্রবাহিত প্রাচীন, অতি প্রাচীন সুখদলের রক্তধারা! সাদামাটা সেই রুটি যা খেয়ে সে মানুষ হয়েছে, সুখদলের চারিপাশে কাদাটে মাটিতে যার উৎস। সাদামাটা সেই জল যা সে খেয়েছে পুকুর থেকে, যে সব পুকুর শুকিয়ে যাওয়া নদীগর্ভ খুঁড়ে এককালে বানিয়েছিল তার পূর্বপুরুষেরা। হাড় ভাঙা গতানুগতিককে ডরায় না সে — ভয় পায় শুধু সেটাকে যেটা গতানুগতিক নয়। মৃত্যুভয়ও তার নেই: কিন্তু স্বপ্ন, রাত্রির অন্ধকার, ঝড়, বিদ্যুৎ আর — আগুন, সারা শরীর তার ভয়ে থরথরিয়ে উঠত। আর বুকের কাছে শিশুর মতো কী একটা অমোঘ সর্বনাশের প্রতীক্ষা বহন করত সে...

তাকে বুড়িয়ে দেয় এই প্রত্যাশা। নিজেকে সে বারবার বোঝাত যে যৌবন পার হয়ে গিয়েছে, সবকিছুতে খুঁজত বিগত যৌবনের আভাস! আর ফিরে আসার পর বছর কাটতে না কাটতে সেই যৌবনসুলভ অনুভূতিটার লেশমাত্র রইল না, যে অনুভূতি নিয়ে আবার সুখদলের দোরগোড়া সে পেরিয়েছিল।

ক্লাভদিয়া মার্কভনার একটি সন্তান হল। হাঁসমুরগী দেখা-শোনার ভার যার ওপরে সেই ফে-

দাসিয়ার পদোন্নতি হল, সে হল আয়া; বয়স কম হলে কী হয়, বার্ধক্যের কালো পোষাক গায়ে চাপিয়ে সে একটা দীনহীন ধর্মভীরু ভাব আনল চেহারায়। নতুন ক্রুশচভের মুখে লালা ঝরে ভুরভুরি কাটে, মাথার ভারে অসহায় টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, চেঁচায় তারস্বরে, দুধ-রঙা, অভিব্যক্তিহীন চোখ মেলে ঠিকমতো তাকাতে পারে না। অথচ তাকে দাদাবাবু বলে ডাকতে শুরু করেছে লোকে — আর ছোটদের ঘর থেকে শোনা যায় অনুচ্চকণ্ঠে সেই আদ্যিকালের শাসানি:

— ওই এল, ওই এল ঝোলাহাতে বুড়োটা... চলে যা বলছি বুড়ো, চলে যা। আসিস না আমাদের কাছে, দাদাবাবুকে নিয়ে যেতে দেব না তোকে; দাদাবাবু লক্ষ্মী ছেলে, আর কাঁদবে না...

আর নাতালিয়া নকল করত ফেদাসিয়াকে, মনে করত সে নিজেও আয়া — রুগ্ণা দিদিমণির আয়া ও সঙ্গী। সে শীতে দেহ রাখলেন ওলগা কিরিলভনা — চাকরদের মহলে যেসব বুড়ীরা জীবনের শেষ দিনগুলো গুনছে তাদের সঙ্গে অন্ত্যেষ্টিতে যাবার অনুমতি পেয়ে গেল নাতালিয়া, সেখানে বিস্বাদ, বেজায় মিষ্টি ময়দার হালুয়া খেয়ে গা ঘুলিয়ে উঠল তার, সুখদলে ফিরে, ভাবাবেগে পূর্ণ একটা বর্ণনা দিল, 'মৃত্যুশয়ানে কেমন

জীবন্ত দেখাচ্ছিল' কর্ত্রীকে, যদিও সেই বীভৎস দেহরাখা কফিনটার দিকে তাকাবার সাহস এমনকি বুড়ীগুলোর পর্যন্ত হয় নি।

বসন্তকালে চের্মাশ্নয়ে গ্রাম থেকে একটি ওঝাকে আনা হল তনিয়া দিদিমণিকে দেখার জন্য — সে হল ডাকসাইটে ক্লিম ইয়েরখিন, সমৃদ্ধ জোতদার, ভারিক্কি সুন্দর চেহারার মানুষ, দীর্ঘ ধূসর দাড়ি, কোঁকড়ানো পাকধরা চুল মাথার মাঝখানে টেরি কাটা; চাষী হিসেবে বেশ দক্ষ, রোগশয্যার পাশে পিশাচসিদ্ধ ব্যক্তিতে নিজেকে রূপান্তরিত না করা পর্যন্ত তার কথাবার্তা বেশ যুক্তিসঙ্গত ও মোটের ওপর খোলাখুলি। পোষাক-আসাক অত্যন্ত টেকসই আর পরিচ্ছন্ন — ইস্পাতধূসর মোটা পশমের পদ্দিওভ্কা, লাল পেটি একটা আর টপবুট। ছোট চোখজোড়া সেয়ানা আর তীক্ষ্ণ সুগঠিত দেহ একটু নুইয়ে বাড়িতে ঢুকে কাজের কথা শুরু করার সময় চোখদুটো ধর্মভীরুভাবে খুঁজত আইকনগুলোকে। শুরু করত ফসল, বৃষ্টি আর অনাবৃষ্টির কথা দিয়ে, তারপর অনেকক্ষণ ধরে পরিচ্ছন্নভাবে চলত চা-পান, তারপর বুকে আবার ক্রুশচিহ্ন করে তখন শুধু গলার স্বর নিমেষে বদলে জিজ্ঞেস করত রোগীর বিষয়ে।

— গোধূলি... রাত্রি নামছে... সময় হয়েছে, — শুরু করত রহস্যভরা গলায়।

গোধূলির আলোয় শোবার ঘরে বসে তনিয়া দিদিমণি অপেক্ষা করতেন কখন ক্লিমকে দেখা যাবে দোরগোড়ায়, জ্বরে শরীর ঠকঠক করে কাঁপছে, যেকোনো মুহূর্তে মেঝেতে ধপাস করে পড়ে খিঁচুনি শুরু হতে পারে। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে নাতালিয়ারও সর্বাঙ্গ ভয়ে অসাড়। সারা বাড়িটা চুপ মেরে গেছে — এমনকি কর্ত্রী পর্যন্ত ঘর ভর্তি ঝিদের সঙ্গে ফিসফিসিয়ে কথা চালিয়েছেন। বাতি জ্বালাবার বা জোরে কথা বলার সাহস নেই কারো। দরকারমতো ক্লিমের ফরমাশ খাটার জন্য বারান্দায় সতর্ক দাঁড়িয়ে থাকা সেই হাসিখুসি ভাবনাচিন্তাহীন সলশ্‌কার চোখ গেল ঝাপসা হয়ে, বুকে হাতুড়ির ঘা। কয়েকটা মন্ত্রসিদ্ধ হাড় রুমাল থেকে বের করতে করতে সামনে দিয়ে গেল ক্লিম। তারপর সেই মৃত্যুস্তব্ধতা দীর্ণ হল শোবার ঘর থেকে আসা তার জোরালো, অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে:

— ওঠো, ঈশ্বরের বাঁদী!

তারপর দরজা থেকে পাকাচুল মাথা বাড়িয়ে নিষ্প্রাণ সুরে বলল:

— সেই তক্তাটা।

মেঝেতে তক্তা পেতে তার ওপর দাঁড় করানো হল মৃত্যুহিম, আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখ তানিয়া দিদিমণিকে। এত অন্ধকার তখন যে ক্লিমের মুখ প্রায় দেখতে পাচ্ছে না নাতালিয়া। আর হঠাৎ অদেহী, ভূতুড়ে গলায় সে সুর করে বলতে লাগল:

— ফিলাৎ আসছে. . জানলাগুলো ও খুলবে... হাট করে খুলে দেবে দরজাগুলো... চীৎকার করে বলবে: মনপুড়ানি, মনপুড়ানি!

আকস্মিক শক্তিতে, প্রভুত্বব্যঞ্জক ভয়ংকর গলায় চেঁচিয়ে উঠল ক্লিম:

— মনপুড়ানি মনপুড়ানি! সর্বনেশে, মনপুড়ানি, তুই চলে যা নীচের অন্ধকার বনে, সেখানে তোর স্থান! চলে যা সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে; — এবার তার অনুচ্চকণ্ঠ হল ক্ষিপ্র, কর্কশ ও ভয়ংকর, — ঝোড়ো বুয়ান দ্বীপ জল থেকে উঠেছে, তার ওপরে শুয়ে আছে একটা হোঁৎকা মাদী কুকুর, বিকট তার পিঠে ঘন ধূসর লোম...

আর নাতালিয়ার মনে হল এর চেয়ে বীভৎস কথা হতে পারে না কখনো, শব্দগুলো নিমেষে তার আত্মাকে নিয়ে গেল বন্য, উপকথায় বর্ণিত, আদিম কর্কশ কোনো পৃথিবীর সীমানায়। শব্দগুলির যাদুমন্ত্রে অবিশ্বাস

করা অসম্ভব, ঠিক যেমন ক্লিমের পক্ষে অসম্ভব, মনের ব্যামো যাদের, তাদের তো এ সব শব্দের সাহায্যে অলৌকিকভাবে মাঝে মাঝে সারায় ক্লিম, — সেই ক্লিম যে পিশাচসিদ্ধ ক্রিয়ার পর হলে বসে কথা বলে কত সহজ বিনয়ে, রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে আবার চা খেতে শুরু করে:

— যাক, আরো দুটো রাত্তির... তারপর ভগবানের কৃপায় হয়ত উনি আগের চেয়ে ভালো বোধ করবেন... এ বছরে বাক হুইট কিছু বুনেছেন নাকি, ঠাকরুন? লোকে বলছে এ বছরে ফলেছে ভালো! বেজায় ভালো!

দাদাবাবুদের ক্রাইমিয়া থেকে গ্রীষ্মকালে ফেরার কথা। কিন্তু রেজিস্টারি চিঠিতে আর্কাদি পেত্রভিচ আরো টাকা চেয়ে পাঠালেন, জানিয়ে দিলেন হেমন্তের আগে ফিরতে পারবেন না — কেননা পিওত্র পেত্রভিচ অল্প জখম হলেও অনেক দিন তাঁকে শুয়ে থাকতে হবে। তাঁর আরোগ্য হবে কিনা জানার জন্য লোক পাঠানো হল চের্কিজভোর সেই দৈবজ্ঞ মেয়েমানুষটি দানিলভনার কাছে। নেচে নেচে আঙুল মটকাতে লাগল দানিলভনা, তার মানে অবশ্য: আরোগ্য হবে। কর্ত্রী সান্ত্বনা পেলেন। আর তনিয়া দিদিমণি ও নাতালিয়ার সে নিয়ে গরজ

ছিল না। গোড়ার দিকে একটু ভালো বোধ করেছিলেন তনিয়া দিদিমণি, কিন্তু সেণ্ট-পিটার দিবসের মুখে আবার যে কে সেই: সেই মনমরা ভাব, ঝড় বিদ্যুৎ, আগুন আর গোপন আরেকটা কিসের মনপুড়ানি এত নিদারুণ যে ভাইদের নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর হল না তাঁর। মাথা ঘামাবার মতো মনের অবস্থা নাতালিয়ারও ছিল না। প্রার্থনার সময় পিওত্র পেত্রভিচের কথা ভুলত না সে, কামনা করত তাঁর দ্রুত আরোগ্য, যেমন পরে আমরণ সে প্রার্থনা করেছিল তাঁর অবিনশ্বর আত্মার জন্য। কিন্তু এখন তার কাছে সবচেয়ে বড়ো জিনিস হল তনিয়া দিদিমণি। আর যত দিন যায় তত তনিয়া দিদিমণি তার মধ্যে সংক্রামিত করে দিতে লাগলেন তাঁর সেই আতঙ্ক, সর্বনাশের প্রত্যাশা — আর সেই জিনিসটার পূর্বাভাস, যেটার কথা তিনি গোপন করে রেখেছিলেন।

শুকনো, ধুলোভরা আর হাওয়ায় দামাল সেবারের গ্রীষ্মকাল, প্রতিদিন ঝড় বিদ্যুৎ। ভাসা-ভাসা আর ভয় জাগানো কানাকানির বিরাম নেই — নতুন একটা লড়াই বেধেছে নাকি, সিপাইবিদ্রোহ আর অগ্নিকাণ্ডের কানাঘুষো। কেউ বলছে যে সমস্ত ভূমিদাসদের ছেড়ে দেওয়া হল বলে, কেউ বা বলছে তা নয় মোটে,

হেমন্তকালে ওদের সবাইকে যোগ দিতে হবে সৈন্যবাহিনীতে। আর বরাবরকার মতো, গ্রীষ্মকালে ভবঘুরে, বোকাহাবা আর সাধুদের ভিড় লেগে গেল। তাদের রুটি আর ডিম দেওয়া নিয়ে তনিয়া দিদিমণি কর্ত্রীর সঙ্গে হাতাহাতি করেন আর কি। লম্বা, লালচুল দ্রনিয়াও এসে হাজির, জামাকাপড় এত ছেঁড়া যে বর্ণনা করা যায় না। লোকটা আসলে মাতাল কিন্তু ভাবটা সাধুর। চিন্তামগ্নভাবে উঠান হয়ে সটান বাড়ির দিকে আসতে গিয়ে দেয়ালে মাথা ঠুকে যাওয়াতে আনন্দোজ্জ্বল মুখে লাফিয়ে পেছন হটে গেল।

— লক্ষ্মী পাখিরা আমার! — লাফিয়ে সমস্ত শরীর বেঁকিয়ে. রোদ থেকে মুখ ডান হাতের আড়াল করে চড়া গলায় চেঁচিয়ে উঠল। — চল ওড়া যাক, উড়ে একেবারে স্বর্গে যাওয়া যাক, পাখিসব আমার!

আর নাতালিয়া তাকিয়ে রইল তার দিকে, সাধুদের দিকে যেভাবে তাকানো উচিত সেভাবে, অন্য সব মেয়েদের মতো: নিষ্প্রভ করুণামাখা চোখে। এদিকে তনিয়া দিদিমণি তীরের মতো জানলায় হাজির হয়ে কাঁদতে কাঁদতে করুণ গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন:

— আহা, সাধুবাবা! আমার জন্য প্রার্থনা করো, এই পাতকীর জন্য মন্ত্র পড়ো!

চীৎকারটা শুনে ভয়াবহ কী একটা পূর্ববোধে নাতালিয়ার চোখদুটো নিশ্চল হয়ে গেল।

ক্লিচিনো গ্রাম থেকে তিমশা ক্লিচিনস্কিও এসে জুটত। বেঁটে খাটো, মেয়েদের মতো নধর, বড়ো বড়ো বুক ছোট্ট মানুষটা, হলদেটে চুল, মেদে অসাড় রুদ্ধশ্বাস টেরা বাচ্চার মতো মুখ। পরনে সাদা কালিকোর শার্ট, কালিকোর খাটো পেণ্টুলেন; লঘু পায়ে তাড়াতাড়ি প্রবেশ পথে এসে আঙুল এগিয়ে গোলগাল ছোটখাটো পা তাড়াহুড়ো করে আলতোভাবে রাখল, সরু ছোট চোখের ভাবটা যেন এইমাত্র তাকে পাতাল থেকে বা অন্য কোনো নিদারুণ দুর্বিপাক থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

— সর্বনাশ! — রুদ্ধশ্বাসে অনুচ্চকণ্ঠে বলে উঠল। — সর্বনাশ...

ওকে সান্ত্বনা দিয়ে খাইয়ে লোকে বসে রইল, কী বলে শোনার প্রতীক্ষায়। কিন্তু মুখে কোনো কথা নেই তার, ঘোঁৎঘোঁৎ হাঁসফাঁস করছে শুধু খাবার নিয়ে। পেট পুরে খেয়ে, থলেটা কাঁধে আবার ঝুলিয়ে লম্বা লাঠিটার জন্য অস্থিরভাবে তাকাতে লাগল এপাশ-ওপাশ।

— তুমি আবার কবে আসছ, তিমশা? — চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তনিয়া দিদিমণি।

আর সেও জবাব দিল চেঁচিয়ে বিদ্‌ঘুটে উঁচু মেয়েলী গলায়, কেন জানি তনিয়া দিদিমণির নামটা বিকৃত করে:

— ইস্টার রবিবারের আগের হপ্তায়, লুকিয়ানভনা!

চলমান লোকটির পিছু ডেকে অতিদুঃখে কাঁদতে লাগলেন তনিয়া দিদিমণি:

— সাধুবাবা, এই পাতকী, মিসরীয় মেরির জন্য প্রার্থনা করো ভগবানের কাছে!

রোজ একটা না একটা দারুণ দুঃসংবাদ আসে — প্রচণ্ড ঝড় বা অগ্নিকাণ্ডের খবর। আর সুখদলে উত্তরোত্তর বেড়ে যায় আগুনের আদিম আতঙ্ক। পেকে-আসা শস্যের বালুকা-হলুদ সমুদ্রে হয়ত ছায়া পড়ল জমিদার বাড়ির পেছনে উদ্যত ঝড়ো মেঘের, চারণ-ভূমি হয়ে ছুটে এল দমকা হাওয়া, শোনা গেল বজ্রের প্রথম গুরুগুরু ধ্বনি, সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা ছুটবে বাড়িতে কালো কাঠের আইকনগুলো বের করে আনতে আর দুধের ঘটি ঠিক করে রাখতে — সবাই তো জানে এ সব হল আগুনের সেরা তুকতাক। জমিদার বাড়ি থেকে একটার পর একটা কাঁচি উড়ে পড়বে বিছুটি ঝাড়ে, সরিয়ে নেওয়া হবে পূত ভয়ঙ্কর তোয়ালেটা, জানলাগুলো ঢাকা পড়বে পর্দায়, কম্পিত হাতে জ্বালানো হবে মোমবাতি... এমনকি কর্ত্রীর মনে পর্যন্ত ছোয়াচ লাগে আতঙ্কের, সত্যি লাগে

হয়ত, কিম্বা হয়ত লাগার ভাণ করেন। আগে আগে তিনি বলতেন ঝড় বিদ্যুৎ — 'প্রাকৃতিক ঘটনা'। আর এখন বিদ্যুতের প্রতি ঝলকে তিনি ক্রুশচিহ্ন করে শক্ত করে চোখ বুজে হাঁপান, নিজের এবং অন্যদের ভয় বাড়ানোর জন্য বলে যান একটি অদ্ভুত ঝড়ের কথা, যে ঝড়ে ১৭৭১ সালে টিরলে একশ' এগারো জন লোক তখ্খুনি মারা পড়ে। আর তার কাহিনীটি জোরালো করে অন্যেরা — তাড়াতাড়ি নিজেদের নানা গল্প জোগায়: বাজ পড়ে বড়ো রাস্তার উইলো গাছটা পুড়ে গিয়েছিল, চেকিজভোতে একটি স্ত্রীলোক মারা যায় বজ্রাঘাতে, একটি ত্রয়কায় এত জোর বাজ লেগেছিল যে তিনটে ঘোড়াই হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়... শেষ পর্যন্ত তাদের এই অসুস্থ ধ্যান-ধারণায় যোগ দিল ইউশ্কা বলে একটি লোক, যে নিজেকে বলত 'ভ্রান্ত সাধু'।

৯

চাষীর পরিবারে ইউশ্কার জন্ম। কিন্তু জীবনে সে কাজের জন্য কড়ে আঙুলটি নাড়ায় নি কখনো; ভবঘুরের মতো থাকত, কেউ খেতে পরতে দিলে প্রতিদানে বলত নিজের নিছক কুঁড়েমি আর

'কুব্যবহারের' নানা কাহিনী। — 'চাষীর ছেলে বটে, দোস্ত, কিন্তু চালাক চতুর লোক আমি, দেখতে কুঁজোর মতো, — সে বলত। — তাই খাটুনির দরকারটা কী আমার!'

আর সত্যি তাকে দেখতে কুঁজোর মতো, — চোখজোড়ায় বুদ্ধি ব্যঙ্গের ছাপ, মুখে দাড়িগোঁফের বালাই নেই, বুকের খাঁচা রিকেটগ্রস্ত বলে কাঁধ উঁচিয়ে রাখে, নখ কামড়ে, পাতলা শক্ত আঙুলে বারবার লম্বা তামাটে চুল পেছন দিকে বিলি কাটে। চাষবাস 'অভব্য আর বিরক্তিকর' ব্যাপার ভেবে কিয়েভ মঠে আশ্রয় নেয়, সেখানে 'বুদ্ধি পাকিয়ে' — শেষাশেষি 'কুব্যবহারের' জন্য বিতাড়িত হয়। তারপর তার হৃদয়ঙ্গম হল মোক্ষ প্রয়াসী ধার্মিক তীর্থযাত্রীর ভূমিকাটা, — বড়ো পুরনো চাল, হয়ত ওতে ফয়দা হবে না কোনো; তাই খেলল আর একটা চাল: জোব্বা না ছেড়েই নিজের আলসেমি আর কামুকতার জাহির আর বড়াই চলল, আর যত পারে ধূমপান আর মদ্যপান, — কখনো নেশা হত না তার, — মঠ নিয়ে মস্করা করে, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিত কেন ওখান থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

— অবশ্য, — চোখ ঠেরে চাষীদের সে বলত, — ওটার জন্য তখ্খুনি অবশ্য বের করে দেয় আমাকে, ভগবানের

এ দাসকে। আর তাই নিজের দেশ, রাশিয়াতে ফিরে এলাম... ভাবলাম পথে বসব না!

আর পথে যে বসল না — তা ঠিক: মোক্ষলাভ নিয়ে যারা ব্যস্ত তাদের যেমন সাদর অভ্যর্থনা জানায় রাশিয়া ঠিক তেমনি জানাল এই নির্লজ্জ পাপী-টিকে: মিলল খাওয়াপরা, রাতের ঠাঁই, আর মুগ্ধ শ্রোতা।

— আর তাই বুঝি কখনো কাজ করবে না বলে দিব্যি গাললে? — চাষীরা জিজ্ঞেস করত, রোমাঞ্চকর গোপন কথার প্রত্যাশায় চোখগুলো তাদের চকচকে।

— স্বয়ং শয়তান আমাকে দিয়ে কাজ করাক দেখি! — জবাব দিল ইউশ্‌কা। — আমি গোল্লায় গেছি, ভাই! আমার ভেতরে যা পাপ মঠের ছাগলেরও তা নেই। ছুঁড়ীগুলো — মাগীগুলোতে আমার একদম অরুচি! — আমাকে যমের মতো ডরায় বটে, কিন্তু ভালোবাসতে ছাড়ে না। আর বাসবেই না কেন! লোকটা তো আমি খারাপ নই: দেখতে না হয় খারাপ, কিন্তু আসল মাল আছে ভেতরে।

সুখদলে পেঁছিয়ে, ঝানু লোক তো, সে সটান গেল জমিদার বাড়িতে, হল-ঘরে। সেখানে বেঞ্চে বসে নাতালিয়া গুণগুণ করে গাইছিল: 'মেঝেতে সেদিন

দিচ্ছি ঝাড়, পেলুম টুকরো শর্করার...' ওকে দেখে ভয়ে চমকে উঠল:

— কে তুমি? — চেঁচিয়ে বলল সে।

— মানুষ, — এক নজরে তার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল ইউশ্‌কা। — মা ঠাকরুনকে খবর দে।

— কে রে? — ড্রয়িং-রুম থেকে চেঁচিয়ে কর্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন।

কিন্তু নিমেষে তাঁর ভয় ঘোচাল ইউশ্‌কা। বলল যে সে ভূতপূর্ব সাধু, তিনি যে ভেবেছেন পালিয়ে-আসা সৈনিক তা নয়, এখন দেশে ফিরছে — বলল তাকে খানাতল্লাস করে পরে যেন রাত্তিরটা কাটিয়ে একটু জিরিয়ে নেবার অনুমতি দেন। তার খোলাখুলি কথাবার্তায় কর্ত্রী এত বিমোহিত হয়ে গেলেন যে, পরের দিনই সে চাকরদের মহলে জুটে গিয়ে দিব্যি বাড়ির লোকের মতো থেকে গেল। বাজপড়া ঝড় সমানে হতে লাগল বটে, কিন্তু গৃহকর্ত্রীদের মনোরঞ্জনের জন্য গল্প বলে সে চলল অক্লান্তভাবে, বাজপড়ার হাত থেকে ছাদটা বাঁচাবার জন্য বাইরের জানলাগুলোয় কাঠ লাগাবার ফন্দি বের করল সে, ভীষণ বজ্রপাতের মধ্যে ছুটে যেত প্রবেশপথে, এমন কিছু বিপদ নেই সেটা দেখানো চাই। আর চাকরানীদের সাহায্য করত সামোভার জ্বালাতে।

চাকরানীরা ভুরু কোঁচকাত, তাদের দিকে ওর ক্ষিপ্র কামুক দৃষ্টির বিষয়ে সজাগ তারা, কিন্তু ওর মস্করায় হাসত, ওর দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহস ছিল না নাতালিয়ার; অন্ধকার বারান্দায় তাকে দেখে কয়েকবার ইউশ্‌কা তাড়াতাড়ি ফিসফিসিয়ে বলেছে: 'তোর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি একেবারে!' দেখলে ঘেন্না হত নাতালিয়ার; সারা জোব্বাটায় বাজে তামাকের ঝাঁঝালো গন্ধ, কী ভীষণ লোকটা, কী ভীষণ...

কি ঘটবে স্পষ্ট জানত সে। তনিয়া দিদিমণির শোবার ঘরের দরজার কাছে বারান্দায় একলা ঘুমোত সে, ইতিমধ্যে ফিসফিসিয়ে ইউশ্‌কা বলেছে তাকে: 'আমি আসবই। তুই খুন করলেও আসব। আর চেঁচিয়েছিস কি, বাড়িটা পুড়িয়ে ছারখার করে দেব।' কিন্তু তার মানসিক বল সবচেয়ে বেশী করে যেটা ক্ষইয়ে দিচ্ছিল সেটা হল **অমোঘ** কিছু একটা আসন্ন তার উপলব্ধি, সশংকিতে সেই বীভৎস ছাগলের স্বপ্ন শীগগির সত্যি হবে, তনিয়া দিদিমণির সঙ্গে একত্রে বিলুপ্ত হওয়াটা তার কপালে লেখা, এই উপলব্ধি। কারো তো আর জানতে বাকি নেই এখন: রাত্রে বাড়িতে খাস শয়তানের আস্তানা। সবাই জানে, ঝড়, বিদ্যুৎ, আগুন ছাড়া আর কী পাগল করে দিচ্ছে তনিয়া দিদিমণিকে,

কেন ঘুমের মধ্যে তিনি বুনোর মতো লালসায় গোঙিয়ে লাফিয়ে উঠে এত ভয়ংকর চীৎকার ছাড়েন যে বিকট বজ্রপাতের আওয়াজ পর্যন্ত চাপা পড়ে। তারস্বরে তিনি চেঁচাচ্ছেন: 'এডনের সাপ, জেরুজালেমের সাপটা আমার গলা টিপে মেরে ফেলল রে!' রাত্রে ছুকরী ও যুবতীদের ঘরে আসা সেই পাঁঠাটা, সেই শয়তানটা ছাড়া সাপটা আর কী হতে পারে? বাদলা রাত্রে বজ্রের অবিরাম গুরুগুরু ধ্বনি, কালো আইকনগুলোর ওপর বিদ্যুৎচমক, সে সময় অন্ধকারে তার আগমনের চেয়ে ভয়াবহ আর কী হতে পারে দুনিয়ায়? কামের তাড়নায় তীব্র আবেগে নাতালিয়ার কানে তার সেই ফিসফিসানি, সেটাও তো অমানুষিক: কী করে রোখা যায় তাকে? বারান্দায় মোটা কাপড়ের ওপর বসে, সর্বনাশের অমোঘ মুহূর্ত কখন এসে পড়বে তার ভাবনায় দুরুদুরু বুকে অন্ধকারে চোখ মেলে থেকে, ঘুমন্ত কাঁড়ির কাঠের তক্তার সামান্যতম কিঁচকিঁচ বা খসখসানি শোনার জন্য কান পেতে থেকে তার সেই ভবিষ্যৎ দীর্ঘকালব্যাপী কঠিন ব্যাধির প্রথম আক্রমণের উপলব্ধি ইতিমধ্যে হল: একটা পায়ের তলা হঠাৎ শিরশির করে ওঠে, একটা তীক্ষ্ন ছুঁচ ফোটানো আড়ষ্টভাব পায়ের আঙুলগুলো দুমড়ে মুচড়ে দেয়, — খিচুনীটা স্নায়ুশিরাকে মধুর নির্দয়ভাবে মুচড়ে পা

বেয়ে সড়সড় করে ওঠে একেবারে গলা পর্যন্ত, আর এক নিমেষে মনে হয় চেঁচায় পাগলের মতো, উচ্ছ্বাস আর যন্ত্রণার তেমন আবেগে কখনো চেঁচান নি এমনকি তনিয়া দিমিণি...

আর যা অমোঘ তা ঘটল। ইউশ্‌কা এল — গ্রীষ্মের শেষাশেষি তখন, মশাল-ছোঁড়া প্রাচীন সেণ্ট-এলিজা দিবসের আগের ভয়াবহ রাত্রে। ঝড়বৃষ্টি হয় নি সে রাত্রে, ঘুম ছিল না নাতালিয়ার চোখে। একটু ঢুলুনি এসেছিল — হঠাৎ জেগে উঠল, কার ধাক্কায় যেন। রাত্রের সেই নিশুতি প্রহর — নিজের উন্মত্ত হৃৎস্পন্দনে টের পেল। তড়াক করে উঠে বারান্দার এদিক-ওদিক দেখে নিল একবার: যে দিকে তাকায় সে দিকে আকাশ, নিঃশব্দ, জ্বলন্ত আর রহস্যময় আকাশ, সোনালি আর ফিকে নীল চোখ ধাঁধানো ঝলকে দপ করে উঠছে, জ্বলজ্বল করছে, কাঁপছে। মিনিটে মিনিটে বারান্দা আলো হয়ে যাচ্ছে দিনের বেলার মতো। দৌড়তে গিয়ে — স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে পড়ল নাতালিয়া:উঠানে অনেক দিন গাদা করে রাখা এ্যাস্ গাছের কুঁদোগুলো আলোর ঝলকে চোখ ধাঁধানো সাদা দেখাচ্ছে। খাবার ঘরে গেল সে: একটা জানলা খোলা, কানে আসছে গাছের অবিরাম মর্মরধ্বনি, জায়গাটা আরো অন্ধকার বলে জানলার বাইরে চমকানো

বিদ্যুৎ আরো উজ্জ্বল; মুহূর্তের জন্য চারিদিকে জমাট অন্ধকার, তারপর আবার সাড়া জাগছে, — এখানে-ওখানে বিদ্যুৎ ঝলকে লেসের মতো গাছের মাথা, ভয়াবহ বিবর্ণ সবুজ বার্চ ও পপলার গাছ সুদ্ধু বাগানটা দপ করে জ্বলে উঠছে, ফুলে উঠছে, কাঁপছে সোনালি ও ফিকে বেগুনি মহাকাশের পটভূমিকায়।

— সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে যা, বুয়ান দ্বীপে... — এই ভুতুড়ে মন্ত্র পড়ে নিজের সর্বনাশ আরো কাছে টেনে আনছে জেনেও নাতালিয়া পেছন ফিরে ছুটতে ছুটতে ফিসফিসিয়ে উঠল। — আর সেখানে আছে মাদি কুকুর, বিকট তার পিঠে ঘন ধূসর লোম...

আদিম ভয়াল শব্দগুলি উচ্চারণ করেই পেছন ফিরে দেখল ইউশ্‌কাকে, কাঁধ উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, দুপাও দূরে নয়। বিদ্যুৎ ঝিলিক খেলে গেল তার মুখে — ফ্যাকাসে মুখ, চোখগুলোর জায়গায় কালো কালো কোটর। নিঃশব্দে নাতালিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে, দীর্ঘহাতে তাকে জাপটে ধরে — একেবারে দুমড়ে নিমেষের মধ্যে হাঁটুর ওপর পেরে ফেলল তাকে, তারপর ঠাণ্ডা মেঝেতে, চিৎ করে...

পরের রাত্রেও এল ইউশ্‌কা। পরপর এল অনেকগুলো রাত্রে, — আর বিভীষিকা ও নিদারুণ বিতৃষ্ণায় অসাড়

নাতালিয়া ভীরুভাবে আত্মসমর্পণ করল তার কাছে: তাকে বাধা দেবার, কর্ত্রীর বা অন্য ঝি-চাকরের কাছে সাহায্য প্রার্থনার কথা কখনো মনে হয় নি, ঠিক যেমন রাত্রে তাঁকে সম্ভোগ করা শয়তানকে রোখবার সাহস কখনো হয় নি তনিয়া দিদিমণির, এমনকি হয় নি ঠাকুমারও, ডাকসাইটে সেই কর্তৃত্বময়ী রূপসীর বিষয়ে লোকে বলে যে নচ্ছার বেপরোয়া ও চোর চাকরটার হাত এড়াবার সাহস তিনি পান নি; ত্‌কাচ নামের লোকটা অবশেষে নির্বাসিত হয় সাইবেরিয়ায়... শেষ পর্যন্ত নাতালিয়া ও সুখদলে অরুচি ধরে গেল ইউশ্‌কার — একদিন হঠাৎ সে উধাও হয়ে গেল, যেমন হঠাৎ এসেছিল।

মাসখানেক পরে নাতালিয়া বুঝল সে সন্তানসম্ভবা। আর সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ থেকে দাদাবাবুরা ফিরে আসার পরের দিন, আগুন লাগল জমিদার বাড়িতে, দীর্ঘ ভয়াবহ সে অগ্নিকাণ্ড: তার দ্বিতীয় স্বপ্ন সত্য হল। গোধূলি তখন, মুষলধারায় বৃষ্টিপাত চলেছে; বাড়িতে বাজ পড়ল, সলশ্‌কার মতে, আগুনের একটা গোলা ঠাকুর্দার শোবার ঘরের চুল্লি থেকে ঝটকে বেরিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে এ-ঘর থেকে গেল ও-ঘরে। স্নানের ঘরে কেঁদে কেঁদে দিনরাত কাটত যে নাতালিয়ার, — আগুন আর ধোঁয়া দেখে পড়ি কি মরি করে ছুটে সে বেরিয়ে আসে,

পরে সে বলত যে বাগানে সে দেখেছিল লাল কোট আর সোনালি জরির দীর্ঘ কসাক টুপি পরা কাকে যেন: সেও প্রাণপণে দৌড়চ্ছিল বৃষ্টি বিন্দু ঝরা ঝোপঝাড় আর চোরকাঁটার মধ্য দিয়ে... সত্যি দেখেছিল না স্বপ্ন, নাতালিয়া নিশ্চিত নয়। তবে যে কথাটা সত্যি বলে জানে সেটা এই, বিভীষিকায় তার ভবিষ্যৎ সন্তানের ভার কেটে যায়।

সেই হেমন্তকাল থেকে সে শুকিয়ে যেতে লাগল। জীবনযাত্রা তার চলল বাঁধা ধরা গণ্ডির মধ্যে, সেখান থেকে আর কখনো বেরিয়ে এল না। তনিয়া পিসীকে ওরা ভরনেজে নিয়ে গেল পুণ্যাত্মার পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন চুম্বন করাতে। এরপর তাঁর কাছে আসার দুঃসাহস হত না শয়তানের; শান্ত হয়ে উঠে সকলের মতো দিন কাটাতে লাগলেন তিনি — তাঁর মন ও অন্তরের বিশৃঙ্খলা শুধু প্রকাশ পেত বুনো চোখের দীপ্তিতে, তাঁর চূড়ান্ত অপরিচ্ছন্নতায় আর আবহাওয়া খারাপ হলে তাঁর হিংস্র খুঁতখুতানি ও বিষাদের ভাবে। তীর্থযাত্রায় সঙ্গী ছিল নাতালিয়া — সে যাত্রায় তারও মনে শান্তি ফিরে এল, যা মনে হয়েছিল সমাধানের বাইরে তারো মীমাংসা সে খুঁজে পেল। পিওত্র পেত্রভিচের সঙ্গে দেখার কথা ভাবলেই কী কাঁপুনি

আসত শরীরে! নিজেকে ঠিক করে নেওয়ার যতই চেষ্টা করুক না কেন, দেখা হবার ব্যাপারটা শান্ত মনে ভাবতে কখনো পারত না সে। আর ইউশ্‌কা, নিজের সেই কলঙ্ক ও সর্বনাশ! কিন্তু অন্যদের শুধু নয়, পিওত্র পেত্রভিচের চোখেও স্পষ্ট শান্ত দৃষ্টিতে তাকানোর অধিকার সে অর্জন করল তার অনন্যসাধারণ সর্বনাশেরই গুণে, তার সেই জ্বালা যন্ত্রণার অসাধারণ গভীরতায়, তার দুর্ভাগ্যে অমোঘ কিছু একটা যে ছিল, তাতে, — পতনের সময় যে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে, সেটা নিশ্চয় আকস্মিক ব্যাপার নয়! -- আর তার তীর্থযাত্রার গুণেই: স্বয়ং দয়াময় তার প্রলয়ঙ্কর তর্জনী তুলেছেন তার দিকে, তনিয়া দিদিমণির দিকে — লোকনিন্দার ভয় করা তাদের সাজে না! ভরনেজ থেকে ফিরে সুখদলের বাড়িতে যখন প্রবেশ করল তখন সন্ন্যাসিনীর মতো সে, সবায়ের বিনীত সহজ সেবিকা, অন্তর ভারমুক্ত ও শুচি, যেন মৃত্যুশয্যায় সেক্রামেণ্ট নেওয়া হয়ে গেছে, অসঙ্কোচে এগিয়ে পিওত্র পেত্রভিচের হাতে সে চুমু খেলো। আর মুহূর্তখানেকের জন্য শুধু, ফিরোজার আংটি পরা তাঁর ছোট শ্যামবর্ণ হাতে ঠোঁট লাগাতে স্নিগ্ধ উত্তেজনায় যৌবনের আবেগে তার বুক থরথর কেঁপে উঠল...

নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে এল সুখদলের জীবন। ভূমিদাসমুক্তির পাকা খবর পাওয়া গেল — আর সত্যি বলতে খবরটায় আতঙ্ক বোধ করল ঝি-চাকর ও গাঁয়ের লোকেরা: ভবিষ্যতের পর্বে কী আছে, অবস্থা হয়ত যাবে খারাপের দিকে? নতুনভাবে থাকো — এটা বলা বড়ো সহজ! কর্তাদেরও শুরু করতে হবে নতুন জীবনযাত্রা, অথচ সাবেকীভাবে দিন কাটানোর ক্ষমতাও তাঁদের ছিল না। ঠাকুর্দার মৃত্যু, যুদ্ধ, সারা দেশকে বিভীষিকাগ্রস্ত করে দেওয়া সেই ধূমকেতু, তারপর অগ্নিকাণ্ড, ভূমিদাসমুক্তির সংবাদ — সব মিলিয়ে কর্তাদের মুখের ভাব আর মন ঝটিতি বদলে গেল, নিঃশেষ হয়ে গেল তাঁদের যৌবন আব নিশ্চিন্ততা. আগেকার সেই দপ করে জ্বলে ওঠা ও সহজে ঠাণ্ডা হওয়া, তার জায়গায় এল বিদ্বেষ, বিরক্তি ও পরস্পরের তীব্র ছিদ্রানুসন্ধান: বাবার ভাষায়, শুরু হল ওঁদের 'অবনিবনা', আর পরিণামে খাবার খেতে ওঁরা আসতেন চাবুক হাতে... দুয়ারে অনটনের করাঘাত মনে করিয়ে দিল যে ক্রাইমিয়ার যুদ্ধে, অগ্নিকাণ্ডে ও ধারে সর্বস্বান্ত অবস্থার টাল কোনক্রমে না সামলালে নয়। কিন্তু জমিদারি পরিচালনায় ঠোকাঠুকি লেগে গেল ভাইদের মধ্যে। কেউ বিদ্ঘুটে রকমের লোভী, কঠোর ও সন্দিগ্ধ, কেউ —

তেমনি দিলদরিয়া, দয়ালু ও বিশ্বাসপ্রবণ। শেষ পর্যন্ত সমঝোতা করে ওঁরা একটি কারবারে রাজী হয়ে গেলেন, তাতে নাকি বিস্তর লাভ হবার কথা: সম্পত্তি বাঁধা দিয়ে কেনা হল শ'তিনেক জীর্ণ ঘোড়া, — ইলিয়া সাম্‌সনভ নামের একটি বেদে প্রায় সারা জেলা থেকে তাদের জুটিয়ে আনল। মতলব ছিল শীতকালটা ঘোড়াগুলোকে ভালো খাইয়ে-দাইয়ে বসন্তকালে দাঁও-এ বেচা! কিন্তু গাদা গাদা গম আর বিচালি খেয়েও ঘোড়াগুলো কেন জানি একটার পর একটা মরতে শুরু করে দিল, বসন্ত যখন এল তখন প্রায় সবকটা ভবলীলা সাঙ্গ করেছে...

আরো জোর বাধল ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া। মাঝে মাঝে এত দূর গড়াত যে তুলে নিত ছুরি আর বন্দুক। সুখদলে আর একটি দুর্বিপাক না ঘটলে শেষ পর্যন্ত কী হত বলা যায় না। ক্রাইমিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের তিন বছর পরে, শীতের একটি দিনে পিওত্র পেত্রভিচ গাড়ি হাঁকিয়ে গেলেন লুনিওভোতে, সেখানে তাঁর একটি রক্ষিতা ছিল। দুদিন সারাক্ষণ প্রচুর মদ্যপান করে যখন রওনা হলেন বাড়ির দিকে তখনো নেশা কাটে নি। সে শীতে ভয়ানক বরফ পড়ে; কম্বলে ঢাকা নীচু চওড়া শ্লেজে দুটো ঘোড়া জোতা হয়। সামনে তেজী সোমত্ত ঘুড়ীটা দলদলে বরফে পেট

পর্যন্ত বসে যাওয়াতে পিওত্র পেত্রভিচ হুকুম দেন তাকে খুলে শ্লেজের পেছন দিকে বেঁধে দিতে, আর তিনি নিজে সম্ভবত ওর দিকে মাথা করে শোন ঘুমোবার জন্য। কুয়াসায় ভরা ঘুঘু-রঙা সন্ধ্যা নামল। চাকরবাকরদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেন বলে ওরা সবাই পিওত্র পেত্রভিচের ওপর চটা, পাছে গাড়োয়ান ভাস্কা কাজাক তাঁকে খুন করে বসে, সেই ভয়ে তিনি তাকে বাদ দিয়ে সঙ্গে নিতেন ইয়েভ্‌সেই বদুলিয়াকে,— শুয়ে পড়ার সময় ইয়েভ্‌সেইকে হেঁকে 'চালাও এবার' বলে তার পিঠে মারলেন লাথি। বাদামি রঙের বলিষ্ঠ সামনের ঘোড়াটা তখনি ঘামে নেয়ে উঠে ঘড়ঘড় আওয়াজ করে বাষ্প ছড়াচ্ছে, বরফে ঢাকা কঠিন পথে সে ছুটল কুয়াসায় ঝাপসা ধুধু মাঠে, কালো হয়ে আসা নিরানন্দ শীতের রাত্রিতে... মধ্যরাত্রে, সুখদলের সবাই যখন মড়ার মতো ঘুমন্ত, তখন যে বারান্দায় নাতালিয়া ঘুমোত সেখানকার জানলায় কে যেন টোকা দিল দ্রুত ও শঙ্কিত ভাবে। বেঞ্চি থেকে এক লাফে নেমে খালি পায়ে নাতালিয়া দৌড়ল প্রবেশপথে। দেখল ঘোড়াগুলোর আর শ্লেজের ঝাপসা কালো রেখা, চাবুকহাতে দাঁড়িয়ে আছে ইয়েভ্‌সেই।

— বিপদ, বুঝলি কিনা, বিপদ ঘটেছে, — ফাঁকা গলায় অদ্ভুতভাবে বিড়বিড় করে সে বলল, যেন ঘুমের মধ্যে, — কর্তাকে মেরে ফেলেছে ঘোড়াটা... পেছনের ঘোড়াটা... দৌড়ে সামনে গিয়ে পা হড়কে চাঁট মারল কর্তাকে... মুখটা থেঁতলে বসে গেছে এক্কেবারে... এরই মধ্যে শরীর হিম হয়ে যাচ্ছে... আমি মারি নি, আমি মারি নি, ভগবানের দিব্যি, আমি মারি নি!

কোনো কথা না বলে প্রবেশপথের সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নামল নাতালিয়া, খালি পা ডুবে গেল বরফে; স্লেজের কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসে রক্তের দলা জমা ঠাণ্ডা মাথাটা বুকে চেপে ধরে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে, বন্য আনন্দের সে চীৎকার; হাসি আর কান্নায় তার দম বন্ধ হয়ে এল।

১০

যখনি শহুরে জীবন থেকে বিশ্রাম নেবার জন্য আমরা আসতাম শান্ত নিঃস্ব সুদূর সুখদলে তখনি বারবার নাতালিয়া আমাদের বলত তার ভগ্নজীবনের কাহিনী। থেকে থেকে কালো-হয়ে-যাওয়া তার চোখে আসত শূন্য দৃষ্টি আর গলা নেমে যেত কঠোর পরিষ্কার আধো-

ফিসফিসানির সুরে। বারবার আমার মনে পড়ত হল-ঘরের কোণে ঝোলানো পুণ্যাত্মার সেই কর্কশ মূর্তিটা। তাঁর গল্প যে খাঁটি সেটা বোঝাবার জন্য — ছিন্ন মস্তক হাতে, নিজের লোকজনের কাছে এসেছিলেন কবন্ধ তিনি...

ধরা-ছোঁওয়া যায় অতীতের এমন সব চিহ্ন যা এককালে সুখদলে দেখেছিলাম তা আর নেই। বাপ-ঠাকুর্দা ও পূর্বপুরুষেরা না রেখে গিয়েছেন তাঁদের ছবি না চিঠি, এমনকি গেরস্থালির মামুলি জিনিস পর্যন্ত নয়। আর যা কিছু ছিল পুড়ে গেছে আগুনে। প্রায় শ'খানেক বছর আগে শিলের চামড়ায় বাঁধা একটা তোরঙ্গ বহুদিন পড়ে ছিল বারান্দায়, চামড়াটা শক্ত লোমহীন, ছিন্নভিন্ন, ঠাকুর্দার সেই তোরঙ্গের খোপে খোপে ফুট-ফুট দাগের বার্চ ঝলসানো মোমের বিচ্ছিরি দাগলাগা ফরাসী অভিধান ও প্রার্থনা পুস্তকের ছড়াছড়ি। তারপর তোরঙ্গটা পর্যন্ত পরে উধাও হয়ে গেল। ড্রয়িং-রুম আর খাবার ঘরের ভারি আসবাবপত্র ভেঙেচুরে অদৃশ্য হয়ে গেল একে একে। বাড়িটার বয়স যত বাড়ছে তত বসে যাচ্ছে মাটিতে। যেসব ঘটনার কথা বলা হয়েছে তার পরের যে দীর্ঘ বছরগুলি এ বাড়ির ওপর দিয়ে গেছে, তা শুধু মন্থর মৃত্যুর

বছর... আর তার অতীত ক্রমশ পরিণত হচ্ছে উপকথায়।

সুখদলবাসীরা বেড়ে উঠেছিল একটা পান্ডব বর্জিত নিরানন্দ জীবনে, তবু তাদের সে জটিল পৃথিবীতে স্থায়িত্বের, সমৃদ্ধির একটা বাহ্য ছাপ ছিল। সে জীবন এত অনড় এবং তার প্রতি সুখদলবাসীদের টান এত গভীর যে মনে হত এর সমাপ্তি ঘটবে না কখনো। কিন্তু স্তেপের যাযাবরের বংশধরেরা দেখা গেল সবকিছু মেনে নেয়, তারা দুর্বল চিত্ত, 'শাস্তিতে অল্পেই ভেঙে পড়ে'! আর আমরা নিজের চোখে দেখলাম সুখদলবাসীদের বাসাগুলো চকিতে উধাও হয়ে গেল চিহ্নমাত্র না রেখে, ঠিক যেমন লাঙল চালানোর পর একটার পর একটা অদৃশ্য হয়ে যায় আল আর ইঁদুরের গর্তের ওপরকার মাটির ঢিবিগুলো। সুখদল নীড়ের লোকেরা উৎসন্নে গেল, পালিয়ে গেল. আর যারা টিকে রইল কোনক্রমে তাদের শেষ দিন ঘনিয়ে এল যেকোনো প্রকারে। তাই আমরা বড়ো হয়ে যা দেখলাম তা সুখদলের সেই জগত নয়, জীবন বলা চলে না সেটাকে, জীবনের স্মৃতি শুধু, অস্তিত্বের অর্ধবর্বর সহজিয়া বছর যত কাটে তত বিরল হয়ে এল স্তেপে আমাদের বাড়িতে আসা। জায়গাটার সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ-ব্যবধান ক্রমশ বেড়ে

গেল, ক্ষীণতর হয়ে এল যে পরিবেশ ও শ্রেণীতে আমাদের জন্ম তার সঙ্গে আত্মীয়তাবোধ। আমাদের দেশের অনেক লোক আমাদেরই মতো এসেছেন স্বনামখ্যাত প্রাচীন কুলীন বংশ থেকে। ইতিবৃত্তে আমাদের নাম লেখা: আমাদের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন সেনাপতি, 'স্বনামধন্য লোক', জারদের ঘনিষ্ঠ সহচর, এমনকি তাঁদের আত্মীয় পর্যন্ত। আর যদি নাইট বলে ডাকা হত ওঁদের, যদি আমরা জন্মগ্রহণ করতাম পাশ্চাত্যে, তাহলে কী দৃঢ় বিশ্বাসে বলতাম ওঁদের কথা, টিকে থাকতাম আরো কত দিন! নাইটশ্রেণীর কোনো কুলতিলক বলতে পারতেন না যে, মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে গোটা একটা সম্প্রদায় প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে ধরাধাম থেকে, আমাদের কত জন লোক অধঃপাতে গেছে, পাগল হয়ে গেছে, আত্মহত্যা করেছে, পাঁড় মাতাল হয়ে পড়েছে, উচ্ছন্নে গিয়েছে বা কোথায় যেন বেমালুম হারিয়ে গিয়েছে। আমার মতো তিনি স্বীকার করতে পারতেন না যে, আমাদের পূর্বপুরুষদের কথা থাক, এমনকি প্রপিতামহদের জীবন সম্বন্ধেও সামান্য সুস্পষ্ট ধারণা পর্যন্ত আমাদের নেই, মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেকার ঘটনা কল্পনা করা দিনের পর দিন ক্রমশ শক্ত হয়ে পড়ছে আমাদের পক্ষে!

লুনিওভোর বাস্তুভিটে হাল দিয়ে চষে ফেলা হয়েছে অনেক দিন আগেই, যেমনটা ঘটেছে আরো অনেক জমিদারির বেলায়। সুখদল তখনো কোনোক্রমে টিকে ছিল। কিন্তু বাগানের শেষ বার্চ গাছটা কেটে ফেলে, কর্ষণযোগ্য জমিজমার প্রায় সমস্তটা খুচরো হারে বেচে দিয়ে, মালিক স্বয়ং, পিওত্র পেত্রভিচের সন্তান, — রেলওয়ে কণ্ডাক্টারের চাকরী নিলেন, ত্যাগ করলেন জায়গাটা। আর সুখদলের পুরনো অধিবাসী — ক্লাভদিয়া মার্কভনা, তনিয়া পিসী ও নাতালিয়ার জীবনের শেষ কটা বছর কাটল অসীম দুরবস্থায়। বসন্তের পর গ্রীষ্ম, গ্রীষ্ম ম্লান হয়ে যায় হেমন্তে, তারপর আসে শীতকাল... ঋতুচক্রের কোনো হিসেব আর রইল না তাদের। স্মৃতি আর স্বপ্নের ভারে, রোজকার রুটির চিন্তায় আর ঝগড়ায় দিন কাটে। আগে যেসব জায়গায় ফলাও করে ছড়িয়ে থাকত জমিদারী কুঠি, গ্রীষ্মকালে তা ডুবে যায় চাষীদের রাইক্ষেতে: জমিজমার মাঝখানে বাড়িটা দেখা যায় অনেক দূর থেকে। বাগান বলতে এখন বাকি আছে কিছু ঝোপঝাড়, এত জংলী তাদের বাড় যে বারান্দার ঠিক পাশে এসে ডাকে ভারুই পাখি। কিন্তু গ্রীষ্মকালে ভাবনা কিসের! 'গ্রীষ্মকাল তো স্বর্গের মতো!' —

বলত বৃদ্ধারা। সুখদণের সবচেয়ে বেজার আর বিরস সময় হল বাদলা দীর্ঘ হেমন্তকাল আর বরফে ঢাকা শীত। ভগ্নপ্রায় ফাঁকা বাড়িটায় শীত আর বুভুক্ষা। বরফ ঝেঁটিয়ে আসে তার ওপর, কনকনে হাওয়া ঢোকে ছুরির মতো। আর বাড়ি গরম করা, চুল্লি ধরানো হয় কদাচিৎ। বৃদ্ধা কর্ত্রীর ঘর থেকে, — বাড়ির একমাত্র বাসযোগ্য ঘরে — ছোট একটা টিনের বাতির টিমটিমে আলো দেখা যায় সন্ধ্যাবেলায়। বাতির ওপর ঝুঁকে মোজা বোনেন কর্ত্রী, চোখে চশমা, গায়ে ভেড়ার লোমের কোট, পায়ে ফেল্টের বুট। চুল্লির ঠাণ্ডা তাকে বসে বসে ঢোলে নাতালিয়া, আর সাইবেরীয় বদ্যিবুড়ীর মতো দেখতে তনিয়া পিসী নিজের কুঁড়েঘরে বসে বসে টানেন পাইপ। তনিয়া পিসী আর ক্লাভদিয়া মার্কভনার মধ্যে ঝগড়া না লাগলে ক্লাভদিয়া মার্কভনা নিজের বাতিটা রাখেন জানলার ধারিতে, টেবিলে নয়। আর তখন জমিদার বাড়ি থেকে একটা অদ্ভুত ক্ষীণ ঝাপসা আলো পড়ে তনিয়া পিসীর ঠাণ্ডা কনকনে কুঁড়েঘরে, যেখানে ভাঙাচোরা আসবাবের ভিড়, খানখান হয়ে ভেঙে যাওয়া কাঁচের বাসনের টুকরো ছড়ানো এদিকে-ওদিকে, একপাশে ধ্বসে যাওয়া পিয়ানোর বোঝা। তনিয়া পিসী নিজের শেষ শক্তিটুকু

লাগিয়েছিলেন যেসব মুরগীর তদারকে, এই সব টুকরোর ওপর শুয়ে রাত কাটিয়ে তাদের পাগুলো ঠাণ্ডায় জমে যেত, এতই তুহিন ছিল কুঁড়েঘরটা...

কিন্তু এখন আর কেউ নেই সুখদলে। এই ইতিবৃত্তে বলা হয়েছে যাদের কথা তারা মৃত, মৃত তাদের প্রতিবেশী ও সমসাময়িকেরা। মাঝে মাঝে ভাবি: সত্যি তারা কখনো বেঁচেছিল কিনা।

শুধু কবরখানায় এলে মনে হয় তারা এককালে ছিল এ পৃথিবীতে: এমনকি তাদের সঙ্গে সান্নিধ্যের একটা ছমছমে অনুভূতি পর্যন্ত হয়। কিন্তু অনুভূতিটা চেষ্টাসাপেক্ষ, তার জন্য আত্মীয়স্বজনদের কবরখানার পাশে বসে বসে ভাবতে হয় — অবশ্য যদি তেমন কবরখানা খুঁজে বের করতে পারেন একটা। এটা স্বীকার করা লজ্জার ব্যাপার, কিন্তু গোপন করা অনুচিত: ঠাকুর্দা ঠাকুমা বা পিওত্র পেত্রভিচের কবর কোথায় আমাদের জানা নেই। চোর্কিজভোর ছোট গির্জার বেদী থেকে বেশী দূরে নয় — শুধু এটুকুই জানি। শীতকালে সেখানে যাওয়া অসম্ভব: কোমর অবধি বরফের স্তূপ, বরফ থেকে বেরিয়ে আছে কয়েকটা ক্রুশ আর পত্রহীন ঝোপ ও ঝাড়ের চুড়ো ডাল। গ্রীষ্মকালে গ্রামের তপ্ত ফাঁকা নিস্তব্ধ রাস্তা হয়ে গির্জার

উঠানের বেড়ায় ঘোড়া বাঁধা যায়, বেড়ার পিছনে ফার গাছের ঘোর-সবুজ দেয়াল, কালচে হয়ে উঠছে গুমোট গরমে। ফটক পার হয়ে চোখে পড়ে মরচে পড়া গম্বুজওয়ালা সাদা গির্জাটার ওপারে — খাটো ছড়িয়ে পড়া এল্ম, এ্যাস ও লাইম গাছের গোটা একটা কুঞ্জ, সেখানে ঠাণ্ডা আর ছায়ার রাজত্ব। অনেকক্ষণ ঘোরাফেরা ঝোপঝাড়ের মাঝখান দিয়ে, কবরের পাতলা ঘাসে ভরা ঢিবি আর খাতের ওপরে, বৃষ্টিতে পেছল, কালো থলথলে শেওলায় আচ্ছন্ন, মাটিতে প্রায় বসে যাওয়া পাথরের ফলকে পা পড়বে... চোখে পড়বে লোহার দু-একটা স্মৃতিস্তম্ভ। কিন্তু কাদের? এত সবজে-সোনালি হয়ে গেছে যে লিপি পাঠ অসম্ভব। কোন ঢিপিগুলোর তলে ঠাকুর্দা বা ঠাকুমার হাড়কটা? ভগবান জানেন শুধু! আমি কেবল জানি তাঁদের কবর এখানেই কোথায় যেন। বসে বসে ভাবি, বিস্মৃতির অতলে লুপ্ত ক্রুশচভদের চেহারাগুলো কল্পনা করার চেষ্টা করি। একবার নিমেষের জন্য মনে হয় ওঁদের জগত কত সুদূর, আবার পর মুহূর্তে মনে হয় কত কাছে। তারপর মনে মনে বলি:

— কল্পনা করা কঠিন নয়, কঠিন নয় একেবারে। শুধু মনে রাখা দরকার যে নীল আকাশের গায়ে হেলে-

পড়া গিলটি-করা এই ক্রুশ ওঁদেরও কালে ঠিক এমনিই ছিল... তখনো এই সব ফাঁকা গুমোট ক্ষেতে এখনকার মতোই ফলত, হলদে হয়ে উঠত রাইশস্য, ছায়া আর স্নিগ্ধ ঠাণ্ডা আর ঝোপঝাড় এখানে রয়েছে বরাবর... আর ঝোপঝাড়ে ইতস্তত চরে বেড়াত একটা বেতো মাদী ঘোড়া, ঠিক ওইটার মতো, ওই সাদা বুড়ী ঘোড়াটা, যার ঝুঁটি সবজে, খুরগুলো ভাঙাচোরা, পাটল রঙের।

ভাসিলিয়েভস্কয়ে ১৯১১

শেষ দেখা

১
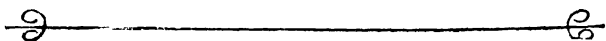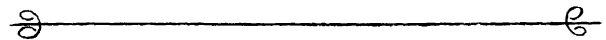
ঘোড়ায় জিন পরাতে হুকুম দিল স্ভেশ্নেভ; হেমন্তের চাঁদিনী রাতটা তখন ঠাণ্ডা আর স্যাঁতসেঁতে।

অন্ধকার আস্তাবলের সরু জানলা দিয়ে চাঁদের আলোর ধোঁয়াটে নীলচে ফালি একটা ঘোড়ার চোখে পড়াতে সেটা দামী পাথরের মতো ধকধক করে জ্বলছে। ঘোড়াটার ওপরে লাগাম আর একটা ভারি উঁচু কসাক জিন চাপিয়ে সইস তার রাশ ধরে বের করে আনল আস্তাবল থেকে, তারপর ফাঁস দিয়ে লেজটা বেঁধে দিল। ঘোড়াটা বাধ্য। জিনের পেটি গায়ে লাগাতে শুধু পাঁজরা

ফুলিয়ে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ছিঁড়ে গেল একটা পেটি। বেশ কষ্ট করে সেটা পরিয়ে সইস দাঁত দিয়ে কোণটা বের করে নিল।

জিন পরাতে খাটো ঘোড়াটাকে বেশ ফিটফাট দেখাচ্ছে। তাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে একটা পচা খুঁটিতে রাশ জড়িয়ে দিয়ে চলে গেল সইস। হলদে দাঁতে খুঁটিটা অনেকক্ষণ ধরে চিবল, কামড়াল ঘোড়াটা। মাঝে মাঝে বুক ফুলিয়ে চিঁহি ডেকে তারপর গভীর হ্রেষাধ্বনি। পাশের একটা জলের গর্তে ম্লান হয়ে আসা চাঁদের সবজে প্রতিচ্ছবি। রিক্ত বাগানে ঘনিয়ে আসছে ঝাপসা কুয়াসা।

চাবুক হাতে স্ত্রেশ্‌নেভকে দেখা গেল প্রবেশপথে। বাদামী পদিওভ্‌কা পরা, পাতলা কোমরে আঁটো করে বাঁধা রূপোর কাজ করা চামড়ার বেল্ট একটা, টকটকে লাল ঝুঁটি পশমের টুপি, ছোট মাথা উঁচিয়ে আসাতে বাঁকা নাক মানুষটিকে দেখাচ্ছে লম্বা আর চটপটে। কিন্তু এমনকি চাঁদের আলোয় ধরা পড়ে তার মুখটা বিবর্ণ, রোদে জলে পোড়া, মোটা কোঁকড়ানো দাড়িতে পাক ধরেছে, গলাটা দড়কচা মারা, দেখা যায় যে উঁচু বুটজোড়া পুরনো, কোটের প্রান্তে — খরগোশের রক্তের অনেক দিনের দলা পাকানো কালচে ছোপ।

প্রবেশপথের পাশের একটা ছোট কালো জানলা খুলে গেল, শোনা গেল ভীরু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা:

— আন্দ্রেই, কোথায় যাচ্ছ?

— আমি আর খোকা নই, মা, — ভুরু কুঁচকে জবাব দিল স্ত্রেশ্‌নেভ, তুলে নিল রাশটা।

জানলা বন্ধ হয়ে গেল বটে, কিন্তু হল-ঘরে শোনা গেল দড়াম করে দরজা খোলার শব্দ। চটি পরা পা ঘষটে প্রবেশপথে বেরিয়ে এল পাভেল স্ত্রেশ্‌নেভ। মুখ আর চোখ ফোলা-ফোলা, পাকা চুল পেছনদিকে ফেরানো। পরনে অন্তর্বাস, তার ওপর চাপিয়েছে একটা পুরনো ঝোলা কোট, বরাবরটার মতো একটু বুঁদ হয়ে বকবক করে চলার মেজাজ।

— কোথায় যাওয়া হচ্ছে, আন্দ্রেই? — ভাঙা ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করল। — ভেরা আলেক্সেয়েভ্‌নাকে আমার নমস্কার জানিও দয়া করে। ওঁকে আমি বরাবর গভীর শ্রদ্ধা করি।

— কাউকে কখনো শ্রদ্ধা করেছ তুমি? — জবাব দিল স্ত্রেশ্‌নেভ। — অন্য লোকের ব্যাপারে সব সময় নাক গলাও কেন?

— ওরে বাবা, মাফি মাঙছি! — বলল পাভেল। — **ঘোড়া ছুটিয়ে যুবা চলেছেন অভিসারে!**

দাঁতে দাঁত চেপে ঘোড়ায় চড়তে গেল স্ত্রেশ্নেভ। রেকাবে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে চাঙা হয়ে উঠে ঘোড়াটার শুরু হল বেখাপ্পা লাফানি। সুযোগমতো স্ত্রেশ্নেভ সহজে তার পিঠে চেপে কিংচকিংচে জিনের সামনেটায় বসল। মাথা ঝাঁকিয়ে তুলে, খুরের ঘায়ে খোঁদলের জলের চাঁদটাকে চুরমার করে দিয়ে জোর কদমে চলতে লাগল ঘোড়া।

২

স্যাঁতসেঁতে, চন্দ্রালোকিত ক্ষেতে অকর্ষিত আলগুলো সোমরাজে ঝাপসা। বড়ো পাখা ছড়িয়ে হঠাৎ নিঃশব্দে ওপরে উড়ে যাচ্ছে পেঁচা — ঘোড়াটা চমকে উঠে নাক দিয়ে শব্দ করছে। জ্যোৎস্নায় আর শিশিরে হিম ও খাঁখাঁ একটা অগভীর বনের মধ্য দিয়ে গেছে রাস্তাটা। নেড়া গাছের মাথা ভেদ করে উজ্জ্বল, ঠিক যেন সিক্ত চাঁদের ঝলক, ভিজে ফুটফুটে আলোয় একাকার অদৃশ্য পত্রহীন ডালপালা। খাতে এ্যাস গাছের ছাল ও মরা পাতার তীক্ষ্ন গন্ধ... এবার ঘেসো মাঠে নামার পালা, পাতলা সাদা বাষ্পের বন্যায় মনে হয় মাঠটা অতল। শিশিরে ঝকঝকে ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে

ঘোড়ার মুখ দিয়েও সাদা বাষ্প বেরোচ্ছে। অন্য দিকে পাহাড়ের ঢালুতে ছায়াভরা দীর্ঘ বনে প্রতিধ্বনি উঠছে ঘোড়ার খুরে ভেঙে যাওয়া ডালপালার শব্দের... হঠাৎ কান খাড়া করল ঘোড়াটা। মাঠের ঝাপসা আলোয় দাঁড়িয়ে আছে গাঁট্টাগোট্টা, ঘাড়মোটা, সরু পাদুটো নেকড়ে। স্ত্রেশ্‌নেভ খুব কাছে না এসে পড়া পর্যন্ত তারা দাঁড়িয়ে রইল, তারপর লাফিয়ে ফিরে নীহারকণায় সাদা ঝকঝকে ঘাসের ওপর দিয়ে বড়ো বড়ো পা ফেলে বেঢপভাবে উঠে গেল পাহাড়ে।

— আর ও যদি আর একটা দিন থেকে যায়? — মাথা পেছনে হেলিয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে ভাবল স্ত্রেশ্‌নেভ।

ঝাপসা রুপোলি খাঁখাঁ মাঠের ওপরে ডান দিকে চাঁদ... সত্যি হেমন্ত কী বিষণ্ণ ও সুন্দর!

একটা গভীর নালার পাশের রাস্তাটা যেখানে জলস্রোতে ধুয়ে গেছে সেখান দিয়ে দীর্ঘ ঘন অরণ্যের দিকে প্রাণপণে উঠতে উঠতে চিঁহি ডাকছে ঘোড়াটা, কিঁচকিঁচ করে উঠছে জিনের সামনের দিক। হঠাৎ পা হড়কে হুড়মুড়িয়ে পাড় থেকে পড়ে যেত আর একটু হলে। প্রচণ্ড রাগে মুখ বিকৃত করে স্ত্রেশ্‌নেভ চাবুক হাঁকড়ে শপাং করে বসাল ঘোড়ার মাথায়।

— ধাড়ি শয়তান কোথাকার! — বিষণ্ণ রাগের সুরে বনে প্রতিধ্বনিত হল তার চীৎকার।

বন পেরিয়ে নগ্ন ক্ষেতের বিস্তার। পাহাড়ের গায়ে বাক হুইটের কালো নাড়ার মাঝে একটা দীনহীন জমিদারি, কী কয়েকটা চালা আর একটা খড়ে ছাওয়া বাড়ি। চাঁদের আলোয় কী বিষণ্ণ সমস্ত কিছু! স্ত্রেশ্‌নেভ থামল। গভীর রাত হয়ে গেছে মনে হল, — এত চুপচাপ জায়গাটা। ঘোড়ায় চেপে গেল উঠানে। বাড়িটা অন্ধকার। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামল স্ত্রেশ্‌নেভ। বাধ্যের মতো মাথা হেলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল জানোয়ারটা। প্রবেশপথে থাবায় নাক গুঁজে কুঁকড়ে শুয়ে আছে একটা বুড়ো শিকারী কুকুর। নড়ল না কুকুরটা, ভুরু তুলে মেঝেতে লেজ ঠুকে শুধু জানাল অভ্যর্থনা। বাইরের ঘরে স্ত্রেশ্‌নেভ ঢুকল, সোঁদা একটা গন্ধ আসছে পুরনো পায়খানা থেকে। আধো-আলো আধো-ছায়া হল-ঘরে; বরফে ঘেমে জানলাগুলোর শার্সি চিকচিক করছে সোনালি আভায়। পাতলা নরম সাদামাটা পোষাক গায়ে ছোটখাটো একটি স্ত্রীলোক নিঃশব্দে পা ফেলে দৌড়িয়ে এল অন্ধকার বারান্দা থেকে। স্ত্রেশ্‌নেভ একটু ঝোঁকাতে নগ্ন হাতে সে তার সরু গলা দ্রুত ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে সুখে

ফুঁপিয়ে উঠল মৃদু কণ্ঠে, পশ্চিওভ্কার মোটা কাপড়ে মুখ চেপে। শিশুর মতো তার হৃৎস্পন্দন শুনেল স্ত্রেশ্নেভ, বুকের ছোট্ট সোনালি ক্রুশের চাপ করল অনুভব, ক্রুশটা মেয়েটির ঠাকুমার — তার শেষ সম্বল।

তাড়াতাড়ি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল মেয়েটি:

— তুমি কাল পর্যন্ত থেকে যাবে তো? থাকবে? এতখানি সুখ! বিশ্বাস করতে ভরসা হচ্ছে না!

— ঘোড়াটাকে রেখে আসি, ভেরা, — নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে স্ত্রেশ্নেভ বলল। -- কাল পর্যন্ত থাকব, কাল পর্যন্ত, -- পুনরুক্তি করে ভাবতে লাগল: 'ওরে বাবা, দিন দিন উচ্ছ্বাসের বান ডাকছে দেখছি! আর সিগারেট টানে ও বেপরোয়া সোহাগের কী ধুম!'

ভেরার মুখটি মধুর, পাউডারে মখমলের মতো নরম। স্ত্রেশ্নেভের ঠোঁটে গাল ঘষে নরম ঠোঁটে জোর একটা চুমু খেল সে। খোলা বুকে ক্রুশের চিকমিক। রাত্রের সবচেয়ে পাতলা গাউনটা পরেছে — এই সবেধন গাউনটি বড়ো আদরের তার, বিশেষ উপলক্ষে পরার জিনিস...

অল্প বয়সে ভেরার চেহারাটি কেমন ছিল মনে করার চেষ্টা করতে করতে স্ত্রেশ্নেভ ভাবল: 'বছর পোনেরো আগে কী দারুণ বিশ্বাস ছিল, সত্যি কী দারুণ বিশ্বাস

করতাম যে ওর সঙ্গে একবার দেখা করার জন্য অনায়াসে, এতটুকু দ্বিধা না করে জীবনের পোনেরোটা বছর দিয়ে দিতে পারি!'

৩

ভোর হতে দেরী নেই। বিছানার ধারে মেঝেতে মোমবাতির আলো। শার্টের গলা খোলা, স্ত্রেশ্‌নেভ চিৎ হয়ে শুয়ে আছে লম্বা শরীর টান করে, মাথার নীচে হাত ছড়িয়ে; বাঁকা নাক ছোট মুখটি গর্বিতভাবে ফেরানো অন্ধকারের দিকে। হাঁটুতে কনুই রেখে ভেরা পাশে বসে আছে। দীপ্ত চোখজোড়া কেঁদে কেঁদে ফোলা, লাল। সিগারেট খেতে খেতে বিরস মুখে তাকিয়ে আছে মেঝেতে। পায়ের ওপর পা রেখে বসাতে সৌখীন দামী জুতোতে ছোট্ট পা'টা বড়ো সুন্দর লাগছিল তার নিজের কাছেই। কিন্তু বুকের সেই তীব্র জ্বালার শেষ নেই।

—তোমার জন্য আমার সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছি,—মৃদুকণ্ঠে বলল সে, কেঁপে উঠল ঠোঁটজোড়া।

কণ্ঠস্বরে কত না স্নেহ, কত না শিশুসুলভ বিষাদ! স্ত্রেশ্‌নেভ কিন্তু চোখ খুলে কঠোর সুরে জিজ্ঞেস করল:

— কী উজাড় করে দিয়েছ, শুনি?

— সব, সবকিছু, সমস্ত কিছু। এবং সবচেয়ে বড়ো কথা, আমার সম্মান খুইয়েছি, খুইয়েছি আমার যৌবন...

— তুমি আর আমি এমন কিছু কমবয়সী নই।

— সত্যি তুমি কী অভব্য! আমাকে একেবারে বোঝো না, — নরম গলায় সে বলল।

— দুনিয়ার সব মেয়েরা সর্বদা এই এক কথা বলে। 'বোঝাটা' তাদের পেয়ারের কথা, বলে অবশ্য বিভিন্নভাবে। গোড়ায় বলে আহ্লাদে আর উচ্ছ্বাসে: 'সত্যি তোমার কী বুদ্ধি, আমাকে এত ভালো করে বোঝো!' আর পরে: 'সত্যি তুমি কী অভব্য! আমাকে একেবারে বোঝো না!'

নিঃশব্দে কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটি বলে চলল এমনভাবে যে মনে হল স্ত্রেশ্‌নেভের কথা কানে যায় নি:

— মানলাম না হয় আমি এমন কিছু নই... কিন্তু গানবাজনা বরাবর ভালোবেসেছি, এখনো পাগলের মতো ভালোবাসি, আর কিছু একটা, সামান্য হলেও, কিছু একটা হয়ত করতে পারতাম...

— ওহো! গানবাজনার ব্যাপার ছিল না ওটা! যে মুহূর্তে পদার্পিক...

— ওটা বলা অভব্য, আন্দ্রেই... আর এখন আমি শুধু একটা বোর্ডিং স্কুলের হতচ্ছাড়া নাচের ক্লাসে পিয়ানো বাজাই, তাও জায়গাটা কোথায়? যে বেল্লিক শহরটায় বরাবর আমার ঘেন্না, সেখানে! কিন্তু এখনো কি এমন একটি মানুষকে খুঁজে পেতাম না যে আমাকে দিত আশ্রয়, সংসার, আমাকে ভালোবাসত, খাতির করত? কিন্তু আমাদের প্রেমের স্মৃতি...

একটা সিগারেট ধরিয়ে আস্তে আস্তে প্রত্যেকটি শব্দ উচ্চারণ করে জবাব দিল স্ত্রেশ্‌নেভ:

— ভেরা, আমরা অভিজাত বংশের গর্ভস্রাব, আমরা প্রেম জিনিসটাকে সহজভাবে নিতে পারি না। ওটা আমাদের কাছে বিষের মতো। আর জীবন ছারখার হয়ে গেছে আমার, তোমার নয়। পোনেরো, ষোলো বছর আগে এখানে আসতাম প্রত্যেক দিন, চাইতাম তোমার দোরগোড়ায় রাতগুলো কাটাতে। তখন আমার বয়স নেহাৎ কম ছিল, ভাবাতিশয্যে পরিপূর্ণ মূর্খ ন্যাকা গোছের মানুষ ছিলাম...

সিগারেট নিভে গেল। সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাতদুটো দেহের পাশে রেখে ছাদের দিকে তাকিয়ে শুয়ে রইল স্ত্রেশ্‌নেভ।

— আমাদের পূর্বপুরুষদের সেই সব প্রেম কাহিনী, নীল ঘিরে সোনালী কাগজে ডিম্বাকার ফ্রেমে তাদের প্রতিকৃতি... আমাদের সনাতন বংশের কুলগুরু — গুরিই, সামন ও আভিভের মূর্তি... সে সবের উত্তরাধিকার তোমার, আমার ভবিতব্য না হলে আর কার হবে? সে সময় আমি এমনকি কবিতা লিখেছি:

ভালোবেসে তোমায় স্বপ্ন দেখেছি তাদের
স্বপ্নিল যারা ভালোবেসেছিল হেথা —
ঘুরেছি বাগানে তারার আলোকে, যেথা,
শতাব্দী আগে আলোকিত মুখ যাদের...

ভেরার দিকে একবার তাকিয়ে আগের চেয়ে কর্কশ গলায় বলল:

— তুমি চলে গিয়েছিলে কেন? আর গিয়েছিলে কার সঙ্গে? তোমার গোত্রের, তোমার জাতের লোক কি সে ছিল?

উঠে বসে ওর হালকা কালো চুলের দিকে তাকাল কঠিন ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে:

— তোমার কথা বরাবর ভেবেছি গভীর উচ্ছ্বাসে আর শ্রদ্ধায়, ভেবেছি আমার ভাবী বধূ হিসেবে। কিন্তু কী লগ্নে মিলন হল তোমার সঙ্গে? আর আমার কাছে কী হয়ে তুমি দাঁড়ালে? আমার স্ত্রী হয়ে? তবু তো

তখন ছিল যৌবন, আনন্দ, সারল্য, আরক্তিম মুখ, কেম্ব্রিকের কামিজ... কী না গভীর অর্থ ছিল আমার কাছে এখানে রোজ আসার! দেখতাম তোমার ফ্রক, সেটাও ফিনফিনে কাপড়ের, পাতলা, যৌবনসুলভ, রোদ আর পূর্বপুরুষদের রক্তের দরুন তামাটে তোমার নগ্ন বাহু, তোমার তাতার চোখের ঝিলিক — সে চোখ তাকাত না আমার দিকে! — তোমার কুচকুচে কালো চুলে হলদে গোলাপ, তোমার হাসি — হাসিটা একটু ভেবাচেকা খাওয়া বোকাটে ধরনের হলেও কী মধুর, এমনকি অন্য কারুর কথা ভাবতে ভাবতে আমার কাছ থেকে সরে গিয়ে বাগানের পথ ধরে তোমার চলা, সত্যি যেন খেলায় মন বসেছে এমন ভান করে তোমার সেই ক্রোকেটের বল মারা, আর বারান্দা থেকে তোমার মায়ের অপমানবর্ষণ — এ সব আমার কাছে...

— সব দোষ মায়ের, আমার নয়, — কষ্ট করে কোনক্রমে বলল ভেরা।

— না! মস্কোয় তোমার সেই প্রথম যাওয়ার কথাটা মনে করো একবার, আনমনে গাইতে গাইতে বাঁধাছাদা করছিলে, নিজের স্বপ্নে, সুখের নিশ্চিত প্রত্যাশায় এত বিভোর যে আমাকে দেখতে পাও নি, স্বচ্ছ ঠান্ডা

সেই সন্ধ্যেবেলায় ঘোড়ায় চেপে গেয়েছিলাম তোমাদের বিদায় দিতে। সেই ঝকঝকে সবুজ ঘাস, চষা গোলাপি মাঠ, ট্রেনের খোলা জানলায় সেই পর্দাটা... হে ভগবান! — বিরাগে আর অশ্রুজলে বলে উঠে আবার বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল স্ত্রেশ্‌নেভ। — তোমার হাতে ভার্বেনার সৌরভ, আমারও হাতে রয়ে গেল সে সৌরভ। সে গন্ধ মিশে গেল আমার ঘোড়ার রাশে, জিন সাজে, ঘোড়ার ঘামের গন্ধে, তবু ছাড়ল না আমাকে অন্ধকারে ঘোড়ায় চেপে বড়ো রাস্তা ধরে যাচ্ছিলাম আর কেঁদেছিলাম সেদিন... তাই যদি সর্বস্ব উজাড় করার, সমস্ত জীবন বিসর্জন দেবার কথা তোলো তাহলে বলতে হয় আমার কথা, এই ঘাঘী মাতালটার কথা!

আর গাল ও গোঁফ বয়ে আসা চোখের জলের উষ্ণ লবণাক্ত ছোঁয়াচ ঠোঁটে পেয়ে মেঝেতে হঠাৎ পা নামিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল স্ত্রেশ্‌নেভ।

চাঁদ অস্তগামী। মরণনীল ছোপ লাগা বনের নীচে মাঠেঘাটে লেগে আছে সাদা চটচটে কুয়াসা। অনেক দূরের আকাশ ঘোর লাল আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। দূরের ঠাণ্ডা অন্ধকার বনে বনরক্ষকের কুটিরে একটা মোরগ ডাকল।

প্রবেশপথের সিঁড়িতে মোজা পায়ে বসে স্ত্রেশ্‌নেভ অনুভব করল পাতলা শার্ট ফুঁড়ে স্যাঁতসেঁতে ঠান্ডার স্রোত হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

— আর তারপর অবশ্য ভূমিকার অদলবদল হয়ে গেল, — শান্ত কণ্ঠে বিতৃষ্ণায় বলল সে। — যাক গে, কিছু এসে যায় না এখন। সব তো শেষ...

৪

ঠান্ডা হল-ঘরে প্রকান্ড একটা তোরঙ্গের ওপর সকালের চা দেওয়া হল। সামোভারটা অপরিচ্ছন্ন, সবজেটে, ভেতরের আগুন নিভে গেছে অনেকক্ষণ। জানলাগুলোর ঠান্ডা ঘামের কুঁড়ি সরে গেছে ওপরের শার্সি থেকে, এখন চোখে পড়ে হিম সকালের ঝকঝকে রোদ আর এখানে সেখানে কোনক্রমে টিকে থাকা নিষ্প্রভ সবুজের মধ্যে একটা বাঁকা গাছ। ঘুমে মুখ ফোলা, খালি পা, লালচুল একটি চাকরানি ভেতরে এসে বলল:

— মিস্ত্রি এসেছে।

— আসুক গে, — চোখ না তুলে বলল স্ত্রেশ্‌নেভ।

ভেরাও চোখ তুলল না। এক রাত্তিরের মধ্যে তার মুখটা কেমন শুকনো হয়ে গেছে, তামাটে ছোপ পড়েছে

চোখের পাতায় আর চোখের কোলে। পোষাকটা কালো বলে যতটা কমবয়স ও সুন্দর নয় তার বেশী দেখাচ্ছে, কালোচুলের দরুন মুখের পাউডারে একটা গোলাপী আভা। স্ত্রেশ্‌নেভের সরু কঠোর মুখ মৃতের মতো বিবর্ণ। মাথাটা পেছনে হেলানো, মোটা কোঁকড়ানো ধূসর দাড়ি ভেদ করে দেখা যাচ্ছে বড়ো টুঁটি।

বেশী ওপরে তখনো ওঠে নি সূর্য, তবু চোখ ধাঁধানো আলো। সামনের প্রবেশপথের সমস্তটা হিমকণায় সাদা। উঠানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বাঁধাকপির পাতার নীলচে-সবুজ বুকে আর ঘাসে নুনের ছিটের মতো লেগে আছে নীহারকণা। খড় বোঝাই ও তুষার কণায় ভরা গাড়িটি হাঁকিয়ে প্রবেশপথের সামনে এসেছিল যে ঘোলাটে চোখ লোকটি সে এখন খড়ে পা ঠুকে ঠুকে ঘুরছে। মুখে একটা পাইপ, লাইলাক-রঙা ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘাড়ের পাশ দিয়ে পেছনে চলে যাচ্ছে। ফারকোট গায়ে বেরিয়ে এল ভেরা, এককালের দামী কোটটা এখন জীর্ণ আর সেকেলে; পাড়ে শক্ত মরচে পড়া সাটিনের ফুল দেওয়া কালো খড়ে বোনা গরমকালের টুপি তার মাথায়।

যেসব পথে হিমকণা গলে গেছে সেসব পথ ধরে গাড়ি চলল, বড়ো রাস্তা পর্যন্ত গাড়ির পেছন পেছন

ঘোড়ায় চেপে ভেরাকে এগিয়ে দিল স্ত্রেশ্‌নেভ। ঘোড়াটা খড়ের দিকে যাচ্ছিল। নাকে চাবুকের ঘা খেয়ে মাথা উ'চিয়ে ফোঁৎ করে একটা আওয়াজ করল সে। গুটিগুটি চলেছে সবাই, কারো মুখে কথা নেই। বাড়ি থেকে স্ত্রেশ্‌নেভের পিছু ধরা বুড়ো দৌড়বাজ কুকুরটা এখন দৌড়চ্ছে পেছন পেছন। উষ্ণ রোদ, আকাশ স্নিগ্ধ স্বচ্ছ।

বড়ো রাস্তার কাছাকাছি এসে গাড়োয়ান হঠাৎ বলে উঠল:

— আসছে গরমে আমার ছোট ছেলেটাকে আবার আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব, দিদিমণি। ভেড়া দেখাশোনার কাজে লাগবে আপনার, মনে হয়।

লাজুক হেসে মুখ ফেরাল ভেরা। টুপি খুলে, জিন থেকে ঝুঁকে পড়ে স্ত্রেশ্‌নেভ ভেরার হাতে অনেকক্ষণ ধরে চুমো খেল। রঙের পাক ধরা চুলে লেগে রইল ভেরার ঠোঁট, নরম গলায় সে বলল:

— নিজের যত্ন নিও, লক্ষ্মীটি। আমার সম্বন্ধে মন্দ ভেবো না কিন্তু।

বড়ো রাস্তায় পড়ে গাড়োয়ান কদমচালে ঘোড়া চালাতে খটখট করে গাড়িটা চলে গেল। ঘুরে নির্দিষ্ট কোনো পথ না বেছে সোজা মাঠের ওপর দিয়ে ঘোড়া চালাল স্ত্রেশ্‌নেভ। তখনো দূরে পেছিয়ে পড়া, পিছু ধাওয়া

কুকুরটাকে সোনালি ক্ষেতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ঘোড়া থামিয়ে তার দিকে চাবুক নাড়াতে লাগল স্ত্রেশ্‌নেভ। কুকুরটাও তখন থেমে, বসে পড়ে মনে হল জিজ্ঞেস করছে: 'কিন্তু তাহলে আমি যাই কোথায়?' আবার স্ত্রেশ্‌নেভ চলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে তাড়াহুড়ো না করে কুকুরটা পিছু দৌড়চ্ছে হালকা ক্ষিপ্র গতিতে। স্ত্রেশ্‌নেভের মন পড়ে আছে অনেক দূরের স্টেশনে, ঝকঝকে রেলে, দক্ষিণগামী ট্রেনটার ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে...

খাঁখাঁ মাঠে ঘোড়া নামিয়ে চলল সে। মাঠটা মাঝে মাঝে পাথুরে, সে সব জায়গা প্রায় তেতে উঠেছে। স্বচ্ছ নীল আকাশের নীচে ঝকঝকে চোখ ধাঁধানো হেমন্তের দিনটায় কোনো শব্দ নেই। নগ্ন মাঠঘাট, খাত, বিরাট রুশী স্তেপের সমস্তটা নিঃশব্দতায় বন্দী। কাঁটা গাছ আর শুকিয়ে যাওয়া বার্ডক থেকে তুলোর মতো আঁস আস্তে আস্তে উড়ছে হাওয়ায়। বার্ডকে বসে আছে ফিঞ্চপাখি। এভাবে তারা বসে থাকবে সারা দিন, শুধু কখনো-সখনো অন্য একটা জায়গায় উড়ে গিয়ে বসবে, আবার সুখে ও সৌন্দর্যে চলবে তাদের শান্ত জীবনযাত্রা।

কাপ্রি, ৩১. ১২ ১৯১২

সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোক

হায় বাবিলন, শক্তিমান নগরী।

এপোকালিপ্‌সিস

সান-ফ্রান্সিস্কোর সেই ভদ্রলোকটি — যাঁর নাম না নেপ্‌ল্‌সে, না কাপ্রিতে কারো মনে নেই — সস্ত্রীক সকন্যা চলেছেন পুরনো পৃথিবী ইউরোপের পথে, সেখানে পুরো দুটো বছর একমাত্র আমোদ-প্রমোদে গা ঢেলে দেবেন।

তাঁর কোনো সন্দেহ নেই যে বিশ্রাম, আমোদ-প্রমোদ, স্বচ্ছন্দ দীর্ঘ যাত্রা ও অন্য অনেক কিছুর অধিকার তাঁর আছে। এই দৃঢ় বিশ্বাসের কারণ ছিল অবশ্য, প্রথমত, তিনি ধনী, দ্বিতীয়ত, যদিও বয়স গড়িয়ে এখন

আটান্ন, এই সবে ঠিকমতো বাঁচা শুরু হয়েছে। এতদিন তো বাঁচেন নি, দেহধারণ করেছেন শুধু, অবশ্য মোটেই মন্দ চলে নি সেটা বলতে হবে, তবু সেটা তো কেবল দেহধারণ, অনাগত দিনগুলিতে তাঁর সমস্ত আশা নিবদ্ধ ছিল। কাজ করে গেছেন ক্রমাগত, নিঃশ্বাস ফেলার সময়টুকু পর্যন্ত পান নি—কাজের জন্য হাজারে হাজারে আমদানি করা চীনেরা ভালো করে জানে তার মানেটা!—অবশেষে তিনি বুঝলেন অনেক কিছু করে ফেলা হয়েছে, এককালে যাঁদের দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরেছিলেন প্রায় তাঁদের স্তরে অবতীর্ণ হয়েছেন, আর তখনি ঠিক করলেন ছুটি ভোগ করতে হবে। যে শ্রেণীর লোক তিনি তাঁদের রেওয়াজ, জীবন উপভোগের সময় এলে ইউরোপ, ভারতবর্ষ ও মিসর ভ্রমণ দিয়ে শুরু করা। ঠিক তাই করা তিনি সিদ্ধান্ত করলেন। খাটুনির বছরগুলোর প্রতিদান পাওয়া যে তাঁর প্রধান চিন্তা হবে সেটা স্বাভাবিক; তবে স্ত্রী কন্যার কথা ভেবেও তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন। অনুভূতিপ্রবণ বলে তাঁর স্ত্রীর খ্যাতি ছিল না কোনকালেই, কিন্তু মাঝবয়সী সব আমেরিকান মহিলাদেরই ভ্রমণের সখ অতি তীব্র। আর কন্যাটি, তার বয়স কম নয়, রুগ্ণ গোছের মেয়েটি, তার তো ঘুরে আসা অতি আবশ্যক: স্বাস্থ্যোন্নতির

কথাটা না হয় ছেড়ে দেওয়া যাক, জাহাজে যে সব সুখকর দোস্তি হয়েছে বলে শোনা যায় তার কথাও ভাবতে হবে। ডিনারের সময় হয়ত দেখলেন খাস কোটিপতির পাশে বসে ফ্রেস্‌কা দেখছেন। সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটি যে যাত্রাপথ ঠিক করে রেখেছিলেন তার প্রসর কম নয়। ডিসেম্বর ও জানুয়ারিতে দক্ষিণ ইতালির সূর্যালোকে অবগাহন, প্রাচীন দৃশ্য, তারানতেলা, ভ্রাম্যমাণ গাইয়েদের নৈশ প্রেমসঙ্গীত উপভোগের ইচ্ছা তাঁর, আর ইচ্ছা একটা জিনিসের যেটা তাঁর বয়সের লোকেরা বিশেষ ধরনের তীব্রতায় উপভোগ করে — সেটি হল নেপ্‌ল্‌সের মেয়েদের প্রেম, সে প্রেম সম্পূর্ণ নিরাসক্ত না হয় নাই হল; কার্নিভাল সপ্তাহ নীস ও মণ্টিকার্লোতে কাটাবেন ঠিক করলেন, সে সময়টায় ওখানে জড়ো হন সমাজের সেইসব বাছাই-করা লোক, — আমাদের এই সভ্য পৃথিবীর সমস্ত কিছু সৌভাগ্যের দণ্ডমুণ্ডের ভার যাঁদের হাতে: এই ধরুন, ডিনার জ্যাকেটের একেবারে হালের কাট ঠিক করা, রাজসিংহাসনের স্থায়িত্ব রক্ষা, যুদ্ধ ঘোষণা ও হোটেলের উন্নতি সাধন, — একদল ওখানে উত্তেজিতভাবে যোগ দেন মোটরগাড়ি ও নৌকার রেসে বা রুলেটে, অন্যরা চালান যাকে বলে হালকা

ফষ্টিনষ্টি, আবার কেউ কেউ গুলি ছুঁড়ে পায়রা মারেন — খোপ ছাড়া হয়ে পায়রাগুলো অপরাজিতা ফুলের মতো সমুদ্রের গায়ে মরকত-শ্যাম মাঠের ওপরে সুন্দরভাবে উড়ে সাদা বলের মতো ঝপ করে পড়ে যায় এক নিমেষে; ভদ্রলোকটির ইচ্ছা মার্চের প্রথম দিকটা ফ্লোরেন্সে কাটিয়ে খৃষ্টের পুনরুত্থান পর্ব নাগাদ রোমে গিয়ে ৫১ নম্বরের স্তোত্রসঙ্গীত শোনা; তাঁর পরিকল্পনার মধ্যে পড়ে ভেনিস ও প্যারিস ভ্রমণ, সেভিলে ষাঁড়ের লড়াই দর্শন, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে স্নান, তারপর এ্যাথেন্স্, কন্স্টান্টিনপোল, প্যালেস্টাইন, মিসর, মায় জাপান পর্যন্ত — অবশ্য, ফেরার পথে... আর সবকিছু শুরু হল চমৎকারভাবে।

নভেম্বরের শেষ তখন, জিব্রল্টার পর্যন্ত সারা পথ কনকনে কুয়াসা আর স্যাঁতসেঁতে তুষার-ঝড় তাদের সঙ্গ ছাড়ল না; কিন্তু সমুদ্রযাত্রা চলল বেশ নিরাপদে। জাহাজে অনেক যাত্রী, বিখ্যাত 'আৎলান্তিদা' জাহাজটি সুযোগ-সুবিধায় ভরা প্রকাণ্ড একটা হোটেলের মতো,— মদ্যপানের নৈশ বার, প্রাচ্য রীতির হামাম, নিজস্ব সংবাদপত্র, — জাহাজে জীবনযাত্রা চলল বাঁধাধরা নিয়মে: কুয়াসায় গভীর ধূসর-সবুজ আন্দোলিত সমুদ্রের ওপর ধীর বিরসভাবে ভোর হবার সেই ঝাপসা

অন্ধকার সময়টায় জাহাজের করিডরে বিউগলের তীক্ষ্ম আওয়াজ সকাল-সকাল ঘুম ভাঙে; ফ্লানেলের পায়জামা পরে নিয়ে কফি, তরল চক্‌লেট বা কোকো পান; তারপর শ্বেতপাথরের স্নানের টবে স্নান সেরে নিয়ে মেজাজ শরীফ করা ও ক্ষুধা উদ্রেকের জন্য ব্যায়াম, তারপর দৈনন্দিন প্রাতঃকৃত্য সেরে ছোট হাজরির পালা; আবার ক্ষিধে চাগিয়ে নেবার জন্য এগারোটা পর্যন্ত ডেকে পা চালিয়ে পায়চারি করে সমুদ্রের ঠাণ্ডা তাজা হাওয়া খাওয়া বা সাফ্‌ল-বোর্ড ইত্যাদি খেলা আর এগারোটা বাজলে — স্যাণ্ডেউইচ ও বুলিয়ন খেয়ে শক্তি সঞ্চয়; দেহে বল পেয়ে জাহাজের খবরের কাগজটা বেশ রসিয়ে পড়ে লাঞ্চের জন্য শান্তভাবে বসে থাকা — লাঞ্চটা ছোট হাজরির চেয়েও স্বাস্থ্যকর, পুষ্টিকর, ভোজনের পর্বগুলি আরো বিবিধ। পরের দুটো ঘণ্টা বিশ্রামের পালা; গোটা ডেকটায় সারি সারি ডেক-চেয়ার, কম্বল গায়ে জড়িয়ে যাত্রীরা হেলান দিয়ে শুয়ে হয় রেলিঙের মধ্য দিয়ে তাকিয়ে থাকেন মেঘলা আকাশ ও ফেনিল সমুদ্রের দিকে, নয় মিঠে তন্দ্রায় বিভোর হয়ে যান। চারটের পর তরতাজা হয়ে ওঠা প্রফুল্ল যাত্রীদের দেওয়া হয় খোসবাই-ওঠা কড়া চা আর বিস্কুট; সাতটার সময়

বিউগলের আওয়াজ জানিয়ে দেয় সেই সময়টি আসন্ন যেটি এই অস্তিত্বের একমাত্র উদ্দেশ্য ও চরম আনন্দ... আর বিউগলের ডাকে জেগে উঠে সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটি শক্তি ও প্রাণের নবীন সঞ্চারে হাত ঘষতে ঘষতে যান নিজের জমকালো ডি-লক্স কামরায়—সেজে নিতে।

রাত্রে 'আৎলান্তিদাকে' দেখে মনে হয় অগণন জ্বলন্ত চোখে চেয়ে আছে অন্ধকারে, এদিকে নীচেকার রান্না আর ভাঁড়ার ঘরে আর মদ রাখার জায়গায় কর্মব্যস্ত কত না বেয়ারা। জাহাজের গা ছাড়িয়ে ভয়াবহ মহাসমুদ্র, কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই কারো, সকলের দৃঢ় বিশ্বাস সমুদ্রকে সামলাবে ক্যাপ্টেন, বিকটাকার মেদবহুল লালচুল সেই লোকটির সর্বদা ঘুমিয়ে পড়া একটা ভাব, জরির ফিতে দেওয়া কালো কোট পরিহিত মানুষটিকে দেখতে বিরাট একটি বিগ্রহের মতো, নিজের রহস্যময় আস্তানা থেকে যাত্রীদের সঙ্গে সময় কাটাতে সে আসে কদাচিৎ; জাহাজের সামনের দোতলায় চলেছে নারকীয় বিষণ্ণতায় সাইরেনের আর্তনাদ আর উদ্দাম ক্রোধে তীক্ষ্ন চীৎকার, কিন্তু আওয়াজটা চমৎকার একটা তার-অর্কেস্ট্রার বাজনায় চাপা পড়াতে কানে যায় না অনেকের — দু'থাকি জানলা দেওয়া শ্বেত পাথরের

হল-ঘরে অক্লান্ত, অপরূপ সে বাজনা, মখমলের কার্পেট বেছানো মেঝে, উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত ঘরটায় নীচু কাটের সান্ধ্য পোষাক পরিহিতা মহিলা আর টেল-কোট বা ডিনার-জ্যাকেট গায়ে ভদ্রলোক, ছিমছাম ওয়েটার আর বিনীত maitres d'hotel-এর ভিড়, আর তাদের ভেতর একজন কেবল মদ পরিবেশন করার লোক, তার গলায় সত্যি সত্যি লর্ড মেয়রের মতো একটা চেন ঝোলানো। ডিনার-কোট আর মাড় দেওয়া শার্টে পরাতে বয়সের তুলনায় অনেক নবীন দেখায় সান-ফ্রান্সিস্কোর সেই ভদ্রলোকটিকে। পাতলা, নাতিদীর্ঘ, শরীরের গঠন বেঢপ হলেও খাপছাড়া নয়, চোখে মুখে চিকচিকে একটা জেল্লা নিয়ে সংযত ফুর্তিতে ঘরটার রত্নোপম সোনালী আভায় বসে থাকেন, সামনে রজন রঙের এক বোতল মদ, সারবন্দী মিহি কাঁচের ছোট বড়ো পানপাত্র আর ফুলদানিতে বঙ্কিম হায়াসিন্‌ত্‌। ছাঁটা সাদা গোঁফওয়ালা হলদেটে মুখটায় মঙ্গোলীয় একটা ভাব, সোনা বাঁধানো দাঁতের ঝিলিক, শক্ত টাক পুরনো হাতির দাঁতের মতো চকচকে। দশাসই চেহারার শান্তপ্রকৃতির তাঁর স্ত্রীর গায়ে যে পোষাক তা দামী কিন্তু বয়সের উপযোগী; আর মেয়েটি — পাতলা লম্বা চেহারা, সুন্দর চুল মধুরভাবে বাঁধা,

মুখে নিঃশ্বাসে ভাওলেট ফুলের মিষ্টি গন্ধ, ঠোঁটের কাছে আর গলার হাড়ের নীচে গোলাপী রঙের অতি ছোট ছোট ব্রণে অল্প একটু পাউডারের ছোপ, আর তার গাউনটা পোষাকী হলেও হালকা ও স্বচ্ছ, নিষ্পাপভাবে খোলাখুলি গোছের... ডিনার পর্ব চলে এক ঘণ্টার বেশী, তারপর বলরুমে নাচ; নাচের সময়টা পুরুষেরা — তাদের মধ্যে যে সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটি থাকবেন বলাই বাহুল্য — আরাম কেদারায় গা ছড়িয়ে বসেন পা তুলে, স্টক এক্সচেঞ্জের একেবারে হালের খবরের ওপর নির্ভর করে দেশবিদেশের ভাগ্য নির্ণয় করতে লাগেন, হাবানা সিগার খেয়ে খেয়ে মুখ লাল হয়ে ওঠে আর নেশা ধরে যায় বারে লিকিওর খেয়ে, সেখানে পরিবেশনের ভার নিগ্রোদের হাতে, লাল কোট যাদের পরনে, চোখের তারা খোসা ছাড়ানো সেদ্ধ ডিমের মতো। দেওয়ালের বাইরে পর্বত প্রমাণ কালো ঢেউয়ে মহাসমুদ্রের ফোঁসানি আর গর্জন, জাহাজের ভিজে ভারি রশারশি ভেদ করে আসে ঝড়ের সাঁই সাঁই শব্দ, থরথর করে কেঁপে ঝুকে ঝড় ও কালো ঢেউয়ের পাহাড় লাঙলের মতো কেটে অতি কষ্টে চলে জাহাজটা, বিক্ষুব্ধ বীচিমালা বারবার গাঁজলায় ভেঙে পড়ে ওপরে পাঠায় ফেনার শিখা, — কুয়াসায় রুদ্ধশ্বাস

সাইরেনটা ডেকে চলে মুমূর্ষু যন্ত্রণায়, ওপরে নিজেদের জায়গাটায় পাহারাদারেরা ঠাণ্ডায় জমে যায়. পাহারার অসহ্য একাগ্রতায় তাদের মাথা ভোঁ ভোঁ করে, আর জলের নীচে জাহাজের পেটটা যেন নরকগর্ভের সবচেয়ে ভয়াবহ ও গুমোট সেই নবম চক্র — সেখানে জাহাজের পেটে দরবিগলিত কটুগন্ধ ঘামে ভিজে, অগ্নিশিখায় ঘোর লাল চেহারার নোংরা অর্ধনগ্ন মানুষেরা সশব্দে মণের পর মণ কয়লা ঢালাতে বিরাট চুল্লিগুলো জ্বলন্ত পাকাশয়ে সেগুলোকে বেমালুম হজম করে অট্টহাসি হাসে; ওদিকে ওপরে বারে লোকেরা চেয়ারের হাতলে পা তুলে দেয়, নিশ্চিন্তে চুমুক পড়ে ব্র্যাণ্ডি ও লিকিওরে, বাতাসে ভাসে খোসবাই ধোঁয়া আর বলরুমে তো সবকিছু ঝকঝকে, বিচ্ছুরিত হয় আলো, উষ্ণতা আর আনন্দ, জোড়ায় জোড়ায় চলে ওয়ালজের ঘুরপাক বা টাঙ্গোর দোলানি — বাজনা অক্লান্তভাবে বেহায়া-মিষ্টতার বিষণ্ণ সুরে জানিয়ে চলে তার আবেদন, সেই একই আবেদন সর্বদা... এই সব কেষ্টবিষ্টুর ভিড়ে ছিলেন একজন সুপরিচিত কোটিপতি, রোগা, দাড়িগোঁফ কামানো, লম্বা, সেকেলে ড্রেস-কোট পরা ভদ্রলোকটি দেখতে প্রধান যাজকের মতো, ছিলেন স্পেনদেশের একটি বিখ্যাত লেখক, ডাকসাইটে সুন্দরী

একজন, আর একজোড়া ছিমছাম প্রেমিক-প্রেমিকা; সবাই তাদের দেখত কৌতুহল ভরে, নিজেদের সুখ গোপন রাখার বালাই নেই তাদের: **ছেলেটি** নাচে শুধু **এই মেয়েটির** সঙ্গে। আর তাদের হাবভাব ব্যবহার এত অপরূপ ও মধুর যে, ক্যাপ্টেন ছাড়া আর কেউ জানত না যে মোটা টাকা দিয়ে প্রেমের অভিনয় করার জন্য ওদের ভাড়া করেছে লয়েড্‌স, এই কোম্পানির জাহাজগুলোর কখনো এটায় কখনো ওটায় তাদের বাস বহুদিন।

জিব্রল্টারের রোদে খুশি হল সবাই, আবহাওয়া মনে হল বসন্তের গোড়ার দিকের মতো। 'আৎলান্তিদায়' আবির্ভাব হল নতুন যাত্রীর, সঙ্গে সঙ্গে সবায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তিনি — এশিয়ার কী একটা দেশের যুবরাজ, পরিচয় গোপন রেখে চলেছেন, ছোটখাটো মানুষটি, একেবারে ভাবলেশহীন চেহারা, মুখটা চওড়া, চোখদুটো সরু, সোনার ফ্রেমের চশমা, গোঁফের মোটা কালো গাছিগুলো মড়ার গোঁফের মতো খড়খড়ে বলে একটু অপ্রীতিকর দেখায় বটে, কিন্তু মোটের ওপর লোকটি বেশ, সহজসরল, জাঁক নেই। ভূমধ্যসাগরে আবার পাওয়া গেল শীতের আভাস, সম্পূর্ণ পরিষ্কার ও ঝকঝকে একটি দিনে জাহাজের দিকে পাগলের মতো

ফ্র্তিতে ছুটে এল উত্তুরে হাওয়া, তার ঝাপটায় ফুঁসে উঠল সমুদ্র ময়ূরের পুচ্ছের মতো নানা-রঙা উঁচু ঢেউয়ে... তারপর, দ্বিতীয় দিনে, বিবর্ণ হয়ে এল আকাশ, দিকচক্রবালে কুয়াসার আবরণ: তীরের কাছাকাছি এসে পড়েছে জাহাজ, দেখা গেল ইস্কিয়া ও কাপ্রির আভাস, আর দূরবীন দিয়ে দেখলে চোখে পড়ে ফিকে-নীল কী একটার নীচে চিনির ঢেলা ছড়ানো, সেটা হল নেপ্‌ল্‌স... মহিলা ও ভদ্রলোকেরা অনেকে এরই মধ্যে গায়ে চাপিয়েছেন হালকা ফারকোট; বিনীত চীনে 'বয়রা', যারা সর্বদা কথা বলে ফিসফিসিয়ে, বাঁকা-পা যে সব ছোকরাদের কালো কুচকুচে বেণী নেমেছে পায়ের ডগা পর্যন্ত, যাদের চোখের ভুরু মেয়েদের মতো পুরু, তারা ধীরে ধীরে কম্বল, ছড়ি, স্যুটকেশ ও জামাকাপড়ের বাক্স নিয়ে যাচ্ছে কামরাগুলোর সিঁড়ির দিকে... সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটির দুহিতা আগের রাত্রে সৌভাগ্যক্রমে পরিচিত হওয়া যুবরাজের পাশে ডেকে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি মৃদু কণ্ঠে দূরের যেখানে আঙুল দেখিয়ে তিনি কী বুঝিয়ে বলছেন সেদিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকার ভাণ করছে; এত বেঁটে মানুষটি যে অন্যদের পাশে দেখাচ্ছেন নেহাৎ ছেলেমানুষ, চেহারাটা দেখতে

ভালো নয়, বিচিত্র, — চশমা, বোলার টুপি ও ইংরেজী ওভারকোট, ঘোড়ার লোমের মতো কর্কশ খড়খড়ে গোঁফ — চাপা মুখে ফিকে জলপাই রঙের চামড়া এঁটে বসেছে, মনে হয় মুখটায় পাতলা এক প্রস্থ বার্নিশ দেওয়া,—কিন্তু মেয়েটি তাঁর কথা শুনছে এত উত্তেজিত হয়ে যে কী বলছেন মাথায় ঢুকছে না এতটুকু; অদ্ভুত মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে সে, বুক বেজায় ঢিপঢিপ করছে: ভদ্রলোকটির সবকিছু, খুঁটিনাটি সবকিছু কেমন আলাদা, — তাঁর শুকনো হাত, চিকন চামড়া, যার নীচে বইছে প্রাচীন রাজারাজড়ার রক্ত; তাঁর জামাকাপড় ইউরোপীয় ও সাদাসিধে হলেও কেন জানি অত্যন্ত দুরস্ত, এ সবকিছু তার কাছে একটা অসাধারণ মোহের ব্যাপার। এদিকে পেটেণ্ট লেদার জুতোর ওপরে ছাই-রঙা গেটার পরে সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটি বারবার তাকাচ্ছেন পাশের ডাকসাইটে সুন্দরীটির দিকে, দীর্ঘাঙ্গিনী ব্লণ্ড মহিলাটির গড়ন অপরূপ, প্যারিসের একেবারে হালকেতায় চোখের সাজ, পাতলা রুপোর চেনে বাঁধা একটা লোমহীন কুঁজোপিঠ ক্ষুদে কুকুরকে কী বলে চলেছিলেন তিনি। কেন জানি অস্বস্তি লাগাতে দুহিতা ভাবল বাপের দিকে আর তাকাবে না।

ভ্রমণের সময় ভদ্রলোকটির হৃদয় দরাজ ছিল। তাই যারা তাঁকে খাওয়ায়, সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত মনের সামান্যতম অভিলাষ আঁচ করে সেবা করে, মনের শান্তি রক্ষা করে ফিটফাট রাখে, তাঁর হয়ে কুলি ডেকে তোরঙ্গগুলো পাঠিয়ে দেয় হোটেলে, তাদের হিতাকাঙ্ক্ষায় অগাধ বিশ্বাস তিনি রাখতেন। সর্বত্র তো এ রকম ঘটেছে, জাহাজে ব্যতিক্রম হয় নি, নেপ্ল্সেও হবে সে রকম। যত কাছে আসছে শহরটা তত বড়ো দেখাচ্ছে; জাহাজের বাজিয়ের দল রোদে ঝলকানো বাদ্যযন্ত্র নিয়ে এরই মধ্যে জড়ো হয়েছিল ডেকে, হঠাৎ তারা কানে তালা লাগিয়ে বাজাতে লাগল জয়যাত্রার একটি সুর; পোষাকী ইউনিফর্ম গায়ে দানব ক্যাপ্টেন নিজের মঞ্চে আবির্ভূত হয়ে অনুগ্রহ দেখানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়ল যাত্রীদের উদ্দেশ্যে, পৌত্তলিকদের করুণাময় দেবতার মতো — আর সকলের মতো, সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটি ভাবলেন গরীয়ান আমেরিকার বজ্রনির্ঘোষের মতো এই জয়যাত্রার সুর বাজানো হচ্ছে শুধু তাঁরই খাতিরে, ক্যাপ্টেন ব্যক্তিগতভাবে শুধু তাঁরই শুভ অবতরণ কামনা করছে। অবশেষে বন্দরে ঢুকল 'আৎলান্তিদা', রেলিঙে ভিড় করে দাঁড়ানো লোক সুদ্ধ তার বহুতল দেহ বাঁধা হল উত্তরণ মঞ্চে, নামার

পাটাতনের শেকলগুলো উঠল ঝনঝনিয়ে — তখন হোটেলের অসংখ্য চাপরাশি ও জরি-লাগানো টুপি মাথায় তাদের সহকারীরা, নানা ধরনের দালাল, সিটি দেওয়া ফচকে ছোঁড়া, গুচ্ছির রঙীন পোস্টকার্ড হাতে ষণ্ডা ভিখিরীর দল ছুটে এল সেবা নিবেদন করে! আর ভদ্রলোকটি হোটেলের গাড়ির দিকে যেতে যেতে, সে হোটেলে হয়ত যুবরাজও উঠবেন, ভিখিরীদের দিকে তাকিয়ে স্মিত হেসে, দাঁতে দাঁত চেপে অনুচ্চ কণ্ঠে, প্রথমে ইংরেজী ও পরে ইতালীয় ভাষায় বলে উঠলেন:

— Go away! Via!*

নেপ্‌ল্‌সে জীবনযাত্রা ঘড়ির কাঁটার মতো নিয়মিত চলতে দেরী হল না একটুও: সকাল সকাল বিরস খাবার ঘরে ছোট হাজরি, মেঘলা আকাশ পরিষ্কার হবার আশা কম, দরদালানের দরজায় গাইডের ভিড়; তারপর উষ্ণ গোলাপী সূর্যের মুখে প্রথম হাসি দেখা দেয়, তারপর উঁচু বারান্দা থেকে চোখে পড়ে ভোরের চিকচিকে বাষ্পে একেবারে আচ্ছাদিত ভিসুভিয়াস, উপসাগরে মুক্তোর মতো রুপোলী লহরী আর দিগন্তে কাপ্রির বিবর্ণ রেখা, ছোট গাড়িতে জোতা ক্ষুদে গাধা তরতর

* সরে যাও! (ইতালীয়)

করে চলেছে নীচের কর্দমাক্ত জাহাজ ঘাটা হয়ে, কোথায় যেন বলিষ্ঠ যুদ্ধং দেহি সঙ্গীতের সঙ্গে তাল রেখে কুচকাওয়াজ করছে খেলাঘরের মতো ছোট সৈনিকদের দল; তারপর — গাড়িতে চেপে রাস্তার ভিড়াক্রান্ত সরু ধূসর ফালি হয়ে মন্থর যাত্রা, দুপাশে উঁচু, বহু গবাক্ষ বাড়ি, মিউজিয়মে যাওয়া, সেগুলো কবরখানার মতো কঠোর ও পরিষ্কার, আলো সমান ও প্রীতিকর বটে তবে বরফের মতো বিরস, কিম্বা ঠাণ্ডা, মোমের গন্ধে ভরা গির্জায় যাওয়া, সেখানে একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি বারবার: ভারি চামড়ার পর্দা ঝোলানো জমকালো প্রবেশপথ, ভেতরে — বিরাট শূন্যতা ও স্তব্ধতা. সাত-শাখার ঝাড়বাতির নরম লাল আলো পড়েছে লেসে মোড়া বেদীতে, কাঠের কালো কালো আসনগুলির মাঝে একটি মাত্র বৃদ্ধা, পায়ের নীচে কবরের পেছল ফলক আর দেয়ালে কার যেন আঁকা 'ক্রুশ থেকে অবতরণ' — ছবিটা প্রসিদ্ধ না হয়ে উপায় নেই; একটার সময় সান-মার্তিনো পাহাড়ে লাঞ্চ, যেখানে দুপুরের দিকে জড়ো হন বেশ কয়েক জন মান্যগণ্য লোক, আর যেখানে একবার সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটির কন্যা প্রায় মূর্ছা গিয়েছিল: তার মনে হয়েছিল যুবরাজকে দেখেছে হলে, যদিও খবরের কাগজ থেকে তার জানাই ছিল যে তিনি রোমে;

পাঁচটা বাজলে — হোটেলের সেই পুরু কার্পেট ও গণগণে আগুনে গরম চমৎকার ড্রয়িং-রুমে চা দেওয়া হত; তারপর ডিনারের জন্য সাজগোজ — আবার গোটা হোটেলটায় ঘণ্টার সুরেলা ভরাট বলিষ্ঠ আওয়াজ, আবার নীচু-কাট গাউন-পরা মহিলারা সিল্ক খসখসিয়ে সার বেঁধে সিঁড়ি হয়ে নামার সময় ছায়া ফেলেন আয়না লাগানো দেয়ালে, আবার ডাইনিং-রুমের দরজাগুলো আতিথেয়তা জানিয়ে হাট হয়ে খুলে যায়, মঞ্চে লাল কোট গায়ে বাজিয়েরা, কালো ওয়েটারের ভিড় হোটেলের ম্যানেজারকে ঘিরে, ম্যানেজারবাবু সুদক্ষভাবে সাদা-লাল রঙের ঘন সুপ প্লেটে ঢালতে ব্যস্ত... ডিনার ব্যাপারটা খাদ্যে, সুরায়, খনিজ জলে, মিষ্টান্নে ও ফলে এত এলাহী যে এগারোটার মধ্যে ঘরে ঘরে গিয়ে অতিথিদের পেট গরম করার জন্য গরম জল ভরা রবারের বোতল দিয়ে আসতে হত পরিচারিকাদের।

সে বছরে অবশ্য ডিসেম্বরটা খুব ভালো ছিল না: হোটেলের দারোয়ানদের কাছে আবহাওয়ার কথা তুললে তারা শুধু দোষী-দোষী ভাবে কাঁধটা উঁচু করে নীচু গলায় বলত যে এরকম একটা শীতকাল আর দেখেছে বলে মনে হয় না; অবশ্য এই প্রথম যে তারা এটা বলতে বাধ্য হচ্ছে তা নয়, এই প্রথম তারা 'সর্বত্র তাজ্জব কী

একটা ঘটছে’ তার ওপর দোষটা চালিয়ে দিচ্ছে না: রিভিয়েরায় অভূতপূর্ব ঝড় আর বৃষ্টি, এ্যাথেন্সে বরফ, এটনাও বরফে ঢাকা, রাত্রে ছড়ায় কী একটা আভা, আর পালের্মো, সেখানে এত ঠাণ্ডা যে ট্যুরিস্টরা পড়ি-কি-মরি করে পালাচ্ছে... ভোরের সূর্য প্রতিদিন ধোঁকা লাগায় তাদের: দুপুরবেলায় আকাশ ধূসর হয়ে যাবেই, ঝিরঝিরে বৃষ্টি নামবে, আর যত সময় গড়ায় তত ঠাণ্ডা আর কর্কশ দিন; তারপর হোটেলের প্রবেশপথে পাম গাছগুলো ধাতব দীপ্তিতে ঝকঝক করে ওঠে, শহরটাকে দেখায় বিশেষ নোংরা আর কোণঠেসা, মিউজিয়মগুলো বড়ো একঘেয়ে, সিগারের টুকরো, সেগুলো ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলেছে মোটা গাড়োয়ানগুলো যাদের অসহ্য দুর্গন্ধযুক্ত রবারের ওপর-কোটের কানাত হাওয়ায় ফৎফৎ করে পাখার মতো — অস্থিচর্মসার ছ্যাকরা ঘোড়ার ওপর যাদের জোর চাবুক হাঁকড়ানোটা যে শুধু ছল বুঝতে বাকি থাকে না; ট্র্যামলাইন সাফ করা লোকগুলোর বুট কী ভয়াবহ, আর কালো চুলে টুপি না চাপিয়ে বৃষ্টি মাথায় ক’রে কাদা ভেঙে চলে যেসব স্ত্রীলোকেরা — তাদের পাগুলো কী বীভৎস ছোট; আর জলের গেঁজানো পাড় থেকে আসা স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা আর পচামাছের দুর্গন্ধ, এ বিষয়ে যত কম বলা যায় তত

ভালো। সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটি ও ভদ্রমহিলার মধ্যে এবারে রোজ সকালে ঝগড়া শুরু হল; মাথা ধরেছে বলে কন্যা হয় ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখে ঘুরে বেড়ায়, নয় হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে উঠে দুনিয়ার সবকিছুতে গভীর উৎসাহ দেখায়, তখন তাকে মনে হয় মধুর সুন্দর: শিরায় শিরায় অসাধারণ রক্ত প্রবহমান সেই কুৎসিত লোকটি তার মনে জাগায় কী সুন্দর কোমল ও জটিল সব অনুভূতি, মেয়েদের অন্তরে যা সাড়া জাগায়, — হোক না সেটা ধন, প্রসিদ্ধি বা খ্যাতি, সেটা তো সত্যি শেষ পর্যন্ত এমন বড়ো কথা নয়... সবাই তাদের ভরসা দিল যে সরেণ্টো ও কাপ্রির হালচাল একেবারে অন্য রকমের — সেখানে আরো রোদ, আরো আলো, লেবু গাছে ফুল ধরেছে, সেখানকার লোকেরা আরো সুজন, সেখানকার মদ আরো খাটি। তাই সান-ফ্রান্সিস্কোর পরিবার নিজেদের বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে কাপ্রিতে যাওয়া ঠিক করল, তাদের মৎলব কাপ্রি দেখবে, এককালে যেখানে টাইবেরিয়াসের প্রাসাদ ছিল সেখানকার পাথরে ঘুরে-টুরে, এজিওর গ্রট্টোর প্রসিদ্ধ গুহা দেখে, খ্রিসমাসের আগে পুরো এক মাস ধরে দ্বীপে ঘুরে ঘুরে কুমারী মেরির প্রশংসাগান যারা করে সেই আব্রুজ্জিও ব্যাগপাইপ বাজিয়েদের বাজনা শুনে সরেণ্টোতে গিয়ে আস্তানা গাড়া।

প্রস্থানের দিনটায়, — সান-ফ্রান্সিস্কোর পরিবারের পক্ষে স্মরণীয় সেই দিনটায়! — এমনকি সকালের সেই মামুলী সূর্যটিকে পর্যন্ত দেখা গেল না। ভারি কুয়াসা ভিসুভিয়সকে একেবারে ঢেকে সমুদ্রের সীসে-রঙা বুকে ধূসর নীচ মেঘে ছড়িয়ে পড়েছে। কাপ্রি চোখে পড়ে না একেবারে — যেন জায়গাটার অস্তিত্ব ছিল না কোনো কালে। আর কাপ্রিগামী ছোট জাহাজটা এত এপাশ-ওপাশ দুলতে লাগল যে সান-ফ্রান্সিস্কোর পরিবারটিকে হতচ্ছাড়া জাহাজটার যাচ্ছেতাই সেলুনে কম্বলে পা ঢেকে সোফায় উবুড় হয়ে চোখ বুজে শুয়ে থাকতে হল, গা এত ঘোলাচ্ছিল। ভদ্রমহিলা ভাবলেন তাঁর যন্ত্রণা সবচেয়ে বেশী; বারবার বমি করে মারা যাবেন মনে হল, আর এদিকে বমি করার পাত্র নিয়ে তাঁর কাছে ছোটাছুটি করা মেয়েটির মুখে শুধু হাসি, — দিনের পর দিন, কী গরমে কী ঠাণ্ডায় বহু বছর এ সমুদ্র সে পাড়ি দিয়েছে, — তবু সে অদম্য। একেবারে মড়ার মতো ফ্যাকাশে মুখে কন্যাটি এক টুকরো লেবু দাঁতে চিপে রেখেছে। ঢিলে ওভারকোট ও বড়ো একটা টুপি পরে ভদ্রলোকটি চিৎ হয়ে শুয়ে চোয়াল আলগা করেন নি একবারও সারা পথটা; মুখে কালি পড়ে গেছে, গোঁফটা দেখাচ্ছে আরো পাকা, মাথা যেন ফেটে যাচ্ছে: আবহাওয়া

বেজায় খারাপ বলে যাত্রার আগের কয়েকটি রাতে বড়ো বেশী নেশা করা আর কয়েকটা বেপাড়ায় গিয়ে 'জীবন্ত দৃশ্য' দেখা হয়েছে। এদিকে খটখট আওয়াজ তোলা পোর্ট-হলে সমানে বৃষ্টির কষাঘাত, জল চুঁইয়ে পড়ছে সোফায়, মাস্তুলে দমকা হাওয়ার আর্তনাদ, থেকে থেকে ঢেউয়ের উত্তাল আক্রমণের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জাহাজটাকে কাৎ করে দিচ্ছে, তখন নীচে শোনা যাচ্ছে কী একটার ঘড়ঘড় গুরুগুরু ধ্বনি। কাস্টেলমারা, সরেণ্টোতে জাহাজ যখন লাগল তখন অবস্থা একটু শান্ত; কিন্তু সেখানেও ঢেউয়ের দাপট এত ভয়ঙ্কর যে খাড়া পাহাড়, বাগান, পাইনকুঞ্জ, গোলাপী ও সাদা হোটেল এবং অন্ধকার কুঞ্চিত সবুজ টিলাসুদ্ধ তীরটা মনে হল দোলনায় সজোরে ওঠানামা করছে; নৌকোগুলো বারবার লাগছে জাহাজের গায়ে, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা চেঁচাচ্ছে উত্তেজনায়, কোথায় যেন চেপটে গুঁড়ো হয়ে গেছে এমন ভাবে একটা বাচ্চা কেঁদে ককিয়ে উঠছে, জোলো হাওয়ার স্রোত দরজা দিয়ে ঢুকছে অবিরাম, 'Royal' হোটেলের পতাকা জাঁকিয়ে লাগানো ঢেউয়ে ওঠাপড়া একটা নৌকোয় একটি ছেলে অবিশ্রাম আধ-আধ তীক্ষ্ন গলায় যাত্রীদের মন কাড়বার চেষ্টায় চেঁচিয়ে চলেছে: 'Kgoya-al! Hôtel Kgoya-al!..' আর নিজেকে

অত্যন্ত বুড়ো বোধ করে — যেমনটা বোধ করা উচিত তাঁর, — সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটি এবার বিরক্তিতে ও রাগে ভাবলেন সেই সব 'Royal', 'Splendid', 'Excelsior' হোটেল আর সেই সব লোভী,রশুনগন্ধি, ছোটখাটো হতচ্ছাড়াগুলোর কথা, যাদের দেশ ইতালি; একবার, জাহাজটা তখন থেমেছে, চোখ খুলে সোফায় উঠে বসাতে জলের ধারে গোটা কয়েক নৌকোর কাছে খাড়া পাহাড়ের পাদদেশে একটার পর একটা বেরিয়ে-আসা, শেওলার ছোপ ধরা, পাথরের তৈরী এমন দুঃস্থ ও ছোট কয়েকটা ঘরের গাদা আর ছেঁড়া নেকড়া, খালি টিন আর তামাটে মাছ ধরার জালের স্তূপ চোখে পড়ল যে তিনি হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে ভাবলেন এই হল আসল ইতালি, যেখানে তিনি এসেছেন আমোদ-প্রমোদের জন্য... অবশেষে, অন্ধকার হয়ে গেছে তখন, নীচে ছোট লাল বাতির শিখায় বিদ্ধ দ্বীপটির কালো পুঞ্জ কাছে, আরো কাছে এসে পড়ল; বেগ কমে গিয়ে হাওয়া হল উষ্ণ আর সুগন্ধি, জাহাজঘাটের ল্যাম্পপোস্ট থেকে আলোর সোনালি সাপ কালো তেলের মতো চকচকে দমে-যাওয়া ঢেউয়ের ওপর দিয়ে এল ভেসে... তারপর হঠাৎ ঘড়ঘড় শব্দে, শেকল ঝনঝনিয়ে ঝপাঙ করে জলে নোঙর পড়ল, চারদিকে রেশারেশি করা

মাঝিদের তীব্র হাঁকডাক — আর সঙ্গে সঙ্গে মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠল, কেবিনের আলো আরো উজ্জ্বল, যেন ইচ্ছে হল খানাপিনার, ধূমপানের, চলাফেরার... দশ মিনিট পরে বড়ো একটা বজরায় চাপল সান-ফ্রান্সিস্কোর পরিবার, মিনিট পোনেরো পরে জাহাজঘাটে নেমে একটা ছোট্ট ঝকঝকে মোটরগাড়িতে চেপে হুস করে খাড়া পাহাড়ের গায়ে ওঠা, গাড়ি চলল আঙুর খুঁটি, ভেঙে-পড়া পাথরের দেয়াল, কখনো-সখনো মাদুর-চাপা ভিজে গ্রন্থিল নারাঙ্গী গাছ পেরিয়ে, তাদের রঙীন ফল ও পুরু চকচকে পাতা গাড়ি ছাড়িয়ে ছুটে গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে... ইতালিতে বৃষ্টির পর মাটির গন্ধ ভারি মধুর, প্রত্যেকটি দ্বীপের গন্ধ নিজস্ব।

কাপ্রি দ্বীপ সে রাত্রে স্যাঁতসেঁতে, অন্ধকার। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের জন্য সজীব হয়ে উঠে আলো জ্বালাল এখানে-সেখানে। সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটিকে সাদর সম্বর্ধনা জানানো যাদের কর্তব্য তারা ভিড় করে ইতিমধ্যে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের মাথায় ফিউনিকুলার রেলওয়ে প্লাটফর্মে। আরো লোক এসেছে অবশ্য, কিন্তু তারা খাতিরের উপযুক্ত নয়, — কাপ্রিতে বাস পাতা গুটিকতক রুশ, অন্যমনস্ক, অপরিচ্ছন্ন লোকগুলোর

দাড়ি আছে, চোখে চশমা, জরাজীর্ণ ওভারকোটগুলোর কলার তোলা, আর একদল পা-লম্বা, গোলমাথা জার্মান, পরনে টিরলীয় পোষাক, কাঁধে ঝোলানো কানভাসের ব্যাগ, কারো সেবা তাদের দরকার নেই, যেখানেই যাক সেখানেই বাড়ির মতো মনে হয়, পয়সাকড়ির ব্যাপারে উপুড়হস্ত মোটেই নয়। রুশ ও জার্মানদের গম্ভীরভাবে এড়ানো সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটি তৎক্ষণাৎ সকলের নজরে পড়লেন। তাঁকে ও সঙ্গের মহিলাদের তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করা হল, পথ দেখিয়ে সামনে ছুটল লোকেরা, আবার তাঁকে ঘিরে ধরল ফচকে ছোঁড়ারা আর কাপ্রির সেইসব দশাসই কিষাণীরা যারা ভদ্র ট্যুরিস্টদের বাক্স-প্যাঁটরা মাথায় করে বয়ে নিয়ে যায়। তাদের কাঠের চটি খটখট আওয়াজ করে নামল ঠিক অপেরার দৃশ্যের মতো ছোট্ট সেই চকটায়, যেখানে ভিজে হাওয়ায় দুলছে বৈদ্যুতিক আলোর গোলোক আর পাখির মতো শিস দিয়ে ডিগবাজি খাচ্ছে ফচকে ছোঁড়ার দল, আর সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটি তাদের মধ্যে পা চালিয়ে স্টেজে ঢোকার মতো করে চললেন মিশে যাওয়া একটি বাড়ির নিচে মধ্যযুগীয় কী একটা খিলানের দিকে, খিলানের ওপারে সরব ছোট্ট রাস্তাটা উঠে গিয়েছে হোটেলের উজ্জ্বল-আলোকিত প্রবেশপথে, বাঁয়ে চেপটা

চেপটা ছাদগুলো, ছাড়িয়ে উঠেছে পাম গাছের ঝাঁকড়া মাথা। আর তার ওপরে নীল নক্ষত্র খচিত কালো আকাশ। আবার মনে হল সান-ফ্রান্সিস্কোর পরিবারটির খাতিরেই সজীব হয়ে উঠেছে ভূমধ্যসাগরের পাহাড়ে দ্বীপের এই ভিজে ছোট্ট পাথুরে শহরটি, তাদেরই জন্য হোটেলের মালিক এত খুশি আর অতিথিবৎসল, বারদালানে শুধু তাদের পা ফেলার অপেক্ষায় রয়েছে চীনে ঘণ্টাটি, তারা ঢুকতেই সবাইকে ডিনার খেতে আহ্বান জানিয়ে সারা বাড়িটায় গমগম করে উঠছে ঘণ্টাধ্বনি।

হোটেলের মালিক, অত্যন্ত ফিটফাট যুবাটি তাঁদের বেশ ভব্যভাবে ও সমাদরে অভ্যর্থনা করাতে মুহূর্তের জন্য চমকে উঠলেন সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটি, হঠাৎ মনে পড়ে গেল আগের রাত্রে তাঁর মাথায় ভিড় করে আসা নানা বিশৃঙ্খল স্বপ্নের মধ্যে দেখেছিলেন এই যুবকটির প্রতিমূর্তি, পরনে ঠিক এই সুন্দর ছাঁটের সকালবেলাকার কোট, আয়নার মতো চকচকে ঠিক এই আঁচড়ানো চুল। অবাক হয়ে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। কিন্তু অনেক বছর হল তাঁর মন থেকে সব রহস্যময় অনুভূতি সাফ হয়ে গেছে, ছিটেফোঁটাও নেই, তাই বিস্ময়ের ভাব কেটে গেল তৎক্ষণাৎ। হোটেলের বারান্দায়

যেতে যেতে ইয়ার্কি করে স্বপ্ন ও সত্যের এই অদ্ভুত মিলটার কথা বললেন স্ত্রী ও কন্যাকে। কথাটা শুনে কন্যা কিন্তু সভয়ে মুখ তুলে চাইল তাঁর দিকে: এই অজানা অন্ধকার দ্বীপে বিষাদ ও ভয়াবহ নিঃসঙ্গতার একটা অনুভূতিতে নিমেষের জন্য তার বুক মুচড়িয়ে উঠল...

উচ্চ পদস্থ একটি ব্যক্তি, সপ্তদশ রাইস, কাপ্রিতে ক'দিন থেকে সবে বিদায় নিয়েছেন। তিনি যে ঘরগুলোয় থাকতেন সেগুলো দেওয়া হল সান-ফ্রান্সিস্কোর অতিথিদের। সবচেয়ে সুশ্রী আর চটপটে পরিচারিকা পেলেন তাঁরা, বেলজিয়ামের সেই মেয়েটির কটিতট কর্সেটের গুণে টান-টান ও ক্ষীণ, মাথায় মাড় দেওয়া টুপিটা খাঁজ-খাঁজ মুকুটের মতো, দেওয়া হল সবচেয়ে জমকালো খাস-চাকর, কালোচুল জ্বলজ্বলে চোখ একটি সিসিলীয়কে, আর সবচেয়ে ক্ষিপ্রকর্মা, লুইজি নামের ছোটখাটো, গোলগাল একটি লোককে, বয়সকালে এ ধরনের অনেক কাজ সে করেছে। মিনিটখানেক পরে সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটির কানে এল দরজায় মৃদু একটি টোকা, হোটেলের ফরাসী ম্যানেজার এসে জিজ্ঞেস করল নবাগতেরা খেতে চান কি না, যদি চান, চান যে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, তাহলে আহার তালিকায় আছে

গলদা চিংড়ি, সেদ্ধ মাংস, এ্যাসপারাগাস, ফেজাণ্ট ইত্যাদি। সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটির পায়ের তলায় তখনো মাটি দুলছে, — যাচ্ছেতাই ছোট সেই ইতালীয় জাহাজটার দরুন তাঁর সমুদ্র-পীড়া এত প্রবল হয়েছিল, — তবু তিনি শান্তভাবে উঠে হোটেলের ম্যানেজার আসার সঙ্গে সঙ্গে হাট হয়ে খুলে যাওয়া জানলাটা বন্ধ করে দিলেন একটু বেখাপ্পাভাবে, জানলা দিয়ে আসছিল দূরের একটা রান্নাঘরের আর নীচের বাগানের ভিজে ফুলের গন্ধ, ধীরেসুস্থে স্পষ্টভাবে তিনি জবাব দিলেন যে খেতে যাবেন, ঘরের বেশ পেছনে, দরজা থেকে যেন অনেক দূরে তাঁদের টেবিল পাতা হয়, স্থানীয় একটা মদ চাই, আর তাঁর প্রত্যেকটি কথা হোটেলের ম্যানেজার নানা বিচিত্র সুরে পুনরুক্তি করল, অবশ্য সব সুরের অর্থ হল এই যে, ভদ্রলোকটির নানা ফরমাশের ন্যায্যতা অনস্বীকার্য, সবকিছু পালিত হবে অক্ষরে অক্ষরে। অবশেষে মাথা হেলিয়ে সে জিজ্ঞেস করল:

— আর কিছু চাই না, স্যার?

চিন্তিত সুরে ‘No’ উচ্চারিত হওয়াতে সে খবর দিল যে লাউঞ্জে সে রাত্রে তারানতেল্লা — নাচবে কার্মেল্লা ও জুজেপ্পে, যাদের নামডাক সারা ইতালিতে ও ‘ট্যুরিস্ট জগতে’।

— পোস্টকার্ডে ছবি দেখেছি কার্মেল্লার, — নিস্পৃহ কণ্ঠে বললেন সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোক। — আর এই জবুজেপে লোকটা — ওর স্বামী বুঝি?

— খুড়তুত ভাই, স্যার, — জবাব দিল হোটেল ম্যানেজার।

মুহূর্তখানেক ইতস্তত করে, কী একটা ভেবে সেটা না বলে মাথা নাড়িয়ে তাকে চলে যাবার ইশারা করলেন সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোক।

তারপর তিনি অতি সযত্নে ডিনারের জন্য সাজগোজ করতে লাগলেন, যেন বিয়ের জন্য তৈরী হচ্ছেন: সবকটা আলো দিলেন জেবলে, ঘরের সমস্ত আয়না ঝকঝক চকচক করে উঠল, তাতে প্রতিফলিত হল আসবাবপত্র ও খোলা তোরঙ্গগুলি, চলল দাড়ি কামানো, মুখ ধোওয়া, ঘন ঘন ঘণ্টা বাজানো — স্ত্রী ও কন্যার কামরা থেকে অধৈর্যভরে আসা ঘণ্টার ধবনি তার সঙ্গে মেশাতে বারান্দাটা ঝনঝন করতে লাগল। লাল এ্যাপ্রন পরা লুইজি আতঙ্কের ভাণে মুখ বিকৃত করে জলের জগ নিয়ে ছোটাছুটি করা পরিচারিকাদের হাসিয়ে কাঁদিয়ে ভদ্রলোকের ঘণ্টাধবনিতে সাড়া দিতে ছুটল সবেগে, অনেক মোটা লোকের তাড়াতাড়ি যাবার নিজস্ব যে একটা গতি আছে সেইভাবে, আঙুলের গাঁট দিয়ে দরজায় টোকা

মেরে বিনয়ের আতিশয্যে গলে পড়ে বোকার মতো প্রশ্ন করল:

— Ha sonato, signore?*

ঘরের ভেতরে জড়িয়ে জড়িয়ে খসখসে গলায় অতিভব্য স্বরে শোনা গেল:

— Yes, come in...

তাঁর পক্ষে এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে যে রাত্রিটা, সে রাত্রে কী অনুভব করেছিলেন, কী বিষয়ে ভেবেছিলেন সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটি? — ঝোড়ো সমুদ্র সবে পাড়ি দেওয়া অন্য সবায়ের যা হয়, — তিনি ডিনার খেতে চেয়েছিলেন শুধু, রসিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন প্রথম চামচ সুপের, প্রথম চুমুক সুরার, সত্যি বলতে ডিনারের সাজগোজের অভ্যাসিক অনুষ্ঠানের সময় একটু উত্তেজিত লাগছিল তাঁর, তাই ভাবনাচিন্তার সময় ছিল না একেবারে।

দাড়ি কামানো, মুখ ধোওয়া হল; নকল দাঁত যথাস্থানে পরিপাটি বসিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এক জোড়া রুপোর বুরুশ জোরে চালিয়ে মুক্তোর মতো পাকা, বিরল চুলের গোছা ঠিকমতো বসালেন ঘন হলদে মাথার খুলিতে, তারপর ফিকে হলদে রঙের অন্তর্বাস চাপালেন

* ডেকেছেন হুজুর? (ইতালীয়)

অতিমাত্রায় ভোজন জনিত মোটা কোমর শক্ত, বুড়োটে দেহে, কালো সিল্কের মোজা আর তলা-পাতলা জুতো পরলেন রোগা, চেপটা পায়ে, হাঁটু বেঁকিয়ে কালো প্যান্টের সিল্কের সাসপেণ্ডার ঠিক করে নিয়ে, মাড়ের জন্য সামনে ফেঁপে ওঠা ধবধবে সাদা শার্ট গুঁজে, হাত কফে ঝকঝকে দুটো বোতাম লাগিয়ে খড়খড়ে কলারে বোতাম লাগানোর লড়াই শুরু করলেন। তখনো পায়ের তলায় মনে হল মেঝেটা দুলছে, বেজায় লাগছে আঙুলের ডগাগুলোয়, টুঁটির নীচে ঝোলা চামড়ায় বিঁধে যেতে লাগল কলারেব বোতাম, তবু হাল না ছেড়ে বাগে আনলেন সেটাকে, পরিশ্রমে জ্বলজ্বলে চোখে, আঁটো টুঁটি চাপা কলারের দরুন বিবর্ণ মুখে, হাঁপিয়ে উঠে ড্রেসিং-টেবিলের সামনের টুলটায় বসে পড়ে তাকালেন আয়নায় নিজের পূর্ণাবয়ব প্রতিচ্ছায়ার দিকে, সে ছায়া পড়েছে ঘরের সবকটা আয়নায়।

— ওঃ, কী ভয়ঙ্কর! — বিড়বিড় করে বললেন, ঝুলে পড়ল শক্ত টেকো মাথা, কী যে তাঁর এত ভয়ঙ্কর লাগছে বোঝার বা ভাবার চেষ্টা নেই; তারপর অভ্যাস বশে খুঁটিয়ে দেখলেন বাতে শক্ত-গাঁট খাটো আঙুলগুলোকে, বাদামী রঙের বড়ো নখগুলোকে, আর আবার জোর দিয়ে বলে উঠলেন, — কী ভয়ঙ্কর...

কিন্তু ঠিক সে সময় ডিনারের ঘণ্টা দ্বিতীয় বার বেজে উঠল, পৌত্তলিকদের মন্দিরে কাঁসরঘণ্টার মতো ঝঙকারে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটি কলারে টাই বেঁধে আরো আঁটো করে নিলেন, ভুঁড়ি ওয়েস্টকোটে দাবিয়ে, কোট চাপিয়ে হাত কফ ঠিক করে আর একবার চেহারাটা দেখে নিলেন আয়নায়... দোআঁসলার মতো জলপাই-রঙের, চোখে কাজ করা, ফুলকাটা নারাঙ্গী রঙের পোষাকে এই কার্মেল্লা মেয়েটি নিশ্চয় চমৎকার নাচিয়ে, — ভাবতে লাগলেন তিনি। তারপর পা চালিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে কার্পেটের উপর দিয়ে গেলেন পাশে স্ত্রীর ঘরে, জোর গলায় শুধালেন তাদের তৈরী হতে আর কতক্ষণ।

— আর পাঁচ মিনিট! — এরই মধ্যে খুশিমাখা আহ্লাদে গলা শোনা গেল কন্যার।

— বেশ, — বললেন সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোক।

তারপর ধীরেসুস্থে বারান্দা ও লাল কার্পেট মোড়া সিঁড়ি হয়ে চললেন পড়ার-ঘরের খোঁজে। তাঁকে দেখে বেয়ারাগুলো দেয়ালে লেপটে দাঁড়িয়ে পড়ছে, ওদের যেন দেখেন না এমনভাবে তিনি চললেন সোজা। ডিনারে যেতে দেরী হয়ে গিয়েছে একটি বৃদ্ধার, ভদ্রলোকের সামনে সামনে বারান্দায় যত তাড়াতাড়ি পারেন চলেছেন

মহিলাটির চুল দুধের মতো সাদা, পিঠ কুঁজো হয়ে গেছে এরই মধ্যে, তবু ফিকে-ছাইরঙের নীচু-কাট একটা গাউন পরেছেন। চলার ধরনটা মজার, মুরগীর মতো. সহজেই বৃদ্ধাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেলেন ডাইনিং-রুমে। সবাই বসে খেতে শুরু করে দিয়েছে, কাঁচের দরজার কাছে পৌঁছিয়ে সিগার ও মিসরী সিগারেটের বাক্স বোঝাই একটি টেবিলের সামনে থেমে ভদ্রলোক বড়ো একটা ম্যানিল্লা বেছে নিয়ে তিনটে লিরা ছুঁড়ে দিলেন টেবিলে; শীতোদ্যানের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে এমনি একবার চোখ মেললেন খোলা জানলার বাইরে: মৃদুমন্দ হাওয়া ভেসে এল অন্ধকার থেকে. মনে হল বুড়ো পাম গাছটার প্রকাণ্ড শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে পড়েছে তারায় তারায়, কানে এল দূরে সমুদ্রের সমান শব্দ... চুপচাপ, আরামী পড়ার-ঘরে টেবিলের ওপরের বাতি ছাড়া কোনো আলো নেই. পাকাচুল একটি জার্মান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খসখস শব্দ করে খবরের কাগজ পড়ছেন, লোকটিকে দেখতে ইব্‌সেনের মতো, রুপোর ফ্রেমের গোল চশমার পিছনে চোখজোড়া পাগলাটে, হতচকিত। কঠিন চোখে তাঁকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোক সবুজ ঢাকনা দেওয়া একটি বাতির পাশে পুরু চামড়ার একটা আরামকেদারায়

বসলেন, প্যাশ্‌নে পরে খবরের কাগজের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন একেবারে, টুঁটিচেপা কলারটার জন্য মাথাটা শুধু অস্থির। কয়েকটা শিরোনামায় তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে সেই কখনো শেষ না হওয়া বলকান যুদ্ধের বিষয়ে কয়েকটি লাইন পড়ে অভ্যাসমতো ভঙ্গিতে ওলটালেন পাতাটা, — আর হঠাৎ কাঁচের মতন দীপ্তিতে চোখের সামনে লাইনগুলো ঝলকিয়ে উঠল, গলাটা ঝুলে পড়ল, ঠেলে বেরিয়ে এল চোখজোড়া, নাক থেকে খসে পড়ে গেল প্যাশ্‌নে... এক হেঁচকায় দেহটা এগিয়ে নিশ্বাস নেবার চেষ্টা করাতে — মুখ দিয়ে পাশবিক একটা আওয়াজ বেরল শুধু; চোয়াল ঝুলে পড়াতে মুখে চিকচিকিয়ে উঠল সোনা বাঁধানো দাঁতগুলো, মাথাটা কাঁধের ওপরে ঝুলতে লাগল অসহায়ভাবে, শার্টের শক্ত বুক ফেঁপে উঠল — ভদ্রলোক গড়িয়ে মেঝেতে পড়ে গেলেন, যেন কার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছেন, পা ছুঁড়ছেন কার্পেটে।

পড়ার-ঘরে জার্মানটি না থাকলে হোটেলের লোকেরা বিনাবিলম্বে গুছিয়ে ধামা চাপা দিতে পারত এই ভয়াবহ ঘটনাটিকে, খিড়কির পথে সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটিকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে যেত ঝট করে যত দূর সম্ভব তত দূরে — হোটেলে যারা এসেছে তাদের কেউ

টের পেত না তাঁর দশার কথা। কিন্তু জার্মানটি চেঁচিয়ে পড়ার-ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে ডাইনিং-রুমে গোলমাল করে হৈচৈ লাগিয়ে দিলেন সারা জায়গাটায়। অনেক অতিথি চেয়ার উল্টে ডিনার ফেলে লাফিয়ে উঠল, ফ্যাকাশে মুখে অনেকে আবার ছুটে পড়ার-ঘরে গিয়ে রকমারি ভাষায় চেঁচাতে লাগল: 'কী হল, ব্যাপারটা কী?' — জবাব দিল না কেউ, মাথায় ঢুকল না কারো কী ঘটেছে, কারণ তখন পর্যন্ত লোকের কাছে সবচেয়ে তাজ্জব জিনিস হল মৃত্যু, বিশ্বাস করতে চায় না মৃত্যুকে। হোটেলের মালিক ছোটাছুটি করে অতিথিদের একে-ওকে সামলে শান্ত করার চেষ্টায় তাড়াতাড়ি আশ্বাস দিয়ে বলতে লাগল ও কিছু না, সামান্য একটা ব্যাপার মাত্র, সান-ফ্রান্সিস্কোর একটি ভদ্রলোক মূর্ছা গিয়েছেন অল্পক্ষণের জন্য... কিন্তু তার কথায় কান দেয় কে। অনেকে তো নিজের চোখে দেখেছে ওয়েটার আর বেয়ারারা টেনে খুলে নিচ্ছে ভদ্রলোকের টাই, ওয়েস্টকোট, ভাঁজপড়া ডিনার-জ্যাকেট, এমনকি, কী কারণে জানা নেই, তাঁর কালো সিল্কের মোজা পরিহিত চেপটা পা থেকে টেনে সরিয়ে নিচ্ছে জুতোজোড়া। তখনো চলেছে তাঁর শারীরিক আক্ষেপ। একরোখা চলেছে মরণের সঙ্গে লড়াই, অপ্রত্যাশিত অভব্যভাবে

চড়াও করা জিনিসটাকে মেনে নিতে পারছেন না তিনি। মাথা ঝটকাচ্ছেন এদিক-ওদিক, গলা কাটলে যেমন হয় তেমন ঘড়ঘড় শব্দ বেরোচ্ছে মুখ থেকে, চোখ ঘুরছে মাতালের মতো... ৪৩ নং ঘরে, — হোটেলের একতলার বারান্দায় একেবারে শেষে সবচেয়ে ছোট, দীনহীন, স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা ঘরটায়, — তাঁকে তাড়াতাড়ি নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেবার পর, কন্যা ছুটে এল এলোচুলে, করসেটের দরুন উদ্ধত খোলা বুক দেখা যাচ্ছে ড্রেসিং গাউনের ফাঁক দিয়ে; তারপর এলেন দশাসই স্ত্রী, ডিনারের জন্য সুসজ্জিতা, বিভীষিকায় বিস্ফারিত মুখ... তখন স্বামীর মাথা ঝাঁকানিটুকু পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে।

পোনেরো মিনিট যেতে না যেতে হোটেলে সবকিছু মোটের ওপর স্বাভাবিক হয়ে এল। কিন্তু সে রাত্রের বারোটা বেজে গেছে একেবারে। কয়েকজন অতিথি ডাইনিং-রুমে ফিরে এসে খাওয়া শেষ করল বটে, কিন্তু নিঃশব্দে ও মুখে আহত একটা ভাব এনে, আর হোটেলের মালিক টেবিলে টেবিলে যেতে লাগল অসহায়ভাবে, স্পষ্ট বিরক্তিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে, ভাবটা যেন বিনাদোষে সে দোষী, সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগল 'ব্যাপারটা কত অপ্রীতিকর' জানতে তার বাকি

নেই, অপ্রীতিকর ব্যাপারটা ফয়সলার 'যথাসাধ্য চেষ্টার' ত্রুটি হবে না; তবু তারানতেল্লাটা বরবাদ করতেই হল, নিভিয়ে দেওয়া হল বাড়তি আলো, বেশীর ভাগ অতিথি গেল বিয়রপানের ঘরে, সবকিছু এমন চুপচাপ যে বারদালানে ঘড়ির টিকটিক পর্যন্ত কানে আসে, দালানে কেউ নেই, শুধু তোতাপাখিটা কেঠো গলায় বকবক করছে, ঘুমোবার আগে তার ছটফটানি, বসার জায়গার ওপরে একটা পা হাস্যকরভাবে বাড়িয়ে দিয়ে অবশেষে ঘুমিয়ে পড়ল সে... মোটা কম্বলে ঢাকা লোহার সস্তা খাটে, ছাদের একটি মাত্র বালবের ক্ষীণ আলোয় শুয়ে রইলেন সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটি। ঠাণ্ডা ভিজে কপালে লাগানো রবারের একটা আইসব্যাগ। বিবর্ণ, এরই মধ্যে মৃত্যুনীল মুখ হিম হয়ে আসছে ধীরে ধীরে, সোনার দাঁতে চিকচিকে হাঁ মুখ দিয়ে নির্গত কর্কশ ঘড়ঘড়ানি ক্ষীণ হয়ে আসছে ক্রমশ। ঘড়ঘড় শব্দ করছেন যিনি, তিনি আর সান-ফ্রান্সিস্কোর সেই ভদ্রলোক নন, — আর কেউ। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন স্ত্রী, কন্যা, ডাক্তার ও চাকরেরা। হঠাৎ, যে জিনিসটার অপেক্ষায় তাঁরা ছিলেন, যেটায় ভয় তাঁদের, সেটা ঘটল — বন্ধ হয়ে গেল ঘড়ঘড়ানি। আর ধীরে, অতি ধীরে, সবায়ের চোখের

সামনে, মৃতের মুখে ছড়িয়ে পড়ল পাণ্ডুর, মুখাবয়বে এল হাল্‌কা সূক্ষ্ম একটা ভাব — একটা সৌন্দর্য, যেটা তাঁকে মানাত অনেক দিন আগে...

ঘরে এল হোটেলের মালিক। 'Gia é morto,'* — ডাক্তার তাকে জানাল ফিসফিসিয়ে। ভাবলেশহীন মুখে কাঁধ ঝাঁকাল মালিক। দরবিগলিত অশ্রুজলে সিক্ত গাল ভদ্রমহিলা তার কাছে এসে অনুরোধ করলেন মৃতকে এবার যেন তাঁর ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়।

— না, না, ম্যাম, — তাড়াতাড়ি অথচ ভদ্রভাবে আপত্তি জানাল মালিক, স্ত্রীলোকের মনোরঞ্জনে বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আর নেই, এবার কথা বলল ফরাসীতে, ইংরাজিতে নয়, কেননা তার তহবিলে সান-ফ্রান্সিস্কোর এই অভ্যাগতেরা সামান্য যা কিছু দিয়ে যাবে তাতে তার কোনো উৎসাহ নেই। — একেবারে অসম্ভব, ম্যাডাম, — বলে বোঝাবার জন্য জুড়ে দিল যে ঘরকটা তার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান, তাঁর অনুরোধ মেনে নিলে সারা কাপ্রি শহরে জানাজানি হয়ে যাবে, ফলে ট্যুরিস্টরা এ ঘরগুলোয় আর থাকতে রাজী হবে না।

কন্যা এতক্ষণ অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে ছিল তার দিকে, এবারে একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে মুখে রুমাল

* মারা গেছে। (ইতালীয়)

গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চোখের জল শুকিয়ে গেল, টকটকে লাল হয়ে উঠল মুখ। গলা চড়িয়ে নিজের ভাষায় জোর করে দাবী জানালেন তিনি, তখনো তাঁর বিশ্বাস করতে কষ্ট যে তাঁদের সব খাতির উবে গেছে একেবারে। ভদ্রভব্যভাবে মালিক ভর্ৎসনা করল তাঁকে: হোটেলের নিয়মকানুন ম্যাডামের অপছন্দ হলে তাঁকে ধরে রাখার দুঃসাহস তার নেই; দৃঢ় গলায় সে জানাল সকাল হবার আগে মৃতদেহ সরিয়ে না ফেললে নয়, পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে, এখুনি তাদের কেউ একজন এসে যা করা দরকার তা করবে... ম্যাডাম জানতে চান কফিন পাওয়া সম্ভব কি না, কাপ্রিতে তৈরী সাদাসিধে গোছের একটা হলেও চলবে? না, দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে মোটেই সম্ভব নয়, তৈরী করিয়ে নেবার সময়ও নেই। অন্য কোন একটা উপায় খুঁজে বের করতে হবে... ধরুন, ইংলন্ড থেকে তার কাছে সোডা-জলের বোতল আসে প্যাকিং বাক্সে... একটা বাক্সের কয়েকটা তক্তা বের করে নেওয়া যেতে পারে...

হোটেলের সবাই নিদ্রামগ্ন। ৪৩ নং ঘরের জানলা খোলা হল,—সামনে বাগানের একটা কোণে ভাঙা কাঁচ বসানো দীর্ঘ পাথরের দেয়ালের ছায়ায় রুগ্ণগোছের একটি কলা গাছ,—আলো নিভিয়ে

ঘর ছেড়ে ওরা বাইরে গেল, তালাচাবি পড়ল দরজায়। মৃত ব্যক্তিটি পড়ে রইলেন অন্ধকারে, আকাশ থেকে তাঁর দিকে চেয়ে রইল নীল তারার দল, দেয়ালে একটি ঝিঁঝি শুরু করল বিষণ্ণ, বেপরোয়া গান... স্বল্পালোকিত বারান্দায় জানলার ধারিতে বসে দুটি পরিচারিকা রিপু করছে। একগাদা কাপড় হাতে আর জুতো পায়ে এল লুইজি।

—Pronto? (তৈয়ার?) — উৎকণ্ঠিতভাবে জোরে ফিস্‌ফিসিয়ে বারান্দার কোণের সেই আতঙ্কজাগানো দরজার দিকে চোখের ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করল সে। তারপর খালি হাতটা হালকাভাবে সে দিকে নাড়িয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল জোরে। — Partenza!* — স্টেশন থেকে ধোঁয়া ছেড়ে ট্রেন বেরিয়ে গেলে সাধারণত এ চেঁচানিটা শোনা যায় ইতালিতে। পরিচারিকারা বোকা হাসি চেপে আরো কাছ ঘেঁষে বসল এ-ওর।

লুইজি তারপর হালকাভাবে লাফাতে লাফাতে দরজায় দৌড়িয়ে গিয়ে কবাটে মৃদু টোকা দিয়ে মাথা হেলিয়ে নীচু গলায় জিজ্ঞেস করল অত্যন্ত সসম্ভ্রমে:

— Ha sonato, signore?

* গাড়ি ছেড়েছে। (ইতালীয়)

গলা সরু করে, নীচের চোয়াল এগিয়ে দিয়ে খসখসে, বিষণ্ণ জড়ানো সুরে জবাবটা সে দিল নিজেই, যেন গলাটা আসছে দরজার ওধার থেকে:

-- Yes, come in...

ভোরবেলায় ৪৩ নং ঘরের জানলার ওপারে যখন আকাশ ফরসা হয়ে এসেছে, কলা গাছের জীর্ণ পাতায় জোলো হাওয়ার খসখসানি, কাপ্রি দ্বীপের ওপর জেগে উঠে ছড়িয়ে পড়ল নীল প্রভাতী আকাশ, ইতালির সুদূর নীল নানা পাহাড়ের ওধারে সূর্য উঠে রাঙিয়ে দিল মণ্টে-সলিয়ারোর পূত, স্পষ্ট চূড়া, রাস্তামেরামতীর দল বেরল তাদের কাজে, ট্যুরিস্টদের পদপল্লবের জন্য দ্বীপের পথঘাট ঠিক করা শুরু হল, — তখন সোডা-জলের একটি লম্বা প্যাকিং-বাক্স আনা হল ৪৩ নং ঘরে। কিছুক্ষণ যেতে না যেতে বাক্সটা বেজায় ভারি হয়ে দাঁড়াল — বেশ কষ্টের চাপ পড়ল ছোট দারোয়ানের হাঁটুতে, বাক্সটাকে যে এক-ঘোড়ার একটা গাড়িতে তাড়াতাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল পাহাড়ের গা বেয়ে আঙুর খেতের মধ্য দিয়ে। বঙ্কিম গতিতে সমুদ্রে গিয়ে নামা সাদা রাস্তা ধরে। রক্তবর্ণ চোখ, থলথলে গাড়োয়ানের গায়ে জীর্ণ পুরনো ছোট হাতা কোট, বুটজোড়া একেবারে ক্ষওয়া, — সারা

রাত সরাইখানায় পাশা খেলে বেশ মাথা ধরেছে তার, — শক্ত জোয়ান ঘোড়াটা সজ্জিত সিসিলীয় কেতায়, লাগামে ঠুনঠুনে মুখর ঘণ্টা আর লাল পশমের পমপমের বাহার, তামার উঁচু ধারগুলোতেও তাই ছাঁটা ঝুঁটিতে গোঁজা গজখানেক লম্বা, ফুরফুরে একটা পালক। ঘোড়াটাকে ক্রমাগত চাবুক লাগাচ্ছে গাড়োয়ান। শরীরের ওপর অত্যাচার আর কুকর্মের দুর্বহ ভারে তার মুখে কথা নেই, চুপচাপ থাকার আর একটা কারণ, — আগের রাত্রে পকেট বোঝাই পয়সা ফাঁক হয়ে গেছে। কিন্তু ঝরঝরে সকালে হাওয়াটা বড়ো তাজা, সমুদ্র এত কাছে, মাথার ওপরে নীল আকাশ, ফলে নেশার ঘোর কেটে যেতে সময় লাগে না, বুকটা হালকা হয়ে যায় শীগ্‌গির, তাছাড়া এখন পেছন দিকে প্যাকিং-বাক্সে যার প্রাণহীন মাথা এদিকে-ওদিকে নড়ছে সান-ফ্রান্সিস্কোর সেই ভদ্রলোকটির কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত মোটা রকম টাকা পাওয়াতে মনে বল পেয়েছে সে... উজ্জ্বল ফিকে নীল আভায় উচ্ছল নেপ্‌ল্‌স উপসাগরে গুবরে পোকার মতো দেখতে ছোট একটি জাহাজ শেষ বারের মতো ডাক ছেড়ে সাড়া জাগিয়ে তুলেছে সারা দ্বীপটায়, দ্বীপের প্রত্যেকটি বাঁক, প্রত্যেকটি শৈলশিরা, প্রত্যেকটি পাথর কী পরিষ্কার

স্পষ্ট, যেন আবহাওয়া বলে কোনো পদার্থ নেই। জাহাজঘাটে ঘোড়ার গাড়িটাকে ছাড়িয়ে গেল সেই মোটরগাড়িটা যাতে করে বড়ো দারোয়ান আনছিল মা ও কন্যাকে, রাত জেগে আর কেঁদে কেঁদে চোখ বসে গেছে যাদের। মিনিট দশেক পরে জল তোলপাড় করে ছোট জাহাজটা সান-ফ্রান্সিস্কোর পরিবারটিকে চিরতরে কাপ্রি থেকে নিয়ে চলল সরেণ্টো ও কাস্টেলামারায়... দ্বীপে আবার ফিরে এল শান্তি ও স্তব্ধতা।

এই দ্বীপে দু'হাজার বছর আগে ছিল একটি মানুষ, নিজের ঘৃণ্য নিষ্ঠুর নানা কাজে সে একেবারে জড়িয়ে পড়ে, কী কারণে যেন লক্ষ লক্ষ লোকের ওপর ক্ষমতা লাভ করে ক্ষমতার অর্থহীনতায় ও পেছনে ছুরি খাবার আতঙ্কে উন্মত্ত হয়ে অকথ্য অত্যাচার সে চালায়, — পৃথিবীর লোকে চিরকাল তার নাম মনে রেখেছে, আর মোটের ওপর যারা আজকাল ঠিক তেমনি যুক্তিহীন ও মূলত তেমনি নিষ্ঠুরভাবে দুনিয়া শাসন করছে, তারা পৃথিবীর নানা দেশ থেকে এখানে আসে দ্বীপের সবচেয়ে খাড়া গায়ে তার বাসস্থানের ভগ্নাবশেষ দেখতে। সুন্দর সেই সকালটায় এই উদ্দেশ্যে কাপ্রিতে আগত সবাই হোটেলে তখনো নিদ্রামগ্ন, যদিচ টকটকে লাল জিন চাপানো, ইঁদুর-রঙা ছোট্ট গাধার দলকে

সার বেঁধে তখুনি আনা হচ্ছে হোটেলের প্রবেশপথে আমেরিকান ও জার্মানদের জন্য — স্ত্রীপুরুষ, ছোকরা ও বুড়োদের জন্য, ঘুম থেকে উঠে ভরপেট খেয়ে তারা তাড়াহুড়ো করে উঠবে গাধার পিঠে, মণ্টে-টাইবেরিওর একেবারে চূড়া পর্যন্ত, সারা পাথুরে রাস্তায় তাদের পেছন পেছন দৌড়বে শিরতোলা হাতে লাঠি ধরে কাপ্রির বৃদ্ধা ভিখারিনীরা। তাদের সঙ্গে যাওয়া ঠিক করে সান-ফ্রান্সিস্কোর যে ভদ্রলোকটি শেষে মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন, তাঁকে জাহাজে নেপ্‌ল্‌সের পথে পাঠানো হয়ে গেছে, এই ভরসায় সুখে শান্তিতে নিদ্রা যাচ্ছে যাত্রীরা, দ্বীপে তখনো স্তব্ধতা, দোকান খোলে নি। বেচাকেনা চলেছে ছোট চকে — মাছ ও সব্জীর হাটে শুধু, সাধারণ লোক ছাড়া আর কেউ নেই সেখানে, তাদের মধ্যে আছে বরাবরকার মতো ভেরাণ্ডা ভাজা দীর্ঘদেহ লরেনসো মাঝি, বেপরোয়া এই লম্পটটির চেহারা এত সুন্দর যে সারা ইতালি তাকে চেনে, অনেক চিত্রকর ছবি এঁকেছে তার: রাত্রে ধরা গোটা দুয়েক গলদা চিংড়ি সঙ্গে এনে জলের দামে সে এরই মধ্যে বেচে দিয়েছে, চিংড়িদুটো এখন খসখস করছে সেই হোটেলের বাবুর্চির অ্যাপ্রনে, যে হোটেলে রাত কাটিয়েছিল সান-ফ্রান্সিস্কোর পরিবার,

ইচ্ছে হলে এখন সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে বেকার লরেনসো, রাজকীয় ভাবে চারদিকে তাকিয়ে, ছিন্নভিন্ন পোষাকে, মাটির পাইপ মুখে, কান ঘেঁষে লাগানো লাল ফ্লানেলের টুপি মাথায় চেহারাটা চেয়ে দেখবার মতো। আনাকাপ্রি থেকে পাথর খোদা ধাপে প্রাচীন ফিনিসীয় পথ ধরে খাড়া মণ্টে-সলিয়ারো হয়ে আসছে দুটি আব্রুজীয় পাহাড়ী লোক। একজনের চামড়ার ক্লোকের নীচে একটা ব্যাগপাইপ — দুটো পাইপ দেওয়া ছাগলের চামড়ার বড়ো ব্যাগ, আর একজনের হাতে — কাঠের বাঁশীর মতো দেখতে কী একটা। পাহাড় থেকে নামছে তারা, নীচের সমস্ত দৃশ্যটা আনন্দোচ্ছল, সুন্দর, ভাস্বর: দ্বীপের পাথুরে কুঁজ প্রায় সবকটা তাদের পায়ের তলায়, অপরূপ নীলের জোয়ারে ভাসমান দ্বীপ, সমুদ্র থেকে সকালের বাষ্প পূবের দিকে উঠে আকাশে উত্তরোত্তর ঊর্ধ্বগামী, ইতিমধ্যে উষ্ণ, সূর্যের চোখধাঁধানো আলোয় চিকচিক করে উঠছে, সকালের কুয়াসায় তখনো ঝাপসা কাছের ও দূরের সব পাহাড় সুদ্ধ ইতালির ফিকে নীল দেহ, যার রূপ বর্ণনা করার ভাষা মানুষের নেই... অর্ধেক পথ নেমে দুজনে চলার গতি কমিয়ে দিল: পথের ওপরে মণ্টে-সলিয়ারোর পাথর-দেয়ালের একটা

কুলঙ্গিতে ঈশ্বর জননী সূর্যালোকে, উষ্ণতায়, উজ্জ্বল আভায় স্নাত, পরনে ধবধবে সাদা পলস্তারার সাজ, বৃষ্টিতে রাণীসুলভ মরচে-সোনালি মুকুট শিরে, নম্র করুণাময়ী জননীর চোখ তিনবার-পূত সন্তানের অনন্ত আনন্দলোকে নিবদ্ধ। পাহাড়িয়ারা টুপি খুলে বাঁশীতে মুখ দিল — আর সরল নম্র আনন্দোচ্ছল স্তুতি ছড়িয়ে পড়ল হাওয়ায়, সূর্যে, প্রভাতে ও অপাপবিদ্ধ সেই নারীর স্তুতিতে যিনি এই দুষ্ট সুন্দর পৃথিবীর সমস্ত তাপিতদের পক্ষ নেন, আর তাঁর গর্ভপ্রসূত সেই মানুষটির স্তুতিতে যিনি সুদূর জুডিয়া দেশে দরিদ্র মেষপালকদের আশ্রয়ে বেথ্‌লিহেমের একটি গুহায় জন্ম নিয়েছিলেন...

আর সে সময় সান-ফ্রান্সিস্কোর মৃত বৃদ্ধটির দেহ নতুন জগতের তীরে কবরে নিজের বাসায় চলেছে। মানুষের হাতে অনেক অপমান আর তাচ্ছিল্য সয়ে, নানা বন্দরের মাল গুদামে এক সপ্তাহ কাটিয়ে, অবশেষে ফিরে এলেন সেই বিখ্যাত জাহাজটিতে যেটি এই সেদিন তাঁকে এত জাঁকে নিয়ে এসেছিল পুরনো জগতে। এবার কিন্তু জীবন্ত মানুষের কাছ থেকে গোপন করে রাখা হল তাঁকে — দাগদুষ্ট আলকাতরা মাখানো তাঁর কফিনকে রাখা হল জাহাজের অন্ধকার খোলে। তারপর

আবার শুরু হল জাহাজের দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা। রাত্রিবেলায় কাপ্রি দ্বীপ পেরিয়ে গেল, অন্ধকার সমুদ্রে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাওয়া জাহাজের আলোগুলো বিষণ্ন মনে হল দ্বীপের দর্শকদের কাছে। কিন্তু জাহাজে, ঝাড়-লণ্ঠন আর শ্বেতপাথরে উজ্জ্বল হলগুলোয় রেওয়াজমতো বিরাট একটি বল-নাচ চলেছিল সে রাত্রে।

নাচ হল দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রাত্রেও — আবার মহাসমুদ্রে তাণ্ডব ঝড়, শ্মশানবিলাপের মতো একটানা সুরে ডেকে সমুদ্রে উঠছে শবাচ্ছাদনের মতো রুপোলি পাড় দেওয়া গম্ভীর কালো ঢেউয়ের পাহাড়। রাত্রি আর ঝড়ের মধ্যে পাড়ি দেওয়া জাহাজের অসংখ্য জ্বলন্ত চোখ তুষার পর্দার আড়ালে প্রায় ঢাকা পড়ে গেল দুই পৃথিবীর মধ্যেকার প্রবেশদ্বার জিব্রলটারে দাঁড়ানো শ্যেনদৃষ্টি শয়তানের কাছে। পাহাড়ের মতো বিরাট বটে শয়তান, কিন্তু তার চেয়ে বিরাট জাহাজটা, কত তলা তার, কতো চোঙা, সবকিছু ডাঁটে বানিয়েছে নতুন মানুষ, হৃদয় যার প্রাচীন। রশারশি আর বরফে সাদা হাঁ-মুখ চোঙায় ঝড়ের প্রহার, কিন্তু জাহাজটা অনড়, বলিষ্ঠ, মহান — দেখলে ভয় হয়। একেবারে ওপরের ডেকে বরফের ঘূর্ণিপাকে একাকী দাঁড়িয়ে আরামী, স্বল্পালোকিত কামরা কয়েকটা, সেখান থেকে পৌত্তলিক

দেবতাসদৃশ স্থূলদেহ ক্যাপ্টেন সমস্ত জাহাজের ওপরে রাজত্ব চালায়, হালকা তার ঘুম কেটে যায় বারবার। ঝড়ে রুদ্ধশ্বাস সাইরেনের গভীর আর্তনাদ ও তীব্র ভয়ার্ত চীৎকার তার কানে বাজে, কিন্তু তার আশা পাশের ঘরে একটা জিনিসের সান্নিধ্য, বাস্তবিকপক্ষে যেটাকে সে নিজেই বোঝে সবচেয়ে কম: যেন কর্মাবৃত সেই বড়ো কামরাটায় থেকে থেকে রহস্যভরা একটা হুংকার, কম্পিত নীল আলোর ছিটে কর্কশ শব্দে দপ করে ফেটে পড়ছে বিবর্ণ-মুখ রেডিও-অপারেটরের চারিদিকে, তার মাথায় ধাতুর একটা অর্ধবৃত্ত বসানো। একেবারে নীচে, 'আৎলান্তিদার' জলগর্ভ গভীরে, যেখানে বয়লারগুলোর বহুটনী ইস্পাত দেহ আর অন্যান্য যন্ত্র ঝাপসা আলোয় চিকচিকিয়ে হিস হিস করে বাষ্প ছিটোচ্ছে, ফেলছে ফোঁটা ফোঁটা উত্তপ্ত তেল আর জল, এ রান্নাঘরে নীচের থেকে জ্বালানো নারকীয় আগুনে পাক করা হচ্ছে জাহাজের গতি, — সেখানে শক্তি, পুঞ্জীভূত ভয়াবহ শক্তি মন্থিত হয়ে যাচ্ছে শেষহীন দীর্ঘ খিলান-দেওয়া তলদেশে, স্বল্পালোকিত সেই গোল সুড়ঙ্গে যেখানে তৈলাক্ত ভিত্তির ওপর আস্তে আস্তে পাক খাচ্ছে বিরাট একটা বম এত দুঃসাহসে যে মানুষের অন্তর চূর্ণ হয়ে যায়, শুঁড়ের মতো লম্বা সুড়ঙ্গে প্রসারিত জীবন্ত

রাক্ষস যেন জিনিসটা। কিন্তু ‘আৎলান্তিদার’ মাঝের অংশটায়, খাবার আর নাচের ঘরে আলো আর আনন্দের উচ্ছ্বাস, সুসজ্জিত মানুষের কণ্ঠস্বরে সে জায়গাগুলো জমজমাট, তার-অর্কেস্ট্রার বাজনায় মুখর, ফুলের গন্ধে জীবন্ত। আবার সেই দুটি সুঠাম পেলব ভাড়াটে প্রেমিক-প্রেমিকা ভিড়ের মধ্যে, আলো, সিল্ক, হীরে আর স্ত্রীলোকদের নগ্ন কাঁধের দীপ্ত আভায় যন্ত্রণায় সাপের মতো এঁকেবেঁকে যাচ্ছে বা পরস্পরকে জাপটে ধরছে ঝটকা মেরে, সুশ্রী মেয়েটির কলঙ্কিত বিনীত চোখ আনত, কেশের বিন্যাস তার নিষ্পাপ আর যেন আঠা দিয়ে বসানো কালো চুল দীর্ঘকায় যুবকটির মুখ পাউডারে বর্ণহীন, লম্বাটে সরু ড্রেস-কোট তার পরনে, পায়ে পেটেণ্টলেদারের সৌখীন জুতো, — সুন্দর চেহারার লোকটিকে দেখতে প্রকাণ্ড একটা রক্তজোঁকের মতো। কামুক বিষণ্ণ সঙ্গীতের সুরে তাল রেখে প্রেমপীড়ার ভান করায় যে ওদের বহুদিন শুধু দিনগত পাপক্ষয়, কেউ জানে না সেটা; আর কেউ জানে না যে অন্ধকার খোলে, তাদের থেকে অনেক, অনেক নীচে, তমসা, মহাসমুদ্র আর ঝড়ের সঙ্গে যোঝা জাহাজের বিষণ্ণ গুমোট গর্ভে পড়ে আছে একটা কফিন...

ভাসিলিয়েভস্কয়ে, অক্টোবর ১৯১৫

লঘু নিশ্বাস

কবরখানায় টাটকা মাটির ঢিবিতে দাঁড়িয়ে আছে ওক কাঠের নতুন একটা ক্রুশ, শক্ত, ভারি, মসৃণ।

এপ্রিলের ধূসর দিন; মফস্বলের প্রশস্ত কবরখানার সমাধিফলকগুলো নেড়া গাছের ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ে অনেক দূর থেকে, ক্রুশের পাদদেশে চীনে মাটির ফুলের মালায় ঠাণ্ডা হাওয়ার শনশন থামে না আর।

ক্রুশের গায়ে লাগানো বেশ বড়ো ব্রোঞ্জের পদকে হাসিখুশি আর আশ্চর্য সজীবচোখ একটি মেয়ের ছবি।

সে হল ওলিয়া মেশ্চের্স্কায়া।

ছেলেবেলায় বাদামী ফ্রক পরা হাই-স্কুলের মেয়েদের ভিড়ে আলাদাভাবে চোখে পড়ত না তাকে: ওর বিষয়ে কী বা বলার ছিল? শুধু এই যে, সে সুশ্রী, ধনী সৌভাগ্যবতীদের একজন, পড়াশোনায় চটপটে হলেও দুষ্টু, ক্লাসের শিক্ষয়িত্রীর হিতোপদেশে একেবারে উদাসীন। তারপর দিনে দিনে নয়, দণ্ডে দণ্ডে কুঁড়ি ফুটিয়ে চলল তার বিকাশ। ক্ষীণ-কটি, কৃশ-পা মেয়েটি চোদ্দের কোঠায় যখন পড়ল তখনি তার বুক আর শরীরের রেখা -- যার মোহিনী শক্তি মানুষের ভাষার বাইরে — বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে; পোনেরো বছর বয়সে রূপসী বলে তার নামডাক। স্কুলের কোনো কোনো সহচরী কত না সযত্নে চুল বাঁধত, দেহের বিষয়ে কত না চুলচেরা নজর তাদের, নিজেদের পরিমিত দেহভঙ্গির ব্যাপারে কত না সতর্ক ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়! কিন্তু কোনো কিছুতে পরোয়া নেই ওলিয়ার — হোক না আঙুলে কালির দাগ, মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠুক গে, চুল যাক উসকোখুসকো হয়ে, দৌড়বার সময় পড়ে গেলে না হয় দেখা গেল নগ্ন হাঁটু। বিনা ক্লেশে গত দুবছরের মধ্যে ক্রমশ তাতে সেই সমস্ত গুণ বর্তাল যার ফলে সে আর সব মেয়েদের

তুলনায় অনন্যসাধারণ, — লাবণ্য, সৌষ্ঠব, বুদ্ধিমত্তা ও চোখে স্বচ্ছ একটা দীপ্তি... বল-নাচে ওলিয়ার মতো সুন্দর কেউ নাচে না, স্কেটিং-এ তার জুড়ি নেই, নাচের পার্টিতে সবচেয়ে খাতির তার, আর কী কারণে যেন নীচের ক্লাসের মেয়েরা তাকে নিয়ে যতটা পাগল আর কাউকে নিয়ে নয়। কিন্তু ছেলেমানুষ তখন তো আর নয়, আস্তে আস্তে হাই-স্কুলে তার একটা খ্যাতি রটে গেল, কথা উঠল, কানাঘুষো ছড়াল যে সে বড়ো বাচাল ও বেপরোয়া, ভক্ত ছাড়া টিকতে পারে না, শেন্‌শিন নামের একটি স্কুলছেলে তার প্রেমে পাগল, সেও নাকি তাকে ভালোবাসে, কিন্তু ছেলেটির প্রতি তার ব্যবহার এত চটুল যে একবার সে আত্মহত্যার উপক্রম করে...

তার জীবনের সেই শেষ শীতকালটায় ফুর্তির হুল্লোড়ে ওলিয়া মেশ্চের্স্কায়ার মাথাটা একেবারে ঘুরে গিয়েছিল, হাই-স্কুলে অন্তত তাই বলে। সেই ঋতুতে কত না বরফ, সূর্য আর শীত, হাই-স্কুলের বাগানের দীর্ঘ ফার গাছের আড়ালে শীগ্‌গির অস্ত যেত সূর্য — সদাসর্বদা উজ্জ্বল ও রশ্মিময় — প্রতিশ্রুতি দিত যে কালকের দিনটায়ও আবার দেখা যাবে হিমকণা আর রোদ, হবে সবর্নায়া স্ট্রীটে বেড়ানো, শহরের পার্কে

স্কেটিং, সন্ধ্যার আকাশে গোলাপি আভা, গানবাজনা এবং স্কেটারদের এদিক-ওদিক ছুটোছুটি আর তাদের মধ্যে ওলিয়া মেশ্চের্স্কায়ার মতো ভাবনাচিন্তাহীন ও সুখী আর কেউ নয়। তারপর একদিন দুপুরের ছুটির সময় খুশিতে চিলের মতো চীৎকাররত প্রথম শ্রেণীর এক দল মেয়ের কাছ থেকে দৌড়িয়ে পালাচ্ছে সে হল-ঘরে, সহসা তার ডাক পড়ল হেডমিস্ট্রেসের কাছে। দৌড়তে দৌড়তে হঠাৎ থেমে, গভীর একটি নিশ্বাস নিয়ে, ক্ষিপ্র ও ইতিমধ্যে খাঁটি স্ত্রীলোকসুলভ ভঙ্গিতে চুল ঠিক করে নেওয়া হল, অ্যাপ্রনের খুঁট কাঁধে টেনে ঠিকমতো বসিয়ে, দীপ্ত চোখে দৌড়ল ওপরে। হেডমিস্ট্রেস দেখতে কমবয়সী কিন্তু চুলে পাক ধরেছে, ডেস্কের সামনে বসে শান্তভাবে তিনি বুনছিলেন; পেছনের দেয়ালে জারের একটা ছবি।

— Mademoiselle মেশ্চের্স্কায়া, — ফরাসীতে বললেন তিনি, বোনার কাজ থেকে চোখ না তুলে, — তোমার ব্যবহার নিয়ে কথা বলার জন্য এই প্রথম তোমাকে ডেকে পাঠাতে হচ্ছে না, দুঃখিত হয়ে বলছি।

— বলুন, ম্যাডাম, শুনছি, — বলে ডেস্কের আরো কাছে এল ওলিয়া। হেডমিস্ট্রেসের দিকে তাকাল, উজ্জ্বল তার চোখ, লুকোচুরির কিছু নেই, মুখ

ভাবলেশহীন: চেয়ারে বসতে গিয়ে লাবণ্যভরে হালকাভাবে শরীরটা যে ভাবে নোয়াল তা শুধু সে-ই পারে।

— ঠিক মতো শুনবে না যে তাতে দুর্ভাগ্যক্রমে আমার আর কোনো সন্দেহ নেই, — বলে হেডমিস্ট্রেস পশমে এমন একটা টান দিলেন যে গোলাটা চকচকে মেঝেতে ঘুরতে লাগল ওলিয়ার কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করে, মুখ তুলে বললেন: — যা বলার একবারই বলব, আর বলব সংক্ষেপে।

বড়ো তকতকে পরিষ্কার ঘরটা বেশ ভালো লাগল ওলিয়ার, কনকনে দিনটায় স্টোভের ঝকঝকে টালিগুলো উষ্ণতা ছড়াচ্ছে, স্নিগ্ধ সৌরভ আসছে ডেস্কে রাখা মেঠো লিলির গোছা থেকে। চমকপ্রদ কোন একটা হল-ঘরের মধ্যে পূর্ণ দৈর্ঘ্যে আঁকা নবীন জারের ছবি একবার দেখে নিয়ে... হেডমিস্ট্রেসের পরিপাটি চুলের সোজা সিঁথিতে চোখ রেখে সে চুপ করে রইল প্রত্যাশায়।

— তুমি আর ছেলেমানুষ নও, — গুরুগম্ভীর চালে বললেন হেডমিস্ট্রেস, চাপা বিরক্তি তাঁর বাড়তির দিকে।

— হাঁ, ম্যাডাম, — সরল সুরে প্রায় ফূর্তির সঙ্গে জবাব দিল ওলিয়া।

— তা বলে তুমি এখনো বড়ো হয়ে যাও নি, — আরো গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন হেডমিস্‌ট্রেস, মুখের নিষ্প্রভ চামড়া অল্প লাল হয়ে উঠল। — প্রথম কথা — এভাবে চুল বাঁধার আস্পর্ধা হল কী করে? চুল বাঁধার কায়দাটা একেবারে বড়োদের মতো!

— চুলটা সুন্দর সেটা তো আমার দোষ নয়, ম্যাডাম. — বলে ওলিয়া দুহাত তুলে সুবিন্যস্ত চুল স্পর্শ করল।

— তোমার দোষ নয়, বটে! — বললেন হেডমিস্‌ট্রেস। — চুল বাঁধার ছিরিটা তোমার দোষ নয়, দামী চিরুণীগুলো তোমার দোষ নয়, বিশ রুবল দামের জুতো কিনিয়ে বাপ-মাকে যে পথে বসাচ্ছ সেটাও তোমার দোষ নয়! কিন্তু শোনো, তুমি যে এখনো হাই-স্কুলের একরত্তি মেয়ে সেটা একেবারে ভুলে গিয়েছ...

এতে ওলিয়া মেশ্চের্স্কায়া নিজের সমস্ত সারল্য ওধীরস্থির ভাব অটুট রেখে হঠাৎ ভদ্রভাবে বাধা দিয়ে বলল:

— মাফ করবেন, ম্যাডাম, কিন্তু আপনি ভুল করছেন: আমি বড়ো হয়ে গেছি। আর দোষটা কার — জানেন? আলেক্সেই মিখাইলভিচ মালিউতিনের, বাবার বন্ধু ও প্রতিবেশী এবং আপনার ভাই যিনি। ব্যাপারটা ঘটেছিল গাঁয়ে গত গ্রীষ্মকালে...

উপরোক্ত বাক্যালাপের এক মাস পরে, অসুন্দর ও অনভিজাত চেহারার একটি কসাক অফিসার, ওলিয়ার সমাজের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক যার নেই, স্টেশনের প্লাটফর্মে, ট্রেন থেকে নামা একগাদা লোকের চোখের সামনে প্রকাশ্যে গুলি করল ওলিয়াকে। ওলিয়ার যে অবিশ্বাস্য স্বীকারোক্তি হতভম্ব করে দিয়েছিল হেডমিস্ট্রেসকে দেখা গেল সেটা সত্যি: তদন্তকারী হাকিমের কাছে অফিসারটি একটি বিবৃতিতে বলল যে মেশ্চের্স্কায়া তাকে প্রলুব্ধ করে ঘনিষ্ঠতা করেছিল, বলেছিল বিয়ে করবে, তারপর, যেদিন সে খুন হল সেদিন নভচের্কাস্কের ট্রেনে তাকে তুলে দিতে এসে রেলওয়ে স্টেশনে হঠাৎ বলল এমনকি তাকে ভালোবাসার কথা কখনো মনে ঠাঁই দেয় নি সে, বিয়ের কথা বলে শুধু তাকে নিয়ে মজা করেছে, ডায়েরীতে মালিউতিনের বিষয়ে লেখা পাতাটা সে তাকে দেয়।

— সেকটা লাইন পড়ে নেবার সময় দিয়ে ও প্লাটফর্মে পায়চারি করতে লাগল, আর পড়ার পর সঙ্গে সঙ্গে ওকে গুলি করলাম, — বলল অফিসারটি। — এই তো ওর ডায়েরী, দেখুন, গেল বছরের ১০ই জুলাই তারিখে কী লেখা...

ডায়েরীতে লেখা:

'রাত প্রায় দুটো। গভীর ঘুম এসে গিয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠলাম... আজ . আমি তাহলে একেবারে বড়ো হয়ে গেছি! বাবা, মা আর তোলিয়া সবাই শহরে, আমি ছিলাম একেবারে একলা। একলা থাকতে কত না ভালো লাগল! সকালে গেলাম বাগানে আর মাঠে, গেলাম বনে, মনে হল সারা পৃথিবীতে আমি একা, আর ভাবলাম এত আরাম ও আনন্দ লাগছে যা আর কখনো হয় নি। বড়ো হাজরি খেলাম একা, তারপর পুরো এক ঘণ্টা পিয়ানো বাজানো, বাজনা শুনে মনে হল আমি বেঁচে থাকব চিরকাল, আমার মতো সুখী আর কেউ হবে না। বাবার পড়ার ঘরে তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম, বেলা চারটের সময় কাতিয়া জাগিয়ে দিয়ে বলল আলেক্সেই মিখাইলভিচ এসেছেন। তাঁকে দেখে বেজায় খুশি হলাম, তাঁকে বসাতে, আদর আপ্যায়ন করতে বেশ লাগত। দুটো খুব সুন্দর ঘোড়ায় টানা গাড়িতে তিনি এসেছিলেন, ঘোড়াদুটো প্রবেশপথের সামনেটায় রইল সারাক্ষণ, তখ্খুনি তিনি গেলেন না, বৃষ্টি পড়েছিল কিনা, ভাবলেন সন্ধ্যের মুখে রাস্তাঘাট একটু খটখটে হয়ে যাবে। বাবার সঙ্গে দেখা না হওয়াতে তিনি দুঃখিত, বেশ হাসিখুশি মেজাজে নাগরের মতো আমার সঙ্গে ব্যবহার করলেন,

ঠাট্টা করে এমন ভাব দেখালেন যে বহুদিন হল আমার প্রেমে পড়েছেন। চায়ের আগে বাগানে ঘোরার সময় আবহাওয়া আবার মধুর হয়ে উঠল, রোদে ভেসে গেল টুপটাপ বৃষ্টিবিন্দু ঝরা গোটা বাগানটা, তবু কী ঠাণ্ডা, তিনি আমার হাত ধরে বললেন আমরা হলাম ফাউস্ট আর মার্গারেট। বয়স তাঁর ছাপ্পান্ন, কিন্তু দেখতে বেশ আর সর্বদা ফিটফাট — একটা জিনিস শুধু ভালো লাগে নি, সেটা হল ওঁর কেপ মাথায় আসাটা, — বিলিতি সেণ্টের গন্ধ ওঁর গায়ে, চোখজোড়া বেশ নবীন আর কালো, সুষ্ঠুভাবে লম্বা দুভাগ করা দাড়ি কিন্তু একেবারে পাকা। কাঁচের বারান্দায় বসে চা খেলাম, শরীরটা কেমন যেন চনমন করে ওঠাতে সোফায় শুয়ে পড়লাম, উনি ধূমপান করছিলেন, তারপর এসে বসলেন আমার পাশে, আবার নানা স্তাবনা করে আমার হাত খুঁটিয়ে দেখে চুমো খেতে লাগলেন। সিল্কের রুমালে মুখ ঢাকলাম... উনি সিল্কের ওপরে আমার ঠোঁটে চুমো খেলেন বারকয়েক... ব্যাপারটা ঘটল কী করে জানি না, মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল নিশ্চয়, আমি যে এরকম ভাবতেও পারি নি কখনো! এখন উদ্ধারের একটা মাত্র পথ খোলা আমার কাছে... ওঁর প্রতি আমার বিতৃষ্ণা এত প্রবল অসহ্য একেবারে!

এপ্রিলের সেসব দিনে শহরটা এত পরিষ্কার আর খটখটে, রাস্তার পাথর সাদা, তার ওপর দিয়ে হাঁটা সহজ আর প্রীতিকর। গির্জায় প্রার্থনার পর প্রতি রবিবার ছোটখাটো একটি মহিলা সবর্নায়া স্ট্রীট হয়ে রওনা হন শহরের বাইরে, পরনে তাঁর শোকপরিচ্ছদ, কালো দস্তানাজোড়া নরম চামড়ার, ছাতার বাঁট আবলুস কাঠের। তিনি যান নোংরা চকের বাঁধানো রাস্তা ধরে, চকের চারপাশে ধোঁয়ায় কালো অনেক কামারশালা, মাঠের দমকা তাজা হাওয়া ফেটে পড়ে থেকে থেকে; আরো দূরে, মঠ আর জেলখানার মাঝখানটায় দেখা যায় আকাশের মেঘে সাদা দিগন্ত আর বসন্তকালীন মাঠঘাটের ধূসর ছোপ, তারপর মঠের দেয়ালের কাছাকাছি জলের গর্তের মধ্য দিয়ে গেছে রাস্তাটা, বাঁ দিকে মোড় নিলে সাদা দেয়ালে ঘেরা একটি বড়ো, নীচু বাগান, ফটকে আঁকা স্বর্গে কুমারী মেরির সম্বর্ধনা দৃশ্য। ছোটখাটো স্ত্রীলোকটি সতর্ক ক্ষিপ্রভাবে ক্রুশচিহ্ন করে দৃঢ় পায়ে অভ্যেস মতো এগোন বাগানের বড়ো বীথিকা হয়ে। ওক কাঠের ক্রুশের মুখোমুখি বেঞ্চিটায় পেঁছিয়ে ঘণ্টাখানেক বা দুয়েক বসে থাকেন হাওয়ায় আর বসন্তের ঠাণ্ডায়, যতক্ষণ না পাতলা জুতো পরা পা আর হালকা দস্তানা মোড়া হাত একেবারে

অসাড় হয়ে যায়। ঠাণ্ডা হলেও মিষ্টি সুরে গান গায় বসন্তের পাখিরা, সে গান আর চীনে মাটির তৈরী ফুলের মালায় হাওয়ার শনশন শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে ভাবেন এই মরা ফুল কখনো যদি না দেখতে হত তার জন্য দিতে পারেন অর্ধেক জীবন। ফুলের এই মালা, মাটির এই ঢিবি আর ওক কাঠের ক্রুশটা! সত্যি কি ক্রুশের নীচে শায়িতা সে, যার চোখ ওপরের পদক থেকে চেয়ে আছে এমন অমর ভাস্বরতায়, সে চোখের শুচিতার সঙ্গে কেমন করে খাপ খাওয়ানো যায় ওলিয়া মেশ্চের্স্কায়ার নামের সঙ্গে অধুনা জড়িত বিভীষিকাকে? — কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থলে সুখী ছোটখাটো মহিলাটি, তীব্র আবেগে একটা স্বপ্নকে যারা আঁকড়ে থাকে তাদের সবাইকার মতো।

স্ত্রীলোকটি হলেন ওলিয়া মেশ্চের্স্কায়ার ক্লাসের শিক্ষয়িত্রী, বিগতযৌবনা অবিবাহিতা মহিলাটি বহুদিন বাস্তবের বদলে কল্পনার জগতে বাস করছেন। প্রথম রঙীন কল্পনা ছিল তাঁর ভাইটিকে ঘিরে, — জুনিয়র অফিসারটি গরীব, কোনক্রমে উল্লেখযোগ্য বলা যেত না তাকে, — তাকে কেন্দ্র করে তার সমস্ত স্বপ্ন দানা বাঁধে, কী কারণে যেন ভেবেছিলেন সে ভবিষ্যতে খুব বড়ো কিছু একটা হবে। মুক্‌দেনের যুদ্ধে সে মারা

গেল, তখন তিনি নিজেকে এই বলে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করলেন -- তিনি কাজ করছেন একটি আদর্শের জন্য! ওলিয়া মেশ্চের্স্কায়ার মৃত্যু তাঁকে নিয়ে গেল নতুন একটি স্বপ্নলোকে। আর এখন তাঁকে হানা দেওয়া নানা চিন্তা ও অনুভূতির বিষয়বস্তু — ওলিয়া মেশ্চের্স্কায়া। প্রতিটি উৎসবের দিনে তার কবরে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেয়ে থাকেন ওক কাঠের ক্রুশের দিকে, মনে আনেন কফিনে শোয়া ফুলের মধ্যে ওলিয়া মেশ্চের্স্কায়াব বিবর্ণ ছোট মুখ — আর, সহসা একবার কানে আসা তার কয়েকটি কথা: দুপুরের ছুটির সময় হাই-স্কুলের বাগানে বেড়াতে বেড়াতে কথাগুলো তাড়াতাড়ি, খুব তাড়াতাড়ি ওলিয়া মেশ্চের্স্কায়া বলেছিল তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী, দীর্ঘাঙ্গিনী, মোটাসোটা সুব্বতিনাকে:

-- বারবার একটা বইয়ে পড়লাম, — অনেক পুরনো, মজার বই আছে বাবার, — পড়লাম মেয়েমানুষের সৌন্দর্য কিরকম হওয়া উচিত... জান, এত সব লেখালেখি যে মনে রাখা ভয়ানক শক্ত: অবশ্য তার চোখ কালো, ফুটন্ত আলকাতরার মতো কালো, সত্যি বলছি রে বিশ্বাস কর, — ঠিক তাই লিখেছে: ফুটন্ত আলকাতরার মতো! — রজনীর মতো কালো হওয়া

চাই চোখের পাতা, গালে থাকা দরকার কোমল রক্তাভা, দেহ হওয়া চাই দোহারা, হাতদুটো সাধারণের চেয়ে লম্বা, — ভাবতে পার -- সাধারণের চেয়ে লম্বা! — পায়ের পাতা ছোট, মানানসই বড়ো বুক, সুগঠিত পা, ঝিনুক-রঙা হাঁটু, নরম কাঁধ, — কথাগুলো এত সত্যি যে অনেকগুলো মুখস্থ করে ফেলেছি! — কিন্তু আসল জিনিসটা, সবচেয়ে বড়ো কথা কী জান? — লঘু নিশ্বাস! আর আমার তো আছেই সেটা — আমার নিশ্বাসপ্রশ্বাস কেমন শোন না, — লঘু তাই না?

আর এখন সেই লঘু নিশ্বাস মিলিয়ে গেছে পৃথিবীতে, এই মেঘলা আকাশে, বসন্তের এই শিরশিরে হাওয়ায়।

১৯১৬

সর্দিগর্মি
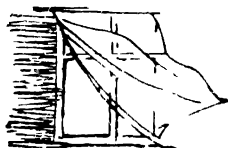
ডিনারের পর ডাইনিং-রুমের গরম উজ্জ্বল আলো থেকে চলে এসে তারা দাঁড়াল ডেকে, রেলিং-এর কাছ ঘেঁষে। চোখ বুজে মেয়েটি হাতের উল্টো দিক গালে চেপে হেসে উঠল সহজ, মধুর সুরে, — ছোটখাটো মেয়েটির সবকিছুই মধুব, — তারপর বলল:

— মনে হচ্ছে নেশা হয়েছে... কোত্থেকে এসেছেন আপনি? তিন ঘণ্টা আগে এমনকি আপনার অস্তিত্ব পর্যন্ত জানা ছিল না। কোথায় যে স্টীমারে উঠলেন তাও জানি না। সামারায়? যা হোক, সব সমান... আমার মাথা ঘুরছে না স্টীমারটা মোড় নিচ্ছে?

সামনে অন্ধকার আর আলো। একটানা মৃদুমন্দ হাওয়া অন্ধকার থেকে বইছে তাদের মুখে, সামনে থেকে আলোগুলো ছুটে পালাচ্ছে এক পাশে: ভলগা জলযানের সচরাচর ক্ষিপ্রগতিতে স্টীমারটা বড়ো একটা পাক দিয়ে চলেছে ছোট জেটির দিকে।

মেয়েটির হাত ধরে লেফটেনাণ্ট ঠোঁটে ছোঁয়াল। ছোট্ট বলিষ্ঠ হাতে রোদেপোড়া গন্ধ। আর তার বুক স্বর্গসুখে আর ভয়ে থমকে দাঁড়াল এই ভেবে যে, দক্ষিণী আকাশের নীচে তপ্ত বালুতে (মেয়েটি বলেছিল আনাপা থেকে ফিরছে) পুরো এক মাস সূর্যস্নানের পর লিনেনের পাতলা ফ্রকের নীচে ওর সারা শরীর কী শক্ত আর তামাটে।

— চলুন নামা যাক... — অনুচ্চ কণ্ঠে বলল লেফটেনাণ্ট।

— কোথায়? — অবাক হয়ে মেয়েটি শুধাল।

— এখানে নেমে পড়ি।

— কেন?

কিছু বলল না লেফটেনাণ্ট। মেয়েটি আবার হাতের উল্টো দিক চাপাল তপ্ত গালে।

— পাগলামি...

— চলুন নামি, — ভারি গলায় সে আবার বলল, — দোহাই আপনার...

— বেশ, আপনার যা ইচ্ছে তাই করুন, — মুখ ফিরিয়ে মেয়েটি বলল।

যতদূর সম্ভব বেগে এসে স্বল্পালোকিত জেটিতে স্টীমারটা লাগল আস্তে ধপ্ করে। দুজনে আর একটু হলে এ-ওর গায়ের ওপর পড়ত। মাথার ওপর দিয়ে ছুটে এল একটা দড়ি, স্টীমারটাকে টেনে নেওয়া হতে লাগল, শুরু হল জলের তোলপাড়, নামবার তক্তার গড়গড় শব্দ... মালপত্র আনতে ছুটল লেফটেনাণ্ট।

মিনিটখানেক পরে ঘুমে জড়ানো ছোট আপিসটা পেরিয়ে বালুতীরে এসে পড়ল দুজন, বালিতে পায়ের গাঁট অবধি বসে যাচ্ছে, নীরবে উঠল একটি ধুলোভরা গাড়িতে। বিরল বাঁকা বাঁকা লণ্ঠনে আলোকিত পাহাড়ের ঢালুর মধ্যে ধুলোয় নরম পথের শেষ হবার নামগন্ধ নেই মনে হল তাদের। কিন্তু এবার ঢালুর শেষ, শুরু হল পাথুরে রাস্তায় চাকার খট্‌খট আওয়াজ, এই তো কোন একটা চক, নানাবিধ দফতর ও অফিস, দমকল বাহিনীর মিনার, গ্রীষ্মের রাতে মফস্বল শহরের উষ্ণতা ও গন্ধ... একটি আলোকিত ফটকের সামনে গাড়োয়ান গাড়ি থামালে খোলা দরজার ফাঁকে চোখে

পড়ল খাড়া পুরনো কাঠের সিঁড়ি এবং গোলাপী শার্ট ও কোট পরা দাড়িগোঁফ না কামানো বুড়ো একটি দারোয়ান, বেজার মুখে সে নেংচাতে নেংচাতে তাদের স্যুট্‌কেস নিয়ে পথ দেখিয়ে চলল ওপরে। বড়ো কিন্তু সারা দিনের তাপে বেজায় গুমোট একটা ঘরে নিয়ে গেল তাদের, জানলায় সাদা পর্দা, ড্রেসিং-টেবিলে গোটা দুয়েক নতুন মোমবাতি, — ঘরে ঢুকতেই, দারোয়ান দরজা বন্ধ করে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই লেফটেনাণ্ট এত অধীর আবেগে ছুটে গেল মেয়েটির কাছে, চুম্বন করার সময়টায় এত তীব্র বাসনায় দুজনের হাঁফ ধরে গেল যে পরে অনেক বছর তাদের মনে জেগে ছিল মুহূর্তটির স্মৃতি: সারা জীবনে দুজনের কারোর এরকম অভিজ্ঞতা আর কখনো হয় নি।

সকাল দশটার সময় চলে গেল সেই ছোটখাটো অনামী মেয়েটি, শেষ পর্যন্ত যে নাম জানায় নি লেফটেনাণ্টকে, হেসে হেসে বলেছে সে শুধু অচেনা সুন্দরী; তপ্ত, রৌদ্রোজ্জ্বল, আনন্দভরা সেই সকালটায় গির্জার ঘণ্টাধ্বনি, হোটেলের সামনে হাটের হৈচৈ, খড়ের, আলকাতরার আর রুশী মফস্বল শহরের নানা উগ্র মিশ্র গন্ধ। রাত্রে বিশেষ ঘুমোয় নি সে কিন্তু সকালে বিছানা ছেড়ে পর্দার

আড়ালে গিয়ে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে মুখহাত ধুয়ে জামাকাপড় পরে নেবার পর তাকে দেখাল সপ্তদশীর মতো নবীনা। অস্বস্তি লাগছিল কি তার? না, খুবই সামান্য একটু শুধু। আগের মতো তার সহজ হাসিখুশি ভাব। আর তার বিচক্ষণ বুদ্ধির পরিচয় পেতে দেরী হল না।

-- না, না, মণি, -- একসঙ্গে আবার যাত্রার প্রস্তাবের উত্তরে সে বলল, — না, পরের স্টীমার না আসা পর্যন্ত আপনাকে থেকে যেতে হবে। দুজনে একসঙ্গে গেলে সবকিছু পণ্ড হবে। আমার বেজায় খারাপ লাগবে। গা ছুঁয়ে বলছি, আমাকে হয়ত যা ভেবেছেন মোটেই আমি তা নই। এটা তো দূরের কথা, এর ঘেঁষা কিছু আমার জীবনে ঘটে নি কখনো, আর ঘটবেও না। আমার বুদ্ধি লোপ পেয়ে গিয়েছিল নির্ঘাত... কিম্বা হয়ত আমাদের দুজনের সর্দিগর্মিগোছের কিছু একটা হয়েছিল...

আর কেমন যেন হালকা মনেই তার কথা মেনে নিল লেফটেনান্ট। স্টীমার ঘাট পর্যন্ত হালকা খুশি মনে গেল তার সঙ্গে, -- গোলাপী রঙের 'সামালিওৎ' ছেড়ে দেবার উপক্রম করেছে তখন, — ডেকের সবার সামনে তাকে চুমু খেয়ে নামবার তক্তা সরিয়ে নেবার সময় কোনক্রমে লাফিয়ে পড়ল তা থেকে।

আগেকার মতো নিশ্চিন্ত হালকা মনে সে ফিরল হোটেলে। কিন্তু মনে হল এরই মধ্যে সেখানটা কিছু বদলেছে। ও নেই, ঘরটার চেহারা তাই কেন যেন একেবারে আলাদা। এখনো সেটা তার উপস্থিতিতে ভরাট, কিন্তু ফাঁকা! কী আশ্চর্য ঘরে তখনো তার বিলিতী ওডিকলোনের খাসা গন্ধ, ট্রেতে শেষ-না-করা তার চায়ের কাপ. কিন্তু তবু সে নেই... আর কোমল অনুরাগে লেফটেনাণ্টের বুকটা এমন মুচড়ে উঠল যে, তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট ধরিয়ে সবেগে পায়চারি করতে লাগল ঘরে।

— কী অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা! — হেসে বলে উঠল জোরে, অথচ টের পেল চোখ ফেটে কিন্তু জল আসছে তার। — 'গা ছুঁয়ে বলছি, আমাকে হয়ত যা ভেবেছেন মোটেই আমি তা নই...' আর চলে গেছে...

পর্দাটা সরানো, বিছানা তখনো ঠিক করা হয় নি। ওর মনে হল বিছানার দিকে তাকানো এখন অসহ্য। পর্দা টেনে আড়াল করল বিছানাটা, হাটের হৈচৈ, গাড়ির চাকার আর্তনাদ ঢাকার জন্য জানলাগুলো বন্ধ করে দিয়ে সাদা ফোলা পর্দাগুলো নামিয়ে বসে পড়ল সোফায়... তাহলে 'জাহাজী কাণ্ডকারখানার' সমাপ্তি হল! ও তো চলে গেছে, এতক্ষণে অনেক দূরে, হয়ত

বসে আছে কাঁচের সাদা লাউঞ্জে, নয়ত ডেকচেয়ারে হেলান দিয়ে তাকিয়ে আছে রোদে চিকচিকে বিরাট নদীর দিকে, ভাঁটির দিকে কাঠের ভেলা চলেছে, হলদে বালুর চর, জল আর আকাশের উজ্জ্বল দৃশ্যপট, ভলগার অনন্ত বিস্তার .. আর বিদায়, চিরবিদায়... আবার কোথাও দেখা হওয়া কি সম্ভব? -- 'সত্যি তো,' সে ভাবল, 'আমি বিনা কারণে কী করে হুট করে হাজির হই সে শহরে যেখানে থাকে ওর স্বামী, ওর তিন বছরের মেয়ে, আর মোটের ওপর যেখানে ওর গোটা সংসার, রোজকার জীবন।' শহরটা তার কাছে মনে হল অন্য ধরনের, পূত সে শহর, সেখানে মেয়েটি কাটাবে তার নিঃসঙ্গ জীবন, হয়ত প্রায় মনে পড়বে তার কথা, মনে পড়বে হঠাৎ দেখার কথা, নশ্বর মুহূর্তগুলির কথা, আর সে কখনো চোখে দেখতে পাবে না তাকে — চিন্তা করে হতবুদ্ধি লাগল লেফটেনাণ্টের। না, তা হতে পারে না! পাগলের মতো ব্যাপার হবে, অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও অবিশ্বাস্য ব্যাপার! এত তীব্র ব্যথা বোধ করল সে, ওর সঙ্গহীন সামনে প্রসারিত দীর্ঘ জীবনকে এত অর্থহীন মনে হল যে, আতঙ্কে আর হতাশায় হৃদয় ভরে গেল।

'ছাইপাঁশ কী ভাবছি!' ভেবে উঠে পড়ে আবার

শুরু করল পায়চারি, চেষ্টা করল পর্দার আড়ালে বিছানাটায় চোখ যাতে না পড়ে। 'কী হয়েছে আমার? আর ওর মধ্যে আহামরি কী দেখেছি, ঘটেছে কী শুনি? সত্যি সর্দিগর্মির মতো ব্যাপারটা! কিন্তু আসল কথা হল, এই হতচ্ছাড়া শহরটায় ওকে ছাড়া বাকি দিনটা কাটাই কী করে?'

মেয়েটির সমস্ত কিছু এখনো মনে আছে তার, ওর সামান্যতম সব স্বকীয়তা, মনে আছে ওর রোদে-পোড়া চামড়া, লিনেনের পোষাক আর বলিষ্ঠ দেহের গন্ধ, ওর মধুর, সহজ, হাসিখুশি গলার স্বর... ওর স্ত্রীলোকসুলভ সমস্ত মোহিনী মায়ায় নিজের তীব্র উচ্ছ্বাসের অনুভূতি এখনো আছে অসাধারণ স্পষ্টভাবে, তবু অন্য, একেবারে অভিনব এই অনুভূতিটা আরো গুরুত্বপূর্ণ এখন — যে বিচিত্র অদ্ভুত অনুভূতিটা ওর সঙ্গে থাকার সময় একবারও অনুভব করে নি, আগের রাত্রে মজার অভিজ্ঞতা হিসেবে ব্যাপারটা শুরু করার সময় কখনো মনে হয় নি এ ধরনের অনুভূতি তার হতে পারে, এই অনুভূতির কথা ওকে আর বলা যায় না এখন! 'আর সবচেয়ে খারাপ হল, ওকে বলতে আর পারব না কখনো!' ভাবল লেফটেনাণ্ট। 'কী করি? এই সব স্মৃতি আর অশান্ত যন্ত্রণার চাপে কী

করে অন্তহীন দিনটা কাটাই চিকচিকে ভলগাপারের পাণ্ডববর্জিত এই শহরটায়, ভলগা বেয়ে তাকে নিয়ে গেছে গোলাপী জাহাজটা!'

মুক্তির সন্ধান করা দরকার, অন্যমনস্ক হবার জন্য কিছু করা চাই, যেতে হবে কোথাও একটা। মন ঠিক করে মাথায় টুপি চাপিয়ে, ছড়িটা তুলে নিয়ে ফাঁকা বারান্দায় জুতোর কাঁটা খট্‌খটিয়ে সে ক্ষিপ্র পায়ে খাড়া সিঁড়ি বেয়ে ছুটল সদর দরজায়... বেশ, কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়? বাইরে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে, ফিটফাট পোষাকে কমবয়সী একটি গাড়োয়ান কার প্রতীক্ষায় যেন ধীরভাবে সিগারেট টেনে চলেছে। বিব্রত অবাকভাবে লেফটেনাণ্ট তাকাল তার দিকে: কোচ বাক্সে এমন ধীরস্থিরভাবে বসে সিগারেট টানছে, সব মিলিয়ে এমন একটা সাধারণ, বেপরোয়া আর উদাসীন ভাব লোকটার আসে কী করে? — 'গোটা এই শহরে বোধহয় আমিই একমাত্র লোক যে ভয়ংকর অসুখী,' — ভেবে বাজারের দিকে চলল লেফটেনাণ্ট।

বাজারে এরই মধ্যে ভিড় কমে আসছে। শসাবোঝাই গাড়ির মাঝখান হয়ে, তাজা গোবরে পা দিয়ে নিরুদ্দেশভাবে সে চলল, চারিধারে নতুন হাঁড়ি-কুঁড়ি আর ঘটিবাটি, আর মাটিতে বসে থাকা মেয়েরা এ-ওর

সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জিনিস বেচতে চাইছে তাকে। বাটিগুলো তুলে আঙুলের টোকায় আওয়াজ তুলে দেখাতে চাইল কত খাসা জিনিস, এদিকে লোকেদের চীৎকারে কান ঝালাপালা হবার জোগাড়: 'এই যে হুজুর, এমন খাসা শসা আর কোথাও পাবেন না, হুজুর!' — সমস্ত ব্যাপারটা এত অবান্তর আর বিশ্রী যে, বাজার ছেড়ে পালাল লেফটেনাণ্ট। গির্জায় গিয়ে পড়ল যখন, তখন প্রার্থনা সঙ্গীত গাওয়া হচ্ছে জোর গলায়, আনন্দ ও সিদ্ধকর্তব্যের অনুভূতিতে, তারপর নদীর ইস্পাত-ধূসর সীমাহীন প্রসারের পাড়ে পাহাড়টায় ছোট পরিত্যক্ত উত্তপ্ত বাগানে ঘোরাফেরা করল অনেকক্ষণ... টিউনিকের ব্যাজ আর বোতামগুলো এত তেতে উঠেছে যে ছোঁয়া যায় না। টুপির ভেতরকার ফিতেটা ঘামে চটচটে, মুখটা জ্বলছে... হোটেলে ফিরে বেশ ভালো আর আরাম লাগল একতলার বড়ো ফাঁকা ঠাণ্ডা ডাইনিং-রুমে গিয়ে টুপি খুলে খোলা জানলার কাছে একটা টেবিলে বসতে; জানলা দিয়ে বইছে উত্তপ্ত হাওয়া, তবুও হাওয়া তো বটে, বরফ-দেওয়া বীট পালঙের সুপ ফরমাশ করল... সবকিছু বেশ ভালো, সমস্ত কিছুতে অতল সুখ, বিপুল আনন্দ; আনন্দ রয়েছে এমনকি এই গরমে, হাটের গন্ধে, অদ্ভুত, শ্রীহীন

আলোয় সেই চোখে পড়া চারিদিকে ছড়ানো মোজা, জুতো, গ্রীষ্মকালীন ফ্রক আর সেই ছোট্ট সুন্দর ড্রেসিং-গাউনটা, ঘুমতে যাবার আগে যেটাতে ঢাকা তার দেহ আমি আলিঙ্গন করতাম, মুখে লাগত তার উষ্ণ নিঃশ্বাস, আত্মসমর্পণে মুখ ও তুলে ধরত, আমি চুমো খেতাম। এই বিভীষিকা থেকে আমাকে মুক্তি দিতে পারে শুধু ওর সঙ্গে, ওর সামনে ফেলা ক্ষিপ্ত অশ্রুধারা, কিন্তু ও তো আর নেই!

আর একটি রাত এল। শোবার ঘরের বোবা স্তব্ধতায় মোমবাতির সেই ক্ষীণ আলো। কালো জানলার বাইরে রাত্রির অন্ধকারে গহন হেমন্তের মুষল-ধারা বৃষ্টির একটানা শব্দ। শুয়ে শুয়ে তাকিয়ে রইলাম ঘরের কোণে — ওখানকার পুরনো আইকনটার সামনে রোজ রাত্রে ও প্রার্থনা করত: যেন ঢালাই করা পুরনো তক্তা সিঁদুর রঙে রাঙা, আর লাল রঙে বার্নিশ করা এই পটে সোনালি বেশ ভূষায় কুমারী মেরির কঠোর বিষণ্ন মূর্তি টানা টানা কালো চোখ তাকিয়ে আছে সুদূর পরপারে — চোখের চারপাশে কালো রেখা! এই কালো রেখা কী ভয়াবহ। আর কী ভয়াবহ আমার কালাপাহাড়ি ভাবানুসঙ্গ: ও — আর কুমারী মেরি, এই প্রতিমূর্তি — আর পালানোর জন্য পাগলের মতো তাড়াহুড়োয়

চার দিকে ছড়ানো তার সব মেয়েলি টুকিটাকি জিনিস।

এক সপ্তাহ কাটল, আরো একটি সপ্তাহ, কেটে গেল একটি মাস। অনেক দিন কাজ ছেড়ে দিয়েছি, কোথাও যাই না, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত চেষ্টা করি একটির পর একটি স্মৃতি থেকে মুক্তি পেতে — আর কেন জানি মনে হত: এককালে কোথায় যেন স্লাভরা ঠিক এইভাবে এক ঘাট থেকে আরেক ঘাটে বনের পথে, খানাখোন্দলের ওপর দিয়ে 'টেনে' নিয়ে যেত তাদের মালবোঝাই নৌকো।

৩০

বাড়ি ও শহরের সর্বত্র উপস্থিতির যন্ত্রণা আরো এক মাস সইলাম। অবশেষে মনে হল এ যন্ত্রণা আর সইতে পারি না, ঠিক করলাম যাব বাতুরিনোতে — কিছু দিন কাটাব, ভবিষ্যতের ভাবনা পরে ভাব যাবে।

তাড়াতাড়ি শেষ বার ভাইকে আলিঙ্গন করে বিদায় নিয়ে চলন্ত ট্রেনের কামরায় উঠে পড়লাম — অত্যন্ত বিচিত্র মনে হল কামরায় ঢুকে নিজেকে বলা: এই তো দেখো, আবার পাখির মতো তুমি স্বাধীন! শীতের

রাত্রিটা অন্ধকার, বরফ নেই, শুকনো হাওয়ায় ট্রেনের সশব্দ ঘড়ঘড়ানি। স্যুটকেশ নিয়ে কোণে দরজার কাছে একটা জায়গা পেলাম, বসে মনে পড়ে গেল ওর সামনে কত ভালো লাগত পোল্যাণ্ডের প্রবাদটির পুনরুক্তি করতে: 'সুখের তরে মানুষের সৃষ্টি, ওড়ার তরে যেমন পাখির' -- আর গর্জিত ট্রেনের কালো জানলার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম যাতে আমার চোখের জল কেউ না দেখে ফেলে। খারকভে যেতে একটি রাত্রি... আর খারকভ থেকে দুবছর আগে চলে আসার সেই আর একটি রাত্রি: বসন্তকাল, ভোরবেলা, দিনের আলো উঁকি দিচ্ছে ট্রেনে আর কী গভীর ঘুমে তখনো সে আচ্ছন্ন... লণ্ঠনের টিমটিমে আলোয়, ঠেসাঠেসি দুর্গন্ধ কামরায় বসে রইলাম অধীরভাবে, কখন ভোর হবে, কখন খারকভে দেখব লোকজন, চলাফেরা, কখন স্টেশনে খাব এক গেলাস গরম কফি...

কুর্স্ক এসে পড়ল, স্মৃতিভরা আর একটি শহর: বসন্তের দুপুরে স্টেশনে ওর সঙ্গে লাঞ্চ খাওয়া, ওর আনন্দ: 'জীবনে এই প্রথম স্টেশনে লাঞ্চ খাচ্ছি!' আর এখন এই ধূসর ও অত্যন্ত ঠাণ্ডা দিনের শেষে, অতিরিক্ত লম্বা ও অস্বাভাবিক মামুলি আমাদের প্যাসেঞ্জার ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে সেই স্টেশনে, বড়ো বড়ো

জগদ্দল তৃতীয় শ্রেণীর কামরার অন্তহীন সারি যার জন্য বিখ্যাত কুস্ক-খারকভ-আজভ রেলপথটি। নেমে তাকিয়ে দেখলাম। ইঞ্জিনের কালো মূর্তি এত দূরে যে প্রায় চোখে পড়ে না। কেটলি হাতে লোকে ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে গরম জলের জন্য দৌড়চ্ছে রেস্তোরাঁয়, সবক'টি লোকের চেহারা সমান কুৎসিত। আমার কামরার সহযাত্রীদের দেখা গেল প্লাটফর্মে: অস্বাস্থ্যকর মেদে পরিশ্রান্ত উদাসীন চেহারার একটি ব্যবসায়ী, আর ভয়ানক ও অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসু একটি যুবক, যার মুখ আর ঠোঁটের মামুলি শুকনোটে ভাব সারা দিন বিতৃষ্ণা জাগাল আমার মনে। আমার দিকে চকিত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে যুবকটি তাকাল সারা দিন, আমিও তার চোখে পড়েছি, সে ভেবেছিল নিশ্চয়: জমিদার-নন্দন নাকী, কে জানে, মুখে দেখছি কথাটি নেই! — যা হোক, হৃদ্যতায় দ্রুত উচ্চারিত একটি মন্তব্য করে সে আমাকে জানিয়ে দিল:

— এখানে হাঁসের রোস্ট কিন্তু হামেশা জলের দরে পাওয়া যায়, বুঝেছেন!

দাঁড়িয়ে থেকে ভাবলাম সেই রেস্তোরাঁটির কথা যেখানে আমার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব, সেখানে সেই টেবিলটার কথা, আমরা দুজনে যেখানে একবার লাঞ্চ খেয়েছিলাম। তখনো বরফ পড়ে নি তবু রুশী শীতের রুক্ষ গন্ধ

হাওয়ায়। বাতুরিনোতে কী বিরস বিরক্তিতে দিন কাটবে! বাবা ও মা বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন, অসুখী বোনটি শুকিয়ে যাচ্ছে, দারিদ্র্যপীড়িত জমিদারি, দারিদ্র্যের ছাপ বাড়িতে, কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার দমক রিক্ত নীচু বাগানে, শীতকালের বিশেষ একটা সুরে কুকুরের ঘেউ-ঘেউ, — এ রকম হাওয়ায় সে ডাকে সর্বদা থাকে কেমন একটা নিষ্প্রয়োজন রিক্ত ভাব... ট্রেনের পেছন দিকটারও যেন শেষ নেই। প্লাটফর্মের বেড়া পেরিয়ে চোখে পড়ে নিষ্পত্র পপলারের উঁচু চূড়া আর গাছ পেরিয়ে জমে-যাওয়া পাথরের রাস্তায় সওয়ারীর প্রতীক্ষায় মফস্বলের ছেকড়া ঘোড়ার গাড়ি, যাকে কুস্কি বলা হয়, তার বিরস বিরক্তি ও বিষণ্ণতা ফুটে উঠেছে গাড়োয়ানদের চেহারায়। প্লাটফর্মে পপলার গাছগুলোর তলায় স্ত্রীলোকেরা দাঁড়িয়ে, মাথায় আঁটো করে জড়ানো শালের খুঁট বুকে আড়াআড়ি করে ঝুলিয়ে কোমরে বাঁধা, মুখ ঠাণ্ডায় নীল, ঘ্যানঘেনে উপরোধের সুরে লোককে ডেকে বলছে জলের দরের সেই হাঁস কিনে নিতে, পাখিগুলো বেজায় বড়ো, ফুসকুড়ি ওঠা চামড়া ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট। যারা কোনক্রমে গরম জলে কেটলি ভরে নিতে পেরেছে তারা চাঙ্গা হয়ে ফিরছে ট্রেনের কামরার উষ্ণতায়; ঠাণ্ডার মৌজে এখন খুশিতে কাঁপছে তারা, দ্রুত পায়ে ফিরতে

ফিরতে খিস্তি-খেউর করে দর কষাকষি করছে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে... অবশেষে নারকীয় বিষাদের একটা হুঙকার বেরোল দূরের ইঞ্জিন থেকে, আরো অনেক পথ এখনো পড়ে আছে আমার সামনে, তার শাসানি সে হুঙকারে... ও কোথায় গেছে জানি না, তাই আমার দুর্দশা এত অতল। তা না হলে লজ্জা এড়িয়ে অনেক দিন আগেই খুঁজে পেতে ওকে ফিরিয়ে আনতাম: যাই ঘটুক না কেন — ওর পালিয়ে যাওয়াটা পাগলামির ঝোঁক মাত্র সন্দেহ নেই, আর লজ্জার দরুন অনুশোচনার কোনো লক্ষণ ও দেখাচ্ছে না।

বাড়িতে ফিরে এলাম, তিন বছর আগেকার সেই ফিরে আসার সঙ্গে কোনো মিল নেই। সবকিছু দেখলাম আলাদা চোখে। পথে আসতে আসতে বাতুরিনোর বিষয়ে যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে আরো বেশী ছন্নছাড়া সবকিছু: গাঁয়ের সেই সব জরাজীর্ণ কুঁড়েঘর, বুনো ঝাঁকড়া-চুল সব কুকুর, দরজাগুলো বসে গেছে শক্ত মাটিতে, তার সামনে বরফে-ঢাকা বর্বর জলের গাড়ি, বাড়িতে যাবার পথে সেই কাদার ঢিবি, বিষণ্ণ জানলাসুদ্ধ বেজার বাড়িটার সামনের ফাঁকা উঠান, পিতামহ ও প্রপিতামহের আমলের সেই বেঢপ উঁচু ভারী চাল, নীচু চালায় ছায়াচ্ছন্ন দুটি অলিন্দ, কালের প্রকোপে তার কাঠ

অঙ্গার নীল — সমস্ত কিছু পুরনো, পোড়ো, অর্থহীন, — দামি ফার গাছটার উঁচু মাথা নুইয়ে দেওয়া হাওয়ার কনকনে ঠাণ্ডা দমকেরও কোনো অর্থ নেই, বাড়ির ছাদের চেয়ে লম্বা গাছটা শীতের রিক্ততায় করুণ চেহারার বাগানের আর সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে। দেখলাম সংসারের জীবনযাত্রায় যে দারিদ্র্য এসেছে তাতে কোনো লুকোচুরি নেই — ইঁটের চুল্লির ফাটলগুলোর উপর কাদা লেপে জোড়াতালি দেওয়া, গরমের লোভে চট বিছানো হয়েছে মেঝেতে... বাবা শুধু তাঁর হালচালে এ সবকিছুকে ছাপিয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন। রোগা আর ছোট হয়ে গেছেন তিনি, চুল একেবারে পাকা, আজকাল তিনি দাড়িগোঁফ কামানোয় কখনো ত্রুটি করেন না, চুল ভালোভাবে আঁচরানো, পোষাকের বিষয়ে সেই পুরনো নিস্পৃহতার ভাব আর নেই, — বার্ধক্য ও দারিদ্র্যের এই ওমরাহি প্রয়াস দেখলে কষ্ট হয়, — অন্য সকলের চেয়ে বাবা সবল ও হাসিখুশি (আমার খাতিরে নিশ্চয়, আমার কলঙ্ক ও দুর্বিপাকের দরুন)। কম্পিত, ইতিমধ্যে শুকিয়ে যাওয়া হাতে সিগারেট ধরে, আমার দিকে সস্নেহ বিষণ্নভাবে তাকিয়ে একবার তিনি বলেন:

— তা বেশ, বাছা, সবকিছু নিয়ম বাঁধা, — যৌবনের

সব উত্তেজনা, সব দুঃখ আর সুখ, বার্ধক্যের শান্তি আর স্বস্তি... লেখাটা কী যেন ? — চোখে হাসির ঝিলিক এনে তিনি বললেন: — 'শান্তি ভরা আনন্দ', নিপাত যাক সব:

ভিত, নিঃসঙ্গতার এই গহনে
আমাদের গরীবখানায়
বুক ভরে নিই মুক্ত মাঠের নিঃশ্বাস,
স্বাদ পাই শান্তি ভরা আনন্দের...

বাবার কথা যখনই ভাবি, অনুশোচনার হাত এড়াতে পারি না — বারবার মনে হয় তাঁর কদর পুরো বুঝি নি, যথেষ্ট ভালোবাসি নি তাঁকে। তাঁর জীবনের, বিশেষ করে তাঁর যৌবনের বিষয়ে কত অল্প জানি, — বেশী জানার সুযোগ যখন ছিল তখন আগ্রহ দেখিয়েছি অত্যন্ত কম, তাই সর্বদা নিজেকে দোষী ঠেকে। বারবার চেষ্টা করেও বুঝতে পারি না তিনি ঠিক কী ধরনের মানুষ ছিলেন, — একেবারে ভিন্ন যুগের ভিন্ন জাতের মানুষ, তাঁর গোটা স্বভাবের প্রতিভাশীলতার অবলীলা ও বৈচিত্র্য কেমন বন্ধ্যা অথচ বিস্ময়কর, কী বিস্ময়কর তাঁর উষ্ণ হৃদয় আর খর বুদ্ধি, যার কাছে ধরা পড়ত সবকিছু, আভাসমাত্রে করায়ত্ত করে নিত সমস্ত কিছু, তাতে ছিল চিত্তের বিরল অকপটতা ও সংগোপনতা, বাহ্যিক সাবল্য

ও অন্তরের দৃষ্টির ধীর তীক্ষ্নতা ও হৃদয়ের রোমাণ্টিকতা। সেই শীতকালে আমি বিশে পা দিয়েছি, আর তাঁর বয়স ষাট। এখন বিশ্বাস করা কঠিন যে, আমার বয়স কোনো কালে বিশ ছিল, সবকিছু সত্ত্বেও যৌবনের নানা শক্তির বিকাশ তখন সবে শুরু হয়েছিল আমার মধ্যে! আর তাঁর সমস্ত জীবন তো তখনি পিছনে পড়ে রয়েছে। তবু সে শীতকালে আমাকে যা সইতে হয় সেটা তাঁর চেয়ে ভালো করে আর কেউ বোঝে নি, সত্যি, মনে হয় আমার অন্তরে বিষাদ আর যৌবনের সেই সংমিশ্রণ তাঁর মতো করে অনুভব আর কেউ করে নি। আমরা বসেছিলাম তাঁর পড়ার ঘরে। রোদ ভরা স্তব্ধ প্রশান্ত দিন, তখনি বরফে-ঢাকা উঠানের কোমল ঝিলিক দেখা যাচ্ছে কামরার নীচু জানলা দিয়ে, ঘরটা গরম, ধোঁয়াটে ও অগোছালো; অগোছালো আরাম ও কখনো অদলবদল না করা সাদাসিধে আসবাবপত্রের জন্যই ঘরটা আশৈশব আমার প্রিয়, আসবাবপত্রগুলো আমার কাছে মনে হত বাবার নানা অভ্যেস ও রুচি, তাঁর বিষয়ে ছেলেবেলাকার নানা স্মৃতি ও আমাকে নিয়ে নানা স্মৃতি থেকে অভিন্ন। 'শান্তি ভরা আনন্দের' কথা বলার সময় সিগারেট রেখে দিয়ে তিনি দেয়াল থেকে নিজের গিটারটি নামিয়ে একটি প্রিয় সুর বাজালেন, লোকসঙ্গীত একটি, তাঁর চোখের

দৃষ্টি হয়ে এল ধীরস্থির, খুশিতে ভরা, কী একটা যেন গোপন সে দৃষ্টিতে — আর সাথে সাথে সে দৃষ্টি জোড় খেল গিটারের কোমল আনন্দের সঙ্গে, তিক্ত উদাস রবে গিটারটা গুণগুণ করে চলেছে কী একটা হারানো রতনের বিষয়ে, আমাদের জীবনে সবকিছু শেষ পর্যন্ত ক্ষণভঙ্গুর, চোখের জল ফেলার যোগ্য কিছু নেই, তার বিষয়ে...

বাড়িতে আসার কিছুদিন পর অনুভূতির তাড়নায় হার মেনে পাগলের মতো ছুটে গেলাম শহরে। সে দিন সন্ধ্যাবেলাতেই ফিরে এলাম খালি হাতে: কেননা ডাক্তারমশাইয়ের বাড়িতে আমাকে ঢুকতে দেওয়া হয় নি। পরিচিত, কিন্তু এখন ভয়ংকর সেই দরজার সামনে শ্লেজ থেকে লাফিয়ে নেমেছিলাম হতাশার দুঃসাহসে, বিভীষিকায় একবার চেয়ে দেখলাম পর্দা আধো-নামানো ডাইনিং-রুমের জানলাগুলোর দিকে, যে ড্রয়িং-রুমে এককালে সোফায় ওর সঙ্গে বসে কেটেছে কত সন্ধ্যা, হেমন্তের সেই সব দিন, আমাদের প্রথম দিককার দিনগুলো! — তারপর ঘণ্টায় টান দিলাম জোরে... খুলে গেল দরজা, মুখোমুখি ওর ভাই, ফ্যাকাসে হয়ে গিয়ে সে পরিষ্কার করে বলল:

— বাবা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান না। আর জানেন তো, ও চলে গেছে।

এই স্কুলের ছেলেটিই তো সেই হেমন্তে ভল্‌চকের সঙ্গে পাগলের মতো সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করত। আর এখন দেখলাম সামনে দাঁড়িয়ে আছে বেজার চেহারার, বেশ ময়লা রঙের একটি ছোকরা, অফিসারি কায়দার সাদা শার্ট গায়ে, উঁচু বুট পায়ে, ঠোটের ওপর নতুন গোঁফের কালো রেখা, ছোট কালো চোখে বিদ্বেষের একগুঁয়ে দৃষ্টি, রোদে তামাটে মুখ এত ফ্যাকাসে যে সবজে একটা ভাব।

— দয়া করে চলে যান, — নীচু গলায় সে বলল, পাতলা শার্টের ভেতর দেখলাম বুক ধকধক করছে।

তবু সারা শীতকাল প্রতিদিন ওর চিঠির আশায় রইলাম নাছোড়বান্দার মতো, — বিশ্বাস করতে পারি নি ও এত নির্দয় হতে পারে পাথরের মতো।

৩১

সে বছরের বসন্তকালে শুনলাম ও বাড়ি ফেরে নিউমোনিয়া নিয়ে, এক সপ্তাহের মধ্যে মারা যায়। আরো শুনলাম ও বলে গিয়েছিল যতদিন সম্ভব ওর মৃত্যুর কথা আমাকে যেন জানানো না হয়।

বাদামি মরক্কোয় বাঁধানো সেই নোটবুকটি এখনও আমার কাছে আছে, প্রথম মাইনে যে দিন ও পায়, যে

দিনটি বোধ করি ওর জীবনে সবচেয়ে দরদের, সেই দিন আমাকে উপহার দিয়েছিল। দেবার সময় প্রথম পাতায় তার লেখা কয়েকটি কথা এখনও পড়া যায়: উত্তেজনায়, তাড়াহুড়োয়, লজ্জায়, যাতে দুটি ভুল থেকে গেছে...

কিছুদিন আগে রাত্রে ওকে স্বপ্নে দেখি — ওর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর আমার সুদীর্ঘ জীবনে ওই প্রথম। যখন দুজনার জীবন ও যৌবন অচ্ছেদ্য ছিল ঠিক তখনকারই মতো নবীনা, কিন্তু এরই মধ্যে মুখে এসেছে ঝরা রূপের লাবণ্য। শীর্ণ দেহ, শোকের পরিচ্ছদের মতো কী একটা পরনে। ওকে দেখলাম ঝাপসাভাবে, কিন্তু দেহে ও মনে এত ঘনিষ্ঠ প্রবল অনুরাগে এবং আনন্দে যে সেরকম অনুভূতি কখনও আর কারো প্রতি হয় নি আমার।

মারিটাইম আল্প্স, ১৯৩৩

ছায়া বীথি

হেমন্তের ঠাণ্ডা বাদলা দিন, তুলা শহরে চাকার অসংখ্য কালো গভীর খাঁজ পড়া একটি বৃষ্টিসিক্ত সড়ক ধরে ছুটে এল তিন ঘোড়ার একটি কাদামাখা ত্রয়কা-গাড়ি, আর পাঁচটার মতো দেখতে তিনটে ঘোড়ার লেজ একটু তুলে বাঁধা যাতে বরফ-কাদা না লাগে; গাড়ির হুড অর্ধেক তোলা। ত্রয়কাটি থামল একটি কাঠের লম্বা বাড়ির সামনে; বাড়ির একদিকে সরকারী গাড়ির ঘাঁটি, অন্যদিকে একঘরের একটি ব্যক্তিগত সরাইখানা, সেখানে যাত্রীরা জিরোয়, রাত কাটায়, সামোভার আনতে বলে।

গাড়ির কোচ বাক্সে যে লোকটি বসে ছিল সে বড়োসড়ো, তাগড়া চেহারার চাষী, তার ওভারকোটটি বেল্ট দিয়ে শক্ত করে বাঁধা, ময়লা গম্ভীর মুখে পাতলা কুচকুচে কালো দাড়ির দরুন চেহারাটা আগেকার দিনের ডাকাতদের মতো, গাড়ির ভেতরে দোহারা চেহারার একটি বৃদ্ধ; মাথায় বড়ো টুপি, ছাই-রঙা অফিসারী ক্লোকে বীবরের লোমে তৈরী কলারটা ওলটানো। ভদ্রলোকটির ভুরুজোড়া কালো বটে, কিন্তু গোঁফ এরই মধ্যে পাকা, গোঁফের কোণ ছোঁওয়া জুলফির রঙও তাই। থুতনি পরিষ্কার কামানো, আর সব মিশিয়ে চেহারাটা দ্বিতীয় আলেক্সান্দরের মতো। তাঁর আমলে এ কেতাটা খুব চালু ছিল অফিসারদের মধ্যে। ভদ্রলোকটির চোখের দৃষ্টিও সেরকম — জিজ্ঞাসু, কঠোর অথচ শ্রান্ত।

গাড়ি থামল; বেশ খাপসই ফৌজী বুট পরা একটি পা বাড়িয়ে, শাময় চামড়ার দস্তানামোড়া হাতে ক্লোকটার আঁচল ধরে তিনি প্রবেশপথের সিঁড়ি বেয়ে তড়তড় করে উঠলেন।

— বাঁ দিকে, হুজুর, — কর্কশগলায় কোচ বাক্স থেকে হাঁকল গাড়োয়ান, আর বেজায় লম্বা বলে ভদ্রলোকটি দরজায় একটু হেঁট হয়ে ভেতরে ঢুকে বাঁ দিকের ঘরে ঢুকলেন।

জায়গাটা গরম, শুকনো ও পরিচ্ছন্ন। বাঁ কোণে নতুন একটি আইকনের সোনালি আভা, তার নীচে পরিষ্কার কড়া কাপড়ে ঢাকা একটি টেবিল, চারপাশে সার বাঁধা পরিষ্কার মাজাঘষা বেঞ্চি; ঘরের ডান দিকের কোণ জুড়ে চূণকাম করা চুল্লিটি নতুন দেখাচ্ছে। আরো কাছে বাদামী রঙের মোটা কাপড়ে ঢাকা খাটের মতো কোন কিছু চুল্লির গায়ে লেগেছে। উনুনের ঢাকনির ওদিক থেকে আসছে সুপের মিঠে মিঠে গন্ধ -- ভালো করে সেদ্ধ বাঁধাকপি, মাংস আর তেজপাতার গন্ধ।

বেঞ্চের ওপর ক্লোকটা নবাগত ছুঁড়ে ফেলে দিলেন — টিউনিক ও টপবুটের জন্য তাঁকে দেখালো আরো খাড়া, আরো ছিমছাম, তারপর দস্তানা ও টুপি খুলে ক্লান্ত ভঙ্গিতে চুলে পাতলা ফ্যাকাসে হাত একবার বুলিয়ে নিলেন। কপাল থেকে চোখের কোণে টেনে বুরুশ করা তাঁর পাকা চুল অল্প কোঁকড়ানো, সুন্দর, দীর্ঘ, কালো-চোখ মুখের এখানে-সেখানে বসন্তের ছোট ছোট দাগ। ঘরে কেউ নেই বলে দরজাটা অল্প ফাঁক করে বিরক্তির সুরে হাঁকলেন:

— এই যে, কেউ আছে নাকি এখানে?

ডাক শুনে ঘরে ঢুকল কালো-চুল একটি স্ত্রীলোক। ভুরুজোড়া ভদ্রলোকটির মতোই কালো, আর তাঁরই মতো

একটি সৌন্দর্য এখনো তার চেহারায় রয়ে গেছে যেটা তার বয়সের পক্ষে বেমানান। ঠোঁটের ওপর ও গালের পাশে পাতলা লোমের দরুন চেহারাটা মাঝবয়সী জিপসী মেয়ের মতো দেখায়, শরীর ভারি হলেও চালচলনের ভঙ্গিটা হালকা, লাল ব্লাউজের নিচে বড়ো বুক, আর হাঁসের পেটের মতো ত্রিকোণ পেট কালো পশমের স্কার্টে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

— সুস্বাগতম, হুজুর, — স্ত্রীলোকটি বলল, — দয়া করে কিছু খাবেন, না একটা সামোভার এনে দেব?

নবাগতটি স্ত্রীলোকটির সুডৌল কাঁধ ও জীর্ণ লাল তাতারি চটি পরা পাতলা পায়ের দিকে এমনিতে একবার তাকিয়ে উদাসীন সুরে সংক্ষেপে বললেন:

— সামোভার। তুমি হোটেলওয়ালী না ঝি?

— হোটেলওয়ালী, হুজুর।

— তার মানে সরাইখানা তুমিই চালাও?

— আজ্ঞে হ্যাঁ। নিজেই চালাই।

— তা কী করে হয়? তুমি কি বিধবা-টিধবা যে একলা কারবার চালাচ্ছ?

— আমি বিধবা নই, হুজুর, কিন্তু বেঁচে থাকতে হবে তো। তাছাড়া কারবার আমার ভালো লাগে।

খেতে খেতে যাত্রা শুরু হল আমার: প্রথমে অন্ধকার রিক্ত একটি গ্রাম হয়ে, তারপর — ক্রমশ ঢিমে তালে — অন্ধকার, নিঃশব্দ, সারা পৃথিবীর কাছে অপরিচিত মাঠঘাটের দিকে, অন্ধকার মৃত্তিকা সমুদ্রে, তার ওপারে উত্তর- পশ্চিম দিকে পাতলা মেঘের নীচে অসীম দিগন্তে কী একটার সবুজ ঝিকিমিকি। রাত্রির মেঠো হাওয়া, এপ্রিলের হালকা ঝিরঝিরে বৃষ্টির হাওয়া বইছে মুখে, অনেক দূরে ডাকা একটা ভারুইপাখি মনে হল রাত্রির হাওয়ায় ক্রমাগত বসার জায়গা বদলাচ্ছে। রাশিয়ার নীচু আকাশে বিরল তারার দ্যুতি মেঘের মাঝে... আবার ভারুইপাখি, বসন্ত, মাটি — আর আমার পুরনো, বিরস ছন্নছাড়া যৌবন! ক্লিষ্ট দীর্ঘ যাত্রা: খোলামেলা জায়গায় রুশী চাষীর সঙ্গে ক্রোশ তিনেক পথ অল্পখানি নয়। গাড়োয়ান নির্বাক দুর্জ্ঞেয় হয়ে গেল; তার গায়ে ভ্যাপসা কুঁড়েঘর আর ভেড়ার চামড়ার জীর্ণ, পাতলা কোটের গন্ধ, জলদি যাবার সব অনুরোধে বোবা সে, অল্প কোনো খাড়াই পথে উঠতে হলে সীট থেকে লাফিয়ে নেমে বুড়ী জীর্ণ ঘুড়ীটার পাশে পাশে হাঁটছে নিয়মিত পদক্ষেপে, হাতে দড়ির লাগাম, মুখ অন্য দিকে ঘোরানো, আর ঘুড়ীটা টলতে টলতে চলেছে কোনো ক্রমে... ভাসিলিয়েভস্কয়েতে যখন ঢুকল তখন নিশুতি

রাত হয়ে গেছে মনে হল: জীবনের কোনো সাড়া নেই, আলো নেই একটিও। অন্ধকার আমার চোখ সওয়া হয়ে গেল, যে চওড়া রাস্তাটা হয়ে গ্রামে ঢুকছি তার প্রত্যেকটা কুঁড়েঘর, প্রত্যেকটা নেড়া গাছ স্পষ্ট দেখা যায়; তারপর বুঝলাম ও দেখলাম নিম্নভূমিতে এপ্রিলের স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডার ঢালুতে নামছি, বাঁয়ে নদীর পুল, ডাইনে রাস্তাটা উঠে গিয়েছে কালো গোমড়া একটা বাড়ির দিকে। আবার সবকিছুর একটা তীক্ষ্ন অনুভূতি হল: সবকিছু কত না ভয়ানক চেনা আর — বসন্তের এই গ্রাম্য কালিমায় জরাজীর্ণতায়, বাকি দুনিয়ার প্রতি ঔদাসীন্যে কত নতুন! চড়াই-এ সক্লেশে ওঠার সময় প্রাণের কোনো লক্ষণ নেই গাড়োয়ানের। হঠাৎ উঠানের পাইন গাছগুলোর পেছনের জানলায় ঝলকে উঠল একটি আলো। বাঁচা গেছে, ওরা তাহলে এখনো ঘুমোয় নি! অবশেষে গাড়িটা অলিন্দের সামনে দাঁড়াল, নেমে দরজা খুলে হলে ঢুকলাম আর সবাই হাসিমুখে আমার আপাদমস্তক একবার দেখে নিল, তখল খুশিতে, অধৈর্যে — আর ছেলেমানুষি লজ্জায় অভিভূত লাগল...

পরদিন সকালে ভাসিলিয়েভস্কয়ে ছেড়ে ক্ষণে ক্ষণে থামা আর পড়া ঝুরঝুরে উচ্চকিত ভোরের বৃষ্টিতে ঘোড়া হাঁকিয়ে চললাম লাঙল দেওয়া মাঠ আর ফেলে রাখা

জমির ওপর দিয়ে। কর্ষণ আর বীজ বপনের কাজ চলেছে। খালি পায়ে একটা লোক কাঠের লাঙলের পিছু পিছু হাঁটছে দুলে দুলে, সাদা পা হড়কে যাচ্ছে ঝুরঝুরে নরম শিরালায়, ঘোড়াটা লাঙল টানছে কুঁজো হয়ে, লাঙলের পেছনে নীল-কালো একটা কাক লাফাতে লাফাতে শিরালা থেকে খুঁটিয়ে খাচ্ছে ঘন লালচে পোকা, আর তার পেছনে লম্বা পা নিয়মিত ফেলে আসছে একটা বুড়ো খালি মাথায়, বুকে চামড়ার বেল্টে বীজের থলে, ডান হাত উদার দরাজ ভঙ্গিতে অনেকখানি বাড়িয়ে মাপমতো অর্ধচক্রে বীজ ছড়াচ্ছে মাটিতে।

বাতুরিনোয় বাড়ির লোকে যেরকম স্নেহে আর আনন্দে আমাকে অভ্যর্থনা করল তাতে সত্যি বুকটা মুচড়িয়ে উঠল। সবচেয়ে গভীর দাগ কাটল মায়ের আনন্দ নয়, বোনের আনন্দ, — জানলা থেকে আমাকে দেখে ছুটে আসার সময় ওর মুখের এই সুখ ও অনুরাগের লাবণ্য দেখব বলে কখনো আশা করি নি। শুচিতায়, তারুণ্যে সত্যি কত মধুর সে। আমার খাতিরে সে দিন প্রথম পরা তার নতুন ফ্রকটিতে কত সে নিষ্পাপ আর নবীন। প্রাচীন সুন্দর বেখাপ্পা বাড়িটাও মনে হল মধুর। আমার ঘরটা দেখে মনে হয় যেন সবেমাত্র বেরিয়েছিলাম: সবকিছু যথাস্থানে, এমনকি লোহার দানিতে আধ-পোড়া

চর্বির বাতিটা পর্যন্ত শীতকালে যেমনটি রেখে গিয়েছিলাম ঠিক তেমনটি তখনো ডেস্কে। ভেতরে ঢুকে চারদিক দেখে নিলাম; কোণে কালো আইকন, রঙীন (বেগুনি আর গাঢ় লাল) কাঁচের শার্সি দেওয়া সেকেলে জানলাগুলো দিয়ে গাছপালা আর আকাশের আভাস, — এখানে-সেখানে নীল হয়ে যাচ্ছে সে আকাশ, সবুজ কুঁড়ি ধরা ডাল পালায় ছড়াচ্ছে বৃষ্টির পসলা। ঘরের সবকটা জিনিস একটু গুরুগম্ভীর, বড়ো ও গভীর... কালো মসৃণ কাঠের ছাদ, দেয়ালেও ঠিক সেরকম কালো মসৃণ কাঠের গুঁড়ি... ওককাঠের খাটের গোল খুঁটিগুলো মসৃণ ও ভারি...

৩

ওরিওলে আবার যাবার ছুতো জোগাল বৈষয়িক একটা ব্যাপার: ব্যাঙ্কে সুদ জমা দিতে হবে বলে গেলাম, কিন্তু কিছুটা দিয়ে বাকিটা দিলাম ফুঁকে। গুরুতর দোষ বটে সেটা, কিন্তু বিচিত্র কী একটা আমার মধ্যে ঘটছে বলে ব্যাপারটায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপণ করলাম না। সমস্ত সময়টা নির্বোধ উচ্ছ্বাসে পূর্ণ একটা দৃঢ় সংকল্প চালাল আমাকে। ওরিওলের প্যাসেঞ্জার ট্রেন ঠিকমতো ধরতে না পেরে মালগাড়ির

ইঞ্জিনে জায়গা করে নিলাম কোনোক্রমে। মনে আছে লোহার তৈরী উঁচু সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম যেখানে, সেখানটা নোংরা, কোনো ছিরি নেই; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। ইঞ্জিন ড্রাইভার ও তার সহকর্মীর পোষাক-আশাক এত তেল চটচটে যে বলার নয়, তাতে আবার ধাতব একটা চিকচিকে ভাব; মুখগুলো তাদের ঠিক তেমনি চটচটে আর চিকচিকে, অক্ষিগোলকের শ্বেতাংশ নিগ্রোদের মতো ধবধবে, চোখের পাতা কালো, যেন অভিনয়ের জন্য মেক-আপ করেছে। একজন ছোকরা দারুণ খটখটিয়ে কোদাল দিয়ে কোণে ঠাসা কয়লা তুলছে, তারপর নারকীয় আগুনের লেলিহান লাল জিহ্বা ফোঁদলের দরজা সশব্দে ঠেলে খুলে জোরে কোদাল চালিয়ে কয়লা ফেলছে সেই নরকাগ্নির ওপর। তার চেয়ে জ্যেষ্ঠ লোকটি জঘন্য চটচটে একটা নেকড়ায় হাত মুছে সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কী একটা যেন টানল আর ঘোরাল... হাওয়া চিরে গেল কর্ণবধির করা সুতীক্ষ্ন হুইসলে, তপ্ত নিশ্বাস, চোখ-ধাঁধানো বাষ্পের পর্দা, কানে তালা লেগে গেল কিসের হঠাৎ হুঙ্কারে আর ধাক্কা খেয়ে আস্তে আস্তে এগনো... তারপর সে হুঙ্কার পরিণত হল বর্বর ঘড়ঘড় শব্দে, আমাদের শক্তি ও বলিষ্ঠতা বেড়ে চলল ক্রমশ,

চারপাশে সবকিছু নড়ছে, দুলছে, লাফাচ্ছে! থেমে গেল সময়ের গতি পাথর-কঠিন সংহতিতে, এদিকে অগ্নিরাক্ষস ছুটে চলল ছোট ছোট পাহাড়ের ওপর দিয়ে স্পন্দমান সমতালে, এক একটি দৌড়ের ক্ষেপ শেষ হতে সময় লাগছে না। তারপর রাত্রির শান্তিপূর্ণ স্তব্ধতায় ট্রেনটা দাঁড়াতে নৈশ অরণ্য থেকে ভেসে এল সৌরভ আর প্রতি ঝোপঝাড় ও গাছ থেকে বুলবুলের অপরূপ সুখের উদাত্ত গান... ওরিওলে আমার সাজগোজ হল যাকে বলে অশ্লীল গোছের — ফুলবাবুসুলভ নরম টপবুট, কালো কুচকুচে পদ্দিওভ্কা, লাল সিল্কের শার্ট আর অভিজাতোচিত টুপি, — লাল ফিতে দেওয়া কালো রঙের। কিনলাম একটা দামী ঘোড়সওয়ারী জিনসাজ, উগ্রগন্ধি, মচমচে চামড়ার জিনিসটা এত চমৎকার যে সেটাকে নিয়ে বাড়ির পথে সে রাত্রে আনন্দে আর ঘুম এল না চোখে, জিনিসটা যে পাশে রয়েছে। ফিরতি পথে পিসারেভো হয়ে গেলাম আবার — ইচ্ছে একটা ঘোড়া কেনা — সে সময় গাঁয়ে একটা ঘোড়ার মেলা বসেছিল। সেখানে আমারি মতো পদ্দিওভ্কা আর টুপি পরা সমবয়সী কয়েকজনের সঙ্গে দোস্তি পাতালাম; মেলার ঘোড়েল ঘাগী লোক তারা, তাদের সাহায্যে কিনলাম খাসজাতের

একটা মাদী ঘোড়া (যদিও জিপসীটা প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল বুড়ো, হৃতশক্তি একটা আক্তা ঘোড়াকে চালিয়ে দিতে এই বলে: 'মিশাকে কিনুন, হুজুর, ওকে একবার কিনলে আমার তারিফ হামেশা করবেন, হুজুর!')। তারপর গ্রীষ্মকালটা আমার কাছে হয়ে দাঁড়াল দীর্ঘ ছুটির দিনের মতো — বাতুরিনোতে একনাগাড়ে তিন দিনের বেশী আর থাকি নি। বেশীর ভাগ সময় কাটত নতুন বন্ধুদের সঙ্গে, আর যখন সে ফিরে এল ওরিওল থেকে তখন শহর ছেড়ে থাকা তো অসম্ভব। ওর ছোট্ট চিঠিটা: 'ফিরে এসে প্রহর গুনছি' পাওয়া মাত্র ছুটলাম স্টেশনে, যদিও ওর লেখাটার বোকা-বোকা রসিকতার সুরটা ভালো লাগল না আর যদিও তখন বেশ দেরী হয়ে গেছে, আকাশে ঘনিয়ে আসছে মেঘ; কিন্তু ট্রেনে ওঠার পর গতিবেগে মাতালের মতো আনন্দ হল, গতিবেগ আরো বেশী ঠেকছে বাইরে ফোঁসা ঝড়বৃষ্টির জন্য, চাকার খটখট আওয়াজ মিশে যাচ্ছে বাজ পড়ার শব্দে, ছাদে বৃষ্টির মুখর ধারাপাত — আর এ সবকিছু চলেছে জানলার কালো শার্সি ঝলসানো বিদ্যুতের নীল আলোতে, শার্সিতে চাবুক মারা ফেনিল, সুগন্ধি জলের সঙ্গে সঙ্গে।

ভেবেছিলাম হাসিখুশিতে মেলামেশার প্রীতি ছাড়া আর কিছু নেই ব্যাপারটায়। কিন্তু তারপর — গ্রীষ্মের শেষাশেষি — আমার একটি বন্ধু তার জন্মদিনে ডাকল অনেককে। বন্ধুটি থাকত বোন ও বুড়ো বাপের সঙ্গে শহরের কাছে, ইস্তার খাড়া পাড়ে একটি ছোট জমিদারিতে, সেও প্রায়ই যেত মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে। নিজে গিয়ে তাকে নিয়ে এল নিজের ঘোড়া গাড়িতে, আমি ঘোড়ায় চেপে পিছু নিলাম। অদ্ভুত ভালো লাগছিল মাঠঘাটের রৌদ্রোজ্জ্বল শুষ্ক বিস্তারে — যতদূর চোখ যায় খড়ের গাদার ছোপ লাগা হলুদ বালির মতো দেখতে ছড়ানো জমি। দুঃসাহসী বেপরোয়া কিছু করার জন্য আমি একাগ্র উন্মুখ। ঘোড়াটাকে চাবকে চাবকে একেবারে খেপিয়ে দিয়ে, রাশ টেনে তারপর ছেড়ে দিলাম, পাগলের মতো খড়ের একটা গাদা লাফিয়ে পার হতে গিয়ে ধারালো খুরের একটা জায়গা ছড়ে রক্ত বেরিয়ে এল। জন্মদিনের ভোজ চলল সন্ধ্যা পর্যন্ত পচা কাঠের বারান্দায়, সকলের অলক্ষিতে সন্ধ্যা মিশে গেল অন্ধকারে, বাতির আলোয়, সুরায়, সঙ্গীতে ও গিটারের বাজনায়। আমি ওর হাত ধরে পাশে বসে রইলাম, সঙ্কোচ আর নেই, হাত সরিয়ে নিল না ও। বেশ রাত হয়েছে তখন, যেন

দুজনে ষড়যন্ত্র করে টেবিল ছেড়ে বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলাম অন্ধকার বাগানে, উষ্ণ অন্ধকারে থেমে, একটা গাছে হেলান দিয়ে ও হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে, — অন্ধকারে ওকে দেখতে না পেলেও ভঙ্গিটার অর্থ বুঝলাম নিমেষে... দ্রুত আকাশ ছাই-রঙা হয়ে এল, সুখের অসহায় আতিশয্যে ভাঙা গলায় মোরগের ডাক, আর এক মিনিট, তারপর উপত্যকার নদীর ওপারে হলুদ মাঠঘাটের ওপরে বিরাট সোনালি সূর্যোদয়ের পটভূমিকায় স্পষ্ট হয়ে উঠল সমস্ত বাগানটা... উপত্যকার ওপরে পাহাড়ের চূড়ায় আমরা দুজনে দাঁড়িয়ে রইলাম; আর ও সূর্যালোকের বন্যায় উন্মোচিত আকাশের দিকে চেয়ে, আমাকে আর না দেখে গাইল চাইকভস্কির 'প্রভাত'। ওর পক্ষে বড়ো চড়া একটা পর্দায় থেমে, ভারুইপাখির রঙের মতো ক্যাম্ব্রিকের স্কার্টের সুন্দর খুঁট তুলে দৌড়িয়ে ও গেল বাড়ির দিকে। আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম আপনহারা হয়ে, কিন্তু তখন শুধু দাঁড়িয়ে থাকাটাই ক্ষমতার বাইরে, সুসম্বদ্ধ চিন্তা তো দূরের কথা। বিস্তর শুকনো ঘাসের মধ্যে পাহাড়ের ধারে একটি পুরনো বার্চ গাছের নীচে শুয়ে পড়লাম। ফরসা হয়ে গেছে এরই মধ্যে, সূর্য উঠেছে উঁচুতে, আর আবহাওয়া

ভালো থাকলে গ্রীষ্মের শেষাশেষি সচরাচর যেমন হয় দিনটা সঙ্গে সঙ্গে তপ্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গাছের শেকড়ে মাথা রাখার সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় ঘুম এসে গেল। কিন্তু ক্রমশ রোদ কড়া হয়ে এল, এত গুমোট আর চোখ-ধাঁধানো আবহাওয়া যে একটু পরে ঘুম থেকে উঠে ছায়ার খোঁজে চললাম টলতে টলতে। চোখ-ধাঁধানো ধারালো সূর্যরশ্মিতে প্লাবিত বাড়িটা তখনো নিদ্রামগ্ন। জেগে উঠেছেন শুধু গৃহকর্তা। লাইলাকের উদ্দাম সম্ভারের পটে বাঁধা তাঁর জানলা খোলা, কানে এল কাশির আওয়াজ, তাতে ধরা পড়ে দিনের প্রথম পাইপ সেবন ও সর দেওয়া প্রথম কড়া চা পানের আনন্দ। আমার পদধ্বনিতে, রোদে চিকচিকে লাইলাক ঝোপ হতে আমার কাছ থেকে ঝটিতে উড়ে যাওয়া চকিত চড়ুইগুলোর শব্দে তিনি নক্সাকাটা তুর্কি সিল্কের জীর্ণ পুরনো ড্রেসিংগাউন বুকে টেনে নিতে নিতে জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন, ফোলা চোখ আর বিপুল পাকা দাড়ি সুদ্ধ ভয়াবহ মুখটি দেখা দিল — তারপর অসাধারণ স্নেহে হাসলেন। দোষীভাবে নমস্কার জানিয়ে বারান্দা দিয়ে দরজা খোলা ড্রয়িং-রুমে ঢুকলাম। ভোরের স্তব্ধতা ও শূন্যতা, প্রজাপতির লুকোচুরি, সেকেলে ধরনের নীল দেওয়াল-কাগজ,

আরামকেদারা আর ছোট সোফা, সব মিলিয়ে আশ্চর্য মধুর ঘরটা, একটা সোফাতে শুয়ে পড়ে, ধাঁচটা অত্যন্ত অস্বস্তিকর, আবার অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লাম। কিন্তু মনে হল মিনিটখানেক পর, — যদিও সত্যি সত্যি অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম, — কে যেন কাছে এসে হেসে কী বলতে বলতে চুলগুলো উসকো-খুসকো করে দিল। ঘুম ভেঙে গেল — সামনে দাঁড়িয়ে তারা যাদের অতিথি আমি, ভাই ও বোন, দুজনেই শ্যামবর্ণ, চোখ আগুনের মতো উজ্জ্বল, তাতার গোছের সুন্দর চেহারা, ভাইয়ের গায়ে হলুদ সিল্কের শার্ট, হলুদ সিল্কের ব্লাউজ বোনের গায়ে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম: ওরা বেশ মিঠে সুরে বলছিল এবার উঠে ছোট হাজরি খেলে হয়, ও তো চলে গেছে, একা নয়, কুজ্‌মিনের সঙ্গে, তারপর ওর একটা চিরকুট আমাকে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল কুজ্‌মিনের চোখ, — ক্ষিপ্র, সাহসী, ছিটছিট দাগ লাগা মৌমাছি রঙের চোখ, — চিরকুটটা নিয়ে গেলাম অন্দরের পুরনো ঘরে। সেখানে টুলে মুখ ধোবার পাত্রের পাশে আমার অপেক্ষায় দেখলাম বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে আছে আগাগোড়া কালো পোষাক পরা একটি ছোটখাটো বুড়ী, মেচেতা-পড়া হাতে জলের ঘটি। চিরকুটটা পড়লাম, তাতে লিখেছে: ‘আমার সঙ্গে আর দেখা করার

চেষ্টা করবেন না', — তারপর মুখ হাত ধুলাম। জলটা কনকনে ঠাণ্ডা, জ্বালা ধরিয়ে দেয় — 'আমাদের হল ঝরণার জল, একটা কূয়ো থেকে আনা,' বলে বুড়ী বেজায় লম্বা একটা লিনেনের তোয়ালে এগিয়ে দিল। তাড়াতাড়ি হল-ঘরে গিয়ে টুপি ও চাবুক তুলে নিয়ে গরম উঠোন হয়ে দৌড়লাম আস্তাবলে... কাছে যেতে অন্ধকারে আমার ঘোড়াটা সখেদে আস্তে চিঁহি করে উঠল — আগের রাত্রে ওর জিন খোলা হয় নি, খালি একটা গামলার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল — এখন পেট বসে গেছে, লাগাম ধরে লাফিয়ে উঠলাম পিঠে: অদ্ভুত বন্য একটা উত্তেজনা, তবু নিজেকে সামলে রেখে, ফটক হয়ে ঘোড়া জোর ছুটিয়ে বেরিয়ে গেলাম। বাড়ির মাঠ ছাড়িয়ে ক্ষেতে মোড় নিলাম সবেগে, খসখসে শস্যের নাড়ার ওপর দিয়ে যেদিকে চোখ যায় সেদিকে ছুটে প্রথম খড়ের গাদাটায় ঘোড়া থামিয়ে একলাফে নেমে ধপ করে শুয়ে পড়লাম পাশে। ঘোড়াটা গোছা গোছা শস্যে মুখ লাগিয়ে কাঁচের মতো বীজ ছড়িয়ে জোরে টান দিতে লাগল; অজস্র ঘড়ির মতো শত শত শস্যের নাড়া আর খড়ের গাদায় ফড়িঙের ব্যস্তসমস্ত খুটোখাট আওয়াজ; চারিদিকে মরুভূমির মতো ছড়িয়ে পড়েছে উজ্জ্বল মাঠঘাট, — কিন্তু কিছু কানে শুনছি না, চোখে দেখছি

না কিছু, শুধু বারবার মনে মনে বলছি: আমাকে ওর ফিরিয়ে দিতে হবে নিজেকে, এই রাত্রি, এই সকাল, শুকনো ঘাসের ওপর ঝলক দেওয়া তার পায়ের ওপর খসখসিয়ে ওঠা ওর ক্যাম্ব্রিকের স্কার্টের ভাঁজ ফিরিয়ে দিতে হবে আমাকে, নইলে মরে যাব দুজনে!

এটা না হয়ে পারে না এই উন্মত্ত নিশ্চয়তায়, এই পাগল অনুভূতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে চললাম শহরের দিকে।

৪

এরপর অনেক দিন শহরে থেকে গিয়ে সারা সময় কাটালাম ওর সঙ্গে, ওর বিপত্নীক বাবার বাড়ির পেছনের ধূলিধূসর ছোট ফুলের বাগানে। ওর বাবা (গাঝাড়া গোছের উদার মতাবলম্বী ডাক্তার) ওকে কোনো বাধা দিতেন না। ইস্তা নদী থেকে যখন ছুটে আসি আর আমার মুখ দেখে ও বুকে সেই যে হাত চাপল, সেই মুহূর্ত থেকে বলা শক্ত দুজনের মধ্যে কার প্রেম বেশী জোরালো, বেশী সুখী, কার প্রেমে বেশী ছেলেমানুষি, আমার না ওর (কেমন যেন হঠাৎ কে জানে কোথা থেকে তা দেখা দিল)। অবশেষে ঠিক করা গেল কিছুদিন দুজনেরই হাঁফ ছাড়ার জন্য আমাদের

ছাড়াছাড়ি হওয়া দরকার। ছাড়াছাড়ি বেজায় দরকার হয়ে পড়েছিল আর একটি কারণে — অভিজাতদের হোটেলে থাকাতে ধারে ডুবে গিয়েছিলাম। তাছাড়া বর্ষা শুরু হয়েছে। ছাড়াছাড়িটা যথাসাধ্য পিছিয়ে দিয়ে অবশেষে শহর ছেড়ে বাড়ি গেলাম, মুষলধারে তখন বৃষ্টি চলেছে। বাড়িতে প্রথম কটা দিন শুধু ঘুমিয়ে কাটল, ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াতাম নিরুদ্দিষ্টভাবে, কিছু করার নেই, ভাবার নেই কিছু। তারপর এল ভাবার অবসর: এ আমার কী ঘটেছে, আর এর শেষ কিসে হবে? একদিন আমার ভাই নিকলাই ঘরে এসে টুপি না খুলেই বসল, বলল:

— তাহলে, ভাই, তোমার রোমাণ্টিক অবস্থাটা এখনো সমানে খাসা চলেছে। সবই সেই আগের মতো: 'চলল শেয়াল নিয়ে, কালো বন দিয়ে, খাড়া পাহাড় পারে', আর বন আর পাহাড়ের পেছনে কী আছে — কেউ জানে না। দেখছ তো, সবকিছুই জানি, অনেককিছু শুনেছি, বাকিটা আন্দাজ করে নিতে পারি — এ সব গল্পের বিশেষ রকমফের হয় না। এও জানি যে এখন বুদ্ধিমানের মতো যুক্তিতর্ক তোমার অসাধ্য। কিন্তু তবু, ভবিষ্যতে কী করবে বলে ঠিক করেছ শুনি।

একটু ঠাট্টা করে জবাব দিলাম:

— সবাইকেই কোনো না কোনো শেয়াল নিয়ে যায়, কিন্তু কোথায় এবং কেন, কেউ জানে না অবশ্য। এমনকি বাইবেলে পর্যন্ত লেখা: 'যৌবনে যেখানে প্রাণ যায়, যেখানে চক্ষু চায়, সেখানে চলে যাও, যুবক!'

চুপ করে বসে আমার ভাই মেঝের দিকে তাকিয়ে বোধহয় কান পেতে শুনতে লাগল হেমন্তের বিরস বিষণ্ণ বাগানে বৃষ্টির ফিসফিসানি; তারপর বিষণ্ণ সুরে বলল:

— বেশ, তাই যদি হয়, যাও...

বারবার শুধালাম নিজেকে: কী করা উচিত? উত্তরটা বেশ স্পষ্ট। কিন্তু যত জোর দিয়ে নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করি যে কাল বিদায়ের চূড়ান্ত চিঠিটা লিখে ফেলা উচিত,—ওটা করা সম্ভব কেননা চূড়ান্ত ঘনিষ্ঠতা তখনো হয় নি দুজনের মধ্যে, — তত গভীরভাবে আমায় পেয়ে বসে ওর জন্য একটা কোমলতা, ওকে নিয়ে উচ্ছ্বাস, আমার প্রতি ওর ভালোবাসার জন্য ওর চোখ, মুখ, হাসি, কণ্ঠস্বরের মাধুর্যের জন্য একটা সকৃতজ্ঞ হৃদয়াবেগ... আর কিছুদিন পরে একটি সন্ধ্যেয় আপাদমস্তক ভিজে সপসপে একজন ঘোড়সওয়ার হঠাৎ আঙিনায় এসে বৃষ্টিতে ভিজে একটা খাম আমাকে দিল: 'আর পারি না। তুমি এসো।' কয়েক ঘণ্টার

মধ্যেই ওকে দেখতে পাব, শুনব ওর কণ্ঠস্বর, এই ভয়ঙ্কর চিন্তায় জেগে রইলাম সারা রাত...

তারপর হেমন্তের ক'টা মাস কাটল এভাবে — হয় বাড়িতে নয় শহরে। ঘোড়া আর জিন দিলাম বেচে, শহরে যখন যেতাম তখন অভিজাতদের হোটেলে আর না উঠে শেচপনায়া চকে নিকুলিনার বোর্ডিং-হাউজে থাকতাম। শহরের চেহারা বদলে গেছে একেবারে, যেখানে মানুষ হয়েছি সেখানকার মতো নয় মোটে। সবকিছু সাদাসিধে গতানুগতিক, শুধু মাঝে মাঝে উস্পেনস্কায়া স্ট্রীট হয়ে আমার পুরনো স্কুল আর স্কুলের মাঠ পেরিয়ে যেতে যেতে পুরনো আবেগের কিছুটা ফিরে আসত, মন সাড়া দিত কিছুতে। তখন পাকা সিগারেটখোর হয়ে গেছি, দস্তুর মতো দাড়ি কামাতে ঢুকি নাপিতের দোকানে, যেখানে একবার ছেলেমানুষের মতো কত না বাধ্যভাবে বসে আড় চোখে তাকিয়ে দেখেছিলাম কাঁচির দ্রুত গতিতে কীভাবে আমার ফিনফিনে চুল পড়ছে মেঝেতে। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত ডাইনিং-রুমের তুর্কি সোফায় বসে থাকতাম দুজনে — প্রায় সর্বদা একলা: ওর বাবা সকাল সকাল চলে যেতেন, ভাই যেত স্কুলে, দুপুরে খাবার পর ওর বাবা একটু ঘুমিয়ে নিয়ে আবার কোথায় যেন

বেরিয়ে যেতেন, আর ভাইটির পাগলের মতো খেলা চলত ভল্‌চক নামের লালচে-বাদামী কুকুরটার সঙ্গে, দোতলার কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ক্রমাগত উঠে আর নেমে কুকুরটা ভীষণ রাগের ভানে ঘেউ-ঘেউ করে প্রায় দম আটকে যেত। তারপর এমন একটা সময় এল যখন সোফায় এই একঘেয়ে বসে থাকায় এবং হয়ত আমার সদাজাগ্রত অতি অপরিমিত অনুভূতি প্রবণতায় বিরক্ত হয়ে ও নানা ছুতোয় বেরিয়ে গিয়ে বান্ধবী ও চেনাশোনা লোকেদের সঙ্গে দেখা করা শুরু করল, এদিকে সোফায় একা বসে আমি শুনতাম সিঁড়িতে স্কুলের ছেলেটির চীৎকার, হাসি আর মেঝেতে পা ঠোকা, আর ভল্‌চকের থিয়েটারি ঘেউ-ঘেউ. চোখের জলে ঝাপসা তাকিয়ে থাকতাম পর্দা অর্ধেক-টানা জানলার দিকে, বাইরের বিরস ধূসর আকাশের দিকে, সিগারেট খেতাম একটার পর একটা... তারপর আবার ওর কী হল: বাড়িতে থাকার পালা শুরু, আমার প্রতি ওর ব্যবহার আবার এত মধুর মমতায় ভরা যে, ও ঠিক কী ধরনের মানুষ বুঝে উঠতে পারলাম না। একদিন আমাকে বলল, 'যাক গে, মনে হচ্ছে, প্রিয়তম, এটা আমাদের অদৃষ্ট!' তারপর সুখে মুখ কুঁচকে কেঁদে ফেলল। এটা ঘটল লাঞ্চের পর, সে সময়টায় যখন পাছে ডাক্তারের ঘুমের

ব্যাঘাত হয়, সবাই পা টিপে হাঁটত বাড়িতে। 'বাবার জন্য শুধু ভীষণ দুঃখ হয়, আমার সবচেয়ে আপনার লোক উনি দুনিয়ায়,' ও বলল, বরাবরকার মতো বাপের প্রতি ওর তীব্র অনুরাগে আমার অবাক লাগল। আর হবি তো হ, ঠিক সে সময় ওর ভাই ছুটে এসে অন্যমনস্কভাবে বিড়বিড় করে জানাল ডাক্তার দেখা করতে চান আমার সঙ্গে। ওর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ওর হাতে চুমু খেয়ে বেশ দৃঢ়ভাবে পা চালিয়ে গেলাম ঘর থেকে।

সবে বেশ ঘুমিয়ে নিয়ে হাতমুখ ধোবার পর মেজাজটা যেমন খোশ আর সদয় থাকে তেমনিভাবে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন ডাক্তার। গুণগুণ করে গাইতে গাইতে একটা সিগারেট তিনি ধরাচ্ছিলেন। একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বললেন:

— শোনো, ভাই, অনেক দিন ধরে তোমার সঙ্গে বাতচিত করার ইচ্ছে, — বিষয়টা জানো তো। ছেঁদো কথায় আমার আস্থা নেই, তুমি সেটা বেশ ভালোভাবে জানো। কিন্তু আমি চাই আমার মেয়ে যেন সুখী হয়; তোমার প্রতিও আমার গভীর আসক্তি, তাই পুরুষের মতো প্রাণ খুলে কথা বলা যাক। শুনলে হয়ত অবাক লাগবে — কিন্তু তোমার বিষয়ে কিছু জানি না: তুমি

কে বলো তো! — মৃদু হেসে তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

মুখ লাল হয়ে গেল আমার, তারপর ফ্যাকাসে সিগারেট জোরে টান দিলাম। কে আমি? গ্যেটের মতো জাঁক করে বলতে পারলে ভালো হত (সবে একারম্যান পড়েছি তখন): 'নিজেকে আমি জানি না, আর ঈশ্বর করুন, কখনো যেন জানতে না হয়!' কিন্তু উত্তর দিলাম সবিনয়ে:

— আমি লেখক... লেখা চালিয়ে যাব, খাটব. .

তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে আরো বললাম:

— হয়ত তৈরী হয়ে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকব...

— বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকবে? তা তো চমৎকার অবশ্য, — ডাক্তার বললেন। — কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য তৈরী হওয়া সহজ কথা নয়। তাছাড়া, ঠিক কিসের জন্য নিজেকে তৈরী করতে চাও? শুধু সাহিত্যিক জীবনের জন্য, না সামাজিক, সরকারী কাজের জন্যও বটে?

আবার আমার মনে ভিড় করে এল আবোলতাবোল নানা কথা — গ্যেটের কথা আবার: 'সমস্ত পার্থিব জিনিসের নশ্বরতার প্রতি একটা বিতৃষ্ণায় যুগের পর যুগ অতিবাহিত করি... রাজনীতি কখনো কবির কারবার হতে পারে না...'

— সমাজ সেবা কবিদের কারবার নয়, — জবাবে বললাম।

অল্প অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন ডাক্তার:

— তার মানে, এই ধরো নেক্রাসভ, তোমার মতে কবি নন মোটে? কিন্তু অন্তত সমসাময়িক জীবনের নানা ধারা তো তোমার খানিকটা চোখে পড়ে। যে কোনো সৎ ও বুদ্ধিমান রুশী বর্তমানে কিসে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ পায় জানো?

আমার জানা যা, সব মনে মনে ভেবে নিলাম মুহূর্তখানেক: সবায়ের মুখে প্রতিক্রিয়া, জেম্স্ত্ভোর কর্মকর্তাদের কথা, 'এখন বিনাশপ্রাপ্ত মহতী সংস্কার যুগের বৈশিষ্টসূচক নানা শুভ ক্রিয়াকর্মের' কথা... তলস্তয় প্রচারিত 'তপোবনের' কথা... সবাই বলে আমরা এখন নাকি বাস করছি চেখভের 'গোধূলি'তে... মনে পড়ল তলস্তয়বাদীদের দ্বারা প্রচারিত মার্কাস্ ওরেলিয়াসের উক্তির সেই চটি বইটা: 'ফ্রণ্টনকে দেখে জেনেছি তথাকথিত অভিজাতদের হৃদয় কী কঠোর...' মনে পড়ল বসন্তকালে নীপারে আমার সঙ্গী সেই বিষণ্ণ ইউক্রেনীয় বৃদ্ধের কথা, কোন এক ধর্মীয় সঙ্ঘের লোক সে, নিজস্ব বিচিত্রভাবে বারবার সেণ্ট পলের সেই উক্তি আমাকে সে শোনায় যার উপসংহারে বলা হয়েছে:

'আমাদের সংগ্রাম রক্তমাংসের বিরুদ্ধে নয়, আমাদের সংগ্রাম ওপরওয়ালা, পৃথিবীর শাসক ও এ যুগের তমসার বিরুদ্ধে...' তলস্তয়ের বাণীর প্রতি আমার পুরনো ঝোঁক ফিরে এল, সে বাণী মানুষকে সমস্ত সামাজিক দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেয় ও সঙ্গে সঙ্গে বিরোধিতা করে 'এ যুগের তমসাবৃত পৃথিবীর শাসকদের' যাদের আমিও দেখতে পারি না। — তলস্তয়ের শিক্ষাবলী নিয়ে একটা বক্তৃতা শুরু করে দিলাম।

— তার মানে তুমি ভাবো যা কিছু অশুভ, যা কিছু দুঃখ — ক্লেশ তা থেকে মোক্ষের একমাত্র উপায় হল এই কুখ্যাত নিষ্ক্রিয়তা আর অপ্রতিরোধ? — অত্যন্ত নিস্পৃহভাবে জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার।

তাড়াতাড়ি জবাব দিলাম আমি সর্বান্তঃকরণে কর্মযোগ ও প্রতিরোধের স্বপক্ষে, কিন্তু সে কর্মযোগ ও প্রতিরোধ 'একেবারে অন্য ধাঁচের'। তলস্তয়ের বাণীতে আমার আসক্তি গড়ে ওঠে সেই সব বলিষ্ঠ ও পরস্পরবিরোধী অনুভূতিতে যা আমার মনে উদ্রিক্ত করেছিল পিয়ের বেজুখভ ও আনাতলি কুরাগিন, 'খল্‌স্তমের' গল্পের প্রিন্স সেপুর্খভস্কয় ও ইভান ইলিচ, 'কী তাহলে করা যায়?' ও 'মানুষের কতই

বা জমি চাই' গল্প, মস্কোর লোকগণনার বিষয়ে লেখা প্রবন্ধটিতে শহরের আর্বজনা ও দারিদ্র্যের ভয়াবহ বর্ণনা ও প্রকৃতির কোলে সাধারণ লোকের সঙ্গে বাস করার একটি রোমাণ্টিক স্বপ্ন, যা জাগরিত হয় 'কসাকরা' পাঠে ও ইউক্রেনকে নিজের চোখে দেখার ফলে: ভাবতাম, আমাদের এই অন্যায় জীবনের সমস্ত কলঙ্ক ঝেড়ে ফেলে স্তেপের কোনো ছোট গাঁয়ে, নীপারের তীরে কোনো সাদা ছোট কুঁড়েতে কাজের শুচি জীবন শুরু করতে পারলে কী চমৎকার না হত! কুঁড়ে ঘরটার কথা বাদ দিয়ে এ সব ভাবনাচিন্তার কিছুটা বললাম ডাক্তারকে। তিনি মন দিয়ে শুনলেন, কিন্তু মনে হল অত্যন্ত মুরুব্বিয়ানার ভাবে। একবার তো তাঁর ঘুমে-ভরা চোখ প্রায় জুড়ে এল, হাই চাপার চেষ্টায় নড়ে উঠল শক্ত চোয়াল, কিন্তু তন্দ্রার ঘোর কাটিয়ে হাই-এর ঠেলায় নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত করে বললেন তিনি:

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছি... তুমি বলতে চাও 'ধরাধামের' মামুলি কোনো সুখ, ব্যক্তিগত কোনো সুখের ধান্দা তোমার নেই? কিন্তু জানো তো, সব সুখই ব্যক্তিগত নয়। এই ধরো আমি, জনগণের ভক্ত আমি নই মোটে; দুর্ভাগ্যক্রমে ওদের ভালোই চিনি, আমার বিশ্বাস হয় না যে ওরা সর্বজ্ঞানের উৎস ও আধার, ওদের সঙ্গে গলা

মিলিয়ে আমি একথা বলতে রাজী নই যে পৃথিবী রয়েছে তিনটে তিমি মাছের পিঠে। তবুও ওদের প্রতি কি আমাদের কোনো দায়িত্ব বা বাধ্যবাধকতা নেই? যা হোক, এ বিষয়ে তোমাকে উপদেশ দেবার দুঃসাহস আমি করব না। অন্তত তোমার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাওয়াতে খুশি হয়েছি। এখন তাহলে আমার বক্তব্যে ফিরে যাওয়া যাক। সংক্ষেপে বলব, আর কিছু ঢেকে বলব না, মাফ করো। পরস্পরের প্রতি তোমার ও আমার মেয়ের মনোভাব আর সে মনোভাবের বর্তমান বিকাশ যাই হোক, তোমাকে আমি এখন এই বলব: ও সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন বটে, কিন্তু এই ধরো যদি তোমার সঙ্গে পাকাপাকি গোছের একটা বন্ধনে আবদ্ধ হতে চেয়ে আমার আশীর্বাদ চায়, তাহলে সরাসরি 'না' বলব। তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে, তোমার সর্বপ্রকার মঙ্গল কামনা করি, কিন্তু 'না'র অন্যথা হবে না। কেন? জবাবটা হবে একেবারেই বাপের মতো: তোমাদের দুজনকে অসুখী দেখতে, দুঃখকষ্টে ডুবে অনিশ্চয়তার মধ্যে কোনোক্রমে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছ দেখতে আমি চাই না। তাছাড়া, একেবারে খোলাখুলিভাবে তোমাকে জিজ্ঞেস করি: তোমাদের দুজনের মধ্যে কী মিল আছে? লিকা বেশ মিষ্টি

চেহারার মেয়ে, কিন্তু, কথাটা চেপে গিয়ে লাভ নেই — ওর মতিগতি অস্থির, — আজ এটা কাল সেটার মোহে ও গা ভাসিয়ে দেয় — তলস্তয়ের তপোবনের স্বপ্ন অবশ্য ও দেখে না — ছিরিহীন এই শহরটায় ওর পোষাকের ধূম একবার দেখো! এ কথা আমি মোটে বলতে চাই না যে ও বিগড়ে গেছে, শুধু বলতে চাই যে আমার মতে ও, যাকে বলে, তোমার দোসর নয় মোটে...

সিঁড়ির তলায় লিকা দাঁড়িয়েছিল আমার অপেক্ষায়, জিজ্ঞাসু ও দুঃসংবাদের জন্য প্রস্তুত দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে। ডাক্তারের শেষ কটি কথা তাড়াতাড়ি জানিয়ে দিলাম। মাথা হেঁট করে ও বলল:

— না, ওঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমি কখনো যাব না!

৫

নিকুলিনার বোর্ডিং-হাউজে থাকার সময় মাঝে মাঝে আমি বেরিয়ে অনির্দিষ্টভাবে শেচপনায়া চকে হাঁটতাম, তারপর মঠের পেছনের ফাঁকা মাঠ হয়ে প্রাচীন দেয়ালে ঘেরা বড়ো কবরখানা পেরিয়ে যেতাম। আর কিছু নেই — শুধু হাওয়া, বিষাদ আর নিঃস্তব্ধতা, সবার কাছে বিস্মৃত, অবহেলিত ক্রুশ ও কবরপাথরের অনন্ত

শান্তি, নিঃসঙ্গ অস্পষ্ট কী একটা ভাবনার মতো কী একটা শূন্যতা। কবরখানার ফটকের ওপরে আঁকা একটি ধুধু নীল-ধূসর সমভূমির এখানে-ওখানে হাঁ-করা কবর আর ভেঙে পড়া কবরপাথরের ছোপ, তার নীচ থেকে উঠছে দন্ত ও পিঞ্জর সর্বস্ব, কঠিন কঙ্কাল ও ফিকে নীল শবাচ্ছাদন গায়ে মান্ধাতার আমলের বুড়ো-বুড়ী। সমভূমির ওপরে শিঙা মুখে উড্ডীন বিরাট একটি দেবদূত, রঙচটা নীল পোযাক হাওয়ায় প্রসারিত পেছনে, কুমারীসুলভ নগ্ন পা হাঁটুর কাছে বাঁকা, লম্বা পায়ের খড়ির মতো সাদা তলা ওলটানো... বোর্ডিং-হাউজেও মফস্বলের হৈমন্তী শান্তির রাজত্ব, সেখানে শূন্যতা — গ্রাম থেকে লোক আসে ক্বচিৎ কখনো। ফিরে উঠানে ঢুকে দেখতাম — পুরুষের টপবুট পায়ে চালা থেকে একটি মোরগ হাতে আমার দিকে আসছে রাঁধুনী। কেন জানি হেসে বলত: 'বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি এটাকে, বুড়ো হয়ে মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে, কিছুদিন থাক আমার সঙ্গে...' পাথরের চওড়া অলিন্দের ধাপে উঠে অন্ধকার প্রবেশপথ ও তারপর কাঠের তক্তা-দেওয়া গরম রান্নাঘর পেরিয়ে ঢুকতাম সামনের ঘরগুলোয় — কর্ত্রীর শোবার ঘর, তারপর সেই ঘরটা যেখানে দুটো সোফা ভাড়া দেওয়া হয় কালেভদ্রে

আসা অতিথিদের — হয় যাজক নয় ব্যাপারীদের — কিন্তু বেশীর ভাগ সময় কেবল আমাকে। স্তব্ধতা, স্তব্ধতারই মধ্যে কর্ত্রীর শোবার ঘরে এলার্ম-ঘড়ির শান্ত টিকটিক... 'বেড়িয়ে এলেন তো?' নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে মধুর দরদী হাসিতে জিজ্ঞেস করত কর্ত্রী। কী মোহিনী সুরেলী গলা! স্ত্রীলোকটি মোটাসোটা, মুখ গোলপানা। মাঝে মাঝে এমন একটা সময় আসত যখন শান্তভাবে তাকাতে পারতাম না তার দিকে — বিশেষ করে সেই সব সন্ধ্যায় যখন টকটকে লাল মুখে গোসলখানা থেকে ফিরে ভিজে কালো চুলে, নরম অলস চোখে ঝিলিক এনে রাত্রির সাদা ব্লাউজ পরা পরিষ্কার দেহ আরাম কেদারায় আলতোভাবে এলিয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে চা খেত আর সিল্কের মতো সাদা, গোলাপী চোখ বেড়ালটা তার নধর, একটু ফাঁক-করা হাঁটুতে বসে গড়গড় করত। বাইরে শোনা যেত ঠকঠক আওয়াজ: রাঁধুনী ভারি খড়খড়িগুলো বন্ধ করছে, জানলার দুধারে যথাস্থানে বসিয়ে দেওয়াতে কনুইয়ের মতো দেখতে পাতগুলোর লোহার খিলের ঝনঝনানি, — এতে মনে পড়ে যায় আগেকার দিনকালে কী বিপদ-আপদ ছিল। নিকুলিনা তখন উঠে পাতগুলোর কোণের গর্তয় লোহার ছোট গুঁজি এ'টে

আবার চা খেতে বসত, তারপর ঘরটা এমনকি আরো আরামের হয়ে যেত... পাগলের মতো নানা চিন্তা ও অনুভূতি আচ্ছন্ন করে দিত আমাকে: সর্বস্ব ছেড়েছুড়ে এখানে, এই বোর্ডিং-হাউজে চিরকাল থেকে যাওয়া, শান্তিতে টিকটিক করা এলার্ম-ঘড়ির আওয়াজে তার উষ্ণ বিছানায় ঘুমনো! একটা সোফার ওপরে দেয়ালে আশ্চর্য সবুজ অরণ্যের ছবি: দীর্ঘ প্রাচীরের মতো সে অরণ্য, কাঠের কুঁড়ে একটি, আর কুঁড়ের পাশে ছোট খাটো একটি বুড়ো, দেহ তার করুণ কুঁজো, শীর্ণ হাত রাখা বাদামি একটা ভালুকের মাথায়, তারও চেহারা ভীরু করুণ, থাবাগুলো নরম; অন্য সোফায় লোকে যেখানে বসবে বা ঘুমোবে তার ওপরকার ছবিটা একেবারে বিদঘুটে মনে হয় — ছবিটা হল কফিনে শায়িত একটি সাদা-মুখ, কালো ফ্রককোট পরিহিত হোমরা-চোমরা লোকের, নিকুলিনার বিগত স্বামীর। হেমন্তের দীর্ঘ সন্ধ্যার সঙ্গে সুর মিলিয়ে রান্নাঘর থেকে আসত তালে তালে পা ঠোকা ও একঘেয়ে গানের শব্দ: 'গির্জার সামনে গাড়ি, ফলাও বিয়েবাড়ি...' — শীতকালে নুনে রাখার জন্য বাঁধাকপির খরখরে টানটান পাতা কোচাতে পয়সা দিয়ে আনানো হত যে সব মেয়েদের তারা গাইত গানটি। আর সমস্ত কিছুতে,—

সস্তা গানে, তালে তালে ঘা মারায়, পুরনো সস্তা ছাপা ছবিতে, এমনকি সেই মরা লোকটিতেও, যার জীবন মনে হয় বোর্ডিং-হাউজের মাথামুণ্ডুহীন সুখী জগতে তখনো জের টেনে চলেছে — এ সমস্ত কিছুতে — বিষণ্ণতা, তিক্ত মধুর একটা বিষণ্ণতা...

৬

নভেম্বরে বাড়ি ফিরলাম। বিদায় নেবার সময়ে ঠিক করা হল ওরিওলে দেখা হবে: ১লা ডিসেম্বর ট্রেন ধরবে লিকা, আমি আসব পরে, লোক দেখানোর খাতিরে না হয় সপ্তাহ খানেক পরে। কিন্তু পয়লা তারিখে বরফাবৃত চাঁদিনী রাতে, পাগলের মতো গাড়ি ছুটিয়ে গেলাম পিসারেভোতে, শহর থেকে যে ট্রেনটা ওর ধরার কথা সেটাতে চাপার জন্য। রূপকথার মতো সেই অপরূপ সুন্দর রাত্রিটা, যেন চোখে দেখছি, অনুভব করছি! চোখের সামনে দেখি বাতুরিনো ও ভাসিলিয়েভস্কয়ের মাঝামাঝি সমতল তুষারাবৃত মাঠে জুড়ি ঘোড়ার গাড়িতে তীরবেগে চলেছি, বমের জোতা মূল ঘোড়াটা যেন মাত্র এক জায়গাতে দাঁড়িয়েই কাঁপাচ্ছে তার হাঁসুলী; দ্রুত সমছন্দে যাত্রা, পাশে বাঁধা সহকারী

ঘোড়াটার পাছা তালে তালে উঠছে আর পড়ছে, পেছনের পায়ের খুরে বরফের ডেলা ছিটিয়ে চলেছে নালে সাদা ঝিলিক তুলে... হঠাৎ মাঝেমাঝে রাস্তা থেকে ছিটকে গভীর বরফে পড়ে আঁকুপাঁকু করে হাঁপিয়ে উঠে বরফে পা ডুবে গিয়ে ঘোড়াটা জড়িয়ে যাচ্ছে খুলে-যাওয়া দড়িতে, তারপর পা রাখবার মতো জায়গা পেয়ে এক লাফে রাস্তায় এসে আবার তীরবেগে দৌড়, বমে সজোরে টান দিয়ে... সমস্ত কিছু ভেসে যাচ্ছে অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে, -- অথচ একই সঙ্গে মনে হচ্ছে তারা গতিহীন ও প্রতীক্ষমান: অনেক দূরে নীচু শান্ত, হিমকণায় ঝাপসা, কুয়াসার জ্বলন্ত মণ্ডলে রহস্যভরা বিষাদের ছাপ মাখা চাঁদের তলায় আঁশের মতো রুপোলি বরফের চাদর পড়ে আছে চিকচিকে, স্তব্ধ, আর সবায়ের চেয়ে স্তব্ধ আমি, স্তব্ধতার রাজত্বে ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে একটা সময় পর্যন্ত অসাড় আমার মন, প্রতীক্ষায় বিধুর, অথচ বিষণ্ণ আগ্রহে চেয়ে আছি কী একটা স্মৃতির দিকে: ঠিক এই রকম একটা রাত, একই পথে গিয়েছিলাম ভাসিলিয়েভস্কয়েতে, বাতুরিনোতে, শুধু ওখানে সেটা আমার প্রথম শীতযাপন, তখন আমি ছিলাম শুচি, নিষ্পাপ ও যৌবনের প্রথম আনন্দোচ্ছ্বল দিনগুলিতে মুখর, তখন ভাসিলিয়েভস্কয়ে থেকে আনা পুরনো

ছোট ছোট বইয়ের কবিতার স্তবক, বাণী, শোকগাথা ও লোকগাথায় উন্মোচিত পৃথিবীর প্রথম কাব্যস্বাদে বিমুগ্ধ আমি:

ঘোড়ার খুরের শব্দ। ধুধু চারিদিক,
স্ভেৎলানার চোখে শুধু শূন্য স্তেপ. .

'কোথায় গেল সে সব এখন!' — ভাবছিলাম, কিন্তু তখন আমার মন যা ছেয়ে রেখেছিল, অসাড় প্রতীক্ষার সেই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসি নি নিমেষের জন্য। 'ঘোড়ার খুরের শব্দ। ধুধু চারিদিক...' — মনে মনে আওড়াচ্ছি ঘোড়ার কদমে তাল রেখে (গতিবেগের সেই ছন্দে তাল রেখে যে ছন্দের মোহ আমার মনে বরাবর এত প্রখর) বললাম নিজেকে আর মনে হল আমি এখন অন্য মানুষ, ফৌজী কেতার টুপি মাথায়, ভালুকলোমের ওভারকোট গায়ে আগেকার দিনের বীরপুরুষের মতো ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছি কোথাও, বাস্তবের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে শুধু ভেড়ার চামড়ার কোর্তার ওপর তুলোর কোট চাপানো, বরফে ঢাকা, সামনে দাঁড়ানো গাড়োয়ানটা আর আমার হিম অসাড় পায়ের কাছে সীটের বাক্সে রাখা বরফ-কণায় মাখা-মাখি, জমে-যাওয়া সুগন্ধি খড়... ভাসিলিয়েভস্কয়ের পর গাড়িটা বরফের

একটা গাদায় পড়ে ঘুরে উল্টে যাওয়াতে বম ভেঙে গেল, গাড়োয়ান দড়ি দিয়ে বাঁধতে লাগল সেটা, আর আমি ট্রেন না ধরার ভয়ে মৃতপ্রায় হয়ে বসে রইলাম। স্টেশনে পৌঁছিয়েই যা টাকাকড়ি ছিল তা দিয়ে প্রথম শ্রেণীর একটা টিকিট কিনে — ও বরাবর প্রথম শ্রেণীতে ওঠে — দৌড়লাম প্লাটফর্মে। মনে আছে জমে-যাওয়া বাষ্পে ঝাপসা চাঁদের আলোয় ঢাকা পড়েছে প্লাটফর্মের হলদে বাতি ও টেলিগ্রাফ-অফিসের আলোকিত জানলাগুলো। ট্রেনটা তখন ঢুকছে স্টেশনে, বরফে ঢাকা অস্পষ্ট দূরসীমায় তাকিয়ে রইলাম, হিমকণা আর ভেতরকার হিম কাঁপুনির জন্য মনে হল শরীরটা যেন কাঁচের তৈরী। হঠাৎ ঘণ্টা বেজে উঠল জোরে, ফাঁপা শব্দে, দড়াম করে দরজা খোলার তীক্ষ্ন কিঁচকিঁচে আওয়াজ, স্টেশন থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসা লোকের পায়ের খর মচমচ শব্দ — তারপর দূরে দেখা দিল ইঞ্জিন কালো লোমশ একটা বস্তুপিণ্ডের মতো, হুসহুস শব্দে আস্তে আস্তে এগিয়ে এল ঝাপসা লাল আলোর ভয়াবহ ত্রিভুজ — বরফে ঢাকা, সর্বাঙ্গ একেবারে ঠাণ্ডায় জমাট, ট্রেনটা অতি কষ্টে কিঁচকিঁচিয়ে, কেঁদে ককিয়ে এসে পৌঁছল স্টেশনে... এক লাফে সিঁড়ি ডিঙিয়ে কামরার দরজা হাট করে খুলে ফেললাম — ওই তো

ও, কাঁধে ফারকোট, ঘন লাল পর্দার আড়ালের একটি লণ্ঠনের নীচে ঝাপসা অন্ধকারে গোটা কামরায় একেবারে একলা বসে সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে আছে...

কামরাটা পুরনো, উঁচু, তিন জোড়া চাকার ওপরে বসানো; ঠাণ্ডায় দ্রুত বেগে যাওয়ার সময় কাঁপুনি আর ঘড়ঘড়ানি, ওঠাপড়া আর দোলানি, দরজা আর দেয়ালের কিঁচকিঁচ, ছাই-রঙা হীরের মতো হিমকণাবৃত জানলাগুলোর ঝিকিমিকি... এরই মধ্যে চলে এসেছি অনেক দূর, মাঝরাত... আপনা থেকেই সবকিছু ঘটল, তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না আমাদের ইচ্ছাশক্তির বা চেতনার... আরক্তিম মুখে, কিছু না দেখা চোখে উঠে ও চুলটা ঠিক করে নিল, তারপর চোখ বুজে বসে রইল একটি কোণে, ধরা ছোঁওয়ার বাইরে...

৭

সে শীতটা আমরা কাটালাম ওরিওলে।

নতুন ভয়ানক ঘনিষ্ঠতায় গোপনে আবদ্ধ আমরা, কী করে বোঝাই আমাদের তখনকার মনের ভাব, যে ভাব নিয়ে সকালে স্টেশন থেকে পত্রিকা-অফিসে ঢুকেছিলাম!

আমি উঠলাম ছোট একটা হোটেলে, ও আগেকার মতো রয়ে গেল আভিলভার সঙ্গে। দিনের বেলার বেশীর ভাগ কাটত সেখানে, আর ঘনিষ্ঠ প্রহরগুলি · · আমার হোটেলে।

আমাদের সুখ হালকা ধরনের নয়, মনে ও শরীরে হাঁফ ধরিয়ে দেয়।

একটি সন্ধ্যার কথা মনে আছে: ও গিয়েছে স্কেটিং করতে, অফিসে কাজ করছি আমি, — তখন ওখানে কাজ পেয়ে অল্পস্বল্প রোজগারও শুরু হয়েছে, — বাড়িটা ফাঁকা আর চুপচাপ, কী একটা মিটিংএ গেছে আভিলভা, সন্ধ্যে যেন আর শেষ হয় না, জানলার বাইরে রাস্তার আলো বিষণ্ন, অযাচিত, বরফের ওপর মচমচ শব্দে আসা যাওয়া পথচারীদের পায়ের শব্দ যেন কী একটা নিয়ে নিচ্ছে আমার কাছ থেকে, রিক্ত করে দিচ্ছে যেন আমাকে: মনে নিঃসঙ্গতা, ব্যথা আর হিংসের গুরুভার, — একলা বসে বসে কী একটা বাজে কাজ করে চলেছি আমি, আমার অযোগ্য কাজ নিতে হয়েছে ওরই খাতিরে, আর ও কিনা মজা লুঠছে বরফ-ঢাকা পুকুরে, যার চারিধারে কালো ফার গাছ সুদ্ধ সাদা বরফের টিলা, যেখানে ফৌজী অর্কেস্ট্রার মুখর শব্দ, গ্যাসের বেগুনি আলোর বান ডেকেছে,

ইতস্তত দেখা যাচ্ছে উড়ন্ত কালো মূর্তির ছোপ... হঠাৎ ঘণ্টা বেজে উঠল, দ্রুত পদক্ষেপে ও ঘরে ঢুকল। পরনে ছাই-রঙা পোষাক, মাথায় কাঠবিড়ালীর চামড়ার ছাই-রঙা টুপি। হাতে ঝকঝকে স্কেট, এক নিমেষে আনন্দে ঘর ভরে গেল ওর নবীন, হিম ছড়ানো সতেজভাবে, ঠাণ্ডায় আর শারীরিক পরিশ্রমে আরক্তিম ওর মুখের সৌন্দর্যে। 'বাপরে, কী ক্লান্ত লাগছে!' — বলে নিজের ঘরে চলে গেল। পেছন পেছন গেলাম; সোফায় ধড়াস্ করে বসে শ্রান্তির হাসি হেসে পা এলিয়ে দিল ও, হাতে তখনো স্কেট। আর এরই মধ্যে অভ্যাসে পরিণত যন্ত্রণার জ্বালায় আমি তাকিয়ে রইলাম উঁচু বুটে ফিতে দিয়ে বসানো ওর পায়ের গাঁটে, খাটো ছাই-রঙা স্কার্টের তলায় ছাই-রঙা মোজা পরা ওর পায়ে, — এমনকি স্কার্টের সেই মোটা পশমের কাপড়টা দেখলেই মনে আসত বাসনার জ্বালা, — তারপর বকতে লাগলাম ওকে — সারাদিন দুজনের তো দেখা হয় নি! — কিন্তু হঠাৎ বুকচেরা স্নেহে আর মমতায় দেখলাম ও ঘুমিয়ে পড়েছে... জেগে উঠে সোহাগের বিষণ্ণ কণ্ঠে ও বলল: 'যা বললে প্রায় সব শুনেছি। রাগ করো না, ভয়ানক ক্লান্ত লাগছে। জানোই তো, এ বছরটায় অনেক ধকল সইতে হয়েছে!'

৮

ওরিওলে থেকে যাওয়ার একটা ছুতো ওর দরকার, তাই গানবাজনা নিয়ে পড়ল। ছুতোর অভাব আমারও হল না: 'গলস্' পত্রিকায় চাকরি জুটল। প্রথম প্রথম সত্যি ভালো লাগত কাজটা: আমার জীবনযাত্রায় শৃঙ্খলার যে বাহ্যিক একটা ভাব এল সেটাই উপভোগ করতাম। আমার সম্পূর্ণ দায়িত্ববিহীন জীবনে এখন একটা দায়িত্ববোধ আসাতে সান্ত্বনা পেলাম। তারপর ক্রমশ বারবার মনে হানা দিতে লাগল একটা কথা: এই কি সেই জীবন যার স্বপ্ন দেখেছিলাম! এ তো, আমার জীবনের সেরা দিন হতে পারত যে সময়টা, হাতের মুঠোয় যখন থাকা উচিত সমস্ত পৃথিবী, তখন কিনা এভাবে কাটাচ্ছি দিন। একজোড়া গালোস পর্যন্ত নেই! এ সব কি শুধু ক্ষণিকের ব্যাপার? তাহলে ভবিষ্যতের গর্ভে কী আছে? কল্পনা করতে শুরু করলাম যে আমাদের দুজনের ঘনিষ্ঠতায়, আমাদের ভাবাবেগ, চিন্তা ও রুচির মিলে কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে, সুতরাং ওর একনিষ্ঠতায় গণ্ডগোল ঘটতে বাধ্য: 'স্বপ্ন ও সত্যের মধ্যে সেই চিরন্তন বিরোধ', সমগ্র ও সম্পূর্ণ প্রেমের সেই চিরন্তন অগম্যতা সেই শীতকালটায়

অনুভব করলাম বিচিত্র তীব্রতায় যা আমার কাছে নতুন, আমার পক্ষে যা ভয়ঙ্কর অকরুণ।

লিকার সঙ্গে পার্টি ও বলনাচে গেলে সবচেয়ে বেশী যন্ত্রণা হত। ওর সঙ্গী সুন্দর ও ভালো নাচিয়ে হলে চোখে পড়ত ওর আনন্দ, সজীবতা, দ্রুত ঘূর্ণমান পা ও স্কার্ট; তখন বলিষ্ঠ ছন্দের, ওয়াল্জ্ সুরের সঙ্গীতে ব্যথায় মুচড়িয়ে উঠত বুক, কান্না পেত। তুরচানিনভের সঙ্গে যখন ও নাচত সবাই তাকিয়ে দেখত খুশিতে, -- অস্বাভাবিক লম্বা সেই অফিসারটির কালো জুলফি, শ্যামবর্ণ লম্বা মুখ, স্থির কালো চোখ। লিকা লম্বা কম নয়, — কিন্তু অফিসারটি প্রায় দু'মাথা লম্বা, লিকাকে ঘনিষ্ঠভাবে ধরে ওয়ালজের তালে ওকে লাবণ্যভরে ঘুরপাক দিয়ে অশেষ নাচার সময় কেমন একটা একগুঁয়েভাবে মুখ নামিয়ে অফিসারটি তাকিয়ে থাকত ওর দিকে, আর ওর সোন্নত মুখে একাধারে সুখ ও দুঃখের, সুন্দর ও আমার পক্ষে অসীম ঘৃণ্য কী একটা আসত। ঈশ্বরের কাছে তীব্রভাবে প্রার্থনা করতাম যে অবিশ্বাস্য কিছু একটা ঘটুক, — লোকটা হঠাৎ মুখ নামিয়ে চুমো খাক ওকে, তাহলে আমার যন্ত্রণাকর প্রত্যাশা তৎক্ষণাৎ হাতে নাতে সাক্ষ্য পাবে; নিশ্চিত হবে হৃদয়ের মৃত্যু!

— তুমি সব সময় নিজের কথা ভাবো, তোমার ইচ্ছেমতো সবকিছু হোক তাই চাও, -- একবার লিকা বলল আমাকে। মনে হয় পারলে তুমি মহানন্দে আমার ব্যক্তিগত জীবনের কিছু রাখবে না, কোনো বন্ধুবান্ধব থাকবে না, নিজে যেমন সকলের কাছ ছাড়া হয়ে পড়েছ ঠিক তেমনি সবায়ের কাছ ছাড়া করে দেবে আমাকেও...

আর সত্যি: প্রেমে, বিশেষ করে স্ত্রীলোকের প্রতি প্রেমে যে করুণা ও মমতা মাখানো স্নেহের একটি উপকরণ থাকতে বাধ্য, সেই রহস্যময় নিয়মের বশে আমি ঘৃণা করতাম ওর হাসিখুশির মুহূর্তগুলিকে -- দলের মধ্যে থাকার সময় বিশেষ করে — ঘৃণা করতাম ওর সজীবতা, নিজেকে দেখানোর ও লোকের প্রশংসা কুড়নোর ওর ইচ্ছে: --- আর তীব্র ভালো লাগত ওর সরলতা, শান্ত, ভীরু ভাব, ওর অসহায়তা, আর ওর চোখের জল, কাঁদলেই সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মতো ফুলে উঠত ওর ঠোঁট। সামাজিক আড্ডায় সত্যি দলছাড়া হয়ে থাকতাম বেশীর ভাগ, নিষ্ঠুর পরিদর্শকের মতো হত আমার রকম সকম, যে নিঃসঙ্গতা ও ঈর্ষা শানিয়ে দিত আমার ভাবধারণ ক্ষমতা, অন্যদের সব খুঁতের বিষয়ে সজাগতা আর অন্তর্দৃষ্টি, তাতে মনে মনে অত্যন্ত

গৌরব বোধ করতাম। তবু লিকার সঙ্গে সত্যিকার ঘনিষ্ঠতার জন্য আমার কী ব্যাকুলতা আর তাতে ব্যর্থকাম হলে কী যন্ত্রণা!

প্রায়ই কবিতা পড়ে শোনাতাম ওকে।

— এটা শোনো তো, কী আশ্চর্য! — বলে উঠতাম। — 'আমার হৃদয়কে নিয়ে যাও দূরে, যেখানে পাহাড় ও বনের ওপরে চাঁদের মতো বসে আছে বিষণ্ণতা!'

কিন্তু এতে ও আশ্চর্য কিছু খুঁজে পেত না।

— হ্যাঁ, বেশ সুন্দর বটে, — সোফায় আরাম করে কুঁকড়ে শুয়ে, গালের নীচে হাত রেখে, আমার দিকে অস্পষ্ট নিস্পৃহভাবে পাশ থেকে তাকিয়ে বলত। — কিন্তু 'বনের ওপরে চাঁদের মতো' কেন? ফেতের লেখা নাকি? প্রকৃতি বর্ণনায় ওর বড্ডো বেশী আগ্রহ।

চটে উঠতাম: একে বলছ বর্ণনা! — লম্বা একটা বক্তৃতা শুরু করে দিতাম ওকে বোঝানোর জন্য যে প্রকৃতি আর আমাদের মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই, হাওয়ার সামান্যতম স্পন্দন পর্যন্ত হল আমাদের জীবনের স্পন্দন; কিন্তু ও শুধু হেসে বলত:

— ওগো, মাকড়সারাই শুধু থাকে ও রকমভাবে!

তারপর আমি পড়ে যেতাম:

পথ চোখে পড়ে না আর হায়।
আবার বরফে ঢেকেছে পথ,
আবার বরফের স্তূপে চলেছে ধীরে
রূপালি পিচ্ছিল সাপ।

ও জিজ্ঞেস করল:

— সাপ আবার কী?

বুঝিয়ে বলতে হল যে তুষার-ঝড়ের কথা বলা হয়েছে, মাটির কাছে ঘুরপাক খাচ্ছে বরফ। বিবর্ণ মুখে পড়তাম:

শ্লেজের ঢাকুনির নিচে
হিম কঠিন রাত্রির ঘোলাটে দৃষ্টি।
পাহাড় ও বনের ওপারে, ধোঁয়াটে মেঘের মাঝখানে
চাঁদের বঙ্কিম রেখার ঝিকিঝিকি।

— ওগো, — ও বলল, — কই, এমন ধারা জিনিস তো কখনো চোখে পড়ে নি!

আক্রোশ চেপে রেখে পড়লাম:

মেঘের ফাঁকে উঠল সূর্য, দীপ্ত নবীন,
বালুতে আঁকলে ঝকঝকে আঁকাবাঁকা রেখা...

তারিফ করে ও মাথা নাড়ল, তার কারণ, বোধহয়, এই যে, ও ভাবল বাগানে বসে সে-ই ছোট্ট সৌখীন ছাতা দিয়ে বালুতে হিজিবিজি কাটছে।

— সত্যি বেশ সুন্দর, -- বলল। — যাক, কাব্যি অনেক হয়েছে, এবার কাছে এসো... তুমি তো সব সময় আমার ওপর চটে থাকো!

ওকে প্রায়ই বলতাম আমার শৈশব ও কৈশোরের কথা, আমাদের জমিদারির রোমাণ্টিক মোহের কথা, বলতাম বাবা, মা ও বোনের কথা। ও শুনত নির্মম উদাসীনতায়। আমি চাইতাম আমাদের পরিবারে মাঝেমাঝে যে দারিদ্র্য ঘনিয়ে আসত তার কথা শুনে ও বিচলিত হোক, দুঃখ বোধ করুক, — যেমন, একবার ফ্রেম থেকে সবকটা আইকন খুলে নিয়ে পুরনো রুপোর তাল শহরে পাঠাতে হল মেশ্চেরিনভার কাছে বাঁধা রাখতে; বাঁকা নাক, গোঁফ, ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখ, সিল্ক্, শাল আর আংটির বহরে ভয়াবহ প্রাচ্য ধরনের চেহারার সেই নিঃসঙ্গ বুড়ীটার কাছে, যার ফাঁকা বাড়িতে গুচ্ছির আঁত পুরনো জিনিসের মাঝে একটা কাকাতুয়া সারাদিন ডেকে যেত তীক্ষ্ন মরা গলায়: কিন্তু বিচলিত বা বিষণ্ন না হয়ে লিকা বলত অন্যমনস্কভাবে:

— কী ভয়ানক সত্যি।

শহরে যত দিন কাটছে তত খাপছাড়া লাগছে নিজেকে, -- এমনকি কী কারণে জানি না আমার প্রতি

আভিলভার ব্যবহার পর্যন্ত বদলে গেল, এল নিস্পৃহতা ও বিদ্রূপের একটা ভাব: শহরে আমার জীবন যত বিরস ও নিরানন্দ হয়ে যায়, তত ঘন ঘন আসে ওর আরো কাছে থাকার ঝোঁক, — ওকে পড়ে শোনাবার, ওকে বলার, ওর কাছে হৃদয় উজাড় করে দেবার ঝোঁক। হোটেলে আমার ঘরটা ছোট, বিষণ্ণ আর বৈচিত্র্যবিহীন, ভীষণ দুঃখ হত নিজের জন্য, — আমার একমাত্র সম্বল একটি বাজে স্যুটকেস আর গুটিকতক বইয়ের জন্য, ঘরে আমার নিঃসঙ্গ সব রাত্রির জন্য, রাত্রিগুলো এত ভয়ানক আর ঠাণ্ডা বলা যায় যে, ঘুমোনোর চেয়ে লড়াই করে জিততে হত আমাকে, তন্দ্রার ঘোরে আমার কাছে ধরা পড়ত যে ভোরের অপেক্ষায় আছি, গির্জার ঘণ্টাঘরে হিম সকালে কখন বেজে উঠবে প্রথম ঘণ্টাধ্বনি। লিকার ঘরও ছোট; চিলেকুঠির সিঁড়ির ধারে বারান্দার কোণে, কিন্তু জানলাগুলো বাগানের দিকে; ঘরটা চুপচাপ, গরম আর সাজানো: সন্ধ্যায় আগুন জ্বালানো হত, আর অত্যন্ত সুন্দর চটিজোড়া সুদ্ধ পা গুটিয়ে, তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ও কুঁকড়ে শুত মধুর একটা ভঙ্গিতে। আমি আবৃত্তি করতাম:

সুদূরে গভীর বনে মধ্যরাত্রি নামল,
তুষার-ঝড়ের হুঙ্কার,

ঘরে আগুনের ধারে আমরা মুখোমুখি বসে,
আগুনে ডাল পোড়ার শব্দ...

কিন্তু তুষার-ঝড়, বন-বাদাড়, নিভৃতি, নীড়, অগ্নিকুণ্ডের কাব্যময় আদিম আনন্দ — এ সব বিশেষ করে তার স্বভাববিরুদ্ধ।

কত দিন না বিশ্বাস করেছি যে শুধু এই বলে ওর মন রাঙিয়ে দেব উত্তেজনায়: 'লাইলাক-রঙা রবারের মতো মসৃণ, এখানে-ওখানে ঘোড়ার নালের পেরেক বসানো, সূর্যাস্তের আলোয় চোখ-ঝলসানো সোনালি রেখায় চিকচিকে হেমন্তের পথগুলির কথা জানো তুমি?' ওকে বললাম হেমন্তের সেই শেষ দিনটার কথা যেদিন আমি ও আমার ভাই গেওর্গি বনে যাই বার্চ গাছের কাঠ কিনতে: রান্নাঘরের ছাদটা হঠাৎ ঝুলে পড়াতে আমাদের আগেকার বাবুর্চিটা আর একটু হলে মারা পড়ত, বুড়ো সেই লোকটা স্টোভের ওপরের তাকে হামেশা শুয়ে থাকত, তাই কড়িবড়গার জন্য বার্চকাঠ কিনতে গেলাম বনে। বৃষ্টির বিরাম নেই (রোদের মধ্যে ক্ষিপ্রগতিতে নেমে আসছে ছোট ছোট বৃষ্টিবিন্দু), মজুরদের সঙ্গে গেলাম, প্রথমে বড়ো রাস্তায় বেশ তাড়াতাড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে, তারপর সেই কুঞ্জটা হয়ে যেখানে বৃষ্টিবিন্দু নিয়ে রোদে চকচক

করছে গাছগুলো, দেখতে আশ্চর্যসুন্দর ছবির মতো, অসংযত অথচ বাধ্য, গাছগুলো যে ফাঁকা জায়গাটায় সেখানটা সবুজ হলেও তখনি আধ-মরা আর জলে ভরে গেছে। আপাদমস্তক ছোট ছোট স্বর্ণাভ পিঙ্গল পাতা ছড়ানো সেই বিশাল বার্চকে জংলির মতো ঘুরে মজুরগুলো কড়া-পড়া বিরাট হাতের তালুতে থুথু ফেলে যখন গাছটার সাদা-কালো গুঁড়িটায় একজোরে কুঠার চালাল তখন মনে কী ব্যথা পেয়েছিলাম লিকাকে বললাম... 'সবকিছু কত ভিজে, কী ঝকঝকে উজ্জ্বল ছিল কল্পনা করতে পারবে না!' শেষে মনের কথা জানিয়ে দিলাম — এ বিষয়ে একটা গল্প লেখার ইচ্ছে আছে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ও বলল:

— কিন্তু এ নিয়ে লেখবার আছে কী! খালি আবহাওয়ার বর্ণনা করে কী লাভ!

সঙ্গীত ছিল আমার সবচেয়ে জটিল, ব্যথাময় আনন্দের অন্যতম। লিকা যখন সুন্দর কিছু বাজাত তখন ওকে আমি রীতিমত পুজো করতাম! ওর প্রতি আত্মত্যাগের উচ্ছ্বসিত একটা স্নেহে টনটনিয়ে উঠত বুক! মনে হত বেঁচে থাকি, সে বেঁচে থাকার শেষ যেন না হয়! বাজনা শুনতে শুনতে প্রায় ভাবতাম: 'আমাদের যদি কখনো ছাড়াছাড়ি হয়, তাহলে ওকে

ছাড়া এ সঙ্গীত শুনব কী করে! ওর সঙ্গে এই প্রেম, এই আনন্দ ভাগাভাগি না করে কখনো কি ভালবাসতে পারব আর কিছু, আনন্দ পাব কোনো কিছুতে?' কিন্তু আমার মনের মতো নয় যে সব জিনিস তার সমালোচনা এত রূঢ়ভাবে করতাম যে চটে উঠে লিকা বাজনা থামিয়ে দিত — ঝট করে ফিরে তাকিয়ে পাশের ঘরে আভিলভাকে হেঁকে বলত:

— নাদিয়া, নাদিয়া! আবোলতাবোল কী বকছে, শোনো একবার!

— আবোলতাবোল বকব বই-কি, — চেঁচিয়ে বলতাম। — এ সব সনাটাগুলোর চারভাগের তিনভাগ হল খেলো, শুধু আওয়াজ, জগাখিচুড়ি, আর কিছু নয়! ওঃ, এটা হল কফিনে কবর-খুঁড়িয়েদের শাবলের ঘা! আহা, বনের ফাঁকা জায়গায় অপ্সরাদের নাচ চলেছে বুঝি, ওহো, এটা হল জলপ্রপাতের গর্জন! অপ্সরা বটে — আমার জানা সবচেয়ে ঘিনঘিনে কথার একটা! খবরের কাগজের ধরতাই বুলি 'সম্ভাবনাময়'এর চেয়েও খারাপ!

লিকা নিজেকে বোঝাতে চাইত থিয়েটারে ওর অনুরাগ অতি প্রবল; এদিকে থিয়েটারে আমার অরুচি, ক্রমশ আমার দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছিল যে বেশীর ভাগ

অভিনেতাদের বাহাদুরি আসলে কিছু নয়, শুধু কমবেশী অশ্লীল স্থূল হবার একটা ক্ষমতা মাত্র, অন্যদের চেয়ে ভালো করে — স্থূলতার নিম্নতম মানদণ্ডে — ওরা ভাগ করতে পারে যে ওরা স্রষ্টা ও শিল্পী। মাথায় পেঁয়াজ-রঙা সিল্কের সাজ আর তুর্কি শাল গায়ে সেই সব অক্লান্ত ঘটকীর দল গোলামের মতো মুখ কেলিয়ে কোনো একটা কেষ্ট বিষ্টুর তোয়াজ করে চলেছে মধুর বুলিতে, আর তিনি সেই নির্ঘাত জাঁকালো আগ্রহের ভঙ্গিতে বুক উঁচিয়ে আঙুল বেশ ফাঁক করে বাঁ হাতটা বুকে, নয় লম্বা-ঝুল ফ্রক-কোটের বুক পকেটে চেপে ধরছেন; সেই সব শুয়োরের মতো নগর শিরোমতি আর ছেবলা খুলেস্তাকভরা, নাক দিয়ে বিষণ্ন গমকে সাঁইসাঁই করা ওসিপরা, নচ্ছার ক্ষুদে রেপেতিলভরা, ফুলবাবুর মতো ক্রুদ্ধ চাৎস্কিরা, মোটা টকটকে লাল কুলের মতো অভিনেতা-মার্কা ঠোঁট ফুলিয়ে আঙুল-উচানো ফামুসভ; মশালবাহীদের মতো ক্লোক আর বাঁকা পালক গোঁজা টুপি মাথায় যত সব হ্যামলেট, কামুক, অলস, রঙ করা চোখ, কালো মখমলে ঢাকা ঊরু, পাগুলো শূদ্রসুলভ চেপটা — এ সমস্ত কিছু দেখলে সত্যি আমার গা শিউরে উঠত। আর অপেরা! পিঠ উঁচিয়ে, প্রকৃতির নিয়মের কোনো বালাই

না মেনে, লিকলিকে পা অসম্ভব ফাঁক করে অথচ হাঁটু গুঁজে দাঁড়িয়ে আছেন রিগোলেট্টো। আকাশের দিকে আবেগে ও বিষণ্ণতায় চোখ গোল করে তাকিয়ে সুসানিন গুরুগম্ভীর নাদে আওড়াচ্ছেন 'হে সূর্য আমার, তোমার উদয় হবে!', 'মৎস্যকন্যার' সেই মিলচালক গাছের ডালের মতো সরু হাত পাগলের মতো বাড়িয়ে দিয়ে রাগে থরথর করে কাঁপছে, বিয়ের আংটিটা অবশ্য তখনো আঙুলে পরা, পরনের শার্ট ও প্যান্ট এত জীর্ণ ও ছিন্নভিন্ন যে মনে হয় খেপা কুকুরের পাল ছিঁড়ে খুঁড়ে দিয়েছে! থিয়েটার নিয়ে আমাদের তর্কবিতর্কের সমাধান কখনো হত না: দেওয়া-নেওয়া আর পরস্পরকে বোঝার মনোভাব একেবারে উবে যেত। যেমন, মফস্বলের সেই বিখ্যাত অভিনেতাটি ওরিওলে এসে 'উন্মাদের দিনপঞ্জি'তে, হাসপাতালের খাটে ড্রেসিং-গাউন গায়ে বসে আছেন তিনি, অসংযত রকমের না কামানো মেয়েলি মুখ দীর্ঘ, যন্ত্রণাকর দীর্ঘ একটি মিনিট কেমন একটা নির্বোধ পুলকে ক্রমশ বাড়ন্ত অবাক বিস্ময়ে অসাড় বসে থেকে অবশেষে ধীরে, অতি ধীরে একটা আঙুল তুলে, অবিশ্বাস্য মন্থরতায় ও অকথ্য ভাবপ্রবণ মুখে, কুৎসিৎভাবে মুখ বেঁকিয়ে প্রতিটি শব্দ

টেনে টেনে বললেন: 'আজ-কের এই দি-নে...' গভীর আগ্রহে তাই দেখে ও শুনে দর্শকেরা সবাই তাঁকে নিয়ে পাগল! পরের দিন লিউবিম তর্ৎসভের ভাণ করে আরো চমৎকার দেখালেন. আর তার পরের দিন বনে গেলেন মার্মেলাদভ — ঝুল লাগা মুখে, টকটকে লাল নাকে বললেন: 'প্রিয় মহাশয়, আপনার সহিত সশ্রদ্ধ বাক্যালাপের দুঃসাহস কি করিতে পারি?' —আর সেই পত্র লেখিকা বিখ্যাত অভিনেত্রীটি, হঠাৎ সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা লেখার অভিলাষ হওয়াতে ডেস্কে বসে শুকনো কলম শুকনো দোয়াতে ডুবিয়ে এক নিমেষে খসখস করে পাতায় তিনটে লম্বা আঁচড় দিলেন, চিঠিটা খামে পুরে ঘণ্টা বাজানোতে ছোট সাদা অ্যাপ্রন পরা সুশ্রী পরিচারিকা এসে হাজির, তাঁকে সংক্ষেপে কঠোর সুরে বললেন: 'এখ্খুনি পাঠিয়ে দাও এটা!' — আর প্রত্যেকবার থিয়েটার থেকে ফিরে এসে রাত তিনটে পর্যন্ত চলত আমাদের চেঁচামেচি, ঘুম হত না আভিলভার; তখন আমি যে শুধু বাপান্ত করছি উন্মাদ, তর্ৎসভ ও মার্মেলাদভকেই নয়, গোগল, অস্ত্রভ্স্কি ও দস্তয়েভ্স্কিও বাদ যেতেন না...

— আচ্ছা ধরোই না, তুমিই ঠিক বলছ, — বিবর্ণ

মুখে ও চেঁচিয়ে উঠত, চোখজোড়া কালো হয়ে গেছে বলে অসাধারণ সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে, — এত ক্ষেপে যাবার কী আছে এতে? ওকে জিজ্ঞেস করো তো, নাদিয়া!

উত্তরে চেঁচিয়ে বলতাম, — কারণ, কারণ এই যে, 'সুবাস' কথাটা 'সু-বা-স!' উচ্চারণ করছে শুনলে যে কোনো অভিনেতাকে গলা টিপে মেরে ফেলার ইচ্ছে আমি দাবাতে পারি না!

ওরিওল সমাজের লোকেদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতের পর প্রতিবার ঠিক এমনি ঝগড়া লেগে যেত। তীব্রভাবে চাইতাম আমার দর্শনশক্তি, আমার সেয়ানা তীক্ষ্ন মনের সব প্রসাদের ভাগ নিক ও; ইচ্ছে হত আশেপাশের সবাই ও সবকিছু নিয়ে আমার ধারালো সমালোচনা সংক্রামিত হোক ওতে, কিন্তু হতাশায় দেখতাম যে আমার সব ধ্যানধারণা ও অনুভূতির অংশীদার ওকে করার চেষ্টার ফল হত ঠিক উল্টো। একদিন বললাম:

— যদি শুধু জানতে আমার কত শত্রু!

— কেমন শত্রু? — ও জিজ্ঞেস করল। — কোথায়?

— সব রকমের শত্রু, সর্বত্র: হোটেলে, দোকানে, বাজারে, রাস্তায়, স্টেশনে...

— কিন্তু কে তারা?

— কে আবার, সবাই, সক্কলে! গুচ্চির জঘন্য মুখ আর শরীর! জানো, এমনকি সেণ্ট পল পর্যন্ত বলেছিলেন: 'সব প্রাণীর দেহ সমান নয়: কিন্তু মানুষের দেহ এক ধরনের, পশুদের অন্য...' কয়েক জনের দেহ তো একেবারে বীভৎস! যেভাবে তারা পা রাখে, যেভাবে দেহ এগিয়ে দেয় দেখলে মনে হয় এই সবেমাত্র চার পায়ে হাঁটা ছেড়েছে! এই ধরো, কাল বল্খভস্কায়া স্ট্রীটে অনেকক্ষণ একটি বৃষস্কন্ধ তাগড়া পুলিসম্যানের পিছু পিছু গিয়েছিলাম। আমার চোখজোড়া যেন আটকে ছিল ওভারকোটে ঢাকা ওর বিরাট পিঠে, চকচকে, বেজায় ফেঁপে-ওঠা টপ বুটের ওপরে পায়ের গোছে, সত্যি, ফেঁপে-ওঠা টপ বুটে, তাদের কড়া গন্ধে, শক্ত ছাই-রঙা ওভারকোটের কাপড়ে, বেল্টের বোতামে, ফৌজী সাজে সেই চল্লিশ বছরের বলিষ্ঠ জানোয়ারটার সবকিছুতে আমার কী দারুণ বিতৃষ্ণা আর আহ্লাদ!

— তোমার কি কোনো লজ্জা নেই! — সবিদ্বেষ করুণায় সে বলল। — তুমি সত্যি কি এত সাংঘাতিক নীচ লোক? একেবারে বুঝি না তোমাকে। অসম্ভব পরস্পরবিরোধী মালমশলায় তৈরী তুমি!

৯

তবুও সকালে অফিসে পেঁছিয়ে হুকে ওর ছাই-রঙা পশমের কোট দেখে ক্রমশ উষ্ণ আনন্দে ভারি ভালো লাগত, মনে হত ওটা ও নিজে, আর তা না হলেও ওর শরীরের মধুর একটি অংশ তো; কোটের নীচে দাঁড় করানো ছাই-রঙা প্রিয় গালোসজোড়া, মধুর মনভোলানো একটি অংশ ওর। ওকে দেখার ব্যগ্রতায় সবায়ের আগে অফিসে পেঁছতাম, — কাজ হাতে নিয়ে মফস্বল থেকে পাঠানো রিপোর্টে চোখ বুলিয়ে সংশোধন করতাম, পড়তাম কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র, তাদের মধ্য থেকে বানাতাম 'আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতার টেলিগ্রাম' সব, স্থানীয় লেখকদের রম্য রচনার কোনো-কোনোটা প্রায় নতুন করে লিখতাম সবটা; এদিকে সর্বক্ষণ থাকতাম প্রতীক্ষায় — শেষে এই তো ওর দ্রুত পদক্ষেপ, ওর স্কার্টের খসখস শব্দ! ঠাণ্ডা সুগন্ধি হাত, রাত্রে ভালো ঘুমের পর বিশেষ করে দীপ্ত ওর চোখে যৌবনসুলভ একটি আভা — মনে হত নতুন মানুষ, ছুটে আমার কাছে এসে এদিক-ওদিক একবার তাকিয়ে ও চুমু খেত আমাকে। কখনো-সখনো হোটেলে আসত, গায়ে লেগে থাকত, শীতের আর ঠাণ্ডা

ফারকোটের গন্ধ। আপেলের মতো কনকনে ওর গালে চুমু খেয়ে কোটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে ওর দেহের ও পোষাকের উষ্ণতা ও মধুরতাকে স্পর্শ করতাম, আর ও হাসতে হাসতে, — 'ছেড়ে দাও বলছি, আমি কাজে এসেছি!' বলে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করত। ঘণ্টা বাজিয়ে বেয়ারারকে ডেকে বলত আমার ঘরটা ঠিক করে দিতে, সাহায্যও করত নিজে...

অজান্তে একবার আভিলভার সঙ্গে ওর কথাবার্তা শুনে ফেলেছিলাম; ডাইনিং-রুমে সন্ধ্যেবেলায় বসে আমাকে নিয়ে বেশ খোলাখুলি আলোচনা চলছিল, ভেবেছিল আমি ছাপাখানায়। আভিলভা বলল:

— কিন্তু, লিকা ভাই, ভবিষ্যতে কী হবে? ওর প্রতি আমার মনোভাব তুমি জানো, বেশ লোক ও, কোনো সন্দেহ নেই। কেন যে তোমার মোহ, খুব ভাল করে বুঝি... কিন্তু তারপর?

গভীর খাদে যেন পড়লাম। তাহলে আমি 'বেশ লোক', আর কিছু নয়! 'মোহ' ছাড়া আর কিছু নেই ওর!

ওর উত্তর যা শুনলাম আরো ভয়াবহ:

— কী করব বলো? কোনো তো উপায় দেখছি না...

এমন তীব্র একটা রাগ ভেতরে ফুঁসিয়ে উঠল যে

আর একটু হলে ডাইনিং-রুমে ছুটে গিয়ে চেঁচিয়ে বলতাম উপায় একটা আছে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেও আমি ওরিওল ছেড়ে চলে যাব, কিন্তু হঠাৎ ও বলল:

— কিন্তু, নাদিয়া, তুমি কি বোঝো না কেন যে আমি ওকে খুব ভালোবাসি? তাছাড়া সত্যি বলতে তুমি ওকে চেনো না — যা দেখায় তার চেয়ে হাজার গুণ ও ভালো...

হ্যাঁ, আমি আসলে যা, তার চেয়েও অনেক খারাপ ঠেকতে পারত। চাপা অস্থিরতায় দিন কাটত আমার, প্রায়ই লোকের সঙ্গে ব্যবহার হত কর্কশ, উদ্ধত, একটুতে মন ভরে যেত বিষাদে ও হতাশায়; কিন্তু চট করে মেজাজ বদলে যেত যখন দেখতাম আমাদের শান্তি ও ঐক্যতানের ব্যাঘাত ঘটাতে, ওকে কেড়ে নিতে চেষ্টা করছে না কেউ: আর সঙ্গে সঙ্গে দিলদারী, খোলাখুলি ও সুখী হবার সহজাত প্রবৃত্তিটা আসত ফিরে। পার্টিতে হয়ত যাচ্ছি, নিশ্চিত জানি ওখানে গেলে আমার কোনো ক্ষতি বা গ্লানি হবে না, তখন কী খুশিতে যাবার মহড়া, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ধোপ দুরস্ত হবার ঘটা, কী তারিফ করা নিজের চোখের, গালের যৌবনসুলভ রক্তাভ ছোপের, ধবধবে সাদা মাড়-দেওয়া শার্টের, — সদ্য কাচা ভাঁজে ভাঁজে আটকে থাকা মাড়-দেওয়া শার্টটা খোলার

সময় কী সুন্দর ফরফরানি! ঈর্ষার জ্বালায় না দগ্ধালে ভয়ানক ভালো লাগত বল-নাচ। বল-নাচের জন্য তৈরী হবার সময় প্রত্যেকবার নিদারুণ কয়েকটি মুহূর্তের ভোগানি সইতে হত, — আভিলভার বিগত স্বামীর ড্রেস-কোটটা বাধ্য হয়ে চাপাতে হত, সত্যি বটে কোটটা একেবারে নতুন, আমার বিশ্বাস একবারও পরা হয় নি, তবু সেটা মরমে মরমে আমাকে বিঁধত। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে যখনি বুক ভরে নিতাম ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া, দেখতাম তারার ছিটে লাগা আকাশ, শ্লেজে বসতাম তখনি জুড়িয়ে যেত সব জ্বালা... বল-নাচের সময় উজ্জ্বল আলোকিত প্রবেশ-দ্বারের ওপর কেন লাল ডোরা-কাটা চাঁদোয়া টাঙ্গানো হত, কেনই বা গাড়ি ও শ্লেজ নিয়ন্ত্রিত করা পুলিসরা দেখাত নিষ্ঠুর রোয়াব, ভগবান শুধু জানেন! যাই হোক — বল-নাচ ছিল এরকম ব্যাপার, অদ্ভুত চেহারার প্রবেশ-দ্বারের সামনে ঝকঝকে উজ্জ্বল আলো বিকিরিত পদদলিত চিনির মতো বরফে, তড়িঘড়ি কর্মপটুতার একটা ভাব, পুলিসের কড়া হুকুম, তাদের ছুঁচলো গোঁফ ঠাণ্ডায় জমাট, পালিশ করা টপবুটের ঠকঠক বরফে, বোনা সাদা দস্তানায় মোড়া হাত পকেটে ঢুকনো, কনুইগুলো অদ্ভুতভাবে বেঁকানো। পুরুষেরা প্রায় সবাই উর্দি

পরিহিত, — রাশিয়ায় এককালে উর্দির ছড়াছড়ি ছিল, — আর নিজের পদ ও উর্দি নিয়ে সবায়ের বেশ জাঁক ও উত্তেজনা, — আমি এখনই লক্ষ্য করেছিলাম যে এমনকি সারা জীবন উচ্চতম পদবী ও উচ্চতম পদের অধিকারী হলেও লোকে আজীবন সেটা সহজভাবে নিতে পারে না। অতিথিরা আসার সঙ্গে সঙ্গে আমারও চাঞ্চল্য হত শুরু, নিমেষের মধ্যেই তারা হত আমার চকিত তীক্ষ্ণ, বিরোধী খর দৃষ্টির লক্ষ্যবস্তু। কিন্তু মেয়েদের প্রায় সকলেই মধুর ও বাঞ্ছনীয়। ফারের টুপি ও হুড-দেওয়া ক্লোক হল-ঘরে খুলে ফেলার পর কী লাবণ্যময়ী তারা, ওদেরই জন্য তো চওড়া, লাল কার্পেট মোড়া সিঁড়ি, আয়নায় ঝাঁকে ঝাঁকে ওদেরই মোহিনী ছায়া পড়বে না তো আর কার পড়বে। তারপর — নাচের আগে বল-ঘরের সেই জমকালো শূন্যতা, তাজা কনকনে ভাব, হীরক ছটা বিচ্ছুরিত গুরুভার বাতি ঝাড়ে আলোর পুঞ্জ, প্রকাণ্ড পর্দাবিহীন জানলা, তখনো ফাঁকা পার্কেট-করা মেঝের ঝকঝকে প্রসার, তাজা ফুল, পাউডার, সেণ্ট, নরম সাদা দস্তানার গন্ধ, — ক্রমশ ভিড় করে আসা অতিথিদের দেখার উত্তেজনা, অর্কেস্ট্রার প্রথম গুরুগুরু ধ্বনির প্রতীক্ষা, কখন এই অনাহত মেঝেতে

ছুটে যাবে নাচের প্রথম জুড়ি — যে দুজনের আত্মবিশ্বাস সব থেকে প্রবল, সর্বদা যারা চটপটে।

সর্বদা আমি বল-নাচে রওনা হতাম তাদের আগেই। পেঁৗছিয়ে দেখতাম অতিথিদের গাড়ি তখন এসে থামছে, একতলায় আর্দালিরা বরফগন্ধি টপ-কোট, ফারকোট ও ফৌজী কোটের গাদা নিয়ে অস্থির, আর সর্বত্র যা ঠাণ্ডা, আমার পাতলা ড্রেস-কোটের পক্ষে বেজায় কনকনে। অন্য লোকের কোট আমার পরনে, চুল ফিটফাট আঁচড়ানো, পাতলা চেহারা আরো পাতলা দেখাচ্ছে, আমার দেহ ভারহীন, এখানে সবায়ের অপরিচিত, নিঃসঙ্গ আমি, — কী একটা খবরের কাগজে অদ্ভুত কী একটা কাজ করে বিচিত্র দাম্ভিক এই যুবকটি, — গোড়ার দিকে এত স্থির, এত আত্মসচেতন লাগত, এত দলছাড়া যে মনে হত আমি যেন একটি তুষার দর্পণ। ক্রমশ বাড়ত ভিড় আর হৈ-চৈ; সঙ্গীতের গর্জন আগের চেয়ে চেনা মনে হত, বল-রুমের দরজাগুলো তখনই লোকে ঠেসাঠেসি; ক্রমশ বাড়তির দিকে মেয়ের সংখ্যা, হাওয়া আরো ভারি, আরো উষ্ণ, কেমন যেন নেশা ধরে যেত, ভিড়ের মাঝে ভেসে যেতে যেতে আরো সাহসে তাকাতাম মেয়েদের দিকে, আরো ধৃষ্টতায় পুরুষদের দিকে, কোনো ড্রেস-কোট

বা উর্দি'র সঙ্গে ধাক্কা লাগলে আমার 'মাফ করুন'টা শোনাত ক্রমশ বেশী করে ভদ্র ও উদ্ধত... তারপর হঠাৎ দেখতাম ওদের, — ওই তো ভিড়ের মধ্যে মৃদু হেসে ধীরে পথ করে ওরা চলেছে, — আর হঠাৎ বুকটা ঘনিষ্ঠতা ও সঙ্গে সঙ্গে বিব্রত বিস্ময়ের একটা বোধে মুচড়ে থমকে দাঁড়াত: চেনা দুজনকে যেন চেনাও যায় না। বিশেষ করে ওর চেহারা — একেবারে আলাদা। এরকম সময় ওর যৌবন ও তন্বীভাব সর্বদা গভীর রেখা কাটত আমার মনে: করসেটে ক্ষীণ কটিতট আঁটো করে বাঁধা, সুন্দর গাউনে কী হালকা, শুচি খুশির ভাব, দস্তানার ওপর থেকে কাঁধ পর্যন্ত নগ্ন বাহু ছেলেমানুষের হাতের মতো কনকনে আর লালচে; তখনো অনিশ্চিত মুখভাব... চূড়া করে বাঁধা ওর চুল শুধু গণ্যমান্য মহিলার মতো... সবকিছুতে একটা বিচিত্র মনকাড়ানো ভাব, কিন্তু তারই সঙ্গে মনে হয় একটা কিছু আছে যেটা আমাকে এড়িয়ে যেতে, ঠকাতে চায়, এমনকি কলঙ্কের গোপন কামনার ছাপও তাতে। কিছুক্ষণ পরে কে যেন তাড়াতাড়ি ওর কাছে গিয়ে বল-রুমসুলভ ক্ষিপ্রভাবে একটু নীচু হয়ে অভিবাদন জানাল, আর ও হাত পাখাটা আভিলভাকে দিয়ে যেন অন্যমনস্কভাবে এবং লাবণ্যভরে ভদ্রলোকটির কাঁধে

হাত রেখে পায়ের আঙুলে ঘুরপাক খেয়ে ভেসে অদৃশ্য হয়ে গেল ওয়াল্‌জ্‌ নাচিয়েদের ভিড়ে, গোলমাল আর বাজনার মধ্যে। আর আমি তাকিয়ে দেখতাম বিদায়সুলভ একটা মনোভাবে, ইতিমধ্যে যেটা পরিণত হয়েছে কঠোর বিদ্বেষে।

বল-নাচে ছোটখাটো, প্রাণোচ্ছ্বল, সর্বদা হাসিখুশি ও ধীর আভিলভার তারুণ্য আর উজ্জ্বল লাবণ্যও আমার মনে দাগ কাটত। একটা নাচের আসরে সেবার প্রথম টের পেলাম ওর বয়স মাত্র ছাব্বিশ, আর নিজের মনের কথা মেনে নিতে ভয় পেয়ে সেই প্রথম হঠাৎ বুঝলাম সেই শীতকালে আমার প্রতি ওর মনোভাবে অদ্ভুত পরিবর্তনের কারণটা কী, — হয়ত ও আমাকে ভালোবাসে, ঈর্ষা করে আমাকে।

১০

তারপর এল দীর্ঘ বিরহের পালা।

তার সূত্রপাত হল ডাক্তার মশাইয়ের হঠাৎ আবির্ভাবে।

ঠাণ্ডা, রোদে-ভরা একটি সকালে অফিসে গিয়ে আচমকা নাকে এল অতি পরিচিত কী একটা

সিগারেটের কড়া গন্ধ, শুনলাম ডাইনিং-রুমে উত্তেজিত কথাবার্তা আর হাসির শব্দ। থমকে দাঁড়ালাম — কী ব্যাপার? সারা বাড়ি ধোঁয়ায় ভরে দিয়েছেন যিনি তিনি তাহলে ডাক্তার মশাই, কানে এল তাঁরই গলা, জোরে কথা বলছেন যেরকম উত্তেজিতভাবে সেটা বিশেষত্ব এক ধরনের মানুষের, যাঁরা একটা বয়সে পা দিয়ে বছরের পর বছর কাটান একেবারে না বদলে, নিটোল স্বাস্থ্যে, হরদম সিগারেট টেনে, ক্রমাগত বকবক করে। হতভম্ব লাগল — এই অপ্রত্যাশিত আগমনের উদ্দেশ্য কী? লিকার কাছে কিছু কি চান উনি? আর কী করে ঘরে আমি ঢুকি, আমার হাবভাব কেমন হওয়া উচিত? — অবশ্য দারুণ কিছু ঘটল না প্রথমে। চটপট নিজেকে সামলে ডাইনিং-রুমে ঢুকলাম, ঢুকে খুশিতে অবাক হলাম... সহৃদয় ডাক্তার মশাই সত্যি একটু বিব্রত বোধ করলেন, দোষ করে ফেলেছেন এমন একটা ভাবে হেসে তাড়াতাড়ি আমাকে জানালেন যে 'মফস্বল থেকে হাওয়া বদলের জন্য হপ্তা খানেকের' জন্য এসেছেন। তক্ষুণি চোখে পড়ল লিকাও উত্তেজিত, আর কী কারণে জানি না আভিলভাও। তখনো আশা করা যেত এর কারণ হল শুধু ডাক্তার মশাইয়ের অপ্রত্যাশিত আগমন, যিনি তাঁর বন গাঁ

থেকে এই এসে ট্রেনে সারা রাত কাটানোর পর অত্যন্ত রসিয়ে গরম চা পান করছেন অন্য লোকের ডাইনিং রুমে। আমি সবে টাল সামলে উঠছি এমন সময় বজ্রাঘাত: ডাক্তারের সব কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎ ধরা পড়ল আমার কাছে যে, তিনি একলা আসেন নি, সঙ্গে রয়েছে বগমলভ, আমাদের শহরের এই নবীন, ধনী ও এমনকি নামকরা চর্মব্যবসায়ীটি অনেক দিন ধরে লিকার পাণিপ্রার্থী। তারপর কানে এল ডাক্তার সহাস্যে বলছেন:

-- লিকা, ও বলে তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, মাথার ঠিক নেই, মন একেবারে ঠিক করে ফেলে এখানে এসেছে! দুর্ভাগা যুবকটির ভবিষ্যৎ তাই সম্পূর্ণভাবে তোমার হাতে: ইচ্ছে হলে করুণা করতে পারো ওকে, আর তা না হলে -- ওর জীবনটা একেবারে ছারখার করে দিতে পারো...

আর শুধু ধন আছে বলে বগমলভ যোগ্য পাত্র নয়: লোকটা চালাকচতুর, স্বভাবটা প্রাণবান আর প্রীতিকর, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করেছে, বিদেশ ঘুরে এসেছে, দুটো বিদেশী ভাষা জানে। প্রথম দর্শনে বড়ো বীভৎস ঠেকে লোকটাকে: গাজরের মতো লাল চুল পরিপাটিভাবে মাঝখানে টেরি কাটা, মুখটা পেলব ও

গোল, আর বপুটি বিকট, অমানুষিকভাবে মাংসল, অদ্ভুত পেল্লায় খেয়ে অস্বাভাবিক আয়তনের শিশুর মতো, কিম্বা যেন বিরাট বাচ্চা ইয়র্কশায়ারী শূয়োর, মেদ ও রক্তের চকচকে একটা পিণ্ড; অথচ শূয়োরটার সবকিছু এত চমৎকার, এত পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল যে কাছে থাকলে সুখ উপছে ওঠে মনে: নীল চোখদুটো আকাশের মতো স্বচ্ছ, মুখের রঙ অবিশ্বাস্য পরিষ্কার, আর ওর হাবেভাবে, হাসিতে, গলার স্বরে, চোখে ও ঠোঁটের খেলায় লাজুক ও মন-কাড়ানো গোছের কিছু একটা; হাত পা এত ছোট যে মনে নাড়া দেয়, বিলাতি কাপড়ের পোষাক, মোজা, শার্ট ও টাই সব সিল্কের। চট করে লিকার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম ওর মুখে বিব্রত মৃদুহাসি... আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে আগন্তুক মনে হল, হঠাৎ মনে হল এই বাড়িতে আমি অযাচিত, রবাহূত আর ওর প্রতি একটা বিদ্বেষ ফুঁসিয়ে উঠল...

তারপর কখনো ঘণ্টাখানেকও ওর সঙ্গে একা থাকতে পারি নি, সব সময় ও হয় বাবা নয় বগমলভের সঙ্গে। আভিলভার হেঁয়ালি ফূর্তির হাসি আর থামতে চায় না। বগমলভের সঙ্গে সে এত সাদর মিষ্টি ব্যবহার করতে লাগল যে প্রথম দিন থেকেই নিজের বাড়িতেই

আছে এমন একটা ভাব হল লোকটার, সকালে দেখা দিয়ে রাত পর্যন্ত থাকত, ঘুমোবার জন্য শুধু যেত হোটেলে। তাছাড়া যে সৌখীন নাটুকে দলের সভ্যা লিকা, — সেটা পিঠে পরবের সপ্তাহে একটা নাটক করার মহড়া দিতে শুরু করল, লিকার নির্বন্ধে তার বাবা ও বগমলভ দুজনেই ছোটখাটো ভূমিকায় নামতে রাজী হলেন। আমাকে লিকা বলত শুধু বাবার খাতিতে বগমলভকে প্রেম নিবেদন করতে দিচ্ছে সে, বন্ধুর প্রতি অভদ্র ব্যবহারে তিনি যাতে ক্ষুণ্ণ বোধ না করেন সে জন্য। আর ওকে বিশ্বাস করার ভাণ দেখিয়ে নিজেকে আমি রাখলাম কড়া শাসনে, এমনকি জোর করে যেতাম ওদের মহড়ায়, সেখানে ঈর্ষার জ্বালা ও অন্য সব ভোগান্তি চেষ্টা করতাম গোপন রাখতে: সত্যি ওর 'অভিনয়ের' করুণ চেষ্টা দেখে মরমে মরে যেতাম। সব মিলিয়ে প্রতিভার এই একান্ত অভাব ভয়াবহ দৃশ্য বটে! নাটকের পরিচালক একটি বেকার পেশাদারী অভিনেতা; স্বভাবতই সে কল্পনা করত তার মধ্যে প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ বর্তমান, নিজের জঘন্য থিয়েটারী অভিজ্ঞতায় কী তার আহামরি, লোকটার বয়স বলা মুশকিল, গদ-রঙা মুখের রেখাগুলো এত গভীর যে ইচ্ছে করে দাগ কেটে বসানো হয়েছে মনে করা যেত।

এ ভূমিকায় অভিনয় এ রকম, ও ভূমিকায় সে রকম হওয়া দরকার, গলাবাজি করে উপদেশ দেবার সময় চটে উঠত বার বার, এত অভদ্র তীব্রভাবে তিরস্কার করত যে রগের দাড়া দাড়া শিরাগুলো ফুলে উঠত, ওদের দেখানোর জন্য কখনো পুরুষ, কখনো মেয়ে সাজত, আর ওকে অনুকরণের চেষ্টায় সবায়ের প্রাণান্ত হবার জোগাড়, ওদের গলার প্রতিটি সুরে, ওদের প্রতিটি দেহভঙ্গি দেখে সে কী যন্ত্রণা আমার: অভিনেতাটা অকথ্য একেবারে, কিন্তু আরো বেশী অকথ্য হল তার সাকরেদরা। অভিনয় করার প্রয়োজনটা কী ওদের? কিসের জন্য অভিনয়? দলের মধ্যে ছিল 'বাহিনীর একটি মহিলা', যেকোনো মফস্বল শহরে এধরনের চরিত্র দেখা যায়, কাঠ-কাঠ চেহারার সাহসিকা একজন, আত্মপ্রত্যয়ে ভরা; ছিল একটি ভয়াবহ সাজের আইবুড়ী, সর্বদা তার অস্বস্তি, সর্বদা কিসের প্রতীক্ষায় যেন, ঠোঁট কামড়ানো বাতিক; ছিল দুই বোন, সব সময় একসঙ্গে থাকার ও চেহারার অদ্ভুত মিলের জন্য তাদের সবাই চেনে শহরে: দুজনেই লম্বা, মোটা কালো চুল, কালো ভুরু জোড় খেয়েছে নাকের ওপরে, দুজনেই মুখ খোলে কদাচিৎ — খাটি একজোড়া কালো জুড়ি ঘোড়া; প্রদেশপালের কনফিডেনশ্যাল সচিবও ছিল দলে, টাক

পড়তে শুরু করলেও বেশ কম বয়সী, সোনালি চুল লোকটির নীল চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসা, চোখের পাতা লাল, দীর্ঘ দেহ, মাড়-দেওয়া অতিশয় উঁচু কলার, বিরক্তিকরভাবে ভদ্র ও মার্জিত তার ব্যবহার; ছিল বিখ্যাত সেই স্থানীয় উকিলটি, বুকে ও ঘাড়ে চর্বির পাহাড় যেন, পাদুটো থপথপে — বল-নাচে তাকে দেখে সব সময় ভুল করে ভাবতাম লোকটি হল ড্রেস-কোট পরিহিত বাটলার. — ছিল একটি ছোকরা শিল্পী: গায়ে কালো মখমলের ওয়েস্ট-কোট, চুল ভারতীয়দের মতো লম্বা, পাশ থেকে ছাগলের মতো দেখতে মুখের রেখা সরু হয়ে নেমেছে ছাগল দাড়িতে, আধ-বোজা চোখে মেয়েলি একটা ভ্রষ্টাভাব এবং নরম টুকটুকে ঠোঁট যা দেখলে অস্বস্তি হত, পাছাটি স্ত্রীলোকের মতো...

অভিনয়ের রাত্রিও এসে পড়ল। যবনিকা ওঠার আগে সাজঘরে ঘুরে এলাম: উন্মাদাগার একেবারে, সাজগোজ, মেক-আপ চলেছে, চলেছে চেঁচামেচি, ঝগড়া, শৌচাগার থেকে ছুটে বেরিয়ে যাওয়া, এ-ওর গায়ে ধাক্কা, তাহলেও কেউ কাউকে চিনতে পারছে না — এত বিদ্ঘুটে তাদের সাজপোষাক, — একজন তো সত্যি সত্যি চাপিয়েছে বাদামি ড্রেস-কোট ও বেগুনি

পেণ্টুলেন, — এত প্রাণহীন তাদের পরচুলা, দাড়ি, রঙ মাখা অনড় মুখ, কপালে ও নাকে লাল পলস্তারের ছোপ, রঙ করা জ্বলজ্বলে চোখের ভুরু এত বেশী ও এত বেয়াড়াভাবে কালো করা যে চোখগুলো পিটপিট করছে ম্যানিকিনের মতো। লিকাকে হঠাৎ দেখে চিনতে পারি নি, এত অবাক হয়ে গেলাম — লাল পেলব সেকেলে ধরনের ফ্রকে, পুরু হলদেটে পরচুলায়, চকোলেট বাক্সের মতো সস্তা সুন্দর ও ছেলেমানুষি মুখে তাকে পুতুলের মতো দেখাচ্ছিল এত বেশী... হলদে চুল একটা ঝাড়ুদারের ভূমিকায় নামার কথা বগমলভের, তাই 'টাইপ চরিত্রের' যোগ্য পোষাকে তাকে সাজাবার চেষ্টায় কোনো ত্রুটি হয় নি, — আবার ডাক্তার মশাই নামবেন বুড়ো জ্যেঠা মশাই, অবসরপ্রাপ্ত একটি জেনারেলের ভূমিকায়: নাটক শুরু হল, প্রথম দৃশ্যে তিনি, গাঁয়ের বাড়িতে বেতের আরাম কেদারায় বসে আছেন খালি মেঝেতে পেরেক মেরে বসানো তক্তায় তৈরী সবুজ গাছের তলায়, মোটা সিল্কের স্যুট পরনে, তাঁরও গোটা মুখে টকটকে লাল রঙ মাখানো, দুধবরণ পেল্লায় গোঁফ, কেদারায় হেলান দিয়ে বিরক্তিতে চেয়ে আছেন সামনে বেশ খুলে-ধরা খবরের কাগজের দিকে, আর যদিও দৃশ্যটি হল গ্রীষ্মের একটি খাসা সকাল, তবু

তলা থেকে পাদদীপের আলোয় এত বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন যে গোঁফ আর চুল পাকা হওয়া সত্ত্বেও মনে হচ্ছে বয়স অসম্ভব কম; খবরের কাগজে চট করে চোখ বুলিয়ে বিরক্তিতে গজর-গজর করে কী একটা বলার কথা, কিন্তু তিনি খবরের কাগজের দিকে চেয়ে আছেন তো গাছেন, প্রম্পটারের মরিয়া ফিসফিসানি শোনা গেলেও মুখ দিয়ে একটা কথা বেরুল না। অবশেষে যখন লিকা পর্দার আড়াল থেকে ছুটে এসে (ছেলেমানুষের মতো চঞ্চল, মধুর উচ্চ হাসিতে) পেছন থেকে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চোখে হাত চেপে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল: 'বলো তো কে?' — শুধু তখনি তাঁর কথা ফুটল, ছেড়ে ছেড়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'ছাড় বলছি, ছাড় দুষ্টু মেয়ে, কে যে বিচক্ষণ জানা আছে আমার!'

প্রেক্ষাগৃহে আধো-আলো, আধো-অন্ধকার, স্টেজে উজ্জ্বল রোদের জোয়ার। সামনের সারিতে বসে একবার স্টেজটা দেখে নিয়ে আশপাশের লোকেদের দিকে তাকালাম; সে সারিতে সবচেয়ে ধনী, মেদে থলথল নাগরিকেরা আর উচ্চতম পদস্থ দারুণ জমকালো পুলিস ও ফৌজী বড়ো কর্তারা বসেছে, সবাই মন্ত্র মুগ্ধের মতো চেয়ে আছে স্টেজের দিকে, — তাদের দেহভঙ্গিতে

চাপা উত্তেজনা, মুখের হাসি যেন জমে গেছে... প্রথম অঙ্কের শেষ পর্যন্ত টেঁকা দায় হয়ে উঠল আমার কাছে। যে মুহূর্তে স্টেজে দুম করে একটা শব্দ হল — পর্দা পড়ো পড়ো তার লক্ষণ — তাড়াতাড়ি হল ছেড়ে চলে গেলাম। তখন অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মেজাজ রঙীন, তাদের অসংযত ফূর্তিজনক নানা উক্তি বিশেষ করে অস্বাভাবিক ঠেকল আটপৌরে আলোকিত বারান্দায়, যেখানে বুড়ো পরিচারক, সবকিছু যার গা সওয়া, আমাকে সাহায্য করল কোট পরতে। রাস্তায় ছুটে বেরিয়ে এলাম অবশেষে। সর্বনেশে নিঃসঙ্গতার একটি বিচিত্র অনুভূতি ক্রমশ বেড়ে গভীর উচ্ছ্বাসে পরিণত হল আমার মনে। রাস্তাঘাট জনশূন্য, পরিষ্কার, নিশ্চল আলো ছড়াচ্ছে রাস্তার বাতি। বাড়ি না গিয়ে গেলাম অফিসে, হোটেলের ছোট ঘরটা বড্ডো ভীতিকর। অফিস এলাকাটা পেরিয়ে ফাঁকা চকে ঢুকলাম, সেখানে গির্জার অল্প ঝকঝকে সোনালি গম্বুজ নক্ষত্রখচিত আকাশে অদৃশ্য... বরফে আমার বুটের মচমচানিতে অত্যন্ত গভীর ও ভয়াবহ কী একটা যেন... বাড়িটা গরম, চুপচাপ, শান্তিতে ভরা, আলোকিত ডাইনিং-রুমে ঘড়ির মন্থর টিকটিক শব্দ। আভিলভার ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে, তার আয়া সদর দরজা খুলে ঘুমে-

ভরা চোখে আমার দিকে চেয়ে পা টেনে টেনে চলে গেল। সিঁড়ির পাশের সেই ঘরটায় গেলাম যে ঘরটা আমার অতি-পরিচিত, অতি অর্থঘন। অন্ধকারে পুরনো সোফায় বসলাম, সেটা এখন মনে হল কেমন যেন করাল... মনে মনে চাই অথচ ভয় করি সেই মুহূর্তটি যখন গাড়ি চেপে ওরা সবাই এসে পড়বে বাড়িতে, এক সঙ্গে কথা বলতে বলতে, হাসতে হাসতে হৈচৈ করবে, চা খেতে বসবে, চলবে মতের বিনিময়, — কিন্তু সবচেয়ে বেশী আমার আতঙ্ক সেই মুহূর্তটিতে যখন আমার কানে আসবে ওর হাসি, ওর কণ্ঠস্বর... সারা ঘরে ওর ছাপ, সারা ঘরে ওর অনুপস্থিতি, ওর উপস্থিতি, ওর সবকিছুর গন্ধ, — ওর নিজের, ওর গাউন, ওর সেণ্ট, সোফার হাতায় আমার পাশে পড়ে থাকা ওর নরম ড্রেসিং-গাউনের গন্ধ... জানলা দিয়ে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হিম, নীল রাত, গাছের কালো ডালপালার পেছনে তারার ঝকঝকে দীপ্তি...

লেণ্টের প্রথম সপ্তাহে ও চলে গেল ওর বাবা ও বগমলভের সঙ্গে (বগমলভকে প্রত্যাখ্যান করার পর)। কিন্তু চলে যাবার বেশ কিছু দিন আগেই কথা বন্ধ করে দিয়েছিলাম ওর সঙ্গে। জিনিসপত্র গোছগাছের

সময় সারাক্ষণ ও কাঁদল, মনে মনে আশা ছিল হঠাৎ হয়ত ওকে বাধা দিয়ে যেতে দেব না।

১১

লেণ্ট চলেছে; মফস্বল শহরে উপবাসপর্ব জোর পালন করা হয়। গাড়োয়ানেরা রাস্তার কোণে বেকার দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে বুক বরাবর হাত সজোরে দোলায় গরম হবার চেষ্টায়, কোনো অফিসার হেঁটে গেলে ভয়ে ভয়ে কেবল ক্ষীণকণ্ঠে ডাকে: 'হুজুর, পক্ষিরাজে চাপবেন না কি?' আসন্ন বসন্তের আভাস পেয়ে অস্থির আনন্দে ডাকে কাক, কিন্তু দাঁড়কাকদের ডাক তখনো কর্কশ কঠোর।

বিশেষ করে রাত্রিবেলায় আমার বিরহ ভয়ংকর মনে হত। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যেত, অভিভূত হয়ে ভাবতাম: কী করে বাঁচি এখন, বেঁচে থেকে লাভ কী? অর্থহীন রাত্রির অন্ধকারে, হাজারো অচেনা মানুষের ভিড় ঠেসা এই বিচিত্র মফস্বল শহরে, সারা রাত্রি সরু যে জানলাটাকে ভেবেছিলাম দীর্ঘ, ধূসর, নির্বাক শয়তান সেই জানলা দেওয়া হোটেলের ঘরে কী জানি কেন যে লোকটি শুয়ে আছে — সে কি আমি? শহরে

আমার একমাত্র বন্ধু হল আভিলভা। কিন্তু সত্যি কি ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু? আমাদের এই ঘনিষ্ঠতা দ্ব্যর্থব্যঞ্জক, খাপছাড়া...

সকাল সকাল আর অফিসে হাজির হই না। আমাকে আসতে দেখলে মৃদু হেসে অভ্যর্থনা জানায় আভিলভা। আমার সঙ্গে ওর ব্যবহার আবার কমনীয় মধুর, আমাকে নিয়ে আর ঠাট্টা তামাসা করে না, ওর মধ্যে এখন যা দেখি তা হল আমার প্রতি স্থির প্রেম, সাগ্রহ সহানুভূতি ও আদরযত্ন। প্রায়ই সন্ধ্যেবেলাগুলো কাটে একলা ওর সঙ্গে, — ও পিয়ানো বাজায়, আমি সোফায় আধো-শুয়ে সঙ্গীতের স্বর্গসুখে, সঙ্গীতে তীব্রতর হৃদয়ের ব্যথায় ও সকলকে ক্ষমা করার মতো একটা গভীর স্নেহের উপলব্ধিতে উদগত অশ্রু জল চোখ বুজে সামলাতাম। অফিসের সাধারণ ঘরে ঢুকে সর্বদা ওর ছোট্ট হাতে চুমু খেয়ে যেতাম সম্পাদকীয় দপ্তরে। সেখানে থাকতেন সিগারেট মুখে শুধু একটি লোক, যিনি সম্পাদকীয় লেখেন। লোকটা বোকা, চিন্তাকুল, পুলিসের নজরবন্দীতে ওরিওলে নির্বাসিত তিনি। চেহারাটা কেমন যেন অদ্ভুত: চাষীদের মতো দাড়ি রেখেছেন, পরনে ময়লা, খয়েরী রঙের ঘরে বোনা পদ্দিওভ্‌কা, পায়ে আলকাতরা দেওয়া টপবুট, তীব্র

অথচ প্রীতিকর একটা গন্ধ। বাঁ হাত সর্বস্ব লোকটা, ডান হাতের অর্ধেকটা কী কারণে যেন নেই, হাতায় ঢাকা নুলো হাতে ডেস্কে কাগজ চেপে ধরে লিখতেন বাঁ হাতে: বসে বসে সিগারেটে জোর টান দিয়ে অনেকক্ষণ ভাবতেন, তারপর হঠাৎ নুলো হাত দৃঢ়তরভাবে কাগজে চেপে শুরু হত তার দ্রুত ও পূর্ণোদ্যমে লেখা, বাঁদরের মতো ক্ষিপ্র পটুতায়। তারপর সাধারণত হাজির হতেন বিদেশী সংবাদের সমীক্ষক; খাটো পা ছোট গোছের বৃদ্ধ, বিস্মিত চোখে চশমা। খরগোশের লোমের আস্তর দেওয়া ছোট জ্যাকেট ও কানঢাকা নামানো ফিনল্যাণ্ডীয় টুপি হল-ঘরে খুলে রাখতেন, ছোট টপবুটে, পেণ্টুলেন ও সরু চামড়ার বেল্টে আটকানো ফ্লানেলের শার্টে তাঁকে তখন ঠিক দেখাত দশ বছরের বেঁটে খাটো ছোঁড়ার মতো; ঘন কাঁচা-পাকা চুল হিংস্রের মতো খাড়া খাড়া, বিভিন্ন দিকে খোঁচা খোঁচা, তাতে তাঁকে দেখতে সজারুর মতো, বিস্মিত চশমাটাও হিংস্র; তিনি সর্বদা সঙ্গে করে দুটো বাক্স আনতেন অফিসে, একটাতে সিগারেটের কাগজ, অন্যটাতে তামাক, কাজ করার সময় ক্রমাগত সিগারেট বানাতেন, রাজধানীর খবরের কাগজে ঝানু চোখ বোলাতে বোলাতে হালকা হলদে রঙের আঁশ-আঁশ

তামাক তামার পাতলা একটা নলে গ‍ুঁজে অন্যমনস্কভাবে কাগজ হাতড়ে, নলটার বাঁট নরম শার্টের ব‍ুকে আর নলটা কাগজে টিপে স‍ুকৌশলে টেবিলের ওপর ছ‍ুঁড়তেন সিগারেটটা। তারপর আসত কাগজের মেক-আপ করে যে সে, আর প্র‍ুফ-রিডার। মেক-আপের লোকটি ঢুকত একটা ধীরস্থির স্বাধীনভাবে: আশ্চর্য ভদ্র, স্বল্পভাষী ও দ‍ুর্জ্ঞেয়; আদমিটি অসম্ভব রোগা ও শ‍ুকনো, জিপসিস‍ুলভ কালো চুল, সবজে জলপাই রঙ, ছোট কালো গোঁফ, ছাই-রঙা মরা ঠোঁট; কালো পেণ্টুলেন ও খড়খড়ে বড়ো ওলটানো কলার দেওয়া নীল স্মকে সর্বদা ফিটফাট ও নিখ‍ুঁত — সবকিছ‍ু ঝকঝকে তকতকে; মাঝে মাঝে তার সঙ্গে ছাপাখানায় কথা বলতাম; তখন মৌনব্রত ভেঙে, কালো চোখে আমার দিকে অচঞ্চল কঠোরভাবে তাকিয়ে, গলার স‍ুর না তুলে বাতচিত শ‍ুর‍ু করত, যেন দম দেওয়া প‍ুতুল, বক্তব্যের বদল হত না কখনো: দ‍ুনিয়ার সর্বত্র, সর্বদা সবকিছ‍ুতে অন্যায়ের রাজত্ব। প্র‍ুফ-রিডারের ঘর ছেড়ে যাওয়া-আসার বিরাম নেই, — যে প্রবন্ধের প্র‍ুফ দেখছে তাতে নির্ঘাত কিছ‍ু একটা তার বোধগম্য হয় নি, নয় ভালো লাগে নি এমন জিনিসের অভাব কখনো হত না, লেখকের কাছে এসে হয় বোঝাতে, নয় বদলাতে

অনুরোধ করত; এসে বলত: 'মাফ করুন, এ জিনিসটা কিন্তু ঠিকমতো বলা হয় নি'; লোকটি মোটাসোটা ও বেঢপ, কোঁকড়ানো চুল ভিজে ভিজে দেখতে, নেশায় চুর হয়ে আছে পাছে কেউ বুঝে ফেলে, সেই ভয়ে অস্থির হয়ে ঘাড় গুঁজে থাকত, কিছু জিজ্ঞেস করতে হলে মদের গন্ধে ভুরভুর নিশ্বাস চেপে লোকের ওপর ঝুঁকে পড়ে চকচকে ফোলা আর কম্পিত হাত বাড়িয়ে দেখাত কোনটা সে বোঝে নি বা কোনটা তার মতে সমীচীন নয়। ঘরে বসে অন্যমনস্কভাবে আমি অন্যদের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করে যেতাম, কিন্তু বেশীর ভাগ সময় জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ভাবতাম: নিজে কী লিখব, কী ভাবে লিখব?

তখন আমার আর একটি গোপন জ্বালা শুরু হয়েছে, আর একটি তিক্ত ও অবাস্তব 'স্বপ্ন'। আবার লেখা ধরেছি, — গদ্য বেশীর ভাগ, — আর সেগুলো ফের ছাপা হচ্ছে। কিন্তু যা লিখেছি, যা ছাপা হয়েছে তাতে আমার মন নেই। অন্য কিছু, যা পারি ও লিখি তা নয়, যা পারি না এমন কিছু, সম্পূর্ণ অন্য কিছু লেখার বাসনায় যন্ত্রণা পেতাম। ভাবতাম জীবন যা দিয়েছে তার প্রসাদে নিজের অন্তরে সত্যিকার লেখকের যোগ্য কিছু একটা গড়ে তোলা, — কত না বিরল

আনন্দের ব্যাপার, — কত না আধ্যাত্মিক উদ্যমের কথা। তাই ক্রমশ আমার জীবন হয়ে দাঁড়াল এই 'অবাস্তব স্বপ্নের' সঙ্গে লড়াইয়ের সামিল, নতুন ও সমানে পলাতক সেই আনন্দের সন্ধান ও জয়, তার অনুসরণ, তার বিষয়ে অহরহ চিন্তা।

ডাক আসত দুপুরবেলায়। অফিসের সাধারণ ঘরে এসে আবার দেখতাম আভিলভা ঝুঁকে কাজ করে চলেছে, সুন্দর চুল সযত্নে বিন্যস্ত, ওর সবকিছু এত মিষ্টি মনে হয়: টেবিলের তলায় দানাদার চামড়ার জুতোর কোমল দীপ্তি, কাঁধে পশমের কেপ, জানলা দিয়ে আসা ধূসর শীতের দিনের আলোয় চিকচিকে সেটাও; জানলার বাইরের বরফ পড়া, আকাশটা মরাখেকো কাকের মতো ধূসর। ডাক থেকে রাজধানীর সবচেয়ে হালের সাময়িক পত্রিকাগুলো বেছে নিয়ে তাড়াতাড়ি পাতা কাটতাম... চেখভের নতুন গল্প! শুধু নামটা দেখে এত বিচলিত লাগত যে প্রথম কটা লাইন এমনকি পড়া অসাধ্য — আগে থেকেই একটা ঈর্ষিত তৃপ্তি যেন টের পেতাম! এদিকে আরো লোকের আগমন ও প্রস্থান: বিজ্ঞাপনদাতা কয়েকটি, আর লেখার তাড়নায় অধীর নানা ধরনের কত লোক: আঙ্গোরা মাফলার গলায়, হাতে দস্তানা জমকালো একটি বৃদ্ধ বড়ো

সাইজের সস্তা কাগজের ব্যাণ্ডেল নিয়ে হাজির, প্রথম পৃষ্ঠায় খাগড়ার কলমের যুগের সেই মুন্সিয়ানী বাহাদুরিতে লেখা 'গান ও মনের কথা', একটি অত্যন্ত কাঁচা বয়সের অফিসার লজ্জায় টকটকে লাল হয়ে উঠে পাণ্ডুলিপিখানা দিয়ে সংক্ষেপে ভদ্র ও স্পষ্টভাবে অনুরোধ জানালেন যে লেখাটা পড়ে যদি ছাপাই তাহলে যেন তাঁর আসল নাম গোপনই রাখা হয় -- 'শুধু নামের আদ্যক্ষর ছাপাবেন দয়া করে, অবশ্য যদি সেটা আপনাদের কাগজের নিয়ম বহির্ভূত না হয়।' অফিসারটির পর — উদয় হলেন টপ-কোটের গরমে ও উত্তেজনায় ঘর্মাক্তকলেবর একটি যাজক। Spectator ছদ্মনামে তিনি ছাপাতে চান তাঁর 'গ্রাম্য দৃশ্যাবলী', তারপর আগমন হল জেলা এ্যাটর্নির... অতিশয় ফিটফাট মানুষটি, নতুন গালোস, পশম দেওয়া নতুন দস্তানা, গন্ধ গোকুলের লোমাবৃত নতুন ওভারকোট, পশমের লম্বা নতুন টুপি এত ধীরেসুস্থে খুললেন যে বেজায় বিদ্ঘুটে মনে হল, ওপরকার সব পরিধেয় খুলে ফেলার পর দেখা গেল তিনি অত্যন্ত রোগা, দাঁতালো ও মাজাঘষা; ধবধবে একটি রুমালে গোঁফ মুছতে প্রায় আধ-ঘণ্টা লাগল তাঁর, আর আমি আমার লেখকসুলভ তীক্ষ্ন দৃষ্টির তারিফ করতে করতে

তাঁর প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি দেখতে লাগলাম লোলুপ চোখে।

'লোকটার দাঁত তো ফাঁক ফাঁক, গোঁফ জোড়া কী পুরু, আপেলের মতো ঢিপ কপাল থেকে চুল তো এরই মধ্যে হটতে শুরু করেছে, চোখগুলো কী চকচকে, চোয়ালের হাড়ের ওপর জ্বলজ্বলে অসুস্থ ছোপ, পাদুটো বড়ো আর চেপটা, বড়ো চেপটা হাতে কী বড়ো গোল গোল নখ! ওকে তো হতেই হবে মাজাঘষা, ফিটফাট, ধীরস্থির আর নিজের বপু বিষয়ে এত সাবধান, না হলে চলবে না যে!' আমি ভাবলাম।

আয়া বাগান থেকে বাচ্চাকে নিয়ে আসত দুপুরের খাবারের জন্য। হল-ঘরে ছুটে গিয়ে আভিলভা স্বচ্ছন্দে শিশুর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ওর ভেড়ার লোমের সাদা টুপি খুলে দিত, সাদা পশম দেওয়া ওর ছোট্ট ঘন নীল পদ্দিওভ্‌কার বোতাম খুলে দিয়ে চুমু খেত ওর ঠাণ্ডা জ্বলজ্বলে লাল গালে, আর ও নিজের কী একটা চিন্তায় মগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে অন্যমনস্কভাবে তাকাত এদিক-সেদিকে, জামাকাপড় খোলায় আর চুমুতে অনাগ্রহ তার, বাধা দিত না — আর আমি টের পেতাম যে হিংসেটা আমার হচ্ছে সবকিছুতে: বাচ্চাটার মাথামুণ্ডুহীন সুখ, মাতৃত্বের আনন্দ আভিলভার, আয়ার বয়সজনিত স্থিরতা। যাদের

জীবন সাধারণ ভাবনাচিন্তা ও কর্তব্যের ছকে ঢালা, যাদের জীবনে নেই প্রত্যাশা, নেই সেই সবচেয়ে বিচিত্র মানুষি পেশা, অর্থাৎ লেখা নিয়ে কল্পনাবিলাসী প্রস্তুতির বালাই, তাদের সবায়ের প্রতি ঈর্ষা হত আমার। হিংসে করতাম তাদের যাদের সহজ, সঠিক, সুনির্দিষ্ট কাজ আছে জীবনে, যে কাজ শেষ করার পর একেবারে স্বচ্ছন্দ চিত্তে গা ঝাড়া দিয়ে থাকা যায় পরের দিন পর্যন্ত।

লাঞ্চের পর সাধারণত আমি বেরিয়ে যেতাম। শহরে ভারি তুষার-পাতের চাদর, লেণ্টের সময়কার সেই বড়ো আলসে বরফকণা, যার কোমল, অদ্ভুত বিচিত্র সাদা রঙ দেখে বারবার ভুল করে মনে হয় সত্যি বুঝি বসন্তকাল আসন্ন। নিঃশব্দে ছুটে চলে গেল একটা গাড়ি, গাড়োয়ানের একটা গা ঝাড়া ভাব, হয়ত চট করে এক গেলাস মদ খেয়ে নিয়ে কিছু একটা ভালো, প্রীতিকর জিনিসের ধান্দায় আছে... এর চেয়ে মামুলি আর কী হতে পারে? কিন্তু এখন আমার মনে বিংধে বসে সবকিছু, এমনকি সবচেয়ে ক্ষণস্থায়ী যেকোনো ছাপ বিংধে বসে, আর বেংধার পর সঙ্গে সঙ্গে আগ্রহ হয় সেটাকে টিকিয়ে রাখার, যাতে সেটা অপচয়ে রেশ মাত্র না রেখে অদৃশ্য না হয়ে যায়, লোভের উদগ্র

তাড়নায় সেই ছাপটাকে নিজের খাতিরে আঁকড়ে ধরে কিছু একটা কাজে লাগাতে হয় আমাকে। ওই তো গাড়োয়ানটি একটা দাগ রেখে চলে গেল, আর সেই মুহূর্তটি এবং গাড়োয়ানটির সবকিছু দাগ রেখে গেল আমার মনে, বিচিত্র ঝাপসা সে স্মৃতি মিইয়ে থেকে অনেকক্ষণ বৃথায় মনে আনল গুরুভার। তারপরে এলাম একটি সমৃদ্ধ ভবনে, দেখলাম সামনে বরফকণার মধ্যে আবছা দাঁড়িয়ে আছে একটি চকচকে বার্নিশ করা গাড়ি, পেছনের বড়ো বড়ো চাকার তেল চটচটে টায়ার বসে গেছে পুরনো বরফে, লেগেছে গুঁড়ো গুঁড়ো নতুন বরফের পাউডার। যেতে যেতে তাকালাম ভারি কাঁধ সইসের পিঠের দিকে, গাড়ির সীটে উদ্যত বসে আছে গদির মতো পুরু মখমলের টুপি মাথায়, শীতকালে বাচ্চাদের গায়ে যেভাবে বেল্ট জড়ানো হয় সেভাবে বগলের তল দিয়ে বেল্ট আটা; হঠাৎ চোখে পড়ল গাড়ির কাঁচের দরজার ওধারে, সুন্দর পাতলা রঙের সাটিনের গদির মধ্যে বসে ছোট্ট মিষ্টি একটা কুকুর কাঁপতে কাঁপতে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন একটা কিছু বলবে এবার, কানদুটি তার ঠিক খুকিদের মাথায় বাঁধা বো-এর মতো। আর বিদ্যুৎ ঝলকে আনন্দ দীর্ণ করল আমাকে, মনে রাখতেই হবে কথাটা, খাটি বো।

লাইব্রেরীতে যেতাম। পুরনো লাইব্রেরীতে বইয়ের বিরল সম্ভার। কিন্তু কী বিষণ্ণ অযাচিত চেহারা! বাড়িটা পুরনো, অবহেলিত, হলটা বিরাট আর ফাঁকা, দোতলায় যাবার সিঁড়ি ঠাণ্ডা কনকনে, বনাত দেওয়া দরজায় ছেঁড়া ওয়েলক্লথ লাগানো। তিনটি ঘরে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত জীর্ণ বইয়ের সারি, লম্বা কাউণ্টার, ছোট একটা ডেস্ক, তদারকের ভার একটি ছোটখাটো, চেপটা বুক, বিরস বেজার মুখের চুপচাপ স্ত্রীলোকের ওপর, পরনে তার কালো ঘোলাটে রঙের কী একটা পোষাক, হাতদুটো বিবর্ণ অস্থিচর্মসার, মধ্যম আঙুলে কালির দাগ, ধূসর স্মক পরা ঝোড়োকাকের মতো দেখতে একটি ছোকরা তার ফাইফরমাস খাটে — ইঁদুরের মতো নরম মাথার চুল কাটা হয় নি অনেক দিন। 'পড়ার ঘরে' যেতাম, ঘরটা গোলপানা, ধোঁয়ার গন্ধ, মাঝখানের গোল টেবিলে 'বিশপ সমাচার' ও 'রুশী তীর্থযাত্রী'। আর একটি পড়ুয়ার সঙ্গে মোলাকাৎ না হয়ে যেত না — রোগাপানা ছেলেছোকরা স্কুলের ছাত্রটি খাটো জীর্ণ টপ-কোট গায়ে টেবিলে কাৎ হয়ে পড়ে ভারি একটা কেতাবের পাতা ওলটাত গোপন রহস্যের ভাবে, বলের মতো গোল পাকানো রুমালে চুপি চুপি বারবার নাক মুছত ছেলেটি...

নিঃসঙ্গতায় আর বইয়ের বাছাইয়ে শহরের মধ্যে অদ্ভুত আমরা দুজনে, আমরা ছাড়া সেখানে কে আর বসে থাকবে? ছেলেটি যা পড়ত স্কুলের ছাত্রের পক্ষে হাস্যকরভাবে বেমানান: 'পরচা'। আর গ্রন্থাগারিকা আমারও দিকে একটু অবাক হয়ে প্রায়ই তাকাত যখন চাইতাম 'উত্তরী মৌমাছি', 'মস্কো সমাচার', 'ধ্রুবতারা', 'উত্তরী পুষ্প' ও পুশকিনের 'সমসাময়িক'... নতুন নানা বইও পড়তাম — 'জীবনী বিচিত্রার': তবে পড়ার উদ্দেশ্য ছিল শুধু কিছু ভরসা পাওয়া তাদের কাছ থেকে, নামকরা লোকদের সঙ্গে নিজের একটা ঈর্ষান্বিত তুলনা করা... 'নামকরা লোক বটে!' কত অগুনতি কবি, ঔপন্যাসিক ও গল্প লেখকের সঙ্গে দুনিয়ার পরিচয় না হয়েছে, আর টিকেছেন মাত্র কয়েকজন! চিরকাল শুধু কয়েকজনেরি নামডাক! হোমার, হোরেস, ভার্জিল, দান্তে, পেত্রার্কা... শেক্সপীয়র, বায়রন, শেলী, গ্যেটে... রাসিন, মোলিয়ের. . সেই একই 'ডন কুইক্সোট', সেই 'মানন লেস্কট'... মনে আছে কী গভীর সম্ভ্রমের সঙ্গে সেই পড়ার ঘরে রাদিশ্চেভ প্রথম পড়েছিলাম — 'চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, মানবকুলের দুঃখযন্ত্রণার নিমিত্ত আমার হৃদয় বেদনায় দীর্ণ হইয়া গেল!'

দিন শেষ হবো-হবো, তখন লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে

এসে অন্ধকার ঘনিয়ে আসা রাস্তায় আস্তে আস্তে হাঁটতাম। গির্জার ঘণ্টার নরম আওয়াজের রেশ হাওয়ায়। দুঃখ হত নিজের প্রতি, মন কেমন করত ওর জন্য, বাড়ির জন্য, ঢুকতাম গির্জায়। সেখানেও সেই একই একটা অযাচিত ভাব: শূন্য অন্ধকার, কয়েকটি টিমটিমে মোমবাতি, কয়েক জন বুড়ো-বুড়ী। চাষার মতো মাথার মাঝখানে টেরি কাটা গির্জার ওয়ার্ডেন মোমবাতির কাউণ্টারের পেছনে ধর্মাবেগে নিশ্চল দাঁড়িয়ে বণিকজনোচিত তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে চোখ বুলিয়ে নিত সমবেত উপাসকমণ্ডলীর ওপর। চেপটা পা অতি কষ্টে টেনে দারোয়ান ঘুরে বেড়াত, হেলে পড়া, অতি তাড়াতাড়ি গলে যাওয়া একটা মোমবাতি ঠিক করে দাঁড় করিয়ে দিত, পুড়ে নিঃশেষ একটা বাতি ফুঁ দিয়ে দিল নিভিয়ে, পোড়া পোড়া মোমের গন্ধ উঠত ঘরে, বাতির শেষটা নিয়ে অন্য সব বাতির টুকরোর সঙ্গে মিশিয়ে বুড়ো হাতে দলা পাকিয়ে মোমের একটা তাল বানাত, — আর তাকে দেখে বোঝা যেত আমাদের এই পার্থিব বিদ্ঘুটে জীবন নিয়ে তার কত অবসাদ, কত না অবসাদ আমাদের নানা ক্রিয়াকর্মে — দীক্ষা, খৃষ্টের শেষ নৈশ ভোজন পর্বানুষ্ঠান, আমাদের বিবাহ ও সমাধিগমন, বছরের

পর বছর পালা করে আসা ভোজন ও উপবাস উৎসব। হাতাবিহীন জুব্বায় অদ্ভুত রোগা, অনাবৃত মাথা, মেয়েলিভাবে এলোমেলো চুল এলানো যাজক বেদীর বন্ধ সিংহদ্বারের দরজার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এত নীচু হয়ে প্রণাম জানাচ্ছেন যে বুক থেকে আলখাল্লা খসে করে মেঝেতে পড়ল, দীর্ঘশ্বাসের উচ্চকিত সুরে তিনি বলছেন: 'হে স্বর্গপতি, মোর জীবন মরণের অধিপতি...' ব্যাকুল অনুতপ্ত আঁধারে, বিষাদাচ্ছন্ন রিক্ততায় প্রতিধ্বনি উঠল তাঁর কণ্ঠস্বরের। নিঃশব্দে গির্জা থেকে বেরিয়ে এসে, আঁধার-করে-আসা ধোঁয়াটে আকাশের দিকে তাকিয়ে আবার বুক ভরে নিলাম শীতের হাওয়া, বসন্তের প্রতিশ্রুতি যাতে। একটি ভিখিরি ঘন পাকাচুল মাথা ভুয়ো বিনয়ে আমার সামনে নামিয়ে পাঁচ কোপেকের মুদ্রার আশায় হাত পাতল, পয়সা পেয়ে হাতের মুঠো শক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলে তাকালে হঠাৎ খুব অবাক হলাম — লোকটার জোলো, ফিরোজা নীল চোখদুটো একেবারে পাঁড় মাতালের, স্ট্রবেরির মতো প্রকাণ্ড নাকে তিনটে যেন বড়ো, থাক থাক সচ্ছিদ্র স্ট্রবেরি। আবার মনে আনন্দের কী জ্বালা: ভেবে দেখুন একবার, তিন থাকের স্ট্রবেরিসুলভ একটা নাক!

আঁধার-হয়ে-আসা আকাশ, আকাশের গায়ে পুরনো ছাদের কালো রেখা, দেখতে দেখতে চললাম বল্‌খভস্কায়া স্ট্রীট হয়ে, আর রেখাগুলির দুর্জ্ঞেয় সান্ত্বনার মাধুর্যে মন ভরে উঠল যন্ত্রণায়। মানুষের একটা পুরনো চালা — কেউ কি কখনো লিখেছে এ বিষয়ে? রাস্তায় রাস্তায় আলো জ্বলে উঠল, দোকানের জানলায় উষ্ণ দীপ্তি, ফুটপাথে হাঁটছে নানা কালো মূর্তি, আকাশ হয়ে উঠল আরো ঘন গভীর নীল, শহর আরো মধুর ও আরামের... কখনো কালো মূর্তিগুলোর একে, কখনো অন্যকে অনুসরণ করলাম গোয়েন্দার মতো, ওদের পিঠের দিকে, গালোসের দিকে তাকিয়ে চলেছি, ওদের কিছুটা বোঝার, ধরার, একেবারে ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করছি... আমি চাই লিখতে! লেখা উচিত এই সব ছাদ, গালোস আর পিঠের বিষয়ে, তবে 'স্বেচ্ছাচারী শাসন ও জুলুমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, পদদলিত নিঃসম্বল মানুষের রক্ষা, জলজ্যান্ত চরিত্র অঙ্কন, সমসাময়িক পৃথিবী, সাধারণের মনোভাব ও ধারার বিরাট চিত্রাঙ্কন' আমার উদ্দেশ্য নয়! পা চালিয়ে গেলাম অর্লিকের দিকে। সন্ধ্যা শেষ হয়ে রাত্রি নেমেছে, সেতুতে ইতিমধ্যে জ্বলেছে গ্যাসের দীপ্ত আলো, আলোর নীচে অনাবৃত লাল পা বরফে রেখে দাঁড়িয়ে আছে

ছন্নছাড়া একটি মেথর, মেচেতা পড়া, ফোলা-ফোলা মুখ, বিরস ক্ষীণ দৃষ্টি চোখ, পরনে কেবল একটা ছেঁড়া সুতির শার্ট আর লাল রঙের ছোট পাজামা, শার্টে হাত গুঁজে, নিজেকে জড়িয়ে টলছে লোকটা, কুকুরের মতো চোখ মেলে তাকাচ্ছে আমার দিকে, কুকুরের মতো কাঁপছে ঠকঠক ক'রে, কেঠো গলায় বিড়বিড় করে বলছে: 'হুজুর, হুজুর!' চোরের মতো তার ছবিটা চট করে পাকড়ে লুকিয়ে ফেললাম মনের মধ্যে, আর সেজন্য তাকে ছুঁড়ে দিলাম পুরো দশ কোপেকের একটা মুদ্রা... কী ভয়ংকর জীবন! কিন্তু সত্যি কি 'ভয়ংকর'? হয়ত 'ভয়ংকর' কথাটা এ ক্ষেত্রে চলে না একেবারে, প্রয়োজন সম্পূর্ণ অন্য কোনো একটা শব্দের? এই সেদিন এরই মতো একটা ছন্নছাড়া গরীব লোককে পাঁচ কোপেক ছুঁড়ে দিয়ে ছেলেমানুষের মতো চেঁচিয়ে বলেছিলাম: 'কী ভয়ংকর সত্যি তোমার বেঁচে থাকার ধরনটা!' আর আমার বোকামিতে হঠাৎ রেগে উঠে কী বেয়াড়া দৃঢ়ভাবে আমাকে জবাব দিয়েছিল লোকটা ভাঙা গলায়: 'এতে ভয়ংকর কিছুই নেই, বাবু!' — সেতু পেরিয়ে চোখে পড়ল বড়ো একটা বাড়ির একতলায় মাংস বিক্রেতার পুরু কাঁচের জানলায় চোখ ধাঁধানো আলো, জানলায় অজস্র ধরনের সসেজ

ও হ্যামের এত ছড়াছড়ি ও সমারোহ যে দোকানের সাদা ঝকঝকে ভেতরটা প্রায় চোখে পড়ে না, সেখানেও গাদাগাদি করে সসেজ ও হ্যাম ঝোলানো। জানলার রক্তাভ আলো আমার ওপর পড়ল, পাশ দিয়ে যেতে যেতে আক্রোশে ভাবলাম: 'সামাজিক বৈষম্যই বটে!' যেন কাকে হুল ফোটানোর মৎলব। যেতাম গাড়োয়ানদের চায়ের আড্ডায় মস্কভ্স্কায়া স্ট্রীটে। সেখানে হৈচৈ, ঠেসাঠেসি ও ভ্যাপসা গরমের মধ্যে বসে চেয়ে চেয়ে দেখতাম মাংসল টকটকে লাল মুখ, লালচে বাদামী দাড়ি, সামনে রাখা রঙচটা ট্রেতে দুটো সাদা চায়ের কেটলি, হাতল ভিজে জবজবে সুতোয় বাঁধা ঢাকনিতে। জনগণের জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ করতাম ভাবছেন? মোটেই নয় — দেখতাম শুধু ট্রেটা, ভিজে জবজবে সুতোটা!

১২

মাঝে মাঝে হাঁটতাম রেলওয়ে স্টেশনের দিকে। বিজয় তোরণ পেরোলে রাস্তাঘাট অন্ধকার, ছোট শহরের রাত্রির সেই ঘোলাটে অন্ধকার। তারপর দেখতাম ছোট একটি মফস্বল শহর, অজানা, শুধু আমার কল্পনাপ্রসূত, কিন্তু

এত জবলজ্যান্ত যে মনে হয় সারা জীবন কাটিয়েছি সেখানে। দেখতাম বরফচাপা চওড়া রাস্তা, বরফের কালো কালো হতচ্ছাড়া কুঁড়ে, একটা জানলায় টিমটিমে লাল আলো... বিমুগ্ধ হয়ে নিজেকে বলতাম বারবার: এই ঠিক, এই ঠিক, লেখা উচিত ঠিক এইভাবে, কয়েকটি মাত্র কথায়: বরফ, কুঁড়ে, সাঁঝের বাতি... আর কিছু নয়! — মাঠ থেকে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভেসে আসত ইঞ্জিনের চীৎকার ও ফোঁসফোসানি আর কয়লার সেই মধুর গন্ধ যা অন্তরের অন্তঃস্থল আলোড়িত করে অনুভূতি আনে সুদূরের, আদিগন্তের। দেখতাম যাত্রী নিয়ে ছেকরা গাড়ির কালো মূর্তি ছুটে আসছে আমার দিকে, মস্কোর মেলট্রেন এরই মধ্যে এসে গিয়েছে? সত্যিই এসেছে, কেননা স্টেশনের রেস্তোরাঁ গরম ও গুমোট হয়ে উঠেছে লোকের ভিড়ে, আলোয়, রান্নাঘরের গন্ধে, সামোভার জবালানোয়, কোটের পেছনকার ঝুল উড়িয়ে ছুটোছুটি করছে তাতার ওয়েটারেরা, প্রত্যেকের পা বাঁকা, রঙ ময়লা, চোয়ালের হাড় উ‌ঁচু, চোখের কোটর ঘোড়ার মতো, কামানের গোলার মতো নীলচে কামানো মাথা। বড়ো টেবিলটায় ভিড় করে বসে সওদাগরের গোটা একটি দল মুলোর আচার দিয়ে স্টার্জন মাছ খাচ্ছে, তারা সবাই 'অণ্ডচ্ছেদ' ধর্মসম্প্রদায়ের লোক,

জাফরান রঙা বড়ো ভারিক্কি মেয়েলি মুখ, সরু সরু চোখ, ওভারকোটে শেয়ালের চামড়ার আস্তরণ দেওয়া... স্টেশনের বইয়ের দোকানটায় সর্বদা আমার গভীর আগ্রহ, সুভরিনের বইয়ের হলদে ও ছাই-রঙা মলাটের নামগুলো পড়ে নেবার জন্য চোখ মেলে তাই ঘুরতাম ক্ষুধিত নেকড়ের মতো। আর সব মিলে ঘুরে বেড়ানো ও ট্রেনের জন্য আমার তীব্র অশেষ আকাঙ্ক্ষাকে এত বেশী চাগিয়ে তুলত। সেই যার সঙ্গে অসীম সুখে কোথাও চলে যেতে পারতাম, তার জন্য এত ব্যাকুলতা হত যে তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে শ্লেজে চেপে ছুটতাম শহরে, ফিরে যেতাম অফিসে। হৃদয়বেদনা ও গতিবেগ সুন্দর জোড় খায় হামেশা! শ্লেজটার সঙ্গে আমিও ধাক্কা খেয়ে গর্তে পড়তাম আর উঠতাম, আমি বসে বসে ওপরে হঠাৎ চেয়ে দেখতাম চাঁদ উঠেছে আকাশে: শীতের ভাসমান ঝাপসা মেঘের পেছন থেকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে, ঝলকাচ্ছে ফ্যাকাসে সাদা একটি মুখ। আকাশের কত উঁচুতে সে মুখ, সবকিছুতে কত উদাসীন! উড়ন্ত মেঘের ফাঁকে কখনো দেখা যাচ্ছে নিমেষের জন্য, ঢেকে যাচ্ছে আবার, কিন্তু কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই তার, ওদের নিয়ে পরোয়া নেই কোনো। ঘাড় উঁচু করে রাখাতে শেষ পর্যন্ত ব্যথা ধরে যেত, কিন্তু চোখ ফেরাতাম না

চাঁদ থেকে, মেঘমুক্ত ঝকঝকে রূপে যখন সবটা দেখা যায় তখন কিসের মতো চেহারা তার বোঝার চেষ্টা করতাম প্রাণপণে। সে কি মৃতের সাদা মুখোস? জানি ভেতরকার আলোয় দীপ্ত সে, কিন্তু কোন মালমশলায় তৈরী? পারাফিনে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই হবে অবশ্য! কোথাও এটার উল্লেখ না করলে নয়। অফিসের হল-ঘরে দেখা হয়ে গেল আভিলভার সঙ্গে, সে বিস্মিত ও খুশি হয়ে বলে উঠল, 'বা, কী ঠিক সময়ে এসে গেছ! চলো আমার সঙ্গে জলসায়!' — জরিদেওয়া কালো একটা পোষাক তার গায়ে, এত সুন্দর যে আরো ছোট আর সুঠাম দেখাচ্ছে তাকে, কাঁধ, হাত আর স্তনের নরম ঢালু অনাবৃত; কেশকারের দোকান ঘুরে এসেছে, কেশবিন্যাস নিখুঁত, মুখে পাউডার দেওয়াতে চোখদুটো যেন আরো কালো আরো দীপ্ত। ফার কোটটা ওর গায়ে জড়িয়ে দিতে দিতে ভয়ংকর ঘনিষ্ঠ তার নগ্ন কাঁধ ও কোঁকড়ানো, সুগন্ধি চুলে চুমো খাবার হঠাৎ ঝোঁক চাপলাম কষ্টে... রাজধানীর নামকরা গাইয়ে বাজিয়েদের আসর বসেছে অভিজাতদের ক্লাবে, সেখানকার হল-ঘরে ঝাড়ের আলোর ফোয়ারা ছুটেছে। সুন্দরী গায়িকা একটি আর একজন কালো চুলের প্রকাণ্ড গায়ক, অন্যান্য সব গাইয়েদের মতো আশ্চর্য

স্বাস্থ্য ও জোয়ান ঘোড়ার বর্বরোচিত অপরূপ শক্তির প্রতিমূর্তি। পেল্লায় পেটেন্ট লেদারের জুতোয়, সুন্দর মানানসই ড্রেস-কোটে, সাদা শার্টে, সাদা টাইয়ে একেবারে চোখ ঝলসানো চেহারা, বাজখাই, প্রাণবন্ত, শাসানোগোছের একরোখা গলায় স্পর্ধা ও বীরোচিত দুঃসাহস। মেয়েটি কখনো গলা নামিয়ে, কখনো তার সুরে সুর মিলিয়ে সাড়া দিচ্ছে দ্রুতছন্দে, বাধা দিচ্ছে স্নিগ্ধ ভর্ৎসনায় ও অনুযোগে, তীব্র বিষাদে ও উচ্ছ্বসিত আনন্দে, ক্ষিপ্র মধুর গিটকিরিতে হেসে উঠছে...

১৩

প্রায়ই ভোরবেলায় জেগে উঠতাম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখতাম — সাতটা বাজে নি। ভয়ংকর ইচ্ছে হত আবার কম্বল মুড়ি দিয়ে গরম বিছানায় শুয়ে থাকি আরো কিছুক্ষণ। ঘরের আলো হিম ধূসর, ঘুমন্ত হোটেলের নিঃশব্দতা ভাঙত শুধু খুব ভোরের দিকের একটা শব্দে — বারান্দার শেষে কোট ঝাড়া বুরুশের খসখস আওয়াজ, বোতামে বুরুশ ঠেকার শব্দ। কিন্তু আর একটা দিন পাছে বৃথায় যায় বলে এত শঙ্কিত আমি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লেখা নিয়ে — সত্যি মন

দিয়ে লেখা নিয়ে, — বসার জন্য এত ব্যগ্র, যে ঘণ্টার দড়িতে জোরে টান দিতাম, একরোখা, করুণ, কম্পিত একটা সাড়া উঠত বারান্দায়। সবকিছু কী পরদেশী ও বিশ্রী এখানে — এই হোটেলখানা, কাপড়ঝাড়ার বুরুশ খসখস করে চালানো নোংরা চাকরটা, কনকনে ঠাণ্ডা জল তেরছা ফিনকিতে মুখে পাঠানো টিনের হতকুচ্ছিৎ মুখধোবার জায়গাটা! রাত্রির পাতলা শার্টে কী করুণ আমার যৌবনসুলভ কৃশ দেহ, জানলার বাইরের ধারিতে দানা দানা বরফে ঠাণ্ডায় ছোট বলের মতো কুঁকড়ে জমে যাওয়া পায়রাটা কী বিষণ্ণ! হঠাৎ হৃদয় রাঙিয়ে উঠত আনন্দেভরা দুঃসাহসী একটা সংকল্পে: এখখুনি, আজকেই এখানকার পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যাওয়া যাক বাতুরিনোতে আমার আপনার, আদরের বাড়িতে! কিন্তু তাড়াতাড়ি চা গিলে ভাঙাচোরা সেই টেবিলটায়, যেটা মুখধোবার জায়গার পাশে ঠেলে একটা দরজার গায়ে লাগানো, দরজার ওদিকের ঘরটায় থাকত একটি ম্রিয়মান, উদাসসুন্দরী ভদ্রমহিলা আর তার আট বছরের বাচ্ছা, সেই টেবিলটায় আমার গুটিকতক বই ঠিক করে গোছানো একটা ভাব আনার পর আমি আবার বরাবরকার মতো মগ্ন হয়ে যেতাম আমার সেই ভোরবেলাকার কাজে: লেখার জন্য আমার

সেই প্রস্তুতি, আমার মধ্যে কী আছে তার বিশ্লেষণের চেষ্টা, আমার ভেতরকার কী একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে রূপ নেবো-নেবো হয়েছে, তার সন্ধান... বসে থাকতাম সেই মুহূর্তটির আশায় — ভয় হত আবার হয়ত কিছু মিলবে না, শুধু বসে থাকা সার হবে, ক্রমশ বাড়ন্ত উত্তেজনায়, হাত ঠাণ্ডায় হিম হয়ে যাবে, তারপর গভীর হতাশা, আবার রাস্তায় ছুটে বেরিয়ে অফিস যাওয়া। চিন্তাধারা গোলমেলে হয়ে যেত, সাবলীল অসংলগ্নতার ভারে ব্যথিয়ে উঠত মন, সে মনে কত বিচিত্র অনুভূতি, চিন্তা ও কল্পনার ভিড়... সর্বদা প্রধান বিষয়বস্তু হল আমি, আমার ব্যক্তিত্ব; সত্যি কথা বলতে যতই আগ্রহভরে অন্যদের খুঁটিয়ে দেখি না কেন আসলে তাদের বিষয়ে কোনো উৎসাহ ছিল না আমার। ভাবতাম, বেশ তাহলে স্রেফ নিজের বিষয়ে একটা গল্প লিখলেই হয়। কিন্তু লিখি কী করে? 'শৈশব, কৈশোর' তার মতো কিছু একটা? অথবা আরো সহজভাবে? 'অমুক জায়গায়, অমুক সময় আমি জন্মগ্রহণ করি...' কিন্তু হা ভগবান, এ সব কী নীরস, কী খেলো আর কী কৃত্রিম! আমার অনুভূতি তো একেবারে অন্য রকমের! বলতে লজ্জিত ও বিব্রত হয়ত লাগবে, তবু ব্যাপারটা তো তাই: আমার জন্ম মহাবিশ্বে,

দেশ ও কালের অসীমে, যেখানে একদা দানা বাঁধে কী একটা সৌরজগত, তারপর যাকে আমরা বলি সূর্য, তারপর পৃথিবী... কিন্তু ব্যাপারটার মানে কী দাঁড়ায়? এ বিষয়ে ফাঁকা কথা ছাড়া আমার আর কী জানা আছে? সৃষ্টির প্রারম্ভে পৃথিবী ছিল জ্বলন্ত গ্যাসের পুঞ্জ... তারপর কোটি কোটি বছরের পর, গ্যাস পরিণত হল তরল পদার্থে, তরল পদার্থ ঘন হল আর, মনে হয়, আরো বিশ লক্ষ বছর কেটে যাবার পর পৃথিবীতে দেখা দিল প্রোটোজোয়া: অ্যালগা, ইন্ফুজোরিয়া... তারপর মেরুদণ্ডহীন প্রাণী: কৃমি, খোলাবিশিষ্ট জন্তু... তারপর উভচর প্রাণী... তাদের পর এল বিরাট উরোগামী প্রাণী... আর তাদের পর কোন এক গুহামানুষ আগুন আবিষ্কার করল যে... তারপর ক্যালডিয়া, আসিরিয়া ও মিসর, পিরামিড বানানো ও মমির তদারক ছাড়া আর কী করেছে তারা আমার মনে নেই... আর্টাক্জার্কাস নামের কে একজন হুকুম দিলেন হেলেস্পণ্ট জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবার... পেরিক্লিস ও আসপেসিয়া, থার্মোপলিসের যুদ্ধ, মারাথনের যুদ্ধ... যা হোক, এ সব ঘটার অনেক আগে উপকথার সেই যুগে ভেড়ার পাল নিয়ে এব্রাহামের আবির্ভাব ঘটে, তিনি গেলেন প্রতিশ্রুত পূত দেশে...

'যখন ডাক পড়ল সেই দেশে যাবার, যে দেশ পরে তিনি পাবেন উত্তরাধিকারসূত্রে, বিশ্বাসভরে ডাক মেনে নিলেন এব্রাহাম, রওনা হলেন তিনি, কোথায় যাচ্ছেন না জেনে...' না, কোথায় যাচ্ছেন জানতেন না তিনি। আমারও জানা নেই! 'বিশ্বাসভরে...' কিসে বিশ্বাস? ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রেমময় দয়ালুতায়? 'কোথায় যাচ্ছেন না জেনে...' সত্যি তিনি জানতেন: তিনি যাচ্ছিলেন সুখের দিকে, মানে এমন কিছু একটার দিকে যেটা তাঁকে দেবে আনন্দ ও পরিতৃপ্তি, অন্যকথায় বলতে গেলে, প্রেম ও জীবনের দিকে... কিন্তু আমিও তো ঠিক এভাবে বরাবর থেকেছি, বেঁচেছি শুধু তারই জন্য যা জাগায় প্রেম ও আনন্দ...

আমার ছোট টেবিলের পেছনের দরজার ওধার থেকে কানে আসে মহিলাটি ও শিশুটির কণ্ঠস্বর, শুনতে পাই মুখ-ধোবার জায়গার পাদানির ঘটাং শব্দ। জলের ছলাৎ ছলাৎ, চা তৈরী হওয়ার আওয়াজ, আর শিশুটিকে খেতে বলার অনুরোধ: 'কস্তিয়া, লক্ষ্মীসোনা, রুটিটা খেয়ে নে!' উঠে পড়ে পায়চারি শুরু করতাম। আবার এই সোনা কস্তিয়া... তাকে সকালের খাওয়া দিয়ে মা সাধারণত চলে যেত দুপুর পর্যন্ত। ফিরে এসে কেরোসিনের স্টোভে কিছু একটা রেঁধে ছেলেকে

দুপুরের খাওয়া দিয়ে বেরিয়ে যেত আবার। কী যন্ত্রণা এই ছোট্ট কম্ভিয়াকে লক্ষ্য করা — হোটেল-শিশু গোছের চীজে সে পরিণত হয়েছে, সারাদিন এঘর-ওঘর করে, ঘরে কেউ থাকলে উঁকি মেরে দেখে ভীরুভাবে কথাবার্তা বলে, ঘরের লোকের আদর কাড়াবার চেষ্টা তার, মন-জোগানোর জন্য কিছু বলতে চায়, কিন্তু কেউ কান দেয় না তার কথায়, কেউ কেউ এমনকি তাড়িয়ে দিয়ে বিড়বিড় করে বলে: 'কেটে পড়, বাছাধন। আমাকে রেহাই দাও, বাবা!' একটি ঘরে থাকতেন ছোট একটি বুড়ী, অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির শ্রদ্ধাস্পদা মহিলাটি হোটেলের আর কাউকে সমকক্ষ গণ্য করতেন না, বারান্দা হয়ে যাবার সময় কৃপাদৃষ্টি ফেলতেন না কারো দিকে, আর প্রায়ই, বড়ো বেশী ঘন ঘন, গোসলখানায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে সশব্দে জলকেলি করতেন। ভদ্রমহিলার একটি বড়ো, চওড়া-পিঠ, খাঁদানাক কুকুর ছিল, গণ্ডেপিণ্ডে খেয়ে তার ঘাড়ে থাকে থাকে চর্বি; বড়ো কুলের মতো রঙের চকচকে চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসা, কুৎসিত নাকের মাঝখানটা অশ্লীলভাবে চাপা, নীচের চোয়াল আত্মগম্ভীরতায় ও তাচ্ছিল্যে এগোনো, শ্বাদন্তের মাঝখানে ধরাপড়া জিভটা যেন ব্যাঙের। কুকুরটার মুখের ভাব সব সময় এক

রকমের — হুঁশিয়ারি ঔদ্ধত্যের একটা ভাব — কিন্তু তবু অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির সে। আর তাই কস্তিয়া কারো ঘর থেকে বিতাড়িত হয়ে বারান্দায় তার সামনে পড়লে তক্ষুণি কানে আসত কুকুরটার চাপা বুনো আওয়াজ, গলা দিয়ে বেরোত ঘড়ঘড় ফোঁস ফোঁস শব্দ, সেটা রাগের উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে শেষ হত প্রবল হিংস্র ঘেউ-ঘেউ-এ, আর কস্তিয়া কেঁদে ককিয়ে একসার হত মৃগী রোগীর মতো...

চেয়ারে আবার বসে পড়তাম, জীবন কত দীনহীন, কত খেলো, তবু কত ব্যথাময় জটিল ভেবে মন খারাপ হয়ে যেত। মনে হত লিখি ক্ষুদে কস্তিয়াকে নিয়ে বা ওধরনের কিছু একটার বিষয়ে। যেমন সেই প্রবীণা মেয়ে দর্জিটি, একবার যে হপ্তাখানেক ছিল নিকুলিনার বোর্ডিং-হাউজে, সারাক্ষণ কাপড়ের ফালি গাদা করা টেবিলে কী একটা কেটে যেত সে, তারপর জোড় দেওয়া ফালিগুলো জড়ো করে সেলাই-এর কলে রেখে দিত কল চালিয়ে... হাতের কাঁচির গতি কীভাবে সে বড়ো শুকনোটে হাঁ-মুখ বেঁকিয়ে কুঁচকিয়ে দেখত সেটা মনে রাখার যোগ্য, রসিয়ে রসিয়ে চা খেতে কী ভালো লাগত তার, নিকুলিনাকে মিষ্টি কিছু বলার জন্য সর্বদা তার কী চেষ্টা আর আগ্রহ, ভাণ করে, খুব চাঙ্গা হয়ে

কথাবার্তা চালাতে চালাতে শ্রমজীর্ণ তার বড়ো হাত আপনা থেকে যেন চলে যেত সাদা রুটির ফালির টুকরিতে, জ্যামের কাঁচের পাত্রের দিকে ঘন ঘন তাকাত আড়-চোখে। আর সেদিন ক্রাচহাতে যাকে দেখেছিলাম কারাচেভস্কায়া স্ট্রীটে, সেই খোঁড়া মেয়েটি? খোঁড়া আর কুঁজোরা হাঁটে উদ্ধত, কুছ পরোয়া নেই ভাবে। কিন্তু সেই মেয়েটি খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমার কাছে এল সলজ্জ ভাবে; দুটো হাতের কালো ক্রাচে ভর দিয়ে ধরা বাঁধা মাত্রায় লাফিয়ে, কাঁধ ঝটকিয়ে এল, বগল থেকে উদ্যত ক্রাচের কালো বাঁট। একাগ্রদৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে... পরনের কোটটা খাটো, শিশুদের যেমন হয়, গাঢ় বাদামি চোখজোড়া বুদ্ধিদীপ্ত, শুচি ও উজ্জ্বল, যেমনটা হয় শিশুদের, অথচ জীবনকে, জীবনের দুঃখ ও প্রহেলিকাকে সে চোখ জানে... সত্যি, এসব দুর্ভাগাদের কয়েকজন কী সুন্দর, ওদের মুখে চোখে ফুটে ওঠে অন্তরের প্রতিচ্ছবি!

কীভাবে শুরু করব আমার জীবন বর্ণনা সেটা ঠিক করে নেবার জন্য আবার চেষ্টা করতাম একাগ্রচিত্ত হবার। সত্যি, কীভাবে! যা হোক একটা কিছু দিয়ে শুরু না করলে তো নয়, বিশ্বজগত, যেখানে নির্দিষ্ট একটি মুহূর্তে আমি ভূমিষ্ঠ হই, না হয় সেটা গেল,

অন্তত রাশিয়া দিয়ে শুরু করলে হয়: যে দেশে আমার বাস, যে পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেছি তার একটা ধারণা পাঠককে না দিলে তো চলে না। কিন্তু এর বিষয়ে আমি কী জানি? স্লাভদের পুরাতন নানা উপজাতি, সে সব উপজাতিদের মধ্যে নানা বিবাদ। দীর্ঘ দেহ, সোনালি চুল, সাহস ও অতিথিবৎসলতার জন্য স্লাভদের নামডাক ছিল, তারা উপাসনা করত সূর্যদেবের, বজ্রের ও বিদ্যুতের, সমীহ করত অরণ্যের জলাভূমির প্রেতযোনি ও মৎস্যকন্যাদের, 'সবকিছুতে মোটের ওপর প্রকৃতির প্রপঞ্চ ও শক্তিকে'... আর কী? রাজা ভ্লাদিমিরের ওখানে রাজন্য ও জারগ্রাদের রাজদূতদের নিমন্ত্রণ, রোরুদ্যমান লোকজনের সামনে সিংহাসনচ্যুত বজ্র দেবতাকে (পেরুনকে) নীপারে নিক্ষেপ... প্রাজ্ঞ ইয়ারস্লাভ, তাঁর সন্তান ও দৌহিত্রদের মধ্যে বিবাদ... মনে পড়ে 'সুবৃহৎ নীড়' ভ্সেভলদের কথা... কিন্তু সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হল এই, সমসাময়িক রাশিয়া সম্বন্ধে একেবারে কিছু জানা নেই আমার। অবশ্য আছে বটে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারবর্গ ও ভুখা কিষান, আছে গাঁয়ের কর্মকর্তা, সশস্ত্র পুলিস, সাধারণ পুলিস, ও গাঁয়ের যাজক সব, লেখকদের মতে যাদের ওপর সর্বদা সুবৃহৎ সংসারের চাপ... আর কী? আছে ওরিওল,

রাশিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন শহরের অন্যতম—ওরিওলের জীবনযাত্রা ও অধিবাসীদের বিষয়ে কিছুটা অন্তত জানা উচিত ছিল, কিন্তু কী জানি? শুধু রাস্তা, গাড়োয়ান, খাতকাটা বরফ, দোকান হাট, সাইনবোর্ড — খালি সাইনবোর্ড আর সাইনবোর্ড... আর্চবিশপ, প্রদেশপাল... জান্তব, নিষ্ঠুর, বিরাটদেহ, সুদর্শন সেই পুলিস ইন্সপেক্টর রাশেভস্কি... আছে বটে পালিৎসিন, ওরিওলের গৌরব যে, তার একটা থামবিশেষ, সেই সব পাগলাটে মহিষদের একজন যাদের জন্য স্মরণীয় কাল থেকে রাশিয়া বিখ্যাত: কুলীনবংশ জাত বৃদ্ধটি, আকসাকভ ও লেসকভের সেই বন্ধুপ্রবর থাকেন যে বাড়িতে সেটা দেখতে প্রাচীন রুশী প্রাসাদের মতো, ঘরে ঘরে কাঠের দেয়ালে বিরল আইকনের বাহার। রঙীন মরক্কোর পাড় দেওয়া বিচিত্র ঢিলে একটা কোট তিনি সর্বদা পরেন, বাবরি-কাটা চুল, মুখটা ভারি ও ঘন, ফালি ফালি চোখ, তাঁর বুদ্ধি প্রখর, লোকে বলে পড়াশোনা করেছেন অনেক... কিন্তু পালিৎসিন নামের এই মানুষটির বিষয়ে আর কিছু কি জানি? কিছু না, একেবারে কিছু না!

এতে হঠাৎ চটে উঠলাম: সত্যি তো, কাউকে বা কিছুকে সমগ্রভাবে জানার প্রয়োজন কী আমার, যেভাবে

যা জানি, বুঝি, সেইভাবে লিখব না কেন! আবার তড়াক করে উঠে পায়চারি শুরু করতাম, চটে যে উঠেছি তাতে খুশি, রাগটাকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরেছি যেন তাতেই আমার মুক্তি। আর হঠাৎ চোখের সামনে দেখতাম স্ভিয়াতগরস্কি মঠ, যেখানে গিয়েছিলাম আগের বসন্তে, দেখতাম দনেৎসের তীরে মঠের দেয়ালের সামনে নানা জায়গা থেকে আসা লোকেরা সমবেত হয়েছে। বলে কয়ে যদি রাত কাটাতে পারি তার নিষ্ফল চেষ্টায় যাজকটির পিছু পিছু ঘুরছি চত্বরে, আর সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে দৌড়িয়ে কেটে পড়ল সবকিছু যেন হাওয়ায় ছড়িয়ে — হাত, পা, চুল আর জোব্বার প্রান্তদেশ — আর কী পাতলা নমনীয় দেহ তার, মেচেতা পড়া কিশোরের মতো মুখ, সন্ত্রস্ত সবুজ চোখ, ফিকে সোনালী, নরম ফোলা ফোলা কোঁকড়ানো চুলের কী সুন্দর, অসাধারণ সম্ভার... তারপর মনে পড়ত নীপারে আমার যাত্রার সেই বাসন্তী দিনগুলো, তখন মনে হয়েছিল সে যাত্রার শেষ নেই। স্তেপের কোথাও ভোর... তারপর ট্রেনের শক্ত বেঞ্চে ঘুম ভেঙে গেল, কাঠ কাঠ বিছানা ও ঠাণ্ডায় সারা শরীরটা আড়ষ্ট, তাকিয়ে দেখলাম জমে যাওয়া সাদা জানলা দিয়ে কিছু চোখে পড়ে, না — কোথায় এসে পড়েছি, জানি না, — আর

মনে হল এই অনিশ্চয়তার মতো অপরূপ জিনিস আর কিছু নেই... ভোরের সজাগতায় সমস্ত ইন্দ্রিয় শক্তি ধারালো, লাফিয়ে উঠে জানলা খুলে কনুইয়ে ভর দিলাম; সাদা সকাল, ঘন সাদা কুয়াসা, বাসন্তী প্রভাত আর কুয়াসার গন্ধ, ট্রেন ছুটে চলেছে. আমার হাতে-মুখে ঝাপট মারছে যেন ভিজে কাপড়...

১৪

একদিন কেন জানি না ঠিক সময়ে ঘুম ভাঙল না। জেগে উঠে নড়াচড়া না করে সামনে, জানলার দিকে, শীতের দিনের প্রশান্ত সাদা আলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম. বিরল একটা শান্তির বোধ, মন ও অন্তর ধীরস্থির. চারিদিকের পরিবেশ অদ্ভুত ক্ষুদ্র ও সহজ বোধ হল। অনেকক্ষণ রইলাম এভাবে, ঘরটা ভারাক্রান্ত করল না আমার মনকে, অনুভব করলাম, — আমার চেয়ে অনেক ক্ষুদ্র সেটা, আমার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটা জিনিস। উঠে পড়ে মুখ-হাত ধুয়ে অভ্যাসমতো সস্তা লোহার খাটের শিয়রে ঝোলানো ছোট আইকনটাকে প্রণাম জানালাম; আশ্চর্য ব্যাপার, সেই আইকনই. এখনও আমার ঘরে: কালের প্রকোপে কঠিন, মসৃণ

ঘন সবুজ কাঠের টুকরোয় সস্তা রুপোর কাজ করা, উঁচু জায়গাগুলো হল এব্রাহামের সঙ্গে খেতে বসা তিনটি দেবদূত, তাদের প্রকট প্রাচ্য, চকচকে চোখ রুপোর গোল গর্তগুলো থেকে চেয়ে আছে আমার দিকে অন্ধকার দৃষ্টিতে, — আইকনটি আমার মা'র পরিবারে পুরুষানুক্রমে এ হাত থেকে ও হাতে চলে এসেছে, এটি তিনি আশীর্বাদ হিসেবে আমাকে দিয়েছিলেন যখন পৃথিবীতে যাত্রা শুরু করি, পিছনে যখন ফেলে রেখে আসি আমার শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের সেই কিছুটা কৃচ্ছ্রের বছরগুলি, আমার পার্থিব জীবনের সেই অস্পষ্ট গোপন অধ্যায়টি, যেটি এখন আমার কাছে মনে হয় অত্যন্ত অসাধারণ, পুণ্য ও উপকথাসুলভ, কালের গুণে যেটি এখন একেবারে অন্য একটি জীবনে পরিণত হয়েছে, যে জীবনের কাছে এমনকি নিজেকে মনে হয় পরদেশী... প্রণাম জানিয়ে বাইরে গেলাম কী একটা কিনতে, শুয়ে থাকার সময় সেটা কেনার কথা ভেবেছিলাম। পথে মনে পড়ে গেল গতরাত্রে দেখা একটি স্বপ্নের কথা: কার্ণিভাল সপ্তাহ, আবার আমি রস্তভ্‌ৎসেভ্‌দের সঙ্গে আছি, আর বাবা ও আমি সার্কাসে বসে কালো টাট্টু ঘোড়ার একটা দল দেখছি, মায় ছ'টা ঘোড়া দৌড়িয়ে এল খেলা-দেখানোর

জায়গায়... তাদের সবায়ের গায়ে ঝকঝকে তামা আর ঠুনঠুনে ঘণ্টা দেওয়া ছোট শৌখীন জিনসাজ, লাগাম মুখে জোর করে আঁটা, লাল মখমলের রাশ শক্তভাবে বাঁধা জিনে, মোটা ছোট ঘাড় বেঁকাচ্ছে তারা, ছাঁটা কেশর কালো বুরুশের মতো খোঁচা হয়ে উঠেছে ঘাড়ে, ঝুঁটিতে গোঁজা লাল পালক... কদম চালে তাল রেখে পাশাপাশি ছুটেছে তারা, ঘণ্টা বাজিয়ে, কালো ঘাড় একরোখা রাগের ভাবে বেঁকিয়ে, আকারে ও রঙে সবাই খাপ খেয়েছে চমৎকার, প্রত্যেকের গা চওড়া, পা ছোট, হঠাৎ একগুঁয়ের মতো দাঁড়িয়ে পড়ে তারা খলীনে দাঁত বসিয়ে নাড়াতে লাগল পালকগুলো... ড্রেস-কোট পরা তালিমদারের হাঁক ডাকে ও বারবার চাবুক ঝাপটানোর চোটে অবশেষে তারা হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে দর্শকদের অভিবাদন জানাল, তারপর হাঁফ ছেড়ে বাদ্যযন্ত্রে হঠাৎ বেজে উঠল দ্রুত কদমচালের উচ্চকিত সুর আর ঘোড়াগুলো সার বেঁধে খেলা-দেখানোর জায়গায় চক্কর মারতে লাগল, যেন বাজনা পিছু ধাওয়া করেছে এমনভাবে... দোকানে গিয়ে কালো ওয়েলক্লথের মলাট দেওয়া ভারি একটা খাতা কিনলাম। ঘরে ফিরে চা খেতে খেতে ভাবলাম: 'যথেষ্ট হয়েছে। এবার থেকে শুধু পড়ব আর মাঝে মাঝে নোট রাখব —

বিভিন্ন চিন্তাভাবনা, অনুভূতি ও মন্তব্য — কোনো বিষয়ে দাবিদাওয়া না করে...' কালিতে কলম ডুবিয়ে প্রথম পাতায় বড়ো বড়ো স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখলাম:

— আলেক্সেই আর্সেনিয়েভ। সংক্ষিপ্ত মন্তব্য।

তারপর খাতায় কী লিখব অনেকক্ষণ ভাবলাম চুপচাপ বসে থেকে, সিগারেটে জোর টান দিলাম, কিন্তু মনে কোনো জ্বালা নেই, বিষণ্ণতা ও স্তব্ধতা শুধু, আর কিছু নয়। অবশেষে শুরু করলাম লিখতে:

— নামকরা তলস্তয়পন্থী প্রিন্স ন. পত্রিকা অফিসে এসে তুলায় ভুখা লোকেদের জন্য চাঁদা ও খরচের বিষয়ে তাঁর রিপোর্ট ছাপাতে বললেন। লোকটি বেঁটে, মোটাগোছের। ককেশাসী চেহারার বিচিত্র নরম টপবুট, আস্ত্রাখানী টুপি, ভেড়ার লোমের কলার দেওয়া ওভারকোট, — সবকিছু পুরনো, জীর্ণ কিন্তু দামী ও ফিটফাট — ছাই-রঙা ফিনফিনে শার্ট চামড়ার বেল্ট দিয়ে আঁটাতে গোলগাল ভুঁড়িটা স্পষ্ট, সোনালি প্যাস্‌নে চোখে। মোটেই জাঁকি লোক নন, কিন্তু দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার খারাপ লাগল তাঁর জমকালো চেহারা, দুধের মতো ধবধবে সাদা মাজা ঘষা মুখ আর কঠোর চোখ। তক্ষুণি বিতৃষ্ণা হল লোকটির প্রতি। আমি

অবশ্য তলস্তয়ের চেলা নই, তবু লোকে যা ভাবে তাও আমি নই। আমি চাই দুনিয়া ও দুনিয়ার লোকে সুন্দর হোক, প্রেম ও আনন্দের খোরাক জোগাক, আর যা কিছু এতে বাধা দেয় তাতে আমার অরুচি।

— সেদিন বল্‌খভস্কায়া স্ট্রীটে হাঁটছি, দেখলাম: অস্তগামী সূর্য, পশ্চিমে হিম আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে, আর সেই সবুজ স্বচ্ছ হিম আকাশ থেকে সন্ধ্যার শুচি আলোর বন্যায় সারা শহর প্লাবিত, সে আলোর অদ্ভুত ব্যাকুলতা ভাষায় অবর্ণনীয়; আর ফুটপাথে ছিন্নভিন্ন জামাকাপড়ে শীতে কালিয়ে যাওয়া একটি বুড়ো অর্গান-বাদক দাঁড়িয়ে, অথর্ব যন্ত্রটার বাঁশির মতো শিসে, ঝঙ্কারে আর হাঁফিয়ে পড়া আওয়াজে মুখর হয়ে উঠেছে হিম সন্ধ্যা, বেরিয়ে আসছে একটি রোমাণ্টিক সুর, সেই সুদূরের, সাবেক কালের বিদেশী সুরে মন ব্যথায় ভরে যায় অদ্ভুত স্বপ্নে আর অনুতাপে...

— যেখানেই যাই, হয় বিভীষিকা নয় ব্যথা। দু'সপ্তাহ আগে দেখা একটি জিনিস এখনো স্পষ্ট মনে আছে। তখনো সন্ধ্যেবেলা, কিন্তু মেঘলা অন্ধকার। কিছু না ভেবে ছোট পুরনো একটি গির্জায় ঢুকে দেখলাম প্রার্থনাবেদীর কাছে অন্ধকারে মোমবাতির টিমটিমে

আলো বেশ নীচুতে, আরো কাছে গিয়ে,—স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে পড়লাম: তিনটি মোমবাতির ক্ষীণ বিষণ্ণ আলো পড়েছে পাশে কাগজের ফুল লাগানো একটি ছোট লাল কফিনে, আলো হয়ে উঠেছে সেখানে শায়িত একটি গোলমুখ, ময়লা রঙের শিশু। মনে হত সে ঘুমিয়ে আছে যদি না চোখে পড়ত তার মুখের সেই চীনামাটিসুলভ রঙ, গোল নিমীলিত চোখের পাতায় লাইলাকের ছোপ আর সুখের ত্রিভুজ, যদি তার মুখাবয়বে না থাকত ধরাধামের সবকিছু থেকে সেই অতল শান্ত শাশ্বত বিচ্ছেদের ভাব!

— দুটো গল্প লিখেছি, ছাপা হয়েছে সেগুলো, কিন্তু দুটোরই সবকিছু কৃত্রিম ও অপ্রীতিকর: একটি হল ভুখা চাষীদের বিষয়ে, যাদের কখনো নিজের চোখে দেখি নি বলে সত্যিকার করুণা হতে পারে না, আর একটি হল ধ্বংসপ্রায় জমিদারের সেই খেলো প্রসঙ্গ, প্রথমটির মতোই অবাস্তব, অথচ আমি শুধু লিখতে চেয়েছিলাম গরীব একটি জমিদার, র.-মশাইয়ের সদর বাগানে দেখা প্রকাণ্ড রুপোলি পপলার গাছটির কথা, আর তাঁর পড়ার ঘরে বইয়ের আলমারির ওপর সেই খড়ঠেসা শিকারী বাজের কথা, নিশ্চল পাখিটা চিত্রবিচিত্র তামাটে ডানা মেলে চকচকে হলদে চোখে তাকিয়ে

থাকে, সর্বক্ষণ শুধু তাকিয়ে থাকে লোকের দিকে... দারিদ্র্যের কথা লিখতে হলে আমি শুধু লিখতাম তার কাব্যময়তার কথা। ছন্নছাড়া মাঠঘাট, কোনো জমিদার-বাড়ি ও বাগানের দীন ধ্বংসাবশেষ, চাকরবাকর, ঘোড়া ও শিকারী কুকুরের বিশেষ বালাই নেই, বুড়ো-বুড়ীরা, অর্থাৎ 'প্রবীণ মালিকেরা', জীবনের শেষ কটা দিন কাটাচ্ছে অন্দরের সংকীর্ণ ঘরে, কমবয়সীদের ছেড়ে দিয়েছে সামনের ঘরগুলো — এ সবকিছু করুণ ও মর্মস্পর্শী। আর 'আলালের ঘরের দুলালেরা' কেমন ধরনের চীজ বর্ণনা করতাম — নিরক্ষর অকর্মণ্য তারা, ভিখারীর সামিল, তবু তারা ভাবে শুধু তাদেরই ধমনীতে প্রবহমান নীল রক্ত, তারাই হল সবচেয়ে উঁচু দরের একমাত্র কুলীন। তাদের টুপি, সামিনের শার্ট, কসাক পেণ্টুলেন ও টপবুট... একসঙ্গে জুড়ো হলেই মদ্য ও ধূমপান আর হামবড়াই। শ্যাম্পেনের পুরনো সুন্দর গেলাসে ভোদকা পান, বন্দুকে ফাঁকা গুলি ভরে জ্বালানো মোমবাতির দিকে চালানো হাসির হররার মধ্যে। 'আলালের ঘরের দুলালদের' একজন, প.-মশাই, তার লাটেওটা জমিদারি ছেড়েছুড়ে দিয়ে বহুদিন অব্যবহৃত একটি জল-কলে গিয়ে কাঠের ঘরে বাসা বাঁধল রক্ষিতার সঙ্গে, মাগীটার নাক বলে পদার্থ

প্রায় ছিল না। প.-মশাই হয় খড় বিছোনো কাঠের তক্তায় বা 'বাগানে', অর্থাৎ ঘরের পাশে একটি আপেল গাছের তলায় রাত কাটাত তার সঙ্গে। আপেল গাছের একটি ডালে টাঙ্গানো ভাঙা আয়নায় প্রতিফলিত হত সাদা মেঘ। আর কিছু করার ছিল না বলে লোকটি বসে বসে জল-কলের পাশের পুকুরে চাষীদের হাঁস লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়ত, যতবার ঢিল পড়ত জলে ততবার হাঁসের ঝাঁক পাখা ঝাপটে উঠে ভয়াবহ চীৎকারে পাড়া কাঁপিয়ে উড়ে যেত পুকুরের ওপর দিয়ে।

-- বুড়ো, অন্ধ, আমাদের এককালে ভূমিদাস গেরাসিম অন্য সব অন্ধদের মতো মুখ তুলে হাঁটত, যেন যেতে কী একটা শুনছে কান পেতে। গাঁয়ের শেষে একটা ছোট কুঁড়েঘরে একেবারে একা থাকত সে, সাথী বলতে ছিল শুধু গাছের ছালের খাঁচায় অস্থির একটি ভারুইপাখি, দিনের পর দিন খাঁচা থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টায় ও কাপড়ের ঢাকনায় মাথা ঠুকে ঠুকে মাথার ওপর দিকটা তার নেড়া। চোখে দেখতে না পেলেও গ্রীষ্মকালের প্রতিটি দিন ভোরবেলায় ভারুই ধরতে যাওয়া চাই গেরাসিমের, অন্ধ মুখে নরম হাওয়ার স্পর্শ, ভেসে আসছে মাঠঘাট থেকে তিতিরের ডাক, ভারি ভালো লাগত তার। সে বলত দুনিয়ার সবচেয়ে

মধুর জিনিস হল সেই রোমাঞ্চকর মুহূর্তগুলি যখন তিতির জালের কাছে এসে থেকে থেকে ডাকে আরো জোরে, আরো তীব্র আবেগে, পাখি-ধরিয়ের পক্ষে আরো ভয় ধরিয়ে। সত্যিকার কবি ছিল বটে গেরাসিম!

১৫

অফিসে গিয়ে লাঞ্চ খেতে ইচ্ছে হল না। গেলাম মস্কভস্কায়া স্ট্রীটের একটি হোটেলে। কয়েক গেলাস ভোদকা ও একটি হেরিং মাছ খেলাম, প্লেটে মাছটার চেপটা মাথা দেখে ভাবলাম: 'হেরিংয়ের গাল যেন মুক্তো, এটা টুকে না রাখলে চলবে না।' তারপর খেলাম চড়বড়ে সেলিয়ান্‌কা। জায়গাটা ভিড় ঠেসা, নীচু ঘরটায় প্যানকেক, ভাজা মাছ ও জ্বলন্ত চর্বির গন্ধ, পিছু বেঁকে, নেচে, মাথা বেজায় উঁচিয়ে ছুটোছুটি করছে ওয়েটাররা, আর তাদের মালিক — মূর্তিমান রুশী চরিত্র — কাউণ্টারের পেছনে ছবির মতো ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে প্রত্যেককে দেখছে তীক্ষ্ন তেরছা নজরে, ধর্মভীরু কড়া গোছের লোকের যে ভূমিকা এতদিন তার বেশ রপ্ত তারই ডং-এ; দাঁড়কাকের মতো দেখতে কালো পোষাক পরিহিতা ছোটখাটো মঠবাসিনীরা

ঝলমলে ফিতে লাগানো ভারি জুতো পায়ে ব্যবসায়ীদের টেবিলগুলোর মাঝখানে আস্তে আস্তে গিয়ে মাথা নীচু করে নিঃশব্দে এগিয়ে ধরছে মলাটে রুপালি ক্রুশ আঁকা তাদের ছোট ছোট কালো পুস্তিকা, আর ব্যবসায়ীরা ভুরু কুঁচকে সবচেয়ে খারাপ কোপেকগুলো বের করছে ব্যাগ থেকে... মনে হল এ সবকিছু আমার স্বপ্নের খেই টেনে চলেছে, আর ভোদকা, সেলিয়ান্কা ও শৈশবস্মৃতির ভারে একটু বুঁদ হওয়াতে চোখে প্রায় জল এসে গেল... হোটেলে ফিরে গেলাম, শুয়ে পড়ে ঘুম। জেগে যখন উঠলাম তখন গোধূলি, বিষাদ ও ঝাপসা অনুতাপে ভরা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে অপ্রসন্নভাবে লক্ষ্য করলাম চুল বড়ো লম্বা আর কবি-কবি গোছের। নাপিতের দোকানে গেলাম। দেখলাম সাদা কাপড় চাপানো বেঁটে মতো একটি লোক — মাথায় টাক, কানদুটো উঁচনো — ঠিক যেন বাদুড় — তার ঠোঁটের ওপর আর গালে নাপিত অদ্ভুত পুরু ফেনা তুলে সাবান ঘষছে। ওস্তাদের মতো ক্ষুর দিয়ে সমস্ত সাদা জিনিসটা সরিয়ে আর একবার মুখে সাবানের স্বল্প প্রলেপ দিয়ে দাড়ি কামানো হল আবার, এবার বেপরোয়া, সংক্ষিপ্ত ওপর পোঁচে। বাদুড়প্রবর পা ফাঁক করে উঠে সাদা কাপড়টা

সুদ্ধ টেনে এক হাতে সেটাকে বুকে চেপে অন্য হাতে টকটকে লাল মুখটা ধুয়ে ফেলল।

— একটু ও-ডি-কলোন দেবো নাকি, স্যার? — নাপিত জিজ্ঞেস করল।

— ঢাল, -- বলল বাদুড়প্রবর।

সেণ্টের স্প্রে হিসহিসিয়ে উঠল, তারপর তোয়ালে দিয়ে বাদুড়ের ভিজে গাল আস্তে ঘষল নাপিত।

— বাস, -- চটপটভাবে বলে সাদা কাপড়টা ঝট করে সে সরিয়ে নিল। বাদুড়প্রবর উঠে দাঁড়াতে ভয়াবহ চেহারাটা স্পষ্ট দেখা গেল: লম্বকর্ণ বিরাট মাথা, লাল মরক্কো রঙের চওড়া রোগা মুখ, দাড়িগোঁফ পরিষ্কার কামানো সে মুখের চোখদুটো শিশুর চোখের মতো জবলজবলে, হাঁ-টা কালো গর্তের সামিল, লোকটা বেঁটে, চওড়া কাঁধ, মাকড়সা গোছের খর্ব দেহ আর লিকলিকে পা, পাদুটো তাতারদের মতো বেঁকা। নাপিতের হাতে বখশীশ গুঁজে দিয়ে উৎকৃষ্ট কালো একটা ওভারকোট ও বোলার টুপি চাপিয়ে লোকটি চুরুট ধরাল, তারপর গেল বেরিয়ে। আমার দিকে ফিরে নাপিত বলল:

— এঁকে চেনেন নাকি? ইনি হলেন ব্যবসাদার ইয়েমাকিভ। এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড়লোক।

জানেন, হামেশা কত বখশীশ দেন দেখুন।

আঙুল ফাঁক করে দেখিয়ে ফূর্তির হাসি হেসে বলল:

— পুরোপুরি দু কোপেক!

আমি তারপর অভ্যেসমতো রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। গির্জা একটি চোখে পড়াতে ভেতরে ঢুকলাম। নিঃসঙ্গতা ও বিষাদের ফলে গির্জায় যাওয়া অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ভেতরটা গরম, উজ্জ্বল মোমবাতির দরুন একটা উদাস উৎসবের ভাব, নকল রুবি বসানো তামার ক্রুশ প্রার্থনা পাঠের ও সঙ্গীতের ডেস্কে, চারধারে দীর্ঘ দানিতে মোমবাতির ঝাড়ের ঝকঝকে আলো, ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে যাজক ও ডিকনরা করুণ টানা টানা সুরে বলে চলেছে: 'হে স্বর্গাধিপতি, ভক্তি জানাই তোমার ক্রুশকে...' দরজার ধারে অন্ধকারে লম্বা সুতির কোট গায়ে চামড়ার জুতো পায়ে একটি বৃদ্ধ, বুড়ো ঘোড়ার মতো বলিষ্ঠ ও কর্কশ লোকটি (সাধারণের নৈতিক উন্নতির জন্য যেন) যাজকদের প্রার্থনায় ধুয়া ধরে কঠোর গুণগুণাতিতে। আর ডেস্কের কাছে ভিড়ের মধ্যে মোমবাতির উষ্ণ সোনালী আলোয় স্নাত একটি বৃদ্ধ তীর্থযাত্রী দাঁড়িয়ে। সন্ন্যাসীর

মতো ক্ষীণদেহ তার, প্রাচীন আইকনের মতো কালো ও সূক্ষ্ম তার মুখ প্রায় ঢাকা পড়েছে দুগালে আদিম শুচিতায় ঝুলে পড়া দীর্ঘ কালো মেয়েলি চুলের গোছায়, বাঁ হাতে দৃঢ় মুঠিতে ধরা লম্বা লাঠি, বহু বছর ব্যবহারের ফলে মসৃণ চকচকে, কালো চামড়াব থলি পিঠে; সবাই থেকে দূরে সে দাঁড়িয়ে আছে, কোনো নড়াচড়া নেই, সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন। তার দিকে তাকিয়ে আমার চোখ জলে ভরে এল -- আমার দেশ রাশিয়ার কথা ভেবে, প্রাচীন অন্ধকার রাশিয়ার কথা ভেবে, মন কেমন করে উঠল, আচ্ছন্ন লাগল বিষাদে। কে যেন মোমবাতি দিয়ে পিঠে অল্প টোকা দিল: ঘুরে দেখলাম — আনত দেহ একটি বৃদ্ধা, পরনে তার ক্লোক ও শাল, খালি মাড়ি থেকে উঁচিয়ে আছে একটি শুধু দাঁত: 'ক্রুশের জন্য কিছু দাও, বাছা!' খুশি হয়ে ব্যগ্রভাবে, তার নীলচে নখ ঠাণ্ডা অসাড় হাত থেকে মোমবাতিটি নিয়ে চোখঝলসানো বাতিদানির দিকে এগোলাম অস্বস্তিভরে, আর লজ্জা হল অস্বস্তির জন্য, কোনক্রমে মোমবাতিটা অন্যান্য মোমবাতির মধ্যে দাঁড় করিয়ে হঠাৎ ভাবলাম: 'ভেগে যাই!' আর, প্রার্থনার ডেস্ক থেকে সরে এসে, ক্রুশে প্রণাম জানিয়ে দ্রুত সাবধানে গেলাম অন্ধকার দরজার

দিকে, পিছনে পড়ে রইল গির্জার স্নিগ্ধ মধুর আলো ও উষ্ণতা। বাইরে বিরস অন্ধকার, উপরে হাওয়ার হাহাকার... 'আমি চললাম!' — মনে মনে বলে টুপিটা পরলাম, আর ঠিক করলাম স্মলেন্‌স্কে যাব।

স্মলেন্‌স্কে কেন? তার কারণ হল ব্রিয়ানস্ক, 'ব্রীনস্কের' অরণ্য ও 'ব্রীনস্কের' ডাকাতদের বিষয়ে আমার স্বপ্ন... কোন এক গলিতে একটি রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়লাম। একটা টেবিলে হতচ্ছাড়া গোছের একজন প্রায় শুয়ে পড়ে গলা ফাটিয়ে গান গাইছে, ভাবখানা তার মাতালের — নিজের সর্বনাশে কাঁদুনে আনন্দের যে অভিনয় রুশীদের অতিশয় প্রিয় তার মহড়া চলেছে — তার স্বরে গাইছে: 'সর্বনেশে ভুলের ফলে ভাই হাতে পড়েছে হাতকড়া!' পাশের টেবিলে মাথা খাড়া করে কালো ঝোলা গোঁফে একটি লোক বিতৃষ্ণাভরে তাকে দেখছে; লম্বা গলা ও পাতলা চামড়ার নীচে নড়ন্ত তার বড়ো, খুঁচিয়ে ওঠা কথা থেকে মনে হয় লোকটা নির্ঘাত চোর। বারের কাছে নেশায় বুঁদ হয়ে দুলছে লিকলিকে পায়ে সাপটে বসা জীর্ণ পোষাকে একটি ঢাঙ্গা মেয়েমানুষ, ধোবানী হবে সম্ভবত: কে একটা লোক কত নচ্ছার সেটা বোঝাবার চেষ্টা করছে

বারের লোকটিকে হাত সজোরে চালিয়ে, বড়ো বেশী কাচা ধোওয়ার ফলে নখগুলো কাঁচের মতন চকচকে; কাউণ্টারে এক গেলাস ভোদকা, মাঝে মাঝে সেটা তুলে না খেয়েই ধরে থেকে — আবার নামিয়ে বকে চলেছে কাউণ্টারে নখে টোকা দিয়ে। ভেবেছিলাম বিয়ার নেব, কিন্তু জায়গাটার আবহাওয়া অত্যন্ত ভ্যাপসা ও নোংরা, বাতির আলো বড়ো টিমটিমে, আর ছোট, জমে-যাওয়া জানলাগুলোর ধারিতে পচধরা কয়েকটা ময়লা কাপড়ের টুকরো চুঁইয়ে গলন্ত বরফের জল ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ছে মেঝেতে...

দুর্ভাগ্যক্রমে ডাইনিং-রুমে আভিলভা কয়েকটি অতিথিকে আপ্যায়ন করছিল। — 'এই যে, আমাদের প্রিয় কবি দেখছি! — সে বলে উঠল। — অলাপ নেই?' — তার হাতে চুমো খেলাম, সবায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল আমাকে। তার পাশে সকালের কোট ও সাদা সিল্কের ওয়েস্টকোট পরিহিত একটি কুঞ্চিতচর্ম বৃদ্ধ, খাসা ছাঁটা গোঁফে বাদামি কল্প, টেকো মাথা ঢাকা বাদামি পরচুলায়; চটপট দাঁড়িয়ে উঠে মহাসৌজন্যে যেরকম ক্ষিপ্রভাবে নীচু হয়ে অভিবাদন জানালেন সেটা তাঁর বয়সের পক্ষে আশ্চর্য; তাঁর কোটের প্রান্তদেশে কালো জরি দেওয়া, জিনিসটা আমার

পছন্দ বরাবর, যাঁদের এ রকম কোট আছে তাঁদের ওপর হিংসে হত, আমারও ওরকম একটা হবে স্বপ্ন দেখতাম। বৃদ্ধের পাশে বসে একটি মহিলা চালাক চতুর কথাবার্তার অনর্গল ফোয়ারা বইয়ে দিয়েছেন, শক্ত গোলগাল হাত এগিয়ে দিলেন আমার দিকে, চকচকে মেদল হাতে দস্তানার ধারের কর্কশের ছাপ, দস্তানা এমনভাবে ধরে আছেন যেন সেটা মাছের ডানা। কথাবার্তা ভালোই বলেন ভদ্রমহিলা, ক্ষিপ্র ও সামান্য হাঁফ-ধরাভাবে; গলা বলে পদার্থের বালাই নেই, গায়ে চর্বি একটু বেশী, বিশেষ করে পেছন দিকটায় বগলের কাছে, কটিরেখা করসেটের চাপে পাথরের মতো গোল আর কঠিন, কাঁধে ঝুলিয়েছেন ধোঁয়াটে-তামাটে রঙের ফার, তার গন্ধ পশমের পোষাক ও উষ্ণ দেহ সেন্টের মধুর সৌরভের সঙ্গে মিশে অত্যন্ত গুমোট।

দশটার সময় অতিথিরা উঠে গৃহকর্ত্রীকে অনেক কিছু মিষ্টি কথা বলে বিদায় নিলেন।

— বাঁচলাম, বাবা! — খুশির হাসি হেসে বলে উঠল আভিলভা। — চলুন, আমার ঘরে গিয়ে বসা যাক। এখানকার জানলাটা খুলে দেওয়া উচিত... কিন্তু, বলুন তো, আপনার কী হয়েছে? — স্নিগ্ধ ভর্ৎসনার সুরে বলল, দুটো হাত আমার দিকে বাড়িয়ে।

হাতে চাপ দিয়ে বললাম:

— কাল চলে যাচ্ছি...

সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল সে:

— কোথায়?

— স্মলেন্স্কে।

— কেন?

— এভাবে থাকা আমার আর চলে না...

— কিন্তু স্মলেন্স্কে কেন? বসুন... আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না...

সোফায় দুজনে বসলাম, সোফায় পাতলা ডোরাকাটা গ্রীষ্মকালীন একটা ঢাকনা।

— এই ঢাকনাটা দেখছেন? — আমি বললাম। — রেলের সীটের ঢাকনার মতো। ধীরভাবে এটার দিকে তাকাতে পর্যন্ত আমি পারি না, এত ইচ্ছে হয় চলে যাবার।

আভিলভা সোফায় হেলে আরো ভালো করে বসাতে ওর পা দুটো চোখে পড়ল।

— কিন্তু স্মলেন্স্কে কেন? — বিস্মিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করল।

— সেখান থেকে ভিতেব্স্ক... পলৎস্ক...

— কিন্তু কেন?

— জানি না। প্রথমত, জায়গাগুলোর নাম আমার সুন্দর লাগে: স্মলেন্‌স্ক, ভিতেব্‌স্ক, পলৎস্ক...

— তামাসা রাখুন, সত্যি বলুন তো কেন?

— তামাসা করছি না। কয়েকটা শব্দের আওয়াজ কী অদ্ভুত সুন্দর, জানেন তো? আগেকার দিনে স্মলেন্‌স্ক কতবার দগ্ধ, কতবার না ঘেরাও হয়েছে... কেন জানি না সত্যি মনে হয় শহরটার সঙ্গে আমার যোগসূত্র আছে। জানেন, একবার ওখানকার ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রাচীন কয়েকটি দলিলপত্র পুড়ে যায়, ফলে আমাদের বংশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়ভাগ ও বিশেষ অধিকার আমরা হারাই...

— দিন আর কাটে না! ওর জন্য খুব মন কেমন করছে বুঝি? আপনাকে চিঠিপত্র দেয় না?

— না, লেখে না, কিন্তু সেটা বড়ো কথা নয়। মোটামুটি ওরিওলের জীবনযাত্রা আমার ধাতে সয় না। 'যাযাবর হরিণ জানে কোথায় তার চারণভূমি...' আমার সাহিত্যিক চেষ্টাও একেবারে কাজ দিচ্ছে না। সারা সকাল ওখানে বসে থাকি, মাথায় ছাইভস্ম ছাড়া কিছু নেই, যেন পাগল। আর কিসের দরুন বেঁচে আছি, জানেন? আমাদের ওখানে বাতুরিনোতে একটি দোকানদারের যে কন্যা আছে, বিয়ের আশা সে বিলকুল

ছেড়ে দিয়েছে, বেঁচে আছে শুধু তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে লোকের মন্দ দেখার বুদ্ধিতে। আমারও হাল সে রকম।

— আপনি এখনো নেহাৎ শিশু! — সস্নেহে বলে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল আভিলভা।

— একেবারে নীচু স্তরের প্রাণীরাই তাড়াতাড়ি বড়ো হয়, — আমি বললাম। — তাছাড়া, শিশু কে বা নয়? একবার ইয়েলেৎস্ক মহকুমা আদালতের একটি সদস্যের সঙ্গে ওরিওল পর্যন্ত একসঙ্গে গিয়েছিলাম, বেশ মানী, গম্ভীর প্রকৃতির ভদ্রলোক, দেখতে ইস্কাপনের রাজার মতো... বসে বসে 'নভয়ে ভ্রেমিয়া' পড়ছিলেন, তারপর উঠে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে উধাও হয়ে গেলেন। চিন্তিত বোধ করে আমিও বাইরে গিয়ে কামরার শেষে বারান্দার দরজাটা খুললাম। ট্রেনের গর্জনের দরুন ভদ্রলোক আমার উপস্থিতি টের পেলেন না — কী দেখলাম জানেন? খুব ক্ষিপ্র তালে নাচছিলেন, ট্রেনের চাকার শব্দে তাল রেখে অত্যন্ত জটিল সব পায়ের কাজ দেখাচ্ছিলেন।

আমার দিকে চোখ তুলে সে হঠাৎ বলল নরম গলায়, অর্থঘন সুরে:

— আমার সঙ্গে মস্কো যাবেন?

ভীষণ আতঙ্কের একটি রোমাঞ্চকর অনুভূতি বোধ করলাম... লাল হয়ে উঠে তুতলিয়ে বললাম 'না' আর ধন্যবাদ জানালাম... আজও সেই মুহূর্তটি মনে পড়ে বিষম লোকসানের যন্ত্রণায়।

১৬

পরের দিন রাত্রে চলেছি, ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর একটি নির্জন কামরায়। একেবারে একা, একটু ভয় হচ্ছে এমনকি। কাঠের বেঞ্চে কেঁপে কেঁপে পড়ছে একটি লণ্ঠনের অস্পষ্ট বিষণ্ণ আলো। কালো জানলার সামনে দাঁড়িয়ে দুহাতে আলো থেকে মুখ আড়াল করে একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছি রাত্রির দিকে, বনের দিকে, কালো জানলার অদৃশ্য ফুটো থেকে আসছে কনকনে ঠাণ্ডা তাজা হাওয়া। ঝাঁকে ঝাঁকে লাল মৌমাছি হাজারে হাজারে উড়ে চলে যাচ্ছে, তীরের মতন উড়ে গিয়ে ছাড়াছাড়ি হয়ে মিশে যাচ্ছে শীতের ঠাণ্ডায়, সে ঠাণ্ডায় ধূপ ও ইঞ্জিনের পোড়া কাঠের গন্ধ... আরণ্যক এই রাত্রিটা রূপকথার মতো কী অন্ধকার, কী মহিমময়, কী কঠোর! অন্তহীন সংকীর্ণ পথ বন কেটে গেছে, দুধারে নিবিড় বনের ঘনিষ্ঠ সারিতে জমাট বহু

প্রাচীন গাছের বিরাট অন্ধকার প্রেতমূর্তি। লাইনের পাশে সাদা বরফের স্তূপে আড়াআড়িভাবে পড়ছে জানলার আলোকিত আয়তক্ষেত্র, থেকে থেকে ক্ষিপ্র গতিতে ছুটে চলে যাচ্ছে টেলিগ্রাফের খুঁটি, — আর ওপরে ও দূরে সবকিছু অন্ধকারে ও রহস্যে সমাবৃত।

সকালে ঘুম ভাঙল হঠাৎ, শক্তির একটা উচ্ছ্বাসে: চারিদিক ফরসা ও চুপচাপ, ট্রেন থেমেছে, স্মলেন্স্কে এসে গেছি, স্টেশনটা বড়ো। ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে লোভীর মতো বুক ভরে নিলাম টাটকা হাওয়া... স্টেশনের ফটকের কাছে কী একটা ঘিরে ঠেসাঠেসি লোকের ভিড়। তাড়াতাড়ি গেলাম সেখানে: বুনো শুয়োর একটা, শিকারে মারা পড়েছে, প্রকাণ্ড বলিষ্ঠ জানোয়ারটা ঠাণ্ডায় জমে আড়ষ্ট, দেখতে তবু ভয়ংকর, সারা শরীরে খোঁচা খোঁচা মোটা লোমের দীর্ঘ, পাঁশুটে ডগায় শুকনো বরফের পাউডার; চোখদুটো পোষা শুয়োরের মতো, চাপা মুখ থেকে বেরিয়ে আছে দুটো ধারালো সাদা দাঁত। 'এখানে থেকে যাব?' ভাবলাম। 'না, আরও দূরে যাওয়া যাক, ভিতেব্স্কে!'

সেখানে যখন পেঁছিলাম তখন হিম স্বচ্ছ সন্ধ্যা। সবকিছু গভীর তুষারাবৃত নিঃশব্দ, পরিষ্কার ও অপাপবিদ্ধ, শহরটাকে দেখে মনে হল প্রাচীন ও অরুশী:

দীর্ঘ সব বাড়ি, সেগুলো মিলেছে তীক্ষ্ণাগ্র ছাদে। ছোট ছোট জানলা, একতলার মেঝেতে বেশ খানিকটা কেটে বসানো অর্ধবৃত্তাকার মোটা ফটক। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে লম্বা ফ্রক-কোট, সাদা মোজা ও ফিতে-দেওয়া বুট পরিহিত কয়েকটি বৃদ্ধ ইহুদী, তাদের জুলফি ভেড়ার বাঁকা বাঁকা শিঙের মতন, মুখ তাদের নিরক্ত বিষণ্ণ, জিজ্ঞাসু চোখ প্রায় যেন কালো। শহরের প্রধান রাস্তাটা হেঁটে বেড়াবার জায়গা — ফুটপাথে গজেন্দ্র গমনে চলেছে বিস্তর গোলগাল মেয়ে, মফস্বলের ইহুদীসুলভ জাঁকে তারা সজ্জিত ফিকে নীল, বেগুনি বা বৈক্রান্ত মণির মতো লাল পুরু মখমলের কোটে। তাদের পিছু পিছু কিন্তু সাবধানে দূরত্ব রেখে হাঁটছে যুবকেরা, মাথায় বোলর টুপি পরলেও জুলফি তারা ছাড়ে নি, ছোকরাদের মুখের প্রাচ্য সৌন্দর্যে কুমারীসুলভ একটা পেলব সুডৌল ভাব, গালে দাড়ির রেশমী রেখা, চোখ হরিণের মতো অলস... মন্ত্রমুগ্ধ যেন, চললাম ভিড়ের মধ্যে, সুন্দর অভিনব শহরটাকে মনে হচ্ছিল কত প্রাচীন।

অন্ধকার ঘনিয়ে এল, একটা চকে এসে দেখলাম একটি হলুদ রোমান-ক্যাথলিক গির্জা। তাতে দুটি ঘণ্টাঘর। ভেতরে ঢুকে দেখি আধো-আলোয় বেঞ্চের সারি, আর

সামনে একযোগে উপাসনার টেবিলে অর্ধবৃত্তাকারে রাখা ছোট ছোট মোমবাতি। তক্ষুণি ওপর থেকে কানে এল অর্গানের মন্থর আত্মনিমগ্ন শব্দ, স্নিগ্ধ মসৃণ তার প্রবাহ, তারপর আওয়াজটা বেড়ে ক্রমশ উঁচু, কর্কশ ও ধাতব হল, — কাঁপা কাঁপা, ঘষার মতো একটা আওয়াজ, যেন দম বন্ধ করা কী একটার হাত এড়াবার চেষ্টা করছে শব্দগুলো, তারপর হঠাৎ হাত ছিনিয়ে মহান, স্বর্গীয় সঙ্গীতে মুখর হয়ে উঠল... সামনে যেখানে প্রদীপের কম্পমান শিখা সেখানে অনুচ্চ কণ্ঠের ওঠানামা, অনুনাসিক সুরে লাটিন ভাষায় আবৃত্তি। প্রদোষের আলোতে বুঝতে পারলাম কয়েকটি বর্মাবৃত প্রতিমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে পাথরের থামগুলোর দুপাশে কালো প্রেতের মতন সার বেঁধে, থামগুলো অদৃশ্য হয়েছে ওপরের অন্ধকারে। বেদীর ওপর অনেক উঁচুতে রঙীন কাঁচের বড়ো জানলাটা আধো-অন্ধকার হয়ে উঠছে...

১৭

সেদিন রাত্রেই পিতার্সবুর্গে রওনা হলাম। গির্জা থেকে বেরিয়ে পলৎস্কের ট্রেন ধরার জন্য ফিরে গেলাম স্টেশনের দিকে: ইচ্ছে ছিল সেখানে কোনো পুরনো

হোটেলে থেকে যাব, কেন জানি না মনে হয়েছিল সেখানে দিন কতক কাটাই সম্পূর্ণ নিরালায়। বেশ রাত্রে ছাড়ার কথা পলৎস্কগামী ট্রেনের। স্টেশনটা ফাঁকা, অন্ধকার। কাউণ্টারে একটি মাত্র নিদ্রালস বাতির আলোয় রেস্তোরাঁটা আলোকিত, এত ছেড়ে ছেড়ে দেয়াল-ঘড়ির টিক টিক যে মনে হল সময়ের স্রোতটা শেষ হতে চলেছে। গুমোট স্তব্ধতায় সেখানে একেবারে একা বসে রইলাম কত কাল। অবশেষে সামোভার জ্বালানোর গন্ধ এল, আলো ও জীবনের সাড়া শুরু হল স্টেশনে, তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে, কী করছি না জেনেই পিতার্সবুর্গের টিকিট কাটলাম।

ভিতেব্স্ক রেলওয়ে স্টেশনে পলৎস্কের ট্রেনের জন্য অন্তহীন প্রতীক্ষায় বসে থাকার সময় চারিপাশের সবকিছু থেকে আমার ভয়াবহ বিচ্ছিন্নতা টের পেয়েছিলাম, অবাক ও বিব্রত লেগেছিল, — এ সবের মানে কী, কেন আমি এসবের মধ্যে বসে আছি, কেন? নিঃশব্দ, আবছা অন্ধকার সেই রেস্তোরাঁ, কাউণ্টারে নিদ্রালস বাতির আলো, ডাইনিং-রুমের ছায়াছন্ন বিস্তার, তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ, সব রেলওয়ে স্টেশনে যেমন, তেমনি কুরুচির সঙ্গে সাজানো টেবিলটা ঘরের মাঝখানের প্রায় সমস্তটা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে, বেখাপ্পা ঝুলে-পড়া টেল-কোট গায়ে ঘুম জড়ানো সেই বক্রদেহ বুড়ো ওয়েটার

সামোভার জ্বালানোর ঝাঁঝালো গন্ধ ঘরে ছড়িয়ে পড়াতে পা টেনে টেনে বেরিয়ে এল কাউন্টারের পেছন থেকে, বুড়োদের আক্রোশ ভরা বেঢপ ভঙ্গিতে দেয়ালের গায়ে সার বেঁধে দাঁড় করানো চেয়ারগুলোতে উঠে কম্পিত হাতে ম্যাড়মেড়ে কাঁচের গ্লোবে দেয়াল-বাতিগুলো জ্বালিয়ে দিল... তারপর দীর্ঘদেহ এক সশস্ত্র পুলিস অবজ্ঞাভাবে বুটের কাঁটা খটখটিয়ে রেস্তোরাঁ হয়ে বেরিয়ে গেল প্লাটফর্মে, যার মেঝে পর্যন্ত লম্বিত ফৌজী ওভারকোটের ফাঁকটা দেখে মনে পড়ে গেল দামী পালের ঘোড়ার লেজের কথা, — অর্থ কী এ সবের? কেন এ সব? কিসের জন্য? আর বাইরে যাবার সময় পুলিস দরজা খোলাতে ঘরে ঢুকল ঠাণ্ডা তুষার রাত্রির যে তাজা ঝলক, তার সঙ্গে এসবের কোনো মিলই নেই সেই মুহূর্তে, আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়ে হঠাৎ, অজ্ঞাত কোনো কারণে ঠিক করে ফেললাম পিতার্স্বর্গে যাব।

শীতের বৃষ্টি নেমেছে পলৎস্কে, রাস্তাগুলো ভিজে, কুৎসিত। দুটি ট্রেনের ফাঁক দিয়ে শহরটি দেখে নিজের হতাশায় খুশি লাগল। ট্রেনে যেতে যেতে লিখলাম: 'দিনটার শেষ নেই। তুষার ও অরণ্যাবৃত অন্তহীন প্রসার। জানলার বাইরে শুধু পাণ্ডুর আকাশ ও বরফ। বনে

ঢুকলে ট্রেনের ভেতরটা অন্ধকার, তারপর ট্রেন আবার বেরিয়ে আসে তুষারাবৃত সমভূমির বিরস বিস্তারে, আর চোখে পড়ে দূরে দিগন্তে অরণ্যপুঞ্জের ওপর আনত আকাশে শীসের মতো ঝাপসা কী একটা ভেসে আছে। সবকটা স্টেশন কাঠের তৈরী... উত্তর, উত্তরাঞ্চল!'

সুদূর উত্তরের জায়গা মনে হল পিতার্সবুর্গকে। ঘনীভূত তুষার-ঝড়ের মধ্য দিয়ে গাড়োয়ান সবেগে গাড়ি হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে লিগভ্কা ও নিকলায়েভ্স্কি স্টেশনের দিকে, রাস্তাগুলোর সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য অসাধারণ মনে হল। সবে বেলা দুটো, কিন্তু স্টেশনের ইমারতে গোল ঘড়িটা আলোকিত হয়ে ঝকঝক করছে তুষার-ঝড়ে। থামলাম ঠিক বাড়িটার সামনে, লিগভ্কার অন্য দিকটায়, খাল বরাবর। জঘন্য জায়গাটা — কাঠের গুদাম, গাড়োয়ানদের আস্তানা, চায়ের দোকান, সরাইখানা ও বিয়ার খাবার জায়গা। গাড়োয়ান যে হোটেলটার গুণগান করেছিল, সেখানে অনেকক্ষণ বসে রইলাম ওভারকোট না খুলে, ছ'তলার অসম্ভব বিরস জানলা থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে রইলাম গোধূলির আলোয় ঘোলাটে বরফের দিকে, ট্রেনের দোলায় ক্লান্তিতে মাথা ঘুরছিল... এই তাহলে পিতার্সবুর্গ! অত্যন্ত প্রখরভাবে মনে হল: অন্ধকার ও ভয়ংকর মহিমায় আচ্ছন্ন

এই শহরে তাহলে আমি উপস্থিত। পশমের পুরনো পর্দা, তারই সঙ্গে রঙ মেলানো সোফার চাদরের, ও হোটেলের সস্তা ঘরে যে লাল জিনিস দিয়ে মেঝে পালিশ করা হয়, তার কটুগন্ধে ঘরটা অত্যন্ত গরম ও গুমোট। বাইরে গিয়ে খাড়া সিঁড়ি ধরে তড়তড় করে নেমে গেলাম। রাস্তায় যেতেই দুর্ভেদ্য, ঘুরপাক-খাওয়া বরফের হিম আঘাত, তুষার-ঝড়ের ঝাপসা অন্ধকারে একটা শ্লেজ দেখতে পেয়ে সেটা নিয়ে তীরের মতন গেলাম ফিনল্যান্ড স্টেশনে, বিদেশের অনুভূতি লাভের জন্য। সেখানে চটপট নেশায় বুঁদ হয়ে ওকে একটা টেলিগ্রাম করে দিলাম:

'পরশুদিন আসছি'।

বিরাট, প্রাচীন ও জনসংকুল মস্কো আমাকে অভ্যর্থনা করল ঝকঝকে আলো, গলন্ত বরফ, জল-ধারা ও ডোবা, ঘোড়ার টানা ট্রামের উচ্চকিত ঘড়ঘড়, পদচারী ও নানা গাড়ির গোলমেলে বিশৃঙ্খলা, জিনিসপত্রে বিষম বোঝাই কত না মালবাহী শ্লেজ, নোংরা সরু গলি, প্রাচীর, প্রাসাদ ও অন্যান্য বাড়িসুদ্ধ মনোহরা ছাপা ছবির মতো ক্রেমলিন, আর গির্জার ঝকঝকে সোনালি গম্বুজের ছড়াছড়ি দিয়ে। অবাক লাগল সেণ্ট বাসিলের গির্জা দেখে, ক্রেমলিনের নানা ক্যাথিড্রালে গেলাম, লাঞ্চ খেলাম

অথৎনি রিয়াদের বিখ্যাত ইয়েগরভ রেস্তোরাঁয়। চমৎকার জায়গাটা: নীচে একটু ধূসর ও কোলাহলমুখরিত, বেচাকেনা চলেছে সাধারণ লোকের, কিন্তু ওপরের নীচু ঘরদুটো পরিষ্কার, চুপচাপ ও ভব্য, — এমনকি ধূমপান পর্যন্ত নিষিদ্ধ, — উঠান থেকে ছোট জানলা দিয়ে সূর্য উঁকি মারাতে বেশ আরামের, খাঁচায় গাইছে একটি ক্যানারি; কোণে একটি বাতির সাদা ঝিলিক, একটা দেয়ালের ওপর দিক জুড়ে হলদে-তামাটে বার্নিশ করা একটি কালো ছবি: তাতে দেখা যায় বন্ধুর ছাদ ওপরে উঠেছে বেঁকে, লম্বা বারান্দায় পীতমুখ অস্বাভাবিক বড়োসড়ো কয়েকটি চীনে চা খাচ্ছে — পরনে সোনালী পোষাক, সবুজ টুপি, সস্তা বাতির ঢাকনির মতো দেখতে... সেদিনই সন্ধ্যাবেলায় মস্কো ছাড়লাম...

আমাদের শহরে এরই মধ্যে শ্লেজের জায়গা নিয়েছে গাড়ি, আজও সমুদ্র থেকে দুরন্ত দামাল হাওয়া রাজত্ব করছে স্টেশনে। বরফের ভারমুক্ত খটখটে প্লাটফর্মে সে দাঁড়িয়ে আমার জন্য। বসন্তকালীন টুপিতে হাওয়ার ঝাপট, আমাকে দেখা মুশকিল তার পক্ষে। দূরে থেকে দেখলাম তাকে, — হারিয়ে-যাওয়া গোছের ভাব, হাওয়ায় চোখ কুঁচকে চলন্ত ওয়াগনের একটায় আমাকে দেখার চেষ্টা করছে। ছাড়াছাড়ির পর প্রিয়জনের মধ্যে যে করুণ

ও মর্মস্পর্শী একটা ভাব সর্বদা আমাদের নাড়া দেয়, সেই ভাব তার চেহারায়। আগের চেয়ে রোগা হয়ে গেছে, সাদাসিধে জামাকাপড় গায়ে। ট্রেন থেকে লাফিয়ে নামলাম, ঠোঁটের ওপর থেকে ওড়না ছাড়াবার চেষ্টা করল ও, পারল না, ওড়না না সরিয়েই চুমু খেল বেখাপ্পাভাবে, মৃতের মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর মুখ।

গাড়িতে হাওয়ার মুখে নিঃশব্দে মাথা হেঁট করে তিক্ত, বিরস গলায় কয়েকবার বলল:

— আমার কী দশা তুমি করেছ, কী দশা করেছ!

তারপর সমান বিরস গলায় বলল:

— ভরিয়ান্‌স্কায়া হোটেলে যাচ্ছ? তোমার সঙ্গে যাই, চলো।

ঘরে গিয়ে — দোতলার একটা বড়ো ঘর, পাশে ছোট আর একটা ঘর — ও সোফায় বসে দেখতে লাগল দারোয়ান কেমন বোকার মতো আমার স্যুটকেসটা ঘরের মাঝখানে কার্পেটের ওপর ধড়াস করে বসাল। তারপর আর কিছু চাই কিনা জিজ্ঞেস করল।

— না, আর কিছু চাই না, — আমার হয়ে ও বলল। — যেতে পারো...

তারপর টুপির পিন খুলতে লাগল।

— তুমি এত চুপচাপ কেন? কিছু বলছ না কেন ? — কম্পিত ঠোঁট চেপে জিজ্ঞেস করল উদাসীন সুরে।

ওর সামনে নতজানু হয়ে বসে ওর হাঁটু জড়িয়ে ধরলাম, কাপড়ের উপর মুখ রেখে তাতে চুমু খেয়ে কেঁদে ফেললাম। আমার মাথা তুলে ধরল ও — আবার আমার ঠোঁটে অনুভব করলাম ওর প্রিয়, অবর্ণনীয় মধুর ঠোঁট, শুনতে পেলাম আমাদের স্পন্দমান হৃদয় স্বর্গসুখে স্তব্ধ হয়ে এসেছে। লাফিয়ে ওঠে দরজায় চাবি দিয়ে জানলার ফুলে-ওঠা সাদা পর্দা কনকনে হাতে নামিয়ে দিলাম, — বাইরে হাওয়ায় দুলছে একটি কালো নিষ্পত্র গাছ, তার ডালে একটি দাঁড়কাক মাতালের মতো দুলে দুলে ডাকছে ঊর্ধ্বস্বর আতঙ্কে...

—বাবা শুধু চান আমরা বিয়েটা মাস ছয়েক পিছিয়ে দিই, — পরে, বিশ্রামের আলস্যে শুয়ে মৃদুকণ্ঠে ও আমাকে বলল। — সবুর করা চাই, আমার জীবন তো এখন সম্পূর্ণভাবে তোমার, তা নিয়ে যা খুশি করতে পারো।

ড্রেসিং-টেবিলে দীর্ঘ সাদা মোমবাতি কয়েকটি, শক্ত পর্দাগুলোয় নিষ্প্রভ সাদা ঝিলিক, আর খড়ির মতো সাদা সিলিং থেকে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে পলস্তারার বিচিত্র কারুকার্য।

১৮

ইউক্রেনের একটি শহরে আমরা যাব. খারকভ থেকে আমার ভাই গেওর্গি সেখানে এসেছে ইউনিয়ন বোর্ডের পরিসংখ্যান বিভাগের ভার নিতে. সেখানে আমাদের দুজনেরই চাকরি হবার কথা। খৃষ্টের পুনরুত্থান পর্বের আগেকার দ্বিতীয় সপ্তাহ ও ইস্টার আমরা কাটালাম বাতুরিনোতে। আমার মা ও বোন তাকে নিয়ে মুগ্ধ, বাবা তাকে আদর করে 'তুমি' বলে ডাকতেন, রোজ সকালে স্বেচ্ছায় তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিতেন চুমো খাবার জন্য, তার প্রতি শুধু আমার ভাই নিকলাইয়ের ব্যবহার গম্ভীর ও অতি ভদ্র গোছের। আমাদের সংসারের একজন সে, ব্যাপারটা অভিনব বলে ও শান্ত আর কোমলভাবে সুখী, আমাদের সংসারের একজন, আমাদের বাড়ির, ভিটেমাটির, যৌবনে যে-ঘরে আমি থাকতাম আর যে-ঘর তার কাছে এখন সুন্দর ও মরমী মনে হল তার একজন, আর আমার বইগুলোর, যেগুলো ভীরু আনন্দে সে দেখত উল্টে-পাল্টে... তারপর আমরা বাতুরিনো ছাড়লাম।

ওরিওলে যেতে একটি রাত্রি। সকালে খারকভের ট্রেনে ওঠা।

রোদেভরা একটি সকালে ট্রেনের বারান্দায় তপ্ত জানলার সামনে দুজনে দাঁড়িয়ে।

— সত্যি, কী আশ্চর্য, ওরিওল ও লিপেৎস্ক ছাড়া আর কোথাও কখনো যাই নি, — ও বলল। — এর পরে বুঝি কুস্‌র্ক? আমার কাছে এরই মধ্যে দক্ষিণী দেশ শুরু হয়ে গেছে।

— হ্যাঁ, আমার কাছেও।

— কুস্কের্ লাঞ্চ খাব? জানো, স্টেশনের রেস্তোরাঁয় কখনো লাঞ্চ খাই নি...

কুস্কের্র পর যত এগোই তত উষ্ণ ও প্রসন্ন। লাইনের ধারে ধারে তখনি ঘাসের ঘন সম্ভার, ফুল ও সাদা প্রজাপতি, আর প্রজাপতির মানে হল গ্রীষ্মকাল।

— গ্রীষ্মকালে ওখানে অসম্ভব গরম হবে! —মৃদু হেসে ও বলল।

— আমার ভাই লিখেছে শহরটা কিন্তু বাগানের মতো।

— তা বটে, ইউক্রেন কিনা। এর আগে কখনো ভাবি নি... দেখ, দেখ, কী বড়ো বড়ো পপলার গাছ! আর সবুজ এরই মধ্যে! এত হাওয়া-কল কেন?

— হাওয়া-পাম্প, হাওয়া-কল নয়। এবার চোখে পড়বে খড়ির পাহাড়, আর তারপর বেল্‌গরদ্‌।

— এবার তোমাকে চিনেছি, সত্যি, রোদের এই ঘটা ছেড়ে উত্তরে আমিও পারতাম না টিকতে।

জানলা নামিয়ে দিলাম। রৌদ্রোজ্জ্বল হাওয়ার গরম ঝলক, ইঞ্জিনের ধোঁয়ার কয়লার গন্ধ, আর দক্ষিণের চকিত আভাস। ও চোখ অর্ধেকটা বুজল, সূর্যের আলো তপ্ত রেখায় সঞ্চারিত হল ওর মুখে, কপালে খেলা-করা কালো নবীন কেশে, সাদাসিধে সুতির ফ্রকে; রোদে গরম হয়ে উঠে চোখ ঝলসে দিচ্ছে ফ্রকটা।

বেল্‌গরদের কাছে উপত্যকায় খুশিতে ফুলফোটা চেরি বাগান ও চুনকাম করা কুটিরের মধুর সাদাসিধে ছাপ। বেল্‌গরদের স্টেশনে রুটি বেচা ইউক্রেনীয় স্ত্রীলোকদের মন-জুড়ানো বকরবকর।

দর কষাকষি করে কয়েকটা ও কিনল, নিজের গেরস্থালি ও ইউক্রেনীয় শব্দের ব্যবহারে ভারি খুশি।

সে রাত্রে আবার ট্রেন বদলালাম খারকভে।

গন্তব্যে পৌছাব ভোরে।

ও তখনো ঘুমিয়ে। কামরায় মোমবাতির আলো প্রায় শেষ, স্তেপে তখনো রাত্রি, আবছা-আঁধার, কিন্তু স্তেপের ওপারে সুদূর, আনত, গোপন পূর্বাশা। আমরা যেখানে থাকি তার থেকে কত আলাদা এ জায়গাটার চেহারা, — ধূসর সবুজ উঁচু ঢিবি সুদ্ধ এই রিক্ত, সীমাহীন

সমভূমি! একটা সাবস্টেশন এক নিমেষে পার হয়ে গেলাম — ঝোপঝাড়, গাছ নেই একটিও, আর উষার এই রহস্যময় জন্মমুহূর্তে সে স্টেশনটাও কেমন নীলচে-সাদা পাথুরে রিক্ত: এখানকার ছোট ছোট স্টেশনগুলো কী নিঃসঙ্গ!

দিনের আলো ঢুকছে ট্রেনেও। নিচে, মেঝেতে তখনো ছায়া, কিন্তু আরো ওপরে আধো-আলো। ঘুমের মধ্যে ও বালিশের নিচে মাথা গুঁজে পা গুটিয়ে নিল। মা যে শালটা ওকে দিয়েছিলেন তা দিয়ে সাবধানে ওকে ঢেকে দিলাম।

১৯

স্টেশনটা শহর থেকে দূরে, প্রশস্ত একটি উপত্যকায়। হাসি মুখ ওয়েটার, অমায়িক কুলি ও দু'ঘোড়ার চওড়া গাড়ির সীটে বসা দিলদরাজ গাড়োয়ান, সব মিলিয়ে ছোটখাটো জায়গাটি প্রীতিকর।

ঘন বাগানের ছড়াছড়ি, পাহাড়ের চূড়ায় একটি ক্যাথিড্রাল, শহরটি পাহাড় থেকে চেয়ে আছে পূর্বে ও দক্ষিণে। পূর্বের উপত্যকায় এক টিলার চূড়ায় প্রাচীন একটি মঠ, তার ওপারে সবটা সবুজ আর ফাঁকা

সমভূমি, উপত্যকা ক্রমশ ভিড়েছে স্তেপে। দক্ষিণে, নদী ও উজ্জ্বল মাঠের ওপারে দৃষ্টি হারিয়ে যায় চোখ-ঝলসানো রোদে।

বাগান ও কাঠের পথের দুধারে সার বেঁধে দাঁড়ানো পপলারের ভিড়ে শহরের অনেক রাস্তা যেন কোন ঠেসা; কাঠের 'ফুটপাথে' ঘন ঘন দেখা হয়ে যায় উন্নত-বুক উদ্ধত মেয়েদের সঙ্গে, স্কার্ট আঁটো হয়ে বসেছে নিতম্বে, দুটো বালতি লাগানো ভারি বাঁখারি তাদের বলিষ্ঠ কাঁধে। অসাধারণ দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ পপলার গাছগুলির খুব তারিফ করতাম আমরা; তখন মে মাস, প্রায়ই বৈশাখী ঝড় ও মুষলধারে বৃষ্টি, শক্ত সবুজ চিকচিকে পাতাগুলো ছড়াত আলকাতরার তাজা সুগন্ধ!—এখানে বসন্ত সর্বদা দীপ্ত ও হাসিখুশি, গ্রীষ্ম গুমোট, হেমন্ত দীর্ঘ ও স্বচ্ছ, আর জোলো হাওয়ায় মোলায়েম শীতকাল, শ্লেজের ছোট ছোট ঘণ্টার চাপা আওয়াজে চমৎকার।

এরকম একটা রাস্তায় আমরা বাড়ি নিলাম, আমাদের বাড়িওয়ালা কভান্‌কো, তামাটে রঙের বড়োসড়ো বুড়ো, ছোটো ছোটো করে ছাঁটা পাকা চুল, রীতিমত জোতদার সে: একটা আঙিনা, একটা বার-বাড়ি, মূল বাড়ি ও তার পেছনের বাগান। সে থাকত বার-বাড়িতে, বাড়িটা

আমাদের ভাড়া দিল. চুনকাম করা বাড়ির সামনের দিকে কাঁচ-দেওয়া বারান্দা, পেছনের বাগানের দরুন ছায়াচ্ছন্ন জায়গাটা। কোথায় যেন সে কাজ করত; কাজ থেকে বাড়ি ফিরে ভালো করে ডিনার খেয়ে গড়িয়ে নিত একটু, তারপর সাজ গোজের তোয়াক্কা না রেখে খোলা জানলার সামনে বসে পাইপ খেতে খেতে গুণ গুণ করে ইউক্রেনীয় গান গাইত: 'পাহাড়ের গায়ে ফসল কাটছে চাষীরা...'

বাড়ির ঘরগুলো নীচু ও সাদাসিধে; বারান্দায় রঙীন সুতোয় গুণ-সেলাই করা কোড়া কাপড়ে ঢাকা একটা অতি পুরনো সিন্দুক। একটি কসাক মেয়ে আমাদের কাজ করত. তার রূপে নোগাইসুলভ কী যেন ছিল।

আমার ভাইয়ের ব্যবহার আরো মিষ্টি, আরো সহৃদয়। মিছে ভাবি নি, লিকা ও তার মধ্যে শীগগিরই খুব ভাব জমে গেল; ওদের কারও সঙ্গে আমি ঝগড়া করলে এ-ওর পক্ষ নিত।

আমাদের সহকর্মী ও বন্ধু চক্র (ডাক্তার. উকিল. ইউনিয়ন বোর্ডের লোক) খারকভে আমার ভাইয়ের বন্ধু চক্রের মতো, — এদের হালচালের সঙ্গে সহজে খাপ খাইয়ে নিলাম. খুব খুশি হলাম লেওন্তভিচ ও ভাগিনকে দেখে, তারাও খারকভ থেকে চলে এসেছে। খারকভের চক্রের সঙ্গে এদের একটি মাত্র পার্থক্য — সেটি হল এদের

মতামত আরো নরমপন্থী. ছোট শহরের স্বাচ্ছল্যে এদের জীবনযাত্রার ধরনটা প্রায় শহুরে, শুধু যে অন্য শহর থেকে আসা লোকজনের সঙ্গে এদের অমায়িক মেলামেশা তা নয়, এমনকি স্থানীয় পুলিসের কর্তার সঙ্গেও।

আমাদের আড্ডা সাধারণত বসত ইউনিয়ন বোর্ডের একটি কর্মকর্তার বাড়িতে। ভদ্রলোকের সাড়ে বার শ' একর জমি, দশ হাজার ভেড়া, — পরিবারের খাতিরে বাড়িটা রেখেছিলেন জমকালো, আতিথেয়তায় উচ্ছ্বল নিজে তিনি ছোটখাটো চেহারার সাদাসিধে মানুষ, ভালো জামাকাপড়ের বালাই নেই, এককালে ইয়াকুৎস্কে গিয়েছিলেন, নিজের বাড়িতে তাঁকে মনে হত গরীব অতিথির মতো।

২০

আমাদের আঙিনায় পাথরের একটা পুরনো কুয়ো। বার-বাড়ির সামনে দুটো সাদা বাবলা গাছ, আর বাড়ির দাওয়ার পাশে বাদাম গাছের কালো চূড়ার ছায়া পড়ত বারান্দার ডান দিকটায়। সকাল সাতটার মধ্যে সবকিছু রোদে ভরে গিয়ে তপ্ত উজ্জ্বল, উঠান থেকে আসা মুরগির একটানা, উৎকণ্ঠিত ডাকে সাড়া পড়ে যেত,

কিন্তু বাড়িতে, বিশেষ করে বাগানের দিকের ভেতরের ঘরগুলো তখনো ঠাণ্ডা, মুখ ধোবার জায়গার সামনে ছোট তাতারি চটি পায়ে, ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট বুকে যেখানে ও জল ছড়াত সেই শোবার ঘরে জল ও সাবানের টাটকা গন্ধ; ঘাড়ে চুলের নীচে সাবানের ফেনা, সলজ্জে ভিজে মুখ আমার দিকে ফিরিয়ে পা ঠুকে বলত, 'যাও বলছি এখান থেকে!' বারান্দার ঘর থেকে তারপর আসত সদ্য তৈরী চায়ের সুগন্ধ, — নাল-লাগানো জুতো ঠকঠকিয়ে কসাক মেয়েটি সেখানে কাজকর্মে ব্যস্ত; খালী পায়ে জুতো, মোজা নেই, জাত-ঘোড়ার মতো সরু গোড়ালি স্কার্টের নীচে চিকচিক করত প্রাচ্যসুলভ একটা মসৃণ দীপ্তিতে; এম্বার নেকলেস পরা সুডৌল গলাও চিকচিকিয়ে উঠত, কালো চুলের বেড়ে মুখ সজীব ও ভাবপ্রবণ, ব্যগ্র আগ্রহে ঝকঝকিয়ে উঠত বাঁকা চোখ, নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুলে উঠত নিতম্বদেশ।

ছোট হাজরির সময় হাজির হত আমার ভাই, হাতে সিগারেট, মুখের হাসিটা ও হাবভাব বাবার মতো; বেঁটে শরীর মোটা হয়ে যাচ্ছে, দেখতে বাবার মতো নয় বটে, তবে বাবার অভিজাত হালচালের কিছুটা বর্তেছে ছেলেতে: সৌখীন জামাকাপড়ের দিকে ঝোঁক, বেশ চালের মাথায় সিগারেট ধরায় ও পায়ের ওপর পা দিয়ে

বসে; এক কালে সকলের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, সে বিষয়ে তারও কোনো সন্দেহ ছিল না, কিন্তু এই সুদূর ইউক্রেনীয় শহরে এখনকার কাজে সে পুরোমাত্রায় সন্তুষ্ট, চোখে খুশির ঝিলিক নিয়ে আসে ছোট হাজরিতে: সুস্থসবল বহাল তবিয়তে, তার সংসার মানে আমরা, আমাদের প্রতি তার প্রবল অনুরাগ, আর অফিসে রোজ হাজিরা দেবার মানে বেশীর ভাগ সময় সিগারেট ফোঁকা ও আড্ডা মারা, যেমনটা হত খারকভে, সেটা তার মনের মতো ব্যাপার। শেষে গরমকালের খুশির পোষাক পরে বাইরে যাবার জন্য যখন আসত লিকা তখন ভ্রাতৃবর আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে চুমু খেত ওর হাতে।

রোদে ঝকঝকে সুন্দর পপলার গাছ ছাড়িয়ে, বাড়িগুলোর গরম দেয়াল ও রৌদ্রদীপ্ত বাগানের কাছঘেঁষা তপ্ত কাঠের ফুটপাথ হয়ে আমরা যেতাম; ঘন নীলে ফেঁপে ফুলে উঠত ওর ফিকে সিল্কের ছাতা। রোদে পোড়া একটা চক পার হয়ে যেতে হত ইউনিয়ন বোর্ডের হলদে বাড়িতে। একতলায় দারোয়ানদের টপবুট আর ওঁছা তামাকের গন্ধ। আলপাকার কোট গায়ে রাজ্যের পিয়ন আর কেরাণী — বাহ্যত সরল কিন্তু আসলে সেয়ানা ঘুঘুর জাত — ব্যস্তসমস্ত ভাবে

কাগজপত্র নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করত, মাথা হেলাবার ভঙ্গিটা তাদের ইউক্রেনীয়। সিঁড়ির পাশ কাটিয়ে আমরা যেতাম একেবারে একতলার ভেতর দিকের নীচু ঘরগুলোয়, সেখানে আমাদের বিভাগ, কর্মীদের দরুন জায়গাটা বেড়ে — কর্মীরা হলেন সরস সজীব বুদ্ধিজীবী, পোষাকে আশাকে, হাবে-ভাবে ঠাট নেই তাদের... সে সব ঘরে লিকা বসে নানা ধরনের খোঁজখবরের তালিকা বেছে খামে ভরছে জেলায় জেলায় পাঠাবার জন্য, দেখে অদ্ভুত লাগত।

দুপুরবেলায় সস্তা প্লেটে লেবুর টুকরো আর সস্তা গেলাসে আমাদের চা দিয়ে যেত দারোয়ানরা, প্রথম প্রথম এসবের নৈর্ব্যক্তিক দিকটায় এক ধরনের আনন্দ পেতাম। এ সময় অন্যান্য বিভাগ থেকে আমাদের বন্ধুরা আসতেন সিগারেট খেতে, গল্পগুজব করতে। আসতেন সুলিমাও. ইউনিয়ন বোর্ডের সেক্রেটারী। চেহারাটি ভালো, একটু কোল-কুঁজো, সোনার ফ্রেমের চশমা, জমকালো কালো চুল ও দাড়ি মখমলের মতো চকচকে, নরম চুপিসার তার হাঁটার ভঙ্গিটা, কৃপা করা গোছের, হাসি ও কথা বলার ধরনও তেমনি; মুখে সর্বদা হাসি লেগেই আছে, সর্বদা এই অলস অনুগ্রহের ভাণ তিনি করেন; মানুষটা রীতিমতো শিল্পরুচিবিলাসী, টিলার চূড়ার মঠটাকে

তিনি বলতেন 'জমে-যাওয়া সুর'। প্রায়ই আসতেন আমাদের বিভাগে, আর লিকার প্রতি তাঁর তাকানোর ধরনটা উত্তরোত্তর সহৃদয় ও রহস্যময় হয়ে উঠল; তার ডেস্কে গিয়ে হাতের ওপর ঝুঁকে অভিবাদন জানিয়ে চশমা কপালে উঠিয়ে মুখের দিকে তাকাতেন, মিষ্টি হেসে মোলায়েম সুরে বলতেন, 'এখন কী পাঠানো হচ্ছে, শুনি?' কথাটা শুনে খাড়া হয়ে বসে লিকা চেষ্টা করত যতটা সম্ভব ততটা মধুর ও খোলাখুলি জবাব দিতে। আমি এ সবে ভ্রুক্ষেপ করতাম না, ঈর্ষার ছোঁয়াচ আর লাগত না আমার।

আবার আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার পরোয়া না করে বেশ একটা অভিনব অবস্থা হল আমার, ঠিক ওরিওলে 'গলস' পত্রিকার অফিসে যেমন, কর্মী হিসেবে আমার প্রতি লোকের মনোভাব ছিল সহৃদয় ব্যঙ্গের। ধীরেসুস্থে নানা রিপোর্ট সংগ্রহ করতাম, অমুক মহকুমায়, অমুক জেলায় কতটা তামাক ও শালগম চাষ করা হয়েছে তার হিসেব, ফসলের পক্ষে হানিকর কীট-পতঙ্গের বিরুদ্ধে কী 'বন্দোবস্ত' করা হয়েছে তার বিবরণ নোট করে রাখতাম, মাঝে মাঝে আবার আশেপাশের কথাবার্তায় কর্ণপাত না করে বসে বসে বই পড়তাম। নিজের একটা ডেস্ক আছে, ফরমাশ করে যত খুশি নতুন নিব, কলম, পেন্সিল ও

লেখার চমৎকার কাগজ আনাতে পারি অফিসের গুদাম থেকে, বেড়ে লাগত ব্যাপারটা।

বেলা দুটো পর্যন্ত কাজ; তারপর আমার ভাই চেয়ার ছেড়ে উঠে হেসে হাঁকত, — 'এবার বাড়ি যাওয়া যাক!' — আর সবাই তাড়াহুড়ো করে দৌড়ত গ্রীষ্মকালীন ক্যাপ বা টুপি রাখার জায়গায়, ভিড় করে রৌদ্রোজ্জ্বল চকে দৌড়িয়ে বেরিয়ে, পরস্পরের করমর্দন করে, ছড়ি দোলাতে দোলাতে, সিল্কের ঝিলিক মেরে যেতাম যে যার পথে।

২১

বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত শহরের পথঘাট জনহীন, রোদে পুড়ত বাগানগুলো। আমার ভাই ঘুমোত, আর আমরা দুজনে গড়াগড়ি খেতাম লিকার বড়ো বিছানায়। বাড়ির চারপাশ ঘুরে সূর্য বাগানের গাছের ফিকে-সবুজ পত্রপুঞ্জ ভেদ করে উঁকি দিত শোবার ঘরের জানলায়, পত্রপুঞ্জের ছায়া পড়ত মুখ-ধোবার জায়গার ওপরকার আয়নাটায়। এ শহরে এককালে ছাত্র হিসেবে ছিলেন গোগল, আশেপাশের সমস্ত জেলা জানা ছিল তাঁর — মির্গরদ, ইয়ানভ্‌শিচনা, শিশাকি, ইয়ারেস্কি। আমরা

অনেক সময় হেসে আবৃত্তি করতাম: 'ইউক্রেনে গ্রীষ্মের দিন কী সুন্দর, কী দীপ্ত উজ্জ্বল!'

— যাই বলো, বড্ডো গরম কিন্তু! — খুশির দীর্ঘশ্বাস ফেলে উপুড় হয়ে শুয়ে বলত ও। — আর কত মাছি! আচ্ছা, সব্জী বাগানের বিষয়ে কী বলেছেন?

— 'নানা-রঙা সব্জী ছোপের উপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হচ্ছে এই সব অলৌকিক কীটপতঙ্গের মরকত, পোখরাজ ও চুনি পাথর...'

— মায়াবিনী সৌন্দর্য একটা এতে আছে সত্যি! মির্গরদ যেতে পারলে কী ভালো না লাগবে। এক দিন ওখানে না গেলে নয়, কী বলো? দোহাই তোমার, চলো না! কিন্তু কী অদ্ভুত মানুষ উনি ছিলেন, কী অপ্রীতিকর। কখনো কাউকে ভালোবাসেন নি, এমনকি যৌবনেও নয়...

— সত্যি, যৌবনে একটি মাত্র বোকার মতো কাজ করেছিলেন — সেটি হল লিউবেকে যাওয়া।

— পিতার্স্বুর্গে তোমার যাওয়ার মতো... ঘুরে বেড়াতে তোমার এত ভালো লাগে কেন?

— তোমার চিঠি পেতে এত ভালো লাগে কেন?

— আজকাল কে আর আমাকে চিঠি লেখে!

— তবু চিঠি পেতে তো তোমার ভালো লাগে।

প্রীতিকর বা চিত্তাকর্ষক কিছু একটা ঘটার প্রতীক্ষায় আমরা সবাই থাকি। স্বপ্ন দেখি শুভবিস্ময়ের, এ্যাডভেঞ্চারের। সেটাই হল পথে চলার মোহ। তাছাড়া, মুক্তির, ছাড়া পাওয়ার একটা বোধ... সেই অভিনবত্ব যেটা সর্বদা আনে ছুটির মেজাজ, বাড়িয়ে দেয় জীবন উপভোগের শক্তি, ঠিক এটাই তো আমরা সকলে চাই, খুঁজি যেকোনো গভীর আবেগের মধ্যে।

— তা বটে।

— পিতার্সবুর্গের কথা তুমি বলো। যদি জানতে অবস্থাটা কী জঘন্য ছিল, কী তাড়াতাড়ি আমার চরম উপলব্ধি হল যে শরীরে ও মনে আমি হলাম খাঁটি দক্ষিণের লোক। গোগল একবার ইতালি থেকে লেখেন: 'পিতার্সবুর্গ, বরফ, বদমায়েস, দপ্তর — এ সবের স্বপ্ন দেখলাম: ঘুম ভাঙল আবার নিজের দেশেই।' আর আমিও জেগে উঠেছি এখানে। রোমাঞ্চ হয় যখন শুনি: চিগিরিন, চের্কাসি, খরল, লুব্‌নী, চের্তমলীক, দিকয়ে পলে, রোমাঞ্চ হয় যখন দেখি নলখাগড়ায় ছাওয়া এখানকার চাল, চাষাদের কদমছাঁট মাথা, হলুদ ও লাল বুট পরা মেয়েদের, এমনকি বাঁকে করে যে সব ঝুড়িতে ওরা প্লাম আর চেরি নিয়ে যায় সেগুলো দেখলে পর্যন্ত রোমাঞ্চ হয়। 'যাতনায় পাক খেয়ে হাহাকারে কাঁদে পাখি

সন্তানের তরে; স্তেপের উপরে হাওয়ার উত্তরীয়, দীপ্ত সূর্য মধ্যাকাশে...' শেভ্‌চেন্‌কোর কবিতা -- কী অদ্ভুত প্রতিভা তাঁর! ইউক্রেনের মতো সুন্দর জায়গা পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। আর সবচেয়ে বড়ো কথা হল, ইউক্রেনের ইতিহাস বলে আর কিছু নেই এখন, অনেক, অনেক কাল আগে ফুরিয়ে গেছে তার ইতিহাস। শুধু আছে অতীত, আছে আগেকার দিনের গান ও উপকথা — সময়ের স্রোত নিথর যেন। সবচেয়ে বেশী আমার মন ভোলায় এটা।

— 'মন ভোলায়' কথাটা তুমি বড্ডো বেশী ব্যবহার করো, তাই না?

— জীবন তো মন-ভোলানো হওয়া উচিত।

সূর্য নেমে যেতে শুরু করত। খোলা জানলা দিয়ে দরাজ আলোর বন্যা পড়ত রঙ-করা মেঝেতে, খেলা করত ছাদে আয়নার প্রতিবিম্বের সঙ্গে, জানলার ধারিগুলো ক্রমশ উজ্জ্বল আর গরম হয়ে উঠত, মহানন্দে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছির গুঞ্জন সেখানে। লিকার শীতল নগ্ন কাঁধে কামড়াত তারা। একটা চড়ুই হঠাৎ জানলার ধারিতে বসে চারিদিক দেখে নিয়ে আবার ওপরে উঠে মিলিয়ে গেল গাছের দীপ্ত সবুজে, বিকেলের আকাশের গায়ে নকসা কেটেছে গাছগুলো।

— আচ্ছা, অন্য কিছু বলো তো এবার, — ও বলত। — বলো তো, আমাদের কখনো ক্রাইমিয়া যাওয়া হবে নাকি? কী স্বপ্ন দেখি যদি জানতে! স্বপ্ন দেখি তুমি একটা গল্প লিখবে — সুন্দর হবে গল্পটা মনে হয় — আর তখন কিছু টাকাকড়ি হাতে পেয়ে যেতে পারব বেড়াতে... লেখা ছেড়ে দিয়েছ কেন? সত্যি তুমি একটা উড়নচণ্ডী, নিজের সব ক্ষমতা নষ্ট করছ!

— জানো তো এককালে কিছু কসাক ছিল যাদের বলত 'ভবঘুরে', তারা শুধু ঘুরে বেড়াত বলে। মনে হচ্ছে, হয়ত, আমিও 'ভবঘুরে'। 'ঈশ্বর কাউকে দেন প্রাসাদ, আর কাউকে পথ।' গোগলের নোটবুকে আমার যেটা সবচেয়ে ভালো লাগে সেটা হল: 'রাস্তা থেকে আকাশে উঠল স্তেপের একটি গাংচিল, মাথার ঝুঁটিটা তার দেখতে বন্ধনীর মতো... সারা রাস্তা জুড়ে কাঁটা ঝোপের সবুজ একটি বেড়া, আর তার ওপারে শুধু অন্তহীন সমভূমি... বেড়া ও খানাখন্দের ওপর সূর্যমুখী ফুল, নিখুঁত প্রলেপ দেওয়া কুটিরের খড়-ছাওয়া চাল, সুন্দর জানলা ঘিরে আঁকা লাল একটি রেখা...তুমিই রাশিয়ার প্রাচীন উৎসমূল, যেখানে অনুভূতি আরো হৃদ্য স্লাভ স্বভাব আরো স্নিগ্ধ!'

খুব মন দিয়ে শুনে হঠাৎ লিকা বলে উঠল:

— আচ্ছা, বলো তো, গ্যেটের লেখার সেই জায়গাটা আমাকে কেন পড়ে শুনিয়েছিলে? ওই যে, যেখানে ফ্রেদেরিকাকে ছেড়ে যাবার পর হঠাৎ মানসচক্ষে দেখলেন একটি ঘোড়সওয়ার সোনালি জরি দেওয়া ধূসর কোট পরে কোথায় যেন যাচ্ছে? কী লিখেছিলেন?

— 'সে ঘোড়াসওয়ার আমি নিজে। পরনে সোনালি জরি দেওয়া ধূসর কোট, যেরকম কোট কখনো ছিল না আমার।'

— হ্যাঁ, সত্যি, সবটা কী অদ্ভুত আর ছমছমে। তারপর তুমি বললে যৌবনের কল্প লোকে সবাই দেখে স্বপ্নকোট... তিনি ফ্রেদেরিকাকে ত্যাগ করলেন কেন?

— তিনি বলতেন ভেতরকার 'দানব' তাঁকে সর্বদা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।

— তা সত্যি, আর তুমিও তো শীগগিরই আমাকে আর ভালোবাসবে না। আচ্ছা, ঠিক করে বলো তো, — সবচেয়ে বেশী করে কিসের স্বপ্ন দেখ?

— কিসের স্বপ্ন দেখি? ক্রাইমিয়ার প্রাচীন কোনো বাদশা যেন হই, আর তোমাকে নিয়ে থাকি বাখচিসরাই প্রাসাদে... বাখচিসরাই জায়গাটার সমস্তটা অগ্নিকুণ্ডের মতো গরম একটা পাথুরে গিরিপথ, কিন্তু প্রাসাদটা

সর্বদা ছায়ায় ভরা, ঠাণ্ডা তার ফোয়ারা, জানলার বাইরে তুঁত গাছ...

— সত্যি বলছ?

— সত্যি। জানোই তো আমার মনে সর্বদা ভয়ংকর আবোলতাবোল জিনিসের ভিড়। স্তেপের গাংচিলটার কথা ধরো, সমুদ্র ও স্তেপের মিশেল যেটা... মনে আছে নিকলাই হেসে বলত আমি জন্মে বোকা, শুনে ভয়ানক কষ্ট হত, শেষে একদিন হঠাৎ পড়লাম ডেকার্ট নিজে বলতেন যে তাঁর মানসিক জীবনে স্বচ্ছতা ও বুদ্ধিবৃত্তির স্থান ছিল সবচেয়ে গৌণ।

— আচ্ছা, প্রাসাদটায় হারেম আছে নাকি? এটা কিন্তু বেশ গুরুতর ব্যাপার। মনে আছে, তুমি আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করতে পুরুষের প্রেম হল রকমারি প্রেমের পাঁচমিশেলী, বলতে যে নিকুলিনা ও পরে নাদিয়ার প্রতি তোমার মনোভাব সে রকম ছিল... জানো, তুমি মাঝে মাঝে আমার সামনে বড্ডো বেশী নিষ্ঠুর খোলাখুলি কথা বলো। সেদিন কসাক মেয়েটির বিষয়েও ও ধরনের কী একটা বললে।

— খালি বলেছিলাম ওর দিকে যখন চেয়ে দেখি তখন ভীষণ ইচ্ছে হয় লবণাক্ত স্তেপের কোনো খানে গিয়ে তাঁবুতে দিন কাটাই।

— এই তো, নিজেই স্বীকার করছ যে ওর সঙ্গে তাঁবুতে থাকার ইচ্ছে তোমার।

— ওর সঙ্গে থাকার কথা বলি নি।

— তবে কার সঙ্গে? মাগো, আবার চড়ুই! ঘরে ঢুকে যখন আয়নায় ঠোক্কর খায় তখন ভীষণ ভয় হয়।

তড়াক্ করে উঠে ও হাততালি দিল তাড়াতাড়ি, বেখাপ্পাভাবে। ওকে ধরে চুমু খেলাম নগ্ন কাঁধে, পায়ে... সবচেয়ে বেশী আমাকে বিচলিত করত ওর শরীরের উষ্ণ ও ঠাণ্ডা জায়গাগুলোর পার্থক্য!

২২

সন্ধ্যার দিকে ঠাণ্ডা। বাড়ির পেছনে সূর্য নেমে আসত, বারান্দায় উঠানের দিকের জানলাগুলোর পাশে বসে চা খাওয়া। হালে অনেক পড়ত ও, চায়ের পর সাধারণত আমার ভাইকে নানা বিষয়ে জিজ্ঞেস করত, ভ্রাতৃবর ওকে জ্ঞানালোক বিতরণ করতে পেয়ে মহা খুসী। সন্ধ্যেবেলাগুলো একেবারে স্তব্ধ ও চুপচাপ, — শুধু উঠানে সোয়ালো পাখি এদিক-ওদিক চকিতে ঘুরে তারপর উড়ে অদৃশ্য হয়ে যায় অতল আকাশে। ওরা দুজনে কথাবার্তা বলত, আমি বসে বসে শুনতাম কে

যেন গাইছে: 'পাহাড়ের গায়ে ফসল কাটছে চাষীরা...' পাহাড়ের ওপর ফসল তোলার গান, বিরহের বিষণ্ণতায় মসৃণ মন্থর সে গানের প্রবাহ, তারপর মুক্তি, শৌর্য, সুদূরের মোহ, দুঃসাহস ও ফৌজী সুরে তার শক্তি ও মাত্রা বেড়ে যায়:

নীচে, পাহাড়ের নীচে,
ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে,
বীর কসাকেরা!

টানা-টানা বিষণ্ণ সুরে গান তন্ময় হয়ে উঠত উপত্যকায় কসাকদের রণযাত্রায়, দলের নেতা হল দুঃসাহসী দরশেন্‌কো, গানটা বলত, তার পিছু পিছু আসছে সাগাইদাচ্‌নি, —

কী চাই তোমার
হে বিচিত্র বীর কসাক,
কনে, না তামাকের পাইপ...

এই বিচিত্র মানুষটির প্রতি সগর্ব বিস্ময়ে ছেদ পড়ত মুহূর্তের, তারপর আনন্দের আপনহারা উচ্ছ্বাসে আবার ফেটে পড়ত গানে:

বৌয়ের ঝামেলা
সইবে না!
তবে তামাক আর পাইপ
দূর যাত্রায় কসাকের
কাজে লাগবে!

গান শুনতে শুনতে বিষণ্ণ মধুরতায় কিসের প্রতি যেন ঈর্ষা বোধ করতাম।

সূর্যাস্তের সময় বেড়াতাম, মাঝে মাঝে যেতাম শহরে, নয়ত পাহাড়ের ওপর ক্যাথিড্রালের পেছনের বাগানে, নয়ত শহর ছাড়িয়ে মাঠে বাটে। শহরে কয়েকটা বাঁধানো রাস্তা, সেখানে ইহুদী দোকানদারদের বেসাতি; অগুনতি ঘড়ি, তামাক আর ওষুধের দোকান। এ সব রাস্তায় বাড়িগুলো সাদা পাথরের, দিনের উত্তাপ ফুটে বেরোত সন্ধ্যাবেলায়, কোণে কোণে চালা-ঘরের দোকানে বিক্রী হত ফুঁসে-ওঠা জলের সঙ্গে নানা রঙের সিরাপ; সবকিছুতে দক্ষিণের ছাপ, ইচ্ছে হত আরো দক্ষিণে যাই, — মনে আছে খালি ভাবতাম কের্চের কথা তখন — শুধু কের্চ কেন, জানি না। ক্যাথিড্রালের বাগান থেকে নীচের উপত্যকার দিকে চেয়ে কল্পনা করতাম যাচ্ছি ক্রেমেন্‌চুগে বা নিকলায়েভে। খোলা মাঠে, শহরের বাইরে যেতাম পশ্চিম উপকণ্ঠ পার হয়ে, সেখানটা তখনও পুরোপুরি গেঁয়ো। কুটির, চেরি বাগান ও ফুটির ক্ষেত গিয়ে পড়েছে সমভূমিতে, তীরের মতো সোজা মির্গরদ সড়কের মুখোমুখি। টেলিগ্রাফের খুঁটি লাগানো সড়কে অনেক দূরে চোখে পড়ত মন্থরগতি একটা ইউক্রেনীয় গাড়ি, জোয়ালে দুলতে দুলতে টেনে চলেছে দুটো বলদ,

মাথা নামিয়ে, মন্থর গতিতে চলে, গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে যেত টেলিগ্রাফের খুঁটিগুলোর সঙ্গে, যেন সমুদ্রের গর্ভে আর ঝাপসা দূরে শেষ খুঁটিগুলো প্রায় দেখা যায় না, দেশলাই-এর খাড়া কাঠির মতো দেখতে তারা। রাস্তাটা গিয়েছে ইয়ানভ্‌শ্চিনা, ইয়ারেস্কি, শিশাকিতে...

শহরের পার্কে প্রায়ই সন্ধ্যা কাটাতাম। ব্যাণ্ডের বাজনা, রেস্তোরাঁর আলোকিত বারান্দা থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চের মতো চারিদিককার অন্ধকারের মধ্যে চোখে পড়ত অনেক দূর থেকে। আমার ভাই সটান যেত রেস্তোরাঁয় আর আমরা দুজন মাঝে মাঝে যেতাম পার্কের একেবারে শেষে, পাহাড়চূড়ার কিনারায়। গভীর কালো ও উষ্ণ রাত্রি। নীচে কোথায় যেন অন্ধকারে ছোট ছোট আলো, আর বন্দনার মতো মিলিত কণ্ঠে সুষম গান ভেসে আসত আমাদের কানে, ক্ষীণ হয়ে যেত মিলিয়ে — শহরতলির ছোকরাদের গান। সে গান মিশে একাকার হয়ে যেত অন্ধকারে ও স্তব্ধতায়। গুরু গুরু ধ্বনিতে ছুটে যেত আলোকিত জানলার ট্রেন, তখন বিশেষভাবে মনে নাড়া দিত — উপত্যকাটি কী গভীর ও অন্ধকার; ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসত গুরু গুরু ধ্বনি, ঝাপসা হয়ে যেত ট্রেনের আলো, যেন অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে পাতালে। আবার কানে বাজত গান, উপত্যকার ওপারে প্রসারিত দিকচক্রবাল

স্পন্দিত হয়ে উঠত ব্যাঙের অবিশ্রান্ত ডাকে, মনে হত সে ডাক এই স্তব্ধতা ও অন্ধকারকে সম্মোহিত করেছে, চিরকাল বেঁধে রেখেছে মায়ামন্ত্রে বিমুগ্ধ করে।

উপত্যকার অন্ধকারের পর রেস্তোরাঁর ভিড় ঠেসা বারান্দা বেশ মধুর সংকীর্ণ ও চোখ ধাঁধানো মনে হত। ভাগিন, লেওনতভিচ ও সুলিমার সঙ্গে একটা টেবিলে বসা আমার ভাইয়ের তখনি নেশা ধরে গেছে, শুরু হয়েছে ভাবালুতা, সে চটপট দাঁড়িয়ে হাত নাড়িয়ে ডাকত আমাদের। বেশ সরব অভ্যর্থনা, আনতে বলা হত আরো সাদা মদ, গেলাস ও বরফ। তারপর ব্যাণ্ডের বাজনা শেষ হত, পার্ক শূন্য ও অন্ধকার, ফুরফুরে হাওয়া উঠে ইতস্তত পোকা ছড়ানো, কাঁচের ঢাকনির ভেতরে মোমবাতির শিখাগুলিকে জ্বালাতন করত, কিন্তু সবাই বলত এত তাড়াতাড়ি যাবার সময় হয় নি, তাই বসে থাকতাম আমরা। শেষাশেষি যখন সবাই একমত: যাবার বেলা হয়েছে, তখনো চট করেই চলে যেতাম না। দল বেঁধে ফিরতাম, উচ্চকণ্ঠ চলত আলাপ, কাঠের ফুটপাথে পায়ের খটখট শব্দ। ঘন বাগানগুলি ঘুমন্ত, রহস্যে কালো কালো গভীর রাতের নীচু চাঁদের নরম আলোয় স্নাত। অবশেষে আমরা ছাড়া পেয়ে পেঁছতাম আমাদের আঙিনায়, সেখানে চাঁদের আলো চিকচিক করছে

বারান্দার কালো জানলাগুলোয়; একটি ঝিঁঝির শান্ত ডাক; বার-বাড়ির সাদা দেয়ালে আশ্চর্য স্পষ্টভাবে নিথর কালো ছায়ায় আঁকা বাবলা গাছের প্রত্যেকটি ছোট পাতা, প্রত্যেকটি ডাল।

ঘুমোবার আগের মুহূর্তগুলিই সবচেয়ে ভালো। বিছানার পাশের টেবিলে একটি মোমবাতির নরম আলো। নবীনতা, যৌবন, স্বাস্থ্যের পুলকে খোলা জানলা দিয়ে আসত ঠাণ্ডা আমেজ। ড্রেসিং-গাউন পরে বিছানার ধারে ও বসে থাকত কালো চোখ মোমবাতির শিখার দিকে মেলে, বাঁধত স্বল্প চিকচিকে চুল।

— আমার পরিবর্তন নিয়ে তুমি সব সময় ভাবো,— ও বলত। — কিন্তু তুমি নিজে কতটা বদলেছ তা তো জানো না। আজকাল ক্রমশ কম নজর দাও আমার দিকে, বিশেষ করে আমরা ছাড়া অন্য কেউ থাকলে! ভয় হচ্ছে শীগগিরই তোমার কাছে হাওয়ার মতো জিনিস হয়ে দাঁড়াব: হাওয়া ছাড়া লোক বাঁচে না বটে, কিন্তু তবু হাওয়ার কথা ভাবে না কেউ। কথাটা সত্যি, তাই না? তুমি বলো এই হল আসল প্রেম। কিন্তু আমার মনে হয় এর মানে হল এই যে তুমি আমাকে ছাড়া আরো কিছু চাও।

—সত্যি, আমি আরো চাই, আরো কিছু চাই. —

হাসতে হাসতে জবাব দিতাম। -- আমার এখন কিছুতেই মন ওঠে না!

— সেটাই তো বারবার বলি: তোমার মন সব সময় উড়ু উড়ু। তোমার ভাই বলেছেন সফরদার পরিসংখ্যানীদের সঙ্গে যাবার অনুমতি চেয়েছ তাঁর কাছে। কেন চাইতে গেলে? গরমে আর ধুলোয় গাড়িতে ঝাঁকুনি খেতে খেতে যাওয়া; তারপর ভ্যাপসা একটা জেলা অফিসে বসে দিনের পর দিন আমারই পাঠানো প্রশ্নাবলী নিয়ে ইউক্রেনীয়দের অশেষ জিজ্ঞাসাবাদ করা... কেন?..

আমার চোখে চোখ রেখে, বিনুনীটা পেছনে ছুঁড়ে দিয়ে বলল:

— কী টানে তোমাকে?

—আমি সুখী বলে কিছুই এখন যথেষ্ট ঠেকে না আমার কাছে, তাই।

আমার হাত নিজের হাতে রেখে ও শুধাল:

— সত্যি তুমি সুখী?

২৩

আমার প্রথম সফর সেই রাস্তাটা ধরে, যাতে ওর যাবার এত আগ্রহ ছিল, — মির্গরদ সড়ক। শিশাকিতে

ভাগিনের কী একটা কাজ ছিল, সে আমাকে সঙ্গে নিল।

মনে আছে ঠিক সময় যদি সেদিন ঘুম না ভাঙে, কী অস্থির ছিলাম আমরা, — গরম হবার আগেই সকাল সকাল আমাদের রওনা হবার কথা, — কেমন সস্নেহে ও আমাকে জাগিয়ে দিল, ভোর হবার আগে ঘুম থেকে উঠেছে, ছোট হাজরি তৈরী করেছে এরই মধ্যে, আমার সঙ্গে যেতে না পারার হতাশার ভাব কাটিয়ে। সকালটা মেঘলা, ঠাণ্ডা, বারবার জানলা দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছে ও, অস্বস্তি পাছে বৃষ্টিতে আমার সফরটা মাঠে মারা যায়। আজও অনুভব করি বাইরে গাড়ির ঘণ্টা শুনে কেমন স্নিগ্ধ উত্তেজিতভাবে দুজনে উঠে পড়েছিলাম অস্থিরতায়, গভীর আবেগে আলিঙ্গন সেরে দৌড়িয়ে গিয়েছিলাম ফটকে, যেখানে ভাড়াগাড়িতে বসে ছিল ভাগিন, পরনে তার লম্বা ঢিলে ওভারঅল, মাথায় গ্রীষ্মকালের ছাই-রঙা টুপি... পরে বিরাট আকাশের প্রসারে কেমন চাপা লেগেছিল গাড়ির ঘণ্টা, শুকনো ও তপ্ত হয়ে উঠেছিল রোদ-ওঠা দিনটা, রাস্তার জমাট গভীর ধুলো ভেঙে গাড়িটার মসৃণ গতি, আর আশেপাশের সবকিছু এত একঘেয়ে হয়ে গেল যে কিসের জন্য একাগ্র প্রতীক্ষায় সেই নিদ্রালস বিবর্ণ দূর সীমায় চেয়ে থাকা অসহ্য হল। দুপুরবেলায় পাকা গমের তপ্ত সমুদ্রে একটা জিনিস

চোখে পড়ল যেটা আমাদের নিয়ে গেল যাযাবরদের কালে: সেটা হল কচুবেইয়ের অসংখ্য ভেড়ার খোঁয়াড়। গাড়ির ঝাঁকুনির মধ্যে সময় করে লিখে রাখলাম: 'দুপুর, ভেড়ার খোঁয়াড়। উত্তাপে ধূসর আকাশ, বাজপাখি আর তরঙ্গিত মাঠ... আমার সুখের সীমা নেই!' ইয়ানভ্শিচনাতে লিখলাম: 'ইয়ানভ্শিচনা, পুরনো সরাইখানা, ভেতরটা কালো, ঠাণ্ডা আধো-আলো; ইহুদীটা বলল বিয়ার নেই, 'পানীয় শুধু আছে।' — 'সেটা আবার কী?' — 'কেন, পানীয়, বেগুনি পানীয়!' অস্থিচর্মসার ইহুদীটি সাবেকী কেতায় লম্বা ফ্রক-কোটে সজ্জিত, কিন্তু পেছনকার ঘর থেকে পানীয় এনে দিল তার অসাধারণ মোটা একটি ছোকরা, হাই-স্কুলের ছাত্র — ফিকে ছাই-রঙের টিউনিকে আনকোড়া নতুন একটা চামড়ার বেল্ট উঁচু করে লাগানো, কিন্তু দেখতে ভারি সুন্দর, মুখের ধাঁচটা পারসীক। শিশাকি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল গোগলের নোটের কথা: 'সমতল রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ গভীর ফাঁক হয়ে গেছে — যেন পাতালের খাড়া পাড়; আর সে গভীরে বন শুধু, আরো বন পেরিয়ে, সামনের গুলো সবুজ, দূরের গুলো ঘন নীল, আর তাদের ছাড়িয়ে বালুর বিস্তার, রুপালি খড়-রঙা... কিঁচকিঁচে হাওয়া-কল

ডানা নাড়ছে খাড়া পাড়ের উপরে...' উপত্যকার গভীরে, খাড়া পাড়ের নীচে, প্সিওল নদী অর্ধবৃত্তাকারে বাঁক নিয়েছে, সেখানে বাগানে সবুজ একটি গণ্ডগ্রাম। জনৈক ভাসিলেন্কোর সঙ্গে ভাগিনের কাজ ছিল, লোকটির খোঁজে সে গ্রামে অনেকক্ষণ কাটালাম, তার বাড়ি খুঁজে বের করবার পর জানা গেল সে নেই, তাই তার বাড়ির কাছে একটা লাইম গাছের নীচে বসে রইলাম, চারিধারে শুধু স্যাঁতসেঁতে উইলো আর ব্যাঙের ডাক। ভাসিলেন্কো এলে সারা সন্ধ্যে সেখানে বসে বসে বাড়িতে তৈরী নানা মদ ও খাবার খেলাম; টেবিলে রাখা বাতির আলো পড়ল লাইম গাছের পাতায়, এদিকে গ্রীষ্মরাত্রির দুর্ভেদ্য অন্ধকার জমাট হয়ে উঠল চারিধারে। হঠাৎ একটা বেড়ার দরজার ধড়াম শব্দ অন্ধকারে, আর পাউডার মেখে সীসের মতো বিবর্ণ মুখে একটি মেয়ে এল আমাদের টেবিলে জমকালোভাবে, ভাসিলেন্কোর বান্ধবী, ইউনিয়ন বোর্ডের কম্পাউণ্ডার সে; শহর থেকে আগত অতিথিদের আপ্যায়ন চলেছে সেটা চটপট বুঝে প্রথমে তার অত্যন্ত অস্বস্তি, কেমন ধারা ব্যবহার করা উচিত ভেবে না পেয়ে মনে যা এল তাই বলে বসল, কিন্তু তারপর আমাদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে গেলাসের পর গেলাস সাবাড় করতে লাগল, আমার

প্রতিটি ইয়ার্কিতে ক্রমশ সশব্দ তার তীক্ষ্ম হাসি। মেয়েটি অত্যন্ত ছটফটে প্রকৃতির. চোয়ালের হাড় চওড়া, তীক্ষ্ম কালো চোখ, পেশীবহুল হাতে সেণ্টের কড়া গন্ধ, কণ্ঠার হাড় উদ্‌গত, পাতলা নীল ব্লাউজের নীচে ভারি বুক আনত, কোমর সরু, পাছা ভারি। মাঝরাতে বাসায় পেঁাছিয়ে দিলাম তাকে। দুর্ভেদ্য অন্ধকারে শুকিয়ে শক্ত খড়খড়ে চাকার দাগের ওপর দিয়ে হেঁটে ঢুকলাম একটা গলিতে। কঞ্চির বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে সে আমার বুকে মাথা রাখল। অনেক কষ্টে ভেতরে যাবার ইচ্ছে সামলালাম...

পরের দিন বেশ দেরীতে ভাগিন ও আমি বাড়ি ফিরলাম। লিকা তখনি একটা বই নিয়ে শুয়ে পড়েছে। আমাকে দেখে অবাক খুশিতে উঠে বসল, চেঁচিয়ে বলল, 'এরই মধ্যে ফিরে এসেছ?' আমার সফরের কথা তাড়াতাড়ি বলে যখন হাসতে হাসতে কম্পাউণ্ডার মেয়েটির কথা জানালাম, তখন বাধা দিয়ে ও বলল:

— ওটা আমাকে না বললেই নয়?

ওর চোখে দেখা দিল জল।

— সত্যি কী নিষ্ঠুর তুমি! — বালিশের নীচে রুমালটা তাড়াতাড়ি হাতড়াতে-হাতড়াতে বলল। — আমাকে একলা ফেলে গেছ তাতেও তোমার পোষাল না...

জীবনে পরে কতবার না মনে পড়েছে সেই অশ্রুজলের কথা। যেমন, বিশ বছর পরে একদিন তখন বেসারাবিয়ায় সমুদ্রের ধারে বাগান বাড়ীতে আছি। সাঁতার সেরে পড়ার ঘরে এসে শুয়েছি। দামাল হাওয়ার তপ্ত মধ্য দিন: সিল্কের মতো খসখসে গরম জোরালো হাওয়ার মুখর শব্দ বাড়ির চারপাশে মাঝে মাঝে মিলিয়ে গিয়ে আবার তীব্র দাপটে ভেঙে পড়ছে, সে হাওয়া, গাছে গাছে আলো-ছায়ার লুকোচুরি, নরম নুয়ে পড়া ডালপালার দোলন... আবার তীব্র জোরালো হয়ে উঠল হাওয়া, জানলার সামনে গাছের সবুজ পর্দা হঠাৎ ছিন্ন হয়ে দেখা গেল এনামেলের মতো চকচকে, গুমোট আকাশ. তক্ষুণি ঘরের সাদা ছাদে দেখা দিল একটা ছায়া, ফিকে বেগুনি রঙ ধরল ছাদটা। তারপর আবার সবকিছু শান্ত, হাওয়া ছুটে গিয়ে মিলিয়ে গেল বাগানের গভীরে, সমুদ্রের পাড়ে খাড়া পাহাড়ে। তাকিয়ে থেকে কান পেতে শুনছি, হঠাৎ মনে হল: কোথায় যেন, বিশ বছর আগে, ইউক্রেনের অনেকদিন ভুলে-যাওয়া সেই শহরে, যেখানে আমরা শুরু করেছিলাম যুগল জীবনযাত্রা, এসেছিল এমন একটি দুপুর: আমার ঘুম ভাঙ্গল দেরীতে, — ও তখন অফিসে চলে গেছে, — বাগানের দিকের জানলা খোলা, বাইরে গুঞ্জরিত ও দোলন্ত গাছগুলো ঠিক

এমনিভাবে আঁধার ও আলো হয়ে যাচ্ছিল নিমেষে নিমেষে, আর ঘর ভরে গিয়েছিল দুনিয়ার সেই রকম সুখের হাওয়ায় যাতে ভেসে আসে ছোট হাজরির আভাস ও ভাজা পেঁয়াজের সুগন্ধ; চোখ মেলে, বুক ভরে হাওয়া নিয়ে, বালিশটা একটু উঁচু করে, শুয়ে তাকিয়ে রইলাম অন্য বালিশের দিকে, তাতে তখনো লেগে আছে ওর সুন্দর কালো চুলের ক্ষীণ বেগুনি সুরভি আর ছোট্ট সেই রুমালটির গন্ধ যেটা আমাদের ভাব হবার পরও অনেকক্ষণ ও হাতের-মুঠোয় ধরে ছিল; এ সব যখন মনে পড়ে গেল, মনে পড়ে গেল যে তারপর ওকে ছাড়া আমার জীবনের অর্ধেক কাটিয়ে দিয়েছি, ঘুরেছি সারা দুনিয়ায়, পৃথিবীতে চোখ মেলে এখনও বেঁচে আছি, আর ও নেই এখানে, অনন্তকাল ধরে নেই, তখন আমার শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহ থেমে গেল, সোফা থেকে চকিতে পা নামিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, কিছুর হুঁশ নেই, অম্লতরুর বীথি ধরে গেলাম পাহাড়ের খাদটায় আর তাকিয়ে রইলাম নীচে হিরাকসের মতো সবুজ এক টুকরো সমুদ্রের দিকে, হঠাৎ মনে হল এই সমুদ্র করাল ও অপরূপ, আদিম ও নতুন... সে রাত্রে আমি ওর কাছে শপথ করেছিলাম আর কখনও ওকে ছেড়ে যাব না। কয়েক দিন পরে আবার পথে বেরিয়ে পড়লাম।

২৪

বাতুরিনোতে থাকার সময় আমার ভাই নিকলাই বলত:

— তোমার জন্য ভয়ানক দুঃখ হয়। তুমি নিজেকে শেষ করে দিয়েছ অত্যন্ত অকালে।

আমার কিন্তু মোটেই মনে হত না যে নিজেকে শেষ করে দিয়েছি।

কাজটাকে আবার মনে হত সাময়িক একটা ব্যাপার, নিজেকে বিবাহিত লোক বলে ভাবতে পারতাম না। ওকে ছেড়ে থাকতে হবে ভাবলেই ভয়াবহ লাগত বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সারা জীবন একসঙ্গে থাকার কথাটা মনে হলে অবাক বোধ করতাম: সত্যি কি আমরা বরাবরের জন্য বাঁধা পড়েছি একসূত্রে, এভাবে কাটবে বার্ধক্য পর্যন্ত, অন্য সকলের মতো ঘর বেঁধে পুত্রকন্যাদি নিয়ে থাকব? শেষের ব্যাপারটা — ঘর বাঁধা ও পুত্রকন্যাদি বিশেষ করে অসহ্য মনে হত।

— এক দিন তো আমাদের বিয়ে হয়ে যাবে, — স্বপ্নালসভাবে ও আমাকে বলত। — সত্যি, বিয়ে করতে ভয়ানক মন চায়, আর গির্জায় গিয়ে বিয়ে করার চেয়ে সুন্দর জিনিস আর কিছু নেই! আমাদের হয়ত বাচ্চা একটা হবে... তোমার ভালো লাগবে না?

গোপন মধুর বেদনায় মনটা মুচড়ে উঠত, কিন্তু সেটা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলতাম:

— 'অমর জনেরা সৃষ্টি করেন, আর মর্ত্য মানুষ নিজেদের মতো লোকের জন্ম দেয়।'

— আর আমি? — ও শুধালো। — যখন আমাদের ভালোবাসা আর যৌবন শেষ হয়ে যাবে, যখন আমাকে তোমার আর ভালো লাগবে না, তখন কী নিয়ে বাঁচব?

কথাটায় অত্যন্ত বিষাদের রেশ, তাই গভীর আবেগে ঘোষণা করলাম:

— কিছুই শেষ হবে না, তোমাকে চাওয়ার শেষ আমার কখনো হবে না!

সবকিছুতে আমার স্বাধীনতা ও প্রাধান্য বজায় রেখে এখন আমি চাই ভালোবাসা পেতে ও ভালোবাসতে (ঠিক ও যেমন চেয়েছিল ওরিওলে)।

সবচেয়ে বেশী আমার মনে নাড়া দিত ও যখন শোবার সময় বিনুনি বেঁধে আমার কাছে এসে চুমু খেয়ে শুভরাত্রি জানাত; দেখতাম উঁচু হিল না থাকলে ও কত না ছোট, আমার চোখে চোখ রাখার জন্য মাথা বেশ উঁচু করতে হয় ওকে।

কিন্তু ওকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতাম সেই সব মুহূর্তে যখন আমার প্রতি একনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়ে

নিজের সাধ ও ইচ্ছে বরবাদ করে অনুভূতি ও কাজের একটা স্বকীয় বিশিষ্টতায় আমার অধিকার ও মেনে নিত।

ওরিওলে কাটানো সেই শীতকালের কথা প্রায়ই আমরা মনে করতাম, কী করে ছাড়াছাড়ি হল, কী করে আমি চলে গেলাম ভিতেব্‌স্কে, আর আমি বলতাম:

— পলৎস্ক জায়গাটার কী মোহ ছিল সত্যি আমার কাছে? জানো পলৎস্ক শব্দটা বহুকাল ধরে আমার মনে জড়িত প্রাচীন কিয়েভের প্রিন্স ভ্‌সেস্লাভের বিষয়ে একটি উপকথার সঙ্গে, স্কুলে যখন ছিলাম তখন কোথায় যেন উপকথাটি পড়ি: প্রিন্স ভ্‌সেস্লাভকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর ভাই, আর তিনি 'পলৎস্কবাসীদের অন্ধকার দেশে' পালিয়ে গিয়ে জীবন শেষ করেন 'মিতব্যয়ী দারিদ্র্যে', আত্মত্যাগে, প্রার্থনায়, পরিশ্রমে ও 'মোহাচ্ছন্ন স্মৃতিতে': 'তিক্ত মধুর অশ্রুজলে' ভোর হবার এক ঘণ্টা আগে ঘুম ভাঙ্গত তাঁর, মনে লেগে থাকত রঙীন স্বপ্ন যে আবার তিনি কিয়েভে, আছেন 'তাঁর সেই সত্যিকার রাজকীয় মর্যাদায়', প্রভাত প্রার্থনার এই ঘণ্টাধ্বনি মোটেই পলৎস্কে নয়, কিয়েভের সেণ্ট সোফিয়া ক্যাথিড্রালের। আর এটা পড়ার পর থেকে

তখনকার দিনের পলৎস্ক তার প্রাচীনতা ও বর্বরতায় আমার কাছে সর্বদা নিখুঁত অপরূপ ঠেকেছে: মানসচক্ষে দেখতাম শীতের একটি অন্ধকার হিংস্র দিন, কাঠের গির্জা ও ঝুলকালো কুটির সুদ্ধ কাঠের তৈরী একটি ক্রেমলিন, ঘোড়ার খুরে আর ভেড়ার চামড়ার কোট ও গাছের ছালের জুতো পরিহিত লোকেদের পায়ে বরফ দলিত... তারপর যখন সত্যিকার পলৎস্কে হাজির হলাম তখন অবশ্য আমার কল্পলোকের পলৎস্কের সঙ্গে বিন্দুমাত্র মিল দেখলাম না। তবু তখন থেকে আমার কাছে দুটো পলৎস্ক আছে — স্বপ্নের পলৎস্ক আর বাস্তব পলৎস্ক। এখনো কল্পনার জালের ভেতর দিয়ে দেখি আসল পলৎস্ককে: শহরটা বিরস, স্যাঁতসেঁতে, ঠান্ডা, বিষণ্ণ, কিন্তু রেলওয়ে স্টেশনের বড়ো খিলান দেওয়া জানলা সুদ্ধ প্রকাণ্ড হলটা গরম, সবে দিনের আলো ম্লান হয়ে যেতে শুরু করেছে বটে, তবু বাতির ঝাড়ে আলো জ্বালানো হয়েছে, ফৌজী ও বেসামরিক পোষাকে সজ্জিত লোকেদের ভিড় সে ঘরে, পিতার্সবুর্গগামী ট্রেন আসার আগে তাড়াহুড়ো করে তারা খেয়ে নিচ্ছে, কণ্ঠস্বরে, প্লেটে ছুরি লাগার শব্দে, ট্রে'তে করে সুগন্ধি বাঁধাকপির সুপ নিয়ে যাওয়া ওয়েটারদের ছুটোছুটিতে হৈচৈ পড়ে গেছে সবখানে...

এ রকম ভাবে যখনি কথা বলি ও গভীর আগ্রহে শোনে, থামলে পরে বিশ্বাসের সুরে বলে ওঠে: 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝতে পারছি!' আর এ সুযোগ হাতছাড়া না করে আমি ওকে বোঝাতাম:

— গ্যেটে বলেছেন: 'আমাদের নিজেদের সৃষ্টির কাছেই আমরা পরাধীন।' কয়েকটা ভাবাবেগ আছে যাদের হাত আমি কিছুতেই এড়াতে পারি না, তাদের কাছে অসহায় ঠেকে নিজেকে: থেকে থেকে কোনো একটা জিনিস সম্পর্কে আমার কল্পনা সেখানে যাবার জন্য এমন একটা যন্ত্রণাকর ব্যাকুলতা আনে, কল্পিত সেই জায়গায় যাবার, মানে সে কল্পনার আড়ালে যা আছে, বুঝেছ তো: আড়ালে! যে তোমাকে বোঝাতে পারব না!

একবার ভাগিন ও আমি গেলাম নীপার উপত্যকার প্রাচীন একটি গ্রামে, কাজাচি ব্রদীতে, উসুরি জেলায় আস্তানা বাঁধতে যাচ্ছিল সেখানকার লোকে, তাদের বিদায় জানাতে। ভোরবেলায় ট্রেনে করে ফিরে এলাম একদিন। বাড়িতে পেঁছিলাম যখন, সে ও আমার ভাই অফিসে চলে গেছে। রোদে পুড়ে বেজায় প্রাণবন্ত ও যুৎসই লাগছিল, নিজেকে নিয়ে বেজায় খুশি, অদ্ভুত যে দৃশ্য দেখেছি তার কথা ওদের বলার জন্য অধৈর্যে অস্থির, —

দেখেছি দলে দলে লোক যাচ্ছে উপকথার সেই দেশে, কাজাচি ব্রদী থেকে সাত হাজার মাইল দূর দূরান্তরে— সবকটা ঘর দ্রুত পদক্ষেপে পার হই,ঘরগুলো ফাঁকা, গোছানো, মুখহাত ধুয়ে জামাকাপড় বদলানোর জন্য ঢুকলাম শোবার ঘরে, ড্রেসিং টেবিলে ওর টুকিটাকি জিনিস, বড়ো বালিশের ওপর রাখা লেস-কাটা ওর ছোট্ট বালিশটা দেখলাম আনন্দের অদ্ভুত একটা ব্যথায় — সবকিছু কী অসীম প্রিয় ও নিঃসঙ্গ মনে হল, ওর প্রতি অপরাধ করার চরম সুখের একটা ভাবে মনটা কী তীব্র ব্যথিয়ে উঠল, — হঠাৎ চোখে পড়ল বিছানার পাশের টেবিলে একটা খোলা বই, একটু দাঁড়ালাম, তলস্তয়ের 'সাংসারিক সুখ', দাগ দেওয়া আছে এই জায়গাটায়: 'আমার তখনকার সমস্ত ভাবনা, সমস্ত অনুভূতি আমার নয়, তার, যা আমি নিজের করে নিয়েছি...' গোটা কতক পাতা উলটে দেখলাম আরো কয়েকটা লাইনের নীচে দাগ কাটা: 'সে গ্রীষ্মে আমি প্রায়ই যখন শোবাব ঘরে যেতাম তখন আগেকার কামনার জ্বালা ও ভবিষ্যতের আশার বদলে প্রায়ই আমাকে পেয়ে বসত বর্তমানে সুখের জন্য উৎকণ্ঠা... এইভাবে কাটল গ্রীষ্ম আর নিজেকে আমার মনে হতে লাগল নিঃসঙ্গ। ও সর্বদাই সফরে যেত, আমায় একলা ফেলে রেখে যেতে ওর কষ্ট হত না, ভয় হত না...'

কয়েক মুহূর্ত স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। বুঝলাম এর আগে কখনো আমার হুঁশ হয় নি যে, আমার জানা নেই এমন কোনো গোপন মনোভাব ওর থাকতে পারে (এবং আছে), তার চেয়ে বড়ো কথা, সে সব মনোভাব ও চিন্তা বিষণ্ণ, তারা প্রকাশিত হয়েছে অতীতবাচক ক্রিয়ারূপে! 'আমার **তখনকার** সমস্ত ভাবনা, **তখনকার সমস্ত** অনুভূতি... প্রায়ই সেই গ্রীষ্মকালে আমি **আসতাম...**' শেষ কথাগুলোই অপ্রত্যাশিত: 'এইভাবে কাটল গ্রীষ্ম, আর নিজেকে আমার মনে হতে লাগল নিঃসঙ্গ...' তার মানে, সে রাত্রে শিশাকি থেকে আমার ফেরার পর ওর অশ্রুজল দৈবাৎ-গোছের ব্যাপার নয়?

বড়ো বেশী খোশমেজাজের ভাণ করে অফিসে ঢুকে ফুর্তিতে চুমু খেলাম ওকে ও ভাইকে, বকবকানি, হাসিঠাট্টা চালালাম। মনে গোপন ব্যথা নিয়ে এভাবে চালালাম যতক্ষণ না ওকে একলা পেলাম, আর তক্ষুণি কোনো ভণিতা না করে কর্কশ সুরে বললাম:

— বেশ, আমি যখন ছিলাম না তখন 'সাংসারিক সুখ' পড়া হচ্ছিল, তাই না?

লাল হয়ে উঠে ও বলল:

— হ্যাঁ। কেন?

— যে সব লাইনে দাগ দিয়েছ দেখে অবাক হয়ে গেছি!

— কেন?

— কেননা তা থেকে এটা স্পষ্ট যে তুমি ইতিমধ্যে আমাকে নিয়ে অসুখী, ইতিমধ্যে তোমার নিঃসঙ্গ ও হতাশ লাগছে।

— সব সময়ই তোমার বাড়াবাড়ি! — ও বলল। — হতাশ হব কেন? শুধু মন একটু খারাপ হয়েছিল, আর সত্যি একটা সাদৃশ্য ধরা পড়েছিল আমার কাছে... কিন্তু তুমি যা ভাবছ মোটেই তা নয়, সত্যি বলছি।

কাকে বোঝাবার চেষ্টা ও করল? আমাকে না নিজেকে? যা হোক, যা বলল তা শুনে বেশ খুশি হলাম — ওকে বিশ্বাস করায় আমার একান্ত আগ্রহ, ওকে বিশ্বাস করাটা আমার পক্ষে বেশ যুৎসই। 'রাস্তা থেকে আকাশে উঠল স্তেপের ঝুঁটিওয়ালা গাংচিল... ও চলেছে তাড়াতাড়ি, কোমরে আঁটো করে জড়ানো নীল একটা কাপড়, পাতলা ব্লাউজের তলায় স্পন্দিত বুক কাঁপছে, পায়ে জুতো নেই, হাঁটু পর্যন্ত নগ্ন পা নবীন রক্তে আর স্বাস্থ্যে জীবন্ত...' এ সবের প্রতি আমার টান কী প্রখর! কী করে নিজেকে বঞ্চিত করি এ সব থেকে! তাছাড়া আমার বিশ্বাস ছিল এসব কিছু পেয়েও ওকে রাখতে পারি নিজের কাছে। ছুতো-পেলেই ওকে শুধু একটি কথাই বোঝাতাম: ওর উচিত বাঁচা আমার জন্য, আমার মধ্যে,

স্বাধীনতা ও খামখেয়াল থেকে আমাকে বঞ্চিত করা উচিত নয়, — তোমায় আমি ভালোবাসি আর এর জন্য আরো বেশী ভালোবাসব তোমায়। মনে হত ওকে এত ভালোবাসি যে আমি সর্বকিছু করতে পারি, সবই আমার মার্জনীয়।

২৫

— তুমি অনেক বদলে গেছ, — ও বলত। — আজকাল তোমার পৌরুষ আরো বেশী, আরো সহৃদয় ও মধুর তুমি। তাছাড়া আরো হাসিখুশি।

— তাহলে দেখছ তো! আর আমার ভাই নিকলাই ও তোমার বাবা কিনা সব সময় বলতেন আমরা দুজনে খুব অসুখী হব!

— তার কারণ প্রথম থেকেই আমাকে পছন্দ হয় নি নিকলাইয়ের। বাতুরিনোতে ওর নিষ্প্রাণ ভদ্রতার জন্য আমার কত কষ্ট হয়েছিল তুমি ভাবতে পারো না।

— ঠিক তার উল্টো। ও তোমার কথা বলত অত্যন্ত সস্নেহে। আমাকে বলেছিল: 'ওর জন্য ভয়ানক দুঃখ হয়, বয়স এত কম ওর, আর তোমাদের দুজনের কপালে কী আছে যখন ভাবি: বছর কয়েক পরে মফস্বলের আবগারি কর্মচারীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে কী পার্থক্য

থাকবে তোমাদের? মনে আছে, নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি ঠাট্টা করে কীভাবে আঁকতাম? তিন ঘরের একটা হতচ্ছাড়া ফ্ল্যাট, বেতন মাসে পঞ্চাশ রুবল...

— ও দুঃখ পেত শুধু তোমার জন্য।

— ভারি ওর দুঃখ — বলত, ওর একমাত্র আশা যে আমার 'অসংযম' শুধু হয়ত আমাদের দুজনকে উদ্ধার করবে, বলত, আমার এই যা চাকরী তাও আমার পক্ষে বড্ডো বেশী হবে, আর বেশীদিন যেতে না যেতে বিচ্ছেদ হবে আমাদের, ও বলত হয় নিষ্ঠুরতার বশে তুমি ওকে ছেড়ে চলে যাবে, নয় সুমধুর পরিসংখ্যানে কিছুকাল কাটিয়ে ও টের পেয়ে যাবে কী জীবনের নিগড়ে ওকে বেঁধেছ, আর নিজেই ছেড়ে চলে যাবে।

— আমার ওপর ভরসা না রাখলেও পারত। আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যাব না। তখনি শুধু যাব যদি বুঝি আমাকে তোমার আর দরকার নেই, আমি তোমার পথের কাঁটা, তোমার স্বাধীনতার, তোমার ভবিষ্যতের অন্তরায়...

দুর্বিপাকে পড়লে মানুষ বারবার ফিরে আসে সেই একই যন্ত্রণাকর অর্থহীন চিন্তায়: কিসে সূত্রপাত হয়েছিল দুর্বিপাকের? কখন? ছোটখাটো সেসব জিনিস কী, আর কেন চোখে পড়ে নি সে সব হুঁশিয়ারি

সঙ্কেত? 'তখনি শুধু যাব যদি...' কেন মন দিই নি কথাগুলোতে, কেন ধরা পড়ে নি যে ও একটা 'যদি'র সম্ভাবনা বাদ দেয় নি?

নিজের 'ভবিষ্যৎকে' বড়ো বেশী মূল্যবান মনে করতাম। আমার স্বাধীনতার প্রয়োগে অসংযম উত্তরোত্তর বেড়ে চলল — ঠিকই বলেছিল নিকলাই। বাড়িতে থাকা ক্রমশ কষ্টকর হয়ে উঠল: ছুটি পেলেই কোথাও না কোথাও চলে যেতাম, নয়ত ঘুর বেড়াতাম উদ্দেশ্যহীনভাবে।

— রোদে রঙ এত পোড়ালে কোথায়? — বড়ো হাজরির সময় ভাই জিজ্ঞেস করত। — আবার কোথায় যাওয়া হয়েছিল?

— গেলাম মঠে, নদীতে, স্টেশনে...

— আর সব সময় একলা, — ভর্ৎসনার সুরে ও বলল। — কতবার না কথা দিয়েছ আমাকে মঠে নিয়ে যাবে, এতদিনের মধ্যে শুধু একটিবার ওখানে গিয়েছি, জায়গাটা কী সুন্দর, দেয়ালগুলো কী পুরু, সোয়ালো পাখি, মঠবাসী...

ওর দিকে চোখ তুলে তাকাতে লজ্জা ও কষ্ট হল। কিন্তু আমার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবার ভয়, তাই শুধু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম:

— মঠবাসীদের নিয়ে তোমার হবে কী?

— আর তোমার?

কথাবার্তার মোড় ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম।

— ওখানে কবরখানায় ভয়াবহ অদ্ভুত একটা জিনিস আজ দেখলাম: ফাঁকা একটা কবর! সন্ন্যাসী ভাইদের একজন নিজের জন্য সেটা খুঁড়িয়ে রেখেছে আগে থেকে, কবরের মাথায় এমনকি একটা ক্রুশ বসানো, মায় সমাধিলিপি পর্যন্ত আছে, লোকটার নাম, জন্মের তারিখ, এমনকি 'মৃত্যু' কথাটি পর্যন্ত বসানো, খালি ভবিষ্যৎ মৃত্যুর তারিখের জায়গাটা ফাঁকা। চারিদিক ছিমছাম, সযত্নে রক্ষিত, সুন্দর হাঁটার পথ, ফুল — আর হঠাৎ প্রতীক্ষারত কবরটা।

— দেখলে তো?

— দেখার কী আছে?

— তুমি ইচ্ছে করে আমাকে ভুল বুঝতে চাইছ। যাক, কিছু এসে যায় না। তুর্গেনেভ সত্যি বলেছিলেন...

বাধা দিলাম ওকে।

— আমার মনে হয় তোমার সব পড়ার মোদ্দা কথাটা এখন হল তোমার ও আমার বিষয়ে কিছু খুঁজে বের করা। তবে সব মেয়েরাই পড়ে এভাবে।

— বেশ, আমি না হয় মেয়েমানুষ, কিন্তু তোমার মতো স্বার্থপর নই...

সস্নেহে বাধা দিত আমার ভাই:

— ব্যস, ব্যস, হয়েছে !

২৬

গ্রীষ্মের শেষাশেষি অফিসে আমার হালও এমনকি আরো সুবিধাজনক হয়ে দাঁড়াল: আগে শুধু 'যোগ' ছিল অফিসের সঙ্গে, এখন স্টাফে নিয়ে নতুন একটা কাজ দেওয়া হল আমাকে, আর আমার পক্ষে এর চেয়ে বেশী যুৎসই কাজ আর হতে পারে না: ইউনিয়ন বোর্ডের লাইব্রেরীর ভার দেওয়া হল আমাকে, লাইব্রেরী মানে গুদামে প্রশাসনিক নানা বিষয়ে ছাপা বইয়ের স্তূপ। সুলিমার মাথা থেকে উদ্ভাবিত নতুন কাজের দরুন আমাকে এসব বই বাছাই করে একটা ঘরে সুশৃংখলভাবে সাজিয়ে রাখতে হবে, তার জন্য ঘরটা সাফ করা হল বিশেষ করে, — মাটির নীচে খিলান-দেওয়া লম্বা ঘরটাতে যেমন-যেমন দরকার তাক আর বুকশেলফ্। সাজানোর পর বইগুলোর দেখাশোনা করা, আর কোনো বিভাগের কখনও দরকার হলে পড়তে

দেওয়া। বাছাই করে তাকে গুছিয়ে রেখে তাদের দেখাশোনা করা ও ধার দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলাম। কিন্তু শুধু হেমন্তকালে ইউনিয়ন বোর্ডের বাৎসরিক মিটিং-এর আগে গুটি কতক বই দেওয়া ছাড়া আর কখনও বই দিতে হত না কাউকে, তাই করার মধ্যে কেবল রইল তাদের দেখাশোনা, অর্থাৎ কোনো কাজ নেই, কেবল মাটির নীচের ঘরটায় বসে থাকা, ঘরটাকে ভারি ভালোবেসে ফেললাম — অসাধারণ পুরু, দুর্গপ্রাকারের মতো তার দেয়াল, খিলান-দেওয়া ছাদ, গভীর স্তব্ধতা, — কোনো শব্দ কখনো ঢোকে না সেখানে, — অনেক উঁচুতে ছোট জানলাটা দিয়ে সূর্যের আলো আসে ও চোখে পড়ে বাড়িটার পেছনে পরিত্যক্ত জমিতে নানা ঝোপঝাড় ও ঘাসের মূলের আভাস। আমার স্বাধীনতা আরো বেড়ে গেল: সারাদিন এই সমাধিমন্দিরে বসে একেবারে নিরালায় লেখাপড়া, আর যখন মর্জি তখনি হপ্তা খানেকের জন্য কেটে পড়া, ওক-কাঠের নীচু দরজায় তালাচাবি লাগিয়ে বেরিয়ে যাওয়া, যেখানে মন চায় সেখানে ঘুরে আসা।

কেন জানি না গিয়েছিলাম নিকলায়েভে। প্রায়ই হেঁটে যেতাম উপকণ্ঠের একটা খামার বাড়িতে, সাধু জীবন অতিবাহিত করার জন্য সেটা ভাড়া নিয়েছিল

তলস্তয়পন্থী দুই ভাই। কিছুদিন প্রতি রবিবার কাটালাম শহরের পরের স্টেশন পেরিয়ে একটি বড়ো ইউক্রেনীয় গ্রামে, ফিরে আসতাম রাত্রের ট্রেনে... এসব হাঁটন ও ভ্রমণের কী মানে? আমার ঘুরে-বেড়ানোর পেছনে সবকিছু বাদ দিয়ে গোপন যে জিনিসটি ছিল সেটি টের পেত লিকা। শিশাকির সেই মেয়ে-কম্পাউণ্ডারটির বিবরণে তার মনে এত যে দাগ কেটেছিল ভাবি নি।

তাকে হানা দিতে লাগল ঈর্ষা, দমনের চেষ্টা করত বটে, তবু লুকিয়ে রাখতে পারত না। যেমন শিশাকি এ্যাডভেঞ্চারের কথা তাকে বলার প্রায় দুসপ্তাহ পরে হঠাৎ এমন একটি কাজ সে করে বসল যেটা তার উদার, মহৎ ও তখনো কুমারীসুলভ স্বভাবের বিরুদ্ধে, যেটা বরং মানায় সাধারণ 'গিন্নীবান্নি গোছের স্ত্রীলোককে' — কী একটা ছুতো বের করে কর্কশ দৃঢ়তায় ছাড়িয়েছিল কসাক সেই মেয়েটিকে যে আমাদের কাজ করত:

— খুব জানি, তুমি ব্যথা পেয়েছ, — আমাকে বলল বিচ্ছিরিভাবে। — ব্যথা না পেয়ে উপায় কী: তুমি যাকে বলো 'মেয়ে-ঘোড়া', কেমন জুতোর গোড়ালি 'খটখটিয়ে' সে এঘর-ওঘর করে, সত্যি ওর পায়ের গোড়ালি কত

সুঠাম, কী ঝকঝকে বাঁকা চোখ! কিন্তু ভুলে যাচ্ছ কেন যে 'মেয়ে-ঘোড়াটি' বেয়াড়া আর একগুঁয়ে, আমার ধৈর্যের তো একটা সীমা আছে...

আমি জবাব দিলাম অকপটভাবে, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে:

— আমাকে নিয়ে কী করে তোমার ঈর্ষা হতে পারে? এই তো আমি চেয়ে চেয়ে দেখছি তোমার অনবদ্য বাহু আর ভাবছি: দুনিয়ার সবকটা সুন্দরীর বদলেও দেব না এই বাহু! কিন্তু আমি কবি, শিল্পী, আর গ্যেটে বলছেন সব শিল্পই ইন্দ্রিয়পরায়ণ।

২৭

আগস্টের একটি সন্ধ্যায় প্রায় দিন শেষে রওনা হলাম তলস্তয়পন্থী দুজনের কুটিরের দিকে। সে গুমোট প্রহরে শহরের পথঘাট জনহীন, তাছাড়া সেদিন শনিবার। ইহুদীদের বন্ধ দোকান ও চালার সারি হেঁটে পার হলাম। সান্ধ্যপ্রার্থনার জন্য ঘণ্টাধ্বনি, গাছ ও বাড়িগুলোর ছায়া তখনি দীর্ঘ, তবু গ্রীষ্মশেষে পড়ন্ত বেলায় দক্ষিণী শহরগুলোর বিশিষ্ট গুমোটভাব আবহাওয়ায়, তখন পার্কে ও বাড়ির সামনের

বাগানগুলোয় দিনের পর দিন রোদে তেতে সবকিছু খরা, আর সবকিছু সর্বত্র — শহরে, স্তেপে, ফুটির ক্ষেতে অলস তন্দ্রায় মগ্ন গর্মিকালের দীর্ঘ উত্তাপে।

চকে, শহরের কুয়োর পাশে, দাঁড়িয়ে একটি ইউক্রেনীয় মেয়ে, যেন খোদাই করা দেবী মূর্তি, মোজাবিহীন পা ইস্পাতের নাল দেওয়া জুতোয় আচ্ছাদিত; চোখজোড়া বাদামি, ভুরুতে সেই বিশেষ একটি শুচিতা যেটা দেখা যায় ইউক্রেন ও পোল্যাণ্ডের মেয়েদের মধ্যে। চক থেকে উপত্যকার দিকে নেমে-যাওয়া রাস্তাটা দক্ষিণ দিগন্তের সান্ধ্য বিস্তারের মুখোমুখি, ছোট ছোট পাহাড় প্রায় দেখা যায় না। বড়ো রাস্তা থেকে মোড় নিলাম একটা চুপচাপ গলিতে, উপকণ্ঠে মধ্যবিত্ত সব বাড়ির মাঝখান দিয়ে চলে গেছে পথটা, ঘাসের মাঠে বেরিয়ে এলাম পাহাড়ে উঠে স্তেপে নামার জন্য। ক্ষেতে, মাড়াইয়ের জায়গায়, নীল ও সাদা কুঁড়েঘরগুলোর মাঝে নিড়ানির ঝিলিক: গ্রীষ্মের রাত্রে যেসব ছোকরারা মুখ দিয়ে অদ্ভুত বুনো আওয়াজ করে বা স্তোত্রের মতো গান গায় এত চমৎকার, তারাই এখন মাড়াইয়ের কাজে ব্যস্ত। পাহাড়ের চূড়া থেকে যতদূর চোখ যায় ততদূর সারা স্তেপে সোনালি শস্যের ঘন নাড়া। চওড়া রাস্তায় নরম ধুলো এত গভীরভাবে

বসেছে যে মনে হয় মখমলের সোল দেওয়া জুতো পরে হাঁটছি। আর চারপাশের সবকিছু গোটা স্তেপ, আর সমস্ত হাওয়াটা পর্যন্ত — অস্তরবির চোখ ধাঁধানো আলোয় ঝলকিত। রাস্তার বাঁ দিকে, উপত্যকার ওপর পাহাড়ে চূণবালি খসা সাদা দেয়াল দেওয়া একটা কুটির: এখানেই থাকে তলস্তয়পন্থীরা। রাস্তা ছেড়ে শস্য কাটা মাঠের ওপর দিয়ে চললাম সে দিকে। কিন্তু গিয়ে দেখি কেউ নেই। খোলা জানলার দিকে তাকাতে চোখে পড়ল — অসংখ্য ভনভনে কালো মাছি ভিড় করেছে দেয়ালে, ছাদে, তাকে রাখা কাটিগুলোর ওপর। গোয়ালের খোলা দরজায় উঁকি দিয়ে দেখলাম — শুকনো গোবরে সূর্যের লাল আভা, আর কিছু না। ফুটিক্ষেতে গিয়ে দেখি কনিষ্ঠ ভাইটির স্ত্রী — বসে আছে একটি আলে। কাছে গেলাম — কিন্তু হয় সে আমাকে দেখতে পেল না নয় না দেখার ভাণ করল: পাশ ফিরে, একেবারে নড়াচড়া না করে, খালি পা ঝুলিয়ে বসে আছে ছোটখাটো নিঃসঙ্গ মেয়েটি, এক হাতে ভর দিয়ে, অন্য হাতে এক টুকরো খড়, সেটা চিবোচ্ছে।

— নমস্কার, — কাছে গিয়ে বললাম। — আপনাকে এত মনমরা দেখছি কেন?

— নমস্কার, বসুন, — মৃদু হেসে, খড়ের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রোদে তামাটে হাত বাড়িয়ে দিল।

বসে পড়ে তার দিকে তাকালাম: তরমুজ ক্ষেতে নজর রাখা ছোট্ট গেঁয়ো মেয়ের মতো দেখতে অবিকল! রোদে চকচকে চুল, গলাখোলা, কিষানিসুলভ ব্লাউজ গায়ে, জীর্ণ কালো স্কার্ট আঁটো হয়ে বসেছে ভরা পাছায়। ছোট ছোট খালি পা ধুলোয় ভরা, রোদে পুড়ে শুকনো ও কালো খালি পায়ে কী করে হাঁটে সার আর কাঁটার মতো ঘাসের ওপর দিয়ে অবাক হয়ে ভাবলাম। আমাদের শ্রেণীর মেয়েরা পা ঢেকে রাখে লোকচক্ষুর আড়ালে, সেই শ্রেণীর মেয়ে ও, তাই ওর পায়ের দিকে তাকাতে ইচ্ছে হত ও সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তি বোধ করতাম। আমি চেয়ে আছি টের পেয়ে মেয়েটি পাদুটো গুটিয়ে নিল।

— আর সবাই কোথায়? — জিজ্ঞেস করলাম।

আবার মৃদু হাসল সে।

— কোনো একটা চুলোয় গিয়েছে। পুণ্যাত্মাদের একজন মাঠে গেছেন মাড়াই করতে, কোনো গরীব বিধবাটিধবাকে সাহায্য করছেন আর কি, আর একজন শহরে গেছেন মহর্ষি বাবাজীকে লেখা চিঠি ডাকে দিতে: চিঠিগুলো হল আমাদের অন্যায় অনাচার, আমাদের লোভ, মরদেহের সব দুর্বলতা জয়ের সাপ্তাহিক হিসেব। তাছাড়া —

আমাদের হালের একটা 'অগ্নিপরীক্ষার' কথাও জানাতে হবে কিনা: খারকভে পাভ্‌লভস্কি-ভাই ধরা পড়েছেন লিফলেট বিলি করার জন্য — তাতে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়ার নিন্দে ছিল বই-কি!

— আপনার মেজাজ বেজায় বিগড়ে গেছে দেখছি।

— অরুচি ধরে গেছে, — মাথা ঝাঁকিয়ে পেছনে হেলিয়ে সে বলল। — আর পারি না, — মৃদু কণ্ঠে যোগ দিল।

— কী পারেন না?

— সবকিছু অসহ্য। একটা সিগারেট দিন তো।

— সিগারেট?

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, সিগারেট!

সিগারেট দিয়ে দেশলাই জ্বালালাম, মেয়েটি বেখাপ্পাভাবে তাড়াতাড়ি সিগারেট ধরাল। অস্থিরভাবে থেকে থেকে টান দিয়ে, আর সব মেয়েদের মতো ঠোঁট ফুলিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে, চুপ করে গেল সে, তাকিয়ে রইল উপত্যকা ছাড়িয়ে। দিগন্তের সূর্য তখনি তপ্ত হয়ে উঠেছে আমাদের পিঠে, আমাদের পাশের ভারি ভারি লম্বাটে তরমুজের ওপর, সেগুলোর চাপে মাটিতে দাগ পড়েছে, তাদের শুকনো ডাঁটা সাপের মতো জড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। হঠাৎ মেয়েটি সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমার কোলে মুখ রেখে ফোঁপাতে

শুরু করল লোভীর মতো। আর যেভাবে তাকে সান্ত্বনা দিলাম, রোদের গন্ধভরা চুলে চুমো খেলাম, কাঁধে চাপ দিয়ে তাকিয়ে রইলাম পায়ের দিকে, তা থেকে আমার কাছে জলের মতো স্পষ্ট হয়ে গেল তলস্তয়ের চেলাদের প্রতি আমার এত টানের কারণটা কী।

আর নিকলায়েভ? সেখানে যেতাম কেন? পথে যেতে যেতে লিখেছিলাম:

— সবে ক্রেমেন্‌চুগ ছেড়েছি, সন্ধ্যা নেমেছে। ক্রেমেন্‌চুগ স্টেশনে, প্লাটফর্মে, রেস্তোরাঁয় লোকের ভিড়, দক্ষিণী গুমোট, দক্ষিণী ঠেলাঠেলি। ট্রেনে সেই একই ব্যাপার। বেশীর ভাগই ইউক্রেনের মেয়ে, সবায়ের সোমত্ত বয়স, সবাই রোদে তামাটে, উজ্জ্বল, যাত্রা আর গরমের ঠেলায় উত্তেজিত — চলেছে দক্ষিণে, কাজ করতে। ওদের দেহ আর চাষীর পোষাক-আশাকের গরম গন্ধ মনকে এত নাড়া দেয়, এত বকবকানি ওদের, এত খানাপিনা, বাদাম-রঙা চোখের এত ঝিলিক, তড়বড়ে বুলিতে এত ফষ্টিনষ্টি যে বেশ একটা কষ্ট হয়...

— নীপারের ওপর দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ একটি সেতু, ডাইনের জানলা দিয়ে আসছে টকটকে লাল চোখ ঝলসানো সূর্যের আলো, নীচে বিস্তৃত ফেঁপে ওঠা হলুদ জল। বালুময় তীরে অনেক মেয়ে একেবারে অবাধে সব

জামাকাপড় খুলে নগ্ন হয়ে স্নান করছে নদীতে। একটি মেয়ে সেমিজ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দৌড়িয়ে বেঢপভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়ল জলে, পা ছুঁড়ে জলে সে কি লণ্ডভণ্ড...

— নীপার অনেকক্ষণ ছাড়িয়ে এসেছি। কাটা ঘাসের গুচ্ছ ও শস্য নাড়ায় আবৃত নিরানন্দ পাহাড়ে সন্ধ্যার ছায়া। কেন জানি না মনে পড়ে গেল অভিশপ্ত স্ভিয়াতপল্‌কের কথা: ছোট একটা দলের আগে আগে এই উপত্যকা হয়ে এরকম একটা সন্ধ্যায় ও ঘোড়ায় চেপে চলেছে যেন দেখতে পাই — কোথায় চলেছে? মনে কী চিন্তা ওর? আর সেসব তো হাজার বছর আগেকার কথা, এখনও পৃথিবীতে সবকিছু কত সুন্দর। না, স্ভিয়াতপল্‌ক্ নয়, এ হল বুনো চেহারার একটি চাষী, অবসন্ন ঘোড়ায় চেপে মন্থর গতিতে চলেছে পাহাড়ের মধ্যকার ছায়ায়, তার পেছনে একটি স্ত্রীলোক, হাতদুটো পেছনে বাঁধা, এলোমেলো চুল, জোয়ান পাদুটো হাঁটু পর্যন্ত নগ্ন, দাঁতে দাঁত চেপে লোকটার মাথার পেছন দিকটায় চেয়ে রয়েছে, আর লোকটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ সামনে...

— ভিজে, চাঁদনী রাত! জানলার বাইরে স্তেপের সমভূমি, রাস্তার কালো কাদা। সমস্ত ট্রেন ঘুমিয়ে পড়েছে,

ধুলো পড়া লণ্ঠনে পোড়া মোমবাতির মোটা টুকরো। বন্ধ জানলা দিয়ে ক্ষেতের স্যাঁতসেঁতে ঝলক এসে বেমানানভাবে মিশছে ট্রেনের ভেতরকার ভারি দুর্গন্ধের সঙ্গে। কয়েকটি ইউক্রেনীয় স্ত্রীলোক হাত ছড়িয়ে একেবারে চিৎপাত হয়ে ঘুমোচ্ছে, মুখ হাঁ হয়ে গেছে, ব্লাউজের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে বুক, স্কার্টে লেপটে আছে গুরু নিতম্ব... একটি এইমাত্র জেগে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। সবাই ঘুমোচ্ছে — বারবার মনে হতে লাগল এই বুঝি ও আমাকে ডাকবে ফিসফিসিয়ে রহস্য ভরে...

যে গ্রামে রবিবারগুলো কাটাতাম সেটা স্টেশন থেকে বেশী দূর নয়, বিস্তৃত, নীচু একটা উপত্যকায়। একদিন ট্রেনে চেপে উদ্দেশ্যহীনভাবে সেই স্টেশনে গিয়ে নামলাম, হেঁটে চললাম গ্রামের দিকে। সন্ধ্যে হয়ে গেছে, দূরে দেখলাম ফলের বাগান ঘেরা কুটিরগুলোর সাদা অস্পষ্ট ছোপ, আরো কাছে বাড়োয়ারী জায়গাটায় ভেঙে-পড়া হাওয়া-কলের কালো মূর্তি উদ্যত। কাছাকাছি লোকের ভিড়, বেহালায় কিঁচকিঁচিয়ে বেজে উঠল সরস নাচের সুর, শুনলাম কে যেন নাচছে পা ঠুকে... তারপর কয়েকটি রবিবারের সন্ধ্যা কাটালাম সেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে, মাঝরাত পর্যন্ত বেহালার বাজনা, নাচন্ত পায়ের

শব্দ, একঘেয়ে টানা-টানা গেয়ে-যাওয়া মিলিত কণ্ঠস্বর শুনলাম; কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম একটি মেয়ের পাশে, ভরাট বুক তার, লালচে চুল, পুরু ঠোঁট, হলদে চোখে বিচিত্র দীপ্ত দৃষ্টি, আর ভিড়ের সুবিধের অপব্যয় না করে সঙ্গে সঙ্গে চুপিচুপি হাতড়াতাম এ-ওর হাত। স্থিরভাবে দুজনে দাঁড়িয়ে থাকতাম পরস্পরের দিকে তাকাবার চেষ্টা না করে; জানতাম যদি গাঁয়ের ছেলেছোকরারা টের পায় কেন শহুরে বাবুটি তাদের আড্ডায় আসতে শুরু করেছেন ঘন ঘন, তাহলে আর রক্ষে নেই।

নেহাৎ দৈবক্রমে আমাদের দেখা হয়ে যায় প্রথমবার, কিন্তু তারপর থেকে আমি আসার সঙ্গে সঙ্গে ও ঘুরে গিয়ে নিমেষে বুঝে নিত আমি অত্যন্ত কাছে আছি, আমার হাতটা নিয়ে ধরে থাকত সারা সন্ধ্যা। যত অন্ধকার হত তত শক্তভাবে চাপ দিত আমার হাতে, তত কাঁধ ঘেঁষে দাঁড়াত। রাত্রি গভীর হলে লোকজনের ভিড় কমে যেত, তখন ও চুপিচুপি হাওয়া-কলের অন্য দিকে গিয়ে লুকিয়ে পড়ত তার আড়ালে, আর আমি আস্তে আস্তে রাস্তা ধরে যেতাম স্টেশনে, হাওয়া-কলের আশপাশ থেকে সকলে চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে, একটু নীচু হয়ে দৌড়িয়ে ফিরে আসতাম। ব্যবস্থাটা দুজনের

কেউ কথা বলে ঠিক করে নি। হাওয়া-কলের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে—দুজনে নিঃশব্দ আনন্দের উচ্ছ্বাসে যন্ত্রণা পেতাম। একদিন রাত্রে আমার সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত গেল মেয়েটি। আধ-ঘণ্টা পরে ট্রেন আসার কথা, অন্ধকার ও স্তব্ধ স্টেশন—শুধু ঝিঁঝি পোকার মন-জুড়ানো ডাক, আর গ্রামের ওপর অনেক দূরে, অন্ধকার বাগানের ওপর ঘন রক্তাভায় চাঁদ উঠল মন্থর গতিতে। সাইডিং-এ দরজা খোলা একটি মালগাড়ির কামরা। ঝোঁকের মাথায়, কী করছি তাতে নিজেই ভয় পেয়ে কামরাটার দিকে তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে ভেতরে ঢুকলাম, পিছু পিছু এসে সে আমার গলা আঁকড়ে ধরল। কোথায় আছি দেখার জন্য দেশলাই জ্বালিয়ে — হটে এলাম বিভীষিকায়: দেশলাইয়ের আলোয় দেখা গেল মেঝের মাঝখানে লম্বা সস্তা একটা কফিন। বুনো ছাগলের মতো চট করে বেরিয়ে গেল মেয়েটি, আমিও লাফ মারলাম তার পিছুপিছু। কামরা থেকে বেরিয়ে এসে সে বারবার অন্ধকারে হোঁচট খেতে লাগল, হাসিতে দম বন্ধ হয়ে এসেছে, বারবার আমাকে চুমো খাচ্ছে পাগলের মতো আত্মহারা হয়ে, এদিকে আমার একমাত্র ইচ্ছে সেখান থেকে চলে যাওয়া, তারপর সে গ্রামের মুখো আর কখনো হই নি।

২৮

বছরের শেষাশেষি শহরে উৎসব গোছের যে পর্ব শুরু হয় সর্বদা, তার অভিজ্ঞতা হল হেমন্তে — বোর্ডের বাৎসরিক অধিবেশনের সময় সেটা, সারা জেলা থেকে নানা শহরের পৌরসভার সভ্যরা আসেন তখন। শীতকালটাও বেশ ফূর্তিতে কাটল: ইউক্রেনীয় থিয়েটারের সঙ্গে সফরে এল জন্‌কভেৎস্কায়া ও সাক্সাগান্‌স্কি, রাজধানীর নামকরা লোক — চের্নভ, ইয়াকভ্‌লেভ ও স্লাভিনার জলসা, — বেশ কয়েকটা বল-নাচ, মুখোস-পরে উৎসব আর সম্বর্ধনা। বাৎসরিক অধিবেশনের পর একবার মস্কোয় গেলাম তলস্তয়কে দেখতে, ফিরে এসে বেশ রসিয়ে গা ভাসিয়ে দিলাম পার্থিব আনন্দে। আর পার্থিব আনন্দের ফলে আমাদের জীবনের বাহ্যিক দিকে এল বিশেষ একটা পরিবর্তন। যতদূর মনে পড়ে, একটি সন্ধ্যাও আমরা বাড়িতে কাটাই নি। এসবের ফলে আমাদের সম্পর্কে যে পরিবর্তন অলক্ষিতে এল সেটা শুভ নয়।

— তুমি আবার বদলেছ, — একদিন ও বলল। — তুমি এখন রীতিমতো জোয়ান। আর কেন জানি মুখে ফরাসীমার্কা নূর রাখতে শুরু করেছ...

- কেন, নূরটা তোমার অপছন্দ?

— ভালো লাগবে না কেন? তবে সবকিছু এত ক্ষণিকের ব্যাপার!

— তা বটে। তোমাকেও সোমত্ত যুবতীর মতো দেখাতে শুরু করেছে। চেহারাটা আগের চেয়ে পাতলা আর সুন্দর হয়েছে।

— আর তোমার মধ্যে আবার হিংসা দেখা দিয়েছে। আর একটা কথা বলতে ভয় করছে।

— কী বলো তো?

— পরের মুখোস-পরা উৎসবে একটা ফ্যান্সি ড্রেস পরতে পারলে ভালো হত। দামী নয়, খুব সাধাসিদে। কালো লেসের মুখোস আর সঙ্গে কালো লম্বা ঢলঢলে একটা কিছু...

— কী সাজবে?

— নিশা।

— আবার ওরিওলের মতো ভাবসাব দেখছি, তাই না? নিশা! ওটা একটু সস্তাগোছের ব্যাপার।

— সস্তা বা খারাপ কিছু আমি তো দেখছি না, — শুকনো, স্বাবলম্বী গলায় জবাব দিল ও, আর আমার বুকটা দমে গেল, ওর এই শুকনো স্বাবলম্বীভাবে সত্যি সত্যি এমন কিছু একটা টের পেলাম যেটা ওরিওলের

সেই সব দিন ফিরিয়ে আনল। — তোমার আবার হিংসে শুরু হয়েছে, এই যা।

— আবার হিংসুটে হলাম কেন?

— তা জানি না।

— জানো বই-কি। কারণ হল তুমি আবার আমার কাছ থেকে সরে যাচ্ছ, আবার তুমি চাও লোকে তোমাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে প্রেম নিবেদন করুক।

ও বিদ্বেষের হাসি হাসল:

— এটা বলা তোমার সাজে না। গোটা শীতটা তো চের্কাসিভার পাশ ছাড়া হও নি একেবারে।

লাল হয়ে উঠলাম।

— পাশ ছাড়া হই নি বটে! আমরা যেখানে যাই সেখানেই ও হাজির হয়, সেটা কি আমার দোষ? আমার সঙ্গে তোমার ব্যবহার আগেকার মতো খোলাখুলি নয়, যেন কী একটা গোপন কথা আছে, এতেই আমার সবচেয়ে কষ্ট লাগে। সোজাসুজি বলো তো, কথাটা কী? কী গোপন কথা পুষে রেখেছ?

— কী লুকিয়ে রেখেছি? — ও বলল। — আমাদের আগেকার প্রেম আর নেই, সেই দুঃখ। কিন্তু এ নিয়ে কথা বলে কী লাভ...'

একটু থেমে আরো বলল:

-- আর মুখোস-পরা উৎসব, সেটা যদি তোমার এত খারাপ লাগে তাহলে একেবারে ছাড়ান দিতে তৈরী আছি। আমার প্রতি তুমি বড্ডো কড়া, আমার সব মনের সাধকে সস্তা বলো, সবকিছু থেকে আমাকে বঞ্চিত করো, অথচ নিজে কিছু করতে ছাড়ো না...

সেই বসন্ত ও গ্রীষ্মে আবার অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম। শরতের গোড়ার দিকে আবার দেখা হয়ে গেল চের্কাসভার সঙ্গে (তখন পর্যন্ত সত্যি সত্যি আমাদের মধ্যে কিছু ঘটে নি), শুনলাম ও চলে যাচ্ছে কিয়েভে।

— আপনাকে চিরদিনের জন্য ছেড়ে চলে যাচ্ছি, বন্ধু, — বাজপাখির মতো তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে চেয়ে চের্কাসভা বলল। — স্বামী অধীর হয়ে পড়েছেন আমার প্রতীক্ষায়। ক্রেমেন্‌চুগ পর্যন্ত আমার সঙ্গে যাবেন কি? অবশ্য, একেবারে জানাজানি না করে। ওখানে স্টীমারের প্রতীক্ষায় আমাকে পুরো একটা রাত কাটাতে হবে...

২৯

এটা ঘটে নভেম্বরে। আজও দেখি, আজও অনুভব করি বিরস ইউক্রেনীয় শহরটিতে সেই গতিহীন গম্ভীর

দিন ক'টি, কাঠের সংকীর্ণ ফুটপাথ ও জনহীন রাস্তা, বেড়ার ওধারে কালো বাগান, বুলভারের দুপাশে দীর্ঘ নিষ্পত্র পপলার গাছ, শহরের রিক্ত পার্ক, গ্রীষ্মকালীন রেস্তোরাঁর জানলা বন্ধ, সেসব দিনের ভিজে হাওয়া, পচন্ত পাতার কবরখানাসুলভ গন্ধ — আর রাস্তায় ও পার্কে বিরস উদ্দেশ্যহীনভাবে আমার ঘুরে বেড়ানো, মনে একই নাছোড়বান্দা চিন্তা ও স্মৃতির ভার... স্মৃতির ভার — সত্যি স্মৃতি এত বেদনাকর, এত ভয়ংকর যে তার হাত থেকে রেহাই পাবার একটি বিশেষ প্রার্থনাও আছে।

যে গোপন যন্ত্রণার আভাস মাঝে মাঝে সে দিত সেগুলি একদিন নিদারুণ একটি মুহূর্তে পাগল করে দিল ওকে। সেদিন আমার ভাই গেওর্গি কাজ থেকে ফিরেছে দেরীতে, আমার ফিরতে আরো দেরী হল — আমাদের দুজনের যে দেরী হবে ও জানত, কারণ বোর্ডে তখন বাৎসরিক অধিবেশনের প্রস্তুতি চলেছে, বাড়িতে একেবারে একলা থাকত ও, প্রত্যেক মাসে সাধারণত যেমন, কয়েকদিন বেরোয় নি মোটে, এবং সে সময়টায় সাধারণত যেমন হত, ও ঠিক আত্মস্থ ছিল না। নিশ্চয় শোবার ঘরে সোফায় বরাবরকার মতো পা গুটিয়ে অনেকক্ষণ শুয়ে শুয়ে একটার পর একটা সিগারেট খেয়েছে, —এভাবে

সিগারেট খাওয়া হালের অভ্যেস, অভ্যেসটা ওর পক্ষে ভালো নয় বলে ছেড়ে দেওয়ার আমার সব অনুরোধ ও উপরোধে ও কান দেয় নি, — মনে হয়, সামনে চোখ মেলে অনেকক্ষণ ধরে, শুয়ে হঠাৎ উঠে পড়ে এক টুকরো কাগজে কয়েকটা লাইন আমাকে লেখে ধীরস্থির হাতে, অফিস থেকে ফিরে আমার ভাই ফাঁকা ঘরে কাগজের টুকরোটা দেখে তার ড্রেসিং টেবিলে, — তারপর তাড়াহুড়োয় কয়েকটা জিনিস গুছিয়ে — বাকি সব ফেলে রেখে যায় — ঘরের এদিকে-ওদিকে যেমন-তেমন করে ছড়ানো সেসব জিনিস তুলে লুকিয়ে রাখার সাহস আমার হয় নি অনেকক্ষণ। রাত্রে বাপের বাড়িতে যাবার পথের অনেকটা সে চলে গেছে ততক্ষণে... কিন্তু তখনি ওর পিছু ধাওয়া করলাম না কেন? লজ্জিত বোধ করেছিলাম, সে জন্য হয়ত, তাছাড়া ভালো করে জানতাম জীবনের কয়েকটি মুহূর্তে ও নাছোড়বান্দা,সে জন্য হয়ত। আমার কয়েকটা টেলিগ্রাম ও চিঠির জবাব অবশেষে এল, কয়েকটি মাত্র শব্দ: 'আমার মেয়ে চলে গেছে, কোথায় আছে কাউকে জানাতে বারণ।'

আমার ভাই না থাকলে প্রথমে আমার কী হত জানি না (যদিও তার অবস্থাটা অত্যন্ত গোলমেলে ও অসহায়

গোছের)। রাতারাতি পালিয়ে যাবার কারণ বোঝাবার জন্য লেখা চিঠিটা পর্যন্ত আমাকে দেয় নি. আমাকে আগে থেকে তৈরী করার চেষ্টা করল, — আর তাও আনাড়ির মতো, — অবশেষে বলে ফেলবে বলে ঠিক করে এক ফোঁটা তিক্ত চোখের জল ফেলে চিঠিটা আমাকে দিল। কাগজের টুকরোয় ধীরস্থির হাতে লেখা: 'তুমি যে ক্রমশ আমার কাছ থেকে আরো দূরে সরে যাচ্ছ সেটা আর সইতে পারি না। ক্রমশ বেশী করে আমার ভালোবাসাকে এমন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করাটা আমার সহ্যের বাইরে. আমার অন্তরের প্রেমকে আমি শেষ করে দিতে পারি না, তবু না জেনে আমার উপায় নেই যে গ্লানির শেষ সীমায় পেঁাছিয়েছি। আমার সব ছেলেমানুষি সাধ আর স্বপ্ন পেঁাছিয়েছে মোহভঙ্গের শেষ সীমায়, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আমাদের ছাড়াছাড়ি সহ্য করার, আমাকে ভোলার, তোমার এখন সম্পূর্ণ মুক্ত নতুন জীবনে সুখী হবার শক্তি যেন তোমার হয়...' এক নিঃশ্বাসে সবটা পড়ে নিলাম, মনে হল পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে, মুখ ও মাথার চামড়া জমে শক্ত হয়ে যাচ্ছে, তবু নিষ্ঠুরের মতো বললাম:

— তা বই-কি, এ-সব যে হবে জানা উচিত ছিল, 'মোহভঙ্গের' সেই মামুলি ব্যাপার!

এরপর সাহস করে শোবার ঘরে গিয়ে নির্বিকার মুখে সোফায় শুয়ে পড়লাম। অন্ধকার হয়ে এল, সাবধানে ঘরে উঁকি মারল আমার ভাই — আমি ঘুমের ভাণ করে রইলাম। কিছু একটা দুর্ঘটনার মুখোমুখি হলেই ওর অবস্থাটা হত কাছাখোলা, বাবার মতো এসব ওর সহ্য হত না, তাই তাড়াতাড়ি নিজেকে বিশ্বাস করাল যে আমি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছি, আর বোর্ডের একটা মিটিং-এ সেই রাত্রেই যাবার আবার বাধ্যবাধকতার সুযোগ নিয়ে চুপচাপ জামাকাপড় পরে ও চলে গেল... মনে হয় সে রাত্রে নিজেকে গুলি করি নি শুধু এই জন্য যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আজ না হলেও কালকে নিশ্চয় আত্মহত্যা করব। দুধের মতো জ্যোৎস্না বাগান ভাসিয়ে দিতে ঘর আগেকার চেয়ে আলো হয়ে উঠল, ডাইনিং-রুমে গিয়ে বাতি জ্বালিয়ে আলমারির পাশে দাঁড়িয়ে পুরো এক গেলাস ভোদকা খেলাম, তারপর আর এক গেলাস... বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, — কী ভীষণ সব: কী বোবা, উষ্ণ আর স্যাঁতসেঁতে, চারিদিকের সবকিছুতে, রিক্ত বাগানে আর বীথিকার পপলারগুলোর ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলোর সঙ্গে একাকার ঘন সাদা কুয়াসা। কিন্তু ফিরে যাওয়া, আরো ভীষণ ব্যাপার শোবার ঘরে গিয়ে বাতি জ্বালিয়ে ক্ষীণ

আলোয় সেই চোখে পড়া চারিদিকে ছড়ানো মোজা, জুতো, গ্রীষ্মকালীন ফ্রক আর সেই ছোট্ট সুন্দর ড্রেসিং-গাউনটা, ঘুমতে যাবার আগে যেটাতে ঢাকা তার দেহ আমি আলিঙ্গন করতাম, মুখে লাগত তার উষ্ণ নিঃশ্বাস. আত্মসমর্পণে মুখ ও তুলে ধরত, আমি চুমো খেতাম। এই বিভীষিকা থেকে আমাকে মুক্তি দিতে পারে শুধু ওর সঙ্গে, ওর সামনে ফেলা ক্ষিপ্ত অশ্রুধারা, কিন্তু ও তো আর নেই!

আর একটি রাত এল। শোবার ঘরের বোবা স্তব্ধতায় মোমবাতির সেই ক্ষীণ আলো। কালো জানলার বাইরে রাত্রির অন্ধকারে গহন হেমন্তের মুষল-ধারা বৃষ্টির একটানা শব্দ। শুয়ে শুয়ে তাকিয়ে রইলাম ঘরের কোণে — ওখানকার পুরনো আইকনটার সামনে রোজ রাত্রে ও প্রার্থনা করত: যেন ঢালাই করা পুরনো তক্তা সিঁদুর রঙে রাঙা, আর লাল রঙে বার্নিশ করা এই পটে সোনালি বেশ ভূষায় কুমারী মেরির কঠোর বিষণ্ণ মূর্তি টানা টানা কালো চোখ তাকিয়ে আছে সুদূর পরপারে — চোখের চারপাশে কালো রেখা! এই কালো রেখা কী ভয়াবহ। আর কী ভয়াবহ আমার কালাপাহাড়ি ভাবানুসঙ্গ: ও — আর কুমারী মেরি, এই প্রতিমূর্তি — আর পালানোর জন্য পাগলের মতো তাড়াহুড়োয়

চার দিকে ছড়ানো তার সব মেয়েলি টুকিটাকি জিনিস।

এক সপ্তাহ কাটল, আরো একটি সপ্তাহ, কেটে গেল একটি মাস। অনেক দিন কাজ ছেড়ে দিয়েছি, কোথাও যাই না, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত চেষ্টা করি একটির পর একটি স্মৃতি থেকে মুক্তি পেতে — আর কেন জানি মনে হত: এককালে কোথায় যেন স্লাভরা ঠিক এইভাবে এক ঘাট থেকে আরেক ঘাটে বনের পথে, খানাখোন্দলের ওপর দিয়ে 'টেনে' নিয়ে যেত তাদের মালবোঝাই নৌকো।

৩০

বাড়ি ও শহরের সর্বত্র উপস্থিতির যন্ত্রণা আরো এক মাস সইলাম। অবশেষে মনে হল এ যন্ত্রণা আর সইতে পারি না, ঠিক করলাম যাব বাতুরিনোতে — কিছু দিন কাটাব, ভবিষ্যতের ভাবনা পরে ভাব যাবে।

তাড়াতাড়ি শেষ বার ভাইকে আলিঙ্গন করে বিদায় নিয়ে চলন্ত ট্রেনের কামরায় উঠে পড়লাম — অত্যন্ত বিচিত্র মনে হল কামরায় ঢুকে নিজেকে বলা: এই তো দেখো, আবার পাখির মতো তুমি স্বাধীন! শীতের

রাত্রিটা অন্ধকার, বরফ নেই, শুকনো হাওয়ায় ট্রেনের সশব্দ ঘড়ঘড়ানি। স্যুটকেশ নিয়ে কোণে দরজার কাছে একটা জায়গা পেলাম, বসে মনে পড়ে গেল ওর সামনে কত ভালো লাগত পোল্যাণ্ডের প্রবাদটির পুনরুক্তি করতে: 'সুখের তরে মানুষের সৃষ্টি, ওড়ার তরে যেমন পাখির' — আর গর্জিত ট্রেনের কালো জানলার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম যাতে আমার চোখের জল কেউ না দেখে ফেলে। খারকভে যেতে একটি রাত্রি... আর খারকভ থেকে দুবছর আগে চলে আসার সেই আর একটি রাত্রি: বসন্তকাল, ভোরবেলা, দিনের আলো উঁকি দিচ্ছে ট্রেনে আর কী গভীর ঘুমে তখনো সে আচ্ছন্ন... লণ্ঠনের টিমটিমে আলোয়, ঠেসাঠেসি দুর্গন্ধ কামরায় বসে রইলাম অধীরভাবে, কখন ভোর হবে, কখন খারকভে দেখব লোকজন, চলাফেরা, কখন স্টেশনে খাব এক গেলাস গরম কফি...

কুর্স্ক এসে পড়ল, স্মৃতিভরা আর একটি শহর: বসন্তের দুপুরে স্টেশনে ওর সঙ্গে লাঞ্চ খাওয়া, ওর আনন্দ: 'জীবনে এই প্রথম স্টেশনে লাঞ্চ খাচ্ছি!' আর এখন এই ধূসর ও অত্যন্ত ঠাণ্ডা দিনের শেষে, অতিরিক্ত লম্বা ও অস্বাভাবিক মামুলি আমাদের প্যাসেঞ্জার ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে সেই স্টেশনে, বড়ো বড়ো

জগদ্দল তৃতীয় শ্রেণীর কামরার অন্তহীন সারি যার জন্য বিখ্যাত কুস্ক-খারকভ-আজভ রেলপথটি। নেমে তাকিয়ে দেখলাম। ইঞ্জিনের কালো মূর্তি এত দূরে যে প্রায় চোখে পড়ে না। কেটলি হাতে লোকে ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে গরম জলের জন্য দৌড়চ্ছে রেস্তোরাঁয়, সবক'টি লোকের চেহারা সমান কুৎসিত। আমার কামরার সহযাত্রীদের দেখা গেল প্লাটফর্মে: অস্বাস্থ্যকর মেদে পরিশ্রান্ত উদাসীন চেহারার একটি ব্যবসায়ী, আর ভয়ানক ও অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসু একটি যুবক, যার মুখ আর ঠোঁটের মামুলি শুকনোটে ভাব সারা দিন বিতৃষ্ণা জাগাল আমার মনে। আমার দিকে চকিত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে যুবকটি তাকাল সারা দিন, আমিও তার চোখে পড়েছি, সে ভেবেছিল নিশ্চয়: জমিদার-নন্দন নাকী, কে জানে, মুখে দেখছি কথাটি নেই! — যা হোক, হৃদ্যতায় দ্রুত উচ্চারিত একটি মন্তব্য করে সে আমাকে জানিয়ে দিল:

— এখানে হাঁসের রোস্ট কিন্তু হামেশা জলের দরে পাওয়া যায়, বুঝেছেন!

দাঁড়িয়ে থেকে ভাবলাম সেই রেস্তোরাঁটির কথা যেখানে আমার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব, সেখানে সেই টেবিলটার কথা, আমরা দুজনে যেখানে একবার লাঞ্চ খেয়েছিলাম। তখনো বরফ পড়ে নি তবু রুশী শীতের রুক্ষ গন্ধ

হাওয়ায়। বাতুরিনোতে কী বিরস বিরক্তিতে দিন কাটবে! বাবা ও মা বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন, অসুখী বোনটি শুকিয়ে যাচ্ছে, দারিদ্র্যপীড়িত জমিদারি, দারিদ্র্যের ছাপ বাড়িতে, কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার দমক রিক্ত নীচু বাগানে, শীতকালের বিশেষ একটা সুরে কুকুরের ঘেউ-ঘেউ, — এ রকম হাওয়ায় সে ডাকে সর্বদা থাকে কেমন একটা নিষ্প্রয়োজন রিক্ত ভাব... ট্রেনের পেছন দিকটারও যেন শেষ নেই। প্লাটফর্মের বেড়া পেরিয়ে চোখে পড়ে নিষ্পত্র পপলারের উঁচু চূড়া আর গাছ পেরিয়ে জমে-যাওয়া পাথরের রাস্তায় সওয়ারীর প্রতীক্ষায় মফস্বলের ছেকড়া ঘোড়ার গাড়ি, যাকে কুস্কর্ক বলা হয়, তার বিরস বিরক্তি ও বিষণ্নতা ফুটে উঠেছে গাড়োয়ানদের চেহারায়। প্লাটফর্মে পপলার গাছগুলোর তলায় স্ত্রীলোকেরা দাঁড়িয়ে, মাথায় আঁটো করে জড়ানো শালের খুঁট বুকে আড়াআড়ি করে ঝুলিয়ে কোমরে বাঁধা, মুখ ঠাণ্ডায় নীল, ঘ্যানঘেনে উপরোধের সুরে লোককে ডেকে বলছে জলের দরের সেই হাঁস কিনে নিতে, পাখিগুলো বেজায় বড়ো, ফুসকুড়ি ওঠা চামড়া ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট। যারা কোনক্রমে গরম জলে কেটলি ভরে নিতে পেরেছে তারা চাঙ্গা হয়ে ফিরছে ট্রেনের কামরার উষ্ণতায়; ঠাণ্ডার মৌজে এখন খুশিতে কাঁপছে তারা, দ্রুত পায়ে ফিরতে

ফিরতে খিস্তি-খেউর করে দর কষাকষি করছে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে... অবশেষে নারকীয় বিষাদের একটা হুংকার বেরোল দূরের ইঞ্জিন থেকে, আরো অনেক পথ এখনো পড়ে আছে আমার সামনে, তার শাসানি সে হুংকারে... ও কোথায় গেছে জানি না, তাই আমার দুর্দশা এত অতল। তা না হলে লজ্জা এড়িয়ে অনেক দিন আগেই খুঁজে পেতে ওকে ফিরিয়ে আনতাম; যাই ঘটুক না কেন — ওর পালিয়ে যাওয়াটা পাগলামির ঝোঁক মাত্র সন্দেহ নেই, আর লজ্জার দরুন অনুশোচনার কোনো লক্ষণ ও দেখাচ্ছে না।

বাড়িতে ফিরে এলাম, তিন বছর আগেকার সেই ফিরে আসার সঙ্গে কোনো মিল নেই। সবকিছু দেখলাম আলাদা চোখে। পথে আসতে আসতে বাতুরিনোর বিষয়ে যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে আরো বেশী ছন্নছাড়া সবকিছু: গাঁয়ের সেই সব জরাজীর্ণ কুঁড়েঘর, বুনো ঝাঁকড়া-চুল সব কুকুর, দরজাগুলো বসে গেছে শক্ত মাটিতে, তার সামনে বরফে-ঢাকা বর্বর জলের গাড়ি, বাড়িতে যাবার পথে সেই কাদার ঢিবি, বিষণ্ন জানলাসুদ্ধ বেজার বাড়িটার সামনের ফাঁকা উঠান, পিতামহ ও প্রপিতামহের আমলের সেই বেঢপ উঁচু ভারী চাল, নীচু চালায় ছায়াচ্ছন্ন দুটি অলিন্দ, কালের প্রকোপে তার কাঠ

অঙ্গার নীল — সমস্ত কিছু পুরনো, পোড়ো, অর্থহীন,— দামি ফার গাছটার উঁচু মাথা নুইয়ে দেওয়া হাওয়ার কনকনে ঠাণ্ডা দমকেরও কোনো অর্থ নেই, বাড়ির ছাদের চেয়ে লম্বা গাছটা শীতের রিক্ততায় করুণ চেহারার বাগানের আর সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে। দেখলাম সংসারের জীবনযাত্রায় যে দারিদ্র্য এসেছে তাতে কোনো লুকোচুরি নেই — ইঁটের চুল্লির ফাটলগুলোর উপর কাদা লেপে জোড়াতালি দেওয়া, গরমের লোভে চট বিছানো হয়েছে মেঝেতে... বাবা শুধু তাঁর হালচালে এ সবকিছুকে ছাপিয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন। রোগা আর ছোট হয়ে গেছেন তিনি, চুল একেবারে পাকা, আজকাল তিনি দাড়িগোঁফ কামানোয় কখনো ত্রুটি করেন না, চুল ভালোভাবে আঁচরানো, পোষাকের বিষয়ে সেই পুরনো নিস্পৃহতার ভাব আর নেই, — বার্ধক্যে ও দারিদ্র্যের এই ওমরাহি প্রয়াস দেখলে কষ্ট হয়, — অন্য সকলের চেয়ে বাবা সবল ও হাসিখুশি (আমার খাতিরে নিশ্চয়, আমার কলঙ্ক ও দুর্বিপাকের দরুন)। কম্পিত, ইতিমধ্যে শুকিয়ে যাওয়া হাতে সিগারেট ধরে, আমার দিকে সস্নেহ বিষণ্ণভাবে তাকিয়ে একবার তিনি বলেন:

— তা বেশ, বাছা, সবকিছু নিয়ম বাঁধা, — যৌবনের

সব উত্তেজনা, সব দুঃখ আর সুখ, বার্ধক্যের শান্তি আর স্বস্তি... লেখাটা কী যেন? — চোখে হাসির ঝিলিক এনে তিনি বললেন: — 'শান্তি ভরা আনন্দ', নিপাত যাক সব:

ভিত, নিঃসঙ্গতার এই গহনে
আমাদের গরীবখানায়
বুক ভরে নিই মুক্ত মাঠের নিঃশ্বাস,
স্বাদ পাই শান্তি ভরা আনন্দের...

বাবার কথা যখনই ভাবি, অনুশোচনার হাত এড়াতে পারি না — বারবার মনে হয় তাঁর কদর পুরো বুঝি নি, যথেষ্ট ভালোবাসি নি তাঁকে। তাঁর জীবনের, বিশেষ করে তাঁর যৌবনের বিষয়ে কত অল্প জানি, — বেশী জানার সুযোগ যখন ছিল তখন আগ্রহ দেখিয়েছি অত্যন্ত কম, তাই সর্বদা নিজেকে দোষী ঠেকে। বারবার চেষ্টা করেও বুঝতে পারি না তিনি ঠিক কী ধরনের মানুষ ছিলেন, — একেবারে ভিন্ন যুগের ভিন্ন জাতের মানুষ, তাঁর গোটা স্বভাবের প্রতিভাশীলতার অবলীলা ও বৈচিত্র্য কেমন বন্ধ্যা অথচ বিস্ময়কর, কী বিস্ময়কর তাঁর উষ্ণ হৃদয় আর খর বুদ্ধি, যার কাছে ধরা পড়ত সবকিছু, আভাসমাত্রে করায়ত্ত করে নিত সমস্ত কিছু, তাতে ছিল চিত্তের বিরল অকপটতা ও সংগোপনতা, বাহ্যিক সাবল্য

ও অন্তরের দৃষ্টির ধীর তীক্ষ্ণতা ও হৃদয়ের রোমাণ্টিকতা। সেই শীতকালে আমি বিশে পা দিয়েছি, আর তাঁর বয়স ষাট। এখন বিশ্বাস করা কঠিন যে, আমার বয়স কোনো কালে বিশ ছিল, সবকিছু সত্ত্বেও যৌবনের নানা শক্তির বিকাশ তখন সবে শুরু হয়েছিল আমার মধ্যে! আর তাঁর সমস্ত জীবন তো তখনি পিছনে পড়ে রয়েছে। তবু সে শীতকালে আমাকে যা সইতে হয় সেটা তাঁর চেয়ে ভালো করে আর কেউ বোঝে নি, সত্যি, মনে হয় আমার অন্তরে বিষাদ আর যৌবনের সেই সংমিশ্রণ তাঁর মতো করে অনুভব আর কেউ করে নি। আমরা বসেছিলাম তাঁর পড়ার ঘরে। রোদ ভরা স্তব্ধ প্রশান্ত দিন, তখনি বরফে-ঢাকা উঠানের কোমল ঝিলিক দেখা যাচ্ছে কামরার নীচু জানলা দিয়ে, ঘরটা গরম, ধোঁয়াটে ও অগোছালো; অগোছালো আরাম ও কখনো অদলবদল না করা সাদাসিধে আসবাবপত্রের জন্যই ঘরটা আশৈশব আমার প্রিয়, আসবাবপত্রগুলো আমার কাছে মনে হত বাবার নানা অভ্যেস ও রুচি, তাঁর বিষয়ে ছেলেবেলাকার নানা স্মৃতি ও আমাকে নিয়ে নানা স্মৃতি থেকে অভিন্ন। 'শান্তি ভরা আনন্দের' কথা বলার সময় সিগারেট রেখে দিয়ে তিনি দেয়াল থেকে নিজের গিটারটি নামিয়ে একটি প্রিয় সুর বাজালেন, লোকসঙ্গীত একটি, তাঁর চোখের

দৃষ্টি হয়ে এল ধীরস্থির, খুশিতে ভরা, কী একটা যেন গোপন সে দৃষ্টিতে — আর সাথে সাথে সে দৃষ্টি জোড় খেল গিটারের কোমল আনন্দের সঙ্গে, তিক্ত উদাস রবে গিটারটা গুণগুণ করে চলেছে কী একটা হারানো রতনের বিষয়ে, আমাদের জীবনে সবকিছু শেষ পর্যন্ত ক্ষণভঙ্গুর, চোখের জল ফেলার যোগ্য কিছু নেই, তার বিষয়ে...

বাড়িতে আসার কিছুদিন পর অনুভূতির তাড়নায় হার মেনে পাগলের মতো ছুটে গেলাম শহরে। সে দিন সন্ধ্যাবেলাতেই ফিরে এলাম খালি হাতে: কেননা ডাক্তারমশাইয়ের বাড়িতে আমাকে ঢুকতে দেওয়া হয় নি। পরিচিত, কিন্তু এখন ভয়ঙ্কর সেই দরজার সামনে শ্লেজ থেকে লাফিয়ে নেমেছিলাম হতাশার দুঃসাহসে, বিভীষিকায় একবার চেয়ে দেখলাম পর্দা আধো-নামানো ডাইনিং-রুমের জানলাগুলোর দিকে, যে ড্রয়িং-রুমে এককালে সোফায় ওর সঙ্গে বসে কেটেছে কত সন্ধ্যা, হেমন্তের সেই সব দিন, আমাদের প্রথম দিককার দিনগুলো! — তারপর ঘণ্টায় টান দিলাম জোরে... খুলে গেল দরজা, মুখোমুখি ওর ভাই, ফ্যাকাসে হয়ে গিয়ে সে পরিষ্কার করে বলল:

— বাবা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান না। আর জানেন তো, ও চলে গেছে।

এই স্কুলের ছেলেটিই তো সেই হেমন্তে ভল্‌চকের সঙ্গে পাগলের মতো সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করত। আর এখন দেখলাম সামনে দাঁড়িয়ে আছে বেজার চেহারার, বেশ ময়লা রঙের একটি ছোকরা, অফিসারি কায়দার সাদা শার্ট গায়ে, উঁচু বুট পায়ে, ঠোঁটের ওপর নতুন গোঁফের কালো রেখা, ছোট কালো চোখে বিদ্বেষের একগুঁয়ে দৃষ্টি. রোদে তামাটে মুখ এত ফ্যাকাসে যে সবজে একটা ভাব।

— দয়া করে চলে যান, — নীচু গলায় সে বলল, পাতলা শার্টের ভেতর দেখলাম বুক ধকধক করছে।

তবু সারা শীতকাল প্রতিদিন ওর চিঠির আশায় রইলাম নাছোড়বান্দার মতো, — বিশ্বাস করতে পারি নি ও এত নির্দয় হতে পারে পাথরের মতো।

৩১

সে বছরের বসন্তকালে শুনলাম ও বাড়ি ফেরে নিউমোনিয়া নিয়ে, এক সপ্তাহের মধ্যে মারা যায়। আরো শুনলাম ও বলে গিয়েছিল যতদিন সম্ভব ওর মৃত্যুর কথা আমাকে যেন জানানো না হয়।

বাদামি মরক্কোয় বাঁধানো সেই নোটবুকটি এখনও আমার কাছে আছে, প্রথম মাইনে যে দিন ও পায়, যে

দিনটি বোধ করি ওর জীবনে সবচেয়ে দরদের, সেই দিন আমাকে উপহার দিয়েছিল। দেবার সময় প্রথম পাতায় তার লেখা কয়েকটি কথা এখনও পড়া যায়: উত্তেজনায়, তাড়াহুড়োয়, লজ্জায়, যাতে দুটি ভুল থেকে গেছে...

কিছুদিন আগে রাত্রে ওকে স্বপ্নে দেখি — ওর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর আমার সুদীর্ঘ জীবনে ওই প্রথম। যখন দুজনার জীবন ও যৌবন অচ্ছেদ্য ছিল ঠিক তখনকারই মতো নবীনা, কিন্তু এরই মধ্যে মুখে এসেছে ঝরা রূপের লাবণ্য। শীর্ণ দেহ, শোকের পরিচ্ছদের মতো কী একটা পরনে। ওকে দেখলাম ঝাপসাভাবে, কিন্তু দেহে ও মনে এত ঘনিষ্ঠ প্রবল অনুরাগে এবং আনন্দে যে সেরকম অনুভূতি কখনও আর কারো প্রতি হয় নি আমার।

মারিটাইম আল্‌প্‌স, ১৯৩৩

ছায়া বীথি

হেমন্তের ঠাণ্ডা বাদলা দিন, তুলা শহরে চাকার অসংখ্য কালো গভীর খাঁজ পড়া একটি বৃষ্টিসিক্ত সড়ক ধরে ছুটে এল তিন ঘোড়ার একটি কাদামাখা ত্রয়কা-গাড়ি, আর পাঁচটার মতো দেখতে তিনটে ঘোড়ার লেজ একটু তুলে বাঁধা যাতে বরফ-কাদা না লাগে; গাড়ির হুড অর্ধেক তোলা। ত্রয়কাটি থামল একটি কাঠের লম্বা বাড়ির সামনে; বাড়ির একদিকে সরকারী গাড়ির ঘাঁটি, অন্যদিকে একঘরের একটি ব্যক্তিগত সরাইখানা, সেখানে যাত্রীরা জিরোয়, রাত কাটায়, সামোভার আনতে বলে।

গাড়ির কোচ বাক্সে যে লোকটি বসে ছিল সে বড়োসড়ো, তাগড়া চেহারার চাষী, তার ওভারকোটটি বেল্ট দিয়ে শক্ত করে বাঁধা, ময়লা গম্ভীর মুখে পাতলা কুচকুচে কালো দাড়ির দরুন চেহারাটা আগেকার দিনের ডাকাতদের মতো, গাড়ির ভেতরে দোহারা চেহারার একটি বৃদ্ধ; মাথায় বড়ো টুপি, ছাই-রঙা অফিসারী ক্লোকে বীবরের লোমে তৈরী কলারটা ওলটানো। ভদ্রলোকটির ভুরুজোড়া কালো বটে, কিন্তু গোঁফ এরই মধ্যে পাকা, গোঁফের কোণ ছোঁওয়া জুলফির রঙও তাই। থুতনি পরিষ্কার কামানো, আর সব মিশিয়ে চেহারাটা দ্বিতীয় আলেক্সান্দরের মতো। তাঁর আমলে এ কেতাটা খুব চালু ছিল অফিসারদের মধ্যে। ভদ্রলোকটির চোখের দৃষ্টিও সেরকম — জিজ্ঞাসু, কঠোর অথচ শ্রান্ত।

গাড়ি থামল; বেশ খাপসই ফৌজী বুট পরা একটি পা বাড়িয়ে, শাময় চামড়ার দস্তানামোড়া হাতে ক্লোকটার আঁচল ধরে তিনি প্রবেশপথের সিঁড়ি বেয়ে তড়তড় করে উঠলেন।

— বাঁ দিকে, হুজুর, — কর্কশগলায় কোচ বাক্স থেকে হাঁকল গাড়োয়ান, আর বেজায় লম্বা বলে ভদ্রলোকটি দরজায় একটু হেঁট হয়ে ভেতরে ঢুকে বাঁ দিকের ঘরে ঢুকলেন।

জায়গাটা গরম, শুকনো ও পরিচ্ছন্ন। বাঁ কোণে নতুন একটি আইকনের সোনালি আভা, তার নীচে পরিষ্কার কড়া কাপড়ে ঢাকা একটি টেবিল, চারপাশে সার বাঁধা পরিষ্কার মাজাঘষা বেঞ্চি; ঘরের ডান দিকের কোণ জুড়ে চুণকাম করা চুল্লিটি নতুন দেখাচ্ছে। আরো কাছে বাদামী রঙের মোটা কাপড়ে ঢাকা খাটের মতো কোন কিছু চুল্লির গায়ে লেগেছে। উনুনের ঢাকনির ওদিক থেকে আসছে সুপের মিঠে মিঠে গন্ধ — ভালো করে সেদ্ধ বাঁধাকপি, মাংস আর তেজপাতার গন্ধ।

বেঞ্চের ওপর ক্লোকটা নবাগত ছুঁড়ে ফেলে দিলেন — টিউনিক ও টপবুটের জন্য তাঁকে দেখালো আরো খাড়া, আরো ছিমছাম, তারপর দস্তানা ও টুপি খুলে ক্লান্ত ভঙ্গিতে চুলে পাতলা ফ্যাকাসে হাত একবার বুলিয়ে নিলেন। কপাল থেকে চোখের কোণে টেনে বুরুশ করা তাঁর পাকা চুল অল্প কোঁকড়ানো, সুন্দর, দীর্ঘ, কালো-চোখ মুখের এখানে-সেখানে বসন্তের ছোট ছোট দাগ। ঘরে কেউ নেই বলে দরজাটা অল্প ফাঁক করে বিরক্তির সুরে হাঁকলেন:

— এই যে, কেউ আছে নাকি এখানে?

ডাক শুনে ঘরে ঢুকল কালো-চুল একটি স্ত্রীলোক। ভুরুজোড়া ভদ্রলোকটির মতোই কালো, আর তাঁরই মতো

একটি সৌন্দর্য এখনো তার চেহারায় রয়ে গেছে যেটা তার বয়সের পক্ষে বেমানান। ঠোঁটের ওপর ও গালের পাশে পাতলা লোমের দরুন চেহারাটা মাঝবয়সী জিপসী মেয়ের মতো দেখায়, শরীর ভারি হলেও চালচলনের ভঙ্গিটা হালকা, লাল ব্লাউজের নিচে বড়ো বুক, আর হাঁসের পেটের মতো ত্রিকোণ পেট কালো পশমের স্কার্টে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

— সুস্বাগতম, হুজুর, — স্ত্রীলোকটি বলল, — দয়া করে কিছু খাবেন, না একটা সামোভার এনে দেব?

নবাগতটি স্ত্রীলোকটির সুডৌল কাঁধ ও জীর্ণ লাল তাতারি চটি পরা পাতলা পায়ের দিকে এমনিতে একবার তাকিয়ে উদাসীন সুরে সংক্ষেপে বললেন:

— সামোভার। তুমি হোটেলওয়ালী না ঝি?

— হোটেলওয়ালী, হুজুর।

— তার মানে সরাইখানা তুমিই চালাও?

— আজ্ঞে হ্যাঁ। নিজেই চালাই।

— তা কী করে হয়? তুমি কি বিধবা-টিধবা যে একলা কারবার চালাচ্ছ?

— আমি বিধবা নই, হুজুর, কিন্তু বেঁচে থাকতে হবে তো। তাছাড়া কারবার আমার ভালো লাগে।

— তাই বুঝি। বেশ। তোমার ঘরটা কিন্তু বেশ পরিষ্কার আর খাসা।

স্ত্রীলোকটি একটু কোঁচকানো চোখ ভদ্রলোকটির মুখে নিবদ্ধ রাখল, উৎসুক সে দৃষ্টি।

— পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আমার ভালো লাগে, — সে বলল, — যাই হোক না কেন, আমি তো বাবুদের সেবা করে মানুষ হয়েছি। নিজের বাসা কী করে গুছিয়ে রাখতে হয় আমার জানা উচিত, নিকলাই আলেক্সেয়েভিচ্।

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকটি সোজা হয়ে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে লাল হয়ে উঠলেন।

— নাদেঝ্‌দা, তুমি? — তাড়াতাড়ি শুধালেন।

— হ্যাঁ, নিকলাই আলেক্সেয়েভিচ, — জবাবে স্ত্রীলোকটি বলল।

— হে ভগবান, হে ভগবান, — বেঞ্চে বসে পড়ে এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলে উঠলেন ভদ্রলোক। — কে ভাবতে পারে ব্যাপারটা! কত বছর আমাদের দেখা হয় নি? প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর?

— তিরিশ বছর, নিকলাই আলেক্সেয়েভিচ। আমার বয়স এখন আটচল্লিশ, আর আপনি ষাটের কাছাকাছি?

— তা হবে... হে ভগবান, কী আশ্চর্য!

— আশ্চর্য কিসের, হুজুর?

— সবকিছু, সমস্ত... বোঝা উচিত তোমার!

তার ক্লান্তি ও ঔদাসীন্য উধাও হয়ে গেল, উঠে পড়ে দৃঢ় পদক্ষেপে তিনি পায়চারি শুরু করলেন, মেঝের দিকে তাকিয়ে। তারপর থেমে পড়ে কথা বলতে লাগলেন, পাকা জুলফি ভেদ করে আস্তে আস্তে দেখা দিল রক্তাভা:

— তারপর থেকে তোমার কোনো খোঁজ খবর পাই নি। এখানে এলে কী করে? মনিবদের সঙ্গে থেকে গেলে না কেন?

— আপনি চলে যাওয়ার পর ওঁরা আমাকে মুক্তি দেন।

— তখন কোথায় গেলে?

— সে অনেক কথা, হুজুর।

— তুমি বলছ বিয়ে করো নি?

— না, বিয়ে হয় নি।

— কিন্তু কেন? তখন তো তোমার চেহারা ভারি সুন্দর ছিল।

— বিয়ে আমি করতে পারি নি।

— কেন নয়? কী বলতে চাইছ তুমি?

— বলার আর কী আছে? আপনাকে কতো ভালোবাসতাম সেটা আশা করি আপনার মনে আছে।

ভদ্রলোক এত লাল হয়ে উঠলেন যে চোখে জল এসে গেল, ভুরু কুঁচকিয়ে তিনি আবার পায়চারি শুরু করলেন।

— কিছুই থাকে না গো, — অনুচ্চকণ্ঠে বললেন, — প্রেম, যৌবন -- কিছুই থাকে না। মামুলি, খেলো ব্যাপার এটা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু শেষ হয়ে যায়। জোবের কাহিনীতে কী যেন লেখা? 'স্মরণ করবে বয়ে যাওয়া জলের মতো'।

— সবকিছু দয়াময়ের ইচ্ছে, নিকলাই আলেক্সেয়েভিচ। আমাদের যৌবন ফুরিয়ে যায়, কিন্তু ভালোবাসা — সেটা অন্য জিনিস।

মুখ তুলে তার সামনে দাঁড়িয়ে ক্লিষ্ট হাসি হেসে তিনি শুধালেন:

— কিন্তু সারা জীবন তুমি নিশ্চয়ই আমাকে ভালোবাসো নি?

— বেসেছিলাম, কত সময় কেটে গেছে, একেবারে একলা থেকেছি। জানতাম আপনি অনেক দিন আগেই বদলে গিয়েছেন, সে ভালোবাসার অর্থ আপনার কাছে অত্যন্ত কম, যেন কখনো ঘটে নি জিনিসটা, তবু... অনুযোগ-অভিযোগের সময় আর নেই, তবু এটা সত্যি যে আপনি আমাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে ছেড়ে দেন। আর

সর্বকিছু বাদ দিন, এত কষ্ট হত যে মাঝে মাঝে ভাবতাম আত্মহত্যা করি। নিকলাই আলেক্সেয়েভিচ, একসময় তো আপনাকে আদর করে নিকলেন্‌কা বলে ডাকতাম, আর আপনি আমাকে কী বলে ডাকতেন — মনে আছে? আর আপনি তো হামেশা হরেক রকমের 'ছায়া বীথি' নিয়ে কবিতা পড়ে শোনাতেন, মনে আছে? — বিষাদের হাসি হেসে সে শুধাল।

— আর সেসব দিনে তোমার কী রূপ! — মাথা নেড়ে তিনি বললেন। — কী গভীর আবেগ ছিল তোমার! কী সুন্দর ছিলে! কী শরীর, কী চোখ! সকলে তোমার দিকে কীভাবে চেয়ে থাকত, মনে আছে?

— মনে আছে, হুজুর। আপনারও চেহারা অসাধারণ সুন্দর ছিল। আর আপনার কাছেই উজাড় করে দিয়েছিলাম আমার সৌন্দর্য আর বাসনা, জানেন তো। কী করে ভুলি সে কথা!

— হায়! সর্বকিছু ফুরিয়ে যায়! লোকে ভুলে যায় সর্বকিছু।

—সর্বকিছু ফুরিয়ে যায় বটে, কিন্তু সর্বকিছু লোকে ভোলে না।

— যাও, — ঘুরে জানলার দিকে যেতে যেতে তিনি বললেন, — দয়া করে চলে যাও।

রুমাল বের করে চোখ চেপে দ্রুত কণ্ঠে যোগ করলেন:

— আশা করি ভগবান আমাকে ক্ষমা করবেন। তুমি তো ক্ষমা করেছ দেখছি।

দরজার কাছে গিয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল:

— না, নিকলাই আলেক্সেয়েভিচ, ক্ষমা আমি করি নি। মনের কথা যখন শুরু হয়েছে তখন স্পষ্ট বলি: আপনাকে কখনো ক্ষমা করতে পারি নি। দুনিয়ায় আপনার চেয়ে দামী রতন কখনো পাই নি — তখনো না, পরেও নয়। আর তাই আপনাকে ক্ষমা করা যায় না। যাক গে, সেসব ভেবে কী লাভ, মরা মানুষকে তো আর কবর থেকে ফেরানো যায় না।

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ সবের কোনো মানে হয় না, ওদের বলো ঘোড়া জুততে, — জানলা থেকে সরে আসতে আসতে তিনি বললেন, এবার তাঁর মুখের ভার কঠোর। — তোমাকে শুধু একটা কথা বলি: জীবনে কখনো সুখী হই নি, কখনো যে হয়েছি সেটা দয়া করে ভেবো না। মাপ করো আমায়, হয়ত তোমার আঁতে ঘা লাগতে পারে, কিন্তু তোমাকে সোজাসুজি বলি, — স্ত্রীকে আমি ভালোবাসতাম পাগলের মতো। তবু সে আমাকে ঠকাল, তোমাকে যেভাবে আমি ছেড়ে দিই তার চেয়ে বেশী উদ্ধতভাবে আমাকে ছেড়ে সে ভেগে গেল।

আমার ছেলে যখন নেহাৎ শিশু তখন তাকে কী না ভালোবাসতাম — তাকে নিয়ে আমার কত না আশা ছিল! কিন্তু বড়ো হয়ে সে হল বদমায়েস, লম্পট, নীচ একটা লোক, হৃদয় বলে কিছু নেই, সম্মান বোধ বা বিবেক... যাক গে, এটাও সবচেয়ে মামুলি আর খেলো কাহিনী। তোমার মঙ্গল হোক, বন্ধু। মনে হয় তোমার মধ্যে যেটা হারাই সেটা হল আমার জীবনের সবচেয়ে দামী জিনিস।

মেয়েটি কাছে এসে তাঁর হাতে চুমো খেল, তিনিও চুমো খেলেন তার হাতে।

— ওদের বলো আমি তৈরী...

গাড়িতে যেতে যেতে বিরস মুখে তিনি ভাবলেন: 'কী মধুর ছিল ও এককালে! কী যাদু করা লাবণ্য!' যাবার আগে তাঁকে যা বলেছে, তাঁর হাতে যে চুমো খেয়েছে মনে পড়াতে লজ্জা হল, সঙ্গে সঙ্গে লজ্জাবোধের জন্যই লজ্জিত লাগল। 'আমার জীবনের সেরা মুহূর্ত দিয়েছিল ও, কথাটা কি সত্যি নয়?'

পশ্চিম আকাশে নীচের দিকে দেখা দিল বিবর্ণ সূর্য। গাড়োয়ান ঘোড়াগুলোকে চালাচ্ছে কদম চালে, কখনো এ কালো খাঁজ, কখনো অন্যটার ওপর দিয়ে, যেগুলোতে কম কাদা সেগুলো বেছে, সেও কী যেন একটা ভাবছে। তারপর স্থূল ও গম্ভীর ভাবে বলল:

— আমরা যখন চলে যাচ্ছি ও জানলা দিয়ে খালি তাকাচ্ছিল, হুজুর। ওকে অনেকদিন চেনেন বুঝি?

— অনেকদিন, ক্লিম।

— বেশ বুদ্ধিশুদ্ধি আছে ওর। লোকে বলে দিনে দিনে ওর টাকা বাড়ছে। লোকজনকে ধার দেয়।

— তাতে কিছু এসে যায় না।

— এসে যায় না কেন! ভালোভাবে থাকতে কে না চায়? সুদ নিয়ে কড়াকড়ি না করলে বিশেষ ক্ষতি নেই। লোকে বলে, সে বিষয়ে ও অন্যায় করে না। কিন্তু তাহলেও কড়া বটে! সময়মতো ধার শোধ করতে না পারলে — দোষটা নিজেরই।

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, দোষটা নিজেরই... একটু তাড়াতাড়ি চালাও তো, ট্রেন ধরতে পারলে হয়...

জনহীন মাঠে হলদে আলো ছড়াল অস্তগামী সূর্য, কাদাজল ভেঙে চলেছে ঘোড়াগুলো সমান গতিতে। ভদ্রলোক কালো ভুরু কুঁচকে, অন্যমনস্কভাবে সামনের ঘোড়ার খুরের চকিত ঝিলিকের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলেন:

'হ্যাঁ, দোষটা শুধু নিজেরই। হ্যাঁ, তা বটে, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত। আর শুধু শ্রেষ্ঠই নয়, সত্যিকার মোহিনী মুহূর্তগুলি। 'চারদিকে ফোটে বুনো

গোলাপের ঝাঁক, বীথিতে লাইম বৃক্ষের ঘন ছায়া...'
কিন্তু, হে ভগবান, পরে কী বা ঘটত? যদি ওকে ছেড়ে না দিতাম, তাহলে কী হত? হে ভগবান, কী বাজে কথা! এই নাদেঝ্‌দা মেয়ে-মানুষটি — রাস্তার ধারের হোটেলওয়ালী না হয়ে যদি হত আমার স্ত্রী, পিতার্সবুর্গে আমার সংসারের গৃহিণী, আমার ছেলেমেয়েদের মা?'

চোখ বুজে মাথা নাড়তে থাকেন তিনি।

২০. ১০. ৩৮

দাঁড়কাক

বাবা দেখতে ছিলেন দাঁড়কাকের মতো। কথাটা মনে হয়েছিল ছেলেবেলায়। একদিন 'নিভা'য় একটা ছবি দেখেছিলাম নেপোলিয়নের, শৈলশিরার ওপর দাঁড়িয়ে আছেন, সাদা ভুঁড়িপেট, গায়ে হরিণের চামড়ার কোট, পায়ে ছোট কালো বুট, আর হঠাৎ বগদানভের 'মেরু ভ্রমণ'এর একটা ছবি মনে পড়ে যাওয়াতে খুশিতে হেসে উঠলাম, — নেপোলিয়নকে দেখাচ্ছে ঠিক পেঙ্গুইনের মতো, — তারপর বিষণ্ণভাবে মনে হল: আর বাবা দাঁড়কাকের মতো...

আমাদের মহকুমা শহরে বাবা বেশ উঁচু পদের একটা

চাকরী করতেন, সেটা আরো বেশী করে তাঁর ক্ষতি করে; সরকারী চাকুরেদের যে গোত্রের লোক তিনি, মনে হয় না এমনকি তাঁদের কেউ ধীরসুস্থ বচনে ও কাজে তাঁর চেয়ে বেশী উদ্ধত, বেজার, স্বল্পভাষী ও নিস্পৃহ নিষ্ঠুর ছিলেন। সত্যি তাঁকে দেখাত দাঁড়কাকের মতো — বেঁটে, গাঁট্টাগোট্টা, অল্প কুঁজো, খড়খড়ে কালো চুল, বড়ো নাক, লম্বা মুখ, দাড়ি-গোঁফ কামানো, শ্যামল বর্ণ — আরো বেশী দেখাত সেরকম যখন জনহিতার্থে প্রদেশপালের স্ত্রীর দেওয়া কোনো বল-নাচে গিয়ে তিনি রুশী কুঁড়েঘরের মতো সাজানো কোনো স্টলের কাছাকাছি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতেন কুঁজো হয়ে, দাঁড়কাকসুলভ বড়ো মাথা ঘুরিয়ে দাঁড়কাকের মতো চকচকে চোখে তেরছাভাবে তাকিয়ে দেখতেন নৃত্যরত যুগলদের, স্টলের কাছে আসা লোকজন আর সেই ভদ্রমহিলাটির দিকে, যিনি মধুর হাসি হেসে, বড়ো হাতে হীরের আংটি ঝকঝকিয়ে সরু গেলাসে সস্তা হলদে শ্যাম্পেন দিতেন — দীর্ঘাঙ্গী ভদ্রমহিলাটি পরতেন সাবেকী মস্তকাবরণ, পরনে জরির গাউন, নাকটি পাউডারে এত সাদাটে-গোলাপী যে নকল মনে হত। বাবা বহুদিন বিপত্নীক, ছেলেপিলে বলতে দুজন, — আমার আট বছরের বোন লিলিয়া আর আমি, — আর সরকারী

একটি বাড়ির দোতলায় আমাদের সরকারী ফ্ল্যাটের প্রকাণ্ড, চকচকে পালিশ করা ঘরগুলো জ্বলত কেউ-না-থাকার নিরাসক্ত জাঁকজমকে। বাড়িগুলোর মুখ ক্যাথিড্রাল ও শহরের প্রধান রাস্তার মাঝখানে পপলার ছাওয়া এ্যাভেনিউর দিকে। কপাল ভালো, বছরের বেশীর ভাগ আমার কাটত মস্কোয়, সেখানে কাৎকভ লাইসিতে পড়তাম, বাড়িতে আসতাম শুধু বড়ো দিন ও গরমের ছুটির সময়ে। সে বছর বসন্তে স্কুলের পড়া শেষ করে যখন বাড়িতে এলাম, আমার জন্য অপেক্ষা করছিল একেবারে অপ্রত্যাশিত একটা ব্যাপার।

মস্কো থেকে এসে একেবারে হতবুদ্ধি লাগল: কবরখানার মতো নিরানন্দ আমাদের ফ্ল্যাটে যেন হঠাৎ সূর্যের আলো ফেটে পড়েছে — হাসিখুশি কমবয়সী একটি মেয়ের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে ঘরদোর আলোকিত, লিলিয়ার বুড়ী আয়ার বদলে তাকে সবে নেওয়া হয়েছে; লম্বা, শুকনো সে বুড়ীটা দেখতে ছিল মধ্যযুগীয় কোনো পুণ্যবতী কাষ্ঠমূর্তির মতো। মেয়েটি গরীব, আমার বাবার অধীনস্থ একজন কর্মচারীর কন্যা, স্কুল ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন ভালো একটা কাজ জুটিয়েছে আর আমি এসে পড়াতে সমবয়সী সঙ্গী একজন পাবে বলে তার আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু, মা গো, কী ভীরু

মেয়েটি, পোষাকি ডিনারের সময় বাবার সামনে কী তার ভয়, কালো-চোখ লিলিয়াকে নিয়ে কী তার উৎকণ্ঠা; লিলিয়াও চাপা, কিন্তু তার এই চাপা ভাবেও কী তীব্রতা, যেমন তীব্রতা তার প্রত্যেকটি নড়াচড়ায়, সর্বদা যেন কিছুর প্রতীক্ষায় আছে এমন ভাবে কালো-চুল মাথা বেপরোয়াভাবে এদিক-ওদিক ঘোরাত শুধু! ডিনারের সময় বাবাকে আজকাল আর চেনা যায় না:সাদা বোনা দস্তানাপরা বুড়ো গুরিই যখন খাবার দেয় তখন তার দিকে আর বেজার দৃষ্টি হানেন না; মাঝে মাঝে কথা বলেন, — একটু কষ্ট করে টেনে টেনে, তবু সেটা তো কথা বলা, — আর অবশ্য সবসময় বলেন মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে, অতি ভদ্রতা করে ডাকেন তার পিতৃনাম ধরে — 'প্রিয় ইয়েলেনা নিকলায়েভনা' ব'লে, — এমনকি ইয়ার্কি বা হাসির চেষ্টা পর্যন্ত চলে। তাতে অত্যন্ত বিব্রত হয়ে মেয়েটি শুধু হাসত ক্লিষ্টভাবে, পেলব পাতলা মুখে দেখা দিত টকটকে লাল ছোপ — সে মুখটা রোগাসোগা, সোনালি-চুল একটি মেয়ে, সাদা ব্লাউজ বগলের নীচে কমবয়সের গরম ঘামে কালচে, সে ব্লাউজের নিচে বুকজোড়া ছোট, প্রায় দেখা যায় না। ডিনারের সময় আমার দিকে মুখ তুলে তাকাবার সাহস ছিল না তার, সে সময় ওর কাছে আমি এমনকি বাবার চেয়েও

ভীতিকর। কিন্তু আমার দিকে না তাকাবার যতই চেষ্টা সে কর্নক, আমার দিকে বাবার তির্যক দৃষ্টিপাত ক্রমশ কঠিন্ হয়ে যেত: শ্নধ্ন তিনি নন, আমিও অন্নভব করতাম যে, আমার দিকে দৃষ্টিপাত না করে বাবারই কথা শোনায় তার কষ্টকৃত চেষ্টা এবং বদস্বভাব, চুপচাপ অথচ ছটফটে লিলিয়ার দেখাশোনা করার আড়ালে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের একটি ভয় চাপা আছে—একসঙ্গে থাকলে আমরা দ্নজনে যে আনন্দ বোধ করি, তারই থরোথরো ভয়। সন্ধ্যে বেলায় স্টাডিতে কাজ করার সময় তাঁকে সর্বদাই চা দেওয়া হত সোনালি কিনারের বড়ো একটি কাপে, তাঁর কাজের টেবিলে, কিন্তু এখন তিনি চা খান আমাদের সঙ্গে ডাইনিং-র্নমে; সামোভারে চা বানানোর ভার মেয়েটির হাতে, সে-ই ঢেলে দিত — লিলিয়া ততক্ষণে শ্নয়ে পড়েছে। লাল-পাড় দেওয়া ঢিলে লম্বা একটি জ্যাকেট পরে বাবা পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিজের আরাম কেদারায় বসে কাপটা এগিয়ে দিতেন তাকে। কানায় কানায় ভরে, বাবার পছন্দ সেটা, কম্পিত হাতে কাপটা তাঁকে দিয়ে আমার ও নিজের জন্য চা ঢালত, তারপর চোখ নামিয়ে সেলাইয়ের কাজ নিয়ে পড়ত, এদিকে বাবা, অভ্যাসমতো, যা বলতেন — তা ভারি অদ্ভুত:

— ইয়েলেনা নিকলায়েভনা, যাদের সোনালি চুল, তাদের সবচেয়ে ভালো দেখায় হয় কালো, নয় টকটকে লাল পোষাকে... এই ধরো, খুব উ'চু আর খাড়া কলার দেওয়া, ছোট ছোট হীরে বসানো, 'মেরি-স্টুয়ার্ট' ধাঁচের কালো সাটিনের গাউনে তোমাকে চমৎকার মানাবে... কিম্বা চুনির ছোট ক্রুশের সঙ্গে সামান্য বুক-খোলা টকটকে লাল মখমলের মধ্যযুগীয় কোনো গাউন... ফার-দেওয়া লিওনের নীল মখমলের ওভারকোট আর ভেনিসের টুপিও তোমাকে মানাবে... এ সব অবশ্য শুধু আকাশকুসুম, — মৃদু হেসে তিনি বলতেন, — তোমার বাবাকে আমরা মাইনে দিই মাসে মাত্র প'চাত্তর রুবল, তুমি ছাড়া আরো পাঁচটি ছেলেমেয়ের ভরণপোষণ তাকে করতে হয়, সবকটাই ছোট — তাই খুব সম্ভব তোমাকে সারা জীবন কাটাতে হবে দারিদ্র্যে। কিন্তু তবু আমি হামেশা বলি — আকাশকুসুম ভাবলে ক্ষতিটা কি? তাতে মনটা ভালো হয়, শক্তি ও আশা পাওয়া যায়। তাছাড়া, মাঝে মাঝে এমনটি তো হয় যে স্বপ্ন হঠাৎ সত্যি হয়ে গেল — তাই না? ক্বচিৎ কখনো অবশ্য, কদাচিৎ বলতে হবে, তবু হয় তো... এই ধরো, কুরস্ক স্টেশনের সেই রাঁধুনেটা দু'লক্ষ রুবলের লটারির টিকিট টেনে বসল, — সাধারণ রাঁধুনে তাও!

এসব শুধু সহৃদয় ঠাট্টা-তামাসা হিসেবে নিচ্ছে, ভাণ করত মেয়েটি। জোর করে মুখ তুলে বাবার দিকে তাকিয়ে হাসত, এদিকে যেন কোনো কথা কানে আসছে না এমন ভাব করে আমি পেসেন্স খেলে যেতাম। আর বাবা, একবার তিনি তো আরো দূর এগোলেন। আমার দিকে মাথা নাড়িয়ে হঠাৎ বলে বসলেন:

— এই যে ছোকরা, এ-ও হয়ত নানা স্বপ্ন দেখে। ভাবছে পেয়ারের বাপ একদিন তো মারা যাবে, তখন এত সোনার মোহর পাবে যে গোণা ভার! সত্যি বটে, সে গুড়ে বালি, গোণার মতো কিছুই থাকবে না! বলা বাহুল্য অবশ্য যে, ওর বাপের কিছু কিছু সম্পত্তি আছে, — যেমন সামারা প্রদেশে আড়াই শ' একর কালো মাটির সেই ছোট জমিদারিটা, — কিন্তু আমার ঘোরতর সন্দেহ বাছাধন সেটা পাবে কিনা। বাপের প্রতি ওর অনুরাগ তো বিশেষ নেই, আর যতদূর বুঝি — ও একেবারে পয়লা নম্বরের নিষ্কর্মা হয়ে দাঁড়াবে...

শেষ কথাবার্তা হয় সেণ্ট-পিটার দিবসের আগের সন্ধ্যায়, যে দিবসটি আমার পক্ষে অত্যন্ত স্মরণীয়। পরের দিন ভোরবেলায় বাবা বেরিয়ে গেলেন, প্রথমে — ক্যাথিড্রালের উপাসনায়, তারপর প্রদেশপালের সঙ্গে লাঞ্চ খেতে, সেদিন তাঁর জন্মদিন। কিন্তু এমনিতে

রবিবার বাদে বাবা কখনো বাড়িতে লাঞ্চ খেতেন না, সেজন্য বরাবরকার মতো আমরা তিন জনে ছিলাম শুধু। খাওয়া শেষ হয়ে এসেছে, তার প্রিয় নিমকির বদলে লিলিয়াকে চেরির জেলি দেওয়াতে সে গুরিইকে উদ্দেশ্য করে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে, টেবিলে ঘুষি মেরে প্লেটটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল, মাথা ঝটকে কাঁপিয়ে রাগে ফুঁপিয়ে ককিয়ে উঠল। আমরা কোনোক্রমে তাকে তার ঘরে নিয়ে গেলাম, খালি আমাদের হাত কামড়াচ্ছিল আর পা ছুঁড়ছিল, সাধ্যসাধনা করলাম ঠাণ্ডা হতে, বললাম রাঁধুনেকে এর জন্য কঠিন সাজা দেওয়া হবে, অবশেষে স্তোক দিয়ে ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিলাম কোনো রকমে। আর শুধু লিলিয়াকে ঘরে নিয়ে যাবার জন্য আমাদের শুধু এই একত্র প্রচেষ্টায়, মাঝে মাঝে দুজনের হাতে হাত লেগে যাওয়াতে কী থরোথরো সোহাগেই না আমাদের মন ভরে গেল! বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি, অন্ধকার ঘরে বারবার বিদ্যুতের ঝিলিক, বাজের শব্দে জানলার শার্সির খটখটানি।

— ঝড় বিদ্যুতের জন্য ও এত অস্থির হয়ে পড়েছে, — বারান্দায় বেরিয়ে আসার পর খুশিতে ফিসফিসিয়ে ও বলল, তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে কান পেতে শুনতে লাগল।

— ওরে বাবা, কোথায় আগুন লেগেছে! — বলে উঠল।

ডাইনিং-রুমে ছুটে গিয়ে জানলা হটাং করে খুলে দেখলাম এ্যাভেনিউতে গড়গড় শব্দে দমকল ছুটে চলে গেল আমাদের বাড়ি পেরিয়ে। পপলারগুলোর ওপর খর বৃষ্টিধারা, — ঝড় বিদ্যুৎ আর নেই, যেন বৃষ্টিতে নিভে গেছে, — হোজপাইপ্ আর মই বোঝাই লম্বা লম্বা গাড়ি ছুটোছুটি করছে, এগুলোর হৈচৈ-এর মধ্যে দুষ্টুছেলের খেলার মতো নরম হুঁশিয়ারির সুরে দমকলের বাঁশী বেজে উঠল, গাড়িতে কালো কালো ঘোড়ার কেশরের ওপরে ডাণ্ডায় লাগানো ঘণ্টার বাজনার মাঝে পেতলের শিরস্ত্রাণ পরা দমকালের লোকে দাঁড়িয়ে; কানে এল পাথরের রাস্তায় ঘোড়ায় দ্রুত টানা গাড়িগুলোর ধাতব মুখর ধ্বনি... তারপর সেণ্ট-জন দে ওয়ারিয়র চার্চের ঘণ্টাঘরে বিপদসূচক ঘণ্টার দ্রুত, অতি দ্রুত টঙ্কার... দুজনে কাছাকাছি জানলার কাছে দাঁড়িয়ে, জানলা দিয়ে আসছে জল, বৃষ্টি ধোওয়া রাস্তা আর ধুলোর গন্ধ, আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি শুধু দেখা ও শোনার জন্য চরম উত্তেজনায় জ্যাবদ্ধ। তারপর প্রকাণ্ড লাল একটা জলের ট্যাঙ্ক সুদ্ধ শেষ গাড়িটা এসে ঘড়ঘড় করে চলে গেল, হৃৎস্পন্দন আমার দ্রুততর, কপালের

চামড়াটা যেন শক্ত করে বসেছে — নেতিয়ে পড়া ওর হাত হাতে নিয়ে মুখের পাশে তাকালাম মিনতির ভঙ্গিতে আর — ও ফ্যাকাসে হয়ে গিয়ে ঠোঁট ফাঁক করে, গভীর নিঃশ্বাস নেওয়াতে বুক উঁচু হয়ে উঠল। যে নির্মল চোখ আমার দিকে ফেরাল তাতে অশ্রু ও আবেদন একটা। ওর কাঁধ ধরে জীবনে এই প্রথম মেয়ের ঠোঁটের অপরূপ স্নিগ্ধতায় আপনহারা হয়ে গেলাম ... এরপর থেকে এমন কোনো দিনের এমন কোনো ঘণ্টা যায় নি যে ওর সঙ্গে দেখা হয় নি, হঠাৎ যেন, হয় ড্রয়িং-রুমে, নয় বল-রুমে, কিম্বা বাবার পড়ার ঘরের বারান্দায় — বাবার ফিরতে দেরী হত সর্বদা। সংক্ষিপ্ত দেখা সেগুলো, মরিয়ার মতো দীর্ঘ অতৃপ্ত চুম্বন, সে চুম্বন সমাধানহীনতায় তখনি সহ্যের বাইরে। আর বাবা, একটা কিছু আঁচ করে তিনি আবার ড্রয়িং-রুমে সন্ধ্যেবেলায় আমাদের সঙ্গে চা খাওয়া ছেড়ে দিলেন, আবার মনমরা ও স্বল্পভাষী তাঁর ভাবখানা। কিন্তু তাঁকে আমাদের আর ভ্রুক্ষেপ নেই, ডিনারের সময় মেয়েটির হাবভাবে এল আরো শান্তি ও স্থৈর্য।

জুলাই মাসের গোড়ায় অতিরিক্ত রাস্প্‌বেরি খাওয়ার ফলে লিলিয়া অসুখে পড়ল; বিছানায় শুয়ে শুয়ে আস্তে আস্তে সেরে উঠছে, সারা দিন একটা ছোট ডেস্কে

লাগানো বড়ো বড়ো কাগজে রঙীন পেন্সিল দিয়ে উপকথার শহরের ছবি সে আঁকে; তাই লিলিয়ার পাশে সময় কাটানো ছাড়া তার গত্যন্তর রইল না, বসে বসে নিজের জন্য একটা ইউক্রেনীয় ব্লাউজে সূচীর কাজ করত — জায়গাটা ছেড়ে যাওয়া সম্ভবপর নয়, কেননা লিলিয়া সব সময় কিছু-না-কিছু চাইত। আর ফাঁকা, নিঃশব্দ বাড়িতে আমি একেলা থেকে তাকে দেখার, চুমু খাবার ও ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনের অবিরত বাসনায় দগ্ধে মরতাম। বাবার পড়ার ঘরে গিয়ে বসতাম। আলমারি থেকে এলোপাথারি বই টেনে নিয়ে পড়ার জোর চেষ্টা করতাম। সেদিনও ঠিক তাই করছি। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। হঠাৎ কানে এল তার লঘু দ্রুত পদধ্বনি। বই ছুঁড়ে ফেলে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম:

— ও ঘুমিয়ে পড়েছে?

অসহায় ভঙ্গি একটা সে করল।

— ঘুমোবে আবার! ওকে তুমি চেনো না — পাগলের মতো দু'রাত্তির না ঘুমিয়ে কাটালেও ওর কিছু এসে যায় না! আমাকে বাবার ডেস্ক থেকে গোটা কতক পেন্সিল খুঁজে পেতে বের করে নিতে পাঠিয়েছে...

কেঁদে ফেলে কাছে সরে এসে আমার বুকে মুখ রাখল:

— হে ভগবান, কখন এ সবের শেষ হবে? ওঁকে বলো না কেন যে আমাকে ভালোবাসো, আমাদের আলাদা রাখতে পারে দুনিয়ায় এমন কিছু নেই!

অশ্রুসিক্ত মুখ তুলে গভীর আবেগে আমাকে জড়িয়ে রুদ্ধশ্বাস চুম্বনে আঁকড়ে রইল। ওর সমস্ত শরীর আমার দেহে চেপে সোফার দিকে নিয়ে গেলাম — সে মুহূর্তে অন্য কিছু মনে করার বা ভাবার সাধ্য কি আমার? কিন্তু কানে এল দোরগোড়ায় কার মৃদু গলা খাঁকারি: ওর কাঁধের ওপর থেকে চেয়ে দেখলাম — বাবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছেন। তারপর ঘুরে, কুঁজো হয়ে তিনি চলে গেলেন।

সে রাত্রে ডিনারের সময় দুজনের কেউই দেখা দিল না। পরে গুরিই আমার দরজায় টোকা দিয়ে বলল: 'বাবা আপনাকে বলছেন ওনার ঘরে যেতে।' পড়ার ঘরে গেলাম। ডেস্কের সামনে আরামচেয়ারে তিনি বসে ফিরে না তাকিয়ে বলতে শুরু করলেন:

— কাল তুমি সামারার জমিদারিতে রওনা দেবে, বাকি গ্রীষ্মটা সেখানে থাকতে হবে। শরতে হয় মস্কো নয় পিতার্সবুর্গে গিয়ে একটা চাকরীর চেষ্টা করবে। যদি আমার কথা না শোনার মতো স্পর্ধা হয় তাহলে তোমাকে ত্যাজ্যপুত্র করে দেব। কিন্তু এ-ই সব নয়: কাল

প্রদেশপালকে বলব যেন তোমাকে দেশে নির্বাসিত করে রক্ষীর সঙ্গে সেখানে পাঠিয়ে দেন। যাও এখন, আর কখনো যেন তোমাকে না দেখি। কাল সকালে ট্রেনের ভাড়া আর কিছু পকেট খরচা লোক মারফত পাবে। মস্কো বা পিতার্স্‌বুর্গে প্রথম কয়েকটা দিনের খরচা বাবদ টাকা দেবার জন্য কাছারি-বাড়িতে শরৎ নাগাদ লিখব। যাবার আগে ওর সঙ্গে দেখা করার কোনো আশা রেখো না। ব্যস। যাও।

সেই দিন রাত্রেই আমি ইয়ারস্লাভ্‌ল্‌ প্রদেশে রওনা হয়ে গেলাম, সেখানে স্কুলের একটি বন্ধুর সঙ্গে সারা গ্রীষ্ম গ্রামে কাটল। শরতে তার বাবার সাহায্যে পিতার্স্‌বুর্গে পররাষ্ট্র দপ্তরে একটি চাকরী পেয়ে বাবাকে লিখলাম তাঁর সম্পত্তিতে আমার অধিকার চিরকালের জন্য ত্যাগ যে করছি শুধু তা নয়, তাঁর কাছ থেকে কোনো সাহায্যেরও প্রয়োজন আমার নেই। শীতকালে শুনলাম চাকরীতে অবসর গ্রহণ করে তিনিও পিতার্স্‌বুর্গে চলে এসেছেন, সঙ্গে আছে 'তাঁর লাবণ্যময়ী নবীনা বধূ'। আর একদিন রাত্রে যবনিকা ওঠার কয়েক মিনিট আগে মারিইনস্কি থিয়েটারের স্টল্‌সে যেতে যেতে হঠাৎ দেখলাম দুজনকে। স্টেজের কাছে একটা বক্সে তারা, ঝিনুকের অপেরাগ্লাস কার্নিসে

রেখে বসে আছে সামনের সীটে। ড্রেসকোটে দাঁড়কাকের মতো দেখতে তিনি কুঁজো হয়ে একটা চোখ কুঁচকে অনুষ্ঠান-লিপি পড়ছেন একাগ্র মনে। আর সে, সোনালি চুল চূড়ো করে বাঁধা, লাবণ্যভরে বসে ব্যগ্র চোখে দেখছে উষ্ণ, উজ্জ্বল আলোকিত, মৃদু গুঞ্জরিত নীচের প্রেক্ষাগৃহ, বক্সে বসা লোকেদের সান্ধ্য গাউন, ড্রেসকোট ও ইউনিফর্ম। বুকের ওপর চুণির একটা ছোট ক্রুশের অন্ধকার রক্তাভা, সরু কিন্তু এর মধ্যেই নিটোল হয়ে ওঠা হাত নগ্ন, আর টকটকে লাল মখমলের ওড়নার মতো কী একটা চুণিবসানো ব্রোচ দিয়ে কাঁধে আটকানো...

১৮. ০৫. ৪৪

ইভান বুনিন

ছায়া বীথি

গল্পগুচ্ছ

'রাদুগা' প্রকাশন

অনুবাদ: সমর সেন

প্রথম সংস্করণ ১৯৫৭

দ্বিতীয় সংস্করণ

বাংলা অনুবাদ · 'প্রগতি' প্রকাশন · ১৯৫৭
টীকা-টিপ্পনী, অঙ্গসজ্জা · 'রাদুগা' প্রকাশন · ১৯৫৯

সূচী

আপেলের সৌরভ

১

...শরৎকালের গোড়ার সেই সুন্দর দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। আগস্ট মাসে ঝুরঝুরে কবোষ্ণ বৃষ্টি পড়েছে, ঠিক যেন ফসল বোনার জন্য। বৃষ্টি নেমেছে সময় মতো, মাসের মাঝামাঝি, সেণ্ট-লরেন্স দিবসের মুখে। কথায় বলে না, 'হেমন্ত আর শীতের জোড় মেলে ভালো, নদীতে যদি বান না ডাকে, যদি বর্ষে সেণ্ট-লরেন্স দিবসে'! রোদে ভরা এই স্নিগ্ধ শরতে মাঠ ঘাট ভরে গেছে মাকড়সার জালে। এটাও তো শুভলক্ষণ: 'এরকম দিনে যত বেশি মাকড়সার জাল, শরতে তত বেশি লাভ'... মনে পড়ে একটি নির্মল, ঝকঝকে, শান্ত ভোরের কথা... মনে পড়ে সেই বড়ো সম্পূর্ণ সোনালী ফলের বাগানটা একটু শুকনো, গাছের পাতা ঝরে পাতলা হয়ে গেছে, মনে পড়ে মেপ্‌ল বীথিকা, ঝরা পাতার

মৃদু সুবাস আর — আন্তনভ্কা আপেলের মদির সৌরভ, মধু ও হৈমন্তী স্নিগ্ধতার তাজা গন্ধ। হাওয়া এত স্বচ্ছ যে মনে হয় হাওয়া নেই। সারা বাগানটা নানা কণ্ঠস্বর আর ঘোড়ার গাড়ির চাকার কিঁচকিঁচানিতে মুখর। ওরা তারখান*, ব্যাপারী-মালী, চাষীদের ভাড়া করে গাড়িতে আপেল বোঝাই করাচ্ছে, রাত্রেই পাঠাবে শহরে — পাঠাতে হবে রাত্তিরেই, যখন কী ভালোই না লাগে মালের বোঝার ওপর শুয়ে পড়তে, তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে, তাজা হাওয়ায় আল্‌কাত্‌রার গন্ধ অনুভব করতে আর রাতের অন্ধকারে বড়ো রাস্তায় লম্বা সারির সব গাড়ির চাকার সন্তর্পণ কিঁচকিঁচ শব্দ শুনতে। গাড়ি বোঝাই করতে করতে কোনো চাষী হয়ত একটার পর একটা আপেল খেয়ে চলেছে রসালো শব্দে, কিন্তু তখন সাত খুন মাফ, ব্যাপারী বাধা দেবে না তাকে। উল্টে হয়ত বলবে:

'খেয়ে নাও, বাপু, পেট পুরে খেয়ে নাও, বাবা, — কী আর করা যায়! মধু ঢালার সময়ে মধু খায় সবাই!'

সকালের স্নিগ্ধ স্তব্ধতা ভাঙছে শুধু বাগানের গহন বনে প্রবাল-লাল এশবেরি গাছে থ্রাশ পাখির খুশিভরা কিচিরমিচির, মানুষের ডাকাডাকি, বালতি ও পিপেতে আপেল গড়িয়ে যাওয়ার ঘড়ঘড় শব্দ। পাতলা গাছের ফাঁকে দেখা যায় খড় ছড়ানো রাস্তাটা গিয়ে পড়েছে বড়ো একটা ঝুপড়ির দিকে, নজরে পড়ে ঝুপড়িটাও, গ্রীষ্মের ক'টা মাসে তার পাশে রীতিমত সংসার পেতেছে

* ভ্রাম্যমাণ ফেরিওয়ালা; এদের কোনো কর দিতে হত না।

ব্যাপারীরা। সর্বত্রই আপেলের ঝাঁঝালো গন্ধ, এখানটায় — বিশেষ করে। ঝুপড়ির ভেতরে কয়েক জনের শোবার ব্যবস্থা, একটা একনলা বন্দুক, সবুজ রঙ-ধরা তামার সামোভার, তার কোণে — হাঁড়িকুঁড়ি। ঝুপড়ির পাশে কয়েকটি মাদুর, বাক্স, ছেঁড়া কাপড়চোপড়; মাটি খুঁড়ে একটি চুলোও তৈরি করা হয়েছে। দুপুরবেলায় মাংসের চর্বি দিয়ে রসালো জাউ বানানো হয় এখানে, সন্ধেবেলায় জল ফোটানো হয় সামোভারে, আর তখন নীলচে ধোঁয়ার একটা লম্বা ফিতে ছড়িয়ে পড়ে বাগানের গাছগুলোর মধ্যে। উৎসবের দিনে ঝুপড়ির চারপাশে রীতিমত মেলা বসে যায়, গাছের ফাঁকে ফাঁকে ঝিলিক দিয়ে যায় রঙ-বেরঙের সাজসজ্জা। রঙের কড়া গন্ধে ভরা সারাফান গায়ে সম্পন্ন সাবলীল মেয়েচাষীরা* এখানে ভিড় করে; আসে জমিদারবাড়ির চাকরবাকররা — মোটা কাপড়ের সুন্দর অদ্ভুত জংলী পোশাক-পরা; ঘুম-জড়ানো চওড়া মুখে, ভালোজাতের গোরুর মতো ধীরেসুস্থে আসে গাঁয়ের মোড়লের গর্ভবতী যুবতী স্ত্রী। মাথায় তার 'শিং', মাঝখানে সিঁথি-কাটা চুল, দু'পাশে বিনুনী করে পিন দিয়ে বাঁধা, কয়েকটা রুমাল তার ওপর চাপানোয় মাথাটা মনে হয় প্রকাণ্ড। নাল-লাগানো অনুচ্চ বুটে বসানো শক্ত পাদুটো; গায়ে হাতখোলা মখমলের ব্লাউজ, এপ্রনটা লম্বা, আর স্কার্টখানা ঘনবাদামি ডোরা-কাটা বেগুনে রঙের, তার আঁচলে মোড়া প্রশস্ত সোনালী 'পাড়'...

---

* এরা ভূমিদাস নয়। এদের বিশেষ কতকগুলি অধিকার ছিল। কারও কারও আবার ভূমিদাসও ছিল। এরা নিজেদের অভিজাতবংশীয় বলে দাবি করত।

'এই হল আসল গেরস্থ মেয়ে!' মাথা নেড়ে বলে ব্যাপারী। 'এরকমটা আজকাল বড়ো দেখা যায় না...'

সাদা টুইলের শার্ট আর ছোট প্যাণ্ট পরে বাচ্চা ছেলেগুলোর আসার শেষ নেই। রোদে ঝকঝকে চুল না ঢেকে তারা আসছে দুয়ে-দুয়ে, তিনে-তিনে, আর ক্ষুদে খালি পায়ে চলতে চলতে ভয়ে ভয়ে উঁকি মারে আপেল গাছে বাঁধা ঝাঁকড়া-লোম পাহারাদার কুকুরটার দিকে। ওদের মধ্যে খদ্দের বলতে অবশ্য একজনই, কেননা সব মিলিয়ে ওদের টাকাকড়ির দৌড় হল এক কোপেক বা ডিম একটা হয়ত; তবে খদ্দেরের অভাব নেই, কেনাকাটি চলেছে বেশ, আর লম্বা কোট পরনে, হলদে টপ-বুট পায়ে ক্ষয়রোগাক্রান্ত ব্যাপারীটি খোশমেজাজে আছে। ধূর্ত হাবা, কথাবার্তায় গোলমেলে, নেহাৎ 'দয়ার বশে' রাখা ভাইয়ের সঙ্গে বেচার সময়ে ব্যাপারী ঠাট্টা ইয়ার্কি আর ভাঁড়ামী চালাচ্ছে, এমনকি মাঝে মাঝে তুলার* একর্ডিয়নটাও বাজাতে ছাড়ছে না। রাত না হওয়া পর্যন্ত বাগানে লোকের ভিড় কমে না, ঝুপড়িটির কাছে শোনা যায় হাসিহুল্লোড় ও কথাবার্তা, মাঝে মাঝে নাচিয়েদের পায়ের আওয়াজও।...

রাত্তিরের দিকে বেশ ঠাণ্ডা লাগে। শিশিরও পড়ে। সারাদিন কেটেছে খামারে, বুক ভরে নেওয়া হয়েছে নিড়োনো নতুন রাই আর তুষের গন্ধ, এখন বাগান ঘেরা খাদের পাশ কেটে রাতের খাবার খেতে পা চালিয়ে চাঙ্গা মনে বাড়ি ফেরা। দূর গাঁয়ে মানুষের হাঁকাহাঁকি অথবা

* তুলা — ষোড়শ শতাব্দী থেকে মস্কো-রাষ্ট্রের একটি শহর। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে লোহা ও ইস্পাত শিল্পের কেন্দ্র।

দরজা বন্ধ করার কিঁচকিঁচ শব্দ গোধূলির হিমেল হাওয়ায় চারিদিকে ছড়িয়ে গিয়ে শোনায় অদ্ভুত পরিষ্কার। অন্ধকার নেমে আসে। তখন আর একটি নতুন গন্ধ: বাগানে আগুন জ্বালানো হয়েছে, চেরি গাছের জ্বলন্ত ডালের সুগন্ধি ধোঁয়া। অন্ধকার বাগানের গভীরের দৃশ্যটি রূপকথার মতো: ঠিক যেন নরকের কোথাও, চারিপাশে অন্ধকার, মাঝখানে ঝুপড়ির কাছে দাউদাউ করে জ্বলছে লাল লেলিহান অগ্নিকুন্ড, আর তার আশেপাশে চলা ফেরা করছে আবলুস কাঠে খোদাই করা কাদের যেন কালো কালো মূর্তি, তাদের দানব ছায়া পড়ছে আপেল গাছগুলোতে। একবার দেখা যাচ্ছে কয়েক গজ লম্বা একটা কালো হাত গোটা গাছ জুড়ে পড়ে আছে, আরেকবার স্পষ্ট চোখে পড়ে দুখানি পা — যেন দুটো কালো থাম। তারপর হঠাৎ সবকটা ছায়া গড়িয়ে নেমে এল গাছ থেকে — এবং শুধু একটি দীর্ঘ ছায়া পড়ে রইল সারা বীথিকা জুড়ে, ঝুপড়ি থেকে একেবারে ঠিক ফটক পর্যন্ত।...

গভীর রাতে, যখন গাঁয়ের জানলায় আলো নিভে যায়, যখন ঊর্ধ্বাকাশে জ্বলজ্বল করে হীরের মতো উজ্জ্বল সপ্তর্ষিমণ্ডল, তখন আবার বাগানে দৌড়ে ঢোকা। শুকনো পাতার শব্দ তুলে অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে যেতে হয় ঝুপড়িতে। ওখানে খোলা জায়গাটায় একটু জ্যোৎস্না, আর মাথার উপরে ছায়াপথের শুভ্র আলো।

'আপনিই নাকি, ছোট বাবু?' অন্ধকারে শোনা গেল কার যেন অনুচ্চ কণ্ঠস্বর।

'হ্যাঁ। তুই এখনো ঘুমোস নি, নিকলাই!'

'আমাদের ঘুমোলে চলে না। তবে রাত বোধহয় বেশ

হয়েছে, তাই না? ঐ তো, মনে হয়, গাড়িখানা আসছে।...'

অনেকক্ষণ কান পেতে শোনা যায় মাটিতে একটা গুরুগুরু স্পন্দন শুরু হয়েছে। সে স্পন্দন পরিণত হয় শব্দে, ক্রমশ তা জোরালো হয়ে ওঠে, শেষ পর্যন্ত মনে হয় বাগানের ঠিক ওপাশে যেন চাকাগুলো সমান তালে চলেছে দ্রুতগতিতে: এদিক ওদিক দুলে মুখর শব্দে ছুটে আসছে ট্রেনটা... কাছে, আরো কাছে, আরো মুখর ক্রুদ্ধ হয়ে... তারপর হঠাৎ আওয়াজ ক্ষীণ হতে শুরু করে, চাপা পড়ে যায়, যেন মিলিয়ে যায় ভূগর্ভে।...

'বন্দুকটা কোথায়, নিকলাই?'

'এই তো এখানে বাক্সটার পাশে।'

শাবলের মতো ভারি একনলা বন্দুকটা ঝট করে তুলে এমনি একটা গুলি চালানো। আগুনের টকটকে লাল শিখা ঝলকে ওঠে কান ফাটানো শব্দে ক্ষণিকের জন্য চোখে লাগে ধাঁধা, নিভে যায় তারাগুলো, আর শব্দের মুখর প্রতিধ্বনিটি প্রচণ্ড গর্জনে ছড়িয়ে পড়ে দিগন্তের দিকে, তারপর মিলিয়ে যায় নির্মল মৃদু বাতাসে দূরে বহুদূরে।

'সাবাস, ছোট বাবু!' বলে ওঠে লোকটি। 'দিন ওদের পিলে চমকে, সত্যি দিন না, বেটারা জ্বালাতন করে মারছে! খাদের পাশের নাশপাতিগুলো আবার ঝাঁকিয়ে পেড়ে ফেলেছে।...'

আর কালো আকাশে আগুনের রেখা কাটে পড়ন্ত তারা। নক্ষত্রপূর্ণ ঘননীল গভীরতার দিকে তাকাই যতক্ষণ না পায়ের তলা থেকে মাটি যেন সরে যেতে আরম্ভ করে। তখন চটপট উঠে পড়ে কোটের আস্তিনে হাত গুঁজে বীথিকা

হয়ে আবার তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হয়। কী ঠাণ্ডা, শিশির ভরা, আর কী চমৎকারই না দুনিয়ায় বেঁচে থাকা!

২

'রসালো আন্তনভ্কা আপেলের ভালো ফসল ভালো বছরের লক্ষণ'। আন্তনভ্কা খাসা হলে গাঁয়ের সব ভালো: মানে শস্যের ফসলও খাসা হবে... অপর্যাপ্ত ফসলের একটি বছর মনে পড়ছে।

ভোরের আলোয় মোরগগুলো যখন ডেকে চলে আর কুঁড়েঘরগুলো যখন ধোঁয়ায় অন্ধকার, তখন বেগুনী কুয়াসায় ভরা শীতল বাগানের দিকের জানলাটা খুলে ফেলি, কুয়াসার ফাঁকে ফাঁকে এখানে সেখানে ভোরের সূর্যের উঁকিঝুঁকি, — আর নিজেকে সংযত করতে না পেরে — তক্ষুণি ঘোড়া সাজাবার হুকুম দিয়ে তাড়াতাড়ি দৌড়ে যাই পুকুরে হাত মুখ ধুয়ে নিতে। পুকুরপারের উইলো গাছের ছোট ছোট পাতাগুলো সব প্রায় ঝরে গিয়েছে, ডালের ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ে ফিরোজা আকাশ। উইলোর নীচে জল স্বচ্ছ কনকনে এবং মনে হয় ভারি। এই জলে এক পলকে রাত্রির আলসেমি কেটে যায়, আর হাত মুখ ধুয়ে রান্নাঘরে মজুরদের সঙ্গে বসে গরম আলু আর মোটাদানার ভিজে নুন ছড়ানো রাই-এর রুটি দিয়ে নাশ্তা, তারপর ঘোড়ায় চেপে ভীসেল্কি গ্রাম হয়ে শিকারে যেতে যেতে জিনের পিচ্ছিল ছোঁয়াচটা অনুভব করা কতই না মধুর! শরৎ — সে উৎসবের মরসুম, লোকজন এসময় বেশ ফিটফাট, খোশমেজাজ, গাঁয়ের চেহারাও

বছরের অন্যান্য সময় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ফসল যদি ভালো হয়ে থাকে সে বছরে, মাড়াই-উঠোনে যদি গড়ে ওঠে সোনালী শস্যের কেল্লা আর সকালে নদীতে শোনা যায় পাতিহাঁসের উচ্চ শ্রুতিকটু প্যাঁকপ্যাঁক চিৎকার, তাহলে গাঁয়ের জীবনটা একেবারে মন্দ যায় না। তদুপরি আমাদের ভীসেল্‌কি গ্রামটি আদিকাল থেকে, সেই ঠাকুর্দার আমল থেকে সমৃদ্ধির জন্য বিখ্যাত। ভীসেল্‌কির বুড়োবুড়ি বাঁচে অনেক কাল — সমৃদ্ধশালী গ্রামের প্রথম লক্ষণ সেটা — তারা সবাই দীর্ঘাকৃতি, নাদুসনুদুস আর বরফের মতো ধবধবে সাদা তাদের চুল। সব সময়েই শোনা যায়:

'এই তো আগাফিয়া, বয়স তো তিরাশির একটি দিনও কম নয়!' — অথবা এ ধরনের আলাপ:

'তুই মরবি কবে, পান্‌ক্রাৎ? বয়স তো একশ' হতে চলেছে নিশ্চয়?'

'কী বললেন, হুজুর?'

'বলছি বয়স কত হল?'

'তা তো জানি না, হুজুর।'

'প্লাতন আপল্লনীচকে মনে আছে?'

'তা আর থাকবে না? বেশ মনে আছে।'

'দেখলি তো! তার মানে তোর বয়স একশ'র বেশী বই কম নয়।'

মনিবের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বুড়ো মুখ কাচুমাচু করে সবিনয়ে খানিক হাসে। কী আর করি, — দোষটা আমার বটে, মরার বয়স তো হয়েছে। সেণ্ট পিটারের উৎসবের দিনগুলোতে গুচ্ছির পেঁয়াজ বেশী না গিললে বোধহয় আরো অনেক দিন বাঁচত।

ওর বুড়িকেও আমার মনে আছে। বারান্দায় একটা বেঞ্চের ওপর কুঁজো হয়ে সর্বক্ষণ বসে থাকত বুড়ি, বেঞ্চীর কোণ আঁকড়ে থাকত, মাথা ঠকঠক করে নাড়াত, নিঃশ্বাস ফেলত হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে, — সর্বদা কিছু একটা নিয়ে ভাবনা। 'নিজের টাকাকড়ির কথা নিশ্চয়,' বলাবলি করত পাড়ার বৌয়েরা; সত্যি ওর সিন্দুকগুলোতে ছিল বিস্তর 'টাকাকড়ি'। কিন্তু মনে হত কথাটা বুড়িটার কানে যায় নি: বিষণ্ণ ভুরু তুলে আধো-অন্ধ চোখ মেলে তাকিয়ে থাকত দূরের দিকে, ঠকঠক করে নাড়াত মাথা, যেন চেষ্টা করত কিছু একটা স্মরণ করার। বেশ দশাসই দেহ, কেমন যেন কালচে সব কিছু। স্কার্টটা প্রায় শ'খানেক বছরের, ন্যাকড়ার চটিজোড়াও মৃতের পায়ে যেমন পরিয়ে দেওয়া হয় তেমন, গলা হলদে আর হাড়গিলে, কাপড়ের বুটি বসানো ব্লাউজ সর্বদা ধব্‌ধবে সাদা, — 'এখনই কবর দেওয়া যায় খাসা'। বারান্দার কাছে বড়ো একটা পাথর: নিজের কবরের জন্য বুড়ি সেটা নিজের হাতে কিনেছে। কফন পর্যন্ত কেনা হয়ে গেছে, — কফনটা চমৎকার, তার পাড়ে দেবদূত, ক্রুশ আর প্রার্থনার মন্ত্র ছাপানো।

ভীসেল্‌কির বাড়িগুলোও বুড়োদের সঙ্গে বেমানান নয়। বাপঠাকুর্দাদের তৈরী পাকা বাড়ি। তবে অবস্থাপন্ন চাষী — সাভেলি, ইগ্‌নাৎ ও দ্রন্‌ — তাদের বাড়িগুলো বেশ বড়ো, ভেতরে ক'টি ঘর, কেননা ভীসেল্‌কিতে সংসার ভাগাভাগি করার রেওয়াজ তখনো আসে নি। এদের মতো লোকেরা মৌচাক রাখত, ছাই-নীল পালের ঘোড়া নিয়ে তাদের জাঁকের শেষ ছিল না, সংসার চালানোয় বিচক্ষণ লোক তারা। নিড়োনোর জায়গায় ঘন সতেজ তিসিক্ষেত —

বিচালির স্তূপ আর খড়ে ছাওয়া মাড়াই-ঘর গোয়াল এবং লোহার দরজা-দেওয়া গোলা, যেখানে রাখা হত কাপড়ের গাঁইট, চরকা, ভেড়ার লোমের নতুন কোট, রূপোর কাজ করা ঘোড়ার সাজ আর তামার বেড় লাগানো মাপ। ফটক আর শ্লেজের ওপর দিককার কাঠ পুড়িয়ে ক্রুশের চিহ্ন আঁকা। মনে আছে, মাঝে মাঝে ভাবতাম চাষী হওয়াটাই ভারি মধুর ব্যাপার। কোন এক রৌদ্রস্নাত সকালে ঘোড়ায় চেপে গাঁয়ের মাঝখান দিয়ে যেতে যেতে বারবার মনে হত শস্য কাটা আর মাড়ানো কী চমৎকার, কী চমৎকার নিড়োনোর জায়গাটার কাছাকাছি খড়ের গাদায় ঘুমোনো, আর ছুটির দিনে আলো হবার সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ের গির্জার ঘণ্টার সুরেলা গভীর শব্দে জেগে ওঠা, তারপর কোনো একটা জলের পিপের পাশে দাঁড়িয়ে মুখ হাত ধুয়ে পরিষ্কার টুইলের শার্ট আর প্যাণ্ট চাপিয়ে নাল লাগানো অক্ষয় টপবুট পরে নেওয়া। তার ওপর যদি উৎসবের পোশাকে সুসজ্জিতা সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী স্ত্রীকে নিয়ে গাড়ি চেপে দুপুরে গির্জাগমন আর সেখান থেকে দাড়িওয়ালা শ্বশুরের বাড়ি, যেখানে মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য যদি থাকে কাঠের থালায় ভেড়ার গরম মাংস, সুন্দর সাদা রুটি, মৌচাকের মধু আর বাড়ির চোলাই মদ — তাহলে তো স্বর্গসুখ!

সম্প্রতিকাল পর্যন্ত — এমনকি আমারও মনে আছে, বেশী দিনের কথা নয় — মিতব্যয়িতা আর সেকেলে গ্রাম্য সমৃদ্ধির দিক দিয়ে ধনী চাষীদের জীবনযাত্রার ধরনের সঙ্গে যথেষ্ট মিল ছিল বেশীর ভাগ মধ্যবিত্ত অভিজাতদের। ভীসেল্‌কি থেকে প্রায় চার ক্রোশ দূরে আমাদের খুড়ী

ঠাকরুন আন্না গেরাসিমভ্‌নার জমিদারিটাও ছিল তেমনি। সেখানে পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা হয়ে যায়। কুকুর সঙ্গে থাকলে তো ঘোড়া চালাতে হয় আস্তে আস্তে, আর সত্যি তাড়াহুড়োর ইচ্ছে পর্যন্ত হয় না — রোদে ভরা ঠাণ্ডা সকালে খোলা মাঠে থাকার আনন্দ কী অপরিসীম। জমিটা চৌপট, অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। আকাশখানা হালকা, কী অবারিত আর অতল! সূর্যের উজ্জ্বল আলো রাস্তায় পড়ছে তেরছা হয়ে, আর বর্ষার পর গাড়ির চাকায় পালিশ করা, তৈলাক্ত পথটি রেলের মতো চকচক করছে। চারিদিকে ছড়িয়ে আছে বসন্তের ফসলের ঘন সবুজ সতেজ সম্ভার। স্ফটিক-স্বচ্ছ হাওয়ায় হঠাৎ কোথা থেকে একটা বাচ্চা বাজপাখি উড়ে এসে ছোট ধারালো পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে একই জায়গায় হাওয়ায় ভেসে রইল। পরিষ্কার দিগন্তে দৌড়ে চলে যায় টেলিগ্রাফের খুঁটিগুলো, আর তাদের রুপোলি তার মিলিয়ে যায় নীলাকাশের ঢালুতে। রুপোর সুতোর মতো তারগুলোর উপর বসে আছে সোয়ালো পাখিরা — ঠিক যেন সাদা কাগজের রেখায় রেখায় ছোট ছোট কালো চিহ্ন।

ভূমিদাস প্রথা দেখে জানার সুযোগ জোটে নি আমার কখনো। তবুও মনে আছে, তা আমি অনুভব করেছি খুড়ী ঠাকরুন আন্না গেরাসিমভ্‌নার বাড়িতে। ফটক পেরিয়ে প্রাঙ্গণে পা ফেলতেই সঙ্গে সঙ্গে টের পাওয়া যায় এখানে তা পুরোপুরি টিকে আছে। জমিদারিটি তত বড়ো নয়, তবে সবটা পুরনো, মজবুত, বহু প্রাচীন বার্চ আর উইলো গাছে ঘেরা। বার-বাড়িগুলোর ছাত নীচু, কিন্তু সংখ্যায় তারা অনেক ও বেশ সুবিধের। সবকটা বাড়িই

কালো ওক কাঠে যেন ঢালাই করা, ওপরে খড়ের ছাত। চোখে পড়ার মতো জায়গাটা হল ধোঁয়ায় কালো, চাকরবাকরদের মহলটা — বেশ উঁচু বলে না, বরং লম্বা বলে; তার দরজা দিয়ে উঁকি মারছে ভূমিদাস আমলের চাকরবাকরদের কয়েকটি শেষ প্রতিনিধি — জরাজীর্ণ বুড়োবুড়ি আর ডন কুইক্সোটের মতো দেখতে অবসরপ্রাপ্ত একটি স্থবির বাবুর্চি। উঠানে ঢুকলে পরে ওদের সবাই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বেশ নীচু হয়ে সেলাম জানায়। পক্ককেশ সইস ঘোড়া নিতে এসে আস্তাবলের দরজাতেই টুপি খুলে খালি মাথায় পার হয় প্রাঙ্গণটা। সে চালাত খুড়ী ঠাকরুনের গাড়ির সামনের ঘোড়াটা। তবে আজকাল তাঁকে শুধু গির্জায় নিয়ে যায়, শীতকালে ঢাকা স্লেজে, আর গ্রীষ্মকালে লোহা-বাঁধাই মজবুত গাড়িতে; এমন গাড়িতে সাধারণত পাদ্রীরা যাতায়াত করে। খুড়ী ঠাকরুনের বাগানটির খুব নাম অযত্নে পড়ে থাকা এবং বুলবুল, ঘুঘু ও আপেলের জন্য; আর বাড়িটির নাম ছিল তার ছাদের জন্য। ভিটেমাটির প্রবেশপথেই বাড়িটা, বাগানের ঠিক কাছেই — লাইম গাছের ডালপালা তাকে যেন করছে আলিঙ্গন — বেঁটেখাটো, ছোট বাড়িটা, কিন্তু দেখে মনে হয় একশ' বছর নয়, — কালের প্রকোপে কালো আর কঠিন হয়ে যাওয়া খড়ে ছাওয়া অদ্ভুত মোটা ও উঁচু চালটায় বাড়িটা মজবুত দেখাত। সর্বদা আমার মনে হত, বাড়ির সামনের দিকটা জীবন্ত: যেন প্রকাণ্ড টুপির নীচ থেকে কোনো বুড়োর মুখ চোখের কোটর দিয়ে তাকিয়ে দেখছে, — রোদে বৃষ্টিতে জীর্ণ, ঝিনুকের মতো দেখতে

কাঁচের জানলা দিয়ে। এই চোখগুলির দু'দিকে ছিল দুটো বড়ো পুরনো থাম-দেওয়া দাওয়া, এগুলোর ছাদের উপর সব সময়ে বসে থাকত পেট-ভরা পায়রাগুলো, আর সেই সময় অসংখ্য চড়ুই বৃষ্টি ধারার মতো এক ছাত থেকে অপর ছাতে করত ওড়াউড়ি।... শরতের ফিরোজা আকাশের নীচের এই নীড়ে অতিথি কী যে আরাম পেত!

বাড়িতে ঢুকলে প্রথমেই পাওয়া যায় আপেলের সৌরভ, আর তারপর অন্যান্য গন্ধ: মেহগনির পুরনো আসবাবপত্র আর জুন থেকে জানলার ধারিতে ফেলে রাখা লাইম গাছের শুকানো ফুলের গন্ধ... সবকটা কামরায়ই — চাকরদের কামরায়, হলঘরে, ড্রয়িং রুমে -- ঠাণ্ডা, আলোর অভাব। তার কারণ বাড়ির চারপাশে বাগান, আর জানলার ওপরের শার্শিগুলো রঙীন কাঁচের — হয় নীল নয় বেগুনী। চারিদিক নিঝুম ও পরিষ্কার যদিও, মনে হয়, আরাম-কেদারা, কারুকার্য করা টেবিল আর সরু পল তোলা, সোনালী ফ্রেমে বসানো আয়নাগুলো কখনো জায়গা থেকে সরানো হয় নি। তারপর কানে আসে ছোট্ট একটা কাশির শব্দ: আন্না খুড়ী বেরুচ্ছেন। লম্বা নন তিনি, তবে নিজেও আশেপাশের সব জিনিসেরই মতো মজবুত। কাঁধের ওপর বড়ো একটা ফারসী শাল। গুরুগম্ভীর চালে তিনি বেরুতেন বটে, তবে স্বাগত হাসির অভাব হত না। পুরনো দিন, উইল আর উত্তরাধিকার নিয়ে অনর্গল বাক্যস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে অতিথির সামনে নানা মুখরোচক খাদ্যের আবির্ভাব হত: প্রথম নাশপাতি, চার ধরনের আপেল, আর তারপর এলাহি মধ্যাহ্ন ভোজ: মটরশুঁটি আর সেদ্ধ করা আগাগোড়া গোলাপী হ্যাম, পুর

দেওয়া মুরগী, টার্কি, আচার আর লাল ক্‌ভাস* — বেশ কড়া আর অসম্ভব মিষ্টি।... বাগানের দিকের জানলাগুলো খোলা, কাজেই ঘরে আসে শরতের ঝরঝরে ঠান্ডা হাওয়া।...

৩

হালে জমিদারবাবুদের মিইয়ে পড়া মেজাজ চাঙ্গা হয়ে উঠত একটি মাত্র ব্যাপারে — শিকারে।

খুড়ী ঠাকরুনের ভিটেমাটিও অবশ্য ছিল যেগুলো ভাঙনের মুখে এসে পড়া সত্ত্বেও বিরাট ভূসম্পত্তি আর পঞ্চাশ একরের বাগান নিয়ে আগেকার দিনের ঠাট আঁকড়ে থাকত। সত্যি, কয়েকটি এখনো টিকে আছে, তবে ওগুলোতে আর প্রাণ নেই। ত্রোইকা আর নেই, নেই 'কিরগিজ' ঘোড়া, শিকারী কুকুর, ভূমিদাস, এমনকি এ সমস্ত কিছুর মালিক পর্যন্ত উধাও — আমার বিগত শ্যালক আর্সেনি সেমিওনীচের মতো শিকারী-জমিদারবাবুও আর নেই।

সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে ফলের বাগান ও খেতখামার নির্জন হয়ে যায়, আবহাওয়াটাও দস্তুরমতো একদম বদলে যেত হঠাৎ। দিনের পর দিন গাছগুলো দমকা হাওয়ার উন্মত্ত ঝাপটায় আর দিনরাতের বর্ষণে ভিজে গায়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মাঝে মাঝে বিকেলের দিকে বিষণ্ণ নীচু মেঘের ফাঁকে ফাঁকে পশ্চিমে ফেটে পড়ে অস্তরবির কম্পমান

* সচরাচর রুটি বা ওই জাতীয় জিনিস গাঁজিয়ে তৈরি এক ধরনের পানীয়।

সোনালি ঝিকিমিকি আলো, বাতাসে আসে একটা শুচি ও নির্মল আমেজ, হাওয়ায় দাপাদাপি করা পাতা আর ডালপালার মাঝখানে সূর্যের চোখ-ধাঁধানো আলো। জলের মতো স্বচ্ছ নীল আকাশের হিম উজ্জ্বল আভা পড়েছে উত্তরে ধূসর সীসে-রঙা মেঘের ওপর, আর তাদের পেছন থেকে ধীরে ধীরে উঠছে বরফে ঢাকা শৈলশিরার মতো সাদা মেঘ। জানলার সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয়: 'ভগবান করুন, হয়ত, আবহাওয়াটা ঠিক হয়ে যাবে।' কিন্তু হাওয়ার জোর কমা দূরের কথা। বাগানকে উত্ত্যক্ত করে তুলে বসার ঘরের চিমনি থেকে একনাগাড়ে বেরনো ধোঁয়ার কুণ্ডলীকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে ভয়াল ভারি ধূসর মেঘগুলোকে তাড়িয়ে আবার একসঙ্গে জোট পাকিয়ে দেয় তা। মেঘগুলো বেশ নীচ দিয়ে তাড়াতাড়ি ভেসে চলে, এবং অচিরেই আবার ঢেকে দেয় সূর্যকে। নিভে যায় তার ঝকঝকে আলো, ঝাপসা হয়ে আসে নীল আকাশ, বাগানের চেহারা হয়ে ওঠে বিষণ্ন বিরস। আবার নামে বৃষ্টি... প্রথমে ঝিরঝিরে নরম, তারপর ক্রমশ বেড়ে মুষলধারায়, ঝড় আর অন্ধকার। রাত্রি নামে, দীর্ঘ রাত্রি নামে, দীর্ঘ রাত্রি, অস্বস্তিতে ভরা।...

এরকম দুর্যোগের পর বাগানের চেহারাটা দাঁড়ায় রিক্ত, জড়োসড়ো, সঙ্কুচিত, ইতস্তত পড়ে থাকে ভেজা পাতা। কিন্তু মেঘ কেটে গেলে বাগানটা আবার কী সুন্দর দেখতে, অক্টোবরের প্রথম ক'টা স্বচ্ছ আর শীতল সে সব দিন, শরতের বিদায় সমারোহ! তখনো না-ঝরা পাতাগুলো ডালে ডালে টিকে থাকবে প্রথম তুষারপাত পর্যন্ত। শীতল ফিরোজা আকাশের পটে কালো বাগানখানা দীনভাবে

দাঁড়িয়ে থাকবে শীতের অপেক্ষায়, যেটুকু পারে শুষে নেবে সূর্যের আলো। এরই মধ্যে কিন্তু চষা মাঠে চোখে পড়ে কালো কালো ছোপ। আর ক্ষেতগুলো ভরে ওঠে উজ্জ্বল সবুজ বসন্তের ফসলে।... এসে পড়েছে শিকারের দিনগুলো!

চোখের সামনে আমি দেখতে পাই আর্সেনি সেমিওনীচের ভিটেমাটি, সূর্যালোকিত, সিগারেট ও পাইপের ধোঁয়ায় ভরা প্রকান্ড বাড়ির হল-ঘরটা। অনেক লোকের ভিড় — রোদে জলে পোড়া তাদের মুখ, পরনে কুঁচি দেওয়া লম্বা কোর্তা, পায়ে লম্বা বুট। এই মাত্র এলাহি ভোজন পর্ব শেষ হয়েছে, আসন্ন শিকারের সরব আলোচনায় সবাই উত্তেজিত, মুখ লাল; তবে ভোজন পর্ব শেষ হবার পরও কিন্তু ভোদ্‌কার গেলাস ভরে নিতে ভোলে নি তারা। শিকারের শিঙা বেজে উঠল উঠানে, শিকারী কুকুরগুলো চেঁচাতে লাগল নানা রকম গলায়। আর্সেনি সেমিওনীচের পেয়ারের দৌড়বাজ কুকুরটা টেবিলে উঠে থালা থেকে ঝলসানো খরগোশের ভুক্তাবশেষ তাড়াতাড়ি গিলতে আরম্ভ করে। কুকুরটা কিন্তু হঠাৎ বিকট চেঁচিয়ে টেবিল থেকে লাফ দিয়ে নামাতে গেলাস আর রেকাবীগুলো সব উল্টে গেল: শিকারের চাবুক আর রিভল্‌ভার হাতে স্টাডি থেকে বেরিয়ে এসে আর্সেনি সেমিওনীচ আচমকা কানে তালা লাগিয়ে দিয়ে রিভলভার ছুঁড়েছেন। হলটা ঘন ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে, কিন্তু আর্সেনি সেমিওনীচ দাঁড়িয়ে শুধু হাসছেন।

'এই যাঃ, ফসকে গেল!' চোখ নাচিয়ে বলেন তিনি।

লম্বা পাতলা চেহারার লোকটি, তবে কাঁধ চওড়া, সুঠাম

দেহ, আর মুখটা — সুদর্শন জিপ্‌সীর মতো। চোখে তাঁর একটা অদ্ভুত দীপ্তি। রাস্পবেরি-লাল সিল্ক শার্ট, মখমলের ট্রাউজার আর টপবুট পরাতে বেশ ফিটফাট দেখাচ্ছে। রিভল্‌ভার ছুঁড়ে কুকুর আর লোকজনের পিলে চমকিয়ে দিয়ে মোটা ভারি গলায় প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের গাম্ভীর্যে আবৃত্তি করলেন:

সাজাও সাজাও কসাকী ঘোড়াটি
ঝোলাও কাঁধেতে গমগমে শিঙা।

তারপর জোরে বললেন:

'বেশ, তাহলে আর মূল্যবান সময় নষ্ট করে লাভ নেই!'

আজও মনে আছে ব্যাকুল লোভীর মতো তরুণ বুকটি ভরে নিতাম নির্মেঘ আর্দ্র দিনের সন্ধ্যার স্নিগ্ধতায়, যখন আর্সেনি সেমিওনীচের হুল্লোড়ে দলের সঙ্গে বনের মধ্যে শৃঙ্খলমুক্ত কুকুরের সুরেলা চিৎকারে রোমাঞ্চিত হয়ে যেতাম কোথায় কোন 'লাল টিলা' অথবা 'গুরুগুরু দ্বীপ'-এর ঘন জঙ্গলে — যেসব জায়গার নামই শুধু শিকারীর পক্ষে যথেষ্ট চাঞ্চল্যকর। চলেছি একটা রাগী, তাগড়া বেঁটে কির্‌গিজ ঘোড়ায় চেপে, জোরে লাগাম ধরে সামলাতে সামলাতে মনে হত ওর সঙ্গে প্রায় এক হয়ে গিয়েছি। নাক দিয়ে আওয়াজ করে ঘোড়াটা, চার পা ফেলে ছোটার জন্য অধীর। কালো ঝরা পাতার পুরু খড়খড়ে গালিচায় ওর পায়ে পায়ে ওঠে খসখস শব্দ, প্রতিটি শব্দের ফাঁপা প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যায় বৃষ্টিতে ভেজা, স্যাঁতসেঁতে তাজা, ফাঁকা বনের গহনে। দূরে কোথাও চেঁচাল একটা শিকারী কুকুর, করুণ সুরে গভীর উত্তেজনায় তাকে সাড়া দিল অন্য একটা, যোগ দিল তৃতীয়টি — হঠাৎ গোটা বনটা কাঁচের

ঝনঝনানির মতো মুখর হয়ে উঠল মানুষের হৈহল্লা আর কুকুরগুলোর উদ্দাম ডাকে। হট্টগোল ছাপিয়ে বন্দুকের শব্দ — শুরু হল 'কান্ডকারখানা'। গুরুগুরু একটা ধ্বনি গড়িয়ে যাচ্ছে দূরে।

'সামলে হে!' কার চিৎকারে মুখর হয়ে উঠল সারা বন।

'সামলে!' মাতাল করা ভাবনাটা মাথায় ঝলক দিয়ে ওঠে। হো হো করে ঘোড়া তাড়িয়ে — যেন ঠিক শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে ঘোড়া তাড়িয়ে ছুটি পাগলের মতো বনের মধ্য দিয়ে, পথে যে কি আছে সে দিকে কোনো হুঁশ নেই। চোখের সামনে শুধু গাছের ঝিলিক, ঘোড়ার খুরে লেগে ছিটকে মুখে লাগছে কাদার ডেলা। বন থেকে ঝাঁপিয়ে বেরিয়ে দেখা যায় বিচিত্রবর্ণের কুকুর দলে দলে ছড়িয়ে পড়েছে সবুজ ক্ষেতে। জানোয়ারটাকে ধরবার জন্য ঘোড়াটাকে আরো তাড়া দিয়ে তীরের মতো চলি ছোট পথে মাঠ, চষা ক্ষেত আর শস্যের নাড়া পেরিয়ে; অবশেষে অন্য একটি দ্বীপে গিয়ে পড়ি। অদৃশ্য হয়ে যায় প্রাণপণে ডেকে চলা কুকুরের দল। তখন ঘর্মাক্ত, উত্তেজনায় কম্পিত দেহে রাশ টানি মুখে গাঁজলা ওঠা, হাঁপিয়ে পড়া ঘোড়াটার, বুক ভরে লোভীর মতো নিই বন্য উপত্যকার সোঁদা ঠান্ডা হাওয়া। দূরে মিলিয়ে যায় শিকারীদের চিৎকার, কুকুরের ডাক। চারিদিকে — মৃত্যুর মতো স্তব্ধতা। ছোট ঝাঁকড়া গাছ নেই, দীর্ঘ পাইনের বন নিশ্চল, মনে হয় যেন কোনো নিষিদ্ধ দেশে পা দিয়েছি। নালা থেকে আসছে ব্যাঙের ছাতা, পচা পাতা আর ভিজে গাছের ছালের কড়া আর্দ্র গন্ধ। খাত থেকে ছড়ানো সিক্ততা হয়ে উঠছে আরো কনকনে, বনের ভেতরে ক্রমশ ঠান্ডা আর অন্ধকার হয়ে

আসছে।... বাড়ি ফেরার সময় হল। কিন্তু শিকারের পরে কুকুরগুলোকে একসঙ্গে জড়ো করা কঠিন, বনের মধ্যে শিকারীদের শিঙে বেজে চলে হতাশ ব্যাকুল সুরে, অনেকক্ষণ ধরে শোনা যায় চেঁচামেচি, গালি পাড়া, আর শিকারী কুকুরের কেঁউ-কেঁউ ডাক।... শেষে, একেবারে অন্ধকার নেমে পড়লে শিকারীদের দল প্রায় অপরিচিত কোনো চিরকুমার জমিদারের বাড়িতে চড়াও হল। তারা সারা বাড়িটাকে বহু কণ্ঠের আওয়াজে সরগরম করে তোলে। অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্য জ্বালানো লণ্ঠন, মোমবাতি প্রভৃতির আলোয় ভিটেমাটি আলোকিত হয়ে ওঠে।...

মাঝে মাঝে এমনও হত যে শিকারীর দলটা এমন অতিথিবৎসল প্রতিবেশীর বাড়িতে কয়েকটা দিন কাটিয়ে দিত। প্রভাতেই শীতের প্রথম স্যাঁতসেঁতে তুষার আর কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘোড়ায় চেপে চলে যেতাম বনবাদাড়ে; সন্ধ্যার আবছা আঁধারে ফিরতাম সর্বাঙ্গে ধুলোকাদা মেখে; মুখগুলো টকটকে লাল, ক্লান্ত ঘোড়ার ঘাম ও নিহত জানোয়ারের লোমের গন্ধে জামাকাপড় ভরপুর। তারপর শুরু হত মদ্যপান। কনকনে হাওয়ায় সারা দিন মাঠে ঘাটে কাটাবার পর উজ্জ্বল ও লোকজমাট বাড়িটা বেশ আরামের। সবাই কোটের বোতাম খুলে এ ঘরে ও ঘরে যাচ্ছে, খানাপিনা চলছে গোলমেলে ভাবে, জোর গলায় চলেছে সেদিনের শিকারের গল্প; হলের মাঝখানে ফেলে রাখা নেকড়ের লাশটার ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া বিবর্ণ রক্তে মেঝে রাঙানো, দাঁতগুলো বেরিয়ে এসেছে, চোখ উঠে গেছে ওপরে আর তার ফুরফুরে নরম লেজটা এক

ধারে পড়ে আছে। ভোদ্‌কা আর খাবারের পর এত মধুর একটা অবসাদ, ক্লান্তি, এত মিঠে ঘুমের কী পরমসুখ! তখন মনে হয় যেন লোকের কথাগুলো শোনা যাচ্ছে জলের ভেতর দিয়ে। ফাটা মুখ চিড়বিড় করে উঠে, চোখ বুজলেই পায়ের তলায় সারা পৃথিবীটি ঘুরতে থাকে। কিন্তু কোথাও আইকন ও তার সামনের দীপজ্বলা আদ্যিকালের একটা কোণের কামরায় গিয়ে পালকের নরম বিছানায় শুয়ে পড়লে, অমনি আগুন-রঙা শিকারী কুকুরগুলোর অপচ্ছায়া বিদ্যুতের মতো ভেসে আসে চোখের সামনে, সমস্ত শরীরটা ব্যথিয়ে ওঠে ঘোড়ায় চাপার অনুভূতিতে, আর কিছু বোঝার আগেই মধুর নিটোল ঘুম আচ্ছন্ন করে ফেলে, মুছে যায় এইসব ছবি আর অনুভূতি; এমনকি তখন মনেও পড়ে না যে এ ঘরটি কোন কালে একটা বুড়োর পুজোর ঘর ছিল, যার নামটি ঘিরে প্রচলিত রয়েছে ভূমিদাস প্রথার সময়কার নানা ভয়াবহ গল্প, এই পুজোর ঘরেই, হয়ত এই বিছানাতেই তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়।

পরের দিন যদি ঘুম ভাঙত দেরি করে, শিকারে যাবার সময় পেরিয়ে, তাহলে বেশ আয়েস হত। জেগে উঠে অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকা। কোনো সাড়াশব্দ নেই সারা বাড়িতে। কানে আসে মালি কত সাবধানে ঘরে ঘরে ঢুকে গরম করছে চুল্লীগুলো, তা থেকে ভেসে আসছে কাঠের চড়চড় হিসহিস আওয়াজ। সামনেই — এরই মধ্যে শীতকালের মতো নীরব হয়ে যাওয়া বাড়িটায় আরামের একটা দীর্ঘ দিন। ধীরেসুস্থে জামাকাপড় চড়িয়ে বাগানে ঘোরার সময় সহসা দেখা যায় ভিজে পাতায় কারোর চোখে না পড়া একটা ঠাণ্ডা, সিক্ত আপেল, কেন জানি না মনে

হয় জিনিসটা অদ্ভুত সুস্বাদু, এর জুড়ি আর নেই। তারপর ঠাকুর্দার আমলের বই নিয়ে বসা, — পুরু চামড়ায় বাঁধানো বই, মরক্কো চামড়ার পিঠে সোনালি তারা। মোটা হলদেটে পাতার বইগুলো দেখতে প্রার্থনা পুস্তকের মতো, খাসা একটা গন্ধ! পুরনো সেন্টের সুবাস, ছাতাপড়ার প্রীতিকর ঝাঁঝালো গন্ধ। পাতার ধারে ধারে পালকের কলমে মোলায়েম, গোটা গোটা করে লেখা নোটগুলোও বেশ সুন্দর। বই খুললেই চোখে পড়ে: 'প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকদিগের যোগ্য চিন্তা — বুদ্ধি ও গভীর অনুভূতির আলোক'... আর তখন একমনে বইটা পড়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। বইটির নাম — 'অভিজাত দার্শনিক'*), একটি রূপকধর্মী রচনা একশ' বছর আগে একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ছাপাখানায় 'বহু সামরিক পদকের অধিকারী' কোন এক ব্যক্তির খরচায় ছাপানো। 'মানুষের মস্তিষ্কের যোগ্য উচ্চ চিন্তাশক্তি ও অবসর বশতঃ অভিজাত দার্শনিকটির অন্তরে একদা জাগ্রত হইয়াছিল আপন বিস্তীর্ণ বসতভূমিতে বিশ্ব পরিকল্পনার বাসনা'... তারপর হয়ত চোখে পড়ে 'ভল্‌টেয়ার মহাশয়ের ব্যঙ্গাত্মক ও দার্শনিক রচনাবলী', অনুবাদের মজার ভারিক্কি চালটা অনেকক্ষণ উপভোগ্য: 'মহাশয়গণ! ষোড়শ শতাব্দীতে এরাস্‌মাস*) অনুগ্রহ করিয়া ভাঁড়ামীর সাধুবাদ করিয়াছিলেন (এখানে একটি সেমিকোলোন, — নাটকীয় বিরতি); আর আপনারা কিনা আমাকে বুদ্ধির প্রশংসা করিতে বলিতেছেন!...'

*) চিহ্নিত স্থানগুলির জন্য টীকা-টিপ্পনী দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

তারপর সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিনার*) আদিকাল থেকে অবতরণ রোমান্স, পঞ্জিকা আর অতিশয় দীর্ঘ ও ভাবপ্রবণ উপন্যাসের যুগে।... ফাঁকা বাড়িতে আপনার মাথার ওপরে ঘড়ি থেকে বেরিয়ে আসে কোকিল, কানে আসে তার বিষণ্ণ বিদ্রূপের ডাক। আর আস্তে আস্তে অন্তর ভরে জেগে ওঠে বিচিত্র মধুর বিষাদে।...

তারপর হয়ত 'আলেক্সিসের গুপ্তকথা'*) কিংবা 'ভিক্তর বা অরণ্যে শিশু'*)-র পাতা খুলে পড়া যায়: 'রাত বারোটার ঘণ্টা বাজিল! দিনের হট্টগোল ও গ্রামবাসীদের চঞ্চল গীতের পরিবর্তে পূত স্তব্ধতা। আমাদের অর্ধগোলকে নিদ্রাদেবী তাঁহার অন্ধকার পক্ষ বিস্তার করিলেন। তাঁহার পক্ষসঞ্চালনে ঝরিয়া পড়ে অন্ধকার আর স্বপ্ন।... কতই না ক্ষেত্রে স্বপ্ন কেবল দুর্ভাগার জ্বালাযন্ত্রণার পূর্বানুবৃত্তি মাত্র!...' আর চোখের সামনে চকিতে ভেসে আসে কত পুরনো প্রিয় শব্দ: পাহাড় ও কুঞ্জ, বিবর্ণ চাঁদ ও নিঃসঙ্গতা, ভূত ও প্রেত, 'পঞ্চশরের আক্রমণ', গোলাপ ও লিলি, 'ছোট ছেলেদের দুষ্টুমি ও চপলতা', লিলির মতো শুভ্র বাহু, লিউদমিলা'রা ও আলিনা'রা... আর নানা পত্রিকা, তাতে জুকোভ্স্কি*), বাতিউশ্কভ*) ও জিমনাসিয়ামের ছোকরা ছাত্র পুশ্কিনের*) নাম। উদাস মনে ভাবতে হয় ঠাকুমার কথা, ক্লাভিকর্ডে তাঁর বাজানো পলোনেজগুলির কথা, 'ইয়েভ্গেনি ওনেগিন'*) থেকে উদাস সুরে তাঁর কবিতা পাঠের কথা।... চোখের সামনে ভেসে আসে সেই পুরনো, স্বপ্নালস জীবন।... এসব জমিদার মহালে একদা কী মধুর যুবতী ও মহিলারাই না থাকত! সেকেলে ধরনে অদ্ভুত খোপা বাঁধা সেই সব অভিজাত সুন্দরী দেয়ালে টাঙ্গানো

ছবির মধ্য থেকে আমার দিকে তাকিয়ে নম্র মেয়েলী ভঙ্গিতে বিষণ্ণ ও কোমল চোখের দীর্ঘ পল্লব নামালেন।...

৪

জমিদার বাড়ি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে আন্তনভ্কা আপেলের সৌরভ। কত দিনই বা কেটেছে, অথচ মনে হয় তখন থেকে আমার মধ্যে শতাব্দীর ব্যবধান। ভীসেল্কির প্রবীণেরা আর নেই, দেহাবসান হয়েছে আন্না গেরাসিমভ্নার, আত্মহত্যা করেছেন আর্সেনি সেমিওনীচ।... মালিকানা নিয়ে বসেছে ছোটখাটো জোতদাররা, তাদের অবস্থা প্রায় ভিখারীর মতন। কিন্তু এসব ছোটখাটো জমিদারিতে এমন নিঃস্ব জীবনযাত্রাও কী ভালো!

হেমন্তে আবার আমি সেই গাঁয়ে। দিনগুলো ঝাপসা নীল, মেঘলা। সকালে ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে পড়লে সঙ্গে থাকত মাত্র একটি কুকুর, কাঁধে বন্দুক, আর শিকারীর শিঙা। বন্দুকের নলে শিস দিয়ে আওয়াজ তুলছে জোরালো হাওয়া, মুখে লাগছে হাওয়াটা, মাঝে মাঝে নিয়ে আসছে শুকনো বরফগুঁড়ো। সারাদিন ঘুরে বেড়াই জনহীন সমভূমিতে... গোধূলির সময়ে বাড়িতে ফিরে যাই। ক্ষুধার্ত, ঠাণ্ডায় জমে গিয়েছি, কিন্তু সুখের কী উষ্ণ অনুভূতিই না হয় যখন সামনে দেখি অন্ধকারে টিমটিম করা ভীসেল্কির সব আলো, নাকে এসে লাগে ধোঁয়া আর বাড়ির গন্ধ! মনে আছে, আমাদের বাড়ির লোকের ভারি পছন্দ হত 'গোধূলির' সময়টা, আলো না জ্বালিয়ে

আধো-অন্ধকারে বসে বসে নরম গলায় তাঁরা আলাপ করতেন। বাড়িতে ঢুকে দেখি শীতের প্রস্তুতি হিশেবে দু'পাল্লার জানলাগুলো এরই মধ্যে বসানো হয়েছে তাদের জায়গায়, তাই সবচেয়ে বেশী করে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারি শান্ত শীতের আলসেমির সঙ্গে। চাকরদের ঘরে আগুন জ্বালাচ্ছে কেউ, আর আমি, ঠিক ছেলেবেলাকার মতোই, শীতের ঝরঝরে গন্ধভরা একটি খড়ের গাদার পাশে উবু হয়ে বসে তাকিয়ে থাকি হয় দাউদাউ আগুনের দিকে, নয় জানলায়, যেখানে নীল হয়ে বিষণ্ণভাবে মিলিয়ে যায় আবছা আঁধারে আলো। তারপর যাই উজ্জ্বল আলোকিত রান্নাঘরে, সেখানে গরম, বেশ ভিড়ও: রাঁধুনী মেয়েরা বাঁধাকপি কেটে চলেছে, ঝিলিক মারছে দা'গুলো, বসে বসে শুনি তাদের সমতাল কচকচ আওয়াজ, সুন্দরভাবে মেলানো মেয়েদের গলায় গাঁয়ের উদাস অথচ ফুর্তিতে ভরা গান।... মাঝে মাঝে কাছেপিঠের কোনো ছোট জোতদার আসেন, আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান অনেক দিনের জন্য।... ছোট জোতদারের জীবনযাত্রাও খাসা!

বেশ ভোরে ঘুম ভাঙে তাঁর। আড়মোড়া ভেঙে উঠে পড়ে শস্তা কালো তামাক বা শুধু কড়া তামাক দিয়ে একটা পুরু সিগারেট বানিয়ে নেন। নভেম্বরের প্রথম দিক। ভোরের বিবর্ণ আলোয় দেখা যায় সাদাসিধে পড়ার ঘর। দেয়ালে বিশেষ কিছু নেই, শুধু বিছানার ওপর টাঙানো গোটাদুয়েক হলদেটে ঠুনকো খেঁকশেয়ালের চামড়া, কসাক সালোয়ার ও ঢিলে, বেল্ট-খোলা শার্ট পরিহিত একটি তাগড়া লোক। আয়নায় ছায়া পড়েছে ঘুমে ভারি তাতার ধাঁচের একটি মুখের। উষ্ণ, আধো-অন্ধকার বাড়িতে

ঘোর স্তব্ধতা। বারান্দায় বুড়ি রাঁধুনীর নাক ডাকার পাতলা আওয়াজ, ছোটবেলা থেকে এ বাড়িতে সে কাজ করে এসেছে। কিন্তু তাতে কী, মনিব গলা ফাটিয়ে ভাঙা ভাঙা সুরে হাঁক দেন:

'লুকেরিয়া! সামোভার!'

তারপর টপবুট চড়িয়ে, কাঁধে কোট ফেলে, শার্টের গলার বোতাম না আটকে, অলিন্দে বেরিয়ে আসেন তিনি। সারা রাত বন্ধ বিচালি ঘরটায় কুকুরের গন্ধ; অলসভাবে আড় ভেঙে, অল্প কেঁউ কেঁউ করে আহ্লাদে তারা আসত মনিবের কাছ ঘেঁষে।

'ভাগ, বলছি!' মোটা গলায় প্রশ্রয় মাখানো সুরে আস্তে আস্তে বলে বাগান হয়ে তিনি যান মাঠের দিকে। বুক ভরে নেন ভোরের ধারালো হাওয়া আর রাত্রের শীতে নিথর রিক্ত বাগানের গন্ধ। বার্চ বীথির অর্ধেক গাছ এরই মধ্যে কেটে ফেলা হয়েছে। বীথির মধ্যে গেলে হেমন্তের ঠান্ডায় কালো ও কুঁকড়ে যাওয়া পাতা খস খস করে পায়ের তলায়। বিষণ্ণ মেঘলা আকাশের পটে গোলার ছাতের ওপর পালক ফুলিয়ে ঘুমিয়ে থাকে দাঁড়কাকগুলো।... শিকারের দিনই বটে! বীথির মাঝখানে দাঁড়িয়ে মনিব অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখেন হেমন্ত দৃশ্যটি। বাসন্তী ফসলের নির্জন সবুজ মাঠ, সেখানে ঘুরে বেড়ায় কয়েকটি বাছুর। দুটো শিকারী কুকুর পায়ের কাছে কেঁউ কেঁউ করতে থাকে আর জালিভাই কুকুরটি তো বাগানের বাইরে খাবলা খাবলা নাড়ার মধ্যে দাপাদাপি করছে, যেন মনিবকে ডাকছে, মাঠে যেতে চাইছে। কিন্তু শিকারী কুকুর নিয়ে কী লাভ এখন? বলে হাওয়ায় পাতার খসখসানিতে ভয় পেয়ে জন্তুজানোয়ার

তো এখন বেরিয়ে এসেছে কালো মাঠে।... ইস, কয়েকটা দৌড়বাজ কুকুর যদি থাকত!

গোলাঘরে মাড়াই আরম্ভ হচ্ছে। ক্রমশ জোরে চলতে শুরু করে মাড়ানির কল, ভন ভন গোঁ গোঁ শব্দ তুলছে। দাঁতওয়ালা চাকাগুলোকে ঘোরাচ্ছে ঘোড়াগুলো; হেলে দুলে ঘুরছে অলসভাবে দাঁড় টেনে, গোবর ছড়ানো পথে পা ফেলে। মাড়াইয়ের খুঁটিতে লাগানো ছোট একটা টুলে চালক বসে একঘেয়ে সুরে বারবার ঘোড়াগুলোকে হেঁকে চলেছে, চাবুকটা কিন্তু পড়ছে খয়েরী রঙের খাসী ঘোড়াটার পিঠে, যেটা সবচেয়ে আলসে, চলেছে ঝিমোতে ঝিমোতে। তাছাড়া কী আর করবে? — তার চোখদুটো যে বাঁধা!

'ওহে মেয়েরা, পা চালিয়ে!' শণের ঢিলে শার্টটি চাপাতে চাপাতে ধীরস্থির প্রকৃতির কলচালক কড়া সুরে হাঁকে মেয়েদের।

মেয়েরা তাড়াতাড়ি মাড়াইয়ের জায়গাটা সাফ করে ঝাঁটা আর বারকোষ নিয়ে ছুটোছুটি করতে থাকে।

'জয় ভগবান!' বলে কলচালক, আর রাইশস্যের প্রথম গোছাটা তীরের মতো কিঁচকিঁচে মুখর পিপেতে পড়ে ছিটকে বেরিয়ে আসে ফুলঝুরির মতো। পিপের শব্দ ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠে, কাজ চলে দ্রুতগতিতে, কিছুক্ষণের মধ্যে সব আওয়াজ মিলিয়ে যায় মাড়াইয়ের প্রীতিকর শব্দে। গোলাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মনিব দেখছেন ভেতরের অন্ধকারে ঝলকাচ্ছে লাল আর হলদে রুমাল, হাত, কাঁটা ও খড়ের ঝিলিক, পিপের গর্জন, কলচালকের একঘেয়ে হাঁকডাক; চাবুকের সপাং-সপাং শব্দের সঙ্গে তাল রেখে

সব কিছু চলেছে ব্যস্তভাবে। ঝাঁকে ঝাঁকে ভূষি দরজায় উড়ে এসে গায়ে পড়াতে মনিবের দেহটা সাদা হয়ে যাচ্ছে। ঘন ঘন উঁকি মারছেন তিনি ক্ষেতের দিকে।... খুব শিগ্‌গিরই ক্ষেতগুলো বরফে সাদা হয়ে যাবে, শিগ্‌গিরই প্রথম হিমকণা ঢেকে ফেলবে ওগুলো।...

হিমকণা, বছরের প্রথম তুষারপাত! দৌড়বাজ কুকুর নেই, নভেম্বরে শিকার করে লাভ নেই। তবে শীতকাল তো এসে পড়ল, তখন শিকারী কুকুরগুলোই 'কাজে' লাগে। এবং আবার আগেকার দিনের মতোই, ছোটখাটো জোতদাররা এ-ওর বাড়ি গিয়ে মদ্যপান করে শেষ কড়িটিও ফুঁকে দেয়, দিনগুলো কাটায় বরফ-ঢাকা মাঠে। আর শীত রাত্রির অন্ধকারে, নিঝুম কোনো একটা গণ্ডগ্রামে জমিদার বাড়ির বার-বাড়িতে জানলায় দেখা যায় আলো, সেখানে ধোঁয়ার মেঘে আচ্ছন্ন ঘরে জ্বলে চর্বিবাতির ক্ষীণ শিখা, সুর বাঁধা হয় গিটারে।...

আঁধিতে উঠল আঁধিয়ার
হাট করে খোলে কপাট —

ভরাট কণ্ঠে গান শুরু হয়, সবাই ঠাট্টাতামাশার ভান করে ধুয়া ধরে বেতালে বিষণ্ণ হতাশ বেপরোয়ায়:

হাট করে খোলে কপাট
তুষারকণায় ঢেকে গেলে পথঘাট...

১৯০০

সুখদল

১

সুখদলের প্রতি নাতালিয়ার টান আমাদের বরাবর অবাক করে দিয়েছে।

আমাদের বাবাকে দুধ খাইয়ে যে ঝি বড়ো করেছিল তার মেয়ে নাতালিয়া, বাবার সঙ্গে বরাবর সে এক বাড়িতে মানুষ হয়, আট বছর কাটায় আমাদের সঙ্গে লুনিওভোতে, থাকে আপনজনের মতো, গৃহদাসীর মতো নয় মোটে। আর, ওর নিজের কথায়, পুরো আট বছর সে সুখদল আর সেখানকার সমস্ত দুর্ভোগের ধকল থেকে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। কিন্তু নেকড়েকে যতই খাওয়াও তার মন পড়ে থাকে বনে, কথাটা মিছিমিছি নয়: আমাদের বড়ো করার পর নাতালিয়া আবার ফিরে গেল সুখদলে।

ছেলেবেলায় তার সঙ্গে কথাবার্তার কয়েকটা টুকরো মনে আছে:

'তোমার বাপ-মা নেই, তাই না নাতালিয়া?'

'হাঁ। মুনিবদের সঙ্গে আমার মিল আছে এ ব্যাপারে। তোমাদের ঠাকুমা, আন্না গ্রিগরিয়েভ্না, খুব অল্প বয়সে চোখ বোজেন। আমার বাপ-মা'র মতো।'

'তোমার বাবা-মা — কেন তারা অল্প বয়সে মারা যায়?'

'মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছিল, তাই।'

'কিন্তু এতো অল্প বয়সে কেন?'

'ভগবানের ইচ্ছে। মুনিব বাবাকে শাস্তি দেবার জন্যে ফৌজে পাঠিয়েছিলেন; আর টার্কিছানার জন্য মা অকালে মারা গেলেন। আমার অবশ্য মনে নেই, তখন নেহাৎ ছোট ছিলাম কিনা, পরে লোকের মুখে শুনেছি: মা হাঁস-মুরগী-টার্কির দেখাশোনা করতেন। কত যে টার্কিছানা ছিল বলার নয়! একদিন মাঠে শিলাবৃষ্টির ঘা খেয়ে সবকটা মারা গেল। মা ছুটে গেলেন মাঠে, দেখলেন, দেখেই আত্মারাম খাঁচাছাড়া!'

'তুমি বিয়ে করো নি কেন?'

'আমার বর জন্মায় নি এখনও।'

'সত্যি বলো না, কেন করো নি?'

'লোকে বলে, আমাদের দিদি ঠাকরুন, তোমাদের পিসী, আমার বিয়ে মানা করে দিয়েছিলেন। তাই আমার নাম রটেছিল 'বাবুর মেয়ে'।'

'যাঃ, কী যে বলো, তুমি আবার বাবুর মেয়ে কী!'

'একেবারে বাবুর মেয়ে!' মৃদু হেসে, বুড়ো কালচে হাতে ঠোঁট মুছে নিয়ে নাতালিয়া বলল। 'জানো তো,

আর্কাদি পেত্রোভিচ আর আমি যে এক আয়ার দুধ খেয়ে মানুষ — তোমাদের প্রায় পিসী গো।...'

সুখদল নিয়ে আমাদের বাড়িতে যা কিছু বলা হত বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো মনোযোগ দিয়ে শুনতাম: আগে যা সব মাথায় ঢোকে নি এখন তা অনেকটা সাফ, সুখদলে জীবনযাত্রার অদ্ভুত বৈচিত্র্যগুলোর চেহারা এখন স্পষ্টতর। নাতালিয়া তার অর্ধেক জীবন কাটিয়েছে বাবার সঙ্গে — প্রায় তাঁর আপনার লোকের মতো — সে যে সত্যি আমাদেরই একজন, কুলীন বংশের খ্রুশ্চভ্‌দের একজন, এটা আমরা অনুভব করব না তো আর কে করবে! আর এখন দেখা যাচ্ছে বাবুরাই ওর বাবাকে ফৌজে দিয়েছিলেন ভাগিয়ে, আর ওর মা বাবুদের এত সাংঘাতিক ডরাত যে টার্কিছানাগুলোকে মরতে দেখেই অক্কা পায়।

'অবিশ্যি, ওরকম বেপাকে পড়লে বাঁচা দায়.' নাতালিয়া বলল। 'না হলে মাকে কোনো একটা পান্ডববর্জিত ঘুপচি জায়গায় চালান করে দিতেন!'

তারপর সুখদলের বিষয়ে যা শুনলাম সেটা আরো বিচিত্র: ওখানকার বাবুদের মতো সহজ আর দয়ালু লোক 'সারা দুনিয়ায় মেলা ভার', সঙ্গে সঙ্গে এও শুনলাম অবশ্য যে ওঁদের মতো 'বদরাগী' লোকও ছিলেন না। জানা গেল পুরনো বাড়িটা ছিল অন্ধকার থমথমে, আমাদের উন্মাদ ঠাকুর্দা পিওত্‌র কিরিলীচ সেখানে নিজের জারজ সন্তান, আমাদের পিতৃবন্ধু ও নাতালিয়ার খুড়তুতো ভাই গের্ভাস্কার হাতে খুন হন; আমাদের তোনিয়া পিসী হতাশ প্রেমে পাগল হয়ে যান অনেক দিন আগে, এখন তিনি জীর্ণ জমিদার বাড়ির কাছাকাছি একটি পুরনো

কুঁড়েতে থাকেন আর অতি পুরনো একটা বেসুরো ঝনঝনে পিয়ানোয় গভীর উচ্ছ্বাসে écossaise বাজান; শুনলাম নাতালিয়া নিজেও একবার পাগল হয়ে যায়, অল্প বয়সে আমাদের বিগত খুড়োমশাই পিওত্র পেত্রোভিচের প্রেমে পড়েছিল — সেই হল তার প্রথম ও শেষ প্রেম — আর তিনি তাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেন সোশ্কি পল্লীতে।... সুখদলের বিষয়ে অধীর স্বপ্নের জাল বুনে চলার যথার্থ কারণ ছিল আমাদের। আমাদের কাছে সুখদল ছিল শুধু অতীতের রোমান্টিক স্মৃতিস্তম্ভ। কিন্তু নাতালিয়ার কাছে? সেই তো একবার যেন নিজের অন্তরের কোনো প্রশ্নের জবাব দিয়ে গভীর তিক্ততায় বলে উঠেছিল:

'হ্যাঁ! সুখদলে এমনকি খেতে বসার সময় ওঁদের কাছে থাকত তাতার চাবুক! ভাবলে এখনো গা শিউরে ওঠে।'

'মানে চাবুকের কথা বলছ?' আমরা জিজ্ঞেস করলাম।

'সব সমান,' ও বলল।

'কিন্তু চাবুক কেন?'

'যদি ঝগড়া বাধে।'

'সুখদলে সবাই ঝগড়া করত বুঝি?'

'ওরে বাবা! লড়াই নেই এমন দিন যেত না! সবাই ছিলেন ভয়ানক বদরাগী — একদম বারুদের মতো।'

নাতালিয়ার কথায় রোমাঞ্চ হত আমাদের, গভীর গদগদভাবে এ-ওর দিকে চাইতাম: আর অনেকক্ষণ আমাদের হানা দিত একটি বিরাট বাগানের ছবি, বিরাট জমিদারি, ওক কাঠের তৈরী বাড়ি, খড়ে ছাওয়া বিরাট ছাত — সময়ের ছাপে মসীবর্ণ; তারপর হলে খানাপিনা: টেবিল ঘিরে বসেছে সবাই, খেয়ে হাড়ের টুকরো ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে

শিকারী কুকুরগুলোকে, এ-ওর দিকে তাকাচ্ছে কটমট করে — আর প্রত্যেকের কোলে একটা চাবুক: স্বপ্ন দেখতাম কবে বড়ো হয়ে আমরাও কোলে চাবুক রেখে বসব খেতে। অবশ্য এটা বুঝতে বাকি ছিল না যে চাবুকগুলো থেকে কোনো আনন্দ পেত না নাতালিয়া। তবু তো লুনিওভো ছেড়ে ও চলে গেল সুখদলে, তার ভয়াবহ সব স্মৃতির পীঠস্থানে। সেখানে না ছিল মাথা গোঁজার মতো জায়গা, না আপনার বলতে কেউ। পুরনো কর্ত্রী, তোনিয়া পিসীর কাজ সে করত না এখন, কাজ করত বিগত পিওত্র পেত্রোভিচের স্ত্রী ক্লাভ্দিয়া মার্কভ্নার কাছে। কিন্তু তা হলে কী হয়, সুখদল ছেড়ে টিকে থাকতে পারে নি নাতালিয়া।

'আমি নাচার, ভাই, স্রেফ অভ্যেস,' নরম সুরে সে বলল। 'যেখানে ছুঁচ, সেখানেই সুতো। যেখানে জন্ম, সেখানেই বাসা।...'

ওরই যে শুধু গভীর টান সুখদলের প্রতি তা নয়। হায় ভগবান, সুখদলের প্রত্যেকেরই সেরকম তীব্র আসক্তি, সুখদলের স্মৃতিতে তাদের অনুরাগ সমান গভীর!

একটা কুঁড়েঘরে দুঃখেকষ্টে সময় কাটাচ্ছেন তোনিয়া পিসী। সুখদলে অবসান ঘটে তাঁর সুখের, মানসিক স্বাস্থ্যের, মানবিক মর্যাদার। কিন্তু আপনার নীড় ছেড়ে লুনিওভোতে আসার কথা ভুলেও ভাবেন না তিনি, যদিও বাবা তাঁকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করতেন।

'না, তার চেয়ে বরং পাথর ঘাটায় গিয়ে পাথর ভাঙব!' তোনিয়া পিসী বলতেন।

বাবা ছিলেন গাঝাড়া প্রকৃতির মানুষ; মনে হত

কিছুতে তাঁর কোনো টান নেই। কিন্তু সুখদলের গল্প যখন বলতেন তখন তাঁর মধ্যে আসত গভীর বিষণ্ণ একটা সুর। সুখদল ছেড়ে আমাদের ঠাকুমা ওল্‌গা কিরিলভ্‌নার লুনিওভো জমিদারিতে তাঁর আসার পর অনেক, অনেক বছর বিগত, তবু প্রায় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি আক্ষেপ করতেন:

'এই দুনিয়ায় খ্রুশ্চভ্‌দের কেবল একজনই টিকে রইল! আর সেও সুখদলে নেই!'

অবিশ্যি এমনও প্রায়ই ঘটত যে কথা বলার পরই তিনি চিন্তান্বিত হয়ে জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকতেন মাঠের দিকে, তারপর হঠাৎ ঠাট্টার হাসি হেসে গিটারটা দেয়াল থেকে টেনে নিয়ে বলে উঠতেন:

'সুখদল জায়গাটা বেড়ে ছিল বটে, গোল্লায় যাক!' মিনিট খানেক আগে যেমন আন্তরিকভাবে বলেছিলেন, বলতেন ঠিক তেমনি সুরে।

কিন্তু তাঁর অন্তর ছিল সুখদলেরই। সে অন্তরে কত না স্মৃতির গভীর প্রভাব, স্তেপের আর সেখানকার গয়ংগচ্ছ জীবনযাত্রার প্রভাব, সেই প্রাচীন গোষ্ঠীভাব, যাতে করে গ্রাম, চাকরদের মহাল আর জমিদার বাড়ি সব মিলে অভিন্ন হয়ে যেত। আমরা খ্রুশ্চভ্‌রা অবশ্য প্রাচীন কুলীন বংশের লোক। আমাদের নাম আছে অভিজাতদের ষষ্ঠ কুলপঞ্জীতে*), আমাদের অনেক সুখ্যাত পূর্বপুরুষ ছিলেন হয় লিথুয়ানীয়, নয় তাতার রাজকুমারদের ঔরসজাত। কিন্তু আবহমান কাল থেকে খ্রুশ্চভ্‌দের রক্তে মিশেছে চাকরবাকর আর গ্রামবাসীদের রক্ত। পিওত্‌র কিরিলীচের জন্মদাতা কে? এ বিষয়ে নানা কাহিনী আছে। তাঁকে যে

খুন করেছিল সেই গের্ভাস্কার বাবা কে? ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি তিনি হলেন পিওত্র কিরিলীচ। বাবা আর খুড়োর স্বভাবে এত অদ্ভুত গরমিলের কারণ কী? তারও নানা ব্যাখ্যা আছে। তারপর আবার নাতালিয়া আর বাবা একই বুকের দুধ খেয়ে বড়ো হয়েছেন, এদিকে বাবা গের্ভাস্কার সঙ্গে ক্রুশ-বিনিময় করেন।... চাকরবাকর আর গ্রামবাসীদের সঙ্গে আত্মীয়তার খেই বের করার সময় হয়েছে বৈকি খ্রুশ্চভ্দের!

সুখদল ও তার ইতিহাসের প্রতি মোহ, সুখদলের প্রতি ব্যাকুলতা অনেক দিন পর্যন্ত ছিল আমার ও আমার বোনের মধ্যে। চাকরবাকরেরা, গ্রাম আর জমিদার বাড়ি — এই নিয়ে সেখানে ছিল একটি একান্নবর্তী সংসার। সে সংসার চালিয়ে গেছেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা, সেটা অনেক দিন টিকে আছে বংশধরদের মনে। একটি পরিবারের, গোষ্ঠীর, কুলের ইতিহাস গভীর ও জটিল, রহস্যময় এবং প্রায়ই ভয়ঙ্কর হয়। কিন্তু তার শক্তির উৎসই হল এই সব অতল রহস্য, উপকথা আর ইতিহাস। পুঁথিপত্র বা অন্যান্য স্মৃতিচিহ্নের কথা যদি বলেন, তাহলে বাশ্‌কির স্তেপের একটা যাযাবর গ্রামের চেয়ে সুখদল এমন কিছু সমৃদ্ধ নয়। রাশিয়াতে পুঁথিপত্র ইত্যাদির জায়গা নেয় উপকথা। অথচ স্লাভমানসের কাছে উপকথা আর গান — বিষের মতো! আমাদের পূর্বতন চাকরবাকরেরা ছিল বেপরোয়া আলসে লোক আর স্বপ্নবিলাসী — আমাদের বাড়ির মতো জায়গা আর কোথায় তারা পাবে যেখানে মন উজাড় করে দেওয়া যায়? সুখদলের কর্তাদের একমাত্র বংশধর হয়ে দাঁড়ান বাবা। আমরা প্রথম কথা

বলতে শিখি সুখদলের ভাষায়। প্রথম যে গল্প, প্রথম যে গান আমাদের মনে নাড়া দেয় তাও সুখদলের, নাতালিয়ার, বাবার। বাবা গাইতে শেখেন চাকরদের কাছে। 'অনুরাগিণী ছলনাময়ীকে' নিয়ে গান তাঁর মতো বন্ধনহীন বিষণ্ণতায়, কোমল অনুযোগ আর অসহায় আন্তরিকতার সুরে আর কে গাইতে পারত? নাতালিয়ার মতো গল্প বলতে পারত কেউ? সুখদলের চাষীদের মতো আমাদের এত আপনার জন আর কে বা হতে পারে?

অনেকদিন ধরে একসঙ্গে থাকলে বহুলোকের পরিবারে যেমন হয়, খ্রুশ্চভ্‌রাও তেমনি — ঝগড়াঝাঁটি আর বাক্‌বিতণ্ডার জন্য স্মরণীয় কাল থেকে বিখ্যাত। আমাদের শৈশবে সুখদল ও লুনিওভোর মধ্যে এমন একটা ঝগড়া বাধে, যার ফলে বাবা দশ বছর নিজের বাড়ির চৌকাঠ ডিঙান নি। তাই ছেলেবেলায় সুখদলের সঙ্গে ভালো করে পরিচয় হয় নি আমাদের: একবার শুধু গিয়েছিলাম সেখানে, তা-ও জাদন্‌স্ক*) যাবার পথে। কিন্তু কখনো কখনো সত্যের চেয়ে স্বপ্ন বেশী জোরালো। আর গ্রীষ্মের সেই দীর্ঘ দিনটা আমাদের মনে অস্পষ্ট অথচ অক্ষয় একটা স্মৃতি রেখে গিয়েছে। কী একটা ঢেউখেলা মাঠ, চওড়া নিঝুম একটা রাস্তা! আমরা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম তার বহরে আর এখানে-ওখানে টিকে থাকা কোটরাকীর্ণ উইলো গাছে। রাস্তা থেকে বেশ দূরে, শস্যক্ষেতের মধ্যে উইলো গাছে একটা মৌচাকের কথা মনে আছে — নিঝুম রাস্তার ধার ঘেঁষা ক্ষেতে ভাগ্যের হাতে সমর্পিত একটি মৌচাক; তাছাড়া মনে আছে দীর্ঘ ঢালুতে একটা লম্বা বাঁক, প্রকাণ্ড রিক্ত মাঠ, চারিধারে চিমনীবিহীন ছন্নছাড়া

কুঁড়েঘর, পেছনে হলদে পাহাড়ে খাত, খাতের নীচে সাদা নুড়ি আর ভাঙা পাথর।... যে ঘটনায় আমরা সাংঘাতিক ভয় পাই প্রথম, সেটাও ঘটে সুখদলে: যখন ঠাকুর্দা খুন হন গের্ভাস্কার হাতে। খুনের গল্প শুনতে শুনতে হলদে খাতগুলো নিয়ে কল্পনার জাল বোনার শেষ হত না আমাদের: কেবলি মনে হত ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের পর গের্ভাস্কা উধাও হয় ওই পথে, 'সমুদ্রের গভীরে টুপ করে পড়া পাথরের মতো'।

সুখদল থেকে চাষীরা লুনিওভোতে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসত চাকরবাকরের চেয়ে একেবারে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে। বেশীর সময় চাষীরা আসত এক টুকরো জমির তাগিদে। কিন্তু তারাও আমাদের বাড়িতে ঢুকত আত্মীয়ের মতো। সসম্মানে বাবাকে সেলাম জানিয়ে প্রথমে হাতে চুমু খেত, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে ঠোঁটে তিনবার, তারপর নাতালিয়া আর আমাদের দু'জনকে চুমু খাবার পালা। সঙ্গে ভেট আনত মধু, ডিম আর বাড়িতে বোনা তোয়ালে। আর খোলামেলা জায়গায় মানুষ হয়েছি বলে আমরা যেমন গান আর উপকথা ঠিক তেমনি সুবাস আর গন্ধের বিষয়েও সজাগ ছিলাম। সুখদলের মানুষদের চুমো খাবার সময় শণের কথা মনে করিয়ে দেওয়া তাদের গায়ের সেই অদ্ভুত, প্রীতিকর গন্ধ কখনো ভুলে যাই নি; আর ভুলে যাই নি তাদের ভেটের গন্ধ: স্তেপের প্রাচীন গ্রামের মুকুলিত বাকহুইট আর পচা ওক বনের মৌচাকের গন্ধ — মধুতে, তোয়ালেগুলোতে — বিচালির চালাঘর আর ঠাকুর্দার আমলের ধোঁয়াটে কুটিরের গন্ধ।... সুখদলের চাষীরা কোনো গপ্পটপ্প বলত না। ওরা বলবে কী! পুরুষানুক্রমে বলার

মতো কিংবদন্তীও ছিল না ওদের। ওদের কবরে নামের বালাই নেই। আর জীবন ওদের সবারই ভারি এক রকম, ভারি অস্বচ্ছল, কোনো চিহ্ন রেখে যেত না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পেত রুটি, রোজকার সেই মামুলি রুটি। অনেকদিন আগে শুকিয়ে যাওয়া কামেন্‌কা নদীর পাথুরে গর্ভ খুঁড়ে ওরা অবশ্য পুকুর কাটার চেষ্টা করে। কিন্তু পুকুরে তো আর মুশকিল আসান হয় না — পুকুর শুকিয়ে যায়। ঘর বানাল ওরা। কিন্তু সে ঘরের আয়ু কত দিন! সামান্য স্ফুলিঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।... তবু আমাদের সকলের এত টান কেন এই রিক্ত চারণভূমির প্রতি, এই সব কুঁড়েঘর খাত আর উৎসন্নে যাওয়া সুখদল জমিদারির প্রতি?

২

সেই জমিদারি, যেটা গড়ে নাতালিয়ার মানসকে, সারা জীবন চালায় তাকে, যে জমিদারির বিষয়ে কত না শুনেছি, সেই সুখদলে থাকার সুযোগ এল কৈশোরের শেষে।

স্পষ্ট মনে আছে, যেন কালকের ব্যাপার। দিনের শেষে গাড়ি করে যখন সুখদলে পেঁছিলাম তখন বৃষ্টি নেমেছে মুষলধারায়, বাজের শব্দে কানে তালা লেগে যায়, ক্ষিপ্র জ্বলন্ত সাপের মতো চোখ ধাঁধিয়ে দেয় বিদ্যুতের ঝিলিক। আকাশের অর্ধেকটা জুড়ে একটি ঘন বেগুনি রঙের বজ্রগর্ভমেঘ মন্থর ভারি চালে চলেছে উত্তরপশ্চিমে। তার বিরাট পটভূমিকায় শস্যের সবুজ গালিচাটা দেখাচ্ছে বিরস, স্পষ্ট আর মৃত্যুর মতো বিবর্ণ। বড়ো রাস্তার ছোট ভিজে

ঘাস চকচকে, অসাধারণ সরস। ভিজে ঘোড়াগুলো যেন হঠাৎ রোগা হয়ে গিয়ে নীলচে কাদা ঠেলে চলেছে নালের ঝিলিক তুলে, চাকার খস্‌খস্‌ আওয়াজটা কেমন যেন ভিজেভিজে।... সুখদলের দিকে মোড় নিতে হঠাৎ চোখে পড়ল এক দীর্ঘ বিচিত্র মূর্তি — পুরুষ না স্ত্রীলোক বোঝা ভার, গায়ে ড্রেসিং-গাউন, মাথায় আবরণ, উ'চু রাইশস্যের ভিজে ক্ষেতে দাঁড়িয়ে গাছের ডাল দিয়ে পিটোচ্ছে শিং-ভাঙা ছোপ রঙের গোরুকে। আমরা কাছে গিয়ে পড়াতে দেখলাম একটি বুড়ী। আরো জোরে সে ডাল চালাতে গোরুটা লেজ নাড়িয়ে হড়বড় করে এসে পড়ল রাস্তায়। কী একটা যেন চে'চাতে চে'চাতে বুড়ী গাড়ির কাছে এল, গলা বাড়িয়ে ফ্যাকাসে মুখে তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে। ওর কালো, উদ্‌ভ্রান্ত চোখে আতঙ্কে চোখ রেখে, ঠান্ডা ছুঁচলো নাকের ছোঁয়াচ আর কুঁড়েঘরের কড়া গন্ধ পেয়ে চুমো খাওয়ার পালা শেষ করা গেল। এ কি ডাইনী বুড়ী? কিন্তু এর মাথায় ময়লা কাপড়ের উ'চু আবরণ, নগ্ন শরীরের ওপর চাপানো ছে'ড়াখোঁড়া ড্রেসিং-গাউন কোমর পর্যন্ত ভিজে, দেখা যাচ্ছে শুষ্ক দুটি স্তন। এমনভাবে চে'চাচ্ছে যেন আমরা কালা, কিংবা যেন ওর ইচ্ছে একটা জোর ঝগড়া বাধানো। চীৎকার শুনে বুঝলাম: ইনিই হলেন তোনিয়া পিসী।

ক্লাভ্‌দিয়া মার্ক'ভ্‌নাও চে'চালেন বেশ জোরে, কিন্তু তাঁর চে'চানিটা ফুর্তি'র, স্কুলের মেয়ের মতো। ছোটখাটো, মোটাসোটা মহিলাটি, সাদাটে একটু দাড়ির ছাপ মুখে, চোখদুটো অসাধারণ সজীব। দুটো বড়ো দেউড়িওয়ালা বাড়িতে খোলা জানলায় বসে মোজা বুনছিলেন তিনি,

চশমা কপালে তুলে তাকিয়ে দেখছিলেন চারণভূমিটা, যেটা এখন মিশে গেছে উঠানের সঙ্গে। ডান দিকের দেউড়িতে দাঁড়িয়ে নাতালিয়া রোদে পোড়া, মমতায় ভরা মুখে নম্র হাসি এনে, মাথা নীচু করে আমাদের অভ্যর্থনা করল — পায়ে বাকলের জুতো, পরনে লাল পশমের স্কার্ট আর কালচে, কুঞ্চিত কণ্ঠ ঘিরে চওড়া করে কাটা ছাই-রঙা ব্লাউজ। মনে আছে ওর গলা, বেরিয়ে-আসা কণ্ঠার হাড়, শ্রান্ত বিষণ্ণ চোখ দেখে ভেবেছিলাম: এই নাতালিয়া অনেক, অনেক দিন আগে মানুষ হয়েছিল বাবার সঙ্গে একসাথে; আর ঠিক এ জায়গাটায় দাঁড়িয়ে থাকা এই কুৎসিত বাড়িটা হল ঠাকুর্দার ওক কাঠের তৈরী বাসস্থানের ভগ্নাংশ পুরনো সেই বাড়িটা — কত বার না পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পুরনো বাগানের মধ্যে আছে শুধু কয়েকটা ঝোপঝাড়, বার্চ আর পপলার গাছ। খানা-বাড়ি আর চাকরদের মহাল বলতে পড়ে আছে শুধু একটি কুটির, গোলা একটা, একটা মাটির গুদামঘর আর একটি বরফ-ঘর, সোমরাজ আর বেতোশাকে আচ্ছন্ন।... নাকে এল সামোভার ধরাবার গন্ধ, দুই পক্ষে জিজ্ঞাসাবাদ চলেছে: প্রাচীন আলমারিটা থেকে বেরিয়ে এল জামের স্ফটিকপাত্র আর মেপলের পাতার মতো ক্ষয়ে যাওয়া সোনার চামচ, অপ্রত্যাশিত অতিথিদের জন্য রাখা কিছু চিনির মণ্ডা। বহু দিনের ঝগড়ার পর ইচ্ছে করে হৃদ্য কথাবার্তা জমে উঠেছে। এদিকে আমরা থমথমে ঘরগুলোয় ঘুরছি, খুঁজছি বারান্দা, বাগানে যাবার কোনো দরজা।

নীচু ফাঁকা ঘরগুলোর সব কিছু কালের প্রকোপে কালো, সব কিছু সাদাসিধে আর মোটা, তাদের বিন্যাস ঠিক

ঠাকুর্দার আমলের মতো। বাস্তবিক, যেসব ঘরে তিনি থাকতেন তাদেরই পড়ে থাকা অংশগুলো কোনক্রমে জোড়াতালি দিয়ে এগুলো বানানো। চাকরদের ঘরের এক কোণে ঝোলানো স্মলেন্স্কের সেণ্ট মার্কিউরির একটি প্রকাণ্ড, কালচে আইকন — সেই তিনি যাঁর লোহার পাদুকা আর শিরস্ত্রাণ রক্ষিত আছে স্মলেন্স্কের প্রাচীন গির্জায়। শুনেছিলাম: সেণ্ট মার্কিউরি ছিলেন প্রখ্যাত ব্যক্তি, নিজের আইকন থেকে অপাপবিদ্ধ কুমারী মেরি তাঁকে ডাকেন, তাতারদের হাত থেকে স্মলেন্স্ক অঞ্চলকে উদ্ধারের আহ্বান জানান। তাতারদের হারিয়ে দিয়ে সেণ্টটি ঘুমিয়ে পড়েন, তখন শত্রুরা তাঁর শিরচ্ছেদ করে। আর তিনি করলেন কী, নিজের মুণ্ডু হাতে নিয়ে শহরের ফটকে এসে লোকজনকে জানিয়ে দিলেন ব্যাপারটা।... এক হাতে শিরস্ত্রাণ ঢাকা মৃত্যুনীল মাথা, অন্য হাতে অপাপবিদ্ধ কুমারী মেরির আইকন — প্রাচীন সুজ্দালে*) আঁকা এই মুণ্ডুহীন মূর্তিটি দেখে গা ছমছম করে উঠল আমাদের। শুনেছিলাম ঠাকুর্দার বড়ো আদরের এই ছবিটি বার কয়েক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে চিড় খেয়ে যায়। ভারি রুপোর পাতে ছবিটি বসানো, পেছন দিকে স্লাভোনিকে খ্রুশ্চভ্দের কুলপঞ্জিকা লেখা।*) আইকনটির সঙ্গে খাপ খাইয়ে যেন ভারি দরজাগুলোর ওপর আর নীচে ভারি লোহার হুড়কো। মেঝের তক্তা অসম্ভব চওড়া, কালো আর পেছল, জানলার শার্সিগুলো ছোট, ওপরে তোলা যায়। হল-ঘরটা আয়তনে এখন মূল ঘরের অর্ধেক হলেও এখানেই একদা শিকারের বেত নিয়ে খেতে বসতেন খ্রুশ্চভ্রা। এ ঘর হয়ে গেলাম ড্রয়িং-রুমে। সেখানে বারান্দার দরজার অন্য

দিকে এককালে ছিল সেই পিয়ানোটা, যেটা পিওত্‌র পেত্রোভিচের অফিসার বন্ধু ভৈৎকোভিচের প্রেমে পাগলিনী তোনিয়া পিসী বাজাতেন। যেতে যেতে দেখলাম বসার ঘরের খোলা দরজা আর কোণের সেই কামরাটা যেখানে থাকতেন ঠাকুর্দা।...

বিরস সন্ধ্যা। কেটে ফেলা ফলের বাগান, ভেঙে পড়া খামার আর রুপোলী পপলার গাছের ওপারে মাঝে মাঝে চমকানো বজ্রগর্ভ মেঘের বৈশাখী বিদ্যুতে নিমেষের জন্য জেগে উঠছে আলোর গোলাপী-সোনালী পাহাড়। বাগানের পেছনে খাতের ওধারে পাহাড়ে অন্ধকার হয়ে আসা ব্রশিন বনে বৃষ্টি হয় নি বোধ হয়। সেখান থেকে আসছে ওক গাছের শুকনো উষ্ণ গন্ধ, বারান্দার কাছাকাছি বাকি বার্চ গাছগুলো, উ'চু বিছুটি, চোর কাঁটা আর ঝোপঝাড়ের ওপর দিয়ে আসা আর্দ্র মধুর হাওয়ায় সে গন্ধ মিশে যাচ্ছে উদ্ভিদের গন্ধের সঙ্গে। আর সন্ধ্যা, স্তেপ, গহন রাশিয়ার বিপুল স্তব্ধতা চারিধারে।...

'চা দেওয়া হয়েছে,' মৃদু গলায় কে যেন ডেকে বলল।

বলল নাতালিয়া, এই জীবনের সমস্তটায় যে যোগ দিয়েছে, যে হল এর সাক্ষী, এর প্রধান কথক। তার পেছনে দেখা গেল কর্ত্রীকে, ক্ষ্যাপা চোখে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটু ঝু'কে কেতাদুরস্তভাবে কালচে মসৃণ মেঝের ওপর দিয়ে সাবলীলভাবে এলেন তিনি। মাথার আবরণটা তখনো খোলা হয় নি, তবে ড্রেসিং-গাউনের বদলে গায়ে চাপিয়েছেন একটা সেকেলে ধরনের পোশাক, কাঁধে রঙ-চটা সোনালি সিল্কের শাল।

'Où êtes-vous, mes enfants ?*' কৃত্রিম হাসি হেসে হাঁকলেন তিনি। কাকাতুয়ার মতো পরিষ্কার তীক্ষ্ন সে গলা অদ্ভুত প্রতিধ্বনি তুলল ফাঁকা অন্ধকার ঘরগুলোয়।...

৩

হতৈশ্বর্য জমিদারিটির একটি মোহ ছিল, ঠিক যেমন ছিল সুখদলের মানুষ নাতালিয়ায়, তার চাষীসুলভ সরলতায়, তার অপরূপ আর করুণ অন্তরে।

মেঝের তক্তা বেঁকে যাওয়া পুরনো ড্রয়িং-রুমে জুঁইফুলের গন্ধ। সিঁড়ি নেই বলে পুরনো নড়বড়ে ধূসর নীল বারান্দা থেকে নামতে হয় লাফিয়ে। বারান্দাটা ভরে গেছে বিছুটি, এলডর আর বুনো লতার ঝাড়ে। গরমের দিনে কাঠফাটা রোদ যখন পড়ত বারান্দায় হাট করে খুলে দেওয়া হত কাঁচের বসে যাওয়া দরজাগুলো, চিকচিকে ঝকঝকে কাঁচের চৌখুপীর ছায়া পড়ত সামনের দেয়ালের লম্বাটে আয়নায়, তখন আমাদের মনে পড়ে যেত তোনিয়া পিসীর পিয়ানোটার কথা, এককালে যেটার স্থান ছিল আয়নার নীচে। এককালে তো শিরোনামায় কারুকাজ করা হলদেটে সুরলিপির দিকে তাকিয়ে পিয়ানো বাজাতেন পিসী, আর তিনি দাঁড়িয়ে থাকতেন তাঁর পেছনে, বাঁ হাত কোমরে রেখে, দৃঢ় চিবুকে, ভুরু কুঁচকে। সুন্দর প্রজাপতি সব উড়ে উড়ে আসত ঘরে — কারো গায়ে ঝকঝকে সুতীর ফ্রক, কেউ বা পরেছে জাপানী কিমোনো, কেউ বা

* বাছারা, কোথায় তোমরা? (ফরাসী)

কালোবেগুনী মখমলের শাল। আর ঠিক চলে যাবার আগে হঠাৎ চটে উঠে তিনি একটাকে মেরে বসেন, ফুর ফুর করে সেটা সবে বসেছিল পিয়ানোর ঢাকনায়। রুপোলী গুঁড়ো শুধু পড়ে রইল সেখানে। কিন্তু কিছুদিন পরে বোকার মতো ঝিরা গুঁড়োগুলো ঝেড়ে ফেলতে হঠাৎ তোনিয়া পিসীর হিস্টিরিয়া হয়।... ড্রয়িং-রুমের দরজা হয়ে বারান্দায় এসে উষ্ণ তক্তায় বসে ভাবতাম আর ভাবতাম। বাগানে ছোটাছুটি করা হাওয়ায় বার্চ গাছের মখমল-মসৃণ খস্‌খসানি, গাছগুলোর গুঁড়ি কালো কাজ করা সাদা সাটিনের মতো, ডালপালা সবুজ আর ছড়ানো, মাঠ থেকে শোঁ শোঁ ছুটছে হাওয়া — সাদা ফুলের ওপর দিয়ে তীরের মতন বেগে সবুজ সোনালি একটি কলকণ্ঠ পাখি ফুর্তিভরা তীক্ষ্ম ডাকে ধাওয়া করেছে বাচাল কাকগুলোকে, অসংখ্য আত্মীয়কুটুম নিয়ে তাদের আস্তানা ভেঙে পড়া চিমনী আর অন্ধকার চিলেকোঠায়, যেখানে পুরনো ইঁটের গন্ধ, স্তূপীকৃত ধূসর, কালচে লাল ছাইতে সোনালি ছিটে লাগছে ঘুলঘুলি থেকে আসা আলোতে। হাওয়া পড়ে গেল, বারান্দার ধারে ফুলগুলোর ওপর দিয়ে চলতে চলতে ঘুম জড়ানো মৌমাছিরা তাদের কাজ করে চলেছে আলস্যভরে, — স্তব্ধতায় শুধু কানে আসে রুপোলি পপলার পাতার গুঞ্জন চলেছে টুপটাপ একটানা শব্দে, ঝিরঝিরে অবিরাম বৃষ্টির ধ্বনি যেন।... বাগানে ঘুরতে ঘুরতে চলে যেতাম একেবারে প্রান্তে, যেখানে আরম্ভ হয়েছে শস্যক্ষেত। সেখানে প্রপিতামহের ভাঙাছাদ গোসলখানা। এককালে পিওত্‌র পেত্রোভিচের আয়না চুরি করে এখানে লুকিয়ে রেখেছিল নাতালিয়া, এখন সেখানে সাদা খরগোসের

আস্তানা। হালকা পায়ে লাফিয়ে চৌকাঠে উঠে গোঁফ আর চেরা ঠোঁট কাঁপিয়ে তারা ড্যাবে চোখে বিটকেল টেরা চাউনি হেনে তাকিয়ে থাকত উ'চু কাঁটা গাছ আর ব্ল্যাকথর্ন ও চেরি গাছ ছেয়ে ফেলা বিছুটির দিকে! আধো-খোলা মাড়াইঘরে একটা বাদামি পে'চার বাসা। বেড়াজালের উপর যতটা সম্ভব একটা অন্ধকার জায়গা বেছে নিয়ে কান উ'চিয়ে বসে থাকত পে'চাটা, দৃষ্টিহীন হলদে চোখজোড়া বিস্ফারিত — দেখাত বুনো, শয়তানের মতো। বাগান ছাড়িয়ে বহুদূরে শস্যক্ষেতের সমুদ্রে ডুবে যেত সূর্য, মদির প্রশান্ত সন্ধ্যা; এশিন বনে একটা কোকিলের ডাক, বহুদূরে ঘাসের মাঠে বুড়ো রাখাল স্তিওপার বাঁশীর সকরুণ সুর।... পে'চাটা বসে থাকত রাত্রির অপেক্ষায়। রাত্রে সবাই নিদ্রামগ্ন — মাঠঘাট, গ্রাম আর জমিদার বাড়ি। কিন্তু পে'চাটা ফু'পিয়ে ডেকে চলত। গোলাঘর নিঃশব্দে ঘুরে বাগান হয়ে যেত তোনিয়া পিসীর কুটিরে, আস্তে ছাদে বসেই অসুস্থ চিৎকার ছাড়ত একটা।... চুল্লির পাশের বেঞ্চে ঘুমন্ত তোনিয়া পিসী জেগে উঠতেন চমকে।

'প্রভু রক্ষা করুন আমায়,' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ফিসফিসিয়ে বলতেন তিনি।

অন্ধকার গরম কুটিরটা, ছাদের কাছে মাছির নিদ্রালস বিরক্ত ভনভনানি। রোজ রাত্রে কিছু না কিছু একটা তাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়। হয়ত কুটিরের দেয়ালে গোরুটা গা ঘষল; নয়ত একটা ই'দুর পিয়ানোর চাবির ওপর দিয়ে তড়তড় করে যাওয়াতে প্রখর টুংটাং শব্দ, তারপর কোণে তোনিয়া পিসীর সযত্নে রাখা ভাঙা কাঁচের বাসনের গাদায় পা ফসকে পড়ে গেল ই'দুরটা, ঝনঝনাৎ করে উঠল; কিংবা

হয়ত সবুজচোখো কালো বেড়ালটা কোথা থেকে যেন নিশুতি রাতে বাড়ি ফিরে ভেতরে ঢোকার জন্য অলসভাবে মিউ মিউ শব্দ করে দিল; নয়ত পেঁচাটা আবার ছাতে বসে চিৎকার করে ভবিষ্যদ্বাণী করতে লাগল আসন্ন বিপদের। আর ঘুমের ভাব কাটিয়ে, অন্ধকারে মুখে-চোখে ভিড় করা মাছি তাড়িয়ে তোনিয়া পিসী বেঞ্চে হাতড়ে হাতড়ে দড়াম করে দরজা খুললেন — দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তারাভরা আকাশের দিকে এলোপাতাড়ি ছুঁড়ে মারলেন তাঁর বেলনাটা। পাখা দিয়ে খড় খসখসিয়ে পেঁচাটা ঝটকে উড়েই ডুব দিল গভীর অন্ধকারে। প্রায় মাটিতে গা লাগিয়ে স্বচ্ছন্দে গোলাবাড়ির দিকে উড়ে গিয়ে ওপরে উঠল, বসল ছাতের কোণে। আবার বাড়ির দিকে হাওয়ায় ভেসে আসছে তার কান্নার সুর। কী একটা যেন মনে করার চেষ্টায় বসে, তারপর হঠাৎ একটা বিস্ময়ের আর্তনাদ এবং স্তব্ধতা। আবার হঠাৎ ভূতে পাবার মতো ডাক হল শুরু, খ্যাঁকখেঁকে হাসি আর চিৎকার। ক্ষণিকের জন্য থেমে আবার গোঙানি, নাকী সুরে কান্না আর ফোঁপানি।... কিন্তু ছোটছোট বেগুনি মেঘের উষ্ণ অন্ধকার রাত্রিগুলো শান্ত, প্রশান্ত। ঘুমন্ত পপ্‌লারের ঘুম জড়ানো একঘেয়ে মর্মর। ত্রশিন বনের ওপর নিদাঘ বিদ্যুতের সাবধানী চমক, হাওয়ায় ওক গাছের শুকনো গরম গন্ধ। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে, বনের কাছে জই ক্ষেতের সমভূমির ওপরে রুপোলি ত্রিভুজে বৃশ্চিক নক্ষত্রমণ্ডলীর দ্যুতি, যেন সমাধি পাথরের ওপর ক্রুশের ছোট ছাদ।...

বাড়ি ফিরতে দেরী হয়ে যেত। বুক ভরে শিশির, তাজা মাঠঘাট, বুনো ফুল আর ঘাসের গন্ধ নেওয়া হয়ে

গেলে আস্তে আস্তে প্রবেশপথের সিঁড়ি বেয়ে যেতাম অন্ধকার হল-ঘরে। প্রায়ই দেখতাম সেণ্ট মার্কিউরির প্রতিকৃতির নীচে প্রার্থনারত নাতালিয়াকে। আইকনের সামনে ক্ষীণ দেহে, খোলা পায়ে, করজোড়ে দাঁড়িয়ে ফিসফিসে গলায় কী বলে ক্রুশচিহ্ন করে হেঁট হয়ে প্রণাম করত অন্ধকারে অদৃশ্য দেবতাকে — আর সবই কী সহজে, যেন বাড়ির কারো সঙ্গে, ওরই মতো সহজ সাধারণ, ভালোমানুষের সঙ্গে মমতাময় কারো সঙ্গে কথা বলছে।

'নাতালিয়া?' আস্তে আমরা ডাকতাম।

'আজ্ঞে?' প্রার্থনা থামিয়ে মৃদু সহজ কণ্ঠে সাড়া দিত ও।

'এখনো শুতে যাও নি যে?'

'মনে হচ্ছে প্রাণভরে ঘুমোব কবরে।...'

তারপর আমরা বেঞ্চিতে বসে খুলে দিতাম জানলাটা। বুকে হাত মুড়ে দাঁড়িয়ে থাকত নাতালিয়া। নিদাঘ বিদ্যুতের রহস্যঘন ঝিলিকে আলোকিত হয়ে উঠত অন্ধকার ঘরগুলো, শিশিরসিক্ত স্তেপে অনেক দূরে ডাকত একটা ভারুই পাখি, জেগে উঠে উৎকণ্ঠায় পুকুরে প্যাঁক-প্যাঁক করে উঠত একটা হাঁস।...

'বেড়াতে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'তা বেশ, কাঁচ বয়সের ব্যাপার।... আমরাও সারা রাত্তির বাইরে কাটাতাম।... সূর্য ডুবে গেলে বাইরে বেরিয়ে পড়া, সূর্য উঠলে ফিরে আসা।...'

'তখনকার কালে জীবন কাটত ভালো?'

'তা কাটত বৈ কি।'

এর পর অনেকক্ষণ কোনো কথা নেই।

'পেঁচাটা ওরকম করে চেঁচায় কেন, বল না ধাই-মা?' জিজ্ঞেস করত আমার বোন।

'ওর ডাকটা অলক্ষুণে, চুলোয় যাক ও। গুলি ছুঁড়ে ওকে তাড়িয়ে দিলে বোধ হয় ভালো হয়। ডাকলে গাটা ছমছম করে ওঠে, মনে হয়: একটা কিছু সর্বনাশ ঘটবে। ওর ডাকে দিদিমণিও ভয় পান। সবকিছুতে ভীষণ ভয় পান উনি!'

'ওঁর অসুখ হল কেন?'

'যেমনভাবে হয়: খালি কান্না আর শোক।... তারপর ধর্মে মন দিলেন।... ঝিদের সঙ্গে ব্যবহার ক্রমশ খারাপ হয়ে গেল, ভাইদের ওপর রাগ দিনে দিনে বেড়ে গেল।...'

চাবুকের কথাটা মনে পড়ে যাওয়াতে আমরা জিজ্ঞেস করলাম:

'তার মানে ওঁদের মধ্যে বনিবনা ছিল না?'

'বনিবনা! ওরে বাবা! বিশেষ করে দিদিমণির অসুখ, ঠাকুর্দার মৃত্যু, দাদাবাবুদের বয়স বাড়ার আর বিগত পিওত্র পেত্রোভিচের বিয়ে হবার পর যা কাণ্ডটা হত! ওঁরা ছিলেন সাক্ষাৎ অগ্নিশর্মা — বারুদের মতো একদম!'

'চাকরবাকরদের প্রায়ই চাবকাতেন?'

'না, সেরকমটা কখনো হয় নি এখানে, কখনো নয়। আমার কথাই ধর না কেন। আমি যা করেছিলাম! শাস্তি কী হল? পিওত্র পেত্রোভিচের হুকুমে মাথা মুড়িয়ে দেওয়া হল ভেড়ার লোম কাটার কাঁচিতে, একটা শতচ্ছিন্ন জামা গায়ে ভাগিয়ে দেওয়া হল ছোট খামার বাড়িতে।'

'কিন্তু কী করেছিলে তুমি?'

সরাসরি জবাব তক্ষুনি পেতাম না সবসময়। মাঝে মাঝে নাতালিয়া কিছু না ঢেকে তার সব কথা বলত আশ্চর্য খোলাখুলিভাবে; কিন্তু মাঝে মাঝে আবার তোতলিয়ে থেমে পড়ে কী একটা ভেবে মৃদু নিশ্বাস ফেলত। প্রদোষের অন্ধকারে ওর মুখ দেখা যেত না, কিন্তু গলা শুনে টের পেতাম ও হাসছে বিষণ্ণ হাসি:

'কী আর করব, যা করেছিলাম তাই।... আগেই তো বলেছি।... বয়স ছিল কম, বুদ্ধি ছিল না ঘটে।... 'গাইল কোকিল সারা বাগান, পাপের, সর্বনাশের গান'... আর জানোই তো, কুমারী মেয়ের ব্যাপার।...'

বেশ মিষ্টি সুরে আমার বোন ওকে অনুনয় করল:

'কবিতাটার বাকিটুকু আমাদের শোনাও ধাই-মা।'

বিব্রত হত নাতালিয়া।

'এটা কবিতা নয়, গান... সবটা মনে নেই এখন।'

'বাজে কথা। মনে আছে নিশ্চয়।'

'বেশ, তাই যদি চাও তবে।...'

আর তাড়াতাড়ি গানটা আওড়াত সে:

''কেন যে কোকিল'... না, 'গাইল কোকিল সারা বাগান, পাপের, সর্বনাশের গান — সে গানে কেবল পোড়ায় মন... সারা রাত ঘুম না জানে নয়ন!'...'

জোর করে লজ্জা কাটিয়ে আমার বোন শুধাত:

'জ্যাঠামশাইকে তুমি খুব ভালোবাসতে?'

আর নাতালিয়া ফিসফিস করে সংক্ষেপে বলত:

'হ্যাঁ, খুব।'

'প্রার্থনা করার সময় সর্বদা তাঁকে মনে পড়ে?'

'সর্বদা।'

'লোকে বলে সোশ্‌কিতে নিয়ে যাবার সময় তুমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে?'

'তা হয়েছিলাম। আমরা, ঝিরা, তখন ছিলাম ভারি নরম — শাস্তিতে অল্পেই ভেঙে পড়তাম... চোয়াড়ের সঙ্গে কি আমাদের তুলনা করা যায়! ইয়েভ্‌সেই বদ্‌লিয়া আমাকে নিয়ে রওনা হল। ভয়ে দুঃখে একেবারে অসাড় হয়ে গিয়েছিলাম।... সেই প্রথম শহরে গিয়ে অনভ্যাসে দম বন্ধ হবার জোগাড়। তারপর স্তেপেতে গিয়ে পড়লাম, ভয়ানক দুর্বল আর বিষণ্ণ লাগল! হঠাৎ একজন অফিসারকে দেখলাম ঘোড়া হাঁকিয়ে আসছেন আমাদের দিকে, দেখতে কর্তার মতো, — চেঁচিয়ে উঠে তক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। জ্ঞান ফিরে আসতে দেখলাম গাড়িতে শুয়ে আছি, ভাবলাম: আমার কত না সুখ এখন, যেন সশরীরে স্বর্গলাভ!'

'খুব কড়া লোক ছিলেন উনি?'

'ওরে বাবা, তা আর বলতে!'

'কিন্তু পিসী ছিলেন সবচেয়ে খামখেয়ালি, তাই না?'

'তা ছিলেন বৈকি। তোমাদের বলি: এমনকি সাধুর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওনাকে। সত্যি, আমাদের কত না ভোগান্তি হয় ওনার জন্যে! এমন দিনে ওনার সুখে শান্তিতে ঘর করার কথা। কিন্তু খুব গরব ছিল ওনার, মাথা বিগড়ে গেল।... আর ভৈৎকেভিচ সত্যি দিদিমণিকে কত না ভালোবাসতেন! কিন্তু দ্যাখো কাণ্ড!'

'আর দাদু?'

'তিনি আর কি! পাগল ছিলেন তো! মাঝে মাঝে অবশ্য

তাঁরও মেজাজ বিগড়ে যেত। তখনকার দিনে সবাই তো আর ঠাণ্ডা মেজাজের লোক ছিলেন না।... কিন্তু কর্তারা তখন আমাদের মতো লোক নিয়ে খুঁতখুঁত করতেন না।... কখনো সখনো দুপুরের খাবার সময় তোমাদের বাবা গের্ভাস্কাকেও সাজা দিতেন, — উচিত শাস্তিই দিতেন! — সন্ধ্যেবেলায় আবার দু'জনে মিলে উঠানে কী ফুর্তি, কী বালালাইকা বাজানো।...'

'আচ্ছা, উনি, মানে ভেংকেভিচ — দেখতে সুন্দর ছিলেন?'

কী যেন ভাবত নাতালিয়া।

'না, মিথ্যে কথা বলব না: দেখতে উনি ছিলেন কাল্‌মিকের মতো। কিন্তু স্বভাবটা ছিল ভারিক্কি নাছোড়বান্দা। দিদিমণিকে কবিতা পড়ে শোনাতেন আর ভয় দেখাতেন: মরে তাঁর কাছে ফিরে আসবেন।...'

'আচ্ছা, দাদুও তো প্রেমে পড়ে পাগল হয়ে যান?'

'সেটা হয় তোমাদের ঠাকুমার জন্যে। সেটা একেবারে আলাদা ব্যাপার দিদিমণি। তাছাড়া বাড়িটা এত ছমছমে ছিল, হাসিখুশি হবার মতো জায়গা নয় মোটে। আহা বেঁচে থাক সব কিছু! আচ্ছা, আমার বোকাবোকা কথা যদি শুনতে চাও তাহলে বলি।...'

আর তার দীর্ঘ, অতিদীর্ঘ কাহিনী ধীরেসুস্থে, নীচু গলায় বলতে শুরু করত নাতালিয়া...

৪

ইতিবৃত্ত মানতে হলে, আমাদের ধনী প্রপিতামহ কুর্স্ক থেকে যখন সুখদলে আসেন তখন তাঁর তিনকাল গিয়ে

এক কালে ঠেকেছে: বন জঙ্গলে ভর্তি অতিদূর জায়গাটা তাঁর পছন্দ হয় নি। কিন্তু 'আগেকার দিনে আগে পিছু চারিধার শুধু বন বাদাড়' — কথাটা তো এখন চলতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।... দু'শ বছর আগে আমাদের এলাকায় পথিকদের যেতে হত গভীর বনের মধ্য দিয়ে। বনে হারিয়ে যেত সব কিছু — কামেন্কা নদী, উজানির অঞ্চল, আমাদের গ্রাম, জমিদারি আর চারিধারের বন্ধুর মাঠঘাট। ঠাকুর্দার আমলে কিন্তু সেরকমটা ছিল না। জায়গাটার চেহারা তখন আলাদা: তরঙ্গিত স্তেপ, ফাঁকা পাহাড়, ক্ষেতে — রাই জই আর বাকহুইট, রাস্তার দু'পাশে — দলছাড়া কোটরাকীর্ণ উইলো গাছ, আর সুখদলের চড়াইয়ে শুধু সাদা পাথর-নুড়ি। অরণ্য বলতে যা রয়ে গিয়েছিল সেটা হল ত্রশিন বন। বাগানটা সুন্দর ছিল অবশ্য: চওড়া বীথির দু'ধারে প্রসারিত-শাখা সত্তরটা বার্চ গাছ আর বিছুটিতে ঢাকা চেরি গাছ, রাস্পবেরি, বাবলা আর লাইলাক ঝোপের ছড়াছড়ি। আর বাগানের শেষ দিকটায়, যেখানে শস্যক্ষেতের শুরু, সেখানে রুপোলী পপলারের প্রায় একটি কুঞ্জ। ঘন, কালো, শক্ত খড়ে ছাওয়া বাড়ির ছাদ। জানলাগুলোর সামনের আঙিনা ঘিরে খানা-বাড়ি আর সার বেঁধে চাকরদের মহালের দীর্ঘ কাঠের বাড়ি, তাতে অনেক ভাগ। আঙিনা পেরিয়ে সীমাহীন সবুজ মাঠ আর জমিদারির ছড়ানো গ্রাম, আকারে বড়ো, গরীব বটে, কিন্তু — ভাবনা-চিন্তার বালাই নেই।

'এ বিষয়ে কর্তাদের সঙ্গে মিল ছিল সত্যি,' বলত নাতালিয়া। 'তাঁরাও ছিলেন বেপরোয়া — পাকা জমিদার নন, লোভী নন। সম্পত্তি ভাগ করেন সেমিওন কিরিলীচ,

তোমাদের ঠাকুর্দার দাদা। বড়ো আর ভালো অংশটা, পৈতৃক জমিদারিটা নিজের জন্যে রেখে দিলেন। আমাদের দিলেন কেবল সোশ্‌কি, সুখদল আর শ'চারেক ভূমিদাস চাষী। কিন্তু চার শ'র প্রায় অর্ধেকই পালিয়ে গেল।...'

আমাদের ঠাকুর্দা পিওত্‌র কিরিলীচ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে মারা যান। বাবার মুখে অনেকবার শুনেছি, একবার ঠাকুর্দা একটা আপেল গাছের নীচে গালিচে পেতে ঘুমোচ্ছিলেন, প্রবল দমকা ঝড়ে এক গাদা আপেল তাঁর মাথায় পড়াতে পাগল হয়ে যান। নাতালিয়া কিন্তু বলে চাকরদের মহালে ঠাকুর্দার মাথা খারাপ হয়ে যাবার বিষয়ে অন্য কথা হত: তাদের মতে, সুন্দরী স্ত্রীর মৃত্যুশোকে তিনি পাগল হয়ে যান, সে ঘটনাটির আগের দিন সুখদলে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টির প্রকোপ হয়। আর তাই, কালো-চুল, কুঁজো, ময়লা রঙ, অনেকটা তোনিয়া পিসীর মতো কালো একাগ্রচোখ পিওত্‌র কিরিলীচ জীবনের শেষ দিনগুলো কাটান শান্ত পাগলামিতে। নাতালিয়ার মতে, সে সময়ে তাঁদের এত পয়সা ছিল যে উড়িয়ে শেষ করা যেত না। মরক্কো চামড়ার টপবুট পায়ে, গায়ে বাড়িতে পরার রঙীন জামা, ঠাকুর্দা নিঃশব্দে উৎকণ্ঠায় এ-ঘর ও-ঘর করে বেড়াতেন, সাবধানে চারদিক দেখে নিয়ে কাঠের দেয়ালের ফাঁকে গুঁজে দিতেন স্বর্ণমুদ্রা। কেউ ধরে ফেললে বিড় বিড় করে বলতেন:

'তোনিয়ার বরপণের কথা ভাবছি কিনা। এসব জায়গা নিরাপদ, অনেক নিরাপদ, বুঝলে কিনা... কিন্তু ব্যাপারটা

বলতে গেলে — তোমাদেরই হাতে: যদি বলো — তাহলে আর করব না।...'

আবার চলত টাকা গংজে রাখা। নয়ত হল-ঘর আর ড্রয়িং-রুমের ভারি আসবাবপত্র সরাতে লেগে যেতেন, সর্বদা তাঁর আশা কোনো অতিথি এল বুঝি, যদিও প্রতিবেশীরা সুখদলে আসত কালেভদ্রে। কখনো-সখনো ক্ষিধে পেয়েছে বলে ঘ্যান ঘ্যান করে একটা ঘ্যাঁট নিজে বানিয়ে নিতেন, কাঠের পাত্রে পেঁয়াজকলি বিদ্ঘুটেভাবে কেটে কুচিয়ে তাতে রুটির টুকরো ফেলে ঘন ফেনিল ময়দার ক্বাথ ঢেলে এত বেশী মোটা ধূসর নুন ছড়িয়ে দিতেন ওপরে যে জিনিসটা একেবারে তেতো হত, মুখে দেওয়া ভার। দুপুরের খাবার পর বাড়ি চুপচাপ, সবাই যে-যার প্রিয় জায়গায় লম্বা ঘুম দিতে গিয়েছে, সে সময় একাকী পিওত্র কিরিলীচ রাত্তিরেও তার ভালো ঘুম হত না, বুঝতে পারতেন না একা একা নিজেকে নিয়ে কী করবেন। একলা অসহ্য হয়ে পড়লে শোবার ঘর আর অন্যান্য সব ঘরে উঁকি মেরে যারা ঘুমোচ্ছে তাদের সাবধানে ডেকে বলতেন:

'আর্কাশা, ঘুমোচ্ছ বুঝি? তোনিয়া, সোনা, তুমিও ঘুমোচ্ছ নাকি?'

'দোহাই আপনার বাবা, আমাদের আর বিরক্ত করবেন না!' ক্রুদ্ধ চিৎকার শুনে তিনি তাড়াতাড়ি স্তোক দিয়ে বিড়বিড় করে বলতেন:

'আচ্ছা, আচ্ছা, ঘুমোও, সোনা। আর বিরক্ত করব না।...'

আবার শুরু হত তাঁর ভ্রমণ। শুধু আর্দালি মহালের ত্রিসীমানায় যেতেন না তিনি, কারণ এরা অত্যন্ত বেয়াড়া

প্রকৃতির। আবার মিনিট দশেকের মধ্যে শোবার ঘরে ফিরে এসে আগের চেয়ে সাবধানে ঘুমন্তদের ডেকে মন-গড়া একটা কিছু খবর দিতেন: গাড়ির ঘণ্টা বাজিয়ে গাঁয়ের রাস্তায় কে যেন আসছে — 'ফৌজী দল থেকে ছুটি নিয়ে পেতেন্‌কা নয় তো' — কিম্বা বলতেন শিলামেঘ জমছে ঈশান কোণে।

'কর্তা ঝড়-বৃষ্টিকে কী না ডরাতেন,' নাতালিয়া বলত। 'মাথায় ঝুঁটি বাঁধা নেহাৎ বাচ্চা ছিলাম তখন, কিন্তু ও কথাটা ভুলি নি। বাড়িটা ছিল বেজায় অন্ধকার, গোমরামুখো... কী আর করা যায়! আর গরমের এক-একটা দিন — যেন এক-একটা বছর। এন্তার চাকরবাকর... কেবল আর্দালি ছিল পাঁচটা... হ্যাঁ, কী বলছিলাম, দাদাবাবুরা দুপুরের খাবারের পর ঘুমোতে যেতেন, আর আমরা, বাধ্য ঝি-চাকরেরা কী আর করি, শুয়ে পড়তাম তাঁদের মতো। তখন পিওত্‌র কিরিলীচ আমাদের কাছাকাছি না এলেই ভালো — বিশেষ করে গের্ভাস্কার কাছে। 'কী হে আর্দালিরা, ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি?' জিজ্ঞেস করতেন তিনি। আর তক্ষুনি গের্ভাস্কা তোরঙ্গ থেকে মাথা তুলে বলত: 'প্যান্টে বিছুটি ঢুকিয়ে দেব, তাই চাও কি?' — 'বদমাস, কার সঙ্গে কথা বলছিস খেয়াল আছে!' — 'ঘুমের ঘোরে বাস্তুভূতের সঙ্গে, হুজুর।' আর পিওত্‌র কিরিলীচ খাবার ঘর এবং ড্রয়িং-রুমে ফিরে গিয়ে জানলা দিয়ে বাগানে মুখ বাড়িয়ে দেখতেন: ঝড় আসছে কিনা। অবশ্য, সেসব দিনে ঝড় হত ঘন ঘন। আর কী প্রচণ্ড ঝড়! দুপুরের খাবারের পর হয়ত একটা ওরিওল পাখি ডাকতে শুরু করল আর বাগানের পেছন

থেকে গড়িয়ে মেরে উঠতে লাগল মেঘ... অন্ধকার হয়ে গেল বাড়িটা। ঘাস আর ঘন বিছুটির খস্‌খসানি। বারান্দার নীচে লুকোত মাদি টার্কিগুলো বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে।... অতিষ্ঠ হবার মতো ব্যাপার, সত্যি। আর কর্তা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্রুশচিহ্ন করে চেয়ারে উঠে আইকনের সামনে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে তাঁর বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সেই পুণ্য তোয়ালেটা দিতেন টাঙিয়ে — তোয়ালেটা দেখলে আঁতকে উঠতাম আমি! — কিংবা হয়ত জানলা দিয়ে কাঁচি ছুঁড়ে দিতেন। প্রথমেই সেটা করা চাই, মানে কাঁচি ছোঁড়া: তাহলে ঝড়ে কোনো ক্ষতি হবে না।...'

সুখদলের বাড়িতে ফরাসীরা থাকার সময় দিনগুলো ছিল বেশী হাসিখুশি আমাদের। প্রথমে ছিলেন কে এক লুই ইভানভিচ — স্বপ্নালু নীল চোখ, ইয়া বড়ো গোঁফ, নেড়া মাথার টাক ঢেকে এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত চুল আঁটা, পেণ্টুলুনটা অতিশয় লম্বা আর নীচের দিকে সরু। তারপরে এলেন মাঝবয়সী একজন ভদ্রমহিলা, মাদেময়জেল সিজি — হামেশা তাঁর কাঁপুনি লেগে থাকত; আর সবকটা ঘর গমগম করে উঠত লুই ইভানভিচের বাজখাই গলা, আর্কাশাকে তিনি বকতেন: 'চলে যান বলছি, আর কখনো ফিরবেন না যেন!' — হয়ত পড়ার ঘরে শোনা যেত: 'Maître corbeau sur un arbre perché'* —

* 'গাছে বসা দাঁড়কাক।' (ফরাসী)

আর তোনিয়া দিদিমণি শিখতেন পিয়ানো বাজানো। ফরাসীরা সুখদলে ছিল আট বছর। ছেলেপিলেরা পড়তে শহরে চলে গেল, তখনো তারা রয়ে গেল পিওতর কিরিলীচকে সঙ্গ দেবার জন্য, বিদায় নিল শুধু তখনি যখন ছেলেপিলেরা শহর থেকে তৃতীয় গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে এল। কিন্তু ছুটির শেষে আর্কাশা বা তোনিয়াকে আর কোথাও পাঠালেন না পিওতর কিরিলীচ, তাঁর মতে শুধু পেতেন্‌কা স্কুলে গেলেই যথেষ্ট। আর তাই ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া এগোল না, অনাদৃত তারা পড়ে রইল।... নাতালিয়া বলত:

'ওদের সবার ছোট ছিলাম আমি। গের্ভাস্কা আর তোমাদের বাবা প্রায় এক বয়সী বলে দু'জনের মধ্যে খুব ভাব। কিন্তু লোকে বলে না — বাঘে ছাগলে একসঙ্গে ঘর করতে পারে না। আর তাই, ওদের বন্ধুত্ব হল বটে, গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করল যে সে বন্ধুত্ব আমরণ থাকবে, এমনকি ক্রুশের বিনিময় হল পর্যন্ত; কিন্তু শিগগিরই খেল দেখাল গের্ভাস্কা: তোমার বাবাকে আর একটু হলে পুকুরে ডুবিয়ে মেরেছিল আর কি! ক্ষুদে নোংরা একটা ছোঁড়া হলে হবে কি, শয়তানী বুদ্ধিতে একেবারে ওস্তাদ। দাদাবাবুকে একদিন বলল: 'বড়ো হলে আমাকে চাবকাবে?' — 'তা চাবকাব বৈকি।' — 'না, না।' — 'কেন করব না?' — 'এমনি..' আর গের্ভাস্কা শিগগিরই একটা ফন্দী কষল: পুকুরের ওপরে টিলায় একটা পিপে ছিল, আর্কাদি পেত্রোভিচকে বলল পিপের মধ্যে ঢুকে গড়িয়ে টিলা থেকে নামতে। 'প্রথম সুযোগ তোমার, দাদাবাবু, তারপর আমি...' দাদাবাবুকে যা বলা হল তাই

করলেন: পিপের মধ্যে ঢুকে একটা ধাক্কা, তারপর টিলা থেকে গড়গড়িয়ে নেমে ঝপাং করে সটান জলে।.. হায় মা! শুধু ধুলোর ঘূর্ণি, আর কিছু নজরে পড়ে না! ভাগ্যিস কয়েকটা রাখাল কাছাকাছি এসে পড়েছিল।...'

ফরাসীরা থাকার সময়ে বাড়ির চেহারাটা ছিল হব্যভব্য। ঠাকুমা যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন সুখদলে ছিল শাসন করার মতো লোক — নিয়মকানুন আর বাধ্যতা, সদর মহল ও অন্দর মহল, ছুটির দিন, কাজের সময়। এ সবের একটা ঠাট ছিল ফরাসীরা থাকার সময়েও। কিন্তু ওরা চলে যাবার পর বাড়িতে মনিব বলতে কেউ রইল না। ছেলেমেয়েরা যতদিন ছোট ছিল ততদিন বাইরের দিক দিয়ে পিওত্র কিরিলীচ বাড়ির কর্তা। কিন্তু কী বা তাঁর করার ছিল? কে কাকে শাসন করবে: তিনি চাকরদের চালাতেন না চাকরেরা চালাত তাঁকে? পিয়ানোটা বন্ধ হয়ে গেল, ওক কাঠের টেবিলের ঢাকনা গেল উধাও হয়ে -- ঢাকনা বিনাই ওরা খাওয়া-দাওয়া সারত, যখন-তখন বাড়িতে ঢোকার জায়গা জুড়ে সবসময় একপাল দৌড়বাজ কুকুর। বাড়ি দেখাশোনা করার কেউ রইল না — ছাই-রঙা কাঠের দেয়াল, মেঝে আর ছাদ, ছাই-রঙা ভারি দরজা আর দরজার কাঠামো, খাবার ঘরের একটা দিক ভরে দেওয়া সন্তের ছবি-আঁকা সুজ্‌দালের পুরনো আইকনগুলো কিছু দিনের মধ্যেই একেবারে কালো হয়ে গেল। রাত্রিতে বাড়ির চেহারাটা ভয়াবহ — বিশেষ করে ঝড়ের রাতে যখন ঝড়বৃষ্টিতে বাগানটা উঠত গর্জিয়ে, কোণে আইকনের সন্তদের মুখে পড়ত বিদ্যুৎ ঝলক, গাছের ওপর কম্পমান আকাশ ফেটে পড়ে দেখা যেত গোলাপি-সোনালি আভা

আর অন্ধকারে ভীষণ শব্দে হত অশনিসম্পাত। দিনের বেলায় — বাড়ির চেহারাটা ঘুম জড়ানো, শূন্য, বিরস। বছরের পর বছর পিওত্‌র কিরিলীচ দুর্বল থেকে দুর্বলতর, অকিঞ্চিৎকর থেকে আরো অকিঞ্চিৎকর হয়ে যেতে লাগলেন, বাড়ি চালাত বুড়ী দারিয়া উস্তিনভ্‌না — ঠাকুর্দার স্তন্যদায়িনী ধাত্রী। তার ক্ষমতা ছিল প্রায় ঠাকুর্দার সমান, নায়েব দেমিয়ান গেরস্থালীর কাজে হাত দিত না: তার মাথায় শুধু খামার পরিচালনার চিন্তা। মাঝে মাঝে ধীর হাসি হেসে সে বলত: 'মনিবদের কোনো ক্ষতি আমি কি কখনো করতে পারি?' আমার বাবার বয়স তখন কম, সুখদল নিয়ে মাথা ব্যথা তাঁর ছিল না: তিনি পাগল ছিলেন শিকার, বালালাইকা* আর গের্ভাস্কাকে নিয়ে। গের্ভাস্কা নামে আর্দালি হলেও তার সঙ্গেই তিনি সারা দিন কাটাতেন মেশ্চরার কোনো এক জলায় শিকারে, বা গাড়ি-ঘরে বালালাইকা বা বাঁশির নতুন নানা কসরৎ শিখতেন।

'ব্যাপারটা আমাদের গা সওয়া হয়ে গেল,' নাতালিয়া বলত, 'উনি বাড়িতে আসতেন শুধু শুতে। তাও যদি না আসতেন, তার মানে হয় গাঁয়ে আছেন নয় গাড়ি-ঘরে, নয়ত শিকারে বেরিয়েছেন: শীতকালে — খরগোশ, হেমন্তে — শেয়াল, গরমকালে — ভারুই, হাঁস বা বাস্‌টার্ড পাখি; তড়তড়ে ফিতনগাড়িতে চেপে কাঁধে বন্দুক ফেলে শিস দিয়ে দিয়ান্‌কাকে ডেকে চলে যেতেন: সেরিওদ্‌নায়ার মিল্‌-এ কোনো দিন, পরের দিন মেশ্চরার জলায়, তার

* তন্ত্রীযুক্ত বাজনা বিশেষ।

পরের দিন স্তেপে। সঙ্গে সারাক্ষণ গের্ভাস্কা। সে ছিল দলের পাণ্ডা কিন্তু এমন ভাব দেখাত যেন কর্তার ইচ্ছেয় সব তাকে করতে হচ্ছে। আর্কাদি পেত্রোভিচ তাঁর এই শত্তুরটিকে সত্যি সত্যি ভাইয়ের মতো ভালোবাসতেন, কিন্তু যত দিন যেতে লাগল তত তাঁকে নিয়ে বিচ্ছিরি সব কাণ্ড করতে শুরু করল গের্ভাস্কা। দাদাবাবু হয়ত বললেন 'এই গের্ভাস্কা, বালালাইকা বাজানো যাক এবার, দোহাই তোর. আমাকে সেই গানটা শিখিয়ে দে 'গাছের আড়ালে রক্ত সূর্য গেল ডুবে'...' তাঁর দিকে তাকিয়ে নাক দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে জাঁকের হাসি হেসে গের্ভাস্কা উত্তর দিত: 'তার আগে আগে আমার হাতে চুমো খেতে হবে।' মড়ার মতো ফ্যাকাসে হয়ে গিয়ে আর্কাদি পেত্রোভিচ লাফিয়ে উঠে প্রাণপণে তার গালে কষতেন এক চড়, কিন্তু সে কেবল মাথা ঝাঁকিয়ে মুখটা আরো কালি করে গুণ্ডার মতো ভ্রূকুটি করত। 'ওঠ্ বলছি, বদমাস!' দৌড়বাজ কুকুরের মতো গা টান করে, ভেলভেটিনের পেণ্টুলুন আলগা ঝুলিয়ে ও দাঁড়িয়ে উঠত... মুখে কোনো কথা নেই। 'ক্ষমা চা বলছি!' — 'ঘাট হয়েছে, হুজুর।' কিন্তু রাগে দাদাবাবুর দম প্রায় বন্ধ হয়ে যায় — কী বলবেন ভেবে পেতেন না। চেঁচিয়ে উঠতেন — 'ঠিক বটে, 'হুজুর'! আমি চাই তোকে নিজের সমান করে দেখতে, বদমাস কোথাকার, মাঝে মাঝে মনে হয়: তোর জন্যে নিজের প্রাণ পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারি।... আর তুই? ইচ্ছে করে আমাকে চটিয়ে দেবার ফন্দি শুধু, তাই না?'

'মজার ব্যাপার!' বলত নাতালিয়া। 'দাদাবাবু আর ঠাকুর্দাকে জ্বালাতন করত গের্ভাস্কা, আর তোনিয়া

দিদিমণি আমাকে যন্ত্রণা দিতেন। তবু দাদাবাবু আর সত্যি বলতে ঠাকুর্দাও — গের্ভাস্কাকে নিয়ে পাগল ছিলেন আর আমি — তোনিয়া দিদিমণিকে নিয়ে।... সোশ্‌কি থেকে ফিরে, আমার পাতকের পর যখন কিছুটা হুঁশ হল তখন থেকে।...'

৫

ঠাকুর্দার মৃত্যু, গের্ভাস্কার পালানো, পিওত্‌র পেত্রোভিচের বিয়ে, যীশুর বধূ হিসেবে অপ্রকৃতিস্থ তোনিয়া পিসীর নিজেকে উৎসর্গ করা আর সোশ্‌কি থেকে নাতালিয়ার ফিরে আসার পর থেকেই কিন্তু চাবুক হাতে খেতে বসা শুরু হল। তোনিয়া পিসীর মাথা খারাপ হয়ে যাওয়া আর নাতালিয়ার নির্বাসন — দুয়েরই মূলে ছিল প্রেম।

নবীন কর্তাদের যুগ শুরু হয়েছিল, কেটে গিয়েছিল ঠাকুর্দার আমলের বিরস, বদ্ধ জীবনযাপন। সবাইকে অবাক করে দিয়ে সৈন্যবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করে সুখদলে প্রত্যাবর্তন করেন পিওত্‌র পেত্রোভিচ। তাঁর আগমনের ফল নাতালিয়া ও তোনিয়া পিসী দু'জনেরই পক্ষে বড়ো ভয়াবহ হয়।

প্রেমে পড়ল দু'জনেই। কেমন করে ঘটল সেটা দু'জনেই জানত না। প্রথম প্রথম শুধু ওদের মনে হয়েছিল যে 'জীবন আগের চেয়ে আনন্দের হয়ে দাঁড়িয়েছে'।

গোড়ার দিকে বাবুজনোচিত চটক আর আরামের নতুন একটা ধারা সুখদলে প্রবর্তন করলেন পিওত্‌র পেত্রোভিচ।

সঙ্গে এলেন তাঁর সাথী ভৈংকেভিচ আর এল একটি বাবুর্চি — দাড়িগোঁফহীন চাঁচাছোলা মুখ নেশাখোর লোকটি জেলি করার ছাতাধরা সবুজ ছাঁচ আর ভোঁতা সাদাসিধে ছুরি-কাঁটার দিকে তাকাত তাচ্ছিল্যভরে ভুরু কুঁচকে। বন্ধুর কাছে নিজেকে অতিথিবৎসল, দিলদরাজ ও বড়োলোক বলে জাহির করার ইচ্ছে পিওত্র পেত্রোভিচের, আর সেটা তিনি করতেন আনাড়িভাবে, ছেলেমানুষের মতো। কিন্তু সত্যি তো তিনি তখনো নেহাৎ কমবয়সী। দেখতে নরম আর সুন্দর হলেও স্বভাবদোষে কর্কশ ও নিষ্ঠুর, চেহারায় খুব আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন ছোকরা বটে, কিন্তু অতি সহজেই তিনি ভেবাচেকা খেয়ে প্রায় কেঁদে ফেলতেন, আর যে তাঁকে ভেবাচেকা খাইয়ে দিত তার বিরুদ্ধে বহুদিন আক্রোশ পুষে রাখতেন অন্তরে।

বাড়ি ফিরে এসে খেতে বসে প্রথম দিনই তিনি বললেন:

'আমার যেন মনে হচ্ছে আর্কাদি, মনে হচ্ছে আমাদের মাদেইরা মদ ছিল কিছু, মোটেই খারাপ ছিল না সেটা।'

ঠাকুর্দা লাল হয়ে উঠলেন — কী একটা বলতে গিয়ে তাঁর সাহসে কুলোল না শেষ পর্যন্ত, অস্থিরভাবে কোটের কলারটায় টান দিয়ে চুপ করে গেলেন। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল আর্কাদি পেত্রোভিচ:

'কোন মাদেইরা?'

গের্ভাস্কা ঠোঁটা দৃষ্টিতে পিওত্র পেত্রোভিচের দিকে তাকিয়ে অবজ্ঞার হাসি হাসল। অবজ্ঞার ভাব চাপার কোনো চেষ্টা না করে আর্কাদি পেত্রোভিচকে বলল:

'আপনি ভুলে গেছেন, হুজুর। মাদেইরা কলসী কলসী ছিল আমাদের সত্যি, কিন্তু আমরা চাকরবাকরেরা চুরি করে

সাফ করে দিয়েছি। সরাবটা বাবুদের যোগ্য, কিন্তু আমরা ক্ভাসের বদলে ওটাকে গিলে গিলে খতম করেছি।'

রাগে মুখ কালো করে হাঁকলেন পিওত্র পেত্রোভিচ: 'কী বলছিস! চোপরাও!'

উচ্ছ্বসিত হয়ে সায় দিলেন ঠাকুর্দা:

'ঠিক, ঠিক, পেতেন্কা, এই তো চাই! বাহবা!' সরু গলায় সানন্দে চেঁচিয়ে প্রায় কেঁদে ফেলার জোগাড়। 'ও আমায় কিরকম অপমান করে ভাবতে পারবি না! একবার নয়, বারবার ভেবেছি: বেটার কাছে চুপি চুপি গিয়ে হামানদিস্তে দিয়ে মাথাটা ওর গুঁড়ো করে দিই... সত্যি বলছি, গুঁড়ো করে দেব! পাঁজরায় বসিয়ে দেব ছুরি!'

জবাব দিতে এক মুহূর্ত দেরী করল না গের্ভাস্কা:

'ওটা করলে বেজায় সাজা পেতে হয় শুনেছি, হুজুর,' ভুরু কুঁচকে বলল সে। 'আমার কেবলি মনে হয় কর্তার স্বর্গলাভের বয়স হয়েছে!'

পিওত্র পেত্রোভিচ বলতেন, এই অপ্রত্যাশিত বেয়াড়া জবাব শোনার পর তিনি নিজেকে সামলান অতিথির খাতিরে শুধু। গের্ভাস্কাকে শুধু বললেন: 'বেরিয়ে যাও এখান থেকে এক্ষুনি!' পরে সত্যি চেঁচানোর জন্য লজ্জিত বোধ করে তাড়াতাড়ি ভৈৎকেভিচের কাছে মাপ চেয়ে, মৃদু হেসে তাঁর দিকে তাঁর সেই সুন্দর চোখে তাকালেন যার কথা তাঁর পরিচিতরা কখনো ভুলতে পারত না।

নাতালিয়াও অনেকদিন ভুলতে পারে নি সে চোখজোড়ার কথা।

নাতালিয়ার সুখ টেকে অতি অল্প দিন — আর কে

জানত সে সুখের পরিণামে যেতে হবে সোশ্‌কিতে, যেখানে যাওয়াটা তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা?

সোশ্‌কি এখনো টিকে আছে, যদিও কয়েক বছর ধরে তার মালিক তাম্‌বভের একজন ব্যবসাদার। বন্ধ্যা ভূমিতে কাঠের লম্বা কুটির একটা; শস্য ভাণ্ডার, বালতি নামাবার লম্বা খুঁটিসুদ্ধ কুয়ো, আর ফুটির ক্ষেত ঘেরা গোলাঘর। সব কিছু অবশ্য ঠাকুর্দার আমলের মতো, সুখদল ও সোশ্‌কির মধ্যিখানের নগরের চেহারাও বদলায় নি বেশী। নিজের অপরাধে নাতালিয়া নিজেই অত্যন্ত বিস্মিত হয়, পিওত্‌র পেত্রোভিচের রুপোর ফ্রেমে বসানো ভাঁজ করা ছোট্ট আয়নাটা চুরি করেছিল ও।

আয়নাটা দেখামাত্র — তার সৌন্দর্যে এত মুগ্ধ হয়ে যায় সে — অবশ্য পিওত্‌র পেত্রোভিচের যাবতীয় জিনিস সম্বন্ধে তার মনোভাব ছিল এরকম, যে চুরি করার লোভ সামলাতে পারে নি। আয়নাটা নেই লোকে টের না পাওয়া পর্যন্ত কয়েকটা দিন তার কাটে অপরাধের বোধে, নিজের ভয়াবহ গোপন কথা ও ধনের চাপে মন্ত্রমুগ্ধের মতো, আলতা জবার সেই রূপকথার*) মেয়েটির মতো। ঘুমোতে যাবার আগে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করত রাত যেন কেটে যায় শিগ্‌গির, সকাল সকাল ভোর হয়: তখন উৎসবের ছোঁয়াচ লেগেছে নতুন অপরূপ জিনিসে জীবন্ত হয়ে ওঠা বাড়িতে, সে জিনিস এনেছেন রূপবান মনিব, ফিটফাট ছোকরা — চুলে সুগন্ধী মলম, উঁচু লাল কলার দেওয়া টিউনিক, মুখ তামাটে হলেও মেয়েদের মতো মধুর; এমনকি যে করিডরে তোরঙ্গের ওপর ঘুমোত নাতালিয়া, সেখানেও উৎসবের আবহাওয়া, ভোরে ঘুম ভাঙার সঙ্গে

সঙ্গে মনে হত পৃথিবীতে কত না আনন্দ, দরজার বাইরে সাফ করার জন্য রাখা টপবুটজোড়া কী সুন্দর, রাজপুত্রের পায়ের যুগ্যি! কিন্তু সবচেয়ে ভয়ংকর আর উৎসবমুখর জায়গা হল বাগানটা পেরিয়ে, পরিত্যক্ত গোসলখানায়, যেখানে লুকোনো রয়েছে রুপোর ভারি ফ্রেমে ভাঁজ করা সেই আয়না, সেখানে বাগান পেরিয়ে শিশিরে ভেজা ঝোপঝাড় হয়ে চোরের মতো তাড়াতাড়ি যখন যেত নাতালিয়া তখনো কেউ বিছানা ছেড়ে ওঠে নি। গোপন ধন নিয়ে তার কী আহ্লাদ। দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে সকালের উত্তপ্ত আলোয় সেটা খুলে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত মাথা ঘুরতে থাকত, তারপর অত্যন্ত সাবধানে সেটাকে লুকিয়ে রেখে আবার তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা তাঁর সেবায় যাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহস পর্যন্ত হয় না, যাঁর জন্য সে আয়নায় নিজের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত পাগল করা আশায় যে তাকে তাঁর মনে ধরবে হয়ত।

কিন্তু আলতা জবার রূপকথা ফুরোতে দেরী হল না, ফুরোল বড়ো তাড়াতাড়ি, সত্যি। পরিণামে এত অপমান আর লজ্জা যে ভাষায় বলা যায় না। অন্তত তাই মনে হয়েছিল নাতালিয়ার।... পরিণামে পিওত্র পেত্রোভিচ স্বয়ং হুকুম দিলেন মাথা মুড়িয়ে দেওয়া হোক ওর যাতে চেহারাটা কুৎসিত দেখায়। আর এতদিন কিনা ওর চলেছিল নিজেকে সাজানো, ছোট্ট আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভুরুজোড়া কালো করা, দুজনের মধ্যে একটি মধুর গোপন অন্তরঙ্গতার কল্পনা বিলাস। চুরি ধরা পড়ল তাঁরই কাছে, তিনি ধরে নিলেন এটা নেহাৎ ছিঁচকে চুরি, বোকা চাকরানীর দুষ্কর্ম

একটা — তাই মোটা কাপড় গায়ে, কে'দে কে'দে ফোলা চোখে মেয়েটি উঠল গোবরের গাড়িতে, সমস্ত চাকরবাকরের চোখের সামনে; কলঙ্কিনীর যা কিছু প্রিয় তা থেকে হঠাৎ ছিনিয়ে পাঠানো হল সুদূর স্তেপের একটি অদ্ভুত ভয়াবহ ছোট খামার বাড়িতে। তার জানতে বাকি ছিল না: সেখানে তাকে তদারক করতে হবে মুরগী, টার্কি আর তরমুজ-ক্ষেতের; ঝাঁঝা রোদে পুড়ে যাবে দেহ, তার কথা ভাববে না দুনিয়ার কেউ; সেখানে স্তেপেতে এক একটি দিন হবে বছরের মতো, যখন দিকচক্রবাল ঢাকা পড়বে চঞ্চল কুজ্‌ঝটিকায়, সব কিছু এত চুপচাপ, এত গুমোট যে সারা দিন মড়ার মতন পড়ে পড়ে ঘুমোনো যায়, কিন্তু না, শুকিয়ে ওঠা মটরের আওয়াজে কান না দিলে চলবে না, শুনতে হবে তপ্ত বালুতে মোরগের ব্যস্তসমস্ত সাড়াশব্দ, টার্কিগুলোর শান্ত বিষণ্ণ ডাক, একটা বাজপাখির ছমছমে ছায়া হঠাৎ দেখে লাফিয়ে উঠে সরু গলায় টেনে টেনে হাঁকতে হবে: 'হু-উ-স!...' আর সেই ভয়ঙ্করী ইউক্রেনীয় বুড়ীটা, যার হাতে নির্ভর করছে নাতালিয়ার জীবন মরণ, সেই বুড়ীটা যে খামার বাড়িতে অধৈর্য হয়ে নিশ্চয় অপেক্ষা করছে তার শিকারের! ফাঁসিকাঠে যাদের নিয়ে যাওয়া হয় তাদের চেয়ে একটি মাত্র সুবিধে ছিল নাতালিয়ার: ইচ্ছে করলে গলায় দড়ি দিতে পারে সে। নির্বাসনের পথে, তার মতে চিরনির্বাসনের পথে, যেতে যেতে শুধু এইটুকু তার সান্ত্বনা।

জেলার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে এই যাত্রায় দেখার মতো অনেক কিছু ছিল। কিন্তু দেখার মতো অবস্থা তার নেই। শুধু মনে হয়েছিল, অনুভব করেছিল বরং: তার

জীবন শেষ, তার অপরাধ ও কলঙ্ক এত বিপুল যে পুরনো জীবনে ফেরার এতটুকু আশা নেই! তবু তো এখনো সঙ্গে আছে নিজের লোক, ইয়েভ্সেই বদুলিয়া, কিন্তু সেই ইউক্রেনীয় বুড়ীর হাতে তাকে সমর্পণ করার পর কী ঘটবে? সে রাতটা ঘুমিয়ে ইয়েভ্সেই বদুলিয়া তো বিদায় নেবে, অপরিচিত জায়গায় আমরণ থাকতে হবে তাকে। কেঁদে কেঁদে আর যখন পারে না, তখন ক্ষিধে পেতে লাগল। অবাক হয়ে দেখল যে ইয়েভ্সেই বদুলিয়ার কাছে সেটা অস্বাভাবিক মনে হল না, দু'জনে খাবার সময় এমনভাবে কথা বলতে লাগল যেন কিছু ঘটে নি। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল নাতালিয়া — শহরে না পেঁছনো পর্যন্ত সে ঘুম ভাঙল না। আর শহরটা দেখে মনে হল বিরস ধূলিধূসর, যন্ত্রণাকর। সেখানে কী যেন একটা আছে যেটা ঝাপসা ভয়াবহ, মন ব্যাকুল করে দেয় সেটা, যে স্বপ্ন কথায় বলা যায় না তার মতো। সে দিনটার কথা যা মনে আছে তা শুধু এই, স্তেপে দিনটা অত্যন্ত গরম, গ্রীষ্মের দিনের চেয়ে অশেষ আর বড়ো সড়কের চেয়ে দীর্ঘতর দুনিয়াতে আর কিছু নেই। মনে আছে শহরের কয়েকটা রাস্তা পাথরের, তাতে গাড়ির অদ্ভুত ঘড়ঘড়ে আওয়াজ; মনে আছে দূর থেকে ভেসে আসছিল শহরের লোহার ছাদের গন্ধ, আর বাজারের চকে, যেখানে তারা জিরিয়ে নিয়ে ঘোড়াটাকে খাইয়েছিল তখনকার মতো ফাঁকা শস্তাখানা চালাগুলোর কাছে ছিল ধুলো, আলকাতরা আর পচা খড়ের গন্ধ — চাষীরা যেখানে থামে সেখানে ঘোড়ার নাদের সঙ্গে পচা খড়ের আঁটি মিশে থেঁতলে পড়ে থাকে। ঘোড়া খুলে ইয়েভ্সেই তাকে বাঁধল গাড়ির সঙ্গে খাওয়াবার জন্য;

গরম টুপিটা মাথার পেছনে ঠেলে, জামার হাতায় ঘর্মাক্ত কপাল মুছে চলল শস্তাখানার দিকে, রোদে পুড়ে গিয়েছে একেবারে সে। নাতালিয়াকে জোর হুকুম দিয়ে গেল সব কিছুর ওপর 'নজর রাখতে', আর কিছু ঘটলে যেন গলা ফাটিয়ে চেঁচায়। নাতালিয়া বসে রইল নিথর হয়ে, বাড়িঘর দোরের অনেক ওদিকে নতুন তৈরী গির্জার বড়ো রুপোলি তারার মতো ঝকঝকে গম্বুজ থেকে চোখ আর ফেরাল না সে। এভাবে বসে রইল ইয়েভ্সেই ফেরা না পর্যন্ত! ফুর্তির মেজাজে ফিরল সে, কী একটা চিবোতে চিবোতে, বগলে সাদা একটা পাঁউরুটি। ঘোড়াটাকে নিয়ে আবার গাড়িতে জুততে লাগল।

'একটুখানি দেরী হয়ে গেছে, রাজকন্যে!' খুশিতে বিড়বিড় করে সে বলল, সম্বোধনটা হয় নাতালিয়া নয় ঘোড়ার উদ্দেশ্যে। 'যাক গে, সে জন্য আমাদের লটকে দেবে না! অত তাড়া কিসের?.. ফিরতি পথেও তোকে আর হিমসিম খাইয়ে দেব না। মুনিবের ঘোড়ার দাম আমার কাছে অনেক বেশী তোর নোংরা মুখের চেয়ে,' শেষের উল্লেখটা দেমিয়ানের উদ্দেশে। 'আমাকে খালি মুখের চোপা করা: 'খবরদার! সমঝে না চললে মজাটা টের পাওয়াব তোকে।...' তবে রে! — ভাবলাম আমি... অপমানে রাগে গা'টা ঘুলিয়ে উঠল। কর্তারা কখনো আমার এত হেনস্তা করেন নি।... আর তোর এত চাড় কিসের! বেটা হামদোমুখো! বেটা বলে কিনা 'দেখিস্!' — দেখার কী আছে রে? আমি তোর চেয়ে হাঁদা নই বোধহয়। ইচ্ছে যদি করে — আর ফিরবই না তোদের কাছে: ছুঁড়ীটাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে সোজা রাস্তা ধরব, আর কখনো আমার

টিকটিকি পর্যন্ত দেখবি না।... আর ছুঁড়ীটাও আমাকে তাজ্জব করে দিয়েছে: কী নিয়ে বোকাটার মাথা ব্যথা? প্রলয়কাল এসে পড়েছে না কি? ব্যাপারী আর তীর্থযাত্রীদের আসা যাওয়ার অভাব তো হবে না খামারের পাশ দিয়ে — মুখ ফুটে বললেই হল: পুরনো রস্তভ ছাড়িয়ে অনেক দূরে সরে পড়তে সময়ও লাগবে না।... তখন ধরুক দিকি আমাকে!'

আর নাতালিয়ার মুড়নো মাথায় 'গলায় দড়ি দেবার' চিন্তার বদলে এল — পালাবার কথা। গাড়িটা ক্যাঁচকোঁচ করে দুলে উঠল। চুপ মেরে গিয়ে ইয়েভ্‌সেই ঘোড়াটাকে নিয়ে গেল চকের মাঝখানের কুয়োটায়। যেদিক থেকে তারা এসেছে সেদিকটায় মঠের বড়ো বাগানের পেছনে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, মঠের উল্টোদিকে রাস্তার ওপারে হলদে জেলখানার জানলাগুলো সূর্যাস্তের আলোয় সোনালি। জেলখানা দেখে নিমেষের জন্য পালাবার কথাটা আরো বেশী করে মনে হল। পালিয়ে থেকে বাঁচা তো যায়। অবশ্য লোকে বলে তীর্থযাত্রীরা চুরি করা ছেলেমেয়েদের চোখ টগবগে গরম দুধ দিয়ে পুড়িয়ে তাদের দিয়ে ভিক্ষে করায়, আর ব্যাপারীরা ওদের খপ করে সরিয়ে সমুদ্রের কাছে নিয়ে গিয়ে বেচে দেয় নোগাইদের* কাছে।... মাঝে মাঝে আবার মুনিবেরা পালিয়ে যাওয়া বান্দা-বাঁদীদের ধরে এনে শেকলে বেঁধে জেলে কয়েদ করে রাখে।... কিন্তু মন হয় জেলের সিপাইগুলো মানুষ, পশু নয়, গের্ভাস্কা তো তাই বলত!

কিন্তু জেলখানার জানলায় প্রতিফলিত আলো মিলিয়ে

যেতে নাতালিয়ার সমস্ত চিন্তা গোলমেলে হয়ে গেল — না, পালিয়ে যাওয়াটা আরো ভয়ঙ্কর, গলায় দড়ি দেওয়ার চেয়ে ভয়ঙ্কর! আর ইয়েভ্‌সেইও শান্ত হয়ে চুপ করে রয়েছে।

'আমাদের দেরী হয়ে গেছে রে,' অস্বস্তিতে বলে সে লাফিয়ে উঠল গাড়ির ধারে।

বড়ো রাস্তায় পড়ে আবার গাড়িটার ঝাঁকুনি আর দোলানি, পাথরের ওপর মুখর শব্দ।... ভাবা ততটা নয় যতটা অনুভব করল নাতালিয়া: 'আহা, গাড়িটা আবার ফিরে গেলে কত ভালো না হত। সুখদলে চাকিতে গিয়ে যদি কর্তার পায়ে পড়তে পারতাম!' কিন্তু ইয়েভ্‌সেই তো চাবকিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়েছে। বাড়িঘরদোরের পেছনের সেই তারাটা আর চোখে পড়ে না। সামনে পড়ে আছে শুধু সাদা রাস্তা, সাদা ফুটপাথ আর সাদা বাড়িগুলো — আর সব কিছু শেষ হয়েছে প্রকান্ড সাদা গির্জাটায়, ধাতুর তৈরী গম্বুজটা নতুন আর সাদা, ওপরে আকাশ বিরস, নীলচে সাদা।... আর ওদিকে, বাড়িতে ইতিমধ্যে শিশির পড়া শুরু হয়েছে, বাগান থেকে উঠছে ঠান্ডা সৌরভ, রান্নাঘর থেকে গরম একটা গন্ধ; শস্যের সমুদ্র পেরিয়ে অনেক দূরে, বাগানের প্রান্তে রুপোলি পপলারগুলোর ওধারে, সেই পূত পুরাতন স্নানের ঘর ছাড়িয়ে সূর্যাস্তের আভা মিলিয়ে যাচ্ছে। এদিকে ড্রয়িং-রুমে বারান্দার দরজাগুলো খোলা, কোণে লাল-বেগুনি আলো একাকার হয়ে যাচ্ছে ছায়ার সঙ্গে, আর দেখতে ঠাকুর্দা ও পিওত্‌র পেত্রোভিচ দু'জনেরই মতো কালো-চোখ, শ্যাম-পীত রঙের জমিদার-কন্যা সূর্যাস্তের দিকে পিছন ফিরে বসে আছেন

স্বরলিপিতে চোখ রেখে, কমলা-রঙা ঢিলে পাতলা সিল্কের গাউনের হাতা বারবার টেনে নামিয়ে পিয়ানোর হলদে চাবিতে আঘাত দিয়ে ঘর ভরিয়ে দিচ্ছেন ওগিন্‌স্কির*) পলোনেজের গম্ভীর সুরেলা মধুর হতাশার কলিতে; দেখে মনে হয় তাঁর খেয়াল নেই যে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে, বাঁ হাত কোমরে রেখে বলিষ্ঠদেহ, ময়লা রঙের অফিসারটি একাগ্র বিষণ্ণ চিত্তে তাকিয়ে আছেন তাঁর ক্ষিপ্র হাতের দিকে।...

'ওঁর ভালোবাসার জন আছে, আমারও আছে নিজের মানুষ,' এসব সন্ধ্যায় দুরুদুরু হৃদয়ে ভাবার চেয়ে অনুভব বেশী করত নাতালিয়া, আর ঠান্ডা শিশিরসিক্ত বাগানে, বিছুটি ও স্যাঁতসেঁতে উগ্রগন্ধ কাঁটাঝোপের মাঝখানে দৌড়িয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত অসম্ভবের প্রত্যাশায় — কখন ছোটবাবু বারান্দার সিঁড়ি হয়ে নেমে বাগানে আসবেন, তাকে দেখে হঠাৎ ঘুরে পা চালিয়ে তাড়াতাড়ি কাছে আসবেন — ভয়ে আর আনন্দে অসাড় তার মুখ থেকে এতটুকু শব্দ বেরোবে না।...

কিন্তু ঘড়ঘড়িয়ে গাড়িটা চলেছে তো চলেছে। চারিধারে শহর শুধু, গরম আর দুর্গন্ধে ভরা, সেই শহর এককালে যাকে রূপকথার দেশ বলে সে কল্পনা করত। ব্যথিত বিস্ময়ে নাতালিয়া তাকিয়ে রইল ছিমছাম পোশাক পরা লোকগুলোর দিকে, ঘরদোরের সামনে ফুটপাথে তারা আসছে আর যাচ্ছে, দাঁড়িয়ে আছে ফটকে আর দোকানঘরের হাট করা দরজায়।... 'ইয়েভ্‌সেই এ রাস্তাটা ধরল কেন,' ভাবল সে, 'গাড়ি খটখটিয়ে এ পথে যাবার সাহস তার এল কোথা থেকে?'

এবার তারা পেরিয়ে গেল গির্জাটা, উঁচু নীচু ধুলোভরা রাস্তা ধরে কামারশালা আর ক্ষুদে ব্যবসায়ীদের ভেঙে-পড়া কুঁড়ে পেরিয়ে এসে পড়ল অগভীর নদীতে।... আবার কবোষ্ণ জল, পলি মাটি আর মাঠঘাটের সান্ধ্য স্নিগ্ধতার পরিচিত গন্ধ। অনেক দূরে সামনের টিলায় ক্রসিঙের পাশের নিঃসঙ্গ ছোট বাড়িটাতে সাঁঝের প্রথম বাতির শিখা... তারপর খোলা জায়গায় এসে পুল পার হয়ে ক্রসিঙের কাছে পেঁছে — দেখল ঝাপসা-সাদা একটি পাথরের ধুধু রাস্তা তাকিয়ে আছে তাদের চোখে, সীমাহীন দিগন্তে, স্তেপের ঠান্ডা রাত্রির নীলে অদৃশ্য হয়ে গেছে রাস্তাটা। ঢিমে তালে চলে ক্রসিঙ পার হয়ে ঘোড়াটার গতি হল অত্যন্ত মন্থর, পায়ে হাঁটার মতো। আবার শোনা যায় কতো স্তব্ধ রাত্রি, পৃথিবী আর আকাশ। শুধু দূরে কোথায় যেন একটা ছোট্ট ঘণ্টার বিষণ্ণ ধ্বনি। ক্রমশ জোরালো আর সুরেলা হল শব্দটা — অবশেষে একটা ত্রোইকার তালে তালে চলার ভারি আওয়াজ, রাস্তায় খুরের সমান খটখট আর গাড়ির চাকার ঘড়ঘড়ানি ছাপিয়ে শোনা গেল সেটা।... ত্রোইকার সইস হল মুক্ত* একটি ছোকরা, গাড়িতে বসে আছেন একজন অফিসার, হুড দেওয়া ফৌজী ওভারকোটের কলারে চিবুক গুঁজে। ওরা পাশাপাশি এসে পড়াতে মুহূর্তের জন্য মাথা তুললেন তিনি — আর হঠাৎ নাতালিয়ার চোখে পড়ল লাল কলার, কালো গোঁফ, বালতির মতো দেখতে শিরস্ত্রাণের নীচ থেকে তার দিকে তাকিয়ে

* অর্থাৎ ভূমিদাস নয়।

থাকা তরুণ চোখের ঝিলিক।... চিৎকার করে উঠল সে, মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল, জ্ঞান হারাল।...

ক্ষেপার মতো সে ভেবেছিল মানুষটি হলেন পিওত্র পেত্রোভিচ, আর তার সেই অস্থির দাসীহৃদয়ের যন্ত্রণা ও মমতায় হঠাৎ নাতালিয়ার উপলব্ধি হল কী সে হারিয়েছে: হারিয়েছে তাঁর সান্নিধ্য।... বাইরে গেলে যে বালতিটা সঙ্গে থাকে সেটা থেকে আঁজলা আঁজলা জল তাড়াতাড়ি তার মুড়োনো, ঝুলে পড়া মাথায় ছেটাল ইয়েভ্সেই।

বমির ধমকে জ্ঞান ফিরে এল নাতালিয়ার — সঙ্গে সঙ্গে মুখ বাড়িয়ে দিল গাড়ি থেকে। তার ঠাণ্ডা কনকনে কপালে তাড়াতাড়ি হাত রাখল ইয়েভ্সেই।...

একটু ভালো বোধ করে তারপর নাতালিয়া কম্পিত দেহে চিৎ হয়ে শুয়ে তাকিয়ে রইল তারার দিকে, ব্লাউজের গলা ভিজে গেছে। আতঙ্কে মূক ইয়েভ্সেই। তার ধারণা ও ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে তাড়াতাড়ি, আরো তাড়াতাড়ি ঘোড়া ছোটাল সে। গাড়ি ছুটে চলল হেলেদুলে। মেয়েটির মনে হল দেহ বলে তার কিছু নেই — আছে শুধু প্রাণ। আর সে প্রাণে ঠিক যেন 'স্বর্গসুখ'।...

রূপকথার বাগানে ফোটা আলতা জবার মতো তার ভালোবাসা। কিন্তু সেই প্রেম সে নিয়ে গেল স্তেপের গহনে, সুখদলের চেয়েও দূর নির্জন এক জায়গায় যাতে সেখানে নিঃসঙ্গ বিজনে তার মধুর তীব্র প্রথম বেদনা কাটিয়ে উঠতে পারে, তারপর নিজের সুখদলীয় হৃদয়ের গভীরে চাপা দিয়ে রাখতে পারে দীর্ঘ দিন, চিরকাল, মৃত্যু না আসা পর্যন্ত।

৬

সুখদলে প্রেমের গতি বিচিত্র। তেমনি বিচিত্র ঘৃণার গতিও।

সে বছরেই খুন হলেন ঠাকুর্দা। তাঁর সমাপ্তিটা তাঁর খুনীর পরিণাম যেমন, বলতে গেলে সুখদলে যারা মারা যায় তাদের প্রত্যেকের সমাপ্তির মতোই বিদ্ঘুটে। সুখদলের দেবালয় পার্বণ* হল উদ্ধারকর্ত্রী মেরী মাতার পার্বণ**, কয়েকজন অতিথিকে খেতে ডেকেছিলেন পিওত্র পেত্রোভিচ — অত্যন্ত অস্থির ভাব তাঁর: অভিজাতপ্রধান আসবেন বলে কথা দিয়েছেন, তিনি সত্যি আসবেন তো? তাছাড়া ঠাকুর্দা বেশ খুশি আর উত্তেজিত, কারণটা কী বোঝা গেল না। অভিজাতপ্রধান এলেন — আর খাসা জমল পার্টি। বেশ হৈচৈ আর ফুর্তি, সবচেয়ে ফুর্তি — ঠাকুর্দার। ২রা অক্টোবর ভোরবেলায় দেখা গেল ড্রয়িং-রুমের মেঝেতে তাঁর মৃতদেহ পড়ে আছে।

সৈন্যবাহিনীতে ইস্তফা দেবার সময় পিওত্র পেত্রোভিচ এটা জানাতে কসুর করেন নি যে তিনি আত্মত্যাগটা করছেন খ্রুশ্চভ কুল, বংশের আর জমিদারির মর্যাদা রাখার জন্য। জানাতে ভোলেন নি যে জমিদারি দেখাশোনা করার ভার 'অনিচ্ছা' সত্ত্বেও তিনি নিতে বাধ্য। তাঁকে জেলার

* যে সাধু বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নামে কোন পল্লীর ধর্মমন্দির উৎসর্গীকৃত তার সম্মানে অনুষ্ঠিত উৎসব।

** গ্রীক অর্থডক্স চার্চের উৎসব। অক্টোবরের পয়লা তারিখে (প্রাচীন পঞ্জিকামতে) অনুষ্ঠিত হয়।

সবচেয়ে সুশিক্ষিত আর ফয়দাওলা অভিজাতদের সঙ্গে মেলামেশা ও সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে, আর বাকি লোকদের সঙ্গে — তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ না হয় শুধু সেটা দেখা চাই। গোড়ার দিকে ঠিক নিজের পরিকল্পনা মতো তিনি চলেন। দেখা করলেন ছোটখাটো সব জোতদারদের সঙ্গে, এমনকি হানা দিলেন সেই মাতঙ্গিনী বৃদ্ধা খুড়ী ওল্‌গা কিরিলভ্‌নার গ্রামে যাঁর ঘুমের ব্যামো ছিল, যিনি দাঁত মাজতেন নস্যি দিয়ে। বাদশার মতো একাধিপত্যে পিওত্‌র পেত্রোভিচ জমিদারি শাসন করছেন, হেমন্ত আসতে না আসতে এ ব্যাপারটা কারো বিস্ময় উদ্রেক করল না আর। সত্যি, তখন তাঁর চেহারাটা আর ছুটিতে আসা ফুলবাবু ছোকরা অফিসারের মতো রইল না। তিনি তখন কর্তালোক, নবীন জমিদার। অল্পতে বিব্রতভাবে আর লাল হয়ে ওঠেন না তিনি। একেবারে ফিটফাট মানুষ। গায়ে গত্তি লাগল, দামী ঘরোয়া কোট পরনে, ছোটখাটো পায়ে নরম লাল তাতার চটি, ছোট হাতে ফিরোজা আংটির বাহার। ভাইয়ের কালো চোখে তাকাতে লজ্জা হত আর্কাদি পেত্রোভিচের, কী নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করবেন ভেবে পেতেন না। প্রথম প্রথম তাঁর সমস্ত কথা মেনে নিয়ে শিকার করে সময় কাটাতেন।

উদ্ধারকর্ত্রী মেরী মাতার পার্বণের পিওত্‌র পেত্রোভিচ চেয়েছিলেন নিজের অতিথিবৎসলতায় সবাইকে মুগ্ধ করে দেবেন, তাছাড়া বাড়ির কর্তা যে তিনি সেটা জাহির করার অভিলাষ ছিল তাঁর। কিন্তু যত আপদ ঠাকুর্দাকে নিয়ে। আহ্লাদে তিনি আটখানা হলেও বুদ্ধির পরিচয় বেশী

দিলেন না। ক্রমাগত বকবকানি, মাথায় সেই পুরনো পয়মন্ত ছোট মখমলের টুপি, বাড়ির দরজির বানানো নীল নতুন কোটটা বড্ডো বড়ো — সব মিলিয়ে হাস্যকর। তাঁরও ধারণা যে গৃহকর্তা হিসেবে তিনিও কম নন, অতিথি সম্বর্ধনার জন্য একটি নির্বোধ অনুষ্ঠানের উদ্ভাবনে সকাল থেকে তাঁর ব্যস্ততা। খাবার ঘরের বারান্দার দিকের দরজার একটি পাল্লা কখনো খোলা হত না, কিন্তু তিনি নিজে তলার আর ওপর দিকের লোহার হুড়কো সরিয়ে, একটা চেয়ার টেনে, থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে চড়লেন তার ওপর; পাল্লাগুলো হাট করে খুলে দিয়ে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। লজ্জায় আর রাগে পিওত্র পেত্রোভিচের বাকরোধ হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু তিনি ঠিক করেছিলেন সব কিছু সইবেন। তাঁর বাক্যহীনতার সুযোগ নিয়ে ঠাকুর্দা শেষ অতিথি না আসা পর্যন্ত স্থানত্যাগ করলেন না। সামনের দরজায় — কী একটা প্রাচীন প্রথানুযায়ী সেটাকেও হাট করে খুলে দিতে হয়েছিল — তাঁর চোখ যেন এ'টে বসে গিয়েছে, উত্তেজনায় পা ঘষছেন, এক একটি অতিথিকে দেখামাত্র আপ্যায়িত করতে ছুটে গিয়ে নাচের ভঙ্গিতে তাড়াতাড়ি একটা পা এগিয়ে হে'ট হয়ে নমস্কার জানিয়ে সবাইকে রুদ্ধশ্বাসে বলছিলেন:

'আহ, আমি যে কী খুশি হয়েছি! বেজায় খুশি হয়েছি! অনেকদিন পরে আমাদের বাড়িতে পা দিলেন! আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক!'

ঠাকুর্দা নির্বিশেষে সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছিলেন যে তোনিয়া লুনিওভোতে গিয়েছে ওল্‌গা কিরিলভ্‌নার সঙ্গে থাকতে। তাতে ভয়ানক চটছিলেন পিওত্র পেত্রোভিচ।

'তোনিয়ার মন খারাপ বলে অসুস্থ, তাই শরৎকালটা খুড়ীর ওখানে কাটাতে গিয়েছে' — এই অযাচিত খবরটবর শুনে কী ভাববেন অতিথিরা? কারণ, ভৈৎকেভিচের সঙ্গে তাঁর ব্যাপারটা জানতে কারো বাকি নেই। তোনিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে যিনি ডুয়েট বাজাতেন একসঙ্গে, ধরা গলায় তাঁকে পড়ে শোনাতেন 'লিউদ্‌মিলা'*), কিংবা হয়ত বিষণ্ণ চিন্তামগ্নভাবে বলে উঠতেন: 'প্রতিজ্ঞার পূত বন্ধনে তুমি বাগদত্তা মৃতের কাছে...'*) সেই ভৈৎকেভিচের হয়ত সত্যি ন্যায়নিষ্ঠ অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু নিজের মনোভাব প্রকাশের চেষ্টা করামাত্র তোনিয়া ক্ষেপার মতো তেলে বেগুনে জ্বলে উঠতেন, তা সে চেষ্টা যতই নির্দোষ হোক না — যেমন তাঁর জন্য একটা ফুল নিয়ে আসা — তারপর হঠাৎ ভৈৎকেভিচ চলে গেলেন। তাঁর প্রস্থানের পর রাত্রে আর ঘুম হত না তোনিয়ার, যেন শুধু তাঁরই জানা একটি মুহূর্তের প্রত্যাশায় বসে থাকতেন খোলা জানলার ধারে অন্ধকারে, তারপর হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠতেন — ঘুম ভেঙে যেত পিওত্‌র পেত্রোভিচের। অনেকক্ষণ জেগে জেগে ঠোঁট চেপে তিনি শুনতেন তোনিয়ার ফোঁপানি আর অন্ধকার বাগানে পপ্‌লারগুলোর নিদ্রালস গুঞ্জন শব্দটা অশ্রান্ত ঝিরঝিরে বৃষ্টির মতো। তারপর যেতেন তাঁকে সান্ত্বনা দিতে। ঘুমজড়ানো চোখে সান্ত্বনা দিতে আসত বাড়ির ঝিরা, মাঝে মাঝে ঠাকুর্দাও আসতেন দ্রুত পায়ে, উৎকণ্ঠিতভাবে। তখন মাটিতে পা ঠুকে তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচাতেন তোনিয়া, 'আমাকে রেহাই দাও তোমরা, আমার জন্মশত্রু তোমরা!' — সব কিছু শেষ হত কুৎসিত গালাগালিতে, প্রায় মারামারির মতো

ব্যাপারে। ঝিদের আর ঠাকুর্দাকে তাড়িয়ে, দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দরজার হাতল চেপে ধরে পিওত্র পেত্রোভিচ উন্মত্ত হিসহিসিয়ে বলে উঠতেন:

'শোনো, একবার ভেবে দেখো, একবার শুধু ভেবে দেখো, শয়তানী, লোকে কী বলবে!'

'উঃ!' পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠতেন তোনিয়া। 'বাবা, দেখো, ও আমাকে গালিগালাজ করছে, বলছে আমার পেট হয়েছে!'

দু'হাতে মাথা চেপে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেন পিওত্র পেত্রোভিচ। পার্টির দিন গের্ভাস্কাকেও নিয়ে তাঁব বিশেষ উদ্বেগ: তাঁর ভয় সাবধানে না থাকলে সে হয়ত বেয়াড়াপনা করে বসবে।

শরীরে গের্ভাস্কা ভয়ংকর বেড়েছে। প্রকাণ্ড বেঢপ চেহারা, কিন্তু চাকরবাকরদের মধ্যে সেই সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো, বুদ্ধিতে তার জুড়ি নেই, তারও পরনে নীল কোট, নীল পেণ্টুলুন, পায়ে ছাগলের চামড়ার নরম গোড়ালিবিহীন টপবুট। শীর্ণ তামাটে গলায় বেগুনি রঙের পশমী সুতোর একটা রুমাল জড়ানো। ঘন হালকা কালো চুল পাশে টেড়ি কাটা, কদমছাঁট করতে সে রাজী হয় নি — চারপাশে হালকাভাবে কাটা বড় চুল। দাড়িগোঁফ কামাবার বালাই নেই, কারণ চিবুকে কোঁকড়ানো দু'তিনটে মোটা কালো চুল আর প্রকাণ্ড হাঁ-র দু'দিকে দুটো গাছি ছাড়া আর কিছু তার নেই: 'হাঁ-টা তো আকর্ণবিস্তৃত একটা ফালি মাত্র' — বলত লোকে। হাড় বের করা চওড়া ছাতি, ছোট মাথা, কোটরগ্রস্ত চোখ, ছাইয়ের মতো নীলচে পাতলা ঠোঁট, বড়ো নীলচে দাঁত হ্যাংলা চেহারার এই

প্রাচীন আর্যটিকে, সুখদলের এই পারসীককে*) ইতিমধ্যে নাম দেওয়া হয়েছিল: 'শিকারী কুকুর'। তার দন্তবিকশিত হাসি দেখে, কাশি শুনে অনেকে মনে মনে ভাবত: 'শিগ্গিরই তুই পটল তুলবি!' তবু সামনাসামনি এই ছোকরাটিকে সম্মান করে গের্ভাসি আফানাসিয়েভিচ বলে ডেকে অন্য চাকরবাকরদের সঙ্গে তফাৎ করা হত।

বাবুরা পর্যন্ত ভয় পেত তাকে। মনিব আর চাকরবাকরদের মধ্যে একটা মিল ছিল: হয় তারা শাসন করবে নয় সিঁটিয়ে থাকবে। পিওত্র পেত্রোভিচের আগমনের দিনে ঠাকুর্দাকে ঢেঁটা উত্তর দেওয়াতে গের্ভাস্কার কোনো সাজা না হওয়াতে চাকরবাকরেরা অবাক হয়ে গিয়েছিল। সংক্ষেপে শুধু আর্কাদি পেত্রোভিচ তাকে বলেছিলেন: 'তুই একটা আস্ত শুয়োর!' — প্রত্যুত্তরটা ঠিক তেমনি সংক্ষিপ্ত: 'ওঁকে আমি সইতে পারি নে, হুজুর!' কিন্তু পিওত্র পেত্রোভিচের কাছে গের্ভাস্কা গেল আপনা থেকে: অসম্ভব বড়ো পেণ্টুলুনে ঢাকা বেঢপ লম্বা পায়ে একটু হেলে পড়ে, বাঁ হাঁটুটা এগিয়ে দিয়ে দরজায় তার সেই অভ্যস্ত, অযাচিত গায়ে-পড়া ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে অনুরোধ জানাল তাকে যেন বেতপেটা করা হয়।

'আমি, হুজুর, বেজায় বদরাগী আর বেয়াড়া লোক,' বলল নিরাসক্তভাবে, বড়ো বড়ো কালো চোখে ঝিলিক খেলিয়ে।

আর 'বদরাগী' কথাটায় কী একটা আভাস পেয়ে ভয় পেলেন পিওত্র পেত্রোভিচ।

'দেখা যাবে, অনেক সময় আছে, অনেক সময় আছে!'

কড়া হবার ভান করে হাঁকলেন তিনি। 'চলে যা এখান থেকে! দেখতে পারি না তোর মতো বেয়াড়া লোককে!'

কিছু না বলে মুহূর্তখানেক দাঁড়িয়ে রইল গের্ভাস্কা। তারপর বলল:

'আপনার যা মর্জি।'

ওপরের ঠোঁটের একগাছা মোটা চুল পাকাতে পাকাতে, কুকুরের মতো নীলচে দন্ত বিকশিত করে, ভাবাবেগহীন মুখে আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে গেল সে। ঘটনাটা থেকে তার দৃঢ় ধারণা হল যে, ভাবাবেগহীন মুখ করে থাকা এবং যতটা সম্ভব সংক্ষেপে জবাব দেওয়া হল সবচেয়ে ভালো পন্থা। আর পিওত্র পেত্রোভিচ যে শুধু গের্ভাস্কার সঙ্গে কথাবার্তা এড়িয়ে চললেন তা নয়, এমনকি তার মুখের দিকে তাকাতেন না পর্যন্ত।

উৎসবের দিন গের্ভাস্কার ব্যবহার ঠিক তেমনি নিরাসক্ত আর অবোধ্য। খানার বন্দোবস্তে সবাই ছুটোছুটি করছে, চলেছে হুকুম দেওয়া নেওয়া, দিব্যি গালাগালি, ঝগড়া, মেঝে ধোয়ামোছা; আইকনগুলোর ভারি, ময়লা রুপো সাফ করাতে খড়িগুলো নীল, বাড়িতে নাক গলাবার চেষ্টা করাতে কুকুরগুলো লাথি খাচ্ছে, সবায়ের ভাবনা জেলিটা হয়ত ঠিক দানা বাঁধবে না, কাঁটায় কুলিয়ে ওঠা যাবে না হয়ত, পুড়ে যাবে কেক আর মিঠাই; একমাত্র গের্ভাস্কার মুখে অবজ্ঞার ধীর হাসি; ভীষণ উত্তেজিত মদখোর বাবুর্চি কার্জিমিরকে সে বলল: 'ধীরে, পাদ্রীবাবাজী, ধীরে, না হলে কাপড় খসে পড়বে যে!'

অভিজাতপ্রধানের কথা ভাবতে ভাবতে পিওত্‌র পেত্রোভিচ অন্যমনস্কভাবে গের্ভাস্কাকে বললেন:

'দেখ আজ আবার নেশা করে বসিস না।'

'জীবনে কখনো মাল টানি নি,' যেন সমকক্ষের সঙ্গে কথা বলছে এমনভাবে জবাব দিল গের্ভাস্কা। 'ওতে মজা নেই কিছু।'

তারপর সব অতিথি যখন হাজির তখন গের্ভাস্কাকে তুষ্ট করার চেষ্টায় সবাইকে শুনিয়ে পিওত্‌র পেত্রোভিচ হেঁকে বললেন:

'গের্ভাসি! ডুব দিস্‌ না, দোহাই তোর! তুই না থাকলে যে মারা পড়ব!'

অত্যন্ত ভদ্র ও ভারিক্কি গলায় জবাব দিল গের্ভাস্কা:

'কিছু ভাববেন না, হুজুর। বান্দা হাজির।'

এত ভালোভাবে কাজকর্ম এর আগে কখনো করে নি গের্ভাস্কা। তার সামনে অতিথিদের যা বললেন পিওত্‌র পেত্রোভিচ তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য:

'দানবটা কত মুখফোড় হতে পারে বললে বিশ্বাস করবেন না! কিন্তু সত্যি ক্ষমতা আছে লোকটার! হাত নয়ত, একেবারে সোনা!'

তিনি কি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন যে তাঁর এই কথায় কানায় কানায় ভরা সর্বনাশের পাত্র এবারে ছলকে পড়বে? কথাটা কানে গেল ঠাকুর্দার। কোটের গলা টানতে টানতে তিনি হঠাৎ টেবিলের একেবারে অন্য প্রান্তে বসা অভিজাতপ্রধানকে চেঁচিয়ে বললেন:

'হুজুর! আমাকে উদ্ধার করুন! বাপের কাছে ছেলের মতো আপনাকে অনুরোধ করছি! আমার এই চাকরটার

বিরুদ্ধে নালিশ জানাচ্ছি আপনাকে! এই যে, এই লোকটা — গের্ভাসি আফানাসিয়েভিচ কুলিকভ! আমাকে উঠতে বসতে তাচ্ছিল্য করে লোকটা! ও...'

কথাটা শেষ করতে পারলেন না তিনি, অতিথিরা স্তোক দিয়ে তাঁকে শান্ত করল। উত্তেজনার চোটে তিনি কেঁদে ফেলেছিলেন কিন্তু অতিথিরা এত বন্ধুভাবে আর সসম্মানে, সেটা প্রহসন গোছের ব্যাপার অবশ্য, তাঁকে সান্ত্বনা দিল যে তুষ্ট হয়ে শিশুর মতো আবার খুশি হয়ে উঠলেন তিনি। চোখ না তুলে, মুখ একটু ঘুরিয়ে দেয়ালের পাশে অনড় দাঁড়িয়ে রইল গের্ভাস্কা। ঠাকুর্দা দেখলেন দানবটার মাথা বেজায় ছোট, চুল ছোট করে ছাঁটলে আরো ছোট হয়ে যেত: দেখলেন মাথার পেছন দিকটা অত্যন্ত চোখা, ঘাড়ের চুল অত্যন্ত ঘন — রুক্ষ, যেমন-তেমন করে ছাঁটা চুল সরু ঘাড়ের ওপর খুঁচিয়ে বেরিয়ে আছে। শিকারের সময় রোদে আর হাওয়ায় পুড়ে মুখের চামড়া জায়গায় জায়গায় খসে গিয়ে ফিকে বেগুনি রঙের ছোপছোপ দাগ। থেকে থেকে অস্বস্তিতে আর ভয়ে তার দিকে তাকাচ্ছিলেন ঠাকুর্দা, তবু অতিথিদের আনন্দে চেঁচিয়ে বলতে ছাড়লেন না:

'বেশ, বেশ, ওকে ক্ষমা করছি! কিন্তু একটিমাত্র শর্তে, বন্ধুগণ, আপনাদের তিন দিন যেতে দেব না! কিছুতে যেতে দেব না! বিশেষ করে সন্ধেবেলায় যাবেন না, দোহাই আপনাদের। অন্ধকার হয়ে গেলে আমি আর আমি থাকি না: কী বিষণ্ণ হয়ে যায় সব, কী ভয়াবহ! আকাশে মেঘ জমছে, লোকে বলে নাপোলিওনের দলের দুটো ফরাসী আবার ধরা পড়েছে ব্রাশিন বনে।... রাত্রে আমার কপালে

নির্ঘাত মরণ লেখা — শুনে রাখুন কথাটা! এটা মার্তিন জাদেকার*) ভবিষ্যদ্বাণী।...'

কিন্তু তাঁর মৃত্যু ঘটল ভোরের দিকে।

শেষ পর্যন্ত তিনি যা চেয়েছিলেন তাই হয়: 'ওঁকে খুশি করার জন্য' অনেকে রাত্রে থেকে যান; সারা সন্ধ্যে চলল চা-পান, নানা ধরনের জ্যাম পরিমাণে এত বেশী ছিল যে লোকে এসে এসে একটার পর আরেকটা চাখছিল; তারপর পাতা হল আরো টেবিল, জ্বালানো হল স্পার্মাসেটির বাতির ঝাড়, আলো ঠিকরে পড়ল আয়নায়, দামী তামাকের সুগন্ধ আর হৈহৈ গল্পগুজবে ভরা ঘরগুলো গির্জার মতো ঝকঝকিয়ে উঠল সোনালি আভায়। সবচেয়ে বড়ো কথা হল, অনেক অতিথি রয়ে গেলেন রাত কাটাবার জন্য। তার মানে আর একটা প্রীতিকর দিনের সম্ভাবনা, আর সঙ্গে সঙ্গে অনেক ঝামেলা আর মাথাব্যথার পালা: সত্যি তো, তিনি, পিওত্র কিরিলীচ না থাকলে অনুষ্ঠানটা কখনো এত জমত না, ভোজপর্বটা হত না এত এলাহি আর আনন্দের!

শোবার ঘরে সরু মোমবাতি জ্বালানো স্তোত্রবেদীর সামনে কোট খুলে দাঁড়িয়ে, সেণ্ট মার্কিউরির অন্ধকার আইকনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে উত্তেজনায় তিনি সে রাত্রে ভাবছিলেন: 'হ্যাঁ, পাপীর সর্বনাশ ঘটুক।... আমাদের ওপর ক্রোধে সূর্য যেন অস্ত না যায় কখনো!'

তারপর মনে পড়ল সম্পূর্ণ আলাদা একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করার অভিপ্রায় ছিল তাঁর। একটু কুঁজো হয়ে, পঞ্চাশের স্তোত্র ফিস ফিস করে আউড়ে, ঘরে পায়চারি করতে লাগলেন তিনি, বিছানার পাশের টেবিলে ধূপকাঠিটা

নিভু নিভু হয়ে যেতে ঠিক করে দিলেন, স্তোত্রগ্রন্থটা তুলে নিয়ে খুশির আবেশে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মুণ্ডহীন মহাত্মার দিকে আর একবার তাকালেন। হঠাৎ খেই-হারিয়ে-যাওয়া কথাটা মনে পড়াতে মৃদু হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে গেল মুখ.

'হ্যাঁ, ঠিক তাই, ঠিক তাই: বৃদ্ধকে পেলে — খুন করতাম, না পেলে — কিনে নিতাম!'

ঠিক সময় ঘুম না ভাঙলে জরুরী সব হুকুম জারি করা যাবে না, তাই উৎকণ্ঠায় বলতে গেলে ঘুম এল না চোখে। ভোরবেলায়, তখনো ঘরগুলো সাফ করা হয় নি, তামাকের গন্ধে তখনো ভরপুর ঘরগুলোতে উৎসবের পরের সকালের সেই বিশেষ একটা নিঝুম স্তব্ধতা। পা টিপে টিপে সাবধানে খালি পায়ে ড্রয়িং-রুমে গিয়ে, সবুজ তাসের টেবিলের কাছে মেঝেতে পড়ে থাকা কয়েকটা খড়ির টুকরো সন্তর্পণে তুলে নিয়ে তিনি কাঁচের দরজা থেকে চাইলেন বাগানের দিকে, আর বিস্ময়ে মুখ হাঁ হয়ে গেল: হিমনীল ঝক্‌ঝকে স্বচ্ছ আকাশ, বারান্দা আর বারান্দার রেলিং ঢাকা পড়েছে সকালের রুপোলি হিমকণায়, ঢাকা পড়েছে বারান্দার নীচে বিরল ঝোপঝাড়ে তামাটে পাতা। দরজা খুলে হাওয়া শুঁকলেন ঠাকুর্দা: ঝোপঝাড়ে তখনো হৈমন্তী ক্ষয়ের তীব্র গেঁজানো গন্ধ, কিন্তু শীতের তাজা হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে সেটা। আর সব কিছু নিথর, প্রশান্ত, প্রায় মহিমামণ্ডিত। গ্রামের পেছন থেকে উঁকি মেরে সূর্য আলো ছড়াল ছবির মতো দেখতে পথের দু'ধারে অর্ধনগ্ন বার্চ গাছগুলোর মাথায়, আর পাতলা ছোট সোনালি পাতায় ছাওয়া, নীল আকাশের গায়ে স্বচ্ছ সেই সব সাদা-সোনালি গাছের মাথায় কী মধুর, আনন্দোজ্জ্বল লাইলাক আভার

লুকোচুরি! বারান্দার নীচে ঠাণ্ডা ছায়ায় ছুটে চলে গেল একটা কুকুর, তার পায়ের তলায় মচমচ করে উঠল যেন ছড়ানো নুনের মতো হিমকণায় দগ্ধ ঘাস। শব্দটা মনে করিয়ে দেয় শীতকালের কথা — আর, সানন্দ প্রত্যাশায় কাঁধ অল্প ঝাঁকিয়ে ঠাকুর্দা ড্রয়িং-রুমে ফিরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে ভারি আসবাবপত্র সরাতে লেগে গেলেন। সরাবার সময় গুরুগুরু একটা আওয়াজ, থেকে থেকে আয়নায় প্রতিফলিত আকাশের দিকে তাকাতে লাগলেন। হঠাৎ নিঃশব্দ ক্ষিপ্র পায়ে ঘরে ঢুকল গের্ভাস্কা — গায়ে কোট নেই, ঘুমের ঘোর তখনো কাটে নি, 'আর মেজাজটা শয়তানের মতো', এটা সে নিজে বলেছিল পরে।

ঘরে ঢুকে কড়া সুরে হিসহিসিয়ে বলে উঠল:

'থামাও এসব! অন্যদের কাজে কেন নাক গলাও?'

উত্তেজিত মুখ তুলে ঠাকুর্দা সারা সন্ধ্যা আর সারা রাত্রির মতো সমান সদয়সুরে অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন:

'দেখ দিকি, গের্ভাস্কা নিজের মূর্তিটা! কাল রাত্তিরে তোকে মাফ করে দিলাম, আর তুই কিনা মনিবের কাছে কৃতজ্ঞ না হয়ে।...'

মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে গের্ভাস্কা বলল:

'তুমি আমায় জ্বালিয়ে মারলে, তোমার নাকি কান্না অসহ্য! টেবিলটা ছাড়ো দিকি!'

সভয়ে ঠাকুর্দা একবার তাকালেন গের্ভাস্কার মাথার পেছন দিকটায়। সাদা শার্টের ওপরে সরু গলা থেকে সেটা অত্যন্ত খুঁচিয়ে আছে মনে হল। কিন্তু তেলে বেগুনে জ্বলে তিনি দাঁড়ালেন গের্ভাস্কা আর তাসের টেবিলের

মাঝখানটায়, টেবিলটা একটা কোণে নিয়ে যাবার ইচ্ছে ছিল তাঁর।

মুহূর্ত খানেক ভেবে নিয়ে তিনি চেঁচালেন, কিন্তু বিশেষ জোরে নয়:

'ছাড় দিকি ওটা! মনিবের কথা মানা উচিত তোর। আমাকে এত চটিয়ে দিচ্ছিস: পাঁজরায় দেব বসিয়ে ছুরি!'

'বটে!' দাঁত খিঁচিয়ে সখেদে কথাটা বলে গের্ভাস্কা বেশ জোরে ঘা বসাল তাঁর বুকে।

পালিশ করা ওক কাঠের মেঝেতে পা পিছলে পড়ে গেলেন ঠাকুর্দা হাতদুখানা ছড়িয়ে — পড়ার সময় টেবিলের ছুঁচলো কোণে রগ ঠুকে গেল।

রক্ত, শিবনেত্র আর হাঁ-হয়ে-যাওয়া মুখ দেখে গের্ভাস্কা ঠাকুর্দার তখনো উষ্ণ গলা থেকে ছিনিয়ে নিল সোনার পূত ফলক আর ময়লা সুতোয় বাঁধা রক্ষাকবচ।... পেছন দিকে একবার তাকিয়ে কড়ে আঙুল থেকে ঠাকুর্দার বিয়ের আংটিটিও নিয়ে নিল। তারপর দ্রুতপায়ে নিঃশব্দে ড্রয়িং-রুম ছেড়ে সেই যে চলে গেল — একেবারে নিরুদ্দেশ।

সুখদলের একটি মাত্র মানুষ এর পর তাকে দেখেছিল — সে হল নাতালিয়া।

৭

সোশকিতে নাতালিয়া থাকার সময় সুখদলে আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে: পিওত্র পেত্রোভিচের বিবাহ এবং ক্রিমিয়ার যুদ্ধে*) দুই ভাইয়ের স্বেচ্ছায় যোগদান।

দু'বছর পর ফিরে আসে নাতালিয়া: তার কথা তখন

কারো মনে নেই। ফিরে এসে সুখদলকে সে চিনতে পারল না, ঠিক যেমন সুখদল চিনতে পারে নি তাকে।

গ্রীষ্মের সেই সন্ধ্যায় যখন জমিদার বাড়ি থেকে তাকে আনতে পাঠানো গাড়িটা কিঁচকিঁচ শব্দে থামল কুঁড়েঘরের সামনে, আর নাতালিয়া বেরিয়ে এল দোরগোড়ায়, ইয়েভ্‌সেই বদ্‌লিয়া অবাক হয়ে বলে উঠল:

'আরে, সত্যি তুই নাকি, নাতালিয়া?'

'তাছাড়া আর কে?' প্রায় দেখা যায় না এমন মৃদু হেসে জবাব দিল নাতালিয়া।

ইয়েভ্‌সেই মাথা ঝাঁকিয়ে বলল:

'চেহারাটা বেজায় খারাপ হয়ে গিয়েছে কিনা!'

কিন্তু নাতালিয়াকে শুধু দেখছে অন্য রকম: এই যা, মাথামুড়োনো, গোল মুখ, উজ্জ্বল চোখ মেয়েটি আর নেই, সে এখন অনতিদীর্ঘ পাতলা দোহারা চেহারার যুবতী, প্রশান্ত, সংযত ও নম্র। পরনে ইউক্রেনের ডোরাকাটা পশমের স্কার্ট আর সূচীর কাজ করা ব্লাউজ, মাথার ছাই রঙের রুমালটা যদিও আমরা যেমনভাবে পরি তেমনভাবে পরা*। চামড়া একটু রোদে-পোড়া, জোয়ারি রঙের ছোট ছোট মেচেতার দাগ মুখে। কিন্তু সুখদলের খাস লোক ইয়েভ্‌-সেইয়ের কাছে ছাই-রঙা রুমাল, রোদে-পোড়া চামড়া আর মেচেতা কুৎসিত মনে হবেই তো।

সুখদলের পথে ইয়েভ্‌সেই বলল:

'এবার তো তোর বিয়ের বয়স হয়েছে। বিয়ে করার ইচ্ছে হয়েছে নিশ্চয়, অ্যাঁ?'

* অর্থাৎ রুমালের গিঁট থুতনির নীচে বাঁধা।

মাথা নেড়ে শুধু নাতালিয়া বলল:

'না, ইয়েভ্‌সেই খুড়ো, বিয়ে কখনো করব না।'

'তোর হল কী?' এত অবাক লাগল ইয়েভ্‌সেইয়ের যে মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে নিল।

ধীরেসুস্থে নাতালিয়া তাকে বোঝাল: বিয়ে সবায়ের কপালে লেখা নেই, ওকে তোনিয়া দিদিমণির হেফাজতে রাখা হবে হয়ত, কিন্তু তোনিয়া দিদিমণি তো ভগবানের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছেন, তার মানে তিনি নাতালিয়াকেও বিয়ে করতে দেবেন না; তাছাড়া এমন সব স্বপ্ন সে দেখেছে যা থেকে এটা স্পষ্ট যে বিয়ে করাটা তার কপালে নেই।...

'সে আবার কী স্বপ্ন?' ইয়েভ্‌সেই জিজ্ঞেস করল।

'এমন আহামরি কিছু নয়,' নাতালিয়া বলল। 'সেবার গের্ভাস্কার কাছে খবরটা পেয়ে ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম কিনা, খবরটা নিয়ে খালি ভাবতাম।... তাই স্বপ্ন দেখি।'

'ও সত্যি সকালে তোদের সঙ্গে থেকে খাওয়া দাওয়া করেছিল? গের্ভাস্কার কথা বলছি।'

একটু ভাবল নাতালিয়া:

'হ্যাঁ, তা করেছিল। এসে বলল: তোর কাছে বিশেষ একটা জরুরী কাজে কর্তা আমাকে পাঠিয়েছেন, কিন্তু প্রথমে কিছু খেতে দে তো। ওর বিষয়ে মন্দ কিছু না ভেবে টেবিলে খাবার দিলাম। খাওয়া শেষ করে বাইরে গিয়ে ও ইশারায় আমাকে ডাকল। দৌড়ে গেলাম, বাড়ির পেছনে গিয়ে সব কথা আমাকে খুলে বলল, হ্যাঁ, তারপর চলে গেল।...'

'তা লোকজন ডাকলি না কেন?'

'ডাকব কেন? ডাকলে খুন করে ফেলবে বলেছিল। রাত্তিরের আগে কাউকে বলা বারণ ছিল। আর ওদের ও বলল: চালাঘরে গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নিই।...'

নাতালিয়া ফিরে আসাতে ওকে দেখার বিশেষ আগ্রহ সুখদলের সব চাকরবাকরের। পুরনো বান্ধবী আর বাড়ির ঝিদের প্রশ্নবাণে ও জর্জরিত। বান্ধবীদের খুব সংক্ষেপে নাতালিয়া জবাব দিল, যেন যে ভূমিকায় নিজে অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তার বেজায় আনন্দ।

'ভালোয় ভালোয় কেটেছে সব,' কয়েকবার সে বলল।

একবার বলল তীর্থযাত্রী বুড়ীর মতো গলায়:

'ভগবানের অসীম কৃপা। ভালোয় ভালোয় কেটেছে সব।'

আর শান্তভাবে, কালবিলম্ব না করে বাড়ির মামুলী দৈনন্দিন কাজের ভার আবার নিল নাতালিয়া। ঠাকুর্দা আর নেই, দাদাবাবুরা স্বেচ্ছায় চলে গেছেন যুদ্ধে, তোনিয়া দিদিমণি 'ক্ষেপার মতো' ঠাকুর্দাকে নকল করে ঘরে ঘরে ঘোরেন, সুখদলে শাসন করছেন একেবারে অচেনা একটি কর্ত্রী — বেঁটে মোটা অতি চঞ্চল গর্ভবতী একটি মহিলা, এ সবে যেন অবাক হবার কিছু নেই।...

খাবার ঘর থেকে কর্ত্রী হাঁকলেন:

'এখানে আসতে বলো ওকে।... কী যেন ওর নাম? — নাতাশ্‌কাকে*।'

দ্রুতপায়ে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল নাতালিয়া, ক্রুশচিহ্ন করে কোণের আইকনগুলোকে প্রথমে, তারপর কর্ত্রী ও দিদিমণিকে প্রণাম জানিয়ে দাঁড়িয়ে রইল — জিজ্ঞাসাবাদ

* ডাকনাম -- নাতাশা, নাতাশ্‌কা।

ও আদেশের প্রতীক্ষায়। প্রশ্ন অবশ্য শুধু করলেন কর্ত্রী— তোনিয়া দিদিমণি একটি কথাও বললেন না। তিনি লম্বা আর রোগা হয়ে গেছেন, নাকটা ধারালো, অসম্ভব কালো চোখে বিরস স্থির দৃষ্টি। কর্ত্রী তাকে বললেন তোনিয়া দিদিমণির সেবা করতে। আর মাথা নুইয়ে নাতালিয়া শুধু বলল:

'আচ্ছা, মা।'

সেই সমান নিরাসক্ত নিথর দৃষ্টিতে তোনিয়া দিদিমণি সেদিন সন্ধেবেলায় হঠাৎ দারুণ রেগে চোখ পাকিয়ে নিষ্ঠুর আনন্দে নাতালিয়ার চুল ধরে টানতে লাগলেন — জামাকাপড় ছাড়াতে গিয়ে মোজায় বিচ্ছিরি একটা টান দিয়েছিল বলে। ছোট মেয়ের মতো কেঁদে ফেলল নাতালিয়া, কিন্তু কিছু বলল না; ঝিদের ঘরে গিয়ে বেঞ্চিতে বসে ছেঁড়া চুল বাছতে বাছতে সত্যি সত্যি তার অশ্রুসিক্ত চোখের পাতার নীচে দেখা দিল মৃদু হাসি।

'বাবা, একেবারে চামুণ্ডা দেখছি!' বলেছিল সে। 'হাঁড়ির হাল হবে আমার।'

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে অনেকক্ষণ বিছানা ত্যাগ করলেন না তোনিয়া দিদিমণি, আর দরজার পাশে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে নাতালিয়া এক-একবার আড়চোখে চাইতে লাগল তাঁর ফ্যাকাসে মুখের দিকে।

'কী, কী স্বপ্ন দেখা হল?' এমন উদাসীনভাবে তোনিয়া দিদিমণি জিজ্ঞেস করলেন যেন অন্য কেউ তাঁর হয়ে কথা বলছে।

জবাবে নাতালিয়া বলল:

'কিছু না, বলার মতো কিছু না।'

তখুনি ঠিক আগেকার রাতের মতো হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে তোনিয়া দিদিমণি বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে চায়ের পেয়ালাটা ছুঁড়ে মারলেন নাতালিয়ার দিকে, তারপর বিছানায় ধড়াস করে শুয়ে শুরু হল ফুঁপিয়ে কান্না আর চিৎকার। সরে গিয়ে নাতালিয়া পেয়ালাটা এড়াল — খুব চটপট এড়াবার কায়দাটা আয়ত্ত করে ফেলতে বেশী সময় লাগল না তার। জানা গেল, আগের রাত্রের স্বপ্নের কথা জিজ্ঞেস করাতে বোকা ঝিগুলো 'কিছু না দিদিমণি' বললে তোনিয়া দিদিমণি মাঝে মাঝে তাদের চেঁচিয়ে বলতেন: 'মিথ্যে কথা না হয় বল একটা!' কিন্তু মিথ্যে কথায় নাতালিয়া ওস্তাদ ছিল না বলে এড়াবার ফন্দিটা তাকে শিখেপড়ে নিতে হল।

শেষ পর্যন্ত তোনিয়া দিদিমণিকে দেখতে ডাক্তার ডাকা হল। অনেক বড়ি আর মিক্স্‌চার তিনি দিলেন। তোনিয়া দিদিমণির ভয় তাঁকে বিষ খাওয়াবে, তাই প্রথমে নাতালিয়াকে দিয়ে ওষুধগুলো চাখিয়ে নিলেন — একটার পর একটা সবগুলো খেয়ে ফেলল সে বাধ্যের মতো। সোশ্‌কি থেকে ফিরে আসার অল্প কিছুদিন পরে সে শুনল তোনিয়া দিদিমণি তার অপেক্ষায় ছিলেন — যেন সে 'জীবনের একটি কণা': বাস্তবিক তার কথা ভেবেছিলেন তিনিই — সোশ্‌কি থেকে গাড়িটা আসছে কিনা দেখার জন্য ব্যগ্র চোখ মেলে বারবার সবাইকে বলছিলেন গভীর আবেগে যে নাতালিয়া ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একেবারে সেরে উঠবেন। নাতালিয়া ফিরে এল — তখন তাঁর সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য। হতে পারে নাতালিয়াকে নিয়ে হতাশ হয়েছিলেন বলে তাঁর কান্না

পেত? কথাটা ভেবে একদিন নাতালিয়ার বুকটা মুচড়ে উঠল। বারান্দায় বেরিয়ে একটা তোরঙ্গের ওপর বসে সে কাঁদতে লাগল।

কেঁদে কেঁদে ফোলা চোখে ঘরে যখন এল, তোনিয়া দিদিমণি জিজ্ঞেস করলেন:

'কী, ওষুধটা খেয়ে ভালো লাগছে?'

'হ্যাঁ, দিদিমণি,' ফিসফিস করে বলল নাতালিয়া, যদিও সবকটা ওষুধ খেয়ে তার হৃৎস্পন্দন ঢিমে হয়ে গিয়েছে, মাথা ঘুরছে, তোনিয়া দিদিমণির কাছে এসে হাতে চুমো খেল সে আবেগে।

আর তারপর অনেক দিন সে মাথা নীচু করে ঘুরে বেড়াত, তোনিয়া দিদিমণির দিকে মুখ তুলে তাকাবার সাহস নেই, তাঁর জন্য সে এত ব্যথিত।

'ইউক্রেনের কেউটে কোথাকার!' একবার বাড়ির ঝিদের একজন সলশ্‌কা তাকে খেঁকিয়ে ওঠে। নাতালিয়ার অন্তরঙ্গ সখী সে, তার ভাবনাচিন্তা গোপন কথার দোসর হবার সবচেয়ে বেশী চেষ্টা ছিল তার, কিন্তু তার সব আগ্রহের জবাবে শুধু মিলত সংক্ষিপ্ত, মামুলী উত্তর, সখীসুলভ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের কোনো আমেজ ছিল না তাতে।

বিষণ্ণ হাসি হাসল নাতালিয়া। ভাবতে ভাবতে বলল:

'তা বেশ, ঠিক বলেছ। যাদের সঙ্গে থাকা তাদেরই মতো হয়ে যেতে হয় তো। সত্যি বলতে ইউক্রেনের লোকেদের জন্য থেকে থেকে যতটা মন কেমন করে বাপ-মার জন্য ততটা নয়।...'

সোশ্‌কিতে যাবার পর প্রথম প্রথম নতুন পরিবেশের কোনো হুঁশ তার হয় নি। ভোরবেলায় সেখানে পৌঁছিয়ে—

প্রথমে যেটা তার কাছে অদ্ভুত ঠেকে সেটা হল যে কুঁড়েঘরটা বেজায় লম্বা আর সাদা, সমভূমির মধ্যে অনেক দূর থেকে চোখে পড়ে, চুল্লি-জ্বালানো স্ত্রীলোকটি মিষ্টিভাবে কথা বলল তার সঙ্গে, আর পুরুষটি ইয়েভ্‌সেইয়ের গল্পগুজবে কান দিল না। ক্রমাগত বকবক করে চলেছে ইয়েভ্‌সেই — কর্তাদের কথা, দেমিয়ানের কথা, পথের গরম আর শহরে কী খেয়েছিল তারই কথা, পিওত্‌র পেত্রোভিচ, আর অবশ্য আয়না চুরিটার কথা। সুখদলে 'ব্যাজার' বলে পরিচিত শারি নামের ইউক্রেনীয় লোকটি তার এত সব কথায় শুধু মাথা নেড়ে চলল, ইয়েভ্‌সেই থামলে পর অন্যমনস্কভাবে একবার তার দিকে চেয়ে, বিশেষ একটা খুশির ঝিলিক চোখে, অনুচ্চ অনুনাসিক সুরে গান ধরল: 'বরফের ঝড় খাক ঘুরপাক'।... আস্তে আস্তে ধাতস্থ হয়ে এল নাতালিয়া। সোশ্‌কি দেখে সে অবাক। ক্রমশ জায়গাটা তার কাছে সুখদলের তুলনায় বেশী মধুর আর আলাদা ধরনের মনে হতে লাগল। কুঁড়েঘরটাই তো দেখার মতো! — ধবধবে সাদা দেয়াল, খাগড়ায় সুন্দর ছাওয়া মসৃণ চাল! আর ভেতরটা কেমন করে সাজানো, সুখদলের সেই ছন্নছাড়া কুঁড়েঘরগুলোর তুলনায় কত সমৃদ্ধ! দেখার মতো জিনিস বটে কোণে ঝোলানো, রাঙতা-মোড়া, কাগজের ফুলের সুন্দর মালা দিয়ে ঘেরা আইকনগুলো, ওপরে ঝোলানো সূচীর কাজ করা রঙীন তোয়ালে! আর ফুলকাটা টেবিল-ঢাকনা! চুল্লির পাশে তাকে সারি বাঁধা নীল কাঁচের বাটি আর ঘটি! কিন্তু সবচেয়ে বড়ো আশ্চর্যের বিষয় হল ইউক্রেনীয় দম্পতিটি।

কেন ওরা আশ্চর্য সেটা ঠিক ধরতে পারে নি নাতালিয়া, কিন্তু অনুভব করেছে বরাবর। শারির মতো পরিচ্ছন্ন, ধীর, নির্ভুল চাষী আগে কখনো তার চোখে পড়ে নি। লোকটা লম্বা নয়, সরুগোছের, মাথায় কদমছাঁটে বেশ পাক ধরেছে — দাড়ি নেই — কিন্তু তাতারী পাতলা গোঁফজোড়াও পাকা. মুখ আর ঘাড় রোদে পুড়ে কালো আর গভীর বলিকীর্ণ, রেখাগুলো পরিচ্ছন্ন স্পষ্ট আর কেন জানি না মনে হয় প্রয়োজনীয়। লিনেনের পেণ্টুলুনের নীচে খুব ভারি টপবুট পরার জন্য চলার ধরনটা অস্বস্তিকর; পেণ্টুলুনে গোঁজা লিনেনের শার্ট -- বগলের কাছটায় ঢিলে, কলার ওলটানো। হাঁটার সময় একটু ঝুঁকে পড়ে সে। কিন্তু না হাঁটন, না বলিরেখা, না পাকা চুল তাকে বুড়িয়ে দিয়েছে: আমাদের শ্রান্তি আর অবসাদের কোনো ছাপ নেই তার মুখে; একটু ছোট চোখের দৃষ্টিটি তীক্ষ্ন, ব্যঙ্গের স্বল্প আভাস তাতে। তাকে দেখে নাতালিয়ার মনে পড়ত সেই সার্বীয় বুড়ো লোকটির কথা যে একবার বেহালা-বাজিয়ে একটি বাচ্চা ছেলের সঙ্গে সুখদলে এসেছিল।

ইউক্রেনীয় স্ত্রীলোকটির নাম মারিনা, কিন্তু সুখদলের লোক তাকে উঠন-ঠেঙ্গা বলে ডাকে। বয়স পঞ্চাশ, লম্বা দোহারা চেহারা। গালের হাড় উঁচু, মুখের নরম ত্বক হলদে-তামাটে, সুখদলসুলভ নয়, মুখটা একটু কর্কশ হলেও পরিষ্কার গড়ন আর কঠোর চোখের দীপ্তির জন্য দেখতে প্রায় সুন্দর — চোখজোড়া সুলেমানী পাথর বা হলদে-ধূসর রঙের, বেড়ালের চোখের মতো রঙ বদলায়। লাল ছোপ দেওয়া কালো-সোনালি রঙের রুমাল মাথায়

চুড়ো করে বাঁধা; পায়ে আর পেছনে আঁটো করে বসা খাটো কালো স্কার্ট, সাদা ব্লাউজটা আরো সাদা দেখায় তাতে। নাল লাগানো জুতো, মোজার বালাইবিহীন পায়ের গোছ গোলগাল হলেও পাতলা গোছের, রোদে পুড়ে তাতে তামাটে চকচকে কাঠের মতো একটা ভাব। কাজ করতে করতে ভুরুজোড়া কুঁচকিয়ে, জোরালো ভরাট কণ্ঠে যখন সে গাইত পচায়েভে যবন আক্রমণ*) আর ঈশ্বর জননী কর্তৃক পবিত্র মঠ রক্ষার সেই গানটা

পচায়েভের দেয়াল পারে
সান্ধ্য আভা গেল নেমে,

তখন তার গলায় একাধারে আসত এমন একটা বিষণ্ণ হতাশা, মহিমা ও বলিষ্ঠ প্রতিরোধের ঝংকার যে তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারত না নাতালিয়া, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত ভয়েভক্তিতে মন্ত্রমুগ্ধভাবে।

ওদের ছেলেপুলে ছিল না; আর নাতালিয়া তো বাপ-মা হারা। সুখদলীয় কোনো দম্পতির কাছে থাকলে তারা কখনো তাকে 'পুষ্যি মেয়ে' আবার কখনো 'ছিঁচকে চোর' বলে ডাকত, একদিন সোহাগ আর পরের দিন গালিগালাজ। তার সঙ্গে ইউক্রেনীয় সেই দম্পতির ব্যবহার কিন্তু ছিল প্রায় নিস্পৃহ অথচ সঙ্গত। না ছিল তাদের অতিমাত্রায় কৌতূহল, না ছিল বকবকানি। হেমন্তে কালুগা থেকে শস্য কাটা আর মাড়াইয়ের জন্য ভাড়া করে আনা হত গুটি কতক কিশোরী আর বয়স্থাকে, ফুলকাটা রঙীন সারাফানের জন্য তাদের বলা হত 'খুকুমণি'। এই খুকুমণিদের সঙ্গ এড়িয়ে চলত নাতালিয়া: লোকে বলত ওদের চরিত্র

খারাপ, কুৎসিত, নানা রোগে ওরা দুষ্ট, ভরাট-বুক, বেয়াড়া ও নির্লজ্জ তারা, খিস্তিখেউড় আর অশ্লীল ছড়া কাটার বিরাম নেই. পুরুষদের মতো করে বসে পাগলের মতো ঘোড়া ছোটায়। পরিচিত পরিবেশে মনের কথা খুলে বলতে পারলে অশ্রুজলে আর গানে তার বিষাদ হয়ত কেটে যেত। কিন্তু এখানে মনের কথা বলার মতো কে বা আছে, কে বা আছে যার সঙ্গে গান গাওয়া যায়? কর্কশ গলায় খুকুমণিরা হয়ত গান ধরল একটা, আর বাকি সবাই সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিত তালকাটা চড়া গলায়, চলত চিৎকার আর শিস দেওয়া। নাচের ঠাট্টার ছড়া ছাড়া আর কিছু গাইত না শারি। আর মারিনা গান গাইলেও, হোক না কেন প্রেমের গান, চেহারাটা তার হয়ে যেত কঠোর, গর্বিত ও চিন্তায় বিষন্ন।

উইলো আমি পুঁতেছিলাম জলের কিনারে
কুলুকুলু গভীর নদীর পারে, —

হতাশ করুণ স্বরে হয়ত সে আওড়াত, তারপর গলা নামিয়ে যোগ দিত কঠিন নিরাশায়:

নেইকো আমার
মনের মানুষ
ভালোবেসেছি যাকে...

আর নিরালায় নির্জনে অপরিতৃপ্ত প্রথম প্রেমের তিক্ত-মধুর বিষ ধীরে ধীরে আকণ্ঠ পান করল নাতালিয়া, জ্বালা সইল লজ্জা আর হিংসার, রাত্রে দেখা নানা শঙ্কিত মধুর স্বপ্নের, ধুধু স্তেপের নিঃশব্দ দিনে তাকে দগ্ধে

দেওয়া কত ব্যর্থ কল্পনা আর আশার। থেকে থেকে অন্তরের জ্বালা মিলিয়ে গিয়ে আসত মধুর কোমলতা, তীব্র আবেগ ও হতাশার জায়গায় বশ্যতা, ওঁর কাছাকাছি নগণ্য, তুচ্ছভাবে থাকার বাসনা, ভালোবাসার কামনা, যে ভালোবাসা কখনো ধরা পড়বে না দুনিয়ার চোখে, কোনো দাবীদাওয়া বা প্রত্যাশা নেই যে ভালোবাসার। সুখদল থেকে আসা খবরাখবরে কিছুক্ষণের জন্য মনটা স্থির হয়ে যেত। কিন্তু অনেকদিন কোনো খবর না আসাতে সুখদলের জীবনযাত্রার মামুলি দিকটার কথা তার মনে রইল না — আর মনে হতে লাগল সে জীবনটা কত সুন্দর, আর সে জীবনের প্রতি তার ব্যাকুলতা এত তীব্র যে নিজের নৈঃসঙ্গ আর বিষাদের ভার প্রায় অসহ্য হয়ে উঠল।... তারপর হঠাৎ গের্ভাস্কার আবির্ভাব। সুখদলের সব খবর এক নিঃশ্বাসে তড়বড় করে জানাল তাকে, আধঘণ্টায় যা বলল সেটা বলতে অন্য লোকের গোটা দিনের বেশী লাগত — সব কিছু বলল, এমনকি ঠাকুর্দাকে সেই 'মারাত্মক ধাক্কার' কথাটাও, তারপর দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করল:

'এবার চিরতরে বিদায় নিচ্ছি।'

তারপর হতভম্ব নাতালিয়াকে প্রকাণ্ড চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টিতে পুড়িয়ে রাস্তায় যেতে যেতে ডেকে বলল:

'তোরও বোকামি ঝেড়ে ফেলার সময় হয়েছে! ওর তো বিয়ে হল বলে, আর মাগী হিসেবেও ওর কোনো কাজে তুই লাগবি না।... ঘটে বুদ্ধিশুদ্ধি আন তুই।'

আর তাই করল। ভয়াবহ খবরটা সইয়ে সামলে নিল — ঘটে বুদ্ধিশুদ্ধি ফিরে এল।

তারপর বিরস বিষণ্ণ দিনগুলো আর কাটে না যেন,

দিনগুলো তীর্থযাত্রী স্ত্রীলোকদের মতো, যারা বড়ো রাস্তা হয়ে মন্থর পায়ে খামার পেরোয়, মাঝে মাঝে জিরোবার জন্য থেমে অনেকক্ষণ কথা বলে তার সঙ্গে বলে ধৈর্য ধরো, পরমেশ্বরের নামোচ্চারণ করে বিরস একটা অভিযোগের সুরে, বলে, সবচেয়ে বড়ো কথা হল: কিছু না ভাবা।

'যাই ভাবো না কেন — আমাদের ভাবনা মতো তো কিছু হয় না,' তারা বলত, গাছের ছালের জুতো আবার বেঁধে নিয়ে. ফ্যাকাসে মুখ কুঁচকিয়ে অন্তহীন স্তেপের দিকে সখেদে তাকিয়ে। 'ঈশ্বরের করুণা অপার।... চুপিচুপি কয়েকটা পেঁয়াজ এনে দাও তো. এই তো লক্ষ্মী মেয়ে।...'

এমন সব তীর্থযাত্রীও অবশ্য ছিল যারা তার পাপের কথা, পরলোকের কথা তুলে ধর্মভয় জাগাত তার মনে, ভয়াবহ নানা দুর্বিপাক ঘটার ভবিষ্যদ্বাণী করত। তখন একবার দুটো ভয়ংকর স্বপ্ন সে দেখে, বলতে গেলে একটার পর একটা। মনটা সর্বদা পড়ে থাকত সুখদলে — গোড়ার দিকে সুখদলের কথা না ভাবা কঠিন ছিল বৈকি! — মাথায় ঘুরত তোনিয়া দিদিমণি আর ঠাকুর্দার কথা, নিজের ভবিষ্যতের কথা, গণনা করত তার বিয়ে হবে কিনা, আর হলে কবে এবং কার সঙ্গে হবে।... ভাবনাচিন্তা অজান্তে একাকার হয়ে গেল স্বপ্নে একটি রাত্রে, পরিষ্কার দেখল ধুলোভরা উত্তপ্ত আর সশঙ্ক হাওয়ায় দামাল একটি সন্ধ্যায় দুটো বালতি হাতে জল আনতে পুকুরে দৌড়চ্ছে সে — হঠাৎ শুকনো কাদার ঢালুতে চোখে পড়ল প্রকাণ্ড-মাথা বিকট একটা বুড়ো বামন — ছিন্নভিন্ন টপবুট পায়ে, টুপি নেই, লাল উস্‌কো-খুস্‌কো চুল হাওয়ায় এলোমেলো,

টকটকে লাল, বেল্ট-না-বাঁধা শার্ট হাওয়ায় উড়ছে পেছনে। 'মা গো, আগুন লেগেছে নাকি?' ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে। গরম হাওয়ায় চাপা কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল বামনটাও: 'সর্বনাশ, সব খতম! ভয়ঙ্কর মেঘ ঘনাচ্ছে! বিয়ের কথা ভুলেও ভাবিস না!..' অন্য স্বপ্নটি আরো ভয়াবহ: ফাঁকা গরম একটা কুঁড়েঘরে দুপুরবেলায় সে দাঁড়িয়ে, বাইরে থেকে কে একজন দরজাটা বন্ধ করে রেখেছে শক্ত করে। সে রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষায় আছে কীসের যেন — হঠাৎ চুল্লির পেছনা থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল একটা প্রকাণ্ড ছাই-রঙা ছাগল, পেছনের পায়ে দাঁড়িয়ে — সটান এল তার দিকে, উত্তেজনায় অশ্লীল চোখদুটো জ্বলছে কয়লার টুকরোর মতো, আনন্দে পাগল আর কাকুতি-মিনতিতে ভরা। 'আমি তোর নাগর!' মানুষের গলায় চেঁচিয়ে দ্রুতপায়ে লাফাতে লাফাতে এল তার কাছে, পেছনের পায়ের ছোট ছোট খুরে চকিত খটখট শব্দ তুলে, তার পর ঝপাং করে সামনের পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার বুকে।...

এরকম স্বপ্নের পর বারান্দার খাটে লাফিয়ে উঠে হৃৎপিণ্ডের দাপানিতে, অন্ধকারের আতঙ্কে আর এই ভাবনায় যে, কারো কাছে তার যাবার নেই, নাতালিয়া প্রায় মরে মরে।

'হে যীশু! হে ঈশ্বর জননী! দোহাই তোমাদের মুনি ঋষিরা!' তাড়াতাড়ি ফিসফিসিয়ে বলে উঠত সে।

কিন্তু যেসব মুনি ঋষিদের কথা মনে হত তারা সবাই সেণ্ট মার্কিউরির মতো কবন্ধ আর ঘোর তামাটে রঙের, আতঙ্ক তাই বেড়ে যেত।

পরে স্বপ্নগুলোর কথা ভেবে দেখাতে মনে হল তার যৌবন বিগত, কপালে যে ঘটবার তার নড়চড় হবে না কখনো — মনিবকে ভালোবাসার মতো অসাধারণ ঘটনা ঘটেছে তার বেলায়, এটা খামোকা! — সামনে আরো অনেক বাধা বিপদ, তার উচিত ইউক্রেনীয় দম্পতির সংযম ও তীর্থযাত্রী স্ত্রীলোকদের সহজ বিনয় অনুকরণ করা। আর নিজেদের কল্পিত কিছু একটা ভবিতব্য বলে ধরে নিতে, নাটকীয় ভূমিকায় নিজেদের দেখতে সুখদলবাসীরা ভালোবাসে বলে নাতালিয়াও নিজের জন্য বেছে নিল একটা ভূমিকা।

৮

সেণ্ট পিটার দিবসের আগের দিন সন্ধ্যায় প্রবেশপথে দৌড়িয়ে এসে যখন নাতালিয়া বুঝল যে তাকেই নিতে এসেছে বদুলিয়া, চোখে পড়ল সুখদলের ধুলিধুসর ছ্যাকড়া গাড়িটা আর উসকো-খুসকো মাথায় জীর্ণ টুপি, রোদেজ্বলা জটপাকানো দাড়ি, ক্লান্ত ও উত্তেজিত বদুলিয়ার মুখ, সে মুখ অকালে বুড়ো আর কুৎসিত হয়ে গিয়েছে, এমনকি বেমানান ও হীন মুখাবয়বের জন্য অদ্ভুত হয়ে দাঁড়িয়েছে, যখন দেখল শুধু বদুলিয়া নয়, সুখদালের সবাইকার মতো দেখতে সেই ঝাঁকড়া লোম পরিচিত কুকুরটা, যার পেছন দিকটা নোংরা ছাই রঙের, বুক আর ঘাড় যেন চিমনিবিহীন কুঁড়েঘরের ধোঁয়া আর ঝুলিতে কালো হয়ে গিয়েছে, তখন আনন্দে নাতালিয়ার হাঁটু দুমড়ে যাবার জোগাড়। কিন্তু তাড়াতাড়ি নিজেকে সে

সামলে নিল। সুখদলের পথে বদুলিয়া উদ্দেশ্যহীন ভাসাভাসাভাবে বকবক করে বলে চলেছে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের কথা — একবার যুদ্ধটা নিয়ে মহাখুশি আবার পরমুহূর্তে বেজার। নাতালিয়া বুদ্ধিমানের মতো মন্তব্য করল:

'যাই বল, ওদের বেশ একটা শিক্ষা দেওয়া তো আমাদের উচিত, ফরাসীদের কথা বলছি।...'

বহুদূর সুখদলে যেতে যেতে সারা দিন তার মনে অদ্ভুত একটা অনুভূতি — নতুন চোখে দেখল পুরনো পরিচিত সব জিনিস। আগেকার বাসার কাছাকাছি এসে আবার ফিরে আসছে তার আগেকার জীবন, চোখে পড়ছে আশেপাশে কত না অদলবদল, চেনা মুখ। বড়ো রাস্তাটা যেখানে মোড় ঘুরে চলে গিয়েছে সুখদলে সেখানে হলদে ফুলে ভরা ফেলে রাখা জমিতে ছুটোছুটি করছে দু'বছর বয়সের একটা ঘোড়া। একটি ছেলে দড়ির লাগামটা খালি পা দিয়ে মাটিতে চেপে ঘোড়াটার ঘাড় আঁকড়ে অন্য পা দিয়ে লাফিরে ওঠার চেষ্টা করছে পিঠে, কিন্তু ঘোড়াটা নারাজ, লাফালাফি করে ঝাঁকিয়ে ফেলছে তাকে। ছেলেটি ফম্‌কা পান্তিউখিন। চিনতে পেরে নাতালিয়ার সে কী আনন্দ! তারপর দেখল একশ' বছরের বুড়ো নাজারুশ্‌কাকে। ফাঁকা গাড়িতে বসে আছে পুরুষের মতো করে নয়, স্ত্রীলোকের মতো — পাদুটো সটান সামনে ছড়িয়ে — আড়ষ্ট দুর্বলভাবে উঁচু হয়ে আছে কাঁধ, চোখজোড়া করুণ বিষণ্ণ, নিষ্প্রভ; এত রোগা যে 'কফিনে রাখার পদার্থ নেই আর', মাথায় টুপি নেই, জীর্ণ লম্বা কামিজটা চুল্লির তাকে অনবরত শুয়ে শুয়ে ঝুলকালিতে রঙচটা নীলচে। নাতালিয়ার বুকটা সিঁটিয়ে উঠল তিন

বছর আগেকার সেই ঘটনাটা মনে করে — সব্জীবাগানে একটা মুলো চুরি করে হাতেনাতে ধরা পড়েছে নাজারুশ্‌কা, সেই দুর্লভ দয়ালু ও দিলদরিয়া মানুষ আর্কাদি পেত্রোভিচের ইচ্ছে তাকে চাবকানো, ভয়ে আধমরা বুড়ো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে, চারপাশে জমায়েত চাকরবাকর হো-হো করে হাসছে আর চেঁচাচ্ছে:

'আর কী হবে, দাদু কান্না থামাও! মনে হচ্ছে পেণ্টুলুনটা খুলে ফেলতে হবে! রেহাই পাবে না তুমি!'

গাঁয়ের চারণ-ভূমি, কুঁড়েঘরের সারি — আর জমিদার বাড়ি: বাগান, বাড়ির উঁচু ছাদ, চাকরদের মহলের খিড়কির দেয়াল, গোলাঘর আর আস্তাবল এবার চোখে পড়াতে বুক কী ঢিপ-ঢিপ করতে লাগল! দেয়ালসংলগ্ন উঁচু ঘাস আর কাঁটা গাছের কাছ ঘেঁষে এসেছে শস্যফুলের ঘন ছোপ ধরা হলদে রাইক্ষেত; সাদা তামাটে ছোপের একটা বাছুর জইক্ষেতের গভীরে দাঁড়িয়ে শস্যফুল চিবিয়ে চলেছে। সব কিছু, শান্তিময়, সহজ সাধারণ — যা কিছু অসাধারণ, যা কিছু ব্যাকুলতা শুধু তার মনে। গাড়িটা গড়গড়িয়ে ঢুকল চওড়া আঙিনায়, এখানে-ওখানে ঘুমন্ত দৌড়বাজ কুকুরের সাদা সাদা ছোপ, কবরখানায় পাথরের সাদা ফলক যেন। দু'বছর পর মোমবাতি আর লাইম ফুলের প্রিয় গন্ধমাখানো ঠাণ্ডা সেই বাড়িটায় যখন সে ঢুকল, সেই ভাঁড়ার ঘর, সামনের হলে বেঞ্চের ওপরে পড়ে আছে আর্কাদি পেত্রোভিচের কসাক জিনসাজ, জানলায় ভারুই পাখিগুলোর শূন্য খাঁচা — আর ঠাকুর্দার ঘর থেকে হলের কোণে স্থানান্তরিত সেণ্ট মার্কিউরির মূর্তিটা ভীতভাবে দেখে তার মন একেবারে অসাড় হয়ে গেল।...

বাগান থেকে রোদের ঝলক ছোট ছোট জানলা দিয়ে ঢুকে অন্ধকার হল-ঘরটাকে ঠিক আগেকার মতো খুশিতে আলো করে দিয়েছে। একটা মুরগীর ছানা ভুলক্রমে বাড়িতে ঢুকে পড়ে এখন ড্রয়িং-রুমে ঘুরে ঘুরে অসহায় ভাবে ডাকছে। লাইম ফুল শুকিয়ে গিয়ে জানলার উত্তপ্ত উজ্জ্বল ধারিতে সৌরভ ছড়াচ্ছে।... মনে হল তার চারিপাশের সমস্ত পুরনো জিনিসের বয়স কমে গিয়েছে, এরকমটা সাধারণত মনে হয়ে সেই বাড়িতে যেখানে সবে কেউ মারা গিয়েছেন। সব কিছুতে, সমস্ত কিছুতে — বিশেষ করে ফুলের গন্ধে — মনে হল লেগে আছে তার আপন সত্তার, তার শৈশব, কৈশোর, প্রথম প্রেমের রেশ। আর দুঃখ হল তাদের কথা ভেবে যাদের বয়স হয়েছে, যারা মৃত, যারা বদলে গেছে — দুঃখ হল নিজের জন্য, তোনিয়া দিদিমণির জন্য। সমবয়সী বন্ধুদের বয়স হয়েছে, মাঝে মাঝে চাকরদের মহলের দোরগোড়া থেকে বাইরের পৃথিবীর দিকে বিরস দৃষ্টিতে তাকাত যেসব বুড়োবুড়ী, বয়সের দরুন নড়বড় করত যাদের মাথা, তাদের অনেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে ইহলোক থেকে। দারিয়া উস্তিনভ্না আর নেই। ঠাকুর্দা বিদায় নিয়েছেন, সেই ঠাকুর্দা যিনি মৃত্যুকে ভয় পেতেন ছেলেমানুষের মতো, ভাবতেন মরণ আসবে আস্তে আস্তে, ভয়াল মুহূর্তের জন্য প্রস্তুতির সময় দিয়ে। কিন্তু মৃত্যু ভেঙে পড়ল তাঁর মাথায় কী অপ্রত্যাশিত আচমকা! বিশ্বাস করা কঠিন তিনি নেই। চেৌর্কিজভো গাঁয়ে গির্জার কাছাকাছি একটা মাটির স্তূপের নীচে পচে গেছে সাক্ষাৎ তাঁরই দেহ। বিশ্বাস করা কঠিন যে এই কালো, রোগা, চোখানাক মহিলাটি, যিনি এ মুহূর্তে উদাসীন, পরমুহূর্তে

উন্মত্ত, অস্থির বকুনতুড়ে, যিনি মাঝে মাঝে তার সঙ্গে সমকক্ষের মতো খোলাখুলি বাক্যালাপ করেন, আবার মাঝে মাঝে তার চুল টেনে ছিঁড়ে দেন — তিনিই হলেন তোনিয়া দিদিমণি। কালো গোঁফের রেখা মুখে বেঁটেখাটো ঝগড়ুটে জনৈক ক্লাভ্দিয়া মার্কভ্না বাড়ি দেখাশোনা কেন যে করছেন বোঝা ভার।... একদিন সভয়ে তাঁর শোবার ঘরে তাকিয়ে নাতালিয়া দেখল রুপোর ফ্রেমে বসানো সর্বনেশে সেই আয়নাটা — সঙ্গে সঙ্গে বুকটা মুচড়িয়ে উঠল মধুর ব্যথায়। তার পুরনো সব আতঙ্ক, আনন্দ, স্নিগ্ধতা, অপমান আর স্বর্গসুখের প্রত্যাশা. গোধূলির আলোয় শিশিরাসিক্ত চোরকাঁটার গন্ধ আচ্ছন্ন করে দিল তাকে।... কিন্তু নিজের সমস্ত অনুভূতি আর চিন্তাভাবনাকে গোপন রাখত সে, চেষ্টা করত তাদের দাবিয়ে রাখার। তার শিরায় শিরায় প্রবাহিত প্রাচীন, অতি প্রাচীন সুখদলের রক্তধারা! সাদামাটা সেই রুটি খেয়ে সে মানুষ হয়েছে, সুখদলের চারপাশের কাদাটে মাটিতে যার উৎস। সাদামাটা সেই জল সে খেয়েছে পুকুর থেকে, যেসব পুকুর শুকিয়ে যাওয়া নদীগর্ভ খুঁড়ে এককালে বানিয়েছিল তার পূর্বপুরুষেরা। হাড়ভাঙা গতানুগতিককে ডরায় না সে — ভয় পায় শুধু সেটাকে যেটা গতানুগতিক নয়। মৃত্যুভয়ও তার নেই: কিন্তু স্বপ্ন, রাত্রির অন্ধকার, ঝড় বিদ্যুৎ আর আগুন সারা শরীর তার ভয়ে থরথরিয়ে উঠত। বুকের কাছে শিশুর মতো কী একটা অমোঘ সর্বনাশের প্রতীক্ষা বহন করত সে।...

তাকে বুড়িয়ে দেয় এই প্রত্যাশা। নিজেকে সে বারবার বোঝাত যে যৌবন পার হয়ে গিয়েছে, সব কিছুতে খুঁজত

বিগত যৌবনের আভাস। ফিরে আসার পর বছর কাটতে না কাটতে সেই যৌবনসুলভ অনুভূতিটার লেশমাত্র রইল না, যে অনুভূতি নিয়ে আবার সুখদলের দোরগোড়া সে পেরিয়েছিল।

ক্লাভ্‌দিয়া মার্কভ্‌নার একটি সন্তান হল। হাঁসমুরগী দেখাশোনার ভার যার ওপরে সেই ফেদোসিয়ার পদোন্নতি হল, সে হল আয়া। বয়স কম হলে কী হয়, বার্ধক্যের কালো পোশাক গায়ে চাপিয়ে সে একটা দীনহীন ধর্মভীরু ভাব আনল চেহারায়। নতুন খুদে শিশুটির মুখে লালা ঝরে, ভুরভুরি কাটে, মাথার ভারে অসহায় টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে চেঁচায় তারস্বরে, দুধ-রঙা, অভিব্যক্তিহীন চোখ মেলে ঠিকমতো তাকাতে পারে না। অথচ তাকে দাদাবাবু বলে ডাকতে শুরু করেছে লোকে — আর ছোটদের ঘর থেকে শোনা যায় অনুচ্চকণ্ঠে সেই আদ্যিকালের শাসানি:

'ওই এল, ওই এল ঝোলাহাতে বুড়োটা... চলে যা বলছি বুড়ো, চলে যা। আসিস না আমাদের কাছে, দাদাবাবুকে নিয়ে যেতে দেব না তোকে; দাদাবাবু লক্ষ্মী ছেলে. আর কাঁদবে না।...'

আর নাতালিয়া নকল করত ফেদোসিয়াকে, মনে করত সে নিজেও আয়া — রুগ্‌ণা দিদিমণির আয়া ও সঙ্গী। সে শীতে দেহ রাখলেন ওল্‌গা কিরিলভ্‌না — চাকরদের মহলে যেসব বুড়ী জীবনের শেষ দিনগুলো গুনছে তাদের সঙ্গে অন্ত্যেষ্টিতে যাবার অনুমতি পেয়ে গেল নাতালিয়া। সেখানে বিস্বাদ, বেজায় মিষ্টি মধু দিয়ে ভাত খেয়ে গা ঘুলিয়ে উঠল তার, সুখদলে ফিরে, ভাবাবেগে পূর্ণ একটা

বর্ণনা দিল, 'মৃত্যুশয়ানে কেমন জীবন্ত দেখাচ্ছিল' কর্ত্রীকে, যদিও সেই বীভৎস দেহরাখা কফিনটার দিকে তাকাবার সাহস এমনকি বুড়ীগুলোর পর্যন্ত হয় নি।

বসন্তকালে চের্মাশ্নয়ে গ্রাম থেকে একটি ওঝাকে আনা হল তোনিয়া দিদিমণিকে দেখার জন্য — সে হল ডাকসাইটে ক্লিম ইয়েরাখিন, সমৃদ্ধ জোতদার, ভারিক্কি সুন্দর চেহারার মানুষ, দীর্ঘ ধূসর দাড়ি, কোঁকড়ানো পাকধরা চুল, মাথার মাঝখানে টেড়ি কাটা; চাষী হিসেবে বেশ দক্ষ, রোগশয্যার পাশে পিশাচসিদ্ধ ব্যক্তিতে নিজেকে রূপান্তরিত না করা পর্যন্ত তার কথাবার্তা বেশ যুক্তিসঙ্গত ও মোটের ওপর খোলাখুলি। পোশাক-আসাক অত্যন্ত টেকসই আর পরিচ্ছন্ন — ইস্পাতধূসর মোটা পশমের কুঁচি দেওয়া লম্বা কোর্তা, লাল কোমরবন্ধ একটা আর টপবুট। ছোট চোখজোড়া সেয়ানা আর তীক্ষ্ন। সুগঠিত দেহ একটু নুইয়ে বাড়িতে ঢুকে কাজের কথা শুরু করার সময় চোখদুটো ধর্মভীরুভাবে খুঁজত আইকনগুলোকে। শুরু করত ফসল, বৃষ্টি আর অনাবৃষ্টির কথা দিয়ে. তারপর অনেকক্ষণ ধরে পরিচ্ছন্নভাবে চলত চা-পান। কেবল এসবের পরই বুকে আবার ক্রুশচিহ্ন করে গলার সুর নিমেষে বদলে জিজ্ঞেস করত রোগীর বিষয়ে।

'গোধূলি... রাত্রি নামছে... সময় হয়েছে,' শুরু করত রহস্যভরা গলায়।

গোধূলির আলোয় শোবার ঘরে বসে তোনিয়া দিদিমণি অপেক্ষা করতেন কখন ক্লিম্‌কে দেখা যাবে দোরগোড়ায়, জ্বরে শরীর ঠকঠক করে কাঁপছে, যেকোনো মুহূর্তে মেঝেতে ধপাস করে পড়ে খিঁচুনি শুরু হতে পারে।

তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে নাতালিয়ারও সর্বাঙ্গ ভয়ে অসাড়। সারা বাড়িটা চুপ মেরে গেছে — এমনকি কর্ত্রী পর্যন্ত ঘর-ভর্তি ঝিদের সঙ্গে ফিসফিসিয়ে কথা চালিয়েছেন। বাতি জ্বালাবার বা জোরে কথা বলার সাহস নেই কারো। দরকারমতো ক্রিমের ফরমাশ খাটার জন্য দরদালানে সতর্ক দাঁড়িয়ে থাকা সেই হাসিখুসি ভাবনাচিন্তাহীন সলশ্‌কার চোখ গেল ঝাপসা হয়ে, হৃৎপিন্ডটা যেন বুকের ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। কয়েকটা মন্ত্রসিদ্ধ হাড় রুমাল থেকে বের করতে করতে সামনে দিয়ে গেল ক্রিম। তারপর সেই মৃত্যুস্তব্ধতা দীর্ণ হল শোবার ঘর থেকে আসা তার জোরালো, অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে:

'ওঠো, ঈশ্বরের বাঁদী!'

তারপর দরজা থেকে পাকাচুল মাথা বাড়িয়ে নিষ্প্রাণ সুরে বলল:

'সেই পিঁড়িটা।'

মেঝেতে পিঁড়ি পেতে তার ওপর দাঁড় করানো হল মৃত্যুহিম, আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখ তোনিয়া দিদিমণিকে। এত অন্ধকার তখন যে ক্রিমের মুখ প্রায় দেখতে পাচ্ছে না নাতালিয়া। আর হঠাৎ অদেহী, ভূতুড়ে গলায় সে সুর করে বলতে লাগল:

'ফিলাৎ আসছে... জানলাগুলো ও খুলবে... হাট করে খুলে দেবে দরজাগুলো... চিৎকার করে বলবে: মনপুড়ানি, মনপুড়ানি!'

আকস্মিক শক্তিতে, প্রভুত্বব্যঞ্জক ভয়ঙ্কর গলায় চেঁচিয়ে উঠল ক্রিম:

'মনপুড়ানি মনপুড়ানি! সর্বনেশে মনপুড়ানি, তুই চলে যা নীচের অন্ধকার বনে, সেখানে তোর জায়গা! চলে যা সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে,' — এবার তার অনুচ্চকণ্ঠ হল ক্ষিপ্র, কর্কশ ও ভয়ঙ্কর: 'ঝোড়ো বুয়ান দ্বীপ জল থেকে উঠেছে, তার ওপরে শুয়ে আছে একটা হোঁৎকা মাদী কুকুর, বিকট তার পিঠে ঘন ধূসর লোম।...'

আর নাতালিয়ার মনে হল এর চেয়ে বীভৎস কথা হতে পারে না কখনো। শব্দগুলো নিমেষে তার আত্মাকে নিয়ে গেল বন্য, উপকথায় বর্ণিত, আদিম কর্কশ কোনো পৃথিবীর সীমানায়। শব্দগুলোর যাদুমন্ত্রে অবিশ্বাস করা অসম্ভব, ঠিক যেমন ক্রিমের নিজের পক্ষেও অসম্ভব। মনের ব্যামো যাদের, তাদের তো এসব শব্দের সাহায্যে অলৌকিকভাবে মাঝে মাঝে সারায় ক্রিম — সেই ক্রিম যে পিশাচসিদ্ধ ক্রিয়ার পর হল-ঘরে বসে কথা বলে কত সহজ বিনয়ে, রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে আবার চা খেতে শুরু করে:

'যাক, আরো দুটো রাত্তির।... তারপর ভগবানের কৃপায় হয়ত উনি আগের চেয়ে ভালো বোধ করবেন।... এ বছরে বাক্‌হুইট কিছু বুনেছেন নাকি, ঠাকরুন? লোকে বলছে এ বছরে ফলেছে ভালো! বেজায় ভালো!'

দাদাবাবুদের ক্রিমিয়া থেকে গ্রীষ্মকালে ফেরার কথা। কিন্তু রেজিস্টারি চিঠিতে আর্কাদি পেত্রোভিচ আরো টাকা চেয়ে পাঠালেন, জানিয়ে দিলেন হেমন্তের আগে ফিরতে পারবেন না — কেননা পিওত্‌র পেত্রোভিচ অল্প জখম হলেও অনেক দিন তাঁকে শুয়ে থাকতে হবে। তাঁর আরোগ্য হবে কিনা জানার জন্য লোক পাঠানো হল

চোর্কিজভোর সেই দৈবজ্ঞ মেয়েমানুষটি দানিলভ্নার কাছে। নেচে নেচে আঙুল মটকাতে লাগল দানিলভ্না, তার মানে অবশ্য: আরোগ্য হবে। কর্ত্রী সান্ত্বনা পেলেন। তোনিয়া দিদিমণি ও নাতালিয়ার সে নিয়ে কোন গরজ ছিল না। গোড়ার দিকে একটু ভালো বোধ করেছিলেন তোনিয়া দিদিমণি, কিন্তু সেণ্ট পিটার দিবসের মুখে আবার যে কে সেই: সেই মনমরা ভাব, ঝড় বিদ্যুৎ, আগুন আর গোপন আরেকটা কিসের মনপোড়ানি এত নিদারুণ যে ভাইদের নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর হল না তাঁর। মাথা ঘামাবার মতো মনের অবস্থা নাতালিয়ারও ছিল না। প্রার্থনার সময় পিওত্র পেত্রোভিচের কথা ভুলত না সে, কামনা করত তাঁর দ্রুত আরোগ্য, যেমন পরে আমরণ সে প্রার্থনা করেছিল তাঁর অবিনশ্বর আত্মার জন্য। কিন্তু এখন তার কাছে সবচেয়ে বড়ো জিনিস হল তোনিয়া দিদিমণি। যত দিন যায় তত তোনিয়া দিদিমণি তার মধ্যে সংক্রামিত করে দিতে লাগলেন তাঁর সেই আতঙ্ক, সর্বনাশের প্রত্যাশা — আর সেই জিনিসটার পূর্বাভাস, যেটার কথা তিনি গোপন করে রেখেছিলেন।

শুকনো, ধুলোভরা আর হাওয়ায় দামাল সেবারের গ্রীষ্মকাল, প্রতিদিন ঝড় বিদ্যুৎ। ভাসা-ভাসা আর ভয় জাগানো কানাকানির বিরাম নেই — নতুন একটা লড়াই বেধেছে নাকি, সিপাইবিদ্রোহ আর অগ্নিকাণ্ডের কানাঘুষো। কেউ বলছে যে সমস্ত ভূমিদাসদের ছেড়ে দেওয়া হল বলে, কেউ বা বলছে তা নয় মোটে, হেমন্তকালে ওদের সবাইকে যোগ দিতে হবে সৈন্যবাহিনীতে। আর বরাবরকার মতো, গ্রীষ্মকালে ভবঘুরে, বোকাহাবা আর

সাধুদের ভিড় লেগে গেল। তাদের রুটি আর ডিম দেওয়া নিয়ে তোনিয়া দিদিমণি কর্ত্রীর সঙ্গে হাতাহাতি করেন আর কি। লম্বা, লালচুল দ্রনিয়া এসে হাজির — জামাকাপড় এত ছেঁড়া যে বর্ণনা করা যায় না। লোকটা আসলে মাতাল কিন্তু ভাবটা সাধুর। চিন্তামগ্নভাবে উঠোন হয়ে সটান বাড়ির দিকে আসতে গিয়ে দেয়ালে মাথা ঠুকে যাওয়াতে আনন্দোজ্জ্বল মুখে লাফিয়ে পেছন হটে গেল।

'লক্ষ্মী পাখিরা আমার!' লাফিয়ে সমস্ত শরীর বেঁকিয়ে, রোদ থেকে মুখ ডান হাতের আড়াল করে চড়া গলায় চেঁচিয়ে উঠল। 'চল ওড়া যাক, উড়ে একেবারে স্বর্গে যাওয়া যাক, পাখিসব আমার!'

নাতালিয়া তাকিয়ে রইল তার দিকে, সাধুদের দিকে যেভাবে তাকানো উচিত সেভাবে, অন্য সব মেয়েদের মতো: নিষ্প্রভ করুণামাখা চোখে। এদিকে তোনিয়া দিদিমণি তীরের মতো জানলায় হাজির হয়ে কাঁদতে কাঁদতে করুণ গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন:

'আহা, সাধুবাবা! আমার জন্য প্রার্থনা করো, এই পাতকীর জন্য মন্ত্র পড়ো!'

চিৎকারটা শুনে ভয়াবহ কী একটা পূর্ববোধে নাতালিয়ার চোখদুটো নিশ্চল হয়ে গেল।

ক্লিচিনো গ্রাম থেকে তিমোশা ক্লিচিন্‌স্কিও এসে জুটত। বেঁটেখাটো, মেয়েদের মতো নধর, বড়ো বড়ো বুকের ঢিবি, ছোট্ট মানুষটা, হলদেটে চুল, মেদে অসাড় রুদ্ধশ্বাস, টেরা বাচ্চার মতো মুখ। পরনে সাদা ক্যালিকোর শার্ট, ক্যালিকোর খাটো পেন্টুলুন; লঘু পায়ে তাড়াতাড়ি প্রবেশপথে এসে আঙুল এগিয়ে গোলগাল ছোটখাটো পা

তাড়াহুড়ো করে আলতোভাবে রাখল, সরু ছোট চোখের ভাবটা এমন যেন এইমাত্র তাকে পাতাল থেকে বা অন্য কোনো নিদারুণ দুর্বিপাক থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

'সর্বনাশ!' রুদ্ধশ্বাসে অনুচ্চকণ্ঠে বলে উঠল। 'সর্বনাশ।...'

ওকে সান্ত্বনা দিয়ে খাইয়ে লোকে বসে রইল, কী বলে শোনার প্রতীক্ষায়। কিন্তু মুখে কোনো কথা নেই তার, ঘোঁৎঘোঁৎ হাঁসফাঁস করছে শুধু খাবার নিয়ে। পেট পুরে খেয়ে, থলেটা কাঁধে আবার ঝুলিয়ে লম্বা লাঠিটার জন্য অস্থিরভাবে তাকাতে লাগল এপাশ-ওপাশ।

'তুমি আবার কবে আসছ, তিমোশা?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তোনিয়া দিদিমণি।

আর সেও জবাব দিল চেঁচিয়ে বিদ্ঘুটে উঁচু মেয়েলী গলায়, কেন জানি তোনিয়া দিদিমণির নামটা বিকৃত করে:

'ইস্টার রবিবারের আগের হপ্তায়, লুকিয়ানভ্না!'

চলমান লোকটির পিছু ডেকে অতিদুঃখে কাঁদতে লাগলেন তোনিয়া দিদিমণি:

'সাধুবাবা, এই পাতকী, মিসরীয় মেরির জন্যে প্রার্থনা করো ভগবানের কাছে!'

রোজ একটা না একটা দারুণ দুঃসংবাদ আসে — প্রচণ্ড ঝড় বা অগ্নিকাণ্ডের খবর। আর সুখদলে উত্তরোত্তর বেড়ে যায় আগুনের আদিম আতঙ্ক। পেকে-আসা শস্যের কালুকা-হলুদ সমুদ্রে হয়ত ছায়া পড়ল জমিদার বাড়ির পেছনে উদ্যত ঝড়ো মেঘের, চারণ-ভূমি হয়ে ছুটে এল দমকা হাওয়া, শোনা গেল বজ্রের প্রথম গুরুগুরু ধ্বনি, সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা ছুটবে বাড়িতে কালো কাঠের

আইকনগুলো বের করে আনতে আর দুধের ঘটি ঠিক করে রাখতে — সবাই তো জানে এসব হল আগুনের সেরা তুকতাক। জমিদার বাড়ি থেকে একটার পর একটা কাঁচি উড়ে পড়বে বিছুটি ঝাড়ে, ঝুলিয়ে দেওয়া হবে পূত ভয়ঙ্কর তোয়ালেটা, জানলাগুলো ঢাকা পড়বে পর্দায়, কম্পিত হাতে জ্বালানো হবে মোমবাতি।... এমনকি কর্ত্রীর মনে পর্যন্ত ছোঁয়াচ লাগে আতঙ্কের, সত্যি লাগে হয়ত, কিম্বা হয়ত লাগার ভান করেন। আগে তিনি বলতেন ঝড় বিদ্যুৎ — 'প্রাকৃতিক ঘটনা'। আর এখন বিদ্যুতের প্রতি ঝলকে তিনি ক্রুশচিহ্ন করে শক্ত করে চোখ বুজে হাঁপান, নিজের এবং অন্যদের ভয় বাড়ানোর জন্য বলে যান একটি অদ্ভুত ঝড়ের কথা, যে ঝড়ে ১৭৭১ সালে টিরলে একশ' এগারো জন লোক তখ্খুনি মারা পড়ে। আর তাঁর কাহিনীটি জোরালো করে অন্যেরা — তাড়াতাড়ি নিজেদের নানা গল্প জোগায়: বাজ পড়ে বড়ো রাস্তার উইলো গাছটা পুড়ে গিয়েছিল, চের্কিজভোতে একটি স্ত্রীলোক মারা যায় বজ্রাঘাতে, একটি ত্রোইকায় এত জোর বাজ লেগেছিল যে তিনটে ঘোড়াই হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়।... শেষ পর্যন্ত তাদের এই অসুস্থ ধ্যান-ধারণায় যোগ দিল ইউশ্কা বলে একটি লোক, যে নিজেকে বলত 'ভ্রান্ত সাধু'।

৯

চাষীর পরিবারে ইউশ্কার জন্ম। কিন্তু জীবনে সে কাজের জন্য কুটোটি নাড়ায় নি কখনো; ভবঘুরের মতো থাকত, কেউ খেতে পরতে দিলে প্রতিদানে বলত নিজের

নিছক কুঁড়েমি আর 'কুব্যবহারের' নানা কাহিনী। — 'চাষীর ছেলে বটে দোস্ত, কিন্তু চালাক চতুর লোক আমি, দেখতে কুঁজোর মতো,' সে বলত। 'তাই খাটুনির দরকারটা কী আমার?'

আর সত্যি তাকে দেখতে কুঁজোর মতো — চোখজোড়ায় বুদ্ধি ব্যঙ্গের ছাপ, মুখে দাড়িগোঁফের বালাই নেই, বুকের খাঁচা রিকেটগ্রস্ত বলে কাঁধ উঁচিয়ে রাখে, নখ কামড়ে, পাতলা শক্ত আঙুলে বারবার লম্বা তামাটে চুল পেছন দিকে বিলি কাটে। চাষবাস 'অভব্য আর বিরক্তিকর' ব্যাপার ভেবে কিয়েভ মঠে*) আশ্রয় নেয়, সেখানে 'বুদ্ধি পাকিয়ে' — শেষাশেষি 'কুব্যবহারের' জন্য বিতাড়িত হয়। তারপর তার হৃদয়ঙ্গম হল মোক্ষ প্রয়াসী ধার্মিক তীর্থযাত্রীর ভূমিকাটা বড়ো পুরনো চাল, হয়ত ওতে ফয়দা হবে না কোনো; তাই খেলল আর একটা চাল: জোব্বা না ছেড়েই নিজের আলসেমি আর লাম্পট্য নিয়ে বড়াই চলল, আর যত পারে ধূমপান আর মদ্যপান — কখনো নেশা হত না তার — মঠ নিয়ে মস্করা করে, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিত কেন ওখান থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

'অবশ্য,' চোখ ঠেরে চাষীদের সে বলত, 'ওটার জন্য তখ্‌খুনি অবশ্য বের করে দেয় আমাকে, ভগবানের এ দাসকে। আর তাই নিজের দেশ, রাশিয়াতে ফিরে এলাম।... ভাবলাম পথে বসব না!'

আর পথে যে বসল না — তা ঠিক: মোক্ষলাভ নিয়ে যারা ব্যস্ত তাদের যেমন সাদর অভ্যর্থনা জানায় রাশিয়া ঠিক তেমনি জানাল এই নির্লজ্জ পাপীটিকে:

মিলল খাওয়াপরা, রাতের ঠাঁই, আর মুগ্ধ শ্রোতা।

'আর তাই বুঝি কখনো কাজ করবে না বলে দিব্যি গাললে?' চাষীরা জিজ্ঞেস করত, রোমাঞ্চকর গোপন কথার প্রত্যাশায় চোখগুলো তাদের চকচক করে ওঠে।

'স্বয়ং শয়তান আমাকে দিয়ে কাজ করাক দেখি!' জবাব দিল ইউশ্‌কা। 'আমি গোল্লায় গেছি, ভাই! আমার ভেতরে যা পাপ মঠের ছাগলেরও তা নেই। ছুঁড়ীগুলো — মাগীগুলোতে আমার একদম অরুচি! — আমাকে যমের মতো ডরায় বটে, কিন্তু ভালোবাসতে ছাড়ে না। আর বাসবেই না কেন! লোকটা তো আমি খারাপ নই: দেখতে না হয় খারাপ, কিন্তু আসল মাল আছে ভেতরে।'

সুখদলে পৌঁছিয়ে, ঝানু লোক তো সে সটান গেল জমিদার বাড়িতে, হল-ঘরে। সেখানে বেঞ্চে বসে নাতালিয়া গুণগুণ করে গাইছিল: 'মেঝেতে সেদিন দিচ্ছি ঝাড়, পেলুম টুকরো শর্করার...' ওকে দেখে ভয়ে চমকে উঠল:

'কে তুমি?' চেঁচিয়ে বলল সে।

'মানুষ,' এক নজরে তার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল ইউশ্‌কা। 'মা ঠাকরুনকে খবর দে।'

'কে রে?' ড্রয়িং-রুম থেকে চেঁচিয়ে কর্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন।

কিন্তু নিমেষে তাঁর ভয় ঘোচাল ইউশ্‌কা। বলল যে সে ভূতপূর্ব সাধু, তিনি যে ভেবেছেন পালিয়ে-আসা সৈনিক তা নয়, এখন দেশে ফিরছে — বলল তাকে তল্লাস করে পরে যেন রাত্তিরটা কাটিয়ে একটু জিরিয়ে নেবার অনুমতি দেন। তার খোলাখুলি কথাবার্তায় কর্ত্রী এত বিমোহিত হয়ে গেলেন যে, পরের দিনই সে চাকরদের মহলে জুটে

গিয়ে দিব্যি বাড়ির লোকের মতো থেকে গেল। বাজপড়া ঝড় সমানে হতে লাগল বটে, কিন্তু গৃহকর্ত্রীদের মনোরঞ্জনের জন্য গল্প বলে সে চলল অক্লান্তভাবে, বাজপড়ার হাত থেকে ছাদটা বাঁচাবার জন্য বাইরের জানলাগুলোয় কাঠ লাগাবার ফন্দি বের করল সে, ভীষণ বজ্রপাতের মধ্যে ছুটে যেত প্রবেশপথে — এমন কিছু বিপদ নেই সেটা দেখানো চাই। আর চাকরানীদের সাহায্য করত সামোভার জ্বালাতে। চাকরানীরা ভুরু কোঁচকাত, তাদের দিকে ওর ক্ষিপ্র কামুক দৃষ্টির বিষয়ে সজাগ তারা, কিন্তু ওর মস্করায় হাসত, ওর দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহস ছিল না নাতালিয়ার; অন্ধকার দরদালানে তাকে দেখে কয়েকবার ইউশ্‌কা তাড়াতাড়ি ফিসফিসিয়ে বলেছে: 'তোর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি একেবারে!' দেখলে ঘেন্না হত নাতালিয়ার; সারা জোব্বাটায় বাজে তামাকের ঝাঁঝালো গন্ধ, কী ভীষণ লোকটা, কী ভীষণ!..

কী ঘটবে স্পষ্ট জানত সে। তোনিয়া দিদিমণির শোবার ঘরের দরজার কাছে দরদালানে একলা ঘুমোত সে। ইতিমধ্যে ফিসফিসিয়ে ইউশ্‌কা বলেছে তাকে: 'আমি আসবই। তুই খুন করলেও আসব। আর চেঁচিয়েছিস কি, বাড়িটা পুড়িয়ে ছারখার করে দেব।' কিন্তু তার মানসিক বল সবচেয়ে বেশী করে যেটা ক্ষইয়ে দিচ্ছিল সেটা হল অমোঘ কিছু একটা যে আসন্ন তার উপলব্ধি, সোশ্‌কিতে সেই বীভৎস ছাগলের স্বপ্ন শিগ্‌গির সত্যি হবে, তোনিয়া দিদিমণির সঙ্গে একত্রে বিলুপ্ত হওয়াটা তার কপালে লেখা, এই উপলব্ধি। কারো তো আর জানতে বাকি নেই এখন: রাত্রে বাড়িতে খাস শয়তানের আস্তানা। সবাই

জানে, ঝড় বিদ্যুৎ, আগুন ছাড়া আর কী পাগল করে দিচ্ছে তোনিয়া দিদিমণিকে, কেন ঘুমের মধ্যে তিনি বুনোর মতো লালসায় গোঙিয়ে লাফিয়ে উঠে এত ভয়ঙ্কর চিৎকার ছাড়েন যে বিকট বজ্রপাতের আওয়াজ পর্যন্ত চাপা পড়ে। তারস্বরে তিনি চেঁচাচ্ছেন: 'এডনের সাপ, জেরুজালেমের সাপটা আমার গলা টিপে মেরে ফেলল রে!' রাত্রে ছুকরী ও যুবতীদের ঘরে আসা সেই পাঁঠাটা, সেই শয়তানটা ছাড়া সাপটা আর কী হতে পারে? বাদলা রাত্রে বজ্রের অবিরাম গুরুগুরু ধ্বনি, কালো আইকনগুলোর ওপর বিদ্যুৎচমক, সে সময় অন্ধকারে তার আগমনের চেয়ে ভয়াবহ আর কী হতে পারে দুনিয়ায়? কামের তাড়নার তীব্র আবেগে নাতালিয়ার কানে তার সেই ফিসফিসানি, সেটাও তো অমানুষিক: কী করে রোখা যায় তাকে? দরদালানে মোটা কাপড়ের ওপর বসে, সর্বনাশের অমোঘ মুহূর্ত কখন এসে পড়বে তার ভাবনায় দুরুদুরু বুকে অন্ধকারে চোখ মেলে থেকে, ঘুমন্ত কড়ির কাঠের তক্তার সামান্যতম কিঁচকিঁচ বা খসখসানি শোনার জন্য কান পেতে থেকে তার সেই ভবিষ্যৎ দীর্ঘকালব্যাপী কঠিন ব্যাধির প্রথম আক্রমণের উপলব্ধি ইতিমধ্যে হল: একটা পায়ের তলা হঠাৎ শিরশির করে ওঠে, একটা তীক্ষ্ম ছুঁচ ফোটানো আড়ষ্টভাব পায়ের আঙুলগুলো দুমড়ে মুচড়ে দেয় — খিঁচুনীটা স্নায়ুশিরাকে মধুর নির্দয়ভাবে মুচড়ে পা বেয়ে সড় সড় করে ওঠে একেবারে গলা পর্যন্ত, আর এক নিমেষে মনে হয় চেঁচায় পাগলের মতো — উচ্ছ্বাস আর যন্ত্রণার তেমন আবেগে কখনো চেঁচান নি এমনকি তোনিয়া দিদিমণি।...

আর যা অমোঘ তা ঘটল। ইউশ্কা এল — গ্রীষ্মের শেষাশেষি তখন, মশাল-ছোঁড়া প্রাচীন সেণ্ট ইলিয়া দিবসের আগের ভয়াবহ রাত্রে। ঝড়বৃষ্টি হয় নি সে রাত্রে, ঘুম ছিল না নাতালিয়ার চোখে। একটু ঢুলুনি এসেছিল -- হঠাৎ জেগে উঠল, কার ধাক্কায় যেন। রাত্রের সেই নিশুতি প্রহর — নিজের উন্মত্ত হৃৎস্পন্দনে টের পেল। তড়াক করে উঠে দরদালানের এদিক-ওদিক দেখে নিল একবার: যে দিকে তাকায় সে দিকে আকাশ, নিঃশব্দ, জ্বলন্ত আর রহস্যময় আকাশ, সোনালি আর ফিকে নীল চোখ-ধাঁধানো ঝলকে দপ করে উঠছে, জ্বলজ্বল করছে, কাঁপছে। মিনিটে মিনিটে দরদালান আলো হয়ে যাচ্ছে দিনের বেলার মতো। দৌড়তে গিয়ে — স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে পড়ল নাতালিয়া: উঠোনে অনেক দিন গাদা করে রাখা এ্যাস্প্ গাছের কুঁদোগুলো আলোর ঝলকে চোখ-ধাঁধানো সাদা দেখাচ্ছে। খাবার ঘরে গেল সে: একটা জানলা খোলা, কানে আসছে গাছের অবিরাম মর্মরধ্বনি, জায়গাটা আরো অন্ধকার বলে জানলার বাইরে চমকানো বিদ্যুৎ আরো উজ্জ্বল; মুহূর্তের জন্য চারিদিকে জমাট অন্ধকার, তারপর আবার সাড়া জাগছে — এখানে-ওখানে বিদ্যুৎ ঝলকে লেসের মতো গাছের মাথা, ভয়াবহ বিবর্ণ সবুজ বার্চ ও পপলার গাছসুদ্ধ বাগানটা দপ করে জ্বলে উঠছে, ফুলে উঠছে, কাঁপছে সোনালি ও ফিকে বেগুনি মহাকাশের পটভূমিকায়।

'সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে যা, বুয়ান দ্বীপে...' — এই ভুতুড়ে মন্ত্র পড়ে নিজের সর্বনাশ আরো কাছে টেনে আনছে জেনেও নাতালিয়া পেছন ফিরে ছুটতে ছুটতে

ফিসফিসিয়ে উঠল। — 'আর সেখানে আছে মাদি কুকুর, বিকট তার পিঠে ঘন ধূসর লোম।...'

আদিম ভয়াল শব্দগুলি উচ্চারণ করেই পেছন ফিরে দেখল ইউশ্‌কাকে, কাঁধ উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, দু'পাও দূরে নয়। বিদ্যুৎ ঝিলিক খেলে গেল তার মুখে — ফ্যাকাসে মুখ, চোখগুলোর জায়গায় কালো কালো কোটর। নিঃশব্দে নাতালিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে, দীর্ঘ হাতে তাকে জাপটে ধরে — একেবারে দুমড়ে নিমেষের মধ্যে হাঁটুর ওপর পেরে ফেলল তাকে, তারপর ঠান্ডা মেঝেতে, চিৎ করে।...

পরের রাত্রেও এল ইউশ্‌কা। পরপর এল অনেকগুলো রাত্রে — আর বিভীষিকা ও নিদারুণ বিতৃষ্ণায় অসাড় নাতালিয়া ভীরুভাবে আত্মসমর্পণ করল তার কাছে: তাকে বাধা দেবার, কর্ত্রীর বা অন্য ঝি-চাকরের কাছে সাহায্য প্রার্থনার কথা কখনো মনে হয় নি, ঠিক যেমন রাত্রে তাঁকে সম্ভোগ করা শয়তানকে রোখবার সাহস কখনো হয় নি তোনিয়া দিদিমণির, এমনকি হয় নি ঠাকুমারও। ডাকসাইটে সেই কর্তৃত্বময়ী রূপসীর বিষয়ে লোকে বলে যে নচ্ছার বেপরোয়া ও চোর চাকরটার হাত এড়াবার সাহস তিনি পান নি; ত্‌কাচ নামের লোকটা অবশেষে নির্বাসিত হয় সাইবেরিয়ায়।... শেষ পর্যন্ত নাতালিয়া ও সুখদলে অরুচি ধরে গেল ইউশ্‌কার — একদিন হঠাৎ সে উধাও হয়ে গেল, যেমন হঠাৎ এসেছিল।

মাসখানেক পরে নাতালিয়া বুঝল সে সন্তানসম্ভবা। আর সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ থেকে দাদাবাবুরা ফিরে আসার পরের দিন আগুন লাগল জমিদার বাড়িতে। দীর্ঘ ভয়াবহ সে

অগ্নিকান্ড: তার দ্বিতীয় স্বপ্ন সত্য হল। গোধূলি তখন, মুষলধারায় বৃষ্টিপাত চলেছে; বাড়িতে বাজ পড়ল, সলশ্‌কার মতে আগুনের একটা গোলা ঠাকুর্দার শোবার ঘরের চুল্লি থেকে ঝটকে বেরিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে এ-ঘর থেকে গেল ও-ঘরে। স্নানের ঘরে কেঁদে কেঁদে দিনরাত কাটত যে নাতালিয়ার, আগুন আর ধোঁয়া দেখে পড়ি কি মরি করে ছুটে সে বেরিয়ে আসে। পরে সে বলত যে বাগানে সে দেখেছিল লাল কোট আর সোনালি জরির দীর্ঘ কসাক টুপি পরা কাকে যেন: সেও প্রাণপণে দৌড়চ্ছিল বৃষ্টি বিন্দু ঝরা ঝোপঝাড় আর চোরকাঁটার মধ্য দিয়ে।... সত্যি দেখেছিল না স্বপ্ন, নাতালিয়া নিশ্চিত নয়। তবে যে কথাটা সত্যি সেটা এই, বিভীষিকায় তার ভবিষ্যৎ সন্তানের ভার কেটে যায়।

সেই হেমন্তকাল থেকে সে শুকিয়ে যেতে লাগল। জীবনযাত্রা তার চলল বাঁধাধরা গণ্ডির মধ্যে, সেখান থেকে আর কখনো বেরিয়ে এল না। তোনিয়া পিসীকে ওরা ভরনেজে নিয়ে গেল পুণ্যাত্মার পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন চুম্বন করাতে। এর পর তাঁর কাছে আসার দুঃসাহস হত না শয়তানের। শান্ত হয়ে উঠে সকলের মতো দিন কাটাতে লাগলেন তিনি — তাঁর মন ও অন্তরের বিশৃঙ্খলা শুধু প্রকাশ পেত বুনো চোখের দীপ্তিতে, তাঁর চূড়ান্ত অপরিচ্ছন্নতায় আর আবহাওয়া খারাপ হলে তাঁর হিংস্র খুঁতখুঁতানি ও বিষাদের ভাবে। তীর্থযাত্রায় সঙ্গী ছিল নাতালিয়া — সে যাত্রায় তারও মনে শান্তি ফিরে এল, যা মনে হয়েছিল সমাধানের বাইরে তারও মীমাংসা সে খুঁজে পেল। পিওত্‌র পেত্রোভিচের সঙ্গে দেখার কথা ভাবলেই

কী কাঁপুনি আসত শরীরে! নিজেকে ঠিক করে নেওয়ার যতই চেষ্টা করুক না কেন, দেখা হবার ব্যাপারটা শান্ত মনে ভাবতে কখনো পারত না সে। আর ইউশ্‌কা, নিজের সেই কলঙ্ক ও সর্বনাশ! কিন্তু অন্যদের শুধু নয়, পিওত্‌র পেত্রোভিচের চোখেও স্পষ্ট শান্ত দৃষ্টিতে তাকানোর অধিকার সে অর্জন করল তার অনন্যসাধারণ সর্বনাশেরই গুণে, তার সেই জ্বালা যন্ত্রণার অসাধারণ গভীরতায়, তার দুর্ভাগ্যে অমোঘ কিছু একটা যে ছিল, তাতে — পতনের সময় যে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড ঘটে, সেটা নিশ্চয় আকস্মিক ব্যাপার নয়! — আর তার তীর্থযাত্রার গুণেই: স্বয়ং দয়াময় তাঁর প্রলয়ঙ্কর অর্জনী তুলেছেন তার দিকে, তোনিয়া দিদিমণির দিকে — লোকনিন্দার ভয় করা তাদের সাজে না! ভরনেজ থেকে ফিরে সুখদলের বাড়িতে যখন প্রবেশ করল তখন সন্ন্যাসিনীর মতো সে, সবায়ের বিনীত সহজ সেবিকা, অন্তর ভারমুক্ত ও শুচি, যেন মৃত্যুশয্যায় সেক্রামেন্ট নেওয়া হয়ে গেছে। অসঙ্কোচে এগিয়ে পিওত্‌র পেত্রোভিচের হাতে সে চুমু খেল। আর মুহূর্তখানেকের জন্য শুধু, ফিরোজার আংটি পরা তাঁর ছোট শ্যামবর্ণ হাতে ঠোঁট লাগাতে স্নিগ্ধ উত্তেজনায় যৌবনের আবেগে তার বুক থর থর কেঁপে উঠল।...

নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে এল সুখদলের জীবন। ভূমিদাসমুক্তির পাকা খবর পাওয়া গেল — আর সত্যি বলতে খবরটায় আতঙ্ক বোধ করল ঝি-চাকর ও গাঁয়ের লোকেরা: ভবিষ্যতের পর্বে কী আছে, অবস্থা হয়ত যাবে খারাপের দিকে? নতুনভাবে থাকো — এটা বলা বড়ো সহজ! কর্তাদেরও শুরু করতে হবে নতুন জীবনযাত্রা, অথচ

সাবেকীভাবে দিন কাটানোর ক্ষমতাও তাঁদের ছিল না। ঠাকুর্দার মৃত্যু, যুদ্ধ, সারা দেশকে বিভীষিকাগ্রস্ত করে দেওয়া সেই ধূমকেতু, তারপর অগ্নিকান্ড, ভূমিদাসমুক্তির সংবাদ — সব মিলিয়ে কর্তাদের মুখের ভাব আর মন ঝটিতি বদলে গেল, নিঃশেষ হয়ে গেল তাঁদের যৌবন আর নিশ্চিন্ততা, আগেকার সেই দপ করে জ্বলে ওঠা ও সহজে ঠান্ডা হওয়া, তার জায়গায় এল বিদ্বেষ, বিরক্তি ও পরস্পরের তীব্র ছিদ্রানুসন্ধান: বাবার ভাষায়, শুরু হল ওঁদের 'মনোমালিন্য', আর পরিণামে খাবার খেতে ওঁরা আসতেন চাবুক হাতে।... দুয়ারে অনটনের করাঘাত মনে করিয়ে দিল যে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে, অগ্নিকান্ডে ও ধারে সর্বস্বান্ত অবস্থার টাল কোনক্রমে না সামলালে নয়। কিন্তু জমিদারি পরিচালনায় ঠোকাঠুকি লেগে গেল ভাইদের মধ্যে। কেউ বিদ্‌ঘুটে রকমের লোভী, কঠোর ও সন্দিগ্ধ, কেউ — তেমনি দিলদরিয়া, দয়ালু ও বিশ্বাসপ্রবণ। শেষ পর্যন্ত সমঝোতা করে ওঁরা একটি কারবারে রাজী হয়ে গেলেন, তাতে নাকি বিস্তর লাভ হবার কথা: সম্পত্তি বাঁধা দিয়ে কেনা হল শ'তিনেক জীর্ণ ঘোড়া — ইলিয়া সাম্‌সনভ নামের একটি বেদে প্রায় সারা জেলা থেকে তাদের জুটিয়ে আনল। মতলব ছিল শীতকালটা ঘোড়াগুলোকে ভালো খাইয়ে-দাইয়ে বসন্তকালে দাঁও-এ বেচা। কিন্তু গাদা গাদা গম আর বিচালি খেয়েও ঘোড়াগুলো কেন জানি একটার পর একটা মরতে শুরু করে দিল, বসন্ত যখন এল তখন প্রায় সবকটা ভবলীলা সাঙ্গ করেছে।...

আরো জোর বাধল ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া। মাঝে মাঝে

এত দূর গড়াত যে তুলে নিতেন ছুরি আর বন্দুক। সুখদলে আর একটি দুর্বিপাক না ঘটলে শেষ পর্যন্ত কী হত বলা যায় না। ক্রিমিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের তিন বছর পরে, শীতের একটি দিনে পিওত্‌র পেত্রোভিচ গাড়ি হাঁকিয়ে গেলেন লুনিওভোতে, সেখানে তাঁর একটি রক্ষিতা ছিল। দু'দিন সারাক্ষণ প্রচুর মদ্যপান করে যখন রওনা হলেন বাড়ির দিকে তখনো নেশা কাটে নি। সে শীতে ভয়ানক বরফ পড়ে; কম্বলে ঢাকা নীচু চওড়া শ্লেজে দুটো ঘোড়া জোতা হয়। সামনে তেজী সোমত্ত ঘুড়ীটা দলদলে বরফে পেট পর্যন্ত বসে যাওয়াতে পিওত্‌র পেত্রোভিচ হুকুম দেন তাকে খুলে শ্লেজের পেছন দিকে বেঁধে দিতে, আর তিনি নিজে সম্ভবত ওর দিকে মাথা করে শোন ঘুমোবার জন্য। কুয়াসায় ভরা ঘুঘুরঙা সন্ধ্যা নামল। চাকরবাকরদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেন বলে ওরা সবাই পিওত্‌র পেত্রোভিচের ওপর চটা, পাছে গাড়োয়ান ভাস্কা কাজাক তাঁকে খুন করে বসে, সেই ভয়ে তিনি তাকে বাদ দিয়ে সঙ্গে নিতেন ইয়েভ্‌সেই বদুলিয়াকে — শুয়ে পড়ার সময় ইয়েভ্‌সেইকে হেঁকে 'চালাও এবার' বলে তার পিঠে মারলেন লাথি। বাদামি রঙের বলিষ্ঠ সামনের ঘোড়াটা তখনি ঘামে নেয়ে উঠে ঘড়ঘড় আওয়াজ করে বাষ্প ছড়াচ্ছে, বরফে ঢাকা কঠিন পথে সে ছুটল কুয়াসায় ঝাপসা ধুধু মাঠে, কালো হয়ে আসা নিরানন্দ শীতের রাত্রিতে।... মধ্যরাত্রে, সুখদলের সবাই যখন মড়ার মতো ঘুমন্ত, তখন যে দরদালানে নাতালিয়া ঘুমোত সেখানকার জানলায় কে যেন টোকা দিল দ্রুত ও শঙ্কিত ভাবে। বেঞ্চি থেকে এক লাফে নেমে খালি পায়ে নাতালিয়া

দৌড়ল প্রবেশপথে। দেখল ঘোড়াগুলোর আর শ্লেজের ঝাপসা কালো রেখা, চাবুকহাতে দাঁড়িয়ে আছে হুয়েভ্‌সেই।

'বিপদ, বুঝলি কিনা, বিপদ ঘটেছে,' ফাঁকা গলায় অদ্ভুতভাবে বিড়বিড় করে সে বলল, যেন ঘুমের মধ্যে, 'কর্তাকে মেরে ফেলেছে ঘোড়াটা।... পেছনের ঘোড়াটা।... দৌড়ে সামনে গিয়ে পা হড়কে চাঁট মারল কর্তাকে।... মুখটা থেঁতলে বসে গেছে একেবারে।... এরই মধ্যে শরীর হিম হয়ে যাচ্ছে।... আমি মারি নি, আমি মারি নি, ভগবানের দিব্যি, আমি মারি নি!'

কোনো কথা না বলে প্রবেশপথের সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নামল নাতালিয়া, খালি পা ডুবে গেল বরফে; শ্লেজের কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসে রক্তের দলা জমা ঠাণ্ডা মাথাটা বুকে চেপে ধরে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে, বন্য আনন্দের সে চিৎকার। হাসি আর কান্নায় তার দম বন্ধ হয়ে এল।

১০

যখনি শহুরে জীবন থেকে বিশ্রাম নেবার জন্য আমরা আসতাম শান্ত নিঃস্ব সুদূর সুখদলে তখনি বারবার নাতালিয়া আমাদের বলত তার ভগ্নজীবনের কাহিনী। থেকে থেকে কালো-হয়ে-যাওয়া তার চোখে আসত শূন্য দৃষ্টি আর গলা নেমে যেত কঠোর পরিষ্কার আধো-ফিসফিসানির সুরে। বারবার আমার মনে পড়ত হল-ঘরের কোণে ঝোলানো পুণ্যাত্মার সেই কর্কশ মূর্তিটা।

তাঁর গল্প যে খাঁটি সেটা বোঝাবার জন্য — ছিন্ন মস্তক হাতে, নিজের লোকজনের কাছে এসেছিলেন কবন্ধ তিনি।...

ধরা-ছোঁওয়া যায় অতীতের এমন সব চিহ্ন যা এককালে সুখদলে দেখেছিলাম তা আর নেই। বাপ-ঠাকুর্দা ও পূর্বপুরুষেরা না রেখে গিয়েছেন তাঁদের ছবি না চিঠি, এমনকি গেরস্থালির মামুলি জিনিস পর্যন্ত নয়। আর যা কিছু ছিল পুড়ে গেছে আগুনে। প্রায় শ'খানেক বছর আগে শিলের চামড়ায় বাঁধা একটা তোরঙ্গ বহুদিন পড়ে ছিল দরদালানে, চামড়াটা শক্ত লোমহীন, ছিন্নভিন্ন। ঠাকুর্দার সেই তোরঙ্গের ফুট-ফুট দাগের বার্চ দিয়ে তৈরী খোপে খোপে ঝলসানো মোমের বিচ্ছিরি দাগলাগা ফরাসী অভিধান ও প্রার্থনা পুস্তকের ছড়াছড়ি। তারপর তোরঙ্গটা পর্যন্ত পরে উধাও হয়ে গেল। ড্রয়িং-রুম আর খাবার ঘরের ভারি আসবাবপত্র ভেঙেচুরে অদৃশ্য হয়ে গেল একে একে। বাড়িটার বয়স যত বাড়ছে তত বসে যাচ্ছে মাটিতে। যেসব ঘটনার কথা বলা হয়েছে তার পরের যে দীর্ঘ বছরগুলি এ বাড়ির ওপর দিয়ে গেছে, তা শুধু মন্থর মৃত্যুর বছর।... আর তার অতীত ক্রমশ পরিণত হচ্ছে উপকথায়।

সুখদলবাসীরা বেড়ে উঠেছিল একটা পাণ্ডববর্জিত নিরানন্দ জীবনে, তবু তাদের সে জটিল, পৃথিবীতে স্থায়িত্বের, সমৃদ্ধির একটা বাহ্য ছাপ ছিল। সে জীবন এত অনড় এবং তার প্রতি সুখদলবাসীদের টান এত গভীর যে মনে হত এর সমাপ্তি ঘটবে না কখনো। কিন্তু স্তেপের যাযাবরের বংশধরেরা দেখা গেল সব কিছু মেনে নেয়, তারা দুর্বলচিত্ত, 'শাস্তিতে অল্পেই ভেঙে পড়ে'!

আর আমরা নিজের চোখে দেখলাম সুখদলবাসীদের বাসাগুলো চকিতে উধাও হয়ে গেল চিহ্নমাত্র না রেখে, ঠিক যেমন লাঙল চালানোর পর একটার পর একটা অদৃশ্য হয়ে যায় ইঁদুরের গর্তের ওপরকার মাটির ঢিবিগুলো। সুখদল-নীড়ের লোকেরা উৎসন্নে গেল, পালিয়ে গেল, আর যারা টিকে রইল কোনক্রমে তাদের শেষ দিন ঘনিয়ে এল যেকোনো প্রকারে। তাই আমরা বড়ো হয়ে যা দেখলাম তা সুখদলের সেই জগত নয়, জীবন বলা চলে না সেটাকে, জীবনের স্মৃতি শুধু। অস্তিত্বের অর্ধবর্বর সহজিয়া বছর যত কাটে তত বিরল হয়ে এল স্তেপে আমাদের বাড়িতে আসা। জায়গাটার সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ-ব্যবধান ক্রমশ বেড়ে গেল, ক্ষীণতর হয়ে এল যে পরিবেশ ও শ্রেণীতে আমাদের জন্ম তার সঙ্গে আত্মীয়তাবোধ। আমাদের দেশের অনেক লোক আমাদেরই মতো এসেছেন স্বনামখ্যাত প্রাচীন কুলীন বংশ থেকে। ইতিবৃত্তে আমাদের নাম লেখা; আমাদের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন সভাসদ, সেনাপতি, 'স্বনামধন্য লোক', জারদের ঘনিষ্ঠ সহচর এমনকি তাঁদের আত্মীয় পর্যন্ত। আর যদি নাইট বলে ডাকা হত ওঁদের, যদি আমরা জন্মগ্রহণ করতাম পাশ্চাত্যে, তাহলে কী দৃঢ় বিশ্বাসে বলতাম ওঁদের কথা, টিকে থাকতাম আরো কত দিন! নাইটশ্রেণীর কোনো কুলতিলক বলতে পারতেন না যে, মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে গোটা একটা সম্প্রদায় প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে ধরাধাম থেকে, আমাদের কত জন লোক অধঃপাতে গেছে, পাগল হয়ে গেছে, আত্মহত্যা করেছে, পাঁড় মাতাল হয়ে পড়েছে, উচ্ছন্নে গিয়েছে বা কোথায় যেন বেমালুম হারিয়ে গিয়েছে।

আমার মতো তিনি স্বীকার করতে পারতেন না যে, আমাদের পূর্বপুরুষদের কথা থাক, এমনকি প্রপিতামহদের জীবন সম্বন্ধেও সামান্য সুস্পষ্ট ধারণা পর্যন্ত আমাদের নেই, মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেকার ঘটনা কল্পনা করা দিনের পর দিন ক্রমশ শক্ত হয়ে পড়ছে আমাদের পক্ষে!

লুনিওভোর বাস্তুভিটে হাল দিয়ে চষে ফেলা হয়েছে অনেক দিন আগেই, যেমনটা ঘটেছে আরো অনেক জমিদারির বেলায়। সুখদল তখনো কোনোক্রমে টিকে ছিল। কিন্তু বাগানের শেষ বার্চ গাছটা কেটে ফেলে, কর্ষণযোগ্য জমিজমার প্রায় সমস্তটা খুচরো হারে বেচে দিয়ে, মালিক স্বয়ং, পিওত্র পেত্রোভিচের সন্তান, — রেলওয়ে কণ্ডাক্টারের চাকরী নিলেন, ত্যাগ করলেন জায়গাটা। আর সুখদলের পুরনো অধিবাসী — ক্লাভ্দিয়া মার্কভ্না, তোনিয়া পিসী ও নাতালিয়ার জীবনের শেষ কটা বছর কাটল অসীম দুরবস্থায়। বসন্তের পর গ্রীষ্ম, গ্রীষ্ম ম্লান হয়ে যায় হেমন্তে, তারপর আসে শীতকাল।... ঋতুচক্রের কোনো হিসেব আর রইল না তাদের। স্মৃতি আর স্বপ্নের ভারে, রোজকার রুটির চিন্তায় আর ঝগড়ায় দিন কাটে। আগে যেসব জায়গায় ফলাও করে ছড়িয়ে থাকত জমিদারী কুঠি, গ্রীষ্মকালে তা ডুবে যায় চাষীদের রাইক্ষেতে: জমিজমার মাঝখানে বাড়িটা দেখা যায় অনেক দূর থেকে। বাগান বলতে এখন বাকি আছে কিছু ঝোপঝাড়, এত জংলী তাদের বাড় যে ঝুলবারান্দার ঠিক পাশে এসে ডাকে ভারুই পাখি। কিন্তু গ্রীষ্মকালে ভাবনা কিসের! 'গ্রীষ্মকাল তো স্বর্গের মতো!' — বলত বৃদ্ধারা। সুখদলের সবচেয়ে বোজার আর বিরস সময় হল

বাদলা, দীর্ঘ হেমন্তকাল আর বরফে ঢাকা শীত। ভগ্নপ্রায় ফাঁকা বাড়িটায় শীত আর বুভুক্ষা। বরফ ঝেঁটিয়ে আসে তার ওপর, কনকনে হাওয়া ঢোকে ছুরির মতো। আর বাড়ি গরম করা, চুল্লি ধরানো হয় কদাচিৎ। বৃদ্ধা কর্ত্রীর ঘর থেকে — বাড়ির একমাত্র বাসযোগ্য ঘরে — ছোট একটা টিনের বাতির টিমটিমে আলো দেখা যায় সন্ধ্যাবেলায়। বাতির ওপর ঝুঁকে মোজা বোনেন কর্ত্রী — চোখে চশমা, গায়ে ভেড়ার লোমের কোট, পায়ে ফেল্টের বুট। চুল্লির ঠান্ডা তাকে বসে বসে ঢোলে নাতালিয়া। আর সাইবেরীয় বাদ্যিবুড়ীর মতো দেখতে তোনিয়া পিসী নিজের কুঁড়েঘরে বসে বসে টানেন পাইপ। তোনিয়া পিসী আর ক্লাভ্‌দিয়া মার্কভ্‌নার মধ্যে ঝগড়া না লাগলে ক্লাভ্‌দিয়া মার্কভ্‌না নিজের বাতিটা রাখেন জানলার ধারিতে, টেবিলে নয়। আর তখন জমিদার বাড়ি থেকে একটা অদ্ভুত ক্ষীণ ঝাপসা আলো পড়ে তোনিয়া পিসীর ঠান্ডা কনকনে কুঁড়েঘরে, যেখানে ভাঙাচোরা আসবাবের ভিড়, খানখান হয়ে ভেঙে যাওয়া কাঁচের বাসনের টুকরো ছড়ানো এদিকে-ওদিকে, একপাশে ধ্বসে যাওয়া পিয়ানোর বোঝা। তোনিয়া পিসী নিজের শেষ শক্তিটুকু লাগিয়েছিলেন যেসব মুরগীর তদারকে, এই সব টুকরোর ওপর শুয়ে রাত কাটিয়ে তাদের পাগুলো ঠান্ডায় জমে যেত, এতই তুহিন ছিল কুঁড়েঘরটা।...

কিন্তু এখন আর কেউ নেই সুখদলে। এই ইতিবৃত্তে বলা হয়েছে যাদের কথা তারা মৃত, মৃত তাদের প্রতিবেশী ও সমসাময়িকেরা। মাঝে মাঝে ভাবি: সত্যি তারা কখনো বেঁচেছিল কিনা।

শুধু কবরখানায় এলে মনে হয় তারা এককালে ছিল এ পৃথিবীতে: এমনকি তাদের সঙ্গে সান্নিধ্যের একটা ছমছমে অনুভূতি পর্যন্ত হয়। কিন্তু অনুভূতিটা চেষ্টাসাপেক্ষ, তার জন্য আত্মীয়স্বজনদের কবরখানার পাশে বসে বসে ভাবতে হয় — অবশ্য যদি তেমন কবরখানা খুঁজে বের করতে পারেন একটা। এটা স্বীকার করা লজ্জার ব্যাপার, কিন্তু গোপন করা অনুচিত: ঠাকুর্দা ঠাকুমা বা পিওত্‌র পেত্রোভিচের কবর কোথায় আমাদের জানা নেই। চোর্কিজভোর ছোট গির্জার বেদী থেকে বেশী দূরে নয় — শুধু এটুকুই জানি। শীতকালে সেখানে যাওয়া অসম্ভব: কোমর অবধি বরফের স্তূপ, বরফ থেকে বেরিয়ে আছে কয়েকটা ক্রুশ আর পত্রহীন ঝোপ ও ঝাড়ের চুড়ো ডাল। গ্রীষ্মকালে গ্রামের তপ্ত ফাঁকা নিস্তব্ধ রাস্তা হয়ে গির্জার উঠোনের বেড়ায় ঘোড়া বাঁধা যায়, বেড়ার পিছনে ফার গাছের ঘোর-সবুজ দেয়াল, কালচে হয়ে উঠছে গুমোট গরমে। ফটক পার হয়ে চোখে পড়ে মরচে-পড়া গম্বুজওয়ালা সাদা গির্জাটার ওপারে — থাটো ছড়িয়ে পড়া এল্‌ম, এ্যাস্প্‌ ও লাইম গাছের গোটা একটা কুঞ্জ, সেখানে ঠান্ডা আর ছায়ার রাজত্ব। অনেকক্ষণ ঘোরাফেরা ঝোপঝাড়ের মাঝখান দিয়ে, কবরের পাতলা ঘাসে ভরা ঢিবি আর খাতের ওপরে, বৃষ্টিতে সচ্ছিদ্র, কালো থলথলে শেওলায় আচ্ছন্ন, মাটিতে প্রায় বসে যাওয়া পাথরের ফলকে পা পড়বে।... চোখে পড়বে লোহার দু-একটা স্মৃতিস্তম্ভ। কিন্তু কাদের? এত সবজে-সোনালি হয়ে গেছে যে লিপি পাঠ করা অসম্ভব। কোন ঢিপিগুলোর তলে ঠাকুর্দা বা ঠাকুমার হাড়কটা? ভগবান জানেন শুধু!

আমি কেবল জানি তাঁদের কবর এখানেই কোথায় যেন। বসে বসে ভাবি, বিস্মৃতির অতলে লুপ্ত খ্রুশচভ্‌দের চেহারাগুলো কল্পনা করার চেষ্টা করি। একবার নিমেষের জন্য মনে হয় ওঁদের জগত কত সুদূর, আবার পর মুহূর্তে মনে হয় কত কাছে। তারপর মনে মনে বলি:

"কল্পনা করা কঠিন নয়, কঠিন নয় একেবারে। শুধু মনে রাখা দরকার যে গ্রীষ্মের নীল আকাশের গায়ে হেলেপড়া গিলটি-করা এই ক্রুশ ওঁদেরও কালে ঠিক এমনিই ছিল।... তখনো এই সব ফাঁকা গুমোট ক্ষেত্রে এখনকার মতোই ফলত, হলদে হয়ে উঠত রাইশস্য; আর এখানে ছিল ছায়া, স্নিগ্ধ ঠান্ডা আর ঝোপঝাড়।... ঝোপঝাড়ে ইতস্তত চরে বেড়াত একটা বেতো সাদা ঘোড়া, ঠিক ওইটার মতো, ওই সাদা বুড়ো ঘোড়াটা, যার ঝুঁটি সবুজে, খুরগুলো ভাঙাচোরা, পাটল রঙের।

ভাসিলিয়েভ্‌স্কয়ে, ১৯১১

শেষ দেখা

১

ঘোড়ায় জিন পরাতে হুকুম দিল স্রেশ্‌নেভ। হেমন্তের চাঁদিনী রাতটা তখন ঠান্ডা আর স্যাঁতসেঁতে।

অন্ধকার আস্তাবলের সরু জানলা দিয়ে চাঁদের আলোর ধোঁয়াটে নীলচে ফালি একটা ঘোড়ার চোখে পড়াতে সেটা দামী পাথরের মতো ধকধক করে জ্বলছে। ঘোড়াটার ওপরে লাগাম আর একটা ভারি উঁচু কসাক জিন চাপিয়ে সইস তার রাশ ধরে বের করে আনল আস্তাবল থেকে, তারপর ফাঁস দিয়ে লেজটা বেঁধে দিল। ঘোড়াটা বাধ্য। জিনের পেটি গায়ে লাগাতে শুধু পাঁজরা ফুলিয়ে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ছিঁড়ে গেল একটা পেটি। বেশ কষ্ট করে দাঁত দিয়ে টেনে সইস সেটা পরিয়ে দিল।

জিন পরাতে খাটো ঘোড়াটাকে বেশ ফিটফাট দেখাচ্ছে।

তাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে বাড়ির দেউড়ির কাছে একটা পচা খ‍ুঁটিতে রাশ জড়িয়ে দিয়ে চলে গেল সইস। হলদে দাঁতে খ‍ুঁটিটা অনেকক্ষণ ধরে চিব‍ুল, কামড়াল ঘোড়াটা। মাঝে মাঝে ব‍ুক ফুলিয়ে চি'হি ডেকে তারপর গভীর হ্রেষাধ্বনি তুলল। পাশের একটা জলের গর্তে ম্লান হয়ে আসা চাঁদের সব‍ুজে প্রতিচ্ছবি। রিক্ত বাগানে ঘনিয়ে আসছে ঝাপসা কুয়াসা।

চাব‍ুক হাতে স্ত্রেশ্‌নেভকে দেখা গেল দেউড়িতে। বাদামী কুঁচি দেওয়া লম্বা কোর্তা পরা, পাতলা কোমরে আঁটো করে বাঁধা র‍ুপোর কাজ করা চামড়ার বেল্ট একটা, টকটকে লাল ঝ‍ুঁটি পশমের টুপি, ছোট মাথা উ'চিয়ে আসাতে বাঁকা নাক মান‍ুষটিকে দেখাচ্ছে লম্বা আর চটপটে। কিন্তু এমনকি চাঁদের আলোয় ধরা পড়ে তার ম‍ুখটা বিবর্ণ, রোদে জলে পোড়া, মোটা কোঁকড়ানো দাড়িতে পাক ধরেছে, গলাটা শিরা-ওঠা, দেখা যায় যে উ'চু ব‍ুটজোড়া প‍ুরনো, কোটের প্রান্তে — খরগোশের রক্তের অনেক দিনের দলা পাকানো কালচে ছোপ।

দেউড়ির পাশের একটা ছোট কালো জানলা খ‍ুলে গেল, ভীর‍ু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা:

'আন্দ্রেই, কোথায় যাচ্ছ?'

'আমি আর খোকা নই, মা,' ভুর‍ু কু'চকে জবাব দিল স্ত্রেশ্‌নেভ, তুলে নিল রাশটা।

জানলা বন্ধ হয়ে গেল বটে, কিন্তু হল-ঘরে শোনা গেল দড়াম করে দরজা খোলার শব্দ। চটি পরা পা ঘষটে দেউড়িতে বেরিয়ে এল পাভেলা স্ত্রেশ্‌নেভ। ম‍ুখ আর চোখ ফোলা-ফোলা, পাকা চুল পেছনদিকে ফেরানো। পরনে

অন্তর্বাস, তার ওপর চাপিয়েছে একটা পুরনো ঝোলা কোট, বরাবরটার মতো একটু বুদ্ধ হয়ে বকবক করে চলার মেজাজ।

'কোথায় যাওয়া হচ্ছে, আন্দ্রেই?' ভাঙা ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করল। 'ভেরা আলেক্সেয়েভ্‌নাকে আমার নমস্কার জানিও দয়া করে। ওঁকে আমি বরাবর গভীর শ্রদ্ধা করি।'

'কাউকে কখনো শ্রদ্ধা করেছ তুমি?' জবাব দিল স্ত্রেশ্‌নেভ। 'অন্য লোকের ব্যাপারে সবসময় নাক গলাও কেন?'

'ওরে বাবা, মাফি মাঙছি!' বলল পাভেল। **'ঘোড়া ছুটিয়ে যুবা চলেছেন অভিসারে!'**

দাঁতে দাঁত চেপে ঘোড়ায় চড়তে গেল স্ত্রেশ্‌নেভ। রেকাবে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে চাঙা হয়ে উঠে ঘোড়াটার শুরু হল বেখাপ্পা লাফানি। সুযোগমতো স্ত্রেশ্‌নেভ সহজে তার পিঠে চেপে কিঁচকিঁচে জিনের সামনেটায় বসল। মাথা ঝাঁকিয়ে তুলে, খুরের ঘায়ে খোঁদলের জলের চাঁদটাকে চুরমার করে দিয়ে জোর কদমে চলতে লাগল ঘোড়া।

২

স্যাঁতসেঁতে, চন্দ্রালোকিত ক্ষেতে অকর্ষিত আলগুলো সোমরাজে ঝাপসা। বড়ো পাখা ছড়িয়ে হঠাৎ নিঃশব্দে ওপরে উড়ে যাচ্ছে পেঁচা — ঘোড়াটা চমকে উঠে নাক দিয়ে শব্দ করছে। জ্যোৎস্নায় আর শিশিরে হিম ও খাঁখাঁ একটা অগভীর বনের মধ্য দিয়ে গেছে রাস্তাটা। নেড়া গাছের মাথা ভেদ করে উজ্জ্বল, ঠিক যেন সিক্ত চাঁদের

ঝলক, ভিজে ফুটফুটে আলোয় একাকার অদৃশ্য পত্রহীন ডালপালা। এ্যাস্প্ গাছের ছাল ও খাতের মরা পাতার তীব্র কটু গন্ধ।... এবার ঘেসো মাঠে নামার পালা, পাতলা সাদা বাষ্পের বন্যায় মনে হয় মাঠটা অতল। শিশিরে ঝকঝকে ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে ঘোড়ার মুখ দিয়েও সাদা বাষ্প বেরোচ্ছে। অন্য দিকে পাহাড়ের ঢালুতে ছায়াভরা দীর্ঘ বনে প্রতিধ্বনি উঠছে ঘোড়ার খুরে ভেঙে যাওয়া ডালপালার শব্দের।... হঠাৎ কান খাড়া করল ঘোড়াটা। মাঠের ঝাপসা আলোয় দাঁড়িয়ে আছে গাঁট্টাগোঁট্টা, ঘাড়মোটা, সরু-পাদুটো নেকড়ে। স্ত্রেশ্‌নেভ খুব কাছে না এসে পড়া পর্যন্ত তারা দাঁড়িয়ে রইল, তারপর লাফিয়ে ফিরে নীহারকণায় সাদা ঝকঝকে ঘাসের ওপর দিয়ে বড়ো বড়ো পা ফেলে বেঢপভাবে উঠে গেল পাহাড়ে।

'আর ও যদি আর একটা দিন থেকে যায়?' মাথা পেছনে হেলিয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে ভাবল স্ত্রেশ্‌নেভ।

ঝাপসা রুপোলি খাঁখাঁ মাঠের ওপরে ডান দিকে চাঁদ।... সত্যি হেমন্ত কী বিষণ্ণ ও সুন্দর!

একটা গভীর নালার পাশের রাস্তাটা যেখানে জলস্রোতে ধুয়ে গেছে সেখান দিয়ে দীর্ঘ ঘন অরণ্যের দিকে প্রাণপণে উঠতে উঠতে চিঁহিঃ ডাকছে ঘোড়াটা, কিঁচ কিঁচ করে উঠছে জিনের সামনের দিক। হঠাৎ পা হড়কে হুড়মুড়িয়ে পাড় থেকে পড়ে যেত আর একটু হলে। প্রচণ্ড রাগে মুখ বিকৃত করে স্ত্রেশ্‌নেভ চাবুক হাঁকড়ে সপাং করে বসাল ঘোড়ার মাথায়।

'ধাড়ি শয়তান কোথাকার!' বিষণ্ণ রাগের সুরে বনে প্রতিধ্বনিত হল তার চিৎকার।

বন পেরিয়ে নগ্ন ক্ষেতের বিস্তার। পাহাড়ের গায়ে বাক-হুইটের কালো নাড়ার মাঝে একটা দীনহীন জমিদারি, কী কয়েকটা চালা আর একটা খড়ে ছাওয়া বাড়ি। চাঁদের আলোয় কী বিষণ্ণ সমস্ত কিছু! স্ত্রেশ্‌নেভ থামল। গভীর রাত হয়ে গেছে মনে হল — এত চুপচাপ জায়গাটা। ঘোড়ায় চেপে গেল উঠানে। বাড়িটা অন্ধকার। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামল স্ত্রেশ্‌নেভ। বাধ্যের মতো মাথা হেলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল জানোয়ারটা। দেউড়িতে থাবায় নাক গুঁজে কুঁকড়ে শুয়ে আছে একটা বুড়ো দৌড়বাজ কুকুর। নড়ল না কুকুরটা, ভুরু তুলে মেঝেতে লেজ ঠুকে শুধু জানাল অভ্যর্থনা। ভেতরের বারান্দায় স্ত্রেশ্‌নেভ ঢুকল, সোঁদা একটা গন্ধ আসছে পুরনো পায়খানা থেকে। আধো-আলো আধো-ছায়া বাইরের ঘরে; বরফে ঘেমে জানলাগুলোর শার্সি চিকচিক করছে সোনালি আভায়। পাতলা নরম সাদামাটা পোশাক গায়ে ছোটখাটো একটি স্ত্রীলোক নিঃশব্দে পা ফেলে দৌড়িয়ে এল অন্ধকার বারান্দা থেকে। স্ত্রেশ্‌নেভ একটু ঝোঁকাতে নগ্ন হাতে সে তার সরু গলা দ্রুত ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে সুখে ফুঁপিয়ে উঠল মৃদু কণ্ঠে, তার লম্বা ঝুলের কোর্তার মোটা কাপড়ে মুখ চেপে। শিশুর মতো তার হৃৎস্পন্দন শুনল স্ত্রেশ্‌নেভ, বুকের ছোট্ট সোনালি ক্রুশের চাপ অনুভব করল, ক্রুশটা মেয়েটির ঠাকুমার — তার শেষ সম্বল।

তাড়াতাড়ি ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করল মেয়েটি:

'তুমি কাল পর্যন্ত থেকে যাবে তো? থাকবে? এতখানি সুখ! বিশ্বাস করতে ভরসা হচ্ছে না!'

'ঘোড়াটাকে রেখে আসি, ভেরা,' নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে

স্রেশ্‌নেভ বলল। 'কাল পর্যন্ত থাকব, কাল পর্যন্ত,' পুনরুক্তি করে ভাবতে লাগল: 'ওরে বাবা, দিন দিন উচ্ছ্বাসের বান ডাকছে দেখছি! আর কী সিগারেট টানে ও, বেপরোয়া সোহাগের কী ধুম!'

ভেরার মুখটি মধুর, পাউডারে মখমলের মতো নরম। স্রেশ্‌নেভের ঠোঁটে গাল ঘষে নরম ঠোঁটে জোর একটা চুমু খেল সে। খোলা বুকে ক্রুশের চিকমিক। রাত্রের সবচেয়ে পাতলা গাউনটা পরেছে — এই সবেধন গাউনটি বড়ো আদরের তার, বিশেষ উপলক্ষে পরার জিনিস।...

অল্প বয়সে ভেরার চেহারাটি কেমন ছিল মনে করার চেষ্টা করতে করতে স্রেশ্‌নেভ ভাবল: 'বছর পোনেরো আগে কী দারুণ বিশ্বাস ছিল, সত্যি কী দারুণ বিশ্বাস করতাম যে ওর সঙ্গে একবার দেখা করার জন্য অনায়াসে, এতটুকু দ্বিধা না করে জীবনের পোনেরোটা বছর দিয়ে দিতে পারি!'

৩

ভোর হতে দেরী নেই। বিছানার ধারে মেঝেতে মোমবাতির আলো। শার্টের গলা খোলা, স্রেশ্‌নেভ চিৎ হয়ে শুয়ে আছে লম্বা শরীর টান করে, মাথার নীচে হাত ছড়িয়ে; বাঁকা নাক ছোট মুখটি গর্বিতভাবে ফেরানো অন্ধকারের দিকে। হাঁটুতে কনুই রেখে ভেরা পাশে বসে আছে। দীপ্ত চোখজোড়া কেঁদে কেঁদে ফোলা, লাল। সিগারেট খেতে খেতে বিরস মুখে তাকিয়ে আছে মেঝেতে। পায়ের ওপর পা রেখে বসাতে সৌখীন দামী জুতোতে

ছোট্ট পা'টা বড়ো সুন্দর লাগছিল তার নিজের কাছেই। কিন্তু বুকের সেই তীব্র জ্বালার শেষ নেই।

'তোমার জন্য আমার সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছি,' মৃদুকণ্ঠে বলল সে, কেঁপে উঠল ঠোঁটজোড়া।

কণ্ঠস্বরে কত না স্নেহ, কত না শিশুসুলভ বিষাদ! স্ত্রেশ্‌নেভ কিন্তু চোখ খুলে কঠোর সুরে জিজ্ঞেস করল:

'কী উজাড় করে দিয়েছ, শুনি?'

'সব, সব কিছু, সমস্ত কিছু। এবং সবচেয়ে বড়ো কথা, আমার সম্মান খুইয়েছি, খুইয়েছি আমার যৌবন।...'

'তুমি আর আমি এমন কিছু কমবয়সী নই।'

'সত্যি তুমি কী অভব্য! আমাকে একেবারে বোঝো না,' নরম গলায় সে বলল।

'দুনিয়ার সব মেয়েরা সর্বদা এই এক কথা বলে। 'বোঝাটা' তাদের পেয়ারের কথা, বলে অবশ্য বিভিন্নভাবে। গোড়ায় বলে আহ্লাদে আর উচ্ছ্বাসে: 'সত্যি তোমার কী বুদ্ধি, আমাকে এত ভালো করে বোঝো!' আর পরে: 'সত্যি তুমি কী অভব্য! আমাকে একেবারে বোঝো না!''

নিঃশব্দে কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটি বলে চলল এমনভাবে যে মনে হল স্ত্রেশ্‌নেভের কথা কানে যায় নি:

'মানলাম না হয় আমি এমন কিছু নই।... কিন্তু গানবাজনা বরাবর ভালোবেসেছি, এখনো পাগলের মতো ভালোবাসি, আর কিছু একটা, সামান্য হলেও, কিছু একটা হয়ত করতে পারতাম।...'

'ওহো! গানবাজনার ব্যাপার ছিল না ওটা! যে মুহূর্তে পদার্স্কি...'

'ওটা বলা অভব্য, আন্দ্রেই।... এখন আমি শুধু একটা বোর্ডিং স্কুলের হতচ্ছাড়া নাচের ক্লাসে পিয়ানো বাজাই, তাও জায়গাটা কোথায়? যে বেল্লিক শহরটায় বরাবর আমার ঘেন্না, সেখানে! কিন্তু এখনো কি এমন একটি মানুষকে খুঁজে পেতাম না যে আমাকে দিত আশ্রয়, সংসার, আমাকে ভালোবাসত, খাতির করত? কিন্তু আমাদের প্রেমের স্মৃতি...'

একটা সিগারেট ধরিয়ে আস্তে আস্তে প্রত্যেকটি শব্দ উচ্চারণ করে জবাব দিল স্রেশ্‌নেভ:

'ভেরা, আমরা অভিজাত বংশের গর্ভস্রাব, আমরা প্রেম জিনিসটাকে সহজভাবে নিতে পারি না। ওটা আমাদের কাছে বিষের মতো। আর জীবন ছারখার হয়ে গেছে আমার, তোমার নয়। পোনেরো, ষোলো বছর আগে এখানে আসতাম প্রত্যেক দিন, চাইতাম তোমার দোরগোড়ায় রাতগুলো কাটাতে। তখন আমার বয়স নেহাৎ কম ছিল, ভাবাতিশয্যে পরিপূর্ণ মূর্খ নরম গোছের মানুষ ছিলাম।...'

সিগারেট নিভে গেল। সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাতটা দেহের পাশে রেখে ছাদের দিকে তাকিয়ে শুয়ে রইল স্রেশ্‌নেভ।

'আমাদের পূর্বপুরুষদের সেই সব প্রেম কাহিনী, নীল ঘিরে সোনালী কাগজে ডিমের আকারের ফ্রেমে তাদের প্রতিকৃতি... আমাদের সনাতন বংশের কুলগুরু — গুরিই, সামন ও আভিভের মূর্তি... সে সবের উত্তরাধিকার

তোমার, আমার ভবিতব্য না হলে আর কার হবে? সে সময় আমি এমনকি কবিতা লিখেছি:

> ভালোবেসে তোমায় স্বপ্ন দেখেছি তাদের
> স্বপ্নিল যারা ভালোবেসেছিল হেথা —
> ঘুরেছি বাগানে তারার আলোকে, যেথা
> শতাব্দী আগে আলোকিত মুখ যাদের...

ভেরার দিকে একবার তাকিয়ে আগের চেয়ে কর্কশ গলায় বলল:

'তুমি চলে গিয়েছিলে কেন? আর গিয়েছিলে কার সঙ্গে? তোমার গোত্রের, তোমার জাতের লোক কি সে ছিল?'

উঠে বসে ওর হালকা কালো চুলের দিকে তাকাল কঠিন ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে:

'তোমার কথা বরাবর ভেবেছি গভীর উচ্ছ্বাসে আর শ্রদ্ধায়, ভেবেছি আমার ভাবী বধূ হিসেবে। কিন্তু কী লগ্নে মিলন হল তোমার সঙ্গে? আর আমার কাছে কী হয়ে তুমি দাঁড়ালে? আমার স্ত্রী হয়ে? তবু তো তখন ছিল যৌবন, আনন্দ, সারল্য, আরক্তিম মুখ, কেম্ব্রিকের কামিজ।... কী না গভীর অর্থ ছিল আমার কাছে এখানে রোজ আসার! দেখতাম তোমার ফ্রক, সেটাও ফিনফিনে কাপড়ের, পাতলা, যৌবনসুলভ, রোদ আর পূর্বপুরুষদের রক্তের দরুন তামাটে তোমার নগ্ন বাহু, তোমার তাতার চোখের ঝিলিক — সে চোখ তাকাত না আমার দিকে! — তোমার কুচকুচে কালো চুলে হলদে গোলাপ, তোমার হাসি — হাসিটা একটু ভেবাচেকা খাওয়া বোকাটে ধরনের

হলেও কী মধুর, এমনকি অন্য কারুর কথা ভাবতে ভাবতে আমার কাছ থেকে সরে গিয়ে বাগানের পথ ধরে তোমার চলা, সত্যি যেন খেলায় মন বসেছে এমন ভান করে তোমার সেই ক্রোকেটের বল মারা, আর বারান্দা থেকে তোমার মায়ের অপমানবর্ষণ — এসব আমার কাছে...'

'সব দোষ মায়ের, আমার নয়,' কষ্ট করে কোনক্রমে বলল ভেরা।

'না! মস্কোয় তোমার সেই প্রথম যাওয়ার কথাটা মনে করো একবার। আনমনে গাইতে গাইতে বাঁধাছাঁদা করছিলে, নিজের স্বপ্নে, সুখের নিশ্চিত প্রত্যাশায় এত বিভোর যে আমাকে দেখতে পাও নি, স্বচ্ছ ঠান্ডা সেই সন্ধেবেলায় ঘোড়ায় চেপে গিয়েছিলাম তোমাদের বিদায় দিতে। সেই ঝকঝকে সবুজ ঘাস, চষা গোলাপি মাঠ, ট্রেনের খোলা জানলায় সেই পর্দাটা... হে ভগবান!' বিরাগে আর অশ্রুজলে বলে উঠে আবার বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল স্ত্রেশ্‌নেভ। 'তোমার হাতে ভার্বেনার সৌরভ, আমারও হাতে রয়ে গেল সে সৌরভ। সে গন্ধ মিশে গেল আমার ঘোড়ার রাশে, জিনে, ঘোড়ার ঘামের গন্ধে, তবু ছাড়ল না আমাকে। অন্ধকারে ঘোড়ায় চেপে বড়ো রাস্তা ধরে যাচ্ছিলাম আর কেঁদেছিলাম সেদিন।... তাই যদি সর্বস্ব উজাড় করার, সমস্ত জীবন বিসর্জন দেবার কথা তোলো, তাহলে বলতে হয় আমার কথা, এই ঘাঘী মাতালটার কথা!'

গাল ও গোঁফ বেয়ে আসা চোখের জলের উষ্ণ লবণাক্ত ছোঁয়াচ ঠোঁটে পেয়ে মেঝেতে হঠাৎ পা নামিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল স্ত্রেশ্‌নেভ।

চাঁদ অস্তগামী। মরণশীল ছোপ লাগা বনের নীচে মাঠেঘাটে লেগে আছে সাদা চটচটে কুয়াসা। অনেক দূরের আকাশ ঘোর লাল আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। দূরের ঠাণ্ডা অন্ধকার বনে বনরক্ষকের কুটিরে একটা মোরগ ডাকল।

দেউড়ির সিঁড়িতে মোজা পায়ে বসে স্ত্রেশ্‌নেভ অনুভব করল পাতলা শার্ট ফুঁড়ে স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডার স্রোত হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

'আর তারপর অবশ্য ভূমিকার অদলবদল হয়ে গেল,' শান্ত কণ্ঠে বিতৃষ্ণায় বলল সে। 'যাক গে, কিছু এসে যায় না এখন। সব তো শেষ।...'

৪

ঠাণ্ডা হল-ঘরে প্রকাণ্ড একটা তোরঙ্গের ওপর সকালের চা দেওয়া হল। সামোভারটা অপরিচ্ছন্ন, সবজেটে, ভেতরের আগুন নিভে গেছে অনেকক্ষণ। জানলাগুলোর ঠাণ্ডা ঘামের বিন্দু সরে গেছে ওপরের শার্সি থেকে, এখন চোখে পড়ে হিমেল সকালের ঝকঝকে রোদ আর এখানে সেখানে কোনক্রমে টিকে থাকা নিষ্প্রভ সবুজের মধ্যে একটা বাঁকা গাছ। ঘুমে মুখ ফোলা, খালি পা, লালচুল একটি চাকরানি ভেতরে এসে বলল:

'মিত্রি এসেছে।'

'আসুক গে,' চোখ না তুলে বলল স্ত্রেশ্‌নেভ। ভেরাও চোখ তুলল না। এক রাত্তিরের মধ্যে তার মুখটা কেমন শুকনো হয়ে গেছে, তামাটে ছোপ পড়েছে চোখের পাতায়

আর চোখের কোলে। পোশাকটা কালো বলে যতটা কমবয়স ও সুন্দর নয় তার বেশী দেখাচ্ছে, কালোচুলের দরুন মুখের পাউডারে একটা গোলাপী আভা। স্রেশ্নেভের সরু কঠোর মুখ মৃতের মতো বিবর্ণ। মাথাটা পেছনে হেলানো, মোটা কোঁকড়ানো ধুসর দাড়ি ভেদ করে দেখা যাচ্ছে বড়ো কণ্ঠমণিটা।

বেশী ওপরে তখনো ওঠে নি সূর্য, তবু চোখ ধাঁধানো আলো। দেউড়ির সমস্তটা হিমকণায় সাদা। উঠানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বাঁধাকপির পাতার নীলচে-সবুজ বুকে আর ঘাসে নুনের ছিটের মতো লেগে আছে নীহারকণা। খড়-বোঝাই ও তুষার কণায় ভরা গাড়িটি হাঁকিয়ে দেউড়ির সামনে এসেছিল যে ঘোলাটে চোখ লোকটি সে এখন হাতে খড় পিষতে পিষতে ঘুরছে। মুখে একটা পাইপ, বেগনী রঙের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘাড়ের পাশ দিয়ে পেছনে চলে যাচ্ছে। ফারকোট গায়ে বেরিয়ে এল ভেরা। এককালের দামী কোটটা এখন জীর্ণ আর সেকেলে; পাড়ে শক্ত মরচে রঙ পড়া স্যাটিনের ফুল দেওয়া কালো খড়ে বোনা গরমকালের টুপি তার মাথায়।

যেসব পথে হিমকণা গলে গেছে সেসব পথ ধরে গাড়ি চলল, বড়ো রাস্তা পর্যন্ত গাড়ির পেছন পেছন ঘোড়ায় চেপে ভেরাকে এগিয়ে দিল স্রেশ্নেভ। ঘোড়াটা খড়ের দিকে গলা বাড়াচ্ছিল। নাকে চাবুকের ঘা খেয়ে মাথা উঁচিয়ে ফোঁৎ করে একটা আওয়াজ করল সে। গুটিগুটি চলেছে সবাই, কারো মুখে কথা নেই। বাড়ি থেকে স্রেশ্নেভের পিছু ধরা বুড়ো দৌড়বাজ কুকুরটা এখন দৌড়চ্ছে পেছন পেছন। উষ্ণ রোদ, আকাশ স্নিগ্ধ স্বচ্ছ।

বড়ো রাস্তার কাছাকাছি এসে গাড়োয়ান হঠাৎ বলে উঠল:

'আসছে গরমে আমার ছোট ছেলেটাকে আবার আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব, দিদিমণি। ভেড়া দেখাশোনার কাজে লাগবে আপনার, মনে হয়।'

লাজুক হেসে মুখ ফেরাল ভেরা। টুপি খুলে, জিন থেকে ঝুঁকে পড়ে স্ত্রেশ্নেভ ভেরার হাতে অনেকক্ষণ ধরে চুমো খেল। রগের পাক ধরা চুলে লেগে রইল ভেরার ঠোঁট, নরম গলায় সে বলল:

'নিজের যত্ন নিও, লক্ষ্মীটি। আমার সম্বন্ধে মন্দ ভেবো না কিন্তু।'

বড়ো রাস্তায় পড়ে গাড়োয়ান কদমচালে ঘোড়া চালাতে খট খট করে গাড়িটা চলে গেল। ঘুরে নির্দিষ্ট কোনো পথ না বেছে সোজা মাঠের ওপর দিয়ে ঘোড়া চালাল স্ত্রেশ্নেভ। তখনো দূরে পেছিয়ে পড়া, পিছু ধাওয়া কুকুরটাকে সোনালি ক্ষেতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ঘোড়া থামিয়ে তার দিকে চাবুক নাড়াতে লাগল স্ত্রেশ্নেভ। কুকুরটাও তখন থেমে, বসে পড়ে মনে হল জিজ্ঞেস করছে: 'কিন্তু তাহলে আমি যাই কোথায়?' আবার স্ত্রেশ্নেভ চলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে তাড়াহুড়ো না করে কুকুরটা পিছু দৌড়চ্ছে হালকা ক্ষিপ্র গতিতে। স্ত্রেশ্নেভের মন পড়ে আছে অনেক দূরের স্টেশনে, ঝকঝকে রেলে, দক্ষিণগামী ট্রেনটার ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে।...

খাঁখাঁ মাঠে ঘোড়া নামিয়ে চলল সে। মাঠটা মাঝে মাঝে পাথুরে, সেসব জায়গা প্রায় তেতে উঠেছে। স্বচ্ছ নীল আকাশের নীচে ঝকঝকে চোখ ধাঁধানো হেমন্তের দিনটায় কোনো শব্দ নেই। নগ্ন মাঠঘাট, খাত, বিরাট রুশী স্তেপের

সমস্তটা নিঃশব্দতায় বন্দী। কাঁটা গাছ আর শুকিয়ে যাওয়া বার্ডক থেকে তুলোর মতো আঁশ আস্তে আস্তে উড়ছে হাওয়ায়। বার্ডকে বসে আছে ফিঞ্চ পাখি। এভাবে তারা বসে থাকবে সারা দিন, শুধু কখনো-সখনো অন্য একটা জায়গায় উড়ে গিয়ে বসবে, আবার সুখে ও সৌন্দর্যে চলবে তাদের শান্ত জীবনযাত্রা।

কাপ্রি, ৩১.১২.১৯১২

সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোক

হায় বাবিলন, শক্তিমান নগরী!
এপোকালিপ্‌সিস

সান-ফ্রান্সিস্কোর সেই ভদ্রলোকটি — যাঁর নাম না নেপ্‌ল্‌সে, না কাপ্রিতে কারো মনে নেই — সস্ত্রীক সকন্যা চলেছেন পুরনো পৃথিবী ইউরোপের পথে, সেখানে পুরো দুটো বছর একমাত্র আমোদ-প্রমোদে গা ঢেলে দেবেন।

তাঁর কোনো সন্দেহ নেই যে বিশ্রাম, আমোদ-প্রমোদ, স্বচ্ছন্দ দীর্ঘ যাত্রা ও অন্য অনেক কিছুর অধিকার তাঁর আছে। এই দৃঢ় বিশ্বাসের কারণ ছিল অবশ্য। প্রথমত, তিনি ধনী, দ্বিতীয়ত, যদিও বয়স গড়িয়ে এখন আটান্ন, এই সবে ঠিকমতো বাঁচা শুরু হয়েছে। এতদিন তো বাঁচেন নি, দেহধারণ করেছেন শুধু, অবশ্য মোটেই মন্দ চলে নি সেটা বলতে হবে; তবু সেটা তো কেবল দেহধারণ, অনাগত

দিনগুলিতে তাঁর সমস্ত আশা নিবদ্ধ ছিল। কাজ করে গেছেন ক্রমাগত, নিঃশ্বাস ফেলার সময়টুকু পর্যন্ত পান নি — কাজের জন্য হাজারে হাজারে যে চীনেদের তিনি আমদানি করেছিলেন তারা ভালো করে জানে তার মানেটা! — অবশেষে তিনি বুঝলেন অনেক কিছু করে ফেলা হয়েছে, এককালে যাঁদের দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরেছিলেন প্রায় তাঁদের স্তরে অবতীর্ণ হয়েছেন। আর তখনি ঠিক করলেন ছুটি ভোগ করতে হবে। যে শ্রেণীর লোক তিনি, তাঁদের রেওয়াজ জীবন উপভোগের সময় এলে ইউরোপ, ভারতবর্ষ ও মিসর ভ্রমণ দিয়ে শুরু করা। ঠিক তাই করা তিনি সিদ্ধান্ত করলেন। খাটুনির বছরগুলোর প্রতিদান পাওয়া যে তাঁর প্রধান চিন্তা হবে সেটা স্বাভাবিক; তবে স্ত্রী কন্যার কথা ভেবেও তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন। অনুভূতিপ্রবণ বলে তাঁর স্ত্রীর খ্যাতি ছিল না কোনকালেই, কিন্তু মাঝবয়সী সব আমেরিকান মহিলাদেরই ভ্রমণের সখ অতি তীব্র। আর কন্যাটি, তার বয়স কম নয় — রুগ্ণ গোছের মেয়েটি — তার তো ঘুরে আসা অতি আবশ্যক: স্বাস্থ্যোন্নতির কথাটা না হয় ছেড়ে দেওয়া যাক, জাহাজে যেসব সুখকর দোস্তি হয়ে থাকে বলে শোনা যায় তার কথাও ভাবতে হবে। ডিনারের সময় হয়ত দেখলেন খাস কোটিপতির পাশে বসে ফ্রেস্‌কা দেখছেন।

সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটি যে যাত্রাপথ ঠিক করে রেখেছিলেন তার প্রসর কম নয়: ডিসেম্বর ও জানুয়ারিতে দক্ষিণ ইতালির সূর্যালোকে অবগাহন, প্রাচীন দৃশ্য, তারান্‌তেল্লা, ভ্রাম্যমাণ গাইয়েদের নৈশ প্রেমসঙ্গীত উপভোগের ইচ্ছা তাঁর, আর ইচ্ছা একটা জিনিসের যেটা

তাঁর বয়সের লোকেরা বিশেষ ধরনের তীব্রতায় উপভোগ করে — সেটি হল নেপ্‌ল্‌সের মেয়েদের প্রেম, সে প্রেম সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ না হয় নাই হল! কার্নিভাল সপ্তাহ নীস ও মণ্টে-কার্লোতে কাটাবেন ঠিক করলেন, সে সময়টায় ওখানে জড়ো হন সমাজের সেইসব বাছাই-করা লোক — আমাদের এই সভ্য পৃথিবীর সমস্ত কিছু সৌভাগ্যের দণ্ডমুণ্ডের ভার যাঁদের হাতে: একদল ওখানে উত্তেজিতভাবে যোগ দেন মোটরগাড়ি ও নৌকার রেসে বা রুলেটে, অন্যরা চালান যাকে বলে হালকা ফষ্টিনষ্টি, আবার কেউ কেউ গুলি ছুঁড়ে পায়রা মারেন — খোপ ছাড়া হয়ে পায়রাগুলো অপরাজিতা ফুলের মতো সমুদ্রের গায়ে মরকত-শ্যাম মাঠের ওপরে সুন্দরভাবে উড়ে সাদা বলের মতো ঝপ করে পড়ে যায় এক নিমেষে; ভদ্রলোকটির ইচ্ছা মার্চের প্রথম দিকটা ফ্লোরেন্সে কাটিয়ে ইস্টারের অব্যবহিত পূর্ব সপ্তাহ নাগাদ রোমে গিয়ে স্তোত্রসঙ্গীত শোনা। তাঁর পরিকল্পনার মধ্যে পড়ে ভেনিস ও প্যারিস ভ্রমণ, সেভিলে ষাঁড়ের লড়াই দর্শন, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে স্নান, তারপর এ্যাথেন্‌স্‌, কন্‌স্টান্টিনপোল, প্যালেস্টাইন, মিসর, মায় জাপান পর্যন্ত — অবশ্য, ফেরার পথে।... আর সব কিছু শুরু হল চমৎকারভাবে।

নভেম্বরের শেষ তখন। জিব্রাল্টার পর্যন্ত সারা পথ কনকনে কুয়াসা আর স্যাঁতসেঁতে তুষার-ঝড় তাদের সঙ্গ ছাড়ল না; কিন্তু সমুদ্রযাত্রা চলল বেশ নিরাপদে। জাহাজে অনেক যাত্রী, বিখ্যাত 'অ্যাট্‌লান্টিস' জাহাজটি সুযোগ-সুবিধায় ভরা প্রকাণ্ড একটা হোটেলের মতো — মদ্যপানের নৈশ বার, প্রাচ্য রীতির হামাম, নিজস্ব সংবাদপত্র। জাহাজে

জীবনযাত্রা চলল বাঁধাধরা নিয়মে: কুয়াসায় গভীর ধূসর-সবুজ আন্দোলিত সমুদ্রের ওপর ধীর বিরসভাবে ভোর হবার সেই ঝাপসা অন্ধকার সময়টায় জাহাজের করিডরে বিউগলের তীক্ষ্ম আওয়াজে সকাল-সকাল ঘুম ভাঙে; ফ্লানেলের পায়জামা পরে নিয়ে কফি, তরল চকোলেট বা কোকো পান; তারপর শ্বেতপাথরের স্নানের টবে স্নান সেরে নিয়ে মেজাজ শরীফ করা ও ক্ষুধা উদ্রেকের জন্য ব্যায়াম, তারপর দৈনন্দিন প্রাতঃকৃত্য সেরে ছোট হাজরির পালা; আবার ক্ষিধে চাগিয়ে নেবার জন্য এগারোটা পর্যন্ত ডেকে পা চালিয়ে পায়চারি করে সমুদ্রের ঠাণ্ডা তাজা হাওয়া খাওয়া বা সাফল্-বোর্ড ইত্যাদি খেলা আর এগারোটা বাজলে — স্যাণ্ড্উইচ ও বুলিয়ন খেয়ে শক্তি সঞ্চয়; দেহে বল পেয়ে জাহাজের খবরের কাগজটা বেশ রসিয়ে পড়ে লাঞ্চের জন্য শান্তভাবে বসে থাকা — লাঞ্চটা ছোট হাজরির চেয়েও স্বাস্থ্যকর, পুষ্টিকর, ভোজনের পদগুলি আরো বিবিধ। পরের দুটো ঘণ্টা বিশ্রামের পালা। গোটা ডেকটায় সারি সারি বেতের চেয়ার, কম্বল গায়ে জড়িয়ে যাত্রীরা হেলান দিয়ে শুয়ে হয় রেলিঙের মধ্য দিয়ে তাকিয়ে থাকেন মেঘলা আকাশ ও ফেনিল সমুদ্রের দিকে, নয় মিঠে তন্দ্রায় বিভোর হয়ে যান। চারটের পর তরতাজা হয়ে ওঠা প্রফুল্ল যাত্রীদের দেওয়া হয় খোসবাই-ওঠা কড়া চা আর বিস্কুট; সাতটার সময় বিউগলের আওয়াজ জানিয়ে দেয় সেই সময়টি আসন্ন যেটি এই অস্তিত্বের একমাত্র উদ্দেশ্য ও চরম আনন্দ।... আর বিউগলের ডাকে জেগে উঠে সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটি শক্তি ও প্রাণের নবীন সঞ্চারে

হাত ঘষতে ঘষতে যান নিজের জমকালো ডি-লাক্স কামরায় — সেজে নিতে।

রাত্রে 'অ্যাট্‌লাণ্টিসকে' দেখে মনে হয় অগণন জ্বলন্ত চোখে চেয়ে আছে অন্ধকারে, এদিকে নীচেকার রান্না আর ভাঁড়ার ঘরে আর মদ রাখার জায়গায় কর্মব্যস্ত কত না বেয়ারা। জাহাজের গা ছাড়িয়ে ভয়াবহ মহাসমুদ্র, কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই কারো, সকলের দৃঢ় বিশ্বাস সমুদ্রকে সামলাবে ক্যাপ্টেন, বিকটাকার মেদবহুল লালচুল সেই লোকটির সর্বদা ঘুমিয়ে পড়া একটা ভাব, জরির ফিতে দেওয়া কালো কোট পরিহিত মানুষটিকে দেখতে বিরাট একটি বিগ্রহের মতো, নিজের রহস্যময় আস্তানা থেকে যাত্রীদের সঙ্গে সময় কাটাতে সে আসে কদাচিৎ। জাহাজের সামনের দোতলায় চলেছে নারকীয় বিষণ্ণতায় সাইরেনের আর্তনাদ আর উন্দাম ক্রোধে তীক্ষ্ন চিৎকার, কিন্তু আওয়াজটা চমৎকার একটা তার-অর্কেস্ট্রার বাজনায় চাপা পড়াতে কানে যায় না অনেকের — শ্বেত পাথরের দোতলা হল-ঘরে অক্লান্ত, অপরূপ সে বাজনা। মখমলের গালিচা বিছানো মেঝে, উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত ঘরটায় নীচু কাটের সান্ধ্য পোশাক পরিহিতা মহিলা আর টেল-কোট বা ডিনার-জ্যাকেট গায়ে ভদ্রলোক, ছিমছাম ওয়েটার আর বিনীত maîtres d'hôtel*-এর ভিড়; আর তাদের ভেতর একজন কেবল মদ পরিবেশন করার লোক — তার গলায় সত্যি সত্যি লর্ড মেয়রের মতো একটা চেন ঝোলানো। ডিনার-কোট আর মাড় দেওয়া শার্ট পরাতে বয়সের

* ম্যানেজার।

তুলনায় অনেক নবীন দেখায় সান-ফ্রান্সিস্কোর সেই ভদ্রলোকটিকে। পাতলা, নাতিদীর্ঘ, শরীরের গঠন বেঢপ হলেও মজবুত বাঁধুনি, চোখে মুখে চিকচিকে একটা জেল্লা নিয়ে সংযত ফুর্তিতে ঘরটার রত্নোপম সোনালী আভায় বসে থাকেন। সামনে রজন রঙের এক বোতল মদ, সারবন্দী মিহি কাঁচের ছোট বড়ো পানপাত্র আর ফুলদানিতে বঙ্কিম হায়াসিন্‌থ্‌। ছাঁটা সাদা গোঁফওয়ালা হলদেটে মুখটায় মঙ্গোলীয় একটা ভাব, সোনা বাঁধানো দাঁতের ঝিলিক, শক্ত টাক পুরনো হাতির দাঁতের মতো চকচকে। দশাসই চেহারার শান্তপ্রকৃতির তাঁর স্ত্রীর গায়ে যে পোশাক তা দামী কিন্তু বয়সের উপযোগী। আর মেয়েটি — পাতলা লম্বা চেহারা, সুন্দর চুল মধুরভাবে বাঁধা, মুখের নিঃশ্বাসে ভায়োলেট ফুলের মিষ্টি গন্ধ, ঠোঁটের কাছে আর কাঁধের হাড়ের নীচে গোলাপী রঙের অতি ছোট ছোট ব্রণে অল্প একটু পাউডারের ছোপ, তার গাউনটা পোশাকী হলেও হালকা ও স্বচ্ছ, নিষ্পাপভাবে খোলাখুলি গোছের!... ডিনার পর্ব চলে এক ঘণ্টার বেশী। তারপর বলরুমে নাচ। নাচের সময়টা পুরুষেরা — তাদের মধ্যে যে সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটি থাকবেন বলাই বাহুল্য — আরাম কেদারায় গা ছড়িয়ে বসেন পা তুলে, হাভানা সিগার খেয়ে খেয়ে মুখ লাল হয়ে ওঠে তাদের আর নেশা ধরে যায় বার-এ লিকিওর খেয়ে। সেখানে পরিবেশনের ভার নিগ্রোদের হাতে। লাল কোট তাদের পরনে, চোখের তারা খোসা ছাড়ানো সেদ্ধ ডিমের মতো। দেওয়ালের বাইরে পর্বতপ্রমাণ কালো ঢেউয়ে মহাসমুদ্রের ফোঁসানি আর গর্জন, জাহাজের ভিজে ভারি রশারশি ভেদ করে আসে

ঝড়ের সাঁই সাঁই শব্দ, থর থর করে কেঁপে ঝুঁকে ঝড় ও কালো ঢেউয়ের পাহাড় লাঙলের মতো কেটে অতি কষ্টে চলে জাহাজটা, বিক্ষুব্ধ বীচিমালা বারবার গাঁজলায় ভেঙে পড়ে ওপরে পাঠায় ফেনার শিখা — কুয়াসায় রুদ্ধশ্বাস সাইরেনটা ডেকে চলে মুমূর্ষু যন্ত্রণায়। ওপরে নিজেদের জায়গাটায় পাহারাদারেরা ঠাণ্ডায় জমে যায়, পাহারার অসহ্য একাগ্রতায় তাদের মাথা ভোঁ ভোঁ করে। আর জলের নীচে জাহাজের পেটটা যেন নরকগর্ভের সবচেয়ে ভয়াবহ ও গুমোট সেই নবম চক্র — সেখানে জাহাজের পেটে দরবিগলিত কটুগন্ধ ঘামে ভিজে, অগ্নিশিখায় ঘোর লাল চেহারার নোংরা অর্ধনগ্ন মানুষেরা সশব্দে মণের পর মণ কয়লা ঢালালে বিরাট চুল্লিগুলো জ্বলন্ত পাকাশয়ে সেগুলোকে বেমালুম হজম করে অট্টহাসি হাসে। ওদিকে ওপরে বার-এ লোকেরা চেয়ারের হাতলে পা তুলে দেয়, নিশ্চিন্তে চুমুক পড়ে ব্র্যাণ্ডি ও লিকিওরে, বাতাসে ভাসে খোসবাই ধোঁয়া। আর বলরুমে তো সব কিছু ঝকঝকে। বিচ্ছুরিত হয় আলো, উষ্ণতা আর আনন্দ, জোড়ায় জোড়ায় চলে ওয়ালজের ঘুরপাক বা টাঙ্গোর দোলানি — বাজনা অক্লান্তভাবে বেহায়া-মিষ্টতার বিষণ্ণ সুরে জানিয়ে চলে তার আবেদন, সেই একই আবেদন সর্বদা।... এইসব কেষ্টবিষ্টুর ভিড়ে ছিলেন একজন সুপরিচিত কোটিপতি — রোগা, দাড়িগোঁফ কামানো, লম্বা, সেকেলে ড্রেস-কোট পরা ভদ্রলোকটি, ছিলেন স্পেনদেশের একটি বিখ্যাত লেখক, ডাকসাইটে সুন্দরী একজন, আর একজোড়া ছিমছাম প্রেমিক-প্রেমিকা। সবাই তাদের দেখত কৌতূহল ভরে, নিজেদের সুখ গোপন রাখার বালাই নেই তাদের: ছেলেটি

নাচে শুধু এই মেয়েটির সঙ্গে। আর তাদের হাবভাব ব্যবহার এত অপরূপ ও মধুর যে, ক্যাপ্টেন ছাড়া আর কেউ জানত না যে মোটা টাকা দিয়ে প্রেমের অভিনয় করার জন্য ওদের ভাড়া করেছে লয়েড্‌স*), এই কোম্পানির জাহাজগুলোর কখনো এটায় কখনো ওটায় তাদের বাস বহুদিন।

জিব্রাল্টারের রোদে খুশি হল সবাই, আবহাওয়া মনে হল বসন্তের গোড়ার দিকের মতো। 'অ্যাট্‌লান্টিসে' আবির্ভাব হল নতুন যাত্রীর — সঙ্গে সঙ্গে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তিনি — এশিয়ার কী একটা দেশের যুবরাজ, পরিচয় গোপন রেখে চলেছেন। ছোটখাটো মানুষটি, একেবারে ভাবলেশহীন চেহারা, মুখটা চওড়া, চোখদুটো সরু, সোনার ফ্রেমের চশমা, গোঁফের মোটা কালো গাছিগুলো মড়ার গোঁফের মতো খড়খড়ে বলে একটু অপ্রীতিকর দেখায় বটে, কিন্তু মোটের ওপর লোকটি বেশ, সহজসরল, জাঁক নেই। ভূমধ্যসাগরে আবার পাওয়া গেল শীতের আভাস, সম্পূর্ণ পরিষ্কার ও ঝকঝকে একটি দিনে পাগলের মতো ফুর্তিভে ছুটে এল উত্তুরে হাওয়া, তার ঝাপটায় ফুঁসে উঠল সমুদ্র ময়ূরের পুচ্ছের মতো নানা-রঙা উঁচু ঢেউয়ে।... তারপর, দ্বিতীয় দিনে, বিবর্ণ হয়ে এল আকাশ, দিকচক্রবালে কুয়াসার আবরণ: তীরের কাছাকাছি এসে পড়েছে জাহাজ। দেখা গেল ইস্কিয়া ও কাপ্রির আভাস। দূরবীন দিয়ে দেখলে চোখে পড়ে ফিকে-নীল কী একটার নীচে চিনির ডেলা ছড়ানো — সেটা হল নেপ্‌ল্‌স।... ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোকেরা অনেকে এরই মধ্যে গায়ে চাপিয়েছেন হালকা ফারকোট। বিনীত চীনে

'বয়রা', যারা সর্বদা কথা বলে ফিসফিসিয়ে, বাঁকা-পা যেসব ছোকরাদের কালো কুচকুচে বেণী নেমেছে পায়ের ডগা পর্যন্ত, যাদের চোখের ভুরু মেয়েদের মতো পুরু, তারা ধীরে ধীরে কম্বল, ছড়ি, স্যুটকেশ ও জামাকাপড়ের বাক্স নিয়ে যাচ্ছে কামরাগুলোর সিঁড়ির দিকে।... সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটির দুহিতা আগের রাত্রে সৌভাগ্যক্রমে পরিচিত হওয়া যুবরাজের পাশে ডেকে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি মৃদু কণ্ঠে দূরের যেখানে আঙুল দেখিয়ে তিনি কী বুঝিয়ে বলছেন সেদিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকার ভান করছে। এত বেঁটে মানুষটি যে অন্যদের পাশে দেখাচ্ছেন নেহাৎ ছেলেমানুষ, চেহারাটা দেখতে ভালো নয়, বিচিত্র, — চশমা, বোলার টুপি ও ইংরেজী ওভারকোট, ঘোড়ার লোমের মতো কর্কশ খড়খড়ে গোঁফ — চাপা মুখে ফিকে জলপাই রঙের চামড়া এঁটে বসেছে, মনে হয় মুখটায় পাতলা এক প্রস্ত বার্নিশ দেওয়া। কিন্তু মেয়েটি তাঁর কথা শুনছে এত উত্তেজিত হয়ে যে কী বলছেন মাথায় ঢুকছে না এতটুকু। অদ্ভুত মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে সে, বুক বেজায় ঢিপ ঢিপ করছে: ভদ্রলোকটির সব কিছু, খুঁটিনাটি সব কিছু কেমন আলাদা — তাঁর শুকনো হাত, চিকন চামড়া, যার নীচে বইছে প্রাচীন রাজারাজড়ার রক্ত; তাঁর জামাকাপড় ইউরোপীয় ও সাদাসিধে হলেও কেন জানি অত্যন্ত দুরস্ত, এ সব কিছু তার কাছে একটা অসাধারণ মোহের ব্যাপার। এদিকে পেটেন্ট লেদার জুতোর ওপরে ছাইরঙা গেটার পরে সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটি বারবার তাকাচ্ছেন পাশের ডাকসাইটে সুন্দরীটির দিকে — দীর্ঘাঙ্গিনী ব্লন্ড মহিলাটির গড়ন অপরূপ, প্যারিসের

একেবারে হালকেতায় চোখের সাজ, পাতলা রুপোর চেনে বাঁধা একটা লোমহীন কুঁজোপিঠ ক্ষুদে কুকুরকে কী বলে চলেছিলেন তিনি। কেন জানি অস্বস্তি লাগাতে দুহিতা ভাবল বাপের দিকে আর তাকাবে না।

ভ্রমণের সময় ভদ্রলোকটির হৃদয় দরাজ ছিল। তাই যারা তাঁকে খাওয়ায়, সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত মনের সামান্যতম অভিলাষ আঁচ করে সেবা করে, মনের শান্তি রক্ষা করে ফিটফাট রাখে, তাঁর হয়ে কুলি ডেকে তোরঙ্গগুলো পাঠিয়ে দেয় হোটেলে, তাদের হিতাকাঙ্ক্ষায় অগাধ বিশ্বাস তিনি রাখতেন। সর্বত্র তো এ রকম ঘটেছে, জাহাজে ব্যতিক্রম হয় নি, নেপ্‌ল্‌সেও হবে সে রকম। যত কাছে আসছে শহরটা তত বড়ো দেখাচ্ছে। জাহাজের বাজিয়েদের দল রোদে ঝলকানো বাদ্যযন্ত্র নিয়ে এরই মধ্যে জড়ো হয়েছিল ডেকে, হঠাৎ তারা কানে তালা লাগিয়ে বাজাতে লাগল জয়যাত্রার একটি সুর। পোশাকী ইউনিফর্ম গায়ে দানব ক্যাপ্টেন নিজের মঞ্চে আবির্ভূত হয়ে অনুগ্রহ দেখানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়ল যাত্রীদের উদ্দেশ্যে — পৌত্তলিকদের করুণাময় দেবতার মতো। অবশেষে বন্দরে ঢুকল 'অ্যাট্‌লাণ্টিস'। রেলিঙে ভিড় করে দাঁড়ানো লোকসুদ্ধ তার বহুতলা দেহ বাঁধা হল উত্তরণ মঞ্চে, নামার প্যাটাতনের শেকলগুলো উঠল ঝনঝনিয়ে — তখন হোটেলের অসংখ্য চাপরাশি ও জরি-লাগানো টুপি মাথায় তাদের সহকারীরা, নানা ধরনের দালাল, সিটি দেওয়া ফচকে ছোঁড়া, গুচ্ছের রঙীন পোস্টকার্ড হাতে ষণ্ডা ভিখিরীর দল ছুটে এল সেবা নিবেদন করে! আর ভদ্রলোকটি হোটেলের গাড়ির দিকে যেতে যেতে — সে হোটেলে হয়ত যুবরাজও উঠবেন —

ভিখিরীদের দিকে তাকিয়ে স্মিত হেসে, দাঁতে দাঁত চেপে অনুচ্চ কণ্ঠে, প্রথমে ইংরেজী ও পরে ইতালীয় ভাষায় বলে উঠলেন:

'Go away! Via!'*

নেপ্‌ল্‌সে জীবনযাত্রা ঘড়ির কাঁটার মতো নিয়মিত চলতে দেরী হল না একটুও: সকাল সকাল বিরস খাবার ঘরে ছোট হাজরি, মেঘলা আকাশ পরিষ্কার হবার আশা কম, দরদালানের দরজায় গাইডের ভিড়। তারপর উষ্ণ গোলাপী সূর্যের মুখে প্রথম হাসি দেখা দেয়, তারপর উঁচু বারান্দা থেকে চোখে পড়ে ভোরের চিকচিকে বাষ্পে একেবারে আচ্ছাদিত ভিসুভিয়াস, উপসাগরে মুক্তোর মতো রুপোলী লহরী আর দিগন্তে কাপ্রির বিবর্ণ রেখা, ছোট গাড়িতে জোতা ক্ষুদে গাধা তর তর করে চলেছে নীচের কর্দমাক্ত জাহাজ ঘাটা হয়ে, কোথায় যেন বলিষ্ঠ যুদ্ধং দেহি সঙ্গীতের সঙ্গে তাল রেখে কুচকাওয়াজ করছে খেলাঘরের মতো ছোট সৈনিকদের দল। তারপর — গাড়িতে চেপে রাস্তার ভিড়াক্রান্ত সরু ধূসর ফালি হয়ে মন্থর যাত্রা, দু'পাশে উঁচু, বহু গবাক্ষবিশিষ্ট বাড়ি, মিউজিয়মে যাওয়া। মিউজিয়মগুলো কবরখানার মতো কঠোর ও পরিষ্কার, প্রীতিকর বটে তবে ঠিক যেন বরফে আলোকিত, বিরস কিংবা ঠাণ্ডা, মোমের গন্ধে ভরা গির্জায় যাওয়া, সেখানে একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি বারবার: ভারি চামড়ার পর্দা ঝোলানো জমকালো প্রবেশপথ, ভেতরে — বিরাট শূন্যতা ও স্তব্ধতা, সাতশাখার ঝাড়বাতির নরম লাল

* সরে যাও! (ইতালীয়)

আলো পড়েছে লেসে মোড়া বেদীতে, কাঠের কালো কালো আসনগুলির মাঝে একটি মাত্র বৃদ্ধা, পায়ের নীচে কবরের পেছল ফলক আর দেয়ালে কার যেন আঁকা 'ক্রুশ থেকে অবতরণ' — ছবিটা প্রসিদ্ধ না হয়ে উপায় নেই। একটার সময় সান-মার্তিনো পাহাড়ে লাঞ্চ, যেখানে দুপুরের দিকে জড়ো হন বেশ কয়েক জন মান্যগণ্য লোক। সেখানে একবার সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটির কন্যা প্রায় মূর্ছা গিয়েছিল: তার মনে হয়েছিল যুবরাজকে দেখেছে হল-ঘরে, যদিও খবরের কাগজ থেকে তার জানাই ছিল যে তিনি রোমে। পাঁচটা বাজলে — হোটেলের সেই পুরু কার্পেট ও গনগনে আগুনে গরম চমৎকার ড্রয়িং-রুমে চা দেওয়া হত; তারপর ডিনারের জন্য সাজগোজ — আবার গোটা হোটেলটায় ঘণ্টার সুরেলা ভরাট বলিষ্ঠ আওয়াজ, আবার নীচু-কাট গাউন-পরা মহিলারা সিল্ক খসখসিয়ে সার বেঁধে সিঁড়ি হয়ে নামার সময় ছায়া ফেলেন আয়না লাগানো দেয়ালে, আবার ডাইনিং-রুমের দরজাগুলো আতিথেয়তা জানিয়ে হাট হয়ে খুলে যায়, মঞ্চে লাল কোট গায়ে বাজিয়েরা, কালো ওয়েটারের ভিড় হোটেলের ম্যানেজারকে ঘিরে; ম্যানেজারবাবু সুদক্ষভাবে সাদা-লাল রঙের ঘন সুপ প্লেটে ঢালতে ব্যস্ত।... ডিনার ব্যাপারটা খাদ্যে, সুরায়, খনিজ জলে, মিষ্টান্নে ও ফলে এত এলাহী যে রাত এগারোটার মধ্যে ঘরে ঘরে গিয়ে অতিথিদের পেট গরম করার জন্য গরম জল ভরা রবারের বোতল দিয়ে আসতে হত পরিচারিকাদের।

সে বছরে অবশ্য ডিসেম্বরটা খুব ভালো ছিল না: হোটেলের দারোয়ানদের কাছে আবহাওয়ার কথা তুললে

তারা শুধু দোষী-দোষী ভাবে কাঁধটা উঁচু করে নীচু গলায় বলত যে এরকম একটা শীতকাল আর দেখেছে বলে মনে হয় না; অবশ্য এই প্রথম যে তারা এটা বলতে বাধ্য হচ্ছে তা নয়, এই প্রথম তারা 'সর্বত্র তাজ্জব কী একটা ঘটছে' তার ওপর দোষটা চালিয়ে দিচ্ছে: রিভিয়েরায় অভূতপূর্ব ঝড় আর বৃষ্টি, এ্যাথেন্সে বরফ, এট্নাও বরফে ঢাকা, রাত্রে ছড়ায় কী একটা আভা, আর পালের্মো — সেখানে এত ঠাণ্ডা যে ট্যুরিস্টরা পড়ি-কি-মরি করে পালাচ্ছে।... ভোরের সূর্য প্রতিদিন ধোঁকা লাগায় তাদের: দুপুরবেলায় আকাশ ধূসর হয়ে যাবেই, ঝিরঝিরে বৃষ্টি নামবে। যত সময় গড়ায় তত ঠাণ্ডা আর কর্কশ দিন। তারপর হোটেলের প্রবেশপথে পাম গাছগুলো ধাতব দীপ্তিতে ঝকঝক করে ওঠে, শহরটাকে দেখায় বিশেষ নোংরা আর কোণঠেসা, মিউজিয়মগুলো বড়ো একঘেয়ে, সিগারের টুকরো অসহ্য দুর্গন্ধযুক্ত, সেগুলো ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলেছে মোটা গাড়োয়ানগুলো যাদের রবারের ওপর-কোটের কানাত হাওয়ায় পত্ পত্ করে পাখার মতো, অস্থিচর্মসার ছ্যাকরা ঘোড়ার ওপর যাদের জোর চাবুক হাঁকড়ানোটা যে শুধু ছল বুঝতে বাকি থাকে না। ট্র্যামলাইন সাফ করা লোকগুলোর বুট কী কদাকার, আর কালো চুলে টুপি না চাপিয়ে বৃষ্টি মাথায় ক'রে কাদা ভেঙে চলে যেসব স্ত্রীলোকেরা তাদের পাগুলো কী বীভৎস ছোট! আর জলের গেঁজানো পাড় থেকে আসা স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা আর পচা মাছের দুর্গন্ধ, এ বিষয়ে যত কম বলা যায় তত ভালো। সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটি ও ভদ্রমহিলার মধ্যে এবারে রোজ সকালে ঝগড়া শুরু হল। মাথা ধরেছে বলে

কন্যা হয় ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখে ঘুরে বেড়ায়, নয় হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে উঠে দুনিয়ার সব কিছুতে গভীর উৎসাহ দেখায়, তখন তাকে মনে হয় মধুর সুন্দর: শিরায় শিরায় অসাধারণ রক্ত প্রবহমান সেই কুৎসিত লোকটি তার মনে জাগায় কী সুন্দর কোমল ও জটিল সব অনুভূতি, মেয়েদের অন্তরে যা সাড়া জাগায় — হোক না সেটা ধন, প্রসিদ্ধি বা কুলমর্যাদা, সেটা তো সত্যি শেষ পর্যন্ত এমন বড়ো কথা নয়।... সবাই তাদের ভরসা দিল যে সরেণ্টো ও কাপ্রির হালচাল একেবারে অন্য রকমের — সেখানে আরো রোদ, আরো আলো, লেবু গাছে ফুল ধরেছে, সেখানকার লোকেরা আরো সুজন, সেখানকার মদ আরো খাঁটি। তাই সান-ফ্রান্সিস্কোর পরিবার নিজেদের বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে কাপ্রিতে যাওয়া ঠিক করল — তাদের মতলব কাপ্রি দেখবে, এককালে যেখানে টাইবেরিয়াসের*) প্রাসাদ ছিল সেখানকার পাথরে ঘুরে-টুরে, এজিওর গ্রট্টোর প্রসিদ্ধ গুহা দেখে, ক্রিসমাসের আগে পুরো এক মাস ধরে দ্বীপে ঘুরে ঘুরে কুমারী মেরির প্রশংসাগান যারা করে সেই আব্রুজ্জিও ব্যাগপাইপ বাজিয়েদের বাজনা শুনে সরেণ্টোতে গিয়ে আস্তানা গাড়া।

প্রস্থানের দিনটায় — সান-ফ্রান্সিস্কোর পরিবারের পক্ষে স্মরণীয় সেই দিনটায়! — এমনকি সকালের সেই মামুলী সূর্যটিকে পর্যন্ত দেখা গেল না। ভারি কুয়াসা ভিসুভিয়াসকে একেবারে ঢেকে সমুদ্রের সীসে-রঙা বুকে ধূসর নীচ মেঘে ছড়িয়ে পড়েছে। কাপ্রি চোখে পড়ে না একেবারে — যেন জায়গাটার অস্তিত্ব ছিল না কোনো কালে। আর কাপ্রিগামী ছোট জাহাজটা এত এপাশ-ওপাশ দুলতে

লাগল যে সান-ফ্রান্সিস্কোর পরিবারটিকে হতচ্ছাড়া জাহাজটার যাচ্ছেতাই সেলুনে কম্বলে পা ঢেকে সোফায় উবু হয়ে চোখ বুজে শুয়ে থাকতে হল — গা এত ঘোলাচ্ছিল। ভদ্রমহিলা ভাবলেন তাঁর যন্ত্রণা সবচেয়ে বেশী; বারবার বমি করে মারা যাবেন মনে হল, আর এদিকে বমি করার পাত্র নিয়ে তাঁর কাছে ছোটাছুটি করা মেয়েটির মুখে শুধু হাসি — দিনের পর দিন, কী গরমে কী ঠাণ্ডায় বহু বছর এ সমুদ্র সে পাড়ি দিয়েছে — তবু সে অদম্য। একেবারে মড়ার মতো ফ্যাকাশে মুখে কন্যাটি এক টুকরো লেবু দাঁতে চিপে রেখেছে। ঢিলে ওভারকোট ও বড়ো একটা টুপি পরে ভদ্রলোকটি চিৎ হয়ে শুয়ে চোয়াল আলগা করেন নি একবারও সারা পথটা; মুখে কালি পড়ে গেছে, গোঁফটা দেখাচ্ছে আরো পাকা, মাথা যেন ফেটে যাচ্ছে: আবহাওয়া বেজায় খারাপ বলে যাত্রার আগের কয়েকটি রাতে বড়ো বেশী নেশা করা আর কয়েকটা বেপাড়ায় গিয়ে 'জীবন্ত দৃশ্য' দেখা বেশী হয়েছে। এদিকে খটখট আওয়াজ তোলা পোর্ট-হলে সমানে বৃষ্টির কষাঘাত, জল চুঁইয়ে পড়ছে সোফায়, মাস্তুলে দমকা হাওয়ার আর্তনাদ, থেকে থেকে ঢেউয়ের উত্তাল আক্রমণের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জাহাজটাকে কাত করে দিচ্ছে, তখন নীচে শোনা যাচ্ছে কী একটার ঘড়ঘড় গুরুগুরু ধ্বনি। কাস্টেল্লামারা, সরেণ্টোতে জাহাজ যখন লাগল তখন অবস্থা একটু শান্ত; কিন্তু সেখানেও ঢেউয়ের দাপট এত ভয়ঙ্কর যে খাড়া পাহাড়, বাগান, পাইনকুঞ্জ, গোলাপী ও সাদা হোটেল এবং অন্ধকার কুঞ্চিত সবুজ টিলাসুদ্ধ তীরটা মনে হল দোলনায় সজোরে ওঠানামা করছে; নৌকোগুলো

বারবার লাগছে জাহাজের গায়ে, জলো হাওয়ার স্রোত দরজা দিয়ে ঢুকছে অবিরাম, 'Royal' হোটেলের পতাকা ঝাঁকিয়ে লাগানো ঢেউয়ে ওঠাপড়া একটা নৌকোয় একটি ছেলে অবিশ্রাম তীক্ষ্ন গলায় যাত্রীদের মন কাড়বার চেষ্টায় চেঁচিয়ে চলেছে: 'Kgoya-al ! Hôtel Kgoya-al !..' আর নিজেকে অত্যন্ত বুড়ো বোধ করে — যেমনটা বোধ করা উচিত তাঁর — সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটি এবার বিরক্তিতে ও রাগে ভাবলেন সেই সব 'Royal', 'Splendid,' 'Excelsior' হোটেল আর সেই সব লোভী, রসুনগন্ধী, ছোটখাটো হতচ্ছাড়াগুলোর কথা, যাদের দেশ ইতালি। একবার, জাহাজটা তখন থেমেছে, চোখ খুলে সোফায় উঠে বসাতে জলের ধারে গোটা কয়েক নৌকোর কাছে খাড়া পাহাড়ের পাদদেশে একটার পর একটা বেরিয়ে-আসা, শেওলার ছোপ ধরা, পাথরের তৈরী এমন দুঃস্থ ও ছোট কয়েকটা ঘরের গাদা আর ছেঁড়া নেকড়া, খালি টিন আর তামাটে মাছ ধরার জালের স্তূপ চোখে পড়ল যে তিনি হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে ভাবলেন এই হল আসল ইতালি, যেখানে তিনি এসেছেন আমোদ-প্রমোদের জন্য।... অবশেষে, অন্ধকার হয়ে গেছে তখন, নীচে যেন ছোট লাল বাতির শিখায় বিদ্ধ দ্বীপটির কালো পুঞ্জ কাছে, আরো কাছে এসে পড়ল; বেগ কমে গিয়ে হাওয়া হল উষ্ণ আর সুগন্ধী, জাহাজঘাটের ল্যাম্পপোস্ট থেকে আলোর সোনালি সাপ কালো তেলের মতো চকচকে দমে-যাওয়া ঢেউয়ের ওপর দিয়ে এল ভেসে।... তারপর হঠাৎ ঘড়ঘড় শব্দে, শেকল ঝনঝনিয়ে ঝপাং করে জলে নোঙর পড়ল। চারদিকে রেষারেষি করা মাঝিদের তীব্র হাঁকডাক। সঙ্গে

সঙ্গে মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠল, কেবিনের আলো আরো উজ্জ্বল, যেন ইচ্ছে হল খানাপিনার, ধূমপানের, চলাফেরার।... দশ মিনিট পরে বড়ো একটা নৌকোয় চাপল সান-ফ্রান্সিস্কোর পরিবার, মিনিট পোনেরো পরে জাহাজঘাটে নেমে একটা ছোট্ট ঝকঝকে গাড়িতে চেপে হুস করে খাড়া পাহাড়ের গায়ে ওঠা। গাড়ি চলল আঙুরক্ষেতের খুঁটি, ভেঙে-পড়া পাথরের দেয়াল, কখনো-সখনো মাদুর-চাপা ভিজে গ্রন্থিল কমলালেবু গাছ পেরিয়ে; গাড়ির খোলা জানলা দিয়ে দেখা তাদের রঙীন ফল ও পুরু চকচকে পাতা গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে।... ইতালিতে বৃষ্টির পর মাটির গন্ধ ভারি মধুর, প্রত্যেকটি দ্বীপের গন্ধ নিজস্ব।

কাপ্রি দ্বীপ সে রাত্রে স্যাঁতসেঁতে, অন্ধকার। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের জন্য সজীব হয়ে উঠে আলো জ্বালাল এখানে-সেখানে। সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটিকে সাদর সম্বর্ধনা জানানো যাদের কর্তব্য তারা ভিড় করে ইতিমধ্যে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের মাথায় ফিউনিকুলার রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে। আরো লোক এসেছে অবশ্য, কিন্তু তারা খাতিরের উপযুক্ত নয় — কাপ্রিতে বাস পাতা গুটিকতক রুশ — অন্যমনস্ক, অপরিচ্ছন্ন লোকগুলোর দাড়ি আছে, চোখে চশমা, জরাজীর্ণ ওভারকোটগুলোর কলার তোলা; আর একদল পা-লম্বা, গোলমাথা জার্মান পরনে টিরলীয় পোশাক, কাঁধে ঝোলানো ক্যানভাসের ব্যাগ, কারো সেবা তাদের দরকার নেই, পয়সাকড়ির ব্যাপারে উপুড়হস্ত মোটেই নয়। রুশ ও জার্মানদের গম্ভীরভাবে এড়ানো সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটি তৎক্ষণাৎ সকলের নজরে পড়লেন। তাঁকে ও

সঙ্গের মহিলাদের তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করা হল, পথ দেখিয়ে সামনে ছুটল লোকেরা, আবার তাঁকে ঘিরে ধরল ফচকে ছোঁড়ারা আর কাপ্রির সেইসব দশাসই কিষানীরা যারা ভদ্র ট্যুরিস্টদের বাক্স-প্যাঁটরা মাথায় করে বয়ে নিয়ে যায়। তাদের কাঠের চটি খটখট আওয়াজ করে নামল ঠিক অপেরার দৃশ্যের মতো ছোট্ট সেই চকটায়, যেখানে ভিজে হাওয়ায় দুলছে বৈদ্যুতিক আলোর গোলোক আর পাখির মতো শিস দিয়ে ডিগবাজি খাচ্ছে ফচকে ছোঁড়ার দল। সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটি তাদের মধ্যে পা চালিয়ে স্টেজে ঢোকার মতো করে চললেন মিশে যাওয়া একটি বাড়ির নিচে মধ্যযুগীয় কী একটা খিলানের দিকে। খিলানের ওপারে সরব ছোট্ট রাস্তাটা উঠে গিয়েছে হোটেলের উজ্জ্বল-আলোকিত প্রবেশপথে, বাঁয়ে চেপটা চেপটা ছাদগুলো, ছাড়িয়ে উঠেছে পাম গাছের ঝাঁকড়া মাথা। আর তার ওপরে নীল নক্ষত্র খচিত কালো আকাশ। আবার মনে হল সান-ফ্রান্সিস্কোর পরিবারটির খাতিরেই সজীব হয়ে উঠেছে ভূমধ্যসাগরের পাহাড়ী দ্বীপের এই ভিজে ছোট্ট পাথুরে শহরটি, তাদেরই জন্য হোটেলের মালিক এত খুশি আর অতিথিবৎসল, বারদালানে শুধু তাদের পা ফেলার অপেক্ষায় রয়েছে চীনে ঘণ্টাটি, তারা ঢুকতেই সবাইকে ডিনার খেতে আহ্বান জানিয়ে সারা বাড়িটায় গম গম করে উঠছে ঘণ্টাধ্বনি।

হোটেলের মালিক, অত্যন্ত ফিটফাট যুবকটি তাঁদের বেশ ভব্যভাবে ও সমাদরে অভ্যর্থনা করাতে মুহূর্তের জন্য চমকে উঠলেন সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটি, হঠাৎ মনে পড়ে গেল আগের রাত্রে তাঁর মাথায় ভিড় করে আসা নানা

বিশৃংখল স্বপ্নের মধ্যে দেখেছিলেন এই যুবকটির প্রতিমূর্তি — পরনে ঠিক এই সুন্দর ছাঁটের সকালবেলাকার কোট, আয়নার মতো চকচকে ঠিক এই আঁচড়ানো চুল। অবাক হয়ে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। কিন্তু অনেক বছর হল তাঁর মন থেকে সব রহস্যময় অনুভূতি সাফ হয়ে গেছে, ছিটেফোঁটাও নেই, তাই বিস্ময়ের ভাব কেটে গেল তৎক্ষণাৎ। হোটেলের বারান্দায় যেতে যেতে ইয়ার্কি করে স্বপ্ন ও সত্যের এই অদ্ভুত মিলটার কথা বললেন স্ত্রী ও কন্যাকে। কথাটা শুনে কন্যা কিন্তু সভয়ে মুখ তুলে চাইল তাঁর দিকে: এই অজানা অন্ধকার দ্বীপে বিষাদ ও ভয়াবহ নিঃসঙ্গতার একটা অনুভূতিতে নিমেষের জন্য তার বুক মুচড়িয়ে উঠল।...

জনৈক উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ, সপ্তদশ রাইস কাপ্রিতে ক'দিন থেকে সবে বিদায় নিয়েছেন। তিনি যে ঘরগুলোয় থাকতেন সেগুলো দেওয়া হল সান-ফ্রান্সিস্কোর অতিথিদের। সবচেয়ে সুশ্রী আর চটপটে পরিচারিকা পেলেন তাঁরা, বেলজিয়ামের সেই মেয়েটির কটিতট কর্সেটের গুণে টান-টান ও ক্ষীণ, মাথায় মাড় দেওয়া টুপিটা খাঁজ-খাঁজ মুকুটের মতো। তাঁদের দেওয়া হল সবচেয়ে জমকাল খাস-চাকর — কালোচুল জ্বলজ্বলে চোখ একটি সিসিলীয়কে, আর সবচেয়ে ক্ষিপ্রকর্মা, লুইজি নামের ছোটখাটো, গোলগাল একটি লোককে — বয়সকালে এ ধরনের অনেক কাজ সে করেছে। মিনিটখানেক পরে সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটির কানে এল দরজায় মৃদু একটি টোকা। হোটেলের ফরাসী ম্যানেজার এসে জিজ্ঞেস করল নবাগতেরা খেতে চান কি না, যদি চান — চান যে সে বিষয়ে

কোনো সন্দেহ নেই — তাহলে আহার তালিকায় আছে গলদা চিংড়ি, সেদ্ধ মাংস, এ্যাসপারাগাস, ফেজান্ট ইত্যাদি। সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটির পায়ের তলায় তখনো মাটি দুলছে — যাচ্ছেতাই ছোট সেই ইতালীয় জাহাজটার দরুন তাঁর সমুদ্র-পীড়া এত প্রবল হয়েছিল — তবু তিনি শান্তভাবে উঠে হোটেলের ম্যানেজার আসার সঙ্গে সঙ্গে হাট হয়ে খুলে যাওয়া জানলাটা বন্ধ করে দিলেন একটু বেখাপ্পাভাবে। জানলা দিয়ে আসছিল দূরের একটা রান্নাঘরের আর নীচের বাগানের ভিজে ফুলের গন্ধ। ধীরেসুস্থে স্পষ্টভাবে তিনি জবাব দিলেন যে খেতে যাবেন। ঘরের বেশ পেছনে, দরজা থেকে যেন অনেক দূরে তাঁদের টেবিল পাতা হয়, স্থানীয় একটা মদ চাই। তাঁর প্রত্যেকটি কথা হোটেলের ম্যানেজার নানা বিচিত্র সুরে পুনরুক্তি করল — অবশ্য সব সুরের অর্থ হল এই যে, ভদ্রলোকটির নানা ফরমাশের ন্যায্যতা অনস্বীকার্য, সব কিছু পালিত হবে অক্ষরে অক্ষরে। অবশেষে মাথা হেলিয়ে সে জিজ্ঞেস করল:

'সব কিছু ঠিক আছে, স্যার?'

চিন্তিত সুরে 'Y-yes' উচ্চারিত হওয়াতে সে খবর দিল যে লাউঞ্জে সে রাত্রে তারান্‌তেল্লা — নাচবে কার্মেল্লা ও জুজেপ্পে, যাদের নামডাক সারা ইতালিতে ও 'ট্যুরিস্ট জগতে'।

'পোস্টকার্ডে ছবি দেখেছি কার্মেল্লার,' নিস্পৃহ কণ্ঠে বললেন সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোক। 'আর এই জুজেপ্পে লোকটা — ওর স্বামী বুঝি?'

'খুড়তুত ভাই, স্যার,' জবাব দিল হোটেল ম্যানেজার।

মুহূর্তখানেক ইতস্তত করে, কী একটা ভেবে সেটা না বলে মাথা নাড়িয়ে তাকে চলে যাবার ইশারা করলেন সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোক।

তারপর তিনি অতি সযত্নে ডিনারের জন্য সাজগোজ করতে লাগলেন যেন বিয়ের জন্য তৈরী হচ্ছেন: সবকটা আলো দিলেন জেবলে, ঘরের সমস্ত আয়না ঝকঝক চকচক করে উঠল, তাতে প্রতিফলিত হল আসবাবপত্র ও খোলা তোরঙ্গগুলি, চলল দাড়ি কামানো, মুখ ধোওয়া, ঘন ঘন ঘণ্টা বাজানো — স্ত্রী ও কন্যার কামরা থেকে অধৈর্যভরে আসা ঘণ্টার ধ্বনি তার সঙ্গে মেশাতে বারান্দাটা ঝন ঝন করতে লাগল। লাল এ্যাপ্রন পরা লুইজি আতঙ্কের ভানে মুখ বিকৃত করে জলের জগ নিয়ে ছোটাছুটি করা পরিচারিকাদের হাসিয়ে কাঁদিয়ে ভদ্রলোকের ঘণ্টাধ্বনিতে সাড়া দিতে ছুটল সবেগে -- অনেক মোটা লোকের তাড়াতাড়ি যাবার নিজস্ব যে একটা গতি আছে সেইভাবে, আঙুলের গাঁট দিয়ে দরজায় টোকা মেরে বিনয়ের আতিশয্যে গলে পড়ে বোকার মতো প্রশ্ন করল:

'Ha sonato, signore ?*'

ঘরের ভেতরে জড়িয়ে জড়িয়ে খসখসে গলায় অতিভব্য সুরে শোনা গেল:

'Yes, come in...'

তাঁর পক্ষে এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে যে রাত্রিটা, সে রাত্রে কী অনুভব করেছিলেন, কী বিষয়ে ভেবেছিলেন সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটি? — ঝোড়া সমুদ্র সবে পাড়ি

* ডেকেছেন হুজুর? (ইতালীয়)

দেওয়ার পর অন্য সকলের যা হয় — তিনি ডিনার খেতে চেয়েছিলেন শুধু, রসিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন প্রথম চামচ সুপের, প্রথম চুমুক সুরার — সত্যি বলতে ডিনারের সাজগোজের অভ্যাসিক অনুষ্ঠানের সময় একটু উত্তেজনা লাগছিল তাঁর, তাই ভাবনাচিন্তার সময় ছিল না একেবারে।

দাড়ি কামানো, মুখ ধোওয়া হল; নকল দাঁত যথাস্থানে পরিপাটি বসিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এক জোড়া রুপোর বুরুশ জোরে চালিয়ে মুক্তোর মতো পাকা, বিরল চুলের গোছা ঠিকমতো বসালেন ঘন হলদে মাথার খুলিতে, তারপর ফিকে হলদে রঙের সিল্কের অন্তর্বাস চাপালেন অতিমাত্রায় ভোজন জনিত স্ফীত কটিদেশযুক্ত, বার্ধক্যগ্রস্ত অথচ শক্তসমর্থ দেহে, কালো সিল্কের মোজা আর চকচকে জুতো পরলেন রোগা, চেপটা পায়ে, হাঁটু বেঁকিয়ে কালো প্যান্টের সিল্কের সাস্‌পেন্ডার ঠিক করে নিয়ে, মাড়ের জন্য সামনে ফেঁপে ওঠা ধবধবে সাদা শার্ট গুঁজে, হাতার কফে ঝকঝকে দুটো বোতাম লাগিয়ে খড়খড়ে কলারে বোতাম লাগানোর লড়াই শুরু করলেন। তখনো পায়ের তলায় মনে হল মেঝেটা দুলছে, বেজায় লাগছে আঙুলের ডগাগুলোয়, টুঁটির নীচে ঝোলা চামড়ায় বিঁধে যেতে লাগল কলারের বোতাম, তবু হাল না ছেড়ে বাগে আনলেন সেটাকে, পরিশ্রমে জ্বলজ্বলে চোখে, আঁটো টুঁটিচাপা কলারের দরুন লাল মুখে, হাঁপিয়ে উঠে ড্রেসিং-টেবিলের সামনের টুলটায় বসে পড়ে তাকালেন আয়নায় নিজের পূর্ণাবয়ব প্রতিচ্ছায়ার দিকে — সে ছায়া পড়েছে ঘরের সবকটা আয়নায়।

'ওঃ, কী ভয়ঙ্কর!' বিড় বিড় করে বললেন। ঝুলে পড়ল

শক্ত টেকো মাথা। কী যে তাঁর এত ভয়ঙ্কর লাগছে বোঝার বা ভাবার চেষ্টা নেই। তারপর অভ্যাসবশে খুঁটিয়ে দেখলেন বাতে শক্ত-গাঁট খাটো আঙুলগুলোকে, বাদামী রঙের বড়ো নখগুলোকে, আর আবার জোর দিয়ে বলে উঠলেন, 'কী ভয়ঙ্কর...'

কিন্তু ঠিক সে সময় ডিনারের ঘণ্টা দ্বিতীয় বার বেজে উঠল পৌত্তলিকদের মন্দিরে কাঁসরঘণ্টার মতো ঝঙ্কারে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটি কলারে টাই বেঁধে আরো আঁটো করে নিলেন, ভুঁড়ি ওয়েস্টকোটে দাবিয়ে, ডিনার-জ্যাকেট চাপিয়ে হাতার কফ ঠিক করে আর একবার চেহারাটা দেখে নিলেন আয়নায়।... 'দোআঁসলার মতো জলপাই-রঙের, চোখে কাজ করা, ফুলকাটা নারাঙ্গী রঙের পোশাকে এই কার্মেল্লা মেয়েটি নিশ্চয় চমৎকার নাচিয়ে,' ভাবতে লাগলেন তিনি। তারপর পা চালিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে কার্পেটের উপর দিয়ে গেলেন পাশে স্ত্রীর ঘরে, জোর গলায় শুধালেন তাদের তৈরী হতে আর কতক্ষণ।

'আর পাঁচ মিনিট!' এরই মধ্যে খুশিমাখা আহ্লাদে গলা শোনা গেল কন্যার।

'বেশ,' বললেন সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোক।

তারপর ধীরেসুস্থে বারান্দা ও লাল কার্পেট মোড়া সিঁড়ি হয়ে চললেন পড়ার-ঘরের খোঁজে। তাঁকে দেখে বেয়ারাগুলো দেয়ালে লেপটে দাঁড়িয়ে পড়ছে, ওদের যেন দেখেন না এমনভাবে তিনি চললেন সোজা। ডিনারে যেতে দেরী হয়ে গিয়েছে একটি বৃদ্ধার, ভদ্রলোকের সামনে বারান্দায় যত তাড়াতাড়ি পারেন চলেছেন — মহিলাটির

চুল দুধের মতো সাদা, পিঠ কুঁজো হয়ে গেছে এরই মধ্যে, তবু ফিকে-ছাইরঙের নীচু-কাট একটা গাউন পরেছেন। চলার ধরনটা মজার, মুরগীর মতো। সহজেই বৃদ্ধাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেলেন ডাইনিং-রুমে। সবাই বসে খেতে শুরু করে দিয়েছে, কাঁচের দরজার কাছে পৌঁছিয়ে সিগার ও মিসরী সিগারেটের বাক্স বোঝাই একটি টেবিলের সামনে থেমে ভদ্রলোক বড়ো একটা ম্যানিল্লা বেছে নিয়ে তিনটে লিরা ছুঁড়ে দিলেন টেবিলে; শীতোদ্যানের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে এমনি একবার চোখ মেললেন খোলা জানলার বাইরে: মৃদুমন্দ হাওয়া ভেসে এল অন্ধকার থেকে, মনে হল বুড়ো পাম গাছটার প্রকান্ড শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে পড়েছে তারায় তারায়, কানে এল দূরে সমুদ্রের সমান শব্দ।... চুপচাপ, আরামী পড়ার-ঘরে টেবিলের ওপরের বাতি ছাড়া কোনো আলো নেই। পাকাচুল একটি জার্মান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খসখস শব্দ করে খবরের কাগজ পড়ছেন, লোকটিকে দেখতে ইব্‌সেনের মতো*) — রুপোর ফ্রেমের গোল চশমার পিছনে চোখজোড়া পাগলাটে, হতচকিত। কঠিন চোখে তাঁকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোক সবুজ ঢাকনা দেওয়া একটি বাতির পাশে পুরু চামড়ার একটা আরামকেদারায় বসলেন, প্যাশ্‌নে পরে খবরের কাগজের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন একেবারে — টুঁটিচেপা কলারটার জন্য মাথাটা শুধু অস্থির। কয়েকটা শিরনামায় তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে সেই কখনো শেষ না হওয়া বলকান যুদ্ধের বিষয়ে কয়েকটি লাইন পড়ে অভ্যাসমতো ভঙ্গিতে ওলটালেন পাতাটা — আর হঠাৎ কাঁচের মতন দীপ্তিতে চোখের সামনে লাইনগুলো

ঝলকিয়ে উঠল, গলাটা ফুলে উঠল, ঠেলে বেরিয়ে এল চোখজোড়া, নাক থেকে খসে পড়ে গেল প্যাশ্‌নে... এক হেঁচকায় দেহটা এগিয়ে নিশ্বাস নেবার চেষ্টা করাতে মুখ দিয়ে পাশবিক একটা আওয়াজ বেরল শুধু; চোয়াল ঝুলে পড়াতে মুখে চিকচিকিয়ে উঠল সোনা বাঁধানো দাঁতগুলো, মাথাটা কাঁধের ওপরে ঝুলতে লাগল অসহায়ভাবে, শার্টের শক্ত বুক ফেঁপে উঠল — ভদ্রলোক গড়িয়ে মেঝেতে পড়ে গেলেন, যেন কার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছেন, জুতোর ছিল ঠুকছে কার্পেটে।

পড়ার-ঘরে জার্মানটি না থাকলে হোটেলের লোকেরা বিনাবিলম্বে গুছিয়ে ধামাচাপা দিতে পারত এই ভয়াবহ ঘটনাটিকে, খিড়কির পথে সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটিকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে যেত ঝট করে যত দূর সম্ভব তত দূরে — হোটেলে যারা এসেছে তাদের কেউ টের পেত না তাঁর দশার কথা। কিন্তু জার্মানটি চেঁচিয়ে পড়ার-ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে ডাইনিং-রুমে গোলমাল করে হৈচৈ লাগিয়ে দিলেন সারা জায়গাটায়। অনেক অতিথি চেয়ার উল্টে ডিনার ফেলে লাফিয়ে উঠল, ফ্যাকাশে মুখে অনেকে আবার ছুটে পড়ার-ঘরে গিয়ে রকমারি ভাষায় চেঁচাতে লাগল: 'কী হল, ব্যাপারটা কী?' — জবাব দিল না কেউ, মাথায় ঢুকল না কারো কী ঘটেছে, কারণ এখন পর্যন্ত লোকের কাছে সবচেয়ে তাজ্জব জিনিস হল মৃত্যু — বিশ্বাস করতে চায় না মৃত্যুকে। হোটেলের মালিক ছোটাছুটি করে অতিথিদের একে-ওকে সামলে শান্ত করার চেষ্টায় তাড়াতাড়ি আশ্বাস দিয়ে বলতে লাগল ও কিছু না, সামান্য একটা ব্যাপার মাত্র, সান-ফ্রান্সিস্কোর একটি ভদ্রলোক মূর্ছা

গিয়েছেন অল্পক্ষণের জন্য।... কিন্তু তার কথায় কান দেয় কে! অনেকে তো নিজের চোখে দেখেছে ওয়েটার আর বেয়ারারা টেনে খুলে নিচ্ছে ভদ্রলোকের টাই, ওয়েস্টকোট, ভাঁজপড়া ডিনার-জ্যাকেট, এমনকি কী কারণে জানা নেই, তাঁর কালো সিল্কের মোজা পরিহিত চেপটা পা থেকে টেনে সরিয়ে নিচ্ছে জুতোজোড়া। তখনো চলেছে তাঁর শারীরিক আক্ষেপ। একরোখা চলেছে মরণের সঙ্গে লড়াই, অপ্রত্যাশিত অভব্যভাবে চড়াও করা জিনিসটাকে মেনে নিতে পারছেন না তিনি। মাথা ঝটকাচ্ছেন এদিক-ওদিক, গলা কাটলে যেমন হয় তেমন ঘড়ঘড় শব্দ বেরোচ্ছে মুখ থেকে, চোখ ঘুরছে মাতালের মতো।... ৪৩ নং ঘরে — হোটেলের একতলার বারান্দায় একেবারে শেষে সবচেয়ে ছোট, দীনহীন, স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা ঘরটায় তাঁকে তাড়াতাড়ি নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেবার পর কন্যা ছুটে এল এলোচুলে — কর্সেটের দরুন উদ্ধত খোলা বুক দেখা যাচ্ছে ড্রেসিং-গাউনের ফাঁক দিয়ে; তারপর এলেন দশাসই স্ত্রী — ডিনারের জন্য সুসজ্জিতা, বিভীষিকায় বিস্ফারিত মুখ।... ততক্ষণে স্বামীর মাথা ঝাঁকানিটুকু পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে।

পোনেরো মিনিট যেতে না যেতে হোটেলে সব কিছু মোটের ওপর স্বাভাবিক হয়ে এল। কিন্তু সে রাত্রের বারোটা বেজে গেছে একেবারে। কয়েকজন অতিথি ডাইনিং-রুমে ফিরে এসে খাওয়া শেষ করল বটে, কিন্তু নিঃশব্দে ও মুখে আহত একটা ভাব এনে, আর হোটেলের মালিক টেবিলে টেবিলে যেতে লাগল অসহায়ভাবে, স্পষ্ট বিরক্তিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে — ভাবটা যেন বিনাদোষে সে দোষী, সবাইকে

সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগল 'ব্যাপারটা কত অপ্রীতিকর' জানতে তার বাকি নেই, অপ্রীতিকর ব্যাপারটা ফয়সলার 'যথাসাধ্য চেষ্টার' ত্রুটি হবে না; তবু তারান্‌তেল্লাটা বরবাদ করতেই হল, নিভিয়ে দেওয়া হল বাড়তি আলো, বেশীর ভাগ অতিথি গেল বিয়ারপানের ঘরে, সব কিছু এমন চুপচাপ যে বারদালানে ঘড়ির টিকটিক পর্যন্ত কানে আসে, দালানে কেউ নেই, শুধু তোতাপাখিটা কেঠো গলায় বক বক করছে — ঘুমোবার আগে তার ছটফটানি। বসার জায়গার ওপরে একটা পা হাস্যকরভাবে বাড়িয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে চেষ্টা করল সে।... মোটা কম্বলে ঢাকা লোহার শস্তা খাটে, ছাদের একটি মাত্র বাল্‌বের ক্ষীণ আলোয় শুয়ে রইলেন সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোকটি। ঠান্ডা ভিজে কপালে লাগানো রবারের একটা আইসব্যাগ। বিবর্ণ, এরই মধ্যে মৃত্যুনীল মুখ হিম হয়ে আসছে ধীরে ধীরে, সোনার দাঁতে চিকচিকে হাঁ মুখ দিয়ে নির্গত কর্কশ ঘড়ঘড়ানি ক্ষীণ হয়ে আসছে ক্রমশ। ঘড়ঘড় শব্দ করেছেন যিনি, তিনি আর সান-ফ্রান্সিস্কোর সেই ভদ্রলোক নন — আর কেউ। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন স্ত্রী, কন্যা, ডাক্তার ও চাকরেরা। হঠাৎ, যে জিনিসটার অপেক্ষায় তাঁরা ছিলেন, যেটায় ভয় তাঁদের, সেটা ঘটল — বন্ধ হয়ে গেল ঘড়ঘড়ানি। আর ধীরে, অতি ধীরে, সকলের চোখের সামনে, মৃতের মুখে ছড়িয়ে পড়ল পান্ডুর আভা, মুখাবয়বে এল হালকা সূক্ষ্ম একটা ভাব।...

ঘরে এল হোটেলের মালিক। 'Già é morto,'* ডাক্তার

* মারা গেছে। (ইতালীয়)

তাকে জানাল ফিসফিসিয়ে। ভাবলেশহীন মুখে কাঁধ ঝাঁকাল মালিক। দরবিগলিত অশ্রুজলে সিক্ত গাল ভদ্রমহিলা তার কাছে এসে অনুরোধ করলেন মৃতকে এবার যেন তাঁর ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়।

'না, না, ম্যাডাম,' তাড়াতাড়ি আপত্তি জানাল মালিক বিন্দুমাত্র ভদ্রতার বালাই না রেখে। এবার সে কথা বলল ফরাসীতে, ইংরাজিতে নয় — তার তহবিলে সান-ফ্রান্সিস্কোর এই অভ্যাগতেরা সামান্য যা কিছু দিয়ে যাবে তাতে তার আর কোনো উৎসাহ নেই। 'একেবারে অসম্ভব, ম্যাডাম,' বলে বোঝাবার জন্য জুড়ে দিল যে ঘরকটা তার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান, তাঁর অনুরোধ মেনে নিলে সারা কাপ্রি শহরে জানাজানি হয়ে যাবে, ফলে ট্যুরিস্টরা এ ঘরগুলোয় আর থাকতে রাজী হবে না।

কন্যা এতক্ষণ অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে ছিল তার দিকে, এবারে একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে মুখে রুমাল গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চোখের জল শুকিয়ে গেল, টকটকে লাল হয়ে উঠল মুখ। গলা চড়িয়ে নিজের ভাষায় জোর করে দাবী জানালেন তিনি — তখনো তাঁর বিশ্বাস করতে কষ্ট যে তাঁদের সব খাতির উবে গেছে একেবারে। ভদ্রভব্যভাবে মালিক ভর্ৎসনা করল তাঁকে: হোটেলের নিয়মকানুন ম্যাডামের অপছন্দ হলে তাঁকে ধরে রাখার দুঃসাহস তার নেই; দৃঢ় গলায় সে জানাল সকাল হবার আগে মৃতদেহ সরিয়ে না ফেললে নয়, পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছে, এখুনি তাদের কেউ একজন এসে যা করা দরকার তা করবে।... ম্যাডাম জানতে

চান কফিন পাওয়া সম্ভব কি না, কাপ্রিতে তৈরী সাদাসিধে গোছের একটা হলেও চলবে? না, দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে মোটেই সম্ভব নয়, তৈরী করিয়ে নেবার সময়ও নেই। অন্য কোন একটা উপায় খুঁজে বের করতে হবে।... ধরুন, ইংলন্ড থেকে তার কাছে সোডা-জলের বোতল আসে প্যাকিং বাক্সে... একটা বাক্সের কয়েকটা তক্তা বের করে নেওয়া যেতে পারে।...

রাত্রে হোটেলের সবাই নিদ্রামগ্ন। ৪৩ নং ঘরের জানলা খোলা হল — সামনে বাগানের একটা কোণে ভাঙা কাঁচ বসানো দীর্ঘ পাথরের দেয়ালের ছায়ায় রুগ্ণগোছের একটি কলা গাছ। আলো নিভিয়ে ঘর ছেড়ে ওরা বাইরে গেল, তালাচাবি পড়ল দরজায়। মৃত ব্যক্তিটি পড়ে রইলেন অন্ধকারে, আকাশ থেকে তাঁর দিকে চেয়ে রইল নীল তারার দল, দেয়ালে একটি ঝিঁঝিঁ শুরু করল বিষণ্ণ, বেপরোয়া গান, স্বল্পালোকিত বারান্দায় জানলার ধারিতে বসে দুটি পরিচারিকা রিপু করছে। একগাদা কাপড় হাতে আর জুতো পায়ে এল লুইজি।

'Pronto ?*' উৎকণ্ঠিতভাবে জোরে ফিস্‌ফিসিয়ে বারান্দার কোণের সেই আতঙ্কজাগানো দরজার দিকে চোখের ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করল সে। তারপর খালি হাতটা হালকাভাবে সে দিকে নাড়িয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল জোরে, 'Partenza !'** স্টেশন থেকে ধোঁয়া ছেড়ে ট্রেন বেরিয়ে গেলে সাধারণত এ চেঁচানিটা শোনা

* তৈয়ার? (ইতালীয়)

** গাড়ি ছেড়েছে! (ইতালীয়)

যায় ইতালিতে। পরিচারিকারা বোকা হাসি চেপে আরো কাছ ঘেঁষে বসল এ-ওর।

লুইজি তারপর হালকাভাবে লাফাতে লাফাতে দরজায় দৌড়িয়ে গিয়ে কপাটে মৃদু টোকা দিয়ে মাথা হেলিয়ে নীচু গলায় জিজ্ঞেস করল অত্যন্ত সসম্ভ্রমে:

'Ha sonato, signore ?'

গলা সরু করে, নীচের চোয়াল এগিয়ে দিয়ে খসখসে, বিষণ্ণ জড়ানো সুরে জবাবটা সে দিল নিজেই, যেন গলাটা আসছে দরজার ওধার থেকে:

'Yes, come in...'

ভোরবেলায় ৪৩ নং ঘরের জানলার ওপারে যখন আকাশ ফরসা হয়ে এসেছে, কলা গাছের জীর্ণ পাতায় জলো হাওয়ার খসখসানি, কাপ্রি দ্বীপের ওপর জেগে উঠে ছড়িয়ে পড়ল নীল প্রভাতী আকাশ, ইতালির সুদূর নীল নানা পাহাড়ের ওধারে সূর্য উঠে রাঙিয়ে দিল মণ্টে-সলিয়ারোর অকলঙ্ক, স্পষ্ট চূড়া, রাস্তামেরামতীর দল বেরল তাদের কাজে, ট্যুরিস্টদের পদপল্লবের জন্য দ্বীপের পথঘাট ঠিক করা শুরু হল, তখন সোডা-জলের একটি লম্বা প্যাকিং-বাক্স আনা হল ৪৩ নং ঘরে। কিছুক্ষণ যেতে না যেতে বাক্সটা বেজায় ভারি হয়ে দাঁড়াল — বেশ কষ্টের চাপ পড়ল ছোট দারোয়ানের হাঁটুতে, বাক্সটাকে যে এক-ঘোড়ার একটা গাড়িতে তাড়াতাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল পাহাড়ের গা বেয়ে আঙুর খেতের মধ্য দিয়ে, বঙ্কিম গতিতে সমুদ্রে গিয়ে নামা সাদা রাস্তা ধরে। রক্তবর্ণ চোখ, থলথলে গাড়োয়ানের গায়ে জীর্ণ পুরনো ছোট-হাতা-কোট, বুটজোড়া একেবারে ক্ষওয়া — সারা রাত সরাইখানায় নেশা ক'রে বেশ মাথা

ধরেছে তার। শক্ত জোয়ান ঘোড়াটা সজ্জিত সিসিলীয় কেতায়, লাগামে ঠুনঠুনে মুখর ঘণ্টা আর লাল পশমের ফুলের বাহার, তামার উঁচু ধারগুলোতেও তাই, ছাঁটা ঝুঁটিতে গোঁজা গজখানেক লম্বা ফুরফুরে একটা পালক। ঘোড়াটাকে ক্রমাগত চাবুক লাগাচ্ছে গাড়োয়ান। শরীরের ওপর অত্যাচার আর কুকর্মের দুর্বহ ভারে তার মুখে কথা নেই. চুপচাপ থাকার আর একটা কারণ — আগের রাত্রে পকেট বোঝাই পয়সা ফাঁক হয়ে গেছে। কিন্তু ঝরঝরে সকালে হাওয়াটা বড়ো তাজা, সমুদ্র এত কাছে, মাথার ওপরে নীল আকাশ, ফলে নেশার ঘোর কেটে যেতে সময় লাগে না, বুকটা হালকা হয়ে যায় শিগ্‌গির; তাছাড়া এখন পেছন দিকে প্যাকিং-বাক্সে যার প্রাণহীন মাথা এদিকে-ওদিকে নড়ছে সান-ফ্রান্সিস্কোর সেই ভদ্রলোকটির কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত মোটা রকম টাকা পাওয়াতে মনে বল পেয়েছে সে।... উজ্জ্বল ফিকে নীল আভায় উচ্ছল নেপ্‌ল্‌স উপসাগরে গুবরে পোকার মতো দেখতে ছোট একটি জাহাজ শেষ বারের মতো ডাক ছেড়ে সাড়া জাগিয়ে তুলেছে সারা দ্বীপের প্রত্যেকটি বাঁক, প্রত্যেকটি শৈলশিরা। প্রত্যেকটি পাথর কী পরিষ্কার স্পষ্ট, যেন আবহাওয়া বলে কোনো পদার্থ নেই! জাহাজঘাটে ঘোড়ার গাড়িটাকে ছাড়িয়ে গেল সেই মোটরগাড়িটা যাতে করে বড়ো দারোয়ান আনছিল মা ও কন্যাকে, রাত জেগে আর কেঁদে কেঁদে চোখ বসে গেছে যাদের। মিনিট দশেক পরে জল তোলপাড় করে ছোট জাহাজটা সান-ফ্রান্সিস্কোর পরিবারটিকে চিরতরে কাপ্রি থেকে নিয়ে চলল সরেণ্টো ও কাস্টেল্লামারায়।... দ্বীপে আবার ফিরে এল শান্তি ও স্তব্ধতা।

এই দ্বীপে দু'হাজার বছর আগে ছিল একটি মানুষ, নিজের ঘৃণ্য নিষ্ঠুর নানা কাজে সে একেবারে জড়িয়ে পড়ে, কী কারণে যেন লক্ষ লক্ষ লোকের ওপর ক্ষমতা লাভ করে উন্মত্ত হয়ে অকথ্য অত্যাচার সে চালায়। পৃথিবীর লোকে চিরকাল তার নাম মনে রেখেছে, আর তারা পৃথিবীর নানা দেশ থেকে এখানে আসে দ্বীপের সবচেয়ে খাড়া গায়ে তার বাসস্থানের ভগ্নাবশেষ দেখতে। সুন্দর সেই সকালটায় এই উদ্দেশ্যে কাপ্রিতে আগত সবাই হোটেলে তখনো নিদ্রামগ্ন, যদিচ টকটকে লাল জিন চাপানো, ইঁদুর-রঙা ছোট্ট গাধার দলকে সার বেঁধে তখুনি আনা হচ্ছে হোটেলের প্রবেশপথে আমেরিকান ও জার্মানদের জন্য — স্ত্রীপুরুষ, ছোকরা ও বুড়োদের জন্য। ঘুম থেকে উঠে ভরপেট খেয়ে তারা তাড়াহুড়ো করে উঠবে গাধার পিঠে, মন্টে-টাইবেরিওর একেবারে চূড়া পর্যন্ত, সারা পাথুরে রাস্তায় তাদের পেছন পেছন দৌড়বে শিরতোলা হাতে লাঠি ধরে কাপ্রির বৃদ্ধা ভিখারিনীরা। তাদের সঙ্গে যাওয়া ঠিক করে সান-ফ্রান্সিস্কোর যে বৃদ্ধটি শেষে মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন, তাঁকে জাহাজে নেপ্‌ল্‌সের পথে পাঠানো হয়ে গেছে, এই ভরসায় সুখে শান্তিতে নিদ্রা যাচ্ছে যাত্রীরা। দ্বীপে তখনো স্তব্ধতা, দোকান খোলে নি। বেচাকেনা চলেছে ছোট চকে — মাছ ও সব্জীর হাটে শুধু, সাধারণ লোক ছাড়া আর কেউ নেই সেখানে। তাদের মধ্যে আছে বরাবরকার মতো ভেরেণ্ডাভাজা দীর্ঘদেহ লরেন্‌সো মাঝি। বেপরোয়া এই লম্পটটির চেহারা এত সুন্দর যে সারা ইতালি তাকে চেনে, অনেক চিত্রকর ছবি এঁকেছে তার: রাত্রে ধরা গোটা দুয়েক

গলদা চিংড়ি সঙ্গে এনে জলের দামে সে এরই মধ্যে বেচে দিয়েছে। চিংড়িদুটো এখন খস খস করছে সেই হোটেলের বাবুর্চির অ্যাপ্রনে, যে হোটেলে রাত কাটিয়েছিল সানফ্রান্সিস্কোর পরিবার। ইচ্ছে হলে এখন সন্ধ্যা পর্যন্ত এখেনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে বেকার লরেন্সো। রাজকীয় ভাবে চারদিকে তাকিয়ে, ছিন্নভিন্ন পোশাকে, মাটির পাইপ মুখে, কান ঘেঁষে লাগানো লাল ফ্লানেলের টুপি মাথায় চেহারাটা চেয়ে দেখবার মতো। কাপ্রি থেকে আনা পাথর খোদা ধাপে প্রাচীন ফিনিসীয় পথ ধরে খাড়া মন্টে-সলিয়ারো হয়ে নামছে দুটি আব্রুজ্জিও পাহাড়ী লোক। একজনের চামড়ার ক্লোকের নীচে একটা ব্যাগপাইপ — দুটো পাইপ দেওয়া ছাগলের চামড়ার বড়ো ব্যাগ, আর একজনের হাতে — কাঠের বাঁশীর মতো দেখতে কী একটা। পাহাড় থেকে নামছে তারা, নীচের সমস্ত দৃশ্যটা আনন্দোচ্ছল, সুন্দর, ভাস্বর: দ্বীপের পাথুরে কুঁজ প্রায় সবকটা তাদের পায়ের তলায়, অপরূপ নীলের জোয়ারে ভাসমান দ্বীপ। সমুদ্র থেকে সকালের বাষ্প পুবের দিকে উঠে আকাশে উত্তরোত্তর ঊর্ধ্বগামী, ইতিমধ্যে উষ্ণ, সূর্যের চোখধাঁধানো আলোয় চিকচিক করে উঠছে, সকালের কুয়াসায় তখনো ঝাপসা কাছের ও দূরের সব পাহাড়সুদ্ধ ইতালির ফিকে নীল দেহ, যার রূপ বর্ণনা করার ভাষা মানুষের নেই।... অর্ধেক পথ নেমে দু'জনে চলার গতি কমিয়ে দিল: পথের ওপরে মন্টে-সলিয়ারোর পাথর-দেয়ালের একটা কুলঙ্গিতে ঈশ্বর জননী সূর্যালোকে, উষ্ণতায়, উজ্জ্বল আভায় স্নাত, পরনে ধবধবে সাদা পলস্তারার সাজ, বৃষ্টিতে রানীসুলভ মরচে-সোনালি রঙ

ধরা মুকুট শিরে, নম্র করুণাময়ী জননীর চোখ তিনবার-পূত সন্তানের অনন্ত আনন্দলোকে নিবদ্ধ। পাহাড়িয়ারা টুপি খুলে বাঁশীতে মুখ দিল — আর ছড়িয়ে পড়ল হাওয়া, সূর্য, প্রভাতে ও অপাপবিদ্ধ সেই নারীর উদ্দেশ্যে সরল নম্র আনন্দোচ্ছল স্তুতি, যিনি এই দুষ্ট সুন্দর পৃথিবীর সমস্ত তাপিতদের পক্ষ নেন, আর তাঁর গর্ভপ্রসূত সেই মানুষটির উদ্দেশ্যে, যিনি সুদূর জুডিয়া দেশে দরিদ্র মেষপালকদের আশ্রয়ে বেথ্‌লিহেমের একটি গুহায় জন্ম নিয়েছিলেন।...

আর সে সময় সান-ফ্রান্সিস্কোর মৃত বৃদ্ধটির দেহ নতুন জগতের* তীরে কবরে নিজের বাসায় চলেছে। মানুষের হাতে অনেক অপমান আর তাচ্ছিল্য সয়ে, নানা বন্দরের মাল গুদামে এক সপ্তাহ কাটিয়ে, অবশেষে ফিরে এলেন সেই বিখ্যাত জাহাজটিতে যেটি এই সেদিন তাঁকে এত জাঁকে নিয়ে এসেছিল পুরনো জগতে**। এবার কিন্তু জীবন্ত মানুষের কাছ থেকে গোপন করে রাখা হল তাঁকে — দাগদুষ্ট আলকাতরা মাখানো তাঁর কফিনকে রাখা হল জাহাজের অন্ধকার খোলে। তারপর আবার শুরু হল জাহাজের দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা। রাত্রিবেলায় কাপ্রি দ্বীপ পেরিয়ে গেল, অন্ধকার সমুদ্রে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাওয়া জাহাজের আলোগুলো বিষণ্ণ মনে হল দ্বীপের দর্শকদের কাছে। কিন্তু জাহাজে, ঝাড়-লণ্ঠন আর শ্বেতপাথরে উজ্জ্বল হলগুলোয় রেওয়াজমতো বিরাট একটি বল-নাচ চলেছিল সে রাত্রে।

* আমেরিকা।

** আমেরিকা বাদে, ইউরোপ।

নাচ হল দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রাত্রেও — আবার মহাসমুদ্রে তাণ্ডব ঝড়, শ্মশানবিলাপের মতো একটানা সুরে ডেকে সমুদ্রে উঠছে শবাচ্ছাদনের মতো রুপোলি পাড় দেওয়া গম্ভীর কালো ঢেউয়ের পাহাড়। রাত্রি আর ঝড়ের মধ্যে পাড়ি দেওয়া জাহাজের অসংখ্য জ্বলন্ত চোখ তুষার পর্দার আড়ালে প্রায় ঢাকা পড়ে গেল দুই পৃথিবীর* মধ্যেকার প্রবেশদ্বার জিব্রাল্টারে দাঁড়ানো শ্যেনদৃষ্টি শয়তানের কাছে। পাহাড়ের মতো বিরাট বটে শয়তান, কিন্তু তার চেয়ে বিরাট জাহাজটা। কত তলা তার, কত চোঙা, সব কিছু ডাঁটে বানিয়েছে নতুন মানুষ, হৃদয় যার প্রাচীন। রশ্মিরশি আর বরফে সাদা হাঁ-মুখ চোঙায় ঝড়ের প্রহার, কিন্তু জাহাজটা অনড়, বলিষ্ঠ, মহান — দেখলে ভয় হয়। একেবারে ওপরের ডেকে বরফের ঘূর্ণিপাকে একাকী দাঁড়িয়ে আরামী, স্বল্পালোকিত কামরা কয়েকটা, সেখান থেকে পৌত্তলিক দেবতাসদৃশ স্থূলদেহ ক্যাপ্টেন সমস্ত জাহাজের ওপরে রাজত্ব চালায়, হালকা তার ঘুম কেটে যায় বারবার। ঝড়ে রুদ্ধশ্বাস সাইরেনের গভীর আর্তনাদ ও তীব্র ভয়ার্ত চিৎকার তার কানে বাজে, কিন্তু তার আশা পাশের ঘরে একটা জিনিসের সান্নিধ্য, বাস্তবিকপক্ষে যেটাকে সে নিজেই বোঝে সবচেয়ে কম: যেন বর্মাবৃত সেই বড়ো কামরাটায় থেকে থেকে রহস্যভরা একটা হুঙ্কার, কম্পিত নীল আলোর ছিটে কর্কশ শব্দে দপ করে ফেটে পড়ছে বিবর্ণ-মুখ রেডিও-অপারেটরের চারিদিকে, তার মাথায় ধাতুর একটা অর্ধবৃত্ত বসানো। একেবারে নীচে, 'অ্যাটলান্টিসের'

* ইউরোপ ও আমেরিকার।

জলগর্ভ গভীরে, যেখানে বয়লারগুলোর বহুটনী ইস্পাত দেহ আর অন্যান্য যন্ত্র ঝাপসা আলোয় চিকচিকিয়ে হিস হিস করে বাষ্প ছিটোচ্ছে, ফেলছে ফোঁটা ফোঁটা উত্তপ্ত তেল আর জল, যে রান্নাঘরে নীচের থেকে জ্বালানো নারকীয় আগুনে পাক করা হচ্ছে জাহাজের গতি — সেখানে পুঞ্জীভূত ভয়াবহ শক্তি মথিত হয়ে যাচ্ছে শেষহীন দীর্ঘ খিলান-দেওয়া তলদেশে, স্বল্পালোকিত সেই গোল সুড়ঙ্গে যেখানে তৈলাক্ত ভিত্তির ওপর আস্তে আস্তে পাক খাচ্ছে বিরাট একটা বিম্ এত দুঃসাহসে যে মানুষের অন্তর চূর্ণ হয়ে যায়, শুঁড়ের মতো লম্বা সুড়ঙ্গে প্রসারিত জীবন্ত রাক্ষসের মতো জিনিসটা। কিন্তু 'অ্যাট্‌লাণ্টিসের' মাঝের অংশটায়, খাবার আর নাচের ঘরে আলো আর আনন্দের উচ্ছ্বাস, সুসজ্জিত মানুষের কণ্ঠস্বরে সে জায়গাগুলো জমজমাট, তার-অর্কেস্ট্রার বাজনায় মুখর, ফুলের গন্ধে জীবন্ত। আবার সেই দুটি সুঠাম পেলব ভাড়াটে প্রেমিক-প্রেমিকা ভিড়ের মধ্যে, আলো, সিল্ক, হীরে আর স্ত্রীলোকদের নগ্ন কাঁধের দীপ্ত আভায় যন্ত্রণায় সাপের মতো এঁকেবেঁকে যাচ্ছে বা পরস্পরকে জাপটে ধরছে ঝটকা মেরে — সুশ্রী মেয়েটির কলঙ্কিত বিনীত চোখ আনত, কেশের বিন্যাস তার নিষ্পাপ আর যেন আঠা দিয়ে বসানো কালো চুল দীর্ঘকায় যুবকটির মুখ পাউডারে বর্ণহীন — লম্বাটে সরু ড্রেস-কোট তার পরনে, পায়ে পেটেণ্টলেদারের সৌখীন জুতো — সুন্দর চেহারার লোকটিকে দেখতে প্রকাণ্ড একটা রক্তজোঁকের মতো। কামুক বিষণ্ণ সঙ্গীতের সুরে তাল রেখে প্রেমপীড়ার ভান করায় যে ওদের বহুদিন শুধু দিনগত পাপক্ষয়, কেউ জানে না সেটা; আর কেউ

জানে না যে অন্ধকার খোলে, তাদের থেকে অনেক, অনেক নীচে, তমসা, মহাসমুদ্র আর ঝড়ের সঙ্গে যোঝা জাহাজের বিষণ্ন গুমোট গর্ভে পড়ে আছে একটা কফিন।...

ভার্সিলিয়েভ্‌স্কয়ে, অক্টোবর ১৯১৫

লঘু নিশ্বাস

কবরখানায় টাটকা মাটির ঢিবিতে দাঁড়িয়ে আছে ওক কাঠের নতুন একটা ক্রুশ, শক্ত, ভারি, মসৃণ।

এপ্রিলের ধূসর দিন। মফস্বলের প্রশস্ত কবরখানার সমাধিফলকগুলো নেড়া গাছের ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ে অনেক দূর থেকে, ক্রুশের পাদদেশে চীনেমাটির ফুলের মালায় ঠাণ্ডা হাওয়ার শন শন থামে না আর।

ক্রুশের গায়ে লাগানো বেশ বড়ো চীনেমাটির পদকে হাসিখুশি আর আশ্চর্য সজীবচোখ একটি মেয়ের ছবি।

সে হল ওলিয়া মেশ্চের্স্কায়া।

ছেলেবেলায় বাদামী ফ্রক পরা হাই-স্কুলের মেয়েদের ভিড়ে আলাদাভাবে চোখে পড়ত না তাকে: ওর বিষয়ে কী বা বলার ছিল? শুধু এই যে, সে সুশ্রী, ধনী সৌভাগ্যবতীদের একজন, পড়াশোনায় চটপটে হলেও দুষ্টু, ক্লাসের শিক্ষয়িত্রীর হিতোপদেশে একেবারে উদাসীন।

তারপর দিনে দিনে নয়, দণ্ডে দণ্ডে কুঁড়ি ফুটিয়ে চলল তার বিকাশ। ক্ষীণ-কটি, কৃশ-পা মেয়েটি চোদ্দের কোঠায় যখন পড়ল তখনি তার বুক আর শরীরের রেখা — যার মোহিনী শক্তি মানুষের ভাষায় বাইরে — বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে; পোনেরো বছর বয়সে রূপসী বলে তার নামডাক। স্কুলের কোনো কোনো সহচরী কত না সযত্নে চুল বাঁধত, দেহের বিষয়ে কত না চুলচেরা নজর তাদের, নিজেদের পরিমিত দেহভঙ্গির ব্যাপারে কত না সতর্ক ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়! কিন্তু কোনো কিছুতে পরোয়া নেই ওলিয়ার — হোক না আঙুলে কালির দাগ, মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠুক গে, চুল যাক উসকোখুসকো হয়ে, দৌড়বার সময় পড়ে গেলে না হয় দেখা গেল নগ্ন হাঁটু। বিনা ক্লেশে গত দু'বছরের মধ্যে ক্রমশ তাতে সেই সমস্ত গুণ বর্তাল যার ফলে সে আর সব মেয়েদের তুলনায় অনন্যসাধারণ — লাবণ্য, সৌষ্ঠব, বুদ্ধিমত্তা ও চোখে স্বচ্ছ একটা দীপ্তি।... বল-নাচে ওলিয়ার মতো সুন্দর কেউ নাচে না, স্কেটিং-এ তার জুড়ি নেই, নাচের পার্টিতে সবচেয়ে খাতির তার, আর কী কারণে যেন নীচের ক্লাসের মেয়েরা তাকে নিয়ে যতটা পাগল আর কাউকে নিয়ে নয়। কিন্তু ছেলেমানুষ তখন তো আর নয়। আস্তে আস্তে হাই-স্কুলে তার একটা খ্যাতি রটে গেল, কথা উঠল, কানাঘুষো ছড়াল যে সে বড়ো বাচাল ও বেপরোয়া, ভক্ত ছাড়া টিকতে পারে না, শেন্‌শিন নামের একটি স্কুলছেলে তার প্রেমে পাগল, সেও নাকি তাকে ভালোবাসে, কিন্তু ছেলেটির প্রতি তার ব্যবহার এত চটুল যে একবার সে আত্মহত্যার উপক্রম করে।...

তার জীবনের সেই শেষ শীতকালটায় ফুর্তির হুল্লোড়ে ওলিয়া মেশ্চের্স্কায়াব মাথাটা একেবারে ঘুরে গিয়েছিল, হাই-স্কুলে অন্তত তাই বলে। সেই ঋতুতে কত না বরফ, সূর্য আর শীত! হাই-স্কুলের বাগানের দীর্ঘ ফার গাছের আড়ালে শিগ্গির অস্ত যেত সূর্য — সদাসর্বদা উজ্জ্বল ও রশ্মিময় — প্রতিশ্রুতি দিত যে কালকের দিনটায়ও আবার দেখা যাবে হিমকণা আর রোদ, হবে সবোর্নায়া স্ট্রীটে বেড়ানো, শহরের পার্কে স্কেটিং, সন্ধ্যার আকাশে গোলাপি আভা, গানবাজনা এবং স্কেটারদের এদিক-ওদিক ছুটোছুটি। আর তাদের মধ্যে ওলিয়া মেশ্চের্স্কায়ার মতো ভাবনাচিন্তাহীন ও সুখী আর কেউ নয়। তারপর একদিন দুপুরের ছুটির সময় খুশিতে চিলের মতো চিৎকাররত প্রথম শ্রেণীর এক দল মেয়ের কাছ থেকে দৌড়িয়ে পালাচ্ছে সে হল-ঘরে, সহসা তার ডাক পড়ল হেডমিস্ট্রেসের কাছে। দৌড়তে দৌড়তে হঠাৎ থেমে, গভীর একটি নিশ্বাস নিয়ে, ক্ষিপ্র ও ইতিমধ্যে খাঁটি স্ত্রীলোকসুলভ ভঙ্গিতে চুল ঠিক করে নেওয়া হল, অ্যাপ্রনের খুঁট কাঁধে টেনে ঠিকমতো বসিয়ে, দীপ্ত চোখে দৌড়ল ওপরে। হেডমিস্ট্রেস দেখতে কমবয়সী কিন্তু চুলে পাক ধরেছে, ডেস্কের সামনে বসে শান্তভাবে তিনি বুনছিলেন; পেছনের দেয়ালে জারের একটা ছবি।

'Mademoiselle মেশ্চের্স্কায়া,' ফরাসীতে বললেন তিনি, বোনার কাজ থেকে চোখ না তুলে, 'তোমার ব্যবহার নিয়ে কথা বলার জন্যে এই প্রথম তোমাকে ডেকে পাঠাতে হচ্ছে না, দুঃখিত হয়ে বলছি।'

'বলুন, ম্যাডাম, শুনছি,' বলে ডেস্কের আরো কাছে

এল ওলিয়া। হেডমিস্ট্রেসের দিকে তাকাল — উজ্জ্বল তার চোখ, লুকোচুরির কিছু নেই, মুখ ভাবলেশহীন; লাবণ্যভরে হালকাভাবে শরীরটা যে ভাবে নোয়াল তা শুধু সে-ই পারে।

'ঠিক মতো শুনবে না যে তাতে দুর্ভাগ্যক্রমে আমার আর কোনো সন্দেহ নেই,' বলে হেডমিস্ট্রেস পশমে এমন একটা টান দিলেন যে গোলাটা চকচকে মেঝেতে ঘুরতে লাগল ওলিয়ার কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করে; মুখ তুলে বললেন: 'যা বলার একবারই বলব, আর বলব সংক্ষেপে।'

বড়ো তকতকে পরিষ্কার ঘরটা বেশ ভালো লাগল ওলিয়ার। কনকনে দিনটায় স্টোভের ঝকঝকে টালিগুলো উষ্ণতা ছড়াচ্ছে, স্নিগ্ধ সৌরভ ভেসে আসছে ডেস্কে রাখা মেঠো লিলির গোছা থেকে। চমকপ্রদ কোন একটা হল-ঘরের মধ্যে পূর্ণ দৈর্ঘ্যে আঁকা নবীন জারের ছবি একবার দেখে নিয়ে হেডমিস্ট্রেসের পরিপাটি চুলের সোজা সিঁথিতে চোখ রেখে সে চুপ করে রইল প্রত্যাশায়।

'তুমি আর ছেলেমানুষ নও,' গুরুগম্ভীর চালে বললেন হেডমিস্ট্রেস, চাপা বিরক্তি তাঁর বাড়তির দিকে।

'হাঁ, ম্যাডাম,' সরল সুরে প্রায় ফুর্তির সঙ্গে জবাব দিল ওলিয়া।

'তা বলে তুমি এখনো বড়ো হয়ে যাও নি,' আরো গুরুগম্ভীর সুরে বললেন হেডমিস্ট্রেস, মুখের নিষ্প্রভ চামড়া অল্প লাল হয়ে উঠল। 'প্রথম কথা — এভাবে চুল বাঁধার আস্পর্ধা হল কী করে? চুল বাঁধার কায়দাটা একেবারে বড়োদের মতো!'

'চুলটা সুন্দর সেটা তো আমার দোষ নয়, ম্যাডাম,' বলে ওলিয়া দু'হাত তুলে সুবিন্যস্ত চুল স্পর্শ করল।

'তোমার দোষ নয়, বটে!' বললেন হেডমিস্ট্রেস। 'চুল বাঁধার ছিরিটা তোমার দোষ নয়, দামী চিরুণীগুলো তোমার দোষ নয়, বিশ রুব্ল দামের জুতো কিনিয়ে বাপ-মাকে যে পথে বসাচ্ছ সেটাও তোমার দোষ নয়! কিন্তু শোনো, তুমি যে এখনো হাই-স্কুলের একরত্তি মেয়ে সেটা একেবারে ভুলে গিয়েছ...'

এতে ওলিয়া মেশ্চের্স্কায়া নিজের সমস্ত সারল্য ও ধীরস্থির ভাব অটুট রেখে রেখে হঠাৎ ভদ্রভাবে বাধা দিয়ে বলল:

'মাফ করবেন ম্যাডাম, কিন্তু আপনি ভুল করছেন: আমি বড়ো হয়ে গেছি। আর দোষটা কার — জানেন? আলেক্সেই মিখাইলভিচ মালিউতিনের, বাবার বন্ধু ও প্রতিবেশী এবং আপনার ভাই যিনি। ব্যাপারটা ঘটেছিল গাঁয়ে গত গ্রীষ্মকালে।...'

উপরোক্ত বাক্যালাপের এক মাস পরে, অসুন্দর ও অনভিজাত চেহারার একটি কসাক অফিসার, ওলিয়ার সমাজের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক যার নেই, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, ট্রেন থেকে নামা একগাদা লোকের চোখের সামনে প্রকাশ্যে গুলি করল ওলিয়াকে। ওলিয়ার যে অবিশ্বাস্য স্বীকারোক্তি হতভম্ব করে দিয়েছিল হেডমিস্ট্রেসকে দেখা গেল সেটা সত্যি: তদন্তকারী হাকিমের কাছে অফিসারটি একটি বিবৃতিতে বলল যে মেশ্চের্স্কায়া তাকে প্রলুব্ধ করে ঘনিষ্ঠতা করেছিল, বলেছিল বিয়ে করবে, তারপর, যেদিন সে খুন হল সেদিন

নভোচের্কাস্স্কের ট্রেনে তাকে তুলে দিতে এসে রেলওয়ে স্টেশনে হঠাৎ বলল এমনকি তাকে ভালোবাসার কথা কখনো মনে ঠাঁই দেয় নি সে, বিয়ের কথা বলে শুধু তাকে নিয়ে মজা করেছে, ডায়েরীতে মালিউতিনের বিষয়ে লেখা পাতাটা সে তাকে দেয়।

'সে কটা লাইন পড়ে নেবার সময় দিয়ে ও প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতে লাগল, আর পড়ার পর সঙ্গে সঙ্গে ওকে গুলি করলাম,' বলল অফিসারটি। 'এই তো ওর ডায়েরী, দেখুন, গেল বছরের ১০ই জুলাই তারিখে কী লেখা...'

ডায়েরীতে লেখা:

'রাত প্রায় দুটো। গভীর ঘুম এসে গিয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠলাম।... আজ... আমি তাহলে একেবারে বড়ো হয়ে গেছি! বাবা, মা আর তোলিয়া সবাই শহরে, আমি ছিলাম একেবারে একলা। একলা থাকতে কত না ভালো লাগল! সকালে গেলাম বাগানে আর মাঠে, গেলাম বনে, মনে হল সারা পৃথিবীতে আমি একা, আর ভাবলাম এত আরাম ও আনন্দ লাগছে যা আর কখনো হয় নি। বড়ো হাজরি খেলাম একা, তারপর পুরো এক ঘণ্টা পিয়ানো বাজানো, বাজনা শুনে মনে হল আমি বেঁচে থাকব চিরকাল, আমার মতো সুখী আর কেউ হবে না। বাবার পড়ার ঘরে তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম, বেলা চারটের সময় কাতিয়া জাগিয়ে দিয়ে বলল আলেক্সেই মিখাইলভিচ এসেছেন। তাঁকে দেখে বেজায় খুশি হলাম, তাঁকে বসাতে, আদর আপ্যায়ন করতে বেশ লাগত। দুটো খুব সুন্দর ঘোড়ায় টানা গাড়িতে তিনি এসেছিলেন। ঘোড়াদুটো দেউড়ির সামনেটায় রইল সারাক্ষণ। তখ্খুনি তিনি গেলেন

না, বৃষ্টি পড়েছিল কিনা, ভাবলেন সন্ধ্যের মুখে রাস্তাঘাট একটু খটখটে হয়ে যাবে। বাবার সঙ্গে দেখা না হওয়াতে তিনি দুঃখিত, বেশ হাসিখুশি মেজাজে নাগরের মতো আমার সঙ্গে ব্যবহার করলেন, ঠাট্টা করে এমন ভাব দেখালেন যে বহুদিন হল আমার প্রেমে পড়েছেন। চায়ের আগে বাগানে ঘোরার সময় আবহাওয়া আবার মধুর হয়ে উঠল, রোদে ভেসে গেল টুপটাপ বৃষ্টিবিন্দু ঝরা গোটা বাগানটা। তবু কী ঠান্ডা! তিনি আমার হাত ধরে বললেন আমরা হলাম ফাউস্ট আর মার্গারেট*)। বয়স তাঁর ছাপ্পান্ন, কিন্তু দেখতে বেশ আর সর্বদা ফিটফাট — একটা জিনিস শুধু ভালো লাগে নি, সেটা হল ওঁর কেপ মাথায় আসাটা। বিলিতি সেন্টের গন্ধ ওর গায়ে, চোখজোড়া বেশ নবীন আর কালো, সুষ্ঠুভাবে লম্বা দু'ভাগ করা দাড়ি কিন্তু একেবারে পাকা। কাঁচের বারান্দায় বসে চা খেলাম, শরীরটা কেমন যেন চনমন করে ওঠাতে সোফায় শুয়ে পড়লাম। উনি ধূমপান করছিলেন, তারপর এসে বসলেন আমার পাশে, আবার নানা স্তাবনা করে আমার হাত খুঁটিয়ে দেখে চুমো খেতে লাগলেন। সিল্কের রুমালে মুখ ঢাকলাম।... উনি সিল্কের ওপরে আমার ঠোঁটে চুমো খেলেন বারকয়েক।... ব্যাপারটা ঘটল কী করে জানি না, মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল নিশ্চয়। আমি যে এরকম ভাবতেও পারি নি কখনো! এখন উদ্ধারের একটা মাত্র পথ খোলা আমার কাছে।... ওঁর প্রতি আমার বিতৃষ্ণা এত প্রবল অসহ্য একেবারে!'

এপ্রিলের সেসব দিনে শহরটা এত পরিষ্কার আর খটখটে, রাস্তার পাথর সাদা, তার ওপর দিয়ে হাঁটা সহজ

আর প্রীতিকর। গির্জায় প্রার্থনার পর প্রতি রবিবার ছোটখাটো একটি মহিলা সবোর্নায়া স্ট্রীট হয়ে রওনা হন শহরের বাইরে, পরনে তাঁর শোকপরিচ্ছদ, কালো দস্তানাজোড়া নরম চামড়ার, ছাতার বাঁট আবলুস কাঠের। তিনি যান নোংরা চকের বাঁধানো রাস্তা ধরে, চকের চারপাশে ধোঁয়ায় কালো অনেক কামারশালা, মাঠের দমকা তাজা হাওয়া ফেটে পড়ে থেকে থেকে; আরো দূরে, মঠ আর জেলখানার মাঝখানটায় দেখা যায় আকাশের মেঘে সাদা দিগন্ত আর বসন্তকালীন মাঠঘাটের ধূসর ছোপ, তারপর মঠের দেয়ালের কাছাকাছি জলের গর্তের মধ্য দিয়ে গেছে রাস্তাটা, বাঁ দিকে মোড় নিলে সাদা দেয়ালে ঘেরা একটি বড়ো, নীচু বাগান, ফটকে আঁকা স্বর্গে কুমারী মেরির সম্বর্ধনা দৃশ্য। ছোটখাটো স্ত্রীলোকটি সতর্ক ক্ষিপ্রভাবে ক্রুশচিহ্ন করে দৃঢ় পায়ে অভ্যেস মতো এগোন বাগানের বড়ো বীথিকা হয়ে। ওক কাঠের ক্রুশের মুখোমুখি বেঞ্চিটায় পৌঁছিয়ে ঘণ্টাখানেক বা দুয়েক বসে থাকেন হাওয়ায় আর বসন্তের ঠাণ্ডায়, যতক্ষণ না পাতলা জুতো পরা পা আর হালকা দস্তানা মোড়া হাত একেবারে অসাড় হয়ে যায়। ঠাণ্ডা হলেও মিষ্টি সুরে গান গায় বসন্তের পাখিরা, সে গান আর চীনেমাটির তৈরী ফুলের মালায় হাওয়ার শন শন শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে ভাবেন এই মরা ফুল কখনো যদি না দেখতে হত তার জন্য দিতে পারেন অর্ধেক জীবন। ফুলের এই মালা, মাটির এই ঢিবি আর ওক কাঠের ক্রুশটা! সত্যি কি ক্রুশের নীচে শায়িতা সে, যার চোখ ওপরের পদক থেকে চেয়ে আছে এমন অমর ভাস্বরতায়, সে চোখের শুচিতার সঙ্গে কেমন করে খাপ

খাওয়ানো যায় ওলিয়া মেশ্চেরস্কায়া নামের সঙ্গে অধুনা জড়িত বিভীষিকাকে? — কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থলে সুখী ছোটখাটো মহিলাটি, তীব্র আবেগে একটা স্বপ্নকে যারা আঁকড়ে থাকে তাদের সবাইকার মতো।

স্ত্রীলোকটি হলেন ওলিয়া মেশ্চেরস্কায়ার ক্লাসের শিক্ষয়িত্রী, বিগতযৌবনা অবিবাহিতা মহিলাটি বহুদিন বাস্তবের বদলে কল্পনার জগতে বাস করছেন। প্রথম রঙীন কল্পনা ছিল তাঁর ভাইটিকে ঘিরে — জুনিয়র অফিসারটি গরীব, কোনক্রমে উল্লেখযোগ্য বলা যেত না তাকে — তাকে কেন্দ্র করে তাঁর সমস্ত স্বপ্ন দানা বাঁধে, কী কারণে যেন ভেবেছিলেন সে ভবিষ্যতে খুব বড়ো কিছু একটা হবে। মুক্দেনের যুদ্ধে যখন সে মারা গেল, তখন তিনি নিজেকে এই বলে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করলেন — তিনি কাজ করছেন একটি আদর্শের জন্য! ওলিয়া মেশ্চেরস্কায়ার মৃত্যু তাঁকে নিয়ে গেল নতুন একটি স্বপ্নলোকে। আর এখন তাঁকে হানা দেওয়া নানা চিন্তা ও অনুভূতির বিষয়বস্তু — ওলিয়া মেশ্চেরস্কায়া। প্রতিটি উৎসবের দিনে তার কবরে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেয়ে থাকেন ওক কাঠের ক্রুশের দিকে, মনে আনেন কফিনে শোয়া ফুলের মধ্যে ওলিয়া মেশ্চেরস্কায়ার বিবর্ণ ছোট মুখ — আর, সহসা একবার, কানে আসা তার কয়েকটি কথা: দুপুরের ছুটির সময় হাই-স্কুলের বাগানে বেড়াতে বেড়াতে কথাগুলো তাড়াতাড়ি, খুব তাড়াতাড়ি ওলিয়া মেশ্চেরস্কায়া বলেছিল তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী, দীর্ঘাঙ্গিনী, মোটাসোটা সুব্বাতনাকে:

'বাবার একটা বইয়ে পড়লাম — অনেক পুরনো মজার

বই আছে বাবার — পড়লাম মেয়েমানুষের সৌন্দর্য কী রকম হওয়া উচিত... জানিস, এত সব লেখালেখি যে মনে রাখা ভয়ানক শক্ত: অবশ্য তার চোখ কালো, ফুটন্ত আলকাতরার মতো কালো. সত্যি বলছি রে বিশ্বাস কর — ঠিক তাই লিখেছে: ফুটন্ত আলকাতরার মতো! — রজনীর মতো কালো হওয়া চাই চোখের পাতা, গালে থাকা দরকার কোমল রক্তাভা, দেহ হওয়া চাই দোহারা, হাতদুটো সাধারণের চেয়ে লম্বা — ভাবতে পারিস — সাধারণের চেয়ে লম্বা! — পায়ের পাতা ছোট, মানানসই বড়ো বুক, সুগঠিত পা, ঝিনুক-রঙা হাঁটু, নরম কাঁধ — কথাগুলো এত সত্যি যে অনেকগুলো মুখস্থ করে ফেলেছে! — কিন্তু আসল জিনিসটা, সবচেয়ে বড়ো কথা কী জানিস? — লঘু নিশ্বাস! আর আমার তো আছেই সেটা — আমার নিশ্বাসপ্রশ্বাস কেমন শোন্ না — লঘু, তাই না?'

আর এখন সেই লঘু নিশ্বাস মিলিয়ে গেছে পৃথিবীতে, এই মেঘলা আকাশে, বসন্তের এই শিরশিরে হাওয়ায়।

১৯১৬

সর্দিগর্মি

ডিনারের পর ডাইনিং-রুমের গরম উজ্জ্বল আলো থেকে চলে এসে তারা দাঁড়াল ডেকে, রেলিং-এর কাছ ঘেঁষে। চোখ বুজে মেয়েটি হাতের উল্টো দিক গালে চেপে হেসে উঠল সহজ, মধুর স্বরে — ছোটখাটো মেয়েটির সব কিছুই মধুর — তারপর বলল:

'মনে হচ্ছে নেশা হয়েছে আমার।... কোত্থেকে এসেছেন আপনি? তিন ঘণ্টা আগে এমনকি অপনার অস্তিত্ব পর্যন্ত জানা ছিল না। কোথায় যে স্টীমারে উঠলেন তাও জানি না। সামারায়? যা হোক, সব সমান।... আমার মাথা ঘুরছে, না স্টীমারটা মোড় নিচ্ছে?'

সামনে অন্ধকার আর আলো। একটানা মৃদুমন্দ হাওয়া অন্ধকার থেকে বইছে তাদের মুখে, সামনে থেকে আলোগুলো ছুটে পালাচ্ছে এক পাশে: ভোল্‌গা জলযানের

সচরাচর ক্ষিপ্রগতিতে স্টীমারটা বড়ো একটা পাক দিয়ে চলেছে ছোট জেটির দিকে।

মেয়েটির হাত ধরে লেফ্‌টেনাণ্ট ঠোঁটে ছোঁয়াল। ছোট্ট বলিষ্ঠ হাতে রোদেপোড়া গন্ধ। আর তার বুক স্বর্গসুখে আর ভয়ে থমকে দাঁড়াল এই ভেবে যে, দক্ষিণী আকাশের নীচে তপ্ত বালুতে (মেয়েটি বলেছিল আনাপা থেকে ফিরছে) পুরো এক মাস সূর্যস্নানের পর লিনেনের পাতলা ফ্রকের নীচে ওর সারা শরীর কী শক্ত আর তামাটে।

'চলুন নামা যাক...' অনুচ্চ কণ্ঠে বলল লেফ্‌টেনাণ্ট।

'কোথায় ?' অবাক হয়ে মেয়েটি শুধাল।

'এখানে নেমে পড়ি।'

'কেন ?'

কিছু বলল না লেফ্‌টেনাণ্ট। মেয়েটি আবার হাতের উল্টো দিক চাপাল তপ্ত গালে।

'পাগলামি...'

'চলুন নামি,' ভারি গলায় সে আবার বলল, 'দোহাই আপনার. .'

'বেশ, আপনার যা ইচ্ছে তাই করুন,' মুখ ফিরিয়ে মেয়েটি বলল।

যতদূর সম্ভব বেগে এসে স্বল্পালোকিত জেটিতে স্টীমারটা লাগল আস্তে ধপ্‌ করে। দু'জনে আর একটু হলে এ-ওর গায়ের ওপর পড়ত। মাথার ওপর দিয়ে ছুটে এল একটা দড়ি, স্টীমারটাকে টেনে নেওয়া হতে লাগল, শুরু হল জলের তোলপাড়, নামবার তক্তার গড়গড় শব্দ।... মালপত্র আনতে ছুটল লেফ্‌টেনাণ্ট।

মিনিটখানেক পরে ঘুমে জড়ানো ছোট আপিসটা পেরিয়ে

বালুতীরে এসে পড়ল দু'জন। বালিতে পায়ের গাঁট অবধি বসে যাচ্ছে, নীরবে উঠল একটি ধুলোভরা গাড়িতে। বিরল বাঁকা বাঁকা লণ্ঠনে আলোকিত পাহাড়ের ঢালুর মধ্যে ধুলোয় নরম পথের শেষ হবার নামগন্ধ নেই মনে হল তাদের। কিন্তু এবার ঢালুর শেষ, শুরু হল পাথুরে রাস্তায় চাকার খট্‌খট্‌ আওয়াজ। এই তো কোন চক, নানাবিধ দফতর ও অফিস, দমকল বাহিনীর মিনার, গ্রীষ্মের রাতে মফস্বল শহরের উষ্ণতা ও গন্ধ।... একটি আলোকিত ফটকের সামনে গাড়োয়ান গাড়ি থামালে খোলা দরজার ফাঁকে চোখে পড়ল খাড়া পুরনো কাঠের সিঁড়ি এবং গোলাপী শার্ট ও কোট পরা দাড়িগোঁফ না কামানো বুড়ো একটি দারোয়ান। বেজার মুখে সে নেংচাতে নেংচাতে তাদের স্যুট্‌কেস নিয়ে পথ দেখিয়ে চলল ওপরে। বড়ো কিন্তু সারা দিনের তাপে বেজায় গুমোট একটা ঘরে নিয়ে গেল তাদের। জানলায় সাদা পর্দা, ড্রেসিং-টেবিলে গোটা দুয়েক নতুন মোমবাতি। ঘরে ঢুকতেই দারোয়ান দরজা বন্ধ করে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই লেফ্‌টেনাণ্ট এত অধীর আবেগে ছুটে গেল মেয়েটির কাছে, চুম্বন করার সময়টায় এত তীব্র বাসনায় দু'জনের হাঁফ ধরে গেল যে পরে অনেক বছর তাদের মনে জেগে ছিল মুহূর্তটির স্মৃতি: সারা জীবনে দু'জনের কারোর এরকম অভিজ্ঞতা আর কখনো হয় নি।

সকাল দশটার সময় চলে গেল সেই ছোটখাটো অনামী মেয়েটি, শেষ পর্যন্ত যে নাম জানায় নি লেফ্‌টেনাণ্টকে, হেসে হেসে নিজের শুধু পরিচয় দিয়েছে অচেনা সুন্দরী বলে। তপ্ত রৌদ্রোজ্জ্বল, আনন্দভরা সেই সকালটায় গির্জার

ঘণ্টাধ্বনি, হোটেলের সামনে হাটের হৈচৈ, খড়ের, আলকাতরার আর রুশী মফস্বল শহরের নানা উগ্র মিশ্র গন্ধ। রাত্রে বিশেষ ঘুমোয় নি তারা কিন্তু সকালে বিছানা ছেড়ে পর্দার আড়ালে গিয়ে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে মুখহাত ধুয়ে জামাকাপড় পরে নেবার পর তাকে দেখাল সপ্তদশীর মতো নবীনা। অস্বস্তি লাগছিল কি তার? না, খুবই সামান্য একটু শুধু। আগের মতো তার সহজ হাসিখুশি ভাব, আর তার বিচক্ষণ বুদ্ধির পরিচয় পেতে দেরী হল না।

'না, না, মণি,' একসঙ্গে আবার যাত্রার প্রস্তাবের উত্তরে সে বলল, 'না, পরের স্টীমার না আসা পর্যন্ত আপনাকে থেকে যেতে হবে। দু'জনে একসঙ্গে গেলে সব কিছু পণ্ড হবে। আমার বেজায় খারাপ লাগবে। গা ছুঁয়ে বলছি, আমাকে হয়ত যা ভেবেছেন মোটেই আমি তা নই। এটা তো দূরের কথা, এর ঘেঁষা কিছু আমার জীবনে ঘটে নি কখনো, আর ঘটবেও না। আমার বুদ্ধি লোপ পেয়ে গিয়েছিল নির্ঘাত।... কিংবা হয়ত আমাদের দু'জনের সর্দিগর্মি গোছের কিছু একটা হয়েছিল।...'

আর কেমন যেন হালকা মনেই তার কথা মেনে নিল লেফ্‌টেনাণ্ট। স্টীমার-ঘাটে হালকা খুশি মনে গেল তার সঙ্গে — গোলাপী রঙের 'সামোলিওৎ'*) ছেড়ে দেবার উপক্রম করেছে তখন — ডেকের সবার সামনে তাকে চুমু খেয়ে নামবার তক্তা সরিয়ে নেবার সময় কোনক্রমে লাফিয়ে পড়ল তা থেকে।

আগেকার মতো নিশ্চিন্ত হালকা মনে সে ফিরল হোটেলে। কিন্তু মনে হল এরই মধ্যে সেখানটা কিছু

বদলেছে। ও নেই, ঘরটার চেহারা তাই কেন যেন একেবারে আলাদা। এখনো সেটা তার উপস্থিতিতে ভরাট, কিন্তু ফাঁকা! কী আশ্চর্য ঘরে তখনো তার বিলিতী ওডিকলোনের খাসা গন্ধ, ট্রেতে শেষ-না-করা তার চায়ের কাপ, কিন্তু তবু সে নেই।... আর কোমল অনুরাগে লেফ্‌টেনাণ্টের বুকটা এমন মুচড়ে উঠল যে, তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট ধরিয়ে সবেগে পায়চারি করতে লাগল ঘরে।

'কী অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা!' হেসে বলে উঠল জোরে, অথচ টের পেল চোখ ফেটে কিন্তু জল আসছে তার। — ''গা ছুঁয়ে বলছি, আমাকে হয়ত যা ভেবেছেন মোটেই আমি তা নই...' আর চলে গেছে...'

পর্দাটা সরানো, বিছানা তখনো ঠিক করা হয় নি। ওর মনে হল বিছানার দিকে তাকানো এখন অসহ্য। পর্দা টেনে আড়াল করল বিছানাটা, হাটের হৈচৈ, গাড়ির চাকার আর্তনাদ ঢাকার জন্য জানলাগুলো বন্ধ করে দিয়ে সাদা ফোলা পর্দাগুলো নামিয়ে বসে পড়ল সোফায়।... তাহলে 'জাহাজী কাণ্ডকারখানার' সমাপ্তি হল! ও তো চলে গেছে, এতক্ষণে অনেক দূরে, হয়ত বসে আছে কাঁচের সাদা লাউঞ্জে, নয়ত ডেকচেয়ারে হেলান দিয়ে তাকিয়ে আছে রোদে চিকচিকে বিরাট নদীর দিকে, ভাটির দিকে কাঠের ভেলা চলেছে, হলদে বালুর চর, জল আর আকাশের উজ্জ্বল দৃশ্যপট, ভোল্‌গার অনন্ত বিস্তার... আর বিদায়, চিরবিদায়... আবার কোথাও দেখা হওয়া কি সম্ভব? — 'সত্যি তো,' সে ভাবল, 'আমি বিনা কারণে কী করে হাজির হই সে শহরে যেখানে থাকে ওর স্বামী, ওর তিন বছরের মেয়ে, আর মোটের ওপর যেখানে ওর গোটা

সংসার, রোজকার জীবন।' — শহরটা তার কাছে মনে হল অন্য ধরনের, পূত সে শহর, সেখানে মেয়েটি কাটাবে তার নিঃসঙ্গ জীবন, হয়ত প্রায় মনে পড়বে তার কথা, মনে পড়বে হঠাৎ দেখার কথা, নশ্বর মুহূর্তগুলির কথা। আর সে কখনো চোখে দেখতে পাবে না তাকে — চিন্তা করে হতবুদ্ধি লাগল লেফ্‌টেনাণ্টের। না, তা হতে পারে না! পাগলের মতো ব্যাপার হবে, অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও অবিশ্বাস্য ব্যাপার! এত তীব্র ব্যথা বোধ করল সে, ওর সঙ্গহীন সামনে প্রসারিত দীর্ঘ জীবনকে এত অর্থহীন মনে হল যে, আতঙ্কে আর হতাশায় হৃদয় ভরে গেল।

'ছাইপাঁশ কী ভাবছি!' ভেবে উঠে পড়ে আবার শুরু করল পায়চারি, চেষ্টা করল পর্দার আড়ালে বিছানাটায় চোখ যাতে না পড়ে। 'কী হয়েছেআমার? আর ওর মধ্যে আহামরি কী দেখেছি, ঘটেছে কী শুনি? সত্যি সর্দিগর্মির মতো ব্যাপারটা! কিন্তু আসল কথা হল, এই হতচ্ছাড়া শহরটায় ওকে ছাড়া বাকি দিনটা কাটাই কী করে?'

মেয়েটির সমস্ত কিছু এখনো মনে আছে তার, ওর সামান্যতম সব স্বকীয়তা, মনে আছে ওর রোদে-পোড়া চামড়া, লিনেনের পোশাক আর বলিষ্ঠ দেহের গন্ধ, ওর মধুর, সহজ, হাসিখুশি গলার স্বর।... ওর স্ত্রীলোকসুলভ সমস্ত মোহিনী মায়ায় নিজের তীব্র উচ্ছ্বাসের অনুভূতি এখনো আছে অসাধারণ স্পষ্টভাবে; তবু অন্য, একেবারে অভিনব এই অনুভূতিটা আরো গুরুত্বপূর্ণ এখন — যে বিচিত্র অদ্ভুত অনুভূতিটা ওর সঙ্গে থাকার সময় একবারও অনুভব করে নি। আগের রাত্রে মজার অভিজ্ঞতা হিসেবে

ব্যাপারটা শুরু করার সময় কখনো মনে হয় নি এ ধরনের অনুভূতি তার হতে পারে। এই অনুভূতির কথা ওকে আর বলা যায় না এখন! — 'আর সবচেয়ে খারাপ হল, ওকে বলতে আর পারব না কখনো!' ভাবল লেফ্‌টেনাণ্ট। 'কী করি? এই সব স্মৃতি আর অশান্ত যন্ত্রণার চাপে কী করে অন্তহীন দিনটা কাটাই চিকচিকে ভোল্‌গাপারের পাণ্ডববর্জিত এই শহরটায়, ভোল্‌গা বেয়ে তাকে নিয়ে গেছে গোলাপী জাহাজটা!'

মুক্তির সন্ধান করা দরকার, অন্যমনস্ক হবার জন্য কিছু করা চাই, যেতে হবে কোথাও একটা। মন ঠিক করে মাথায় টুপি চাপিয়ে, ছড়িটা তুলে নিয়ে ফাঁকা বারান্দায় টপবুটের লোহার কাঁটা খট্‌খটিয়ে সে ক্ষিপ্র পায়ে খাড়া সিঁড়ি বেয়ে ছুটল সদর দরজায়।... বেশ, কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়? বাইরে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে, ফিটফাট পোশাকে কমবয়সী একটি গাড়োয়ান কার প্রতীক্ষায় যেন ধীরভাবে সিগারেট টেনে চলেছে। বিব্রত অবাকভাবে লেফ্‌টেনাণ্ট তাকাল তার দিকে: কোচবাক্সে এমন ধীরস্থিরভাবে বসে সিগারেট টানছে, সব মিলিয়ে এমন একটা সাধারণ, বেপরোয়া আর উদাসীন ভাব লোকটার আসে কী করে? — 'গোটা এই শহরে বোধহয় আমিই একমাত্র লোক যে ভয়ংকর অসুখী,' — ভেবে বাজারের দিকে চলল লেফ্‌টেনাণ্ট।

বাজারে এরই মধ্যে ভিড় কমে আসছে। শসাবোঝাই গাড়ির মাঝখান হয়ে, তাজা গোবরে পা দিয়ে নিরুদ্দেশভাবে সে চলল। চারিধারে নতুন হাঁড়ি-কুঁড়ি আর ঘটিবাটি। মাটিতে বসে থাকা মেয়েরা এ-ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জিনিস বেচতে চাইছে তাকে। বাটিগুলো তুলে আঙুলের টোকায়

আওয়াজ তুলে দেখাতে চাইল কত খাসা জিনিস। এদিকে লোকেদের চিৎকারে কান ঝালাপালা হবার জোগাড়: 'এই যে হুজুর, এমন খাসা শসা আর কোথাও পাবেন না, হুজুর!' — সমস্ত ব্যাপারটা এত অবান্তর আর বিশ্রী যে, বাজার ছেড়ে পালাল লেফ্‌টেনাণ্ট। গির্জায় গিয়ে পড়ল যখন, তখন প্রার্থনা সঙ্গীত গাওয়া হচ্ছে জোর গলায়, আনন্দ ও সিদ্ধকর্তব্যের অনুভূতিতে; তারপর নদীর ইস্পাত-ধূসর সীমাহীন প্রসারের পাড়ে পাহাড়টায় ছোট পরিত্যক্ত উত্তপ্ত বাগানে ঘোরাফেরা করল অনেকক্ষণ।... টিউনিকের ব্যাজ আর বোতামগুলো এত তেতে উঠেছে যে ছোঁয়া যায় না। টুপির ভেতরকার ফিতেটা ঘামে চটচটে, মুখটা জ্বলছে।... হোটেলে ফিরে বেশ ভালো আর আরাম লাগল একতলার বড়ো ফাঁকা ঠাণ্ডা ডাইনিং-রুমে গিয়ে টুপি খুলে খোলা জানলার কাছে একটা টেবিলে বসতে। জানলা দিয়ে বইছে উত্তপ্ত হাওয়া, তবুও হাওয়া তো বটে। বরফ-দেওয়া বীট পালঙের সুপ ফরমাশ করল।... সব কিছু বেশ ভালো, সমস্ত কিছুতে অতল সুখ, বিপুল আনন্দ; আনন্দ রয়েছে এমনকি এই গরমে, হাটের গন্ধে, অদ্ভুত, শ্রীহীন অচেনা ছোট শহরে, মফস্বলের পুরনো হোটেলটায়, তবু সেই সাথে তার বুক ভেঙে যাচ্ছে। কয়েক গেলাস ভোদ্‌কা শেষ হল, নুন-দেওয়া শসা খেতে খেতে ভাবল, যদি কোনো জাদুমন্ত্রে ওকে ফিরিয়ে আনা যায়, শুধু যদি আর একটি দিন কাটাতে পারে ওর সঙ্গে, তাহলে কোনো দ্বিধা না করে আগামীকাল মরে যেতে প্রস্তুত সে — দিনটা কাটাতে চায় শুধু ওকে বলার, বোঝানোর জন্য, ওর কাছে প্রমাণ করার জন্য যে ওকে ভালোবাসে কী জ্বালায়,

তীব্র অনুরাগে।... কিন্তু কেন প্রমাণ করা? কেন বোঝানো? সে জানে না কেন, কিন্তু তা বেঁচে থাকার চেয়েও বেশী দরকার।

'স্নায়গুলোর বারোটা বেজে গেছে!' অনুচ্চকণ্ঠে বলে ভোদ্‌কা ঢালল পঞ্চম বারের মতো।

সুপ সরিয়ে দিয়ে, কালো কফি আনতে বলে, সিগারেট খেতে খেতে একাগ্রভাবে ভাবতে লাগল: কী করা যায় এখন, কী করে রেহাই পাওয়া যায় এই আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত ভালোবাসা থেকে? তা তো অসম্ভব, কথাটা অনুভব করল তীব্রভাবে। হঠাৎ চটপটে উঠে পড়ল, টুপি আর ছড়ি হাতে ডাকঘরের হদিস নিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটল সেখানে, টেলিগ্রামে কী লিখবে মনে মনে তার খসড়া প্রস্তুত: 'আজ থেকে চিরদিন, আমরণ আমার গোটা জীবন আপনার হাতে।' কিন্তু মোটা দেয়ালের পুরনো তার ও ডাকঘরে পেঁছিয়ে হতবুদ্ধির মতো থমকে দাঁড়াল: কোন শহরে ও থাকে সে জানে, জানে ওর স্বামী ও একটি তিনবছরের মেয়ে আছে, কিন্তু ওর নাম ও পদবীটি তো জানা নেই! আগের রাত্রে খাবার আগে আর পরে হোটেলে বারবার জানতে চেয়েছে তার নাম, কিন্তু সে শুধু হেসে বলেছে:

'কিন্তু আমি কে, আমার নাম কী, কেন জানতে চান?'

ডাকঘরের পাশে রাস্তার কোণে একটি ফটোগ্রাফারের দোকান। অনেকক্ষণ সে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল একটি অফিসারের বড়ো ফটোর দিকে — পুরু পাড় দেওয়া কাঁধপট্টিদুটো, বেরিয়ে আসা চোখ, নীচু কপাল, অদ্ভুত চমৎকার জুলফি। বিরাট চওড়া বুক ঢাকা নানা সম্মান

চিহ্নে।... কী পাগলের মতো, কী বিদ্ঘুটে আর ভয়ঙ্কর লাগে সাধারণ, তুচ্ছ সব জিনিসকে যখন হৃদয় আহত হয় — হ্যাঁ, এখন সে জানে তার হৃদয় আহত হয়েছে, ভয়ঙ্কর সেই 'সর্দিগর্মিতে', সহ্যাতীত প্রখর প্রেমে, সহ্যাতীত বিপুল সুখে! নবদম্পতীর একটি ছবির দিকে সে তাকাল — অল্প বয়সী বরের গায়ে লম্বা ফ্রককোট, গলায় সাদা টাই, চুল ছোট করে ছাঁটা, বিয়ের ওড়না পরা একটি মেয়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে টান হয়ে — চোখ পড়ল একটি বাচাল চেহারার মিষ্টি মেয়ের দিকে, মাথার এক পাশে হেলে আছে ছাত্রীর টুপি।... তারপর তার অজানা, যন্ত্রণার বালাইহীন এইসব লোকের প্রতি ক্লিষ্ট ঈর্ষায় কাতর হয়ে সে সক্লেশে তাকাল রাস্তার ওদিকে।

'কোথায় যাই? কী করি?'

রাস্তায় লোক নেই। বাড়িগুলোর চেহারা সবই এক রকম, সাদা, দোতলা। বণিকদের সব বাড়ি, সঙ্গে বড়ো বাগান, মনে হয় জনপ্রাণী থাকে না একটায়ও; রাস্তায় পুরু সাদা ধুলোর আবরণ; চোখে ধাঁধা লেগে যায়, সব কিছু তীব্র লেলিহান, আনন্দময় সূর্যের আলোয় প্লাবিত, কিন্তু এখানে কেমন যেন লক্ষ্যহীন। দূরে রাস্তাটা কুঁজো হয়ে ওপরে উঠে মেঘহীন, ছাই-রঙা চিকচিকে দিগন্তে গিয়ে পড়েছে। দক্ষিণের একটা রেশ এখানে, তাতে মনে পড়ে সেভাস্তোপোল, কের্চ... আনাপার কথা। এসবই বিশেষ করে অসহ্য লাগে। মাথা নীচু করে, প্রখর আলোয় চোখ কুঁচকিয়ে, মাটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে টলতে টলতে টপবুটের লোহার কাঁটায় হোঁচট খেতে খেতে ফিরে চলল লেফ্টেনাণ্ট।

হোটেলে যখন পেঁছিল, তখন শরীর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে, সাহারা বা তুর্কিস্তানের*) কোথায় যেন দুস্তর পথ পার হয়ে এসেছে। শরীরের শেষ শক্তিটুকু খাটিয়ে ঢুকল নিজের বড়ো ফাঁকা ঘরে। ঘরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়ে গেছে ততক্ষণে, মেয়েটির রেশমাত্র আর নেই, শুধু ফেলে যাওয়া একটি চুলের কাঁটা বিছানার ধারের টেবিলের ওপর! টিউনিক খুলে লেফ্‌টেনাণ্ট তাকাল আয়নায়: মামুলি অফিসারের রোদে পুড়ে তামাটে মুখ, বিবর্ণ গোঁফ; তামাটে রঙের জন্য আরো সাদা দেখাচ্ছে নীলচে চোখের তারা — সে চোখে এখন উন্মত্ত উত্তেজনার একটা ছাপ, আর মাড় দেওয়া খাড়া কলারের পাতলা সাদা শার্টটায় অত্যন্ত যৌবনসুলভ, অত্যন্ত বিষণ্ণ কী একটা যেন ভাব। বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল চিৎ হয়ে, ধুলোমাখা টপবুট পাশে রেখে। পর্দা নামানো, খোলা জানলা দিয়ে ফুরফুরে হাওয়া এসে থেকে থেকে ফুলিয়ে দিচ্ছে পর্দাগুলোকে, ঘরে আনছে তপ্ত লোহার ছাদের আর সেই উজ্জ্বল, এখন একেবারে শূন্য ও শব্দহীন পৃথিবীর উত্তাপ। মাথার নীচে হাত রেখে, এক দৃষ্টিতে সামনে চেয়ে শুয়ে রইল সে। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে চোখ বুজল, অনুভব করল গাল বয়ে ধীরে ধীরে নামছে চোখের জল; অবশেষে ঘুম এল। চোখ যখন খুলল তখন পর্দার ওদিকে লালচে-পীতাভ আভায় সূর্য অস্তগামী। হাওয়া পড়ে গেছে, ঘরে গুমোট গরম।... কালকের দিন আর আজকের সকালের কথা মনে পড়ল — ঠিক যেন বছর দশেকের আগেকার ঘটনা।

ধীরেসুস্থে উঠে জামাকাপড় পরে নিল আস্তে আস্তে, পর্দা

তুলে ঘণ্টা বাজিয়ে আনতে বলল সামোভার আর বিল, তারপর ধীরেসন্স্থে খেল লেবন্-চা। তারপর গাড়ি আনতে বলে স্যাট্কেস অন্যদের দিয়ে নামিয়ে গাড়িতে ঢুকে বিবর্ণ, মরচে তামাটে সীটে বসে দারোয়ানকে বখশিস দিল পাঁচ রন্ব্লের একটা নোট।

'মনে হচ্ছে, হন্জন্র, কালকে আমিই আপনাকে এখানে এনেছিলাম,' লাগামটা তুলে নিতে গিয়ে ফুর্তিতে বলল গাড়োয়ান।

স্টীমার-ঘাটে যখন পেঁছিল, তখন ভোল্গার ওপরে নেমে এসেছে গ্রীষ্মের নীল রাত্রি। নানা রঙের ছোট ছোট আলো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নদীতে, ঘাটের দিকে আসছে জাহাজ, মাস্তুলে ঝুলছে লণ্ঠন।

'ঠিক সময়ে এনে ফেলেছি, হন্জন্র!' তোয়াজ করে বলল গাড়োয়ান।

তাকেও পাঁচ রন্ব্ল দিয়ে লেফ্টেনাণ্ট টিকিট কেটে নেমে গেল স্টীমার-ঘাটে।... ঠিক আগের রাত্রের মতো জাহাজ ভিড়ানোর জায়গায় অল্প একটি শব্দ, দোলন্ত মেঝের দরন্ন একটু মাথা ঘোরা, ছন্ড়ে ফেলা দড়াদড়ি, অল্প কিছন্ পেছিয়ে আসা স্টীমারের নীচে জলের দ্রন্ত স্রোতের তোলপাড় আর শব্দ।... আর ভিড় বোঝাই, আলোয় আলো, রান্নাঘরের গন্ধে ভরপন্র জাহাজটায় তার মনে এল অসাধারণ একটা হৃদ্যতা ও পরিতৃপ্তির ভাব।

এক মিনিট পর নদীর উজানে শন্রন্ হল যাত্রা সেই পথে, যে পথে আজ সকালে চলে গেছে মেয়েটি।

বিরস, অলস, রঙীন নানা ছায়া জলে ফেলে সামনে অনেক দন্রে মিলিয়ে গেল গ্রীষ্ম গোধন্লির ঘোর আভা, তার

অনেক নীচে জলে তখনো ছোট ছোট ঢেউয়ের স্পন্দন আর ঝিকিমিকি এখানে-সেখানে, চারিদিকের অন্ধকারে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আলো ভেসে গেল দূরে, বহু দূরে...

শামিয়ানার নীচে ডেক-চেয়ারে বসে বসে লেফ্‌টেনাণ্টের মনে হল বয়স বেড়ে গেছে দশ বছর।

মারিটাইম আল্‌প্‌স, ১৯২৫

লিকা

১

আমার প্রথম ঘুরে বেড়ানোর সেই বাসন্তী দিনগুলি আমার যৌবনসুলভ কৃচ্ছ্রসাধনার শেষ দিনও বটে।

ওরিওলে প্রথম সকালটায় যখন ঘুম ভাঙ্গল তখনো আমি বদলাই নি, ছিলাম ওরিওলে যাবার পথে যেরকম ঠিক তাই — একাকী, মুক্ত, শান্তচিত্ত, হোটেলে ও শহরে অচেনা; এমনকি শহরের পক্ষে অস্বাভাবিক তাড়াতাড়ি জেগে উঠেছিলাম: সবে তখন ফরসা হতে শুরু করেছে। কিন্তু ঠিক পরের দিন ঘুম ভাঙ্গল দেরীতে, অন্য সকলের মতো। সযত্নে জামাকাপড় পরে আয়নায় চেহারাটা দেখে নিলাম ভালো করে।... নিজের জিপসী-তামাটে রঙ, রোদে জলে পোড়া মুখের কঠোরতা ও উসকোখুসকো চুল নিয়ে অস্বস্তি লেগেছিল পত্রিকার অফিসে। চেহারাটা ভব্য করতে

হবে, বিশেষ করে এই জন্য যে ঘটনাক্রমে আমার অবস্থার উন্নতি হয়ে যায় আগের দিন অপ্রত্যাশিতভাবে: শুধু চাকরীর প্রতিশ্রুতি নয়, অগ্রিম টাকা পর্যন্ত দিতে চাইল আমাকে। টাকাটা নিলাম — লাল হয়ে উঠেছিলাম অবশ্য, তবুও নিলাম। তাই বড়ো রাস্তাটা ধরে যেতে যেতে একটা তামাকের দোকানে ঢুকে এক বাক্স দামী সিগারেট কিনলাম, তারপর নাপিতের দোকানে, সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম যখন, তখন সুন্দর চুল-ছোট মাথায় খোশবাই, আর হাবেভাবে সেই বিশিষ্ট পৌরুষ যেটা নিয়ে নাপিতের দোকান থেকে বেরোয় সবাই। আগের দিন অদৃষ্ট আমার ওপর সুপ্রসন্ন হয়েছিল, তারই শুভ জের অফিসে গিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টানতে পারলে ভালো হত। কিন্তু সটান সেখানে যাওয়া তো যায় না: 'তাই নাকি? আবার এসে পড়েছে বুঝি? আবারও এই সাত সকালে!' তাই একটু বেড়িয়ে নিলাম। প্রথমে আগের দিনের রাস্তা ধরলাম — বল্খোভ্স্কায়া স্ট্রীট হয়ে মস্কোভ্স্কায়া স্ট্রীট — দোকানপাটে ভর্তি লম্বা রাস্তাটা পড়েছে রেলওয়ে স্টেশনে। ধূলিধূসর কোন এক বিজয় তোরণ পর্যন্ত হাঁটলাম; সেটা ছাড়িয়ে রাস্তাটা ফাঁকা দীনহীন। সেটা ছেড়ে গেলাম পুষ্কার্নায়া পাড়ায়, সেটা আরো দীনহীন। তারপর আবার ফিরলাম মস্কোভ্স্কায়া স্ট্রীটে। অর্লিক নদী পর্যন্ত গিয়ে গাড়ির চাকার চাপে নড়বড়ে ঘড়ঘড়ে পুরনো কাঠের পুলটা পেরিয়ে অফিস বাড়িগুলো পর্যন্ত গিয়েছি, কানে এল সবকটা গির্জায় ঘণ্টা বাজছে, আর দেখলাম বড়ো রাস্তা হয়ে আমার দিকে আসছে দীর্ঘ কালো জোড়া ঘোড়ায় টানা একটা গাড়ি। মুখর ঘণ্টাগুলোর তুলনায় তাদের দ্রুত

পদক্ষেপ পড়ছে বেশ তালে তালে, গাড়িতে বসে স্বয়ং আর্চবিশপ কৃপার ভঙ্গিতে হাত নাড়িয়ে ডাইনে বাঁয়ে পথচারীদের আশীর্বাদ বিতরণ করছেন।

অফিসে আবার ভিড়, কাজের চাপ, বড়ো ডেস্কে বসে ছোটখাটো চেহারার আভিলভা ব্যস্ত, আমার দিকে স্মিত হাসির একটা ঝলক হেনে তক্ষুণি আবার কাজে ঝুঁকে পড়ল। লাঞ্চ পর্ব আবার দীর্ঘ, আবার হাসিখুশির পালা। লাঞ্চের পর শুনলাম লিকার ঝড়ের মতো পিয়ানো বাজানো, তারপর লিকা ও অবলেন্স্কায়ার সঙ্গে বাগানের দোলনায় দুললাম। চায়ের পর বাড়িটা আমাকে দেখাল আভিলভা, সবকটা ঘরে নিয়ে গেল। ওর শোবার ঘরে ছবি দেখলাম একজন লোমশ, চশমাপরা লোকের -- হাড় খোঁচা চওড়া কাঁধ, অপ্রসন্ন মুখে তাকিয়ে আছেন তিনি। 'আমার মরহুম স্বামী,' বলল আভিলভা যেন এমনি এমনি। আমি কিন্তু একটু হকচকিয়ে গেলাম: এই ক্ষয়কাশগ্রস্ত বুড়ো — তাকে হঠাৎ স্বামী বলে ডাকল সজীব, সুন্দরী মেয়েটি! — দু'জনকে এক করে দেখার বিদ্‌ঘুটেমিতে হতভম্ব লাগল আমার। তারপর আবার কাজে লাগল আভিলভা। বাইরে যাওয়ার জন্য সাজগোজ করেছে লিকা, কথা বলার ওর সেই বিশিষ্ট ভঙ্গিতে — যেটা ইতিমধ্যে বিব্রতভাবে লক্ষ্য করেছি — বলল, 'বেশ, তাহলে আমি সরে পড়লাম, বাচ্চারা!' তারপর চলে গেল কোথাও, আর অবলেন্স্কায়া আমাকে নিয়ে বেরল বাজারে। বলল ওর সঙ্গে কারাচেভ্স্কায়া স্ট্রীটে যেতে, সেখানে তার মেয়ে-দর্জির সঙ্গে দেখা করতে হবে; অসংকোচ তার প্রস্তাবে আমাদের দু'জনের মধ্যে হঠাৎ এই যে ঘনিষ্ঠতাটা সে গড়ে তুলল

সেটা ভালো লাগল। পাশে হাঁটতে হাঁটতে খুশিতে শুনতে লাগলাম তার ঝরঝরে গলা। মেয়ে-দর্জির ওখানে ওর আলোচনা ও পরামর্শ শেষ হবার প্রতীক্ষায় রইলাম বিশেষ একটা আনন্দভরা ধৈর্যের সঙ্গে। কারাচেভ্স্কায়া স্ট্রীটে যখন আবার বেরিয়ে এলাম তখন গোধূলি। 'তুর্গেনেভ্কে*) আপনার ভালো লাগে?' জিজ্ঞেস করল অবলেন্স্কায়া। উত্তর দিতে ইতস্তত করলাম। আমি গাঁয়ে জন্মেছি ও মানুষ হয়েছি বলে লোকে বরাবর আমাকে এই প্রশ্নটা করে, ধরে নেয় আমি নির্ঘাত তুর্গেনেভের ভক্ত। 'যাক গে, কিছু এসে যায় না,' বলল সে, 'এমনিতেই আপনার কৌতূহল হবেই। এখান থেকে বেশী দূরে নয়, একটা বাড়ি আছে, যেটার বর্ণনা নাকি করা হয়েছে 'বাবুদের বাসায়'*) — দেখবেন নাকি?' শহরের উপকণ্ঠে হেঁটে গিয়ে একটা নিঝুম রাস্তায় এসে পড়লাম। অন্ধকার বাগান, অর্লিকের খাড়া তীরে এপ্রিলের সবুজ পত্রপুঞ্জে ভরা পুরনো পার্কে ধূসর একটা বাড়ি — অনেক দিন কেউ থাকে না সেখানে, আধো-ভাঙা চিমনিগুলোতে এরই মধ্যে বাসা বেঁধেছে দাঁড়কাক। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে, নীচু দেয়ালের ওপর দিয়ে, আকাশের পটে তখনো পাতলা জাফরি কাটা বাগানের মধ্যে দেখলাম বাড়িটা।... লিজা, লাভ্রেৎস্কি, লেম্*)।... আর আমার প্রবল বাসনা হল ভালোবাসার।

সে রাত্রে আমরা সবাই গেলাম শহরের পার্কে। গ্রীষ্মকালীন থিয়েটারের আধো-অন্ধকারে লিকার পাশে বসে তার সঙ্গে খুব খুশিতে দেখলাম মঞ্চে অর্কেস্ট্রা ও অভিনেতাদের সব কিছু হৈচৈ আবোলতাবোল — নীচে থেকে আলো পড়েছে মঞ্চে, জগঝম্প নাচের তালে টিনের

খালি মগ বাজিয়ে পা ঠুকছে খাসা চেহারার পুরবাসিনীরা আর রাজার বর্মধারী সৈন্যরা। থিয়েটারের পর পার্কেই সাপার খাওয়া হল, একটা লোক-বোঝাই বড়ো বারান্দায় বরফের বালতিতে এক বোতল মদ নিয়ে বসলাম মেয়েদের সঙ্গে। ওদের কাছে ক্রমাগত বন্ধুদের আনাগোনা চলতে লাগল; সবায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। আমার সঙ্গে প্রত্যেকেরই ব্যবহার বেশ ভালো, তবে একজন বাদে — সে একবার শুধু মাথা ঝাঁকিয়ে আর কোনো পাত্তা দিল না: পরে আমার বিশেষ ভোগান্তি করায় — তাও অসাবধানে — এই দীর্ঘদেহ অফিসারটি; লম্বাটে, ময়লা রঙের নিষ্প্রভ মুখ, কালো অচঞ্চল চোখ, কালো জুলফি, পরনে খাপসই ফ্রককোট হাঁটুর নীচে পর্যন্ত নেমেছে, পট্টি দেওয়া সরু প্যাণ্ট। লিকা সুন্দর দাঁত দেখিয়ে অনেক কথা বলছে আর হাসছে খুব। সবাই যে তারিফ করে তার দিকে তাকাচ্ছে সেটা বিলক্ষণ জানা তার। দু'জনের দিকে অবিচলিতভাবে তাকানো আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। বিদায় নেবার সময় যতখানি দরকার তার চেয়ে একটু বেশীক্ষণ অফিসারটি ওর ছোট হাত নিজের বড়ো হাতের মুঠোয় রাখল দেখে আমার রক্ত জল হয়ে গেল।

চলে যাবার দিন বছরের প্রথম বৈশাখী ঝড় ফেটে পড়ল। মনে আছে বজ্রের গুরুগুরু ধ্বনি, আভিলভার সঙ্গে স্টেশনে যাচ্ছি হালকা একটা গাড়িতে, গাড়িটায় আর সঙ্গিনীতে বেশ জাঁক আমার; মনে আছে তার সঙ্গে প্রথম ছাড়াছাড়ির সেই বিচিত্র অনুভূতি, তার প্রতি কল্পিত প্রেমে তখনি আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আর সেই সবচেয়ে জোরালো মনোভাব — ওরিওলে আমি হাতে স্বর্গ পাবার

মতো কী একটা যেন পেয়েছি। স্টেশনে আমার মন দাগ কাটল প্রত্যাশায় প্ল্যাটফর্মে ভিড় করা গুরুগম্ভীর জমকালো পোশাকপরিহিত সেরা লোকদের সংখ্যার বহর ও মাহাত্ম্য, এবং যাজকদের অনভিজাত চেহারা — যদিচ চকচকে পোশাক তাদের, রুপোর ক্রুশ আর ধুনুচি হাতে সবার সামনে তারা দাঁড়িয়ে। রাজকীয় ট্রেন জগদ্দল গতিতে এসে পড়ল স্টেশনে, গাজর-রঙা চুল টকটকে লাল উর্দি পরা দানবটা সকলের চোখ ঝলসে দিয়ে লাফিয়ে নামল ট্রেন থেকে, সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু যেন তালগোল পাকিয়ে অসংবদ্ধ হয়ে গেল। শুধু মনে আছে শোকসঙ্গীতের বিষণ্ণ ভয়াবহ গাম্ভীর্য, আর কিছু নয়। তারপর ফানেলের পুনর্নিশ্বাসে বলিষ্ঠ জমকালো ঝাঁকুনিতে গুরুগুরু আওয়াজ শুরু করল কয়লা-কালো পতাকাসুদ্ধ ইঞ্জিনটার তেলতেলা ইস্পাত দেহ, সাদা ইস্পাতের ঝলক তুলে আস্তে আস্তে পিছু হটল চাকার হাত, আয়নার মতো ঝকঝকে নীল ওয়াগনগুলোর ভারি কাঁচের জানলা ও সোনালি ঈগল ভেসে গেল চোখের সামনে দিয়ে।... তাকিয়ে রইলাম ক্রমশ বেগে ঘুরন্ত ইস্পাতের চাকাগুলোর দিকে, ব্রেক ও স্প্রিং-এর দিকে — চোখে পড়ল শুধু সব কিছুর ওপর সাদা ধুলোর ভারি প্রলেপ, দক্ষিণ থেকে, ক্রিমিয়া থেকে আসা দীর্ঘ পথের অপরূপ ধুলো। ঘড়ঘড় শব্দে গর্জিয়ে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল ট্রেন, রাশিয়ার মধ্য হয়ে রাজধানীর দিকে মহিমময় তার শোকযাত্রা; এদিকে আমি এরই মধ্যে গিয়ে পড়েছি মায়াবিনী ক্রিমিয়ায়, গুর্জুফে পুশ্‌কিনের সেই মোহিনী দিনগুলোতে*[১]।

আমার মামুলি মফস্বলে ট্রেনটা ওখানে দাঁড়িয়ে দূরের

একটা শাখা লাইনে। ওর ভেতরে কী নিরালা আরাম পাব তার কথা ইতিমধ্যে ভাবছি। ট্রেন না ছাড়া পর্যন্ত আভিলভা রইল আমার সঙ্গে, খুশিতে বকবক করে চলল: বলল, আমার সঙ্গে ওরিওলে শিগ্‌গির আবার দেখা হবার আশা রাখে, স্মিত হেসে জানিয়ে দিল আমার বিষাদের হাস্যকর অবস্থাটা ওর অজানা নয়। তৃতীয় ঘণ্টা পড়াতে আমি সাগ্রহে চুমো খেলাম ওর হাতে, ও ঠোঁট রাখল আমার গালে। লাফিয়ে ট্রেনে উঠলাম, হেঁচকা টান দিয়ে ছেড়ে দিল ট্রেন, জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আমার দিকে হাত নাড়তে নাড়তে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে ও।...

তারপর সব কিছু মনে হল মর্মস্পর্শী: অল্প কামরার ছোট ট্রেন গুটিগুটি এগিয়ে হঠাৎ পরমুহূর্তে দুলছে আর গড়গড় করছে ভয়ানকভাবে, জনহীন সেই সব স্টেশনে আর ছোট ছোট স্টপ যেখানে কী কারণে যেন দাঁড়িয়ে থাকছে তো থাকছেই। আমার প্রিয় ও চেনা সব কিছু আবার ঘিরে ধরেছে আমাকে: তেরছা কুঁজোভাবে জানলার বাইরে ছুটে চলা মাঠ, এখনো ফাঁকা বলে বিশেষ বিরস, বসন্তের প্রত্যাশায় দীপহীন নিষ্পত্র বার্চ গাছের ঝোপজঙ্গল, বিষণ্ণ দিগন্ত।... সন্ধ্যাটাও ছিল বিষণ্ণ, হাওয়ায় বসন্তের মতো শির্‌শিরে একটা ভাব, আকাশ বর্ণহীন, নীচু।

২

ওরিওল ছাড়ার সময় একটি স্বপ্ন ছিল মনে — ওরিওলে যা শুরু হয়েছে যত শীঘ্র তার খেই যদি টানতে পারি

কোনো রকমে। কিন্তু জানলার পাশে বসে মাঠঘাট ও এপ্রিলের মন্থর সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে শহরটা যত পিছনে ফেলে আসছি তত ভুলে যাচ্ছি সে স্বপ্ন। তারপর ট্রেনে গভীর হয়ে উঠল আবছা-আঁধার; জানলার বাইরে ট্রেনের বাঁ দিকে ওক গাছের সেই চলন্ত পাতলা বনেও অন্ধকার — বরফের আস্তরণ থেকে সদ্য উঁকি মারা গত বছরের লালচে বাদামি পাতায় আচ্ছাদিত নগ্ন, বেঁকা ওক বনটি। আমি ব্যাগ আঁকড়ে দাঁড়িয়ে উঠেছি, ক্রমশ বাড়ছে আমার উত্তেজনা: এই তো সুব্বোতিন বন — পিসারেভো স্টেশন এসে পড়ল বলে। ধুধু শূন্যতায় ট্রেনের বিষণ্ণ হুঁসিয়ারি চিৎকার। গাড়ির করিডরের শেষের দিকে তাড়াতাড়ি গেলাম: কেমন যেন আদিম কর্কশ আবহাওয়া, কনকনে ঠাণ্ডা। ঝুরঝুরে বৃষ্টি পড়ছে, স্টেশনের সামনে একটি মাত্র মালগাড়ি দাঁড়িয়ে। ট্রেন সেটা পেরিয়ে গেল, থাকবার আগেই লাফিয়ে নেমে পড়লাম। প্ল্যাটফর্ম ধরে ছুটে স্বল্পালোকিত, অত্যন্ত বিষণ্ণ, বহু চাষীর কাদামাখা পায়ে দলিত স্টেশন-ঘর পার হয়ে এলাম সামনের অন্ধকার গাড়ির রাস্তায়। গোল উঠানে ফুলের বাগান একটা, গলন্ত বরফে হতশ্রী ও নোংরা, গোধূলির অন্ধকারে একটা ছ্যাকরা ঘোড়ার গাড়ি প্রায় চোখে পড়ে না। সওয়ারীর নিষ্ফল প্রত্যাশায় যায় পুরো সপ্তাহ কাটে, সেই গাড়োয়ান ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটে এল কাছে, যা বললাম মহানন্দে তাই মেনে নিল, বললে যা দেব তাতেই আমাকে সে নিয়ে যাবে দুনিয়ার শেষ সীমানায়: 'হুজুর, আপনার মেহেরবানি হবে আশা করি!' মিনিটখানেক পর তার অপরিসর ছোট্ট গাড়িটায় বাধ্যভাবে ঝটকানি খেতে খেতে যাত্রা শুরু হল

আমার: প্রথমে অন্ধকার রিক্ত একটি গ্রাম হয়ে, তারপর — ক্রমশ ঢিমে তালে — অন্ধকার, নিঃশব্দ, সারা পৃথিবীর কাছে অপরিচিত মাঠঘাটের দিকে, অন্ধকার মৃত্তিকা সমুদ্রে, যার ওপারে উত্তর-পশ্চিম দিকে পাতলা মেঘের নীচে অসীম দিগন্তে কী একটার সবুজ ঝিকিমিকি। রাত্রির মেঠো হাওয়া, এপ্রিলের হালকা ঝিরঝিরে বৃষ্টির হাওয়া মুখে এসে লাগছে। অনেক দূরে ডাকা একটা ভারুই পাখি মনে হল রাত্রির হাওয়ায় ক্রমাগত বসার জায়গা বদলাচ্ছে। রাশিয়ার নীচু আকাশে বিরল তারার দ্যুতি মেঘের মাঝে।... আবার ভারুই পাখি, বসন্ত, মাটি — আর আমার পুরনো, বিবস ছন্নছাড়া যৌবন! ক্লিষ্ট দীর্ঘ যাত্রা: খোলামেলা জায়গায় রুশী চাষীর সঙ্গে ক্রোশ তিনেক পথ অল্পখানি নয়। গাড়োয়ান নির্বাক দুর্জ্ঞেয় হয়ে গেল; তার গায়ে ভাপসা কুঁড়েঘর আর ভেড়ার চামড়ার জীর্ণ, পাতলা কোটের গন্ধ। জলদি যাবার সব অনুরোধে বোবা সে, অল্প কোনো খাড়াই পথে উঠতে হলে সীট থেকে লাফিয়ে নেমে বুড়ী জীর্ণ ঘুড়ীটার পাশে পাশে হাঁটছে নিয়মিত পদক্ষেপে, হাতে দড়ির লাগাম, মুখ অন্য দিকে ঘোরানো, আর ঘুড়ীটা টলতে টলতে চলেছে কোনোক্রমে।... ভাসিলিয়েভ্স্কয়েতে যখন ঢুকল তখন নিশুতি রাত হয়ে গেছে মনে হল: জীবনের কোনো সাড়া নেই, আলো নেই একটিও। অন্ধকার আমার চোখ সওয়া হয়ে গেল, যে চওড়া রাস্তাটা হয়ে গ্রামে ঢুকছি তার প্রত্যেকটা কুঁড়েঘর, প্রত্যেকটা নেড়া গাছ স্পষ্ট দেখা যায়; তারপর বুঝলাম ও দেখলাম নিম্নভূমিতে এপ্রিলের স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডার মধ্যে নেমে যাচ্ছি — বাঁয়ে নদীর পুল, ডাইনে রাস্তাটা উঠে

গিয়েছে কালো গোমড়া একটা বাড়ির দিকে। আবার সব কিছুর একটা তীক্ষ্ন অনুভূতি হল: সব কিছু কত না ভয়ানক চেনা আর — বসন্তের এই গ্রাম্য কালিমায় জরাজীর্ণতায়, বাকি দুনিয়ার প্রতি ঔদাসীন্যে কত নতুন! চড়াই-এ সক্লেশে ওঠার সময় প্রাণের কোনো লক্ষণ নেই গাড়োয়ানের। হঠাৎ উঠানের পাইন গাছগুলোর পেছনের জানলায় ঝলকে উঠল একটি আলো। বাঁচা গেছে, ওরা তাহলে এখনো ঘুমোয় নি! অবশেষে গাড়িটা অলিন্দের সামনে দাঁড়াল, নেমে দরজা খুলে হল-ঘরে ঢুকলাম। সবাই হাসিমুখে আমার আপাদমস্তক একবার দেখে নিল, তখন খুশিতে, অধৈর্যে — আর ছেলেমানুষি লজ্জায় অভিভূত লাগল।...

পরদিন সকালে ভাসিলিয়েভ্স্কয়ে ছেড়ে ক্ষণে ক্ষণে থামা আর পড়া ঝুরঝুরে উচ্চকিত ভোরের বৃষ্টিতে ঘোড়া হাঁকিয়ে চললাম লাঙল দেওয়া মাঠ আর ফেলে রাখা জমির ওপর দিয়ে। কর্ষণ আর বীজ বপনের কাজ চলেছে। খালি পায়ে একটা লোক কাঠের লাঙলের পিছু পিছু হাঁটছে দুলে দুলে, সাদা পা হড়কে যাচ্ছে হাল দেওয়া ঝুরঝুরে নরম জমিতে; ঘোড়াটা লাঙল টানছে কুঁজো হয়ে, লাঙলের পেছনে নীল-কালো একটা কাক লাফাতে লাফাতে হাল দেওয়া জমি থেকে খুঁটিয়ে খাচ্ছে ঘন লালচে পোকা, তার পেছনে লম্বা পা নিয়মিত ফেলে আসছে একটা বুড়ো খালি মাথায় — বুকে চামড়ার বেল্টে বীজের থলে, ডান হাত উদার দরাজ ভঙ্গিতে অনেকখানি বাড়িয়ে মাপমতো অর্ধচক্রে বীজ ছড়াচ্ছে মাটিতে।

বাতুরিনোয় বাড়ির লোকে যেরকম স্নেহে আর আনন্দে

আমাকে অভ্যর্থনা করল তাতে সত্যি বুকটা মুচড়িয়ে উঠল। সবচেয়ে গভীর দাগ কাটল মায়ের আনন্দ নয়, বোনের আনন্দ — জানলা থেকে আমাকে দেখে ছুটে আসার সময় ওর মুখের এই সুখ ও অনুরাগের লাবণ্য দেখব বলে কখনো আশা করি নি। শুচিতায়, তারুণ্যে সত্যি কত মধুর সে! আমার খাতিরে সে দিন প্রথম পরা তার নতুন ফ্রকটিতে কত সে নিষ্পাপ আর নবীন! প্রাচীন সুন্দর বেখাপ্পা বাড়িটাও মনে হল মধুর। আমার ঘরটা দেখে মনে হয় যেন সবেমাত্র বেরিয়েছিলাম: সব কিছু যথাস্থানে, এমনকি লোহার দানিতে আধ-পোড়া চর্বির বাতিটা পর্যন্ত শীতকালে যেমনটি রেখে গিয়েছিলাম ঠিক তেমনটি তখনো ডেস্কে। ভেতরে ঢুকে চারদিক দেখে নিলাম। কোণে কালো আইকন, রঙীন (বেগুনি আর গাঢ় লাল) কাঁচের শার্সি দেওয়া সেকেলে জানলাগুলো দিয়ে গাছপালা আর আকাশের আভাস — এখানে-সেখানে নীল হয়ে যাচ্ছে সে আকাশ; সবুজ কুঁড়ি ধরা ডালপালায় ছড়াচ্ছে বৃষ্টির পশলা। ঘরের সবকটা জিনিস একটু গুরুগম্ভীর, বড়ো ও গভীর।... কালো মসৃণ কাঠের ছাদ, দেয়ালেও ঠিক সেরকম কালো মসৃণ কাঠের গুঁড়ি।... ওককাঠের খাটের গোল খুঁটিগুলো মসৃণ ও ভারি।...

৩

ওরিওলে আবার যাবার ছুতো জোগাল বৈষয়িক একটা ব্যাপার: ব্যাঙ্কে সুদ জমা দিতে হবে বলে গেলাম, কিন্তু কিছুটা দিয়ে বাকিটা দিলাম ফুঁকে। গুরুতর দোষ বটে

সেটা, কিন্তু বিচিত্র কী একটা আমার মধ্যে ঘটছে বলে ব্যাপারটায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলাম না। সমস্ত সময়টা নির্বোধ উচ্ছ্বাসে পূর্ণ একটা দৃঢ় সঙ্কল্প চালাল আমাকে। ওরিওলের প্যাসেঞ্জার ট্রেন ঠিকমতো ধরতে না পেরে মালগাড়ির ইঞ্জিনে জায়গা করে নিলাম কোনোক্রমে। মনে আছে লোহার তৈরী উ'চু সি'ড়ি দিয়ে উঠলাম যেখানে, সেখানটা নোংরা, কোনো ছিরি নেই; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। ইঞ্জিন ড্রাইভার ও তার সহকর্মীর পোশাক-আশাক এত তেল চিটচিটে যে বলার নয় — তাতে আবার ধাতব একটা চিকচিকে ভাব; মুখগুলো তাদের ঠিক তেমনি চিটচিটে আর চিকচিকে, অক্ষিগোলকের শ্বেতাংশ নিগ্রোদের মতো ধবধবে, চোখের পাতা কালো, যেন অভিনয়ের জন্য মেক-আপ করছে। একজন ছোকরা দারুণ খটখটিয়ে কোদাল দিয়ে কোণে ঠাসা কয়লা তুলছে, তারপর নারকীয় আগুনের লেলিহান লাল শিখা যেখান থেকে উঠছে সেই অগ্নিকুণ্ডের দরজা সশব্দে ঠেলে খুলে জোরে কোদাল চালিয়ে কয়লা ফেলে শান্ত করে তুলছে সেই নরকাগ্নি। তার চেয়ে জ্যেষ্ঠ লোকটি জঘন্য চিটচিটে একটা নেকড়ায় হাত মুছে সেটাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে কী একটা যেন টানল আর ঘোরাল।... হাওয়া চিরে গেল কর্ণবধির করা সুতীক্ষ্ন হুইস্‌লে। তপ্ত নিশ্বাস, চোখ-ধাঁধানো বাষ্পের পর্দা। কানে তালা লেগে গেল কিসের হঠাৎ হুঙ্কারে — আর ধাক্কা খেয়ে আস্তে আস্তে এগুনো।... তারপর সে হুঙ্কার পরিণত হল বর্বর ঘড়ঘড় শব্দে, আমাদের শক্তি ও বলিষ্ঠতা বেড়ে চলল ক্রমশ, চারপাশে সব কিছু নড়ছে, দুলছে, লাফাচ্ছে! থেমে

গেল সময়ের গতি পাথর-কঠিন সংহতিতে, এদিকে অগ্নিরাক্ষস ছুটে চলল ছোট ছোট পাহাড়ের ওপর দিয়ে স্পন্দমান সমতালে, এক একটি দৌড়ের ক্ষেপ শেষ হতে সময় লাগছে না। তারপর রাত্রির শান্তিপূর্ণ স্তব্ধতায় ট্রেনটা দাঁড়াতে নৈশ অরণ্য থেকে ভেসে এল সৌরভ আর প্রতি ঝোপঝাড় ও গাছ থেকে বুলবুলের অপরূপ সুখের উদাত্ত গান।... ওরিওলে আমার সাজগোজ হল যাকে বলে অশ্লীল গোছের — ফুলবাবুসুলভ নরম টপবুট, কালো কুচকুচে কুঁচি দেওয়া লম্বা কোর্তা, লাল সিল্কের শার্ট আর অভিজাতোচিত টুপি — লাল ফিতে দেওয়া কালো রঙের। কিনলাম একটা দামী ঘোড়সওয়ারী জিনসাজ, উগ্রগন্ধি, মচমচে চামড়ার জিনিসটা এত চমৎকার যে সেটাকে নিয়ে বাড়ির পথে সে রাত্রে আনন্দে আর ঘুম এল না চোখে — জিনিসটা যে পাশে রয়েছে! ফিরতি পথে পিসারেভো হয়ে গেলাম আবার — ইচ্ছে একটা ঘোড়া কেনা — সে সময় গাঁয়ে একটা ঘোড়ার মেলা বসেছিল। সেখানে আমারই মতো কুঁচি দেওয়া লম্বা কোর্তা আর টুপি পরা সমবয়সী কয়েকজনের সঙ্গে দোস্তি পাতালাম। মেলার ঘোরেল ঘাগী লোক তারা, তাদের সাহায্যে কিনলাম খাসজাতের একটা মাদী ঘোড়া (যদিও জিপসীটা প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল বুড়ো, হৃতশক্তি একটা খাসী করা ঘোড়াকে চালিয়ে দিতে এই বলে: 'মিশাকে কিনুন, হুজুর, ওকে একবার কিনলে আমার তারিফ হামেশা করবেন, হুজুর!')। তারপর গ্রীষ্মকালটা আমার কাছে হয়ে দাঁড়াল দীর্ঘ ছুটির দিনের মতো — বাতুরিনোতে একনাগাড়ে তিন দিনের বেশী আর থাকি নি। বেশীর ভাগ সময় কাটত নতুন বন্ধুদের

সঙ্গে, আর যখন সে ফিরে এল ওরিওল থেকে তখন শহর ছেড়ে থাকা তো অসম্ভব। ওর ছোট্ট চিঠিটা: 'ফিরে এসে প্রহর গুনছি' পাওয়ামাত্র ছুটলাম স্টেশনে, যদিও ওর লেখাটার বোকা-বোকা রসিকতার সুরটা ভালো লাগল না আর যদিও তখন বেশ দেরী হয়ে গেছে, আকাশে ঘনিয়ে আসছে মেঘ। কিন্তু ট্রেনে ওঠার পর গতিবেগে মাতালের মতো আনন্দ হল, গতিবেগ আরো বেশী ঠেকছে বাইরে ফোঁসা ঝড়বৃষ্টির জন্য, চাকার খটখট আওয়াজ মিশে যাচ্ছে বাজ পড়ার শব্দে, ছাদে বৃষ্টির মুখর ধারাপাত — আর এ সব কিছু চলেছে জানলার কালো শার্সি ঝলসানো বিদ্যুতের নীল আলোতে, শার্সিতে চাবুক মারা ফেনিল, সুগন্ধি জলের সঙ্গে সঙ্গে।

ভেবেছিলাম হাসিখুশিতে মেলামেশার প্রীতি ছাড়া আর কিছু নেই ব্যাপারটায়। কিন্তু তারপর — গ্রীষ্মের শেষাশেষি — আমার একটি বন্ধু তার জন্মদিনে ডাকল অনেককে। বন্ধুটি থাকত বোন ও বুড়ো বাপের সঙ্গে শহরের কাছে, ইস্তার খাড়া পাড়ে একটি ছোট জমিদারিতে। সেও প্রায়ই যেত লিকার সঙ্গে দেখা করতে। নিজে গিয়ে তাকে নিয়ে এল নিজের ঘোড়া গাড়িতে, আমি ঘোড়ায় চেপে পিছু নিলাম। অদ্ভুত ভালো লাগছিল মাঠঘাটের রৌদ্রোজ্জ্বল শুষ্ক বিস্তারে। যতদূর চোখ যায় খড়ের গাদার ছোপ লাগা হলুদ বালির মতো দেখতে ছড়ানো জমি। দুঃসাহসী বেপরোয়া কিছু করার জন্য আমি একাগ্র উন্মুখ। ঘোড়াটাকে চাবকে চাবকে একেবারে খেপিয়ে দিয়ে, রাশ টেনে তারপর ছেড়ে দিলাম, পাগলের মতো খড়ের একটা গাদা লাফিয়ে পার হতে গিয়ে ধারালো খুরের

একটা জায়গা ছড়ে রক্ত বেরিয়ে এল। জন্মদিনের ভোজ চলল সন্ধ্যা পর্যন্ত পচা কাঠের বারান্দায়। সকলের অলক্ষিতে সন্ধ্যা মিশে গেল অন্ধকারে, বাতির আলোয়, সুরায়, সঙ্গীতে ও গিটারের বাজনায়। আমি ওর হাত ধরে পাশে বসে রইলাম, সঙ্কোচ আর নেই, হাত সরিয়ে নিল না ও। বেশ রাত হয়েছে তখন, যেন দু'জনে ষড়যন্ত্র করে টেবিল ছেড়ে বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলাম অন্ধকার বাগানে, উষ্ণ অন্ধকারে থেমে, একটা গাছে হেলান দিয়ে ও হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে — অন্ধকারে ওকে দেখতে না পেলেও ভঙ্গিটার অর্থ বুঝলাম নিমেষে।... দ্রুত আকাশ ছাই-রঙা হয়ে এল, সুখের অসহায় আতিশয্যে ভাঙা গলায় মোরগের ডাক, আর এক মিনিট, তারপর উপত্যকার নদীর ওপারে হলুদ মাঠঘাটের ওপরে বিরাট সোনালি সূর্যোদয়ের পটভূমিকায় স্পষ্ট হয়ে উঠল সমস্ত বাগানটা।... উপত্যকার ওপরে পাহাড়ের চূড়ায় আমরা দু'জনে দাঁড়িয়ে রইলাম; আর ও সূর্যালোকের বন্যায় উন্মোচিত আকাশের দিকে চেয়ে, আমাকে আর না দেখে গাইল চাইকোভ্স্কির 'প্রভাত'*⁾। ওর পক্ষে বড়ো চড়া একটা পর্দায় থেমে, ভারুই পাখির রঙের মতো ক্যাম্ব্রিকের স্কার্টের সুন্দর ভাঁজ তুলে দৌড়িয়ে ও গেল বাড়ির দিকে। আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম আপনহারা হয়ে, কিন্তু তখন শুধু দাঁড়িয়ে থাকাটাই ক্ষমতার বাইরে, সুসম্বদ্ধ চিন্তা তো দূরের কথা। বিস্তর শুকনো ঘাসের মধ্যে পাহাড়ের ধারে একটি পুরনো বার্চ গাছের নীচে শুয়ে পড়লাম। ফরসা হয়ে গেছে এরই মধ্যে, সূর্য উঠেছে উঁচুতে, আর আবহাওয়া ভালো থাকলে

গ্রীষ্মের শেষাশেষি সচরাচর যেমন হয় দিনটা — সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় ঘুম এসে গেল। কিন্তু ক্রমশ রোদ কড়া হয়ে এল, এত গুমোট আর চোখ-ধাঁধানো আবহাওয়া যে একটু পরে ঘুম থেকে উঠে ছায়ার খোঁজে চললাম টলতে টলতে। চোখ-ধাঁধানো ধারালো সূর্যরশ্মিতে প্লাবিত বাড়িটা তখনো নিদ্রামগ্ন। জেগে উঠেছেন শুধু গৃহকর্তা। লাইলাকের উদ্দাম সম্ভারের পটে বাঁধা তাঁর জানলা খোলা, কানে এল কাশির আওয়াজ, তাতে ধরা পড়ে দিনের প্রথম পাইপ সেবন ও সর দেওয়া প্রথম কড়া চা পানের আনন্দ। আমার পদধ্বনিতে, রোদে চিকচিকে লাইলাক ঝোপ হতে আমার কাছ থেকে ঝটিত উড়ে যাওয়া চকিত চড়ুইগুলোর শব্দে তিনি নক্সাকাটা তুর্কি সিল্কের জীর্ণ পুরনো ড্রেসিং-গাউন বুকে টেনে নিতে নিতে জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন — ফোলা চোখ আর বিপুল পাকা দাড়িসুদ্ধ ভয়াবহ মুখটি দেখা দিল — তারপর অসাধারণ স্নেহে হাসলেন। মুখ কাচুমাচু করে নমস্কার জানিয়ে বারান্দা দিয়ে দরজাখোলা ড্রয়িং-রুমে ঢুকলাম। ভোরের স্তব্ধতা ও শূন্যতা, প্রজাপতির লুকোচুরি, সেকেলে ধরনের নীল ওয়াল পেপার, আরামকেদারা আর ছোট সোফা — সব মিলিয়ে আশ্চর্য মধুর ঘরটা। একটা সোফাতে শুয়ে পড়লাম — সেটার বাঁকানো ধাঁচটা অত্যন্ত অস্বস্তিকর — আবার অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লাম। কিন্তু মনে হল মিনিটখানেক পর — যদিও সত্যি সত্যি অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম — কে যেন কাছে এসে হেসে কী বলতে বলতে চুলগুলো উসকোখুসকো করে দিল। ঘুম ভেঙে গেল — সামনে দাঁড়িয়ে তারা যাদের অতিথি আমি — ভাই ও বোন, দু'জনেই শ্যামবর্ণ,

চোখ আগুনের মতো উজ্জ্বল, তাতার গোছের সুন্দর চেহারা; ভাইয়ের গায়ে হলুদ সিল্কের শার্ট, হলুদ সিল্কের ব্লাউজ বোনের গায়ে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম: ওরা বেশ মিঠে সুরে বলছিল এবার উঠে ছোট হাজরি খেলে হয়, জানাল ও চলে গেছে — একা নয়, কুজ্‌মিনের সঙ্গে, তারপর ওর একটা চিরকুট আমাকে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল কুজ্‌মিনের চোখ — ক্ষিপ্র, সাহসী, ছিটছিট দাগ লাগা মৌমাছি রঙের চোখ। চিরকুটটা নিয়ে গেলাম অন্দরের পুরনো ঘরে। সেখানে টুলে মুখ ধোবার পাত্রের পাশে আমার অপেক্ষায় দেখলাম বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে আছে আগাগোড়া কালো পোশাক পরা একটি ছোটখাটো বুড়ী, মেচেতা-পড়া হাতে জলের ঘটি। চিরকুটটা পড়লাম, তাতে লিখেছে: 'আমার সঙ্গে আর দেখা করার চেষ্টা করবেন না,' — তারপর মুখ হাত ধুলাম। জলটা কনকনে ঠাণ্ডা, জ্বালা ধরিয়ে দেয় — 'আমাদের হল ঝরণার জল, একটা কুয়ো থেকে আনা,' বলে বুড়ী বেজায় লম্বা একটা লিনেনের তোয়ালে এগিয়ে দিল। তাড়াতাড়ি হল-ঘরে গিয়ে টুপি ও চাবুক তুলে নিয়ে গরম উঠোন হয়ে দৌড়লাম আস্তাবলে।... কাছে যেতে অন্ধকারে আমার ঘোড়াটা সখেদে আস্তে চিঁহিঁ করে উঠল — আগের রাত্রে ওর জিন খোলা হয় নি, খালি একটা গামলার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল — এখন পেট বসে গেছে। লাগাম ধরে লাফিয়ে উঠলাম পিঠে: অদ্ভুত বন্য একটা উত্তেজনা, তবু নিজেকে সামলে রেখে, ফটক হয়ে ঘোড়া জোর ছুটিয়ে বেরিয়ে গেলাম। বাড়ির মাঠ ছাড়িয়ে ক্ষেতে মোড় নিলাম সবেগে, খসখসে শস্যের নাড়ার ওপর দিয়ে যেদিকে চোখ যায় সেদিকে ছুটে প্রথম

খড়ের গাদাটায় ঘোড়া থামিয়ে একলাফে নেমে ধপ করে শুয়ে পড়লাম পাশে। ঘোড়াটা গোছা গোছা শস্যে মুখ লাগিয়ে কাঁচের মতো বীজ ছড়িয়ে জোরে টান দিতে লাগল; অজস্র ঘড়ির মতো শত শত শস্যের নাড়া আর খড়ের গাদায় ফড়িঙের ব্যস্তসমস্ত খুটাখাট আওয়াজ। চারিদিকে মরুভূমির মতো ছড়িয়ে পড়েছে উজ্জ্বল মাঠঘাট। কিন্তু কিছু কানে শুনছি না, চোখে দেখছি না কিছু, শুধু বারবার মনে মনে বলছি: আমাকে ওর ফিরিয়ে দিতে হবে নিজেকে -- এই রাত্রি, এই সকাল, শুকনো ঘাসের ওপর ঝলক দেওয়া তার পায়ের ওপর খসখসিয়ে ওঠা ক্যাম্ব্রিকের স্কার্টের ভাঁজ ফিরিয়ে দিতে হবে আমাকে, নইলে মরে যাব দু'জনে!

এটা না হয়ে পারে না এই উন্মত্ত নিশ্চয়তায় — এই পাগল অনুভূতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে চললাম শহরের দিকে।

৪

এর পর অনেক দিন শহরে থেকে গিয়ে সারা সময় কাটালাম ওর সঙ্গে, ওর বিপত্নীক বাবার বাড়ির পেছনের ধূলিধূসর ছোট ফুলের বাগানে। ওর বাবা (গাঝাড়া গোছের উদার মতাবলম্বী ডাক্তার) ওকে কোনো বাধা দিতেন না। ইস্তা নদী থেকে যখন ছুটে আসি আর আমার মুখ দেখে ও বুকে সেই যে হাত চাপল, সেই মুহূর্ত থেকে বলা শক্ত দু'জনের মধ্যে কার প্রেম বেশী জোরালো, কে বেশী সুখী, কার প্রেমে বেশী ছেলেমানুষী — আমার না ওর (কেমন যেন হঠাৎ কে জানে কোথা থেকে তা দেখা

দিল)। অবশেষে ঠিক করা গেল কিছুদিন দু'জনেরই হাঁফ ছাড়ার জন্য আমাদের ছাড়াছাড়ি হওয়া দরকার। ছাড়াছাড়ি বেজায় দরকার হয়ে পড়েছিল আর একটি কারণে — অভিজাতদের হোটেলে থাকাতে ধারে ডুবে গিয়েছিলাম। তাছাড়া বর্ষা শুরু হয়েছে। ছাড়াছাড়িটা যথাসাধ্য পিছিয়ে দিয়ে অবশেষে শহর ছেড়ে বাড়ি গেলাম, মুষলধারে তখন বৃষ্টি চলেছে। বাড়িতে প্রথম কটা দিন শুধু ঘুমিয়ে কাটল, ঘরে ঘরে বেড়াতাম নিরুদ্দিষ্টভাবে, কিছু করার নেই, ভাবার নেই কিছু। তারপর এল ভাবার অবসর: এ আমার কী ঘটেছে, আর এর শেষ কিসে হবে? একদিন আমার ভাই নিকলাই ঘরে এসে টুপি না খুলেই বসল, বলল:

'তাহলে, ভাই, তোমার রোমাণ্টিক অবস্থাটা এখনো সমানে খাসা চলছে। সবই সেই আগের মতো. 'চলল শেয়াল নিয়ে, কালো বন দিয়ে, খাড়া পাহাড় পারে'*), কিন্তু বন আর পাহাড়ের পেছনে কী আছে — কেউ জানে না। দেখছ তো, সব কিছুই জানি, অনেক কিছু শুনেছি, বাকিটা আন্দাজ করে নিতে পারি — এসব গল্পের বিশেষ রকমফের হয় না। এও জানি যে এখন বুদ্ধিমানের মতো যুক্তিতর্ক তোমার অসাধ্য। কিন্তু তবু, ভবিষ্যতে কী করবে বলে ঠিক করেছ শুনি।'

একটু ঠাট্টা করে জবাব দিলাম:

'সবাইকেই কোনো না কোনো শেয়াল নিয়ে যায়, কিন্তু কোথায় এবং কেন, কেউ জানে না অবশ্য। এমনকি বাইবেলে পর্যন্ত লেখা: 'যৌবনে যেখানে প্রাণ যায়, যেখানে চক্ষু চায়, সেখানে চলে যাও, যুবক!' '

চুপ করে বসে আমার ভাই মেঝের দিকে তাকিয়ে বোধহয় কান পেতে শুনতে লাগল হেমন্তের বিরস বিষণ্ণ বাগানে বৃষ্টির ফিসফিসানি; তারপর বিষণ্ণ সুরে বলল:

'বেশ, তাই যদি হয়, যাও।..'

বারবার শুধালাম নিজেকে: কী করা উচিত? উত্তরটা বেশ স্পষ্ট। কিন্তু যত জোর দিয়ে নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করি যে কাল বিদায়ের চূড়ান্ত চিঠিটা লিখে ফেলা উচিত — ওটা করা সম্ভব কেননা চূড়ান্ত ঘনিষ্ঠতা তখনো হয় নি দু'জনের মধ্যে - তত গভীরভাবে আমায় পেয়ে বসে ওর জন্য একটা কোমলতা, ওকে নিয়ে উচ্ছ্বাস, আমার প্রতি ওর ভালোবাসার জন্য ওর চোখ, মুখ, হাসি, কণ্ঠস্বরের মাধুর্যের জন্য একটা সকৃতজ্ঞ হৃদয়াবেগ।... কিছুদিন পরে একটি সন্ধেয় আপাদমস্তক ভিজে সপসপে একজন ঘোড়সওয়ার হঠাৎ আঙিনায় এসে বৃষ্টিতে ভিজে একটা খাম আমাকে দিল: 'আর পারি না। তুমি এসো।' কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওকে দেখতে পাব, শুনব ওর কণ্ঠস্বর, এই ভয়ংকর চিন্তায় জেগে রইলাম সারা রাত।...

তারপর হেমন্তের ক'টা মাস কাটল এভাবে — হয় বাড়িতে নয় শহরে। ঘোড়া আর জিন দিলাম বেচে, শহরে যখন যেতাম তখন অভিজাতদের হোটেলে আর না উঠে শ্চেপ্‌নায়া চকে নিকুলিনার বোর্ডিং-হাউজে থাকতাম। শহরের চেহারা বদলে গেছে একেবারে, যেখানে মানুষ হয়েছি সেখানকার মতো নয় মোটে। সব কিছু সাদাসিধে গতানুগতিক, শুধু মাঝে মাঝে উস্পেনস্কায়া স্ট্রীট হয়ে আমার পুরনো স্কুল আর স্কুলের পার্ক পেরিয়ে যেতে যেতে পুরনো আবেগের কিছুটা ফিরে আসত, মন সাড়া দিত কিছুতে।

তখন পাকা সিগারেটখোর হয়ে গেছি, দস্তুরমতো দাড়ি কামাতে ঢুকি নাপিতের দোকানে, যেখানে একবার ছেলেমানুষের মতো কত না বাধ্যভাবে বসে আড়চোখে তাকিয়ে দেখেছিলাম কাঁচির দ্রুত গতিতে কীভাবে আমার ফিনফিনে চুল পড়ছে মেঝেতে। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত ডাইনিং-রুমের তুর্কি সোফায় বসে থাকতাম দু'জনে — প্রায় সর্বদা একলা: ওর বাবা সকাল সকাল চলে যেতেন, ভাই যেত স্কুলে, দুপুরে খাবার পর ওর বাবা একটু ঘুমিয়ে নিয়ে আবার কোথায় যেন বেরিয়ে যেতেন, আর ভাইটির পাগলের মতো খেলা চলত ভল্‌চক নামের লালচে-বাদামী কুকুরটার সঙ্গে, দোতলার কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ক্রমাগত উঠে আর নেমে কুকুরটা ভীষণ রাগের ভানে ঘেউ-ঘেউ করে প্রায় দম আটকে যেত। তারপর এমন একটা সময় এল যখন সোফায় এই একঘেয়ে বসে থাকায় এবং হয়ত আমার সদাজাগ্রত অতি অপরিমিত অনুভূতি প্রবণতায় বিরক্ত হয়ে ও নানা ছুতোয় বেরিয়ে গিয়ে বান্ধবী ও চেনাশোনা লোকেদের সঙ্গে দেখা করা শুরু করল, এদিকে সোফায় একা বসে আমি শুনতাম সিঁড়িতে স্কুলের ছেলেটির চীৎকার, হাসি আর মেঝেতে পা ঠোকা, আর ভল্‌চকের থিয়েটারি ঘেউ-ঘেউ, চোখের জলে ঝাপসা তাকিয়ে থাকতাম পর্দা-অর্ধেক-টানা জানলার দিকে, বাইরেব বিরস ধূসর আকাশের দিকে, সিগারেট খেতাম একটার পর একটা।... তারপর আবার ওর কী হল: বাড়িতে থাকার পালা শুরু, আমার প্রতি ওর ব্যবহার আবার এত মধুর মমতায় ভরা যে, ও ঠিক কী ধরনের মানুষ বুঝে উঠতে পারলাম না। একদিন আমাকে বলল, 'যাক গে, মনে হচ্ছে,

প্রিয়তম, এটা আমাদের অদৃষ্ট!' তারপর সুখে মুখ কুঁচকে কেঁদে ফেলল। এটা ঘটল লাঞ্চের পর, সে সময়টায় যখন পাছে ডাক্তারের ঘুমের ব্যাঘাত হয়, সবাই পা টিপে হাঁটত বাড়িতে। 'বাবার জন্য শুধু ভীষণ দুঃখ হয়, আমার সবচেয়ে আপনার লোক উনি দুনিয়ায়,' ও বলল, বরাবরকার মতো বাপের প্রতি ওর তীব্র অনুরাগে আমার অবাক লাগল। আর হবি তো হ', ঠিক সে সময় ওর ভাই ছুটে এসে অন্যমনস্কভাবে বিড় বিড় করে জানাল ডাক্তার দেখা করতে চান আমার সঙ্গে। ওর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ওর হাতে চুমু খেয়ে বেশ দৃঢ়ভাবে পা চালিয়ে গেলাম ঘর থেকে।

সবে বেশ ঘুমিয়ে নিয়ে হাতমুখ ধোবার পর মেজাজটা যেমন খোশ আর সদয় থাকে তেমনিভাবে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন ডাক্তার। গুণ গুণ করে গাইতে গাইতে একটা সিগারেট তিনি ধরাচ্ছিলেন। একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বললেন:

'শোনো, ভাই, অনেক দিন ধরে তোমার সঙ্গে বার্তাচিত করার ইচ্ছে — বিষয়টা জানো তো। ছেঁদো কথায় আমার আস্থা নেই, তুমি সেটা বেশ ভালোভাবে জানো। কিন্তু আমি চাই আমার মেয়ে যেন সুখী হয়; তোমার প্রতিও আমার গভীর আসক্তি, তাই পুরুষের মতো প্রাণ খুলে কথা বলা যাক। শুনলে হয়ত অবাক লাগবে, কিন্তু তোমার বিষয়ে কিছু জানি না: তুমি কে বলো তো!' মৃদু হেসে তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

মুখ লাল হয়ে গেল আমার, তারপর ফ্যাকাসে, সিগারেট জোরে টান দিলাম। কে আমি? গ্যেটের মতো জাঁক করে

বলতে পারলে ভালো হত (সবে একারম্যান*) পড়েছি তখন): 'নিজেকে আমি জানি না, আর ঈশ্বর করুন, কখনো যেন জানতে না হয়!' কিন্তু উত্তর দিলাম সবিনয়ে:

'আমি লেখক।... লেখা চালিয়ে যাব, খাটব।...'

তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে আরো বললাম:

'হয়ত তৈরী হয়ে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকব।...'

'বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকবে? তা তো অবশ্যই চমৎকার,' ডাক্তার বললেন। 'কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য তৈরী হওয়া সহজ কথা নয়। তাছাড়া, ঠিক কিসের জন্য নিজেকে তৈরী করতে চাও? শুধু সাহিত্যিক জীবনের জন্য, না সামাজিক, সরকারী কাজের জন্যও বটে?'

আবার আমার মনে ভিড় করে এল আবোলতাবোল নানা কথা — গোটের কথা আবার: 'সমস্ত পার্থিব জিনিসের নশ্বরতার প্রতি একটা বিতৃষ্ণায় যুগের পর যুগ অতিবাহিত করি।... রাজনীতি কখনো কবির কারবার হতে পারে না।...'

'সমাজ সেবা কবিদের কারবার নয়,' জবাবে বললাম।

অল্প অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন ডাক্তার:

'তার মানে, এই ধরো নেক্রাসভ*), তোমার মতে কবি নন মোটে? কিন্তু অন্তত সমসাময়িক জীবনের নানা ধারা তো তোমার খানিকটা চোখে পড়ে। যে কোনো সৎ ও বুদ্ধিমান রুশী বর্তমানে কিসে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ পায় জানো?'

আমার জানা যা, সব মনে মনে ভেবে নিলাম মুহূর্তখানেক: সবায়ের মুখে প্রতিক্রিয়া, জেমস্ত্ভোর

কর্মকর্তাদের কথা*, এখন 'বিনাশপ্রাপ্ত মহতী সংস্কার যুগের*⁾ বৈশিষ্ট্যসূচক নানা শুভ ক্রিয়াকর্মের' কথা... তলস্তয় প্রচারিত 'তপোবনের' কথা... সবাই বলে আমরা এখন নাকি বাস করছি চেখভের 'গোধূলি'তে।*⁾... মনে পড়ল তলস্তয়বাদীদের দ্বারা প্রচারিত মার্কাস্ ওরেলিয়াসের*⁾ উক্তির সেই চটি বইটা: 'ফ্রণ্টনকে দেখে জেনেছি তথাকথিত অভিজাতদের হৃদয় কী কঠোর।...' মনে পড়ল বসন্তকালে নীপারে আমার সঙ্গী সেই বিষণ্ণ ইউক্রেনীয় বৃদ্ধের কথা — কোন এক ধর্মীয় সংঘের লোক সে, নিজস্ব বিচিত্রভাবে বারবার সেণ্ট পলের সেই উক্তি আমাকে সে শোনায় যার উপসংহারে বলা হয়েছে: 'আমাদের সংগ্রাম রক্তমাংসের বিরুদ্ধে নয়, আমাদের সংগ্রাম ওপরওয়ালা, এ যুগের তমসাবৃত পৃথিবীর শাসকদের বিরুদ্ধে।...' তলস্তয়ের বাণীর প্রতি আমার পুরনো ঝোঁক ফিরে এল — সে বাণী মানুষকে সমস্ত সামাজিক দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেয় ও সঙ্গে সঙ্গে বিরোধিতা করে 'এ যুগের তমসাবৃত পৃথিবীর শাসকদের', যাদের আমিও দেখতে পারি না। — তলস্তয়ের শিক্ষাবলী নিয়ে একটা বক্তৃতা শুরু করে দিলাম।

'তার মানে তুমি ভাবো যা কিছু অশুভ, যা কিছু দুঃখক্লেশ তা থেকে মোক্ষের একমাত্র উপায় হল এই কুখ্যাত নিষ্ক্রিয়তা আর অপ্রতিরোধ?' অত্যন্ত নিস্পৃহভাবে জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার।

* বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলে প্রশাসন ও বিচার কর্তৃপক্ষ। অভিজাতসম্প্রদায় থেকে নিযুক্ত হত।

তাড়াতাড়ি জবাব দিলাম আমি সর্বান্তঃকরণে কর্মযোগ ও প্রতিরোধের স্বপক্ষে, কিন্তু সে কর্মযোগ ও প্রতিরোধ 'একেবারে অন্য ধাঁচের'। তলস্তয়ের বাণীতে আমার আসক্তি গড়ে ওঠে সেই সব বলিষ্ঠ ও পরস্পরবিরোধী অনুভূতিতে যা আমার মনে উদ্রিক্ত করেছিল পিয়ের বেজুখভ ও আনাতোলি কুরাগিন*), 'পক্ষিরাজ' গল্পের*) প্রিন্স সেপুর্খোভ্স্কয়, ইভান ইলিচ*), 'কী তাহলে করা যায়'*) ও 'মানুষের কতই বা জমি চাই'*) গল্প, মস্কোর লোকগণনার বিষয়ে লেখা প্রবন্ধটিতে শহরের আবর্জনা ও দারিদ্র্যের ভয়াবহ বর্ণনা ও প্রকৃতির কোলে সাধারণ লোকের সঙ্গে বাস করার একটি রোমাণ্টিক স্বপ্ন, যা জাগরিত হয় 'কসাক'*) পাঠে ও ইউক্রেনকে নিজের চোখে দেখার ফলে: ভাবতাম, আমাদের এই অন্যায় জীবনের সমস্ত কলঙ্ক ঝেড়ে ফেলে স্তেপের কোনো ছোট গাঁয়ে, নীপারের তীরে কোনো সাদা ছোট কুঁড়েতে কাজের শুচি জীবন শুরু করতে পারলে কী চমৎকার না হত! কুঁড়েঘরটার কথা বাদ দিয়ে এসব ভাবনাচিন্তার কিছুটা বললাম ডাক্তারকে। তিনি মন দিয়ে শুনলেন, কিন্তু মনে হল অত্যন্ত মুরুব্বিয়ানার ভাবে। একবার তো তাঁর ঘুমেভরা চোখ প্রায় জুড়ে এল, হাই চাপার চেষ্টায় নড়ে উঠল শক্ত চোয়াল, কিন্তু তন্দ্রার ঘোর কাটিয়ে হাই-এর ঠেলায় নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত করে বললেন তিনি:

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনছি... তুমি বলতে চাও ধরাধামের মামুলি কোনো সুখ, ব্যক্তিগত কোনো সুখের ধান্দা তোমার নেই? কিন্তু জানো তো, সব সুখই ব্যক্তিগত নয়। এই ধরো আমি, জনগণের ভক্ত আমি নই মোটে; দুর্ভাগ্যক্রমে

ওদের ভালোই চিনি, আমার বিশ্বাস হয় না যে ওরা সর্বজ্ঞানের উৎস ও আধার, ওদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমি একথা বলতে রাজী নই যে পৃথিবী রয়েছে তিনটে তিমি মাছের পিঠে। তবুও ওদের প্রতি কি আমাদের কোনো দায়িত্ব বা বাধ্যবাধকতা নেই? যা হোক, এ বিষয়ে তোমাকে উপদেশ দেবার দুঃসাহস আমি করব না। অন্তত তোমার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাওয়াতে খুশি হয়েছি। এখন তাহলে আমার বক্তব্যে ফিরে যাওয়া যাক। সংক্ষেপে বলব, আর কিছু ঢেকে বলব না, মাফ করো। পরস্পরের প্রতি তোমার ও আমার মেয়ের মনোভাব আর সে মনোভাবের বর্তমান বিকাশ যাই হোক, তোমাকে আমি এখন এই বলব: ও সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন বটে, কিন্তু এই ধরো যদি তোমার সঙ্গে পাকাপাকি গোছের একটা বন্ধনে আবদ্ধ হতে চেয়ে আমার আশীর্বাদ চায়, তাহলে সরাসরি 'না' বলব। তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে, তোমার সর্বপ্রকার মঙ্গল কামনা করি, কিন্তু 'না'র অন্যথা হবে না। কেন? জবাবটা হবে একেবারেই বাপের মতো: তোমাদের দু'জনকে অসুখী দেখতে, দুঃখকষ্টে ডুবে অনিশ্চয়তার মধ্যে কোনোক্রমে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছ দেখতে আমি চাই না। তাছাড়া, একেবারে খোলাখুলিভাবে তোমাকে জিজ্ঞেস করি: তোমাদের দু'জনের মধ্যে কী মিল আছে? লিকা বেশ মিষ্টি চেহারার মেয়ে, কিন্তু, কথাটা চেপে গিয়ে লাভ নেই — ওর মতিগতি অস্থির — আজ এটা কাল সেটার মোহে ও গা ভাসিয়ে দেয় — তলস্তয়ের 'তপোবনের' স্বপ্ন অবশ্য ও দেখে না — ছিরিহীন এই শহরটায় ওর পোশাকের ধুম একবার দেখো! একথা আমি

মোটে বলতে চাই না যে ও বিগড়ে গেছে, শুধু বলতে চাই যে আমার মতে ও, যাকে বলে, তোমার দোসর নয় মোটে।...'

সিঁড়ির তলায় লিকা দাঁড়িয়েছিল আমার অপেক্ষায়, জিজ্ঞাসু ও দুঃসংবাদের জন্য প্রস্তুত দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে। ডাক্তারের শেষ কটি কথা তাড়াতাড়ি জানিয়ে দিলাম। মাথা হেঁট করে ও বলল:

'না, ওঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমি কখনো যাব না!'

৫

নিকুলিনার বোর্ডিং-হাউজে থাকার সময় মাঝে মাঝে আমি বেরিয়ে অনির্দিষ্টভাবে শেচপ্নায়া চকে হাঁটতাম, তারপর মঠের পেছনের ফাঁকা মাঠ হয়ে প্রাচীন দেয়ালে ঘেরা বড়ো কবরখানা পেরিয়ে যেতাম। আর কিছু নেই — শুধু হাওয়া, বিষাদ আর নিস্তব্ধতা, সবার কাছে বিস্মৃত, অবহেলিত ক্রুশ ও কবরপাথরের অনন্ত শান্তি, নিঃসঙ্গ অস্পষ্ট কী একটা ভাবনার মতো কী একটা শূন্যতা। কবরখানার ফটকের ওপরে আঁকা একটি ধুধু নীল-ধূসর সমভূমির এখানে-ওখানে হাঁ-করা কবর আর ভেঙে পড়া কবরপাথরের ছোপ, তার নীচ থেকে উঠছে দন্ত ও পিঞ্জর-সর্বস্ব, কঠিন কঙ্কাল ও ফিকে সবুজ শবাচ্ছাদন গায়ে মান্ধাতার আমলের বুড়ো-বুড়ী। সমভূমির ওপরে শিঙা মুখে উড্ডীন বিরাট একটি দেবদূত — রঙচটা নীল পোশাক হাওয়ায় প্রসারিত পেছনে, কুমারীসুলভ নগ্ন পা হাঁটুর কাছে বাঁকা, লম্বা পায়ের খড়ির মতো সাদা তলা ওলটানো।... বোর্ডিং-

হাউজেও মফস্বলের হৈমন্তী শান্তির রাজত্ব, সেখানে শূন্যতা — গ্রাম থেকে লোক আসে ক্বচিৎ কখনো। ফিরে উঠানে ঢুকে দেখতাম — পুরুষের টপবুট পায়ে চালা থেকে একটি মোরগ হাতে আমার দিকে আসছে রাঁধুনী। কেন জানি হেসে বলত: 'বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি এটাকে, বুড়ো হয়ে মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে, কিছুদিন থাক আমার সঙ্গে।...' পাথরের চওড়া অলিন্দের ধাপে উঠে অন্ধকার প্রবেশপথ ও তারপর তক্তাপোষ-দেওয়া গরম রান্নাঘর পেরিয়ে ঢুকতাম সামনের ঘরগুলোয় — কর্ত্রীর শোবার ঘর, তারপর সেই ঘরটা যেখানে দুটো সোফা ভাড়া দেওয়া হয় কালেভদ্রে আসা অতিথিদের — হয় যাজক নয় ব্যাপারীদের — কিন্তু বেশীর ভাগ সময় কেবল আমাকে! স্তব্ধতা, স্তব্ধতারই মধ্যে কর্ত্রীর শোবার ঘরে এলার্ম-ঘড়ির শান্ত টিকটিক।... 'বেড়িয়ে এলেন তো?' নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে মধুর দরদী হাসিতে জিজ্ঞেস করত কর্ত্রী। কী মোহিনী সুরেলা গলা! স্ত্রীলোকটি মোটাসোটা, মুখ গোলপানা। মাঝে মাঝে এমন একটা সময় আসত যখন শান্তভাবে তাকাতে পারতাম না তার দিকে — বিশেষ করে সেই সব সন্ধ্যায় যখন টকটকে লাল মুখে গোসলখানা থেকে ফিরে ভিজে কালো চুলে, নরম, অলস চোখে ঝিলিক হেনে রাত্রির সাদা ব্লাউজ পরা পরিষ্কার দেহ আরাম কেদারায় আলতোভাবে এলিয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে চা খেত আর সিল্কের মতো সাদা, গোলাপী চোখ বেড়ালটা তার নধর, একটু ফাঁক-করা হাঁটুতে বসে গড়গড় করত। বাইরে শোনা যেত ঠকঠক আওয়াজ: রাঁধুনী ভারি খড়খড়িগুলো বন্ধ করছে, জানলার দু'ধারে যথাস্থানে

বসিয়ে দেওয়াতে কনুইয়ের মতো দেখতে পাতগুলোর লোহার খিলের ঝনঝনানি — এতে মনে পড়ে যায় আগেকার দিনকালে কী বিপদ-আপদ ছিল। নিকুলিনা তখন উঠে পাতগুলোর কোণের ফাঁকে লোহার ছোট গুঁজি এঁটে আবার চা খেতে বসত, তারপর ঘরটা এমনকি আরো আরামের হয়ে যেত।... পাগলের মতো নানা চিন্তা ও অনুভূতি আচ্ছন্ন করে দিত আমাকে · সর্বস্ব ছেড়েছুড়ে এখানে, এই বোর্ডিং-হাউজে চিরকাল থেকে যাওয়া, শান্তিতে টিকটিক করা এলার্ম-ঘড়ির আওয়াজে তার উষ্ণ বিছানায় ঘুমনো! একটা সোফার ওপরে দেয়ালে আশ্চর্য সবুজ অরণ্যের ছবি: দীর্ঘ প্রাচীরের মতো সে অরণ্য, কাঠের কুঁড়ে একটি, আর কুঁড়ের পাশে ছোটখাটো একটি বুড়ো — দেহ তার করুণ কুঁজো, শীর্ণ হাত রাখা বাদামি একটা ভালুকের মাথায়, তারও চেহারা ভীরু করুণ, থাবাগুলো নরম; অন্য সোফায় লোকে যেখানে বসবে বা ঘুমোবে তার ওপরকার ছবিটা একেবারে বিদঘুটে মনে হয় — ছবিটা হল কফিনে শায়িত একটি সাদা-মুখ, কালো ফ্রককোট পরিহিত হোমরা-চোমরা লোকের, নিকুলিনার বিগত স্বামীর। হেমন্তের দীর্ঘ সন্ধ্যার সঙ্গে সুর মিলিয়ে রান্নাঘর থেকে আসত তালে তাল ঠোকার ও একঘেয়ে গানের শব্দ: 'গির্জার সামনে গাড়ি, ফলাও বিয়েবাড়ি...' — শীতকালে নুনে রাখার জন্য বাঁধাকপির খরখরে টানটান পাতা কোচাতে পয়সা দিয়ে আনানো হত যেসব মেয়েদের তারা গাইত গানটি। আর সমস্ত কিছুতে — সস্তা গানে, তালে তালে ঘা মারায়, পুরনো সস্তা ছাপা ছবিতে, এমনকি সেই মরা লোকটিতেও, যার জীবন মনে হয় বোর্ডিং-

হাউজের মাথামুণ্ডুহীন সুখী জগতে তখনো জের টেনে চলেছে — এ সমস্ত কিছুতে ছিল তিক্ত মধুর একটা বিষণ্ণতা।...

৬

নভেম্বরে বাড়ি ফিরলাম। বিদায় নেবার সময়ে ঠিক করা হল ওরিওলে দেখা হবে: ১লা ডিসেম্বর ট্রেন ধরবে লিকা, আমি আসব পরে, লোক দেখানোর খাতিরে না হয় সপ্তাহ খানেক পরে। কিন্তু পয়লা তারিখে বরফাবৃত চাঁদিনী রাতে, পাগলের মতো গাড়ি ছুটিয়ে গেলাম পিসারেভোতে, শহর থেকে যে ট্রেনটা ওর ধরার কথা সেটাতে চাপার জন্য। রূপকথার মতো সেই অপরূপ সুন্দর রাত্রিটা যেন চোখে দেখছি, অনুভব করছি! চোখের সামনে দেখি বাতুরিনো ও ভাসিলিয়েভ্স্কয়ের মাঝামাঝি সমতল তুষারাবৃত মাঠে জুড়ি ঘোড়ার গাড়িতে তীরবেগে চলেছি, জোয়ালের ডাণ্ডার সঙ্গে জোতা মূল ঘোড়াটা যেন মাত্র এক জায়গাতে দাঁড়িয়েই কাঁপাচ্ছে তার হাঁসুলী, দ্রুত সমছন্দে যাত্রা, পাশে বাঁধা সহকারী ঘোড়াটার পাছা তালে তালে উঠছে আর পড়ছে, পেছনের পায়ের খুরে বরফের ডেলা ছিটিয়ে চলেছে নালে সাদা ঝিলিক তুলে।... হঠাৎ মাঝেমাঝে রাস্তা থেকে ছিটকে গভীর বরফে পড়ে আঁকুপাঁকু করে হাঁপিয়ে উঠে বরফে পা ডুবে গিয়ে ঘোড়াটা জড়িয়ে যাচ্ছে খুলে-যাওয়া দড়িতে, তারপর পা রাখবার মতো জায়গা পেয়ে এক লাফে রাস্তায় এসে আবার তীরবেগে দৌড়, জোয়ালের ডাণ্ডায় সজোরে টান দিয়ে।... সমস্ত কিছু ভেসে যাচ্ছে অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে — অথচ একই সঙ্গে মনে হচ্ছে তারা

গতিহীন ও প্রতীক্ষমাণ. অনেক দূরে নীচু শান্ত. হিমকণায় ঝাপসা. কুয়াসার জ্বলন্ত মন্ডলে রহস্যভরা বিষাদের ছাপ মাখা চাঁদের তলায় আঁশের মতো রূপোলি বরফের চাদর পড়ে আছে চিকচিকে. স্তব্ধ আমি, স্তব্ধতার রাজত্বে ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে একটা সময় পর্যন্ত অসাড় আমার মন. প্রতীক্ষায় বিধুর, অথচ বিষণ্ন আগ্রহে চেয়ে আছি কী একটা স্মৃতির দিকে: ঠিক এই রকম একটা রাত, একই পথে গিয়েছিলাম ভার্সিলিয়েভ্স্কয়েতে, বাতুরিনোতে — শুধু ওখানে সেটা আমার প্রথম শীতযাপন. তখন আমি ছিলাম শুচি. নিষ্পাপ ও যৌবনের প্রথম আনন্দোচ্ছ্বল দিনগুলিতে মুখর. তখন ভার্সিলিয়েভ্স্কয়ে থেকে আনা পুরনো ছোট ছোট বইয়ের কবিতার স্তবক. বাণী. শোকগাথা ও লোকগাথায় উন্মোচিত পৃথিবীর প্রথম কাব্যস্বাদে বিমুগ্ধ আমি:

> ঘোড়ার খুরের শব্দ। ধুধু চারিদিক,
> সভেৎলানার চোখে শুধু শূন্য স্তেপ...*)

'কোথায় গেল সেসব এখন!' - ভাবছিলাম, কিন্তু তখন আমার মন যা ছেয়ে রেখেছিল. অসাড় প্রতীক্ষার সেই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসি নি নিমেষের জন্য। 'ঘোড়ার খুরের শব্দ। ধুধু চারিদিক...' — মনে মনে আওড়াচ্ছি ঘোড়ার কদমে তাল রেখে (গতিবেগের সেই ছন্দে তাল রেখে. যে ছন্দের মোহ আমার মনে বরাবর এত প্রখর) বললাম নিজেকে আর মনে হল আমি এখন অন্য মানুষ — ফৌজী কেতার টুপি মাথায়. ভালুকলোমের ওভারকোট গায়ে আগেকার দিনের বীরপুরুষের মতো ঘোড়া ছুটিয়ে

চলেছি কোথাও, বাস্তবের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে শুধু ভেড়ার চামড়ার কোর্তার ওপর তুলোর কোট চাপানো, বরফে ঢাকা, সামনে দাঁড়ানো গাড়োয়ানটা আর আমার হিম অসাড় পায়ের কাছে সীটের বাক্সে রাখা বরফ-কণায় মাখামাখি, জমে-যাওয়া সুগন্ধি যইয়ের খড়।... ভার্সিলিয়েভ্স্কয়ের পর গাড়িটা বরফের একটা গাদায় পড়ে ঘুরে উল্টে যাওয়াতে জোয়ালের ডাণ্ডা ভেঙে গেল, গাড়োয়ান দড়ি দিয়ে বাঁধতে লাগল সেটা, আর আমি ট্রেন না ধরার ভয়ে মৃতপ্রায় হয়ে বসে রইলাম। স্টেশনে পৌঁছিয়েই যা টাকাকড়ি ছিল তা দিয়ে প্রথম শ্রেণীর একটা টিকিট কিনে — ও বরাবর প্রথম শ্রেণীতে ওঠে — দৌড়লাম প্ল্যাটফর্মে। মনে আছে জমে-যাওয়া বাষ্পে ঝাপসা চাঁদের আলোয় ঢাকা পড়েছে প্ল্যাটফর্মের হলদে বাতি ও টেলিগ্রাফ-অফিসের আলোকিত জানলাগুলো। ট্রেনটা তখন ঢুকছে স্টেশনে, বরফে ঢাকা অস্পষ্ট দূরসীমায় তাকিয়ে রইলাম, হিমকণা আর ভেতরকার হিম কাঁপুনির জন্য মনে হল শরীরটা যেন কাঁচের তৈরী। হঠাৎ ঘণ্টা বেজে উঠল জোরে, ফাঁপা শব্দে, দড়াম করে দরজা খোলার তীক্ষ্ন কিঁচকিঁচে আওয়াজ, স্টেশন থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসা লোকের পায়ের খর মচমচ শব্দ — তারপর দূরে দেখা দিল ইঞ্জিন কালো লোমশ একটা বস্তুপিণ্ডের মতো, হুসহুস শব্দে আস্তে আস্তে এগিয়ে এল ঝাপসা লাল আলোর ভয়াবহ ত্রিভুজ — বরফে ঢাকা, সর্বাঙ্গ একেবারে ঠাণ্ডায় জমাট। ট্রেনটা অতি কষ্টে কিঁচকিঁচিয়ে, কেঁদে ককিয়ে এসে পৌঁছল স্টেশনে।... এক লাফে সিঁড়ি ডিঙিয়ে কামরার দরজা হাট করে খুলে

ফেললাম — ওই তো ও, কাঁধে ফারকোট, ঘন লাল পর্দার আড়ালের একটি লণ্ঠনের নীচে ঝাপসা অন্ধকারে গোটা কামরায় একেবারে একলা বসে সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে আছে।...

কামরাটা পুরনো, উঁচু, তিন জোড়া চাকার ওপরে বসানো; ঠান্ডায় দ্রুত বেগে যাওয়ার সময় কাঁপুনি আর ঘড়ঘড়ানি, ওঠাপড়া আর দোলানি, দরজা আর দেয়ালের কিঁচকিঁচ, ছাই-রঙা হীরের মতো হিমকণাবৃত জানলাগুলোর ঝিকিমিকি।... এরই মধ্যে চলে এসেছি অনেক দূর, মাঝরাত।... আপনা থেকেই সব কিছু ঘটল, তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না আমাদের ইচ্ছাশক্তির বা চেতনার।... আরক্তির মুখে, কিছু না দেখা চোখে উঠে ও চুলটা ঠিক করে নিল, তারপর চোখ বুজে বসে রইল একটি কোণে, ধরা ছোঁওয়ার বাইরে।...

৭

সে শীতটা আমরা কাটালাম ওরিওলে।

নতুন ভয়ানক ঘনিষ্ঠতায় গোপনে আবদ্ধ আমরা, কী করে বোঝাই আমাদের তখনকার মনের ভাব, যে ভাব নিয়ে সকালে স্টেশন থেকে পত্রিকা-অফিসে ঢুকেছিলাম!

আমি উঠলাম ছোট একটা হোটেলে, ও আগেকার মতো রয়ে গেল আভিলভার সঙ্গে। দিনের বেলার বেশীর ভাগ কাটত সেখানে, আর ঘনিষ্ঠ প্রহরগুলি — আমার হোটেলে।

আমাদের সুখ হালকা ধরনের নয়, মনে ও শরীরে হাঁফ ধরিয়ে দেয়।

একটি সন্ধ্যার কথা মনে আছে: ও গিয়েছে স্কেটিং করতে, অফিসে কাজ করছি আমি — তখন ওখানে কাজ পেয়ে অল্পস্বল্প রোজগারও শুরু হয়েছে। বাড়িটা ফাঁকা আর চুপচাপ। কী একটা মিটিঙে গেছে আভিলভা। সন্ধে যেন আর শেষ হয় না। জানলার বাইরে রাস্তার আলো বিষণ্ণ, অযাচিত, বরফের ওপর মচমচ শব্দে আসা-যাওয়া পথচারীদের পায়ের শব্দ যেন কী একটা নিয়ে নিচ্ছে আমার কাছ থেকে, রিক্ত করে দিচ্ছে যেন আমাকে। মনে নিঃসঙ্গতা, ব্যথা আর হিংসের গুরুভার। একলা বসে বসে কী একটা বাজে কাজ করে চলেছি আমি, আমার অযোগ্য কাজ নিতে হয়েছে ওরই খাতিরে, আর ও কিনা মজা লুঠছে বরফ-ঢাকা পুকুরে, যার চারিধারে কালো ফার গাছসুদ্ধ সাদা বরফের টিলা, যেখানে ফৌজী অর্কেস্ট্রার মুখর শব্দ, গ্যাসের বেগুনি আলোর বান ডেকেছে, ইতস্তত দেখা যাচ্ছে উড়ন্ত কালো মূর্তির ছোপ।... হঠাৎ ঘণ্টা বেজে উঠল, দ্রুত পদক্ষেপে ও ঘরে ঢুকল। পরনে ছাই-রঙা পোশাক, মাথায় কাঠবিড়ালীর চামড়ার ছাই-রঙা টুপি। হাতে ঝকঝকে স্কেট, এক নিমেষে আনন্দে ঘর ভরে গেল ওর নবীন, হিম ছড়ানো সতেজ ভাবে, ঠাণ্ডায় আর শারীরিক পরিশ্রমে আরক্তিম ওর মুখের সৌন্দর্যে। 'বাপরে, কী ক্লান্ত লাগছে!' — বলে নিজের ঘরে চলে গেল। পেছন পেছন গেলাম; সোফায় ধড়াস্ করে বসে শ্রান্তির হাসি হেসে পা এলিয়ে দিল ও, হাতে তখনো স্কেট। আর এরই মধ্যে অভ্যাসে পরিণত যন্ত্রণার জ্বালায় আমি তাকিয়ে রইলাম উঁচু বুটে ফিতে দিয়ে বসানো ওর পায়ের গাঁটে, খাটো ছাই-রঙা স্কার্টের তলায় ছাই-রঙা

মোজা পরা ওর পায়ে — এমনকি স্কার্টের সেই মোটা পশমের কাপড়টা দেখলেই মনে আসত বাসনার জ্বালা — তারপর বকতে লাগলাম ওকে -- সারাদিন দু'জনের তো দেখা হয় নি! — কিন্তু হঠাৎ বুকচেরা স্নেহে আর মমতায় দেখলাম ও ঘুমিয়ে পড়েছে।... জেগে উঠে সোহাগের বিষণ্ণ কণ্ঠে ও বলল: 'যা বললে প্রায় সব শুনেছি। রাগ করো না, ভয়ানক ক্লান্ত লাগছে। জানোই তো, এ বছরটায় অনেক ধকল সইতে হয়েছে!'

৮

ওরিওলে থেকে যাওয়ার একটা ছুতো ওর দরকার, তাই গানবাজনা নিয়ে পড়ল। ছুতোর অভাব আমারও হল না: 'কণ্ঠস্বর' পত্রিকায় চাকরি জুটল। প্রথম প্রথম সত্যি ভালো লাগত কাজটা: আমার জীবনযাত্রায় শৃঙ্খলার যে বাহ্যিক একটা ভাব এল সেটাই উপভোগ করতাম। আমার সম্পূর্ণ দায়িত্ববিহীন জীবনে এখন একটা দায়িত্ববোধ আসাতে সান্ত্বনা পেলাম। তারপর ক্রমশ বারবার মনে হানা দিতে লাগল একটা কথা: এই কি সেই জীবন যার স্বপ্ন দেখেছিলাম! এ তো, আমার জীবনের সেরা দিন হতে পারত যে সময়টা, হাতের মুঠোয় যখন থাকা উচিত সমস্ত পৃথিবী, তখন কিনা এভাবে কাটাচ্ছি দিন! একজোড়া গ্যালোস পর্যন্ত নেই! এসব কি শুধু ক্ষণিকের ব্যাপার? তাহলে ভবিষ্যতের গর্ভে কী আছে? কল্পনা করতে শুরু করলাম যে আমাদের দুজনের ঘনিষ্ঠতায়, আমাদের ভাবাবেগ, চিন্তা ও রুচির

মিলে কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে, সুতরাং ওর একনিষ্ঠতায় গণ্ডগোল ঘটতে বাধ্য: 'স্বপ্ন ও সত্যের মধ্যে সেই চিরন্তন বিরোধ', সমগ্র ও সম্পূর্ণ প্রেমের সেই চিরন্তন অগম্যতা সেই শীতকালটায় অনুভব করলাম বিচিত্র তীব্রতায়, যা আমার পক্ষে ভয়ঙ্কর অকরুণ।

লিকার সঙ্গে পার্টিতে ও বলনাচে গেলে সবচেয়ে বেশী যন্ত্রণা হত। ওর সঙ্গী সুন্দর ও ভালো নাচিয়ে হলে চোখে পড়ত ওর আনন্দ, সজীবতা, দ্রুত ঘূর্ণমান পা ও স্কার্ট; তখন বলিষ্ঠ ছন্দের, ওয়াল্‌জ্‌ সুরের সঙ্গীতে ব্যথায় মুচড়িয়ে উঠত বুক, কান্না পেত। তুর্চানিনভের সঙ্গে যখন ও নাচত সবাই তাকিয়ে দেখত খুশিতে — অস্বাভাবিক লম্বা সেই অফিসারটির কালো জুল্‌ফি, শ্যামবর্ণ লম্বা মুখ, স্থির কালো চোখ। লিকা লম্বা কম নয় — কিন্তু অফিসারটি প্রায় দু'মাথা লম্বা, লিকাকে ঘনিষ্ঠভাবে ধরে ওয়াল্‌জের তালে তালে ওকে লাবণ্যভাবে ঘুরপাক দিয়ে অশেষ নাচার সময় কেমন একটা একগুঁয়েভাবে মুখ নামিয়ে অফিসারটি তাকিয়ে থাকত ওর দিকে, আর অফিসারের দিকে তুলে ধরা তার মুখে একাধারে সুখ ও দুঃখের, সুন্দর ও আমার পক্ষে অসীম ঘৃণ্য কী একটা আসত। ঈশ্বরের কাছে তীব্রভাবে প্রার্থনা করতাম যে অবিশ্বাস্য কিছু একটা ঘটুক — লোকটা হঠাৎ মুখ নামিয়ে চুমো খাক ওকে, তাহলে আমার যন্ত্রণাকর প্রত্যাশা তৎক্ষণাৎ হাতেনাতে সাক্ষ্য পাবে; নিশ্চিত হবে হৃদয়ের মৃত্যু!

'তুমি সবসময় নিজের কথা ভাবো, তোমার ইচ্ছেমতো সব কিছু হোক তাই চাও,' একবার লিকা বলল আমাকে।

'মনে হয় পারলে তুমি মহানন্দে আমার ব্যক্তিগত জীবনের কিছু রাখবে না, কোনো বন্ধুবান্ধব থাকবে না, নিজে যেমন সকলের কাছ-ছাড়া হয়ে পড়েছ ঠিক তেমনি সবায়ের কাছ-ছাড়া করে দেবে আমাকেও।...'

আর সত্যি: প্রেমে, বিশেষ করে স্ত্রীলোকের প্রতি প্রেমে যে করুণা ও মমতা মাখানো স্নেহের একটি উপকরণ থাকতে বাধ্য, সেই রহস্যময় নিয়মের বশে আমি ঘৃণা করতাম ওর হাসিখুশির মুহূর্তগুলিকে — দলের মধ্যে থাকার সময় বিশেষ করে — ঘৃণা করতাম ওর সজীবতা, নিজেকে দেখানোর ও লোকের প্রশংসা কুড়নোর ওর ইচ্ছে; আর তীব্র ভালো লাগত ওর সরলতা, শান্ত, ভীরু ভাব, ওর অসহায়তা, আর ওর চোখের জল — কাঁদলেই সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মতো ফুলে উঠত ওর ঠোঁট। সামাজিক আড্ডায় সত্যি দলছাড়া হয়ে থাকতাম বেশীর ভাগ, নিষ্ঠুর পরিদর্শকের মতো হত আমার রকম-সকম। সে নিঃসঙ্গতা ও ঈর্ষা শানিয়ে দিত আমার ভাবধারণ ক্ষমতা, অন্যদের সব খুঁতের বিষয়ে সজাগতা আর অন্তর্দৃষ্টি, তাতে মনে মনে অত্যন্ত গৌরব বোধ করতাম। তবু লিকার সঙ্গে সত্যিকার ঘনিষ্ঠতার জন্য আমার কী ব্যাকুলতা আর তাতে ব্যর্থকাম হলে কী যন্ত্রণা!

প্রায়ই কবিতা পড়ে শোনাতাম ওকে।

'এটা শোনো তো, কী আশ্চর্য!' বলে উঠতাম। 'আমার হৃদয়কে নিয়ে যাও দূরে, যেখানে বনের ওপরে চাঁদের মতো বসে আছে বিষণ্ণতা!'*)

কিন্তু এতে ও আশ্চর্য কিছু খুঁজে পেত না।

'হ্যাঁ, বেশ সুন্দর বটে,' সোফায় আরাম করে কুঁকড়ে

শুয়ে, গালের নীচে হাত রেখে, আমার দিকে অস্পষ্ট নিস্পৃহভাবে পাশ থেকে তাকিয়ে বলত। 'কিন্তু 'বনের ওপারে চাঁদের মতো' কেন? ফেতের লেখা নাকি? প্রকৃতি বর্ণনায় ওর বড্ডো বেশী আগ্রহ।'

চটে উঠতাম: একে বলছ বর্ণনা! — লম্বা একটা বক্তৃতা শুরু করে দিতাম ওকে বোঝানোর জন্য যে প্রকৃতি আর আমাদের মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই, হাওয়ার সামান্যতম স্পন্দন পর্যন্ত হল আমাদের জীবনের স্পন্দন; কিন্তু ও শুধু হেসে বলত:

'ওগো, মাকড়সারাই শুধু থাকে ওরকমভাবে!'

তারপর আমি পড়ে যেতাম:

> পথ চোখে পড়ে না আর হায়!
> আবার বরফে ঢেকেছে পথ,
> আবার বরফের স্তূপে চলেছে ধীরে
> রুপালি পিচ্ছিল সাপ...*)

ও জিজ্ঞেস করল:

'সাপ আবার কী?'

বুঝিয়ে বলতে হল যে তুষার-ঝড়ের কথা বলা হয়েছে, মাটির কাছে ঘুরপাক খাচ্ছে বরফ। বিবর্ণ মুখে পড়তাম:

> শ্লেজের ঢাকুনির নিচে
> হিম কঠিন রাত্রির ঘোলাটে দৃষ্টি...
> পাহাড় ও বনের ওপারে, ধোঁয়াটে মেঘের মাঝখানে
> চাঁদের বঙ্কিম রেখার ঝিকিমিকি...*)

'ওগো,' বলল, 'কই, এমন ধারা জিনিস তো কখনো

চোখে পড়ে নি!'

আক্রোশ চেপে রেখে পড়লাম:

> মেঘের ফাঁকে উঠল সূর্য, দীপ্ত নবীন,
> বালুতে আঁকলে ঝকঝকে আঁকাবাঁকা রেখা...*)

তারিফ করে ও মাথা নাড়ল, তার কারণ, বোধহয়, এই যে, ও ভাবল বাগানে বসে সে-ই ছোট্ট সৌখীন ছাতা দিয়ে বালুতে হিজিবিজি কাটছে।

'সত্যি বেশ সুন্দর,' বলল। 'যাক, কাব্যি অনেক হয়েছে, এবার কাছে এসো... তুমি তো সবসময় আমার ওপর চটে থাকো!'

ওকে প্রায়ই বলতাম আমার শৈশব ও কৈশোরের কথা, আমাদের জমিদারির রোমাণ্টিক মোহের কথা, বলতাম বাবা, মা ও বোনের কথা। ও শুনত নির্মম উদাসীনতায়। আমি চাইতাম আমাদের পরিবারে মাঝেমাঝে যে দারিদ্র্য ঘনিয়ে আসত তার কথা শুনে ও বিচলিত হোক, দুঃখ বোধ করুক — যেমন, একবার ফ্রেম থেকে সবকটা আইকন খুলে নিয়ে পুরনো রুপোর অলংকার শহরে পাঠাতে হল মেশ্চেরিনভার কাছে বাঁধা রাখতে; বাঁকা নাক, গোঁফ, ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখ, সিল্ক, শাল আর আংটির বহরে ভয়াবহ প্রাচ্য ধরনের চেহারার সেই নিঃসঙ্গ বুড়ীটার কাছে, যার ফাঁকা বাড়িতে গুচ্ছির অতি পুরনো জিনিসের মাঝে একটা কাকাতুয়া সারাদিন ডেকে যেত তীক্ষ্ণ করা গলায়। কিন্তু বিচলিত বা বিষণ্ণ না হয়ে লিকা বলত অন্যমনস্কভাবে:

'কী ভয়ানক, সত্যি!'

শহরে যত দিন কাটছে তত খাপছাড়া লাগছে নিজেকে। এমনকি কী কারণে জানি না আমার প্রতি আভিলভার ব্যবহার পর্যন্ত বদলে গেল, এল নিস্পৃহতা ও বিদ্রূপের একটা ভাব। শহরে আমার জীবন যত বিরস ও নিরানন্দ হয়ে যায়, তত ঘন ঘন আসে ওর আরো কাছে থাকার ঝোঁক — ওকে পড়ে শোনাবার, ওকে বলার, ওর কাছে হৃদয় উজাড় করে দেবার ঝোঁক। হোটেলে আমার ঘরটা ছোট, বিষণ্ণ আর বৈচিত্র্যবিহীন। ভীষণ দুঃখ হত নিজের জন্য — আমার একমাত্র সম্বল একটি বাজে স্যুটকেস আর গুটিকতক বইয়ের জন্য, ঘরে আমার নিঃসঙ্গ সব রাত্রির জন্য। রাত্রিগুলো এত ভয়ানক আর ঠাণ্ডা বলা যায় যে, ঘুমোনোর চেয়ে লড়াই করে জিততে হত আমাকে, তন্দ্রার ঘোরে আমার কাছে ধরা পড়ত যে ভোরের অপেক্ষায় আছি, গির্জার ঘণ্টাঘরে হিম সকালে কখন বেজে উঠবে প্রথম ঘণ্টাধ্বনি। লিকার ঘরও ছোট; চিলেকুঠির সিঁড়ির ধারে দরদালানের কোণে, কিন্তু জানলাগুলো বাগানের দিকে; ঘরটা চুপচাপ, গরম আর সাজানো; সন্ধ্যায় চুল্লিতে আগুন জ্বালানো হত, আর অত্যন্ত সুন্দর চটিজোড়াসুদ্ধ পা গুটিয়ে, তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ও কুঁকড়ে শুত মধুর একটা ভঙ্গিতে। আমি আবৃত্তি করতাম:

> সুদূর গভীর বনে মধ্যরাত্রি নামল,
> তুষার-ঝড়ের হুঙ্কার,
> ঘরে আগুনের ধারে আমরা মুখোমুখি বসে
> আগুনে ডাল পোড়ার শব্দ...*)

কিন্তু তুষার-ঝড়, বন-বাদাড়, নিভৃতি, নীড়,

অগ্নিকুণ্ডের কাব্যময় আদিম আনন্দ — এসব বিশেষ করে তার স্বভাববিরুদ্ধ।

কত দিন না বিশ্বাস করেছি যে শুধু এই বলে ওর মন রাঙিয়ে দেব উত্তেজনায়: 'লাইলাক-রঙা রবারের মতো মসৃণ, এখানে-ওখানে ঘোড়ার নালের পেরেক বসানো, সূর্যাস্তের আলোয় চোখ-ঝলসানো সোনালি রেখায় চিকচিকে হেমন্তের পথগুলির কথা জানো তুমি?' ওকে বললাম হেমন্তের সেই শেষ দিনটার কথা যেদিন আমি ও আমার ভাই গেওর্গি বনে যাই বার্চ গাছের কাঠ কিনতে: রান্নাঘরের ছাদটা হঠাৎ ঝুলে পড়াতে আমাদের আগেকার বাবুর্চিটা আর একটু হলে মারা পড়ত — বুড়ো সেই লোকটা চুল্লির ওপরের তাকে হামেশা শুয়ে থাকত। তাই কড়িবরগার জন্য বার্চকাঠ কিনতে গেলাম বনে। বৃষ্টির বিরাম নেই (রোদের মধ্যে ক্ষিপ্রগতিতে নেমে আসছে ছোট ছোট বৃষ্টিবিন্দু)। চাষাভুষোদের সঙ্গে গেলাম প্রথমে বড়ো রাস্তায় বেশ তাড়াতাড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে, তারপর সেই কুঞ্জটা হয়ে যেখানে বৃষ্টিবিন্দু নিয়ে রোদে চকচক করছে গাছগুলো — দেখতে আশ্চর্য সুন্দর ছবির মতো, অসংযত অথচ বাধ্য। গাছগুলো যে ফাঁকা জায়গাটায় সেখানটা সবুজ হলেও তখনই আধ-মরা আর জলে ভরে গেছে। আপাদমস্তক ছোট ছোট স্বর্ণাভ পিঙ্গল পাতা ছড়ানো সেই বিশাল বার্চকে জংলির মতো ঘুরে চাষাভুষোরা কড়া-পড়া বিরাট হাতের তালুতে থুথু ফেলে যখন গাছটার সাদা-কালো গুঁড়িটায় একযোগে কুঠার চালাল তখন মনে কী ব্যথা পেয়েছিলাম লিকাকে বললাম।... 'সব কিছু কত ভিজে, কী ঝকঝকে উজ্জ্বল ছিল কল্পনা করতে পারবে

না!' শেষে মনের কথা জানিয়ে দিলাম — এ বিষয়ে একটা গল্প লেখার ইচ্ছে আছে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ও বলল:

'কিন্তু এ নিয়ে লেখবার আছে কী! খালি আবহাওয়ার বর্ণনা করে কী লাভ!'

সঙ্গীত ছিল আমার সবচেয়ে জটিল, ব্যথাময় আনন্দের অন্যতম। লিকা যখন সুন্দর কিছু বাজাত তখন ওকে আমি রীতিমত পুজো করতাম! ওর প্রতি আত্মত্যাগের উচ্ছ্বসিত একটা স্নেহে টনটনিয়ে উঠত বুক! মনে হত বেঁচে থাকি, সে বেঁচে থাকার শেষ যেন না হয়! বাজনা শুনতে শুনতে প্রায় ভাবতাম: 'আমাদের যদি কখনো ছাড়াছাড়ি হয়, তাহলে ওকে ছাড়া এ সঙ্গীত শুনব কী করে! ওর সঙ্গে এই প্রেম, এই আনন্দ ভাগাভাগি না করে কখনো কি ভালবাসতে পারব আর কিছু, আনন্দ পাব কোনো কিছুতে?' কিন্তু আমার মনের মতো নয় যেসব জিনিস তার সমালোচনা এত রূঢ়ভাবে করতাম যে চটে উঠে লিকা বাজনা থামিয়ে দিত — ঝট করে ফিরে তাকিয়ে পাশের ঘরে আভিলভাকে হেঁকে বলত:

'নাদিয়া, নাদিয়া! আবোলতাবোল কী বকছে, শোনো একবার!'

'আবোলতাবোল বকব বৈকি,' চেঁচিয়ে বলতাম। 'এসব সোনাটাগুলোর চারভাগের তিনভাগ হল খেলো, শুধু আওয়াজ, জগাখিচুড়ি, আর কিছু নয়! ওঃ, এটা হল কফিনে কবর-খুঁড়িয়েদের শাবলের ঘা! আহা, বনের ফাঁকা জায়গায় অপ্সরাদের নাচ চলেছে বুঝি, ওহো, এটা হল জলপ্রপাতের গর্জন! অপ্সরা বটে — আমার জানা সবচেয়ে

ঘিন্‌ঘিনে কথার একটা! খবরের কাগজের ধরতাই বুলি 'সম্ভাবনাময়'এর চেয়েও খারাপ!'

লিকা নিজেকে বোঝাতে চাইত থিয়েটারে ওর অনুরাগ অতি প্রবল; এদিকে থিয়েটারে আমার অরুচি, ক্রমশ আমার দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছিল যে বেশীর ভাগ অভিনেতাদের প্রতিভা আসলে কিছু নয়, শুধু কমবেশী অশ্লীল স্থূল হবার একটা ক্ষমতা মাত্র, অন্যদের চেয়ে ভালো করে — স্থূলতার নিম্নতম মানদণ্ডে -- ওরা ভান করতে পারে যে ওরা স্রষ্টা ও শিল্পী। মাথায় পেঁয়াজ-রঙা সিল্কের সাজ আর তুর্কি শাল গায়ে সেই সব অক্লান্ত ঘটকীর দল গোলামের মতো মুখ কেলিয়ে কোনো একটা কেষ্টবিষ্টুর তোয়াজ করে চলেছে মধুর বুলিতে, আর তিনি সেই নির্ঘাত জাঁকালো আগ্রহের ভঙ্গিতে বুক উঁচিয়ে আঙুল বেশ ফাঁক করে বাঁ হাতটা বুকে, মানে লম্বা-ঝুল ফ্রক-কোটের বুক পকেটে চেপে ধরছেন; সেই সব শুয়োরের মতো নগরপাল*) আর ছেবলা খ্‌লেস্তাকভ্‌রা*), নাক দিয়ে বিষণ্ণ গমকে সাঁইসাঁই করা ওসিপরা*), নচ্ছার ক্ষুদে রেপেতিলভরা*), ফুলবাবুর মতো ক্রুদ্ধ চাৎস্কিরা*), মোটা টক্‌টকে লাল কুলের মতো অভিনেতা-মার্কা ঠোঁট ফুলিয়ে আঙুল-উঁচানো ফামুসভ*); মশালচীদের মতো ক্লোক আর বাঁকা পালক গোঁজা টুপি মাথায় যতসব হ্যামলেট, কামুক, অলস, রঙ করা চোখ, কালো মখমলে ঢাকা উরু, পাগুলো শুদ্রস্দুলভ চেপটা — এ সমস্ত কিছু দেখলে সত্যি আমার গা শিউরে উঠত। আর অপেরা! পিঠ উঁচিয়ে, প্রকৃতির নিয়মের কোনো বালাই না মেনে,

লিকলিকে পা অসম্ভব ফাঁক করে অথচ হাঁটু গুঁজে দাঁড়িয়ে আছেন রিগোলেত্তো*)! আকাশের দিকে আবেগে ও বিষণ্ণতায় চোখ গোল করে তাকিয়ে সুসানিন*) গুরুগম্ভীর নাদে আওড়াচ্ছেন 'হে সূর্য আমার, তোমার উদয় হবে!', 'মৎস্যকন্যার'*) সেই মিলচালক গাছের ডালের মতো সরু হাত পাগলের মতো বাড়িয়ে দিয়ে রাগে থর থর করে কাঁপছে, বিয়ের আংটিটা অবশ্য তখনো আঙুলে পরা, পরনের শার্ট ও প্যান্ট এত জীর্ণ ও ছিন্নভিন্ন যে মনে হয় খেপা কুকুরের পাল ছিঁড়ে খুঁড়ে দিয়েছে! থিয়েটার নিয়ে আমাদের তর্কবিতর্কের সমাধান কখনো হত না: দেওয়া-নেওয়া আর পরস্পরকে বোঝার মনোভাব একেবারে উবে যেত। যেমন, মফস্বলের সেই বিখ্যাত অভিনেতাটি ওরিওলে এসে 'উন্মাদের দিনপঞ্জি'তে*), হাসপাতালের খাটে ড্রেসিং-গাউন গায়ে বসে আছেন তিনি। অসংযত রকমের না কামানো মেয়েলি মুখ। দীর্ঘ, যন্ত্রণাকর দীর্ঘ একটি মিনিট কেমন একটা নির্বোধ পুলকে ক্রমশ বাড়ন্ত অবাক বিস্ময়ে অসাড়। বসে থেকে অবশেষে ধীরে, অতি ধীরে একটা আঙুল তুলে, অবিশ্বাস্য মন্থরতায় ও অকথ্য ভাবপ্রবণ মুখে, কুৎসিতভাবে মুখ বেঁকিয়ে প্রতিটি শব্দ টেনে টেনে বললেন: 'আজ-কের এই দি-নে...' গভীর আগ্রহে তাই দেখে ও শুনে দর্শকেরা সবাই তাঁকে নিয়ে পাগল। পরের দিন লিউবিম তর্‌ৎসভের*) ভান করে আরো চমৎকার দেখালেন, আর তার পরের দিন বনে গেলেন মার্মেলাদভ*) — ঝুল লাগা মুখে, টকটকে লাল নাকে বললেন: 'প্রিয় মহাশয়, আপনার সহিত সশ্রদ্ধ বাক্যালাপের দুঃসাহস কি করিতে পারি?' — আর সেই পত্র লেখিকা

বিখ্যাত অভিনেত্রীটি, হঠাৎ সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা লেখার অভিলাষ হওয়াতে ডেস্কে বসে শুকনো কলম শুকনো দোয়াতে ডুবিয়ে এক নিমেষে খস খস করে পাতায় তিনটে লম্বা আঁচড় দিলেন, চিঠিটা খামে পুরে ঘণ্টা বাজানোতে ছোট সাদা অ্যাপ্রন পরা সুশ্রী পরিচারিকা এসে হাজির, তাকে সংক্ষেপে কঠোর সুরে বললেন: 'এখ্খুনি পাঠিয়ে দাও এটা!' — আর প্রত্যেকবার থিয়েটার থেকে ফিরে এসে রাত তিনটে পর্যন্ত চলত আমাদের চেঁচামেচি, ঘুম হত না আভিলভার; তখন আমি যে শুধু বাপান্ত করছি উন্মাদ, তর্সেভ ও মার্মেলাদভকেই নয়, গোগল, অস্ত্রভ্স্কি ও দস্তয়েভ্স্কিও বাদ যেতেন না...

'আচ্ছা ধরোই না, তুমি ঠিকই বলছ,' বিবর্ণ মুখে ও চেঁচিয়ে উঠত, চোখজোড়া কালো হয়ে গেছে বলে অসাধারণ সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে, 'এত ক্ষেপে যাবার কী আছে এতে? ওকে জিজ্ঞেস করো তো নাদিয়া!'

উত্তরে চেঁচিয়ে বলতাম, 'কারণ, কারণ এই যে, 'সুবাস' কথাটা 'সু-বা-স!' উচ্চারণ করছে শুনলে যে কোনো অভিনেতাকে গলা টিপে মেরে ফেলার ইচ্ছে আমি দাবাতে পারি না!'

ওরিওল সমাজের লোকেদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতের পর প্রতিবার ঠিক এমনি ঝগড়া লেগে যেত। তীব্রভাবে চাইতাম আমার দর্শনশক্তি, আমার সেয়ানা তীক্ষ্ন মনের সব প্রসাদের ভাগ নিক ও; ইচ্ছে হত আশেপাশের সবাই ও সব কিছু নিয়ে আমার ধারালো সমালোচনা সংক্রামিত হোক ওতে, কিন্তু হতাশায় দেখলাম যে আমার সব ধ্যানধারণা

ও অনুভূতির অংশীদার ওকে করার চেষ্টার ফল হত ঠিক উল্টো। একদিন বললাম:

'যদি শুধু জানতে আমার কত শত্রু!'

'কেমন শত্রু?' ও জিজ্ঞেস করল। 'কোথায়?'

'সব রকমের শত্রু, সর্বত্র: হোটেলে, দোকানে, বাজারে, রাস্তায়, স্টেশনে।...'

'কিন্তু কে তারা?'

'কে আবার, সবাই, সকলে! গুচ্ছির জঘন্য মুখ আর শরীর! জানো, এমনকি সেণ্ট পল পর্যন্ত বলেছিলেন: 'সব প্রাণীর দেহ সমান নয়: কিন্তু মানুষের দেহ এক ধরনের, পশুদের অন্য।...' কয়েক জনের দেহ তো একেবারে বীভৎস! যেভাবে তারা পা রাখে, যেভাবে দেহ এগিয়ে দেয় দেখলে মনে হয় এই সবেমাত্র চার পায়ে হাঁটা ছেড়েছে! এই ধরো, কাল বল্‌খোভ্‌স্কায়া স্ট্রীটে অনেকক্ষণ একটি বৃষস্কন্ধ তাগড়া পুলিসম্যানের পিছু পিছু গিয়েছিলাম। আমার চোখজোড়া যেন আটকে ছিল ওভারকোটে ঢাকা ওর বিরাট পিঠে, চকচকে, বেজায় ফেঁপে-ওঠা টপবুটের ওপরে পায়ের গোছে, সত্যি ফেঁপে-ওঠা টপবুটে, তাদের কড়া গন্ধে, শক্ত ছাই-রঙা ওভারকোটের কাপড়ে, বেল্টের বোতামে, ফৌজী সাজে সেই চল্লিশ বছরের বলিষ্ঠ জানোয়ারটার সব কিছুতে আমার কী দারুণ বিতৃষ্ণা!'

'তোমার কি কোনো লজ্জা নেই!' সবিদ্বেষ করুণায় সে বলল। 'তুমি সত্যি কি এত সাংঘাতিক নীচ লোক? একেবারে বুঝি না তোমাকে। অসম্ভব পরস্পরবিরোধী মালমশলায় তৈরী তুমি!'

৯

তবুও সকালে অফিসে পৌঁছিয়ে হ্যাঙ্গারে ওর ছাই-রঙা পশমের কোট দেখে ক্রমশ উষ্ণ আনন্দে ভারি ভালো লাগত, মনে হত ওটা ও নিজে, আর তা না হলেও ওর শরীরের মধুর একটি অংশ তো; কোটের নীচে দাঁড় করানো ছাই-রঙা প্রিয় গ্যালোসজোড়া, মধুর মনভোলানো একটি অংশ ওর। ওকে দেখার ব্যগ্রতায় সবায়ের আগে অফিসে পৌঁছতাম — কাজ হাতে নিয়ে মফস্বল থেকে পাঠানো রিপোর্টে চোখ বুলিয়ে সংশোধন করতাম, পড়তাম কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র, তাদের মধ্য থেকে বানাতাম 'আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতার টেলিগ্রাম' সব, স্থানীয় লেখকদের রম্য রচনার কোনো-কোনোটা প্রায় নতুন করে লিখতাম সবটা; এদিকে সর্বক্ষণ থাকতাম প্রতীক্ষায় — শেষে এই তো ওর দ্রুত পদক্ষেপ, ওর স্কার্টের খসখস শব্দ! ঠান্ডা সুগন্ধি হাত, রাত্রে ভালো ঘুমের পর বিশেষ করে দীপ্ত ওর চোখে যৌবনসুলভ একটি আভা — মনে হত নতুন মানুষ। ছুটে আমার কাছে এসে এদিক-ওদিক একবার তাকিয়ে ও চুমু খেত আমাকে। কখনো-সখনো হোটেলে আসত, গায়ে লেগে থাকত শীতের আর ঠান্ডা ফারকোটের গন্ধ। আপেলের মতো কনকনে ওর গালে চুমু খেয়ে কোটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে ওর দেহের ও পোশাকের উষ্ণতা ও মধুরতাকে স্পর্শ করতাম, আর ও হাসতে হাসতে — 'ছেড়ে দাও বলছি, আমি কাজে এসেছি!' — বলে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করত। ঘণ্টা বাজিয়ে বেয়ারাকে ডেকে বলত আমার ঘরটা ঠিক করে দিতে, সাহায্যও করত নিজে।...

অজান্তে একবার আভিলভার সঙ্গে ওর কথাবার্তা শুনে ফেলেছিলাম; ডাইনিং-রুমে সন্ধেবেলায় বসে আমাকে নিয়ে বেশ খোলাখুলি আলোচনা চলছিল, ভেবেছিল আমি ছাপাখানায়। আভিলভা বলল:

'কিন্তু, লিকা ভাই, ভবিষ্যতে কী হবে? ওর প্রতি আমার মনোভাব তুমি জানো, বেশ লোক ও, কোনো সন্দেহ নেই। কেন যে তোমার মোহ, খুব ভালো করে বুঝি।... কিন্তু তারপর?'

গভীর খাদে যেন পড়লাম। তাহলে আমি 'বেশ লোক', আর কিছু নয়! 'মোহ' ছাড়া আর কিছু নেই ওর!

ওর উত্তর যা শুনলাম আরো ভয়াবহ:

'কী করব বলো? কোনো তো উপায় দেখছি না।...'

এমন তীব্র একটা রাগ ভেতরে ফুঁসিয়ে উঠল যে আর একটু হলে ডাইনিং-রুমে ছুটে গিয়ে চেঁচিয়ে বলতাম উপায় একটা আছে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমি ওরিওল ছেড়ে চলে যাব। কিন্তু হঠাৎ ও আবার বলল:

'কিন্তু, নাদিয়া, তুমি কি বোঝো না কেন যে আমি ওকে খুব ভালোবাসি? তাছাড়া সত্যি বলতে তুমি ওকে চেনো না — যা দেখায় তার চেয়ে হাজার গুণ ও ভালো।...'

হ্যাঁ, আমি আসলে যা, তার চেয়েও অনেক খারাপ ঠেকতে পারত। চাপা অস্থিরতায় দিন কাটত আমার, প্রায়ই লোকের সঙ্গে ব্যবহার হত কর্কশ, উদ্ধত, একটুতে মন ভরে যেত বিষাদে ও হতাশায়; কিন্তু চট করে মেজাজ বদলে যেত যখন দেখতাম আমাদের শান্তি ও ঐকতানের ব্যাঘাত ঘটাতে, ওকে কেড়ে নিতে চেষ্টা করছে না কেউ: আর

সঙ্গে সঙ্গে দিলদারী, খোলাখুলি ও সুখী হবার সহজাত প্রবৃত্তিটা আসত ফিরে। পার্টিতে হয়ত যাচ্ছি, নিশ্চিত জানি ওখানে গেলে আমার কোনো ক্ষতি বা গ্লানি হবে না, তখন কী খুশিতে যাবার মহড়া, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ধোপদুরস্ত হবার ঘটা, কী তারিফ করা নিজের চোখের, গালের যৌবনসুলভ রক্তাভ ছোপের, ধবধবে সাদা শার্টের — সদ্য কাচা ভাঁজে ভাঁজে আটকে থাকা মাড়-দেওয়া শার্টটা খোলার সময় কী সুন্দর ফরফরানি! ঈর্ষার জ্বালায় না দগ্ধালে ভয়ানক ভালো লাগত বল-নাচ। বল-নাচের জন্য তৈরী হবার সময় প্রত্যেকবার নিদারুণ কয়েকটি মুহূর্তের ভোগানি সইতে হত — আভিলভার বিগত স্বামীর ড্রেস-কোটটা বাধ্য হয়ে চাপাতে হত। সত্যি বটে কোটটা একেবারে নতুন, আমার বিশ্বাস একবারও পরা হয় নি, তবু সেটা মরমে মরমে আমাকে বিঁধত। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে যখনি বুক ভরে নিতাম ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া, দেখতাম তারার ছিটে লাগা আকাশ, স্লেজে বসতাম, তখনি জুড়িয়ে যেত সব জ্বালা।... বল-নাচের সময় উজ্জ্বল আলোকিত প্রবেশদ্বারের ওপর কেন লাল ডোরাকাটা চাঁদোয়া টাঙ্গানো হত, কেনই বা গাড়ি ও স্লেজ নিয়ন্ত্রিত করা পুলিসরা দেখাত নিষ্ঠুর রোয়াব, ভগবান শুধু জানেন! যাই হোক — বল-নাচ বলে কথা! অদ্ভুত চেহারার প্রবেশদ্বারের সামনে পদদলিত চিনির মতো বরফে বিকিরিত ঝকঝকে উজ্জ্বল আলো, তাড়াহুড়ো কর্মপটুতার একটা ভাব, পুলিসের কড়া হুকুম, তাদের ছুঁচলো গোঁফ ঠাণ্ডায় জমাট, বরফে পালিশ করা টপবুটের ঠকঠক, বোনা সাদা দস্তানায় মোড়া হাত পকেটে ঢুকানো, কনুইগুলো

অদ্ভুতভাবে বেঁকানো। পুরুষেরা প্রায় সবাই উর্দি পরিহিত — রাশিয়ায় এককালে উর্দি'র ছড়াছড়ি ছিল — আর নিজের পদ ও উর্দি নিয়ে সবায়ের বেশ জাঁক ও উত্তেজনা। আমি তখনই লক্ষ্য করেছিলাম যে এমনকি সারা জীবন উচ্চতম পদবী ও উচ্চতম পদের অধিকারী হলেও লোকে আজীবন সেটা সহজভাবে নিতে পারে না। অতিথিরা আসার সঙ্গে সঙ্গে আমারও চাঞ্চল্য হত শুরু, নিমেষের মধ্যেই তারা হত আমার চকিত তীক্ষ্ণ, বিরোধী খর দৃষ্টির লক্ষ্যবস্তু। কিন্তু মেয়েদের প্রায় সকলেই মধুর ও বাঞ্ছনীয়। ফারের টুপি ও হুড-দেওয়া ক্লোক হল-ঘরে খুলে ফেলার পর কী লাবণ্যময়ী তারা! ওদেরই জন্য তো চওড়া, লাল কার্পেট মোড়া সিঁড়ি, আয়নায় ঝাঁকে ঝাঁকে ওদেরই মোহিনী ছায়া পড়বে না তো আর কার পড়বে! তারপর — নাচের আগে বল-ঘরের সেই জমকালো শূন্যতা, তাজা কনকনে ভাব, হীরকচ্ছটা-বিচ্ছুরিত গুরুভার বাতি-ঝাড়ে আলোর পুঞ্জ, প্রকাণ্ড পর্দাবিহীন জানলা, তখনো ফাঁকা পার্কেট-করা মেঝের ঝকঝকে প্রসার, তাজা ফুল, পাউডার, সেণ্ট, নরম সাদা দস্তানার গন্ধ — ক্রমশ ভিড় করে আসা অতিথিদের দেখার উত্তেজনা, অর্কেস্ট্রার প্রথম গুরুগুরু ধ্বনির প্রতীক্ষা, কখন এই অনাহত মেঝেতে ছুটে যাবে নাচের প্রথম জুড়ি — যে-দু'জনের আত্মবিশ্বাস সব থেকে প্রবল, যারা সর্বদা চটপটে।

সর্বদা আমি বল-নাচে রওনা হতাম তাদের আগেই। পৌঁছিয়ে দেখতাম অতিথিদের গাড়ি তখন এসে থামছে, একতলায় আর্দালিরা বরফগন্ধি টপ-কোট ফারকোট ও ফৌজী কোটের গাদা নিয়ে অস্থির, আর সর্বত্র যা ঠাণ্ডা,

আমার পাতলা ড্রেস-কোটের পক্ষে বেজায় কনকনে। অন্য লোকের কোট আমার পরনে, চুল ফিটফাট আঁচড়ানো, পাতলা চেহারা আরো পাতলা দেখাচ্ছে, আমার দেহ ভারহীন, এখানে সবায়ের অপরিচিত, নিঃসঙ্গ আমি — কী একটা খবরের কাগজে অদ্ভুত কী একটা কাজ করে বিচিত্র দাম্ভিক এই যুবকটি — গোড়ার দিকে এত স্থির, এত আত্মসচেতন লাগত, এত দলছাড়া যে মনে হত আমি যেন একটি তুষার-দর্পণ। ক্রমশ বাড়ত ভিড় আর হৈ-চৈ; সঙ্গীতের গর্জন আগের চেয়ে চেনা মনে হত, বল-রুমের দরজাগুলো তখনই লোকে ঠেসাঠেসি; ক্রমশ বাড়তির দিকে মেয়ের সংখ্যা, হাওয়া আরো ভারি, আরো উষ্ণ, কেমন যেন নেশা ধরে যেত, ভিড়ের মাঝে ভেসে যেতে যেতে আরো সাহসে তাকাতাম মেয়েদের দিকে, আরো ধৃষ্টতায় পুরুষদের দিকে, কোনো ড্রেস-কোট বা উর্দির সঙ্গে ধাক্কা লাগলে আমার 'মাফ করুন'টা শোনাত ক্রমশ বেশী করে ভদ্র ও উদ্ধত।... তারপর হঠাৎ দেখতাম ওদের — ওই তো ভিড়ের মধ্যে মৃদু হেসে ধীরে পথ করে ওরা চলেছে — আর হঠাৎ বুকটা ঘনিষ্ঠতা ও সঙ্গে সঙ্গে বিব্রত বিস্ময়ের একটা বোধে মুচড়ে থমকে দাঁড়াত: চেনা দু'জনকে যেন চেনাও যায় না। বিশেষ করে ওর চেহারা — একেবারে আলাদা। এরকম সময় ওর যৌবন ও তন্বীভাব সর্বদা গভীর রেখা কাটত আমার মনে: কর্সেটে ক্ষীণ কটিতট আঁটো করে বাঁধা, সুন্দর গাউনে কী হালকা, শুচি খুশির ভাব! দস্তানার ওপর থেকে কাঁধ পর্যন্ত নগ্ন বাহু ছেলেমানুষের হাতের মতো কনকনে আর লালচে; তখনো অনিশ্চিত মুখভাব।... চূড়া করে বাঁধা ওর চুল শুধু

গণ্যমান্য মহিলার মতো।... সব কিছুতে একটা বিচিত্র মনকাড়ানো ভাব, কিন্তু তারই সঙ্গে মনে হয় একটা কিছু আছে যেটা আমাকে এড়িয়ে যেতে, ঠকাতে চায়, এমনকি কলঙ্কের গোপন কামনার ছাপও তাতে আছে। কিছুক্ষণ পরে কে যেন তাড়াতাড়ি ওর কাছে গিয়ে বল-রুমসুলভ ক্ষিপ্রভাবে একটু নীচু হয়ে অভিবাদন জানাল, আর ও হাতপাখাটা আভিলভাকে দিয়ে যেন অন্যমনস্কভাবে এবং লাবণ্যভাবে ভদ্রলোকটির কাঁধে হাত রেখে পায়ের আঙুলে ঘুরপাক খেয়ে ভেসে অদৃশ্য হয়ে গেল ওয়াল্জ্ নাচিয়েদের ভিড়ে, গোলমাল আর বাজনার মধ্যে। আর আমি তাকিয়ে দেখতাম বিদায়সুলভ একটা মনোভাবে, ইতিমধ্যে যেটা পরিণত হয়েছে কঠোর বিদ্বেষে।

বল-নাচে ছোটখাটো, প্রাণোচ্ছল, সর্বদা হাসিখুশি ও ধীর আভিলভার তারুণ্য আর উজ্জ্বল লাবণ্যও আমার মনে দাগ কাটত। একটা নাচের আসরে সেবার প্রথম টের পেলাম ওর বয়স মাত্র ছাব্বিশ, আর নিজের মনের কথা মেনে নিতে ভয় পেয়ে সেই প্রথম হঠাৎ বুঝলাম সেই শীতকালে আমার প্রতি ওর মনোভাবে অদ্ভুত পরিবর্তনের কারণটা কী — হয়ত ও আমাকে ভালোবাসে, ঈর্ষা করে আমাকে।

১০

তারপর এল দীর্ঘ বিরহের পালা।

তার সূত্রপাত হল ডাক্তার মশাইয়ের হঠাৎ আবির্ভাবে। ঠাণ্ডা, রোদে-ভরা একটি সকালে অফিসে গিয়ে আচমকা নাকে এল অতি পরিচিত কী একটা সিগারেটের

কড়া গন্ধ, শুনলাম ডাইনিং-রুমে উত্তেজিত কথাবার্তা আর হাসির শব্দ। থমকে দাঁড়ালাম — কী ব্যাপার? সারা বাড়ি ধোঁয়ায় ভরে দিয়েছেন যিনি তিনি তাহলে ডাক্তার মশাই। কানে এল তাঁরই গলা, জোরে কথা বলছেন যেরকম উত্তেজিতভাবে সেটা বিশেষত্ব এক ধরনের মানুষের, যাঁরা একটা বয়সে পা দিয়ে বছরের পর বছর কাটান একেবারে না বদলে নিটোল স্বাস্থ্যে, হরদম সিগারেট টেনে, ক্রমাগত বক বক করে। হতভম্ব লাগল — এই অপ্রত্যাশিত আগমনের উদ্দেশ্য কী? লিকার কাছে কিছু কি চান উনি? আর কী করে ঘরে আমি ঢুকি, আমার হাবভাব কেমন হওয়া উচিত? অবশ্য দারুণ কিছু ঘটল না প্রথমে। চটপট নিজেকে সামলে ডাইনিং-রুমে ঢুকলাম, ঢুকে খুশিতে অবাক হলাম।... সহৃদয় ডাক্তার মশায় সত্যি একটু বিব্রত বোধ করলেন, দোষ করে ফেলেছেন এমন একটা ভাবে হেসে তাড়াতাড়ি আমাকে জানালেন যে 'মফস্বল থেকে হাওয়া বদলের জন্য হপ্তা খানেকের' জন্য এসেছেন। তক্ষুনি চোখে পড়ল লিকাও উত্তেজিত, আর কী কারণে জানি না আভিজাতও। তখনো আশা করা যেত এর কারণ হল শুধু ডাক্তার মশাইয়ের অপ্রত্যাশিত আগমন, যিনি তাঁর বন গাঁ থেকে এই মফস্বল শহরে এসে ট্রেনে সারা রাত কাটানোর পর অত্যন্ত সজাগ হয়ে রসিয়ে রসিয়ে গরম চা পান করছেন অন্য লোকের ডাইনিং-রুমে। আমি সবে টাল সামলে উঠছি, এমন সময় বজ্রাঘাত: ডাক্তারের সব কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎ ধরা পড়ল আমার কাছে যে, তিনি একলা আসেন নি, সঙ্গে রয়েছে বগমলভ। আমাদের শহরের এই নবীন, ধনী ও এমনকি নামকরা

চর্মব্যবসায়ীটি অনেক দিন ধরে লিকার পাণিপ্রার্থী। তারপর কানে এল ডাক্তার সহাস্যে বলছেন:

'লিকা, ও বলে তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, মাথার ঠিক নেই, মন একেবারে ঠিক করে ফেলে এখানে এসেছে! দুর্ভাগা যুবকটির ভবিষ্যৎ তাই সম্পূর্ণভাবে তোমার হাতে: ইচ্ছে হলে করুণা করতে পারো ওকে, আর তা না হলে — ওর জীবনটা একেবারে ছারখার করে দিতে পারো।...'

আর শুধু ধন আছে বলে বগমলভ যোগ্য পাত্র নয়: লোকটা চালাকচতুর, স্বভাবটা প্রাণবান আর প্রীতিকর, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করেছে, বিদেশ ঘুরে এসেছে, দুটো বিদেশী ভাষা জানে। প্রথম দর্শনে বড়ো বীভৎস ঠেকে লোকটাকে: গাজরের মতো লাল চুল পরিপাটিভাবে মাঝখানে টেরি কাটা, মুখটা পেলব ও গোল, আর বপুটি বিকট, অমানুষিকভাবে মাংসল, অদ্ভুত পেল্লায় খেয়ে বেড়ে ওঠা অস্বাভাবিক আয়তনের শিশুর মতো, কিংবা যেন বিরাট বাচ্চা ইয়র্কশায়ারী শুয়োর — সর্বাঙ্গে ফুটে বেরোচ্ছে চর্বি আর রক্ত। শুয়োরটার সব কিছু এত চমৎকার, এত পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল যে কাছে থাকলে আনন্দ উপছে ওঠে মনে: নীল চোখদুটো আকাশের মতো স্বচ্ছ, মুখের রঙ অবিশ্বাস্য পরিষ্কার। আর ওর হাবেভাবে, হাসিতে, গলার স্বরে, চোখে ও ঠোঁটের খেলায় লাজুক ও মন-কাড়ানো গোছের কিছু একটা; হাত পা এত ছোট যে মনে নাড়া দেয়, বিলাতি কাপড়ের পোশাক, মোজা, শার্ট ও টাই সব সিল্কের। চট করে লিকার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম ওর মুখে বিব্রত মৃদুহাসি।...

সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে আগন্তুক মনে হল, হঠাৎ মনে হল এই বাড়িতে আমি অযাচিত, রবাহূত। ওর প্রতি একটা বিদ্বেষ ফুঁসিয়ে উঠল।...

তারপর কখনো ঘণ্টাখানেকও ওর সঙ্গে একা থাকতে পারি নি, সবসময় ও হয় বাবা নয় বগমলভের সঙ্গে। আভিলভার হেঁয়ালি ফুর্তির হাসি আর থামতে চায় না। বগমলভের সঙ্গে সে এত সাদর মিষ্টি ব্যবহার করতে লাগল যে প্রথম দিন থেকেই নিজের বাড়িতেই আছে এমন একটা ভাব হল লোকটার। সকালে দেখা দিয়ে রাত পর্যন্ত থাকত, ঘুমোবার জন্য শুধু যেত হোটেলে। তাছাড়া যে সৌখীন নাট্যকে দলের সভ্যা লিকা — সেটা পিঠে পরবের* সপ্তাহে একটা নাটক করার মহড়া দিতে শুরু করল, লিকার নির্বন্ধে তার বাবা ও বগমলভ দু'জনেই ছোটখাটো ভূমিকায় নামতে রাজী হলেন। আমাকে লিকা বলত শুধু বাবার খাতিরে বগমলভকে প্রেম নিবেদন করতে দিচ্ছে সে, বন্ধুর প্রতি অভদ্র ব্যবহারে তিনি যাতে ক্ষুণ্ণ বোধ না করেন সে জন্য। আর ওকে বিশ্বাস করার ভান দেখিয়ে নিজেকে আমি রাখলাম কড়া শাসনে, এমনকি জোর করে যেতাম ওদের মহড়ায়, সেখানে ঈর্ষার জ্বালা ও অন্য সব ভোগান্তি চেষ্টা করতাম গোপন রাখতে: সত্যি ওর 'অভিনয়ের' করুণ চেষ্টা দেখে মরমে মরে যেতাম। সব মিলিয়ে প্রতিভার এই একান্ত অভাব ভয়াবহ দৃশ্য বটে! নাটকের পরিচালক একটি বেকার পেশাদারী অভিনেতা; স্বভাবতই

* পিঠে পরব — সপ্তাহব্যাপী উৎসব। মূলত পৌত্তলিক উৎসব। গ্রীক অর্থডক্স চার্চ এই উৎসবকে গ্রহণ করে।

সে কল্পনা করত তার মধ্যে প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ বর্তমান। নিজের জঘন্য থিয়েটারী অভিজ্ঞতায় কী তার উচ্ছ্বাস! লোকটার বয়স বলা মুশকিল, গদ-রঙা মুখের রেখাগুলো এত গভীর যে ইচ্ছে করে দাগ কেটে বসানো হয়েছে মনে করা যেত। এ ভূমিকায় অভিনয় এরকম, ও ভূমিকায় সেরকম হওয়া দরকার, গলাবাজি করে উপদেশ দেবার সময় চটে উঠত বার বার, এত অভদ্র তীব্রভাবে তিরস্কার করত যে রগের দাড়া দাড়া শিরাগুলো ফুলে উঠত; ওদের দেখানোর জন্য কখনো পুরুষ, কখনো মেয়ে সাজত। এদিকে ওকে অনুকরণের চেষ্টায় সবায়ের প্রাণান্ত হবার জোগাড়, ওদের গলার প্রতিটি সুরে, ওদের প্রতিটি দেহভঙ্গি দেখে সে কী যন্ত্রণা আমার! অভিনেতাটা অকথ্য একেবারে, কিন্তু আরো বেশী অকথ্য হল তার সাকরেদরা। অভিনয় করার প্রয়োজনটা কী ওদের? কিসের জন্য অভিনয়? দলের মধ্যে ছিল 'বাহিনীর একটি মহিলা' — যেকোনো মফস্বল শহরে এধরনের চরিত্র দেখা যায় — কাঠ-কাঠ চেহারার সাহসিকা একজন, আত্মপ্রত্যয়ে ভরা; ছিল একটি ভয়াবহ সাজের আইবুড়ী — সর্বদা তার অস্বস্তি, সর্বদা কিসের প্রতীক্ষায় যেন. ঠোঁট কামড়ানো বাতিক; ছিল দুই বোন — সবসময় একসঙ্গে থাকার ও চেহারার অদ্ভুত মিলের জন্য তাদের সবাই চেনে শহরে: দু'জনেই লম্বা, মোটা কালো চুল, কালো ভুরু জোড় খেয়েছে নাকের ওপরে, দু'জনেই মুখ খোলে কদাচিৎ — খাঁটি একজোড়া কালো জুড়ি ঘোড়া; প্রদেশপালের একান্ত সচিবও ছিল দলে — টাক পড়তে শুরু করলেও বেশ কমবয়সী, সোনালি চুল লোকটির নীল চোখ ঠেলে বেরিয়ে

আসা, চোখের পাতা লাল, দীর্ঘ দেহ, মাড়-দেওয়া অতিশয় উঁচু কলার, বিরক্তিকরভাবে ভদ্র ও মার্জিত তার ব্যবহার; ছিল বিখ্যাত সেই স্থানীয় উকিলটি — বুকে ও ঘাড়ে চর্বির পাহাড় যেন, পাদুটো থপথপে, বল-নাচে তাকে দেখে সবসময় ভুল করে ভাবতাম লোকটি হল ড্রেস-কোট পরিহিত বাটলার; ছিল একটি ছোকরা শিল্পী: গায়ে কালো মখমলের ওয়েস্ট-কোট, চুল ভারতীয়দের মতো লম্বা, পাশ থেকে ছাগলের মতো দেখতে মুখের রেখা সরু হয়ে নেমেছে ছাগল দাড়িতে, আধবোজা চোখে মেয়েলি একটা ভ্রষ্টাভাব এবং নরম টুকটুকে ঠোঁট যা দেখলে অস্বস্তি হত, পাছাটি স্ত্রীলোকের মতো।...

অভিনয়ের রাত্রি এসে পড়ল। যবনিকা ওঠার আগে সাজঘরে ঘুরে এলাম: উন্মাদাগার একেবারে। সাজগোজ, মেক-আপ চলেছে, চলেছে চেঁচামেচি, ঝগড়া, ড্রেসিং-রুম থেকে ছুটে বেরিয়ে যাওয়া, এ-ওর গায়ে ধাক্কা, তাহলেও কেউ কাউকে চিনতে পারছে না — এত বিদ্‌ঘুটে তাদের সাজপোশাক। একজন তো সত্যি সত্যি চাপিয়েছে বাদামি ড্রেস-কোট ও বেগুনি পেণ্টুলেন। এত প্রাণহীন তাদের পরচুলা, দাড়ি, রঙ-মাখা অনড় মুখ, কপালে ও নাকে লাল পলস্তারের ছোপ, রঙ-করা জ্বলজ্বলে চোখের ভুরু এত বেশী ও এত বেয়াড়াভাবে কালো করা যে চোখগুলো পিটপিট করছে ম্যানিকিনের মতো। লিকাকে হঠাৎ দেখে চিনতে পারি নি, এত অবাক হয়ে গেলাম — গোলাপী পেলব সেকেলে ধরনের ফ্রকে, পুরু হলদেটে পরচুলায়, চকোলেট বাক্সের মতো সস্তা সুন্দর ও ছেলেমানুষি মুখে তাকে পুতুলের মতো দেখাচ্ছিল এত বেশী।... হলদে

চুল একটা ঝাড়ুদারের ভূমিকায় নামার কথা বগমলভের, তাই 'টাইপ চরিত্রের' যোগ্য পোশাকে তাকে সাজাবার চেষ্টায় কোনো ত্রুটি হয় নি। আবার ডাক্তার মশাই নামবেন বুড়ো জ্যেঠা মশাই, অবসরপ্রাপ্ত একটি জেনারেলের ভূমিকায়: নাটক শুরু হল, প্রথম দৃশ্যে তিনি, গাঁয়ের বাড়িতে বেতের আরাম কেদারায় বসে আছেন খালি মেঝেতে পেরেক মেরে বসানো তক্তায় তৈরী সবুজ গাছের তলায়, মোটা সিল্কের স্যুট পরনে, তাঁরও গোটা মুখে টকটকে লাল রঙ মাখানো, দুধবরণ পেল্লায় গোঁফ, কেদারায় হেলান দিয়ে বিরক্তিতে চেয়ে আছেন সামনে বেশ খুলে-ধরা খবরের কাগজের দিকে; আর যদিও দৃশ্যটি হল গ্রীষ্মের একটি খাসা সকাল, তবু তলা থেকে পাদদীপের আলোয় এত বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন যে গোঁফ আর চুল পাকা হওয়া সত্ত্বেও মনে হচ্ছে বয়স অসম্ভব কম। খবরের কাগজে চট করে চোখ বুলিয়ে বিরক্তিতে গজর-গজর করে কী একটা বলার কথা, কিন্তু তিনি খবরের কাগজের দিকে চেয়ে আছেন তো আছেনই, প্রম্পটারের মরিয়া ফিসফিসানি শোনা গেলেও মুখ দিয়ে একটা কথা বেরুল না। অবশেষে যখন লিকা পর্দার আড়াল থেকে ছুটে এসে (ছেলেমানুষের মতো চঞ্চল, মধুর উচ্চ হাসিতে), পেছন থেকে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, চোখে হাত চেপে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল: 'বলো তো কে?' — শুধু তখনি তাঁর কথা ফুটল, ছেড়ে ছেড়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'ছাড় বলছি, ছাড় দুষ্টু মেয়ে, কে যে বিচক্ষণ জানা আছে আমার!'

প্রেক্ষাগৃহে আধো-আলো, আধো-অন্ধকার, স্টেজে উজ্জ্বল

রোদের জোয়ার। সামনের সারিতে বসে একবার স্টেজটা দেখে নিয়ে আশপাশের লোকেদের দিকে তাকালাম; সে সারিতে সবচেয়ে ধনী, মেদে থলথল নাগরিকেরা আর উচ্চতম পদস্থ দারুণ জমকালো পুলিস ও ফৌজী বড়ো কর্তারা বসেছে, সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে আছে স্টেজের দিকে। তাদের দেহভঙ্গিতে চাপা উত্তেজনা, মুখের হাসি যেন জমে গেছে।... প্রথম অঙ্কের শেষ পর্যন্ত টেঁকা দায় হয়ে উঠল আমার কাছে। যে মুহূর্তে স্টেজে দুম করে একটা শব্দ হল — পর্দা পড়ো পড়ো তার লক্ষণ — তাড়াতাড়ি হল ছেড়ে চলে গেলাম। তখন অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মেজাজ রঙীন, তাদের অসংযত ফুর্তিজনক নানা উক্তি বিশেষ করে অস্বাভাবিক ঠেকল আটপৌরে আলোকিত বারান্দায়, যেখানে বুড়ো পরিচাবক, সব কিছু যার গা সওয়া, আমাকে সাহায্য করল কোট পরতে। রাস্তায় ছুটে বেরিয়ে এলাম অবশেষে। সর্বনেশে নিঃসঙ্গতার একটি বিচিত্র অনুভূতি ক্রমশ বেড়ে গভীর উচ্ছ্বাসে পরিণত হল আমার মনে। রাস্তাঘাট জনশূন্য, পরিষ্কার, নিশ্চল আলো ছড়াচ্ছে রাস্তার বাতি। বাড়ি না গিয়ে গেলাম অফিসে, হোটেলের ছোট ঘরটা বড্ডো ভীতিকর। অফিস এলাকাটা পেরিয়ে ফাঁকা চকে ঢুকলাম, সেখানে গির্জার অল্প ঝকঝকে সোনালি গম্বুজ নক্ষত্রখচিত আকাশে অদৃশ্য।... বরফে আমার বুটের মচমচানিতে অত্যন্ত গভীর ও ভয়াবহ কী একটা যেন।.. বাড়িটা গরম, চুপচাপ, শান্তিতে ভরা, আলোকিত ডাইনিং-রুমে ঘড়ির মৃদু টিকটিক আওয়াজ হচ্ছে। আভিলভার ছেলে ঘুমোচ্ছে, তার আয়া সদর দরজা খুলে ঘুমেভরা চোখে আমার দিকে চেয়ে পা

টেনে টেনে চলে গেল। সিঁড়ির পাশের সেই ঘরটায় গেলাম যে ঘরটা আমার অতি পরিচিত, অতি অর্থঘন। অন্ধকারে পুরনো সোফায় বসলাম, সেটা এখন মনে হল কেমন যেন করাল।... মনে মনে চাই অথচ ভয় করি সেই মুহূর্তটি যখন গাড়ি চেপে ওরা সবাই এসে পড়বে বাড়িতে, একসঙ্গে কথা বলতে বলতে, হাসতে হাসতে হৈচৈ করবে, চা খেতে বসবে, চলবে মতের বিনিময় — কিন্তু সবচেয়ে বেশী আমার আতঙ্ক সেই মুহূর্তটিতে যখন আমার কানে আসবে ওর হাসি, ওর কণ্ঠস্বর।... সারা ঘরে ওর ছাপ, সারা ঘরে ওর অনুপস্থিতি, ওর উপস্থিতি, ওর সব কিছুর গন্ধ — ওর নিজের, ওর গাউন, ওর সেণ্ট, সোফার হাতায় আমার পাশে পড়ে থাকা ওর ড্রেসিং-গাউনের গন্ধ।... জানলা দিয়ে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হিম, নীল রাত, গাছের কালো ডালপালার পেছনে তারার ঝকঝকে দীপ্তি।...

লেণ্টের*) প্রথম সপ্তাহে ও চলে গেল ওর বাবা ও বগমলভের সঙ্গে (বগমলভকে প্রত্যাখ্যান করার পর)। কিন্তু চলে যাবার বেশ কিছু দিন আগেই কথা বন্ধ করে দিয়েছিলাম ওর সঙ্গে। জিনিসপত্র গোছগাছের সময় সারাক্ষণ ও কাঁদল, মনে মনে আশা ছিল হঠাৎ হয়ত ওকে বাধা দিয়ে যেতে দেব না।

১১

লেণ্ট চলেছে; মফস্বল শহরে উপবাসপর্ব জোর পালন করা হয়। গাড়োয়ানেরা রাস্তার কোণে বেকার দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে বুক বরাবর হাত সজোরে দোলায় গরম

হবার চেষ্টায়, কোনো অফিসার হে'টে গেলে ভয়ে ভয়ে কেবল ক্ষীণকণ্ঠে ডাকে: 'হুজুর, পক্ষিরাজে চাপবেন না কি?' আসন্ন বসন্তের আভাস পেয়ে অস্থির আনন্দে ডাকে কাক, কিন্তু দাঁড়কাকদের ডাক তখনো কর্কশ কঠোর।

বিশেষ করে রাত্রিবেলায় আমার বিরহ ভয়ঙ্কর মনে হত। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যেত, অভিভূত হয়ে ভাবতাম: কী করে বাঁচি এখন, বে'চে থেকে লাভ কী? অর্থহীন রাত্রির অন্ধকারে, হাজারো অচেনা মানুষের ভিড়ে ঠাসা এই বিচিত্র মফস্বল শহরে, সারা রাত্রি সরু যে জানলাটাকে ভেবেছিলাম দীর্ঘ, ধূসর, নির্বাক শয়তান সেই জানলা দেওয়া হোটেলের ঘরে কী জানি কেন যে লোকটি শুয়ে আছে — সে কি আমি? শহরে আমার একমাত্র বন্ধু হল আভিলভা। কিন্তু সত্যি কি ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু? আমাদের এই ঘনিষ্ঠতা দ্ব্যর্থব্যঞ্জক, খাপছাড়া।...

সকাল সকাল আর অফিসে হাজির হই না। আমাকে আসতে দেখলে মৃদু হেসে অভ্যর্থনা জানায় আভিলভা। আমার সঙ্গে ওর ব্যবহার আবার কমনীয় মধুর, আমাকে নিয়ে আর ঠাট্টাতামাসা করে না; ওর মধ্যে এখন যা দেখি তা হল আমার প্রতি স্থির প্রেম, সাগ্রহ সহানুভূতি ও আদরযত্ন। প্রায়ই সন্ধেবেলাগুলো কাটে একলা ওর সঙ্গে। ও পিয়ানো বাজায়, আমি সোফায় আধো-শুয়ে সঙ্গীতের স্বর্গসুখে, সঙ্গীতে তীব্রতর হৃদয়ের ব্যথায় ও সকলকে ক্ষমা করার মতো একটা গভীর স্নেহের উপলব্ধিতে উদ্‌গত অশ্রুজল চোখ বুজে সামলাতাম। অফিসের সাধারণ ঘরে ঢুকে সর্বদা ওর ছোট্ট হাতে চুমু খেয়ে যেতাম সম্পাদকীয় দপ্তরে। সেখানে থাকতেন সিগারেট মুখে শুধু একটি

লোক, যিনি সম্পাদকীয় লেখেন। লোকটা বোকা, চিন্তাকুল, পুলিসের নজরবন্দীতে ওরিওলে নির্বাসিত তিনি। চেহারাটা কেমন যেন অদ্ভুত: চাষীদের মতো দাড়ি রেখেছেন, পরনে খয়েরী রঙের ঘরে বোনা কুঁচি দেওয়া লম্বা কোট, পায়ে আলকাতরা দেওয়া টপবুট, তীব্র অথচ প্রীতিকর একটা গন্ধ। বাঁ-হাত-সর্বস্ব লোকটা, ডান হাতের অর্ধেকটা কী কারণে যেন নেই, হাতায় ঢাকা নুলো হাতে ডেস্কে কাগজ চেপে ধরে লিখতেন বাঁ হাতে: বসে বসে সিগারেটে জোর টান দিয়ে অনেকক্ষণ ভাবতেন, তারপর হঠাৎ নুলো হাত দৃঢ়তরভাবে কাগজে চেপে শুরু হত তার দ্রুত ও পূর্ণোদ্যমে লেখা, বাঁদরের মতো ক্ষিপ্র পটুতায়। তারপর সাধারণত হাজির হতেন বিদেশী সংবাদের সমীক্ষক; খাটো পা ছোট গোছের বৃদ্ধ, বিস্মিত চোখে চশমা। খরগোশের লোমের আস্তর দেওয়া ছোট জ্যাকেট ও কানঢাকা নামানো ফিনল্যান্ডীয় টুপি হল-ঘরে খুলে রাখতেন; ছোট টপবুটে, পেণ্টুলেন ও সরু চামড়ার বেল্টে আটকানো ফ্লানেলের শার্টে তাঁকে তখন ঠিক দেখাত দশ বছরের বেঁটে খাটো ছোঁড়ার মতো; ঘন কাঁচা-পাকা চুল হিংস্রের মতো খাড়া খাড়া, বিভিন্ন দিকে খোঁচা খোঁচা, তাতে তাঁকে দেখতে সজারুর মতো, বিস্মিত চশমাটাও হিংস্র। তিনি সর্বদা সঙ্গে করে দুটো বাক্স আনতেন অফিসে — একটাতে সিগারেটের কাগজ, অন্যটাতে তামাক। কাজ করার সময় ক্রমাগত সিগারেট বানাতেন, রাজধানীর খবরের কাগজে ঝানু চোখ বোলাতে বোলাতে হালকা হলদে রঙের আঁশ-আঁশ তামাক তামার পাতলা একটা নলে গুঁজে অন্যমনস্কভাবে কাগজ হাতড়ে, নলটার বাঁট নরম শার্টের বুকে আর নলটা কাগজে

টিপে সুকৌশলে টেবিলের ওপর ছুঁড়তেন সিগারেটটা। তারপর আসত কাগজের মেক-আপ করে যে সে, আর প্রুফ-রিডার। মেক-আপের লোকটি ঢুকত একটা ধীরস্থির স্বাধীনভাবে — আশ্চর্য ভদ্র, স্বল্পভাষী ও দুর্জ্ঞেয়। আদমিটি অসম্ভব রোগা ও শুকনো, জিপসিসুলভ কালো চুল, সবজে জলপাই রঙের মুখ, ছোট কালো গোঁফ, ছাই-রঙা মরা ঠোঁট ; কালো পেণ্টুলেন ও খড়খড়ে বড়ো ওলটানো কলার দেওয়া নীল স্মকে সর্বদা ফিটফাট ও নিখুঁত — সব কিছু ঝকঝকে তকতকে। মাঝে মাঝে তার সঙ্গে ছাপাখানায় কথা বলতাম ; তখন মৌনব্রত ভেঙে, কালো চোখে আমার দিকে অচঞ্চল কঠোরভাবে তাকিয়ে, গলার সুর না তুলে বাতচিত শুরু করত, যেন দম দেওয়া পুতুল, বক্তব্যের বদল হত না কখনো ; দুনিয়ার সর্বত্র, সর্বদা সব কিছুতে অন্যায়ের রাজত্ব। প্রুফ-রিডারের ঘর ছেড়ে যাওয়া-আসার বিরাম নেই — যে প্রবন্ধের প্রুফ দেখছে তাতে নির্ঘাত কিছু একটা তার বোধগম্য হয় নি, নয় ভালো লাগে নি এমন জিনিসের অভাব কখনো হত না, লেখকের কাছে এসে হয় বোঝাতে, নয় বদলাতে অনুরোধ করত ; এসে বলত : 'মাফ করুন, এ জিনিসটা কিন্তু ঠিকমতো বলা হয় নি।' লোকটি মোটাসোটা ও বেঢপ, কোঁকড়ানো চুল ভিজে ভিজে দেখতে, নেশায় চুর হয়ে আছে পাছে কেউ বুঝে ফেলে, সেই ভয়ে অস্থির হয়ে ঘাড় গুঁজে থাকত, কিছু জিজ্ঞেস করতে হলে মদের গন্ধে ভুরভুর নিশ্বাস চেপে লোকের ওপর ঝুঁকে পড়ে চকচকে ফোলা আর কম্পিত হাত বাড়িয়ে দেখাত কোনটা সে বোঝে নি বা কোনটা তার মতে সমীচীন নয়। ঘরে বসে অন্যমনস্কভাবে আমি অন্যদের পাণ্ডুলিপি

সংশোধন করে যেতাম, কিন্তু বেশীর ভাগ সময় জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ভাবতাম: নিজে কী লিখব, কী ভাবে লিখব?

তখন আমার আর একটি গোপন জ্বালা শুরু হয়েছে, আর একটি তিক্ত ও 'অবাস্তব স্বপ্ন'। আবার লেখা ধরেছি — গদ্য বেশীর ভাগ, — আর সেগুলো ফের ছাপা হচ্ছে। কিন্তু যা লিখেছি, যা ছাপা হয়েছে তাতে আমার মন নেই। অন্য কিছু, যা পারি ও লিখি তা নয়, যা পারি না এমন কিছু, সম্পূর্ণ অন্য কিছু লেখার বাসনায় যন্ত্রণা পেতাম। ভাবতাম জীবন যা দিয়েছে তার প্রসাদে নিজের অন্তরে সত্যিকার লেখকের যোগ্য কিছু একটা গড়ে তোলা — কত না বিরল আনন্দের ব্যাপার — কত না আধ্যাত্মিক উদ্যমের কথা। তাই ক্রমশ আমার জীবন হয়ে দাঁড়াল এই 'অবাস্তব স্বপ্নের' সঙ্গে লড়াইয়ের সামিল, নতুন ও সমানে পলাতক সেই আনন্দের সন্ধান ও জয়, তার অনুসরণ, তার বিষয়ে অহরহ চিন্তা।

ডাক আসত দুপুরবেলায়। অফিসের সাধারণ ঘরে এসে আবার দেখতাম আভিলভা ঝুঁকে কাজ করে চলেছে — সুন্দর চুল সযত্নে বিন্যস্ত, ওর সব কিছু এত মিষ্টি মনে হয়: টেবিলের তলায় অশ্বচর্মের জুতোর কোমল দীপ্তি, কাঁধে পশমের হাতাহীন কোট — জানলা দিয়ে আসা ধূসর শীতের দিনের আলোয় চিকচিকে সেটাও। জানলার বাইরের বরফ পড়া, আকাশটা মরাখেকো কাকের মতো ধূসর। ডাক থেকে রাজধানীর সবচেয়ে হালের সাময়িক পত্রিকাগুলো বেছে নিয়ে তাড়াতাড়ি পাতা কাটতাম।... চেখভের নতুন গল্প! শুধু নামটা দেখে এত বিচলিত

লাগত যে তাকিয়ে থাকাই সার হত — প্রথম কটা লাইন পর্যন্ত পড়া অসাধ্য হয়ে দাঁড়াত — আগে থেকেই একটা ঈর্ষিত তৃপ্তি যেন টের পেতাম! এদিকে আরো লোকের আগমন ও প্রস্থান: কয়েকজন বিজ্ঞাপনদাতা, আর লেখার তাড়নায় অধীর নানা ধরনের কত লোক: ফুরফুরে পশমের মাফলার গলায়, হাতে দস্তানা জমকালো একটি বৃদ্ধ বড়ো সাইজের সস্তা কাগজের একটা আস্ত গাদা নিয়ে হাজির — প্রথম পৃষ্ঠায় পালকের কলমের যুগের সেই মুন্সিয়ানী বাহাদুরিতে লেখা 'গান ও মনের কথা', একটি অত্যন্ত কাঁচা বয়সের অফিসার লজ্জায় টকটকে লাল হয়ে উঠে পাণ্ডুলিপিখানা দিয়ে সংক্ষেপে ভদ্র ও স্পষ্টভাবে অনুরোধ জানালেন যে লেখাটা পড়ে যদি ছাপাই তাহলে যেন তাঁর আসল নাম গোপনই রাখা হয়: 'শুধু নামের আদ্যক্ষর ছাপাবেন দয়া করে — অবশ্য যদি সেটা আপনাদের কাগজের নিয়ম বহির্ভূত না হয়।' অফিসারটির পর উদয় হলেন টপ-কোটের গরমে ও উত্তেজনায় ঘর্মাক্তকলেবর একটি যাজক। Spectator ছদ্মনামে তিনি ছাপাতে চান তাঁর 'গ্রাম্য দৃশ্যাবলী', তারপর আগমন হল জেলা এ্যাটর্নির।... অতিশয় ফিটফাট মানুষটি; নতুন গ্যালোস, পশম দেওয়া নতুন দস্তানা, গন্ধগোকুলের লোমাবৃত নতুন ওভারকোট, পশমের লম্বা নতুন টুপি এত ধীরেসুস্থে খুললেন যে বেজায় বিদ্‌ঘুটে মনে হল। ওপরকার সব পরিধেয় খুলে ফেলার পর দেখা গেল তিনি অত্যন্ত রোগা, দাঁতালো ও মাজাঘষা; ধবধবে একটি রুমালে গোঁফ মুছতে প্রায় আধ-ঘণ্টা লাগল তাঁর, আর আমি আমার

লেখকসুলভ তীক্ষ্ন দৃষ্টির তারিফ করতে করতে তাঁর প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি দেখতে লাগলাম লোলুপ চোখে।

'লোকটার দাঁত তো ফাঁক ফাঁক, গোঁফজোড়া কী পুরু, আপেলের মতো ঢিপ কপাল থেকে চুল তো এরই মধ্যে হটতে শুরু করেছে, চোখগুলো কী চকচকে, চোয়ালের হাড়ের ওপর জ্বলজ্বলে অসুস্থ ছোপ, পাদুটো বড়ো আর চেপটা, বড়ো চেপটা হাতে কী বড়ো গোল গোল নখ! ওকে তো হতেই হবে মাজাঘষা, ফিটফাট, ধীরস্থির আর নিজের বপু বিষয়ে এত সাবধান — না হলে চলবে না যে!' আমি ভাবলাম।

আয়া বাগান থেকে বাচ্চাকে নিয়ে আসত দুপুরের খাবারের জন্য। হল-ঘরে ছুটে গিয়ে আভিলভা স্বচ্ছন্দে শিশুর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ওর ভেড়ার লোমের সাদা টুপি খুলে দিত, সাদা পশম দেওয়া ওর ছোট্ট ঘন নীল কুঁচি দেওয়া লম্বা কোর্তার বোতাম খুলে দিয়ে চুমু খেত ওর ঠান্ডা জ্বলজ্বলে লাল গালে, আর ও তাতে বাধা না দিয়ে নিজের কী একটা চিন্তায় মগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে অন্যমনস্কভাবে তাকাত এদিক-সেদিকে — জামাকাপড় খোলায় আর চুমুতে কোনো আগ্রহ দেখাত না। এদিকে আমি টের পেতাম যে হিংসেটা আমার হচ্ছে সব কিছুতে: বাচ্চাটার মাথামুণ্ডুহীন সুখ, মাতৃত্বের আনন্দ আভিলভার, আয়ার বয়সজনিত স্থিরতা। যাদের জীবন সাধারণ ভাবনাচিন্তা ও কর্তব্যের ছকে ঢালা, যাদের জীবনে নেই প্রত্যাশা, নেই সেই সবচেয়ে বিচিত্র মানুষিক পেশা, অর্থাৎ লেখা নিয়ে কল্পনাবিলাসী প্রস্তুতির বালাই, তাদের সবায়ের প্রতি ঈর্ষা হত আমার। হিংসে করতাম তাদের

যাদের সহজ, সঠিক, সুনির্দিষ্ট কাজ আছে জীবনে, যে কাজ শেষ করার পর একেবারে স্বচ্ছন্দ চিত্তে গা ঝাড়া দিয়ে থাকা যায় পরের দিন পর্যন্ত।

লাঞ্চের পর সাধারণত আমি বেরিয়ে যেতাম। শহরে ভারি তুষারপাতের চাদর, লেণ্টের সময়কার সেই বড়ো আলসে বরফকণা, যার কোমল, অদ্ভুত বিচিত্র সাদা রঙ দেখে বারবার ভুল করে মনে হয় সত্যি বুঝি বসন্তকাল আসন্ন। নিঃশব্দে ছুটে চলে গেল একটা গাড়ি, গাড়োয়ানের একটা গা ঝাড়া ভাব — হয়ত চট করে এক গেলাস মদ খেয়ে নিয়ে কিছু একটা ভালো, প্রীতিকর জিনিসের ধান্দায় আছে।... এর চেয়ে মামুলি আর কী হতে পারে? কিন্তু এখন আমার মনে বি'ধে বসে সব কিছু — এমনকি সবচেয়ে ক্ষণস্থায়ী যেকোনো ছাপ বি'ধে বসে, আর বে'ধার পর সঙ্গে সঙ্গে আগ্রহ হয় সেটাকে টিকিয়ে রাখার, যাতে সেটা অপচয়ে রেশ মাত্র না রেখে অদৃশ্য না হয়ে যায়; লোভের উদগ্র তাড়নায় সেই ছাপটাকে নিজের খাতিরে আঁকড়ে ধরে কিছু একটা কাজে লাগাতে হয় আমাকে। ওই তো গাড়োয়ানটি একটা দাগ রেখে চলে গেল — আর সেই মুহূর্তটি এবং গাড়োয়ানটির সব কিছু দাগ রেখে গেল আমার মনে। বিচিত্র ঝাপসা সে স্মৃতি মিইয়ে থেকে অনেকক্ষণ বৃথায় মনে আনল গুরুভার। তারপরে এলাম একটি সমৃদ্ধ ভবনে, দেখলাম সামনে বরফকণার মধ্যে আবছা দাঁড়িয়ে আছে একটি চকচকে বার্নিশ করা গাড়ি — পেছনের বড়ো বড়ো চাকার তেল চটচটে টায়ার বসে গেছে পুরনো বরফে, লেগেছে গুঁড়ো গুঁড়ো নতুন বরফের পাউডার। যেতে যেতে তাকালাম ভারি-কাঁধ সইসের

পিঠের দিকে — গাড়ির সীটে উদ্যত বসে আছে গদির মতো পুরু মখমলের টুপি মাথায়, শীতকালে বাচ্চাদের গায়ে যেভাবে বেল্ট জড়ানো হয় সেভাবে বগলের তল দিয়ে বেল্ট আঁটা। হঠাৎ চোখে পড়ল গাড়ির কাঁচের দরজার ওধারে, সুন্দর পাতলা রঙের সাটিনের গদির মধ্যে বসে ছোট্ট মিষ্টি একটা কুকুর কাঁপতে কাঁপতে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন একটা কিছু বলবে এবার। কানদুটি তার ঠিক খুকিদের মাথায় বাঁধা বোএর মতো। আর বিদ্যুৎ ঝলকে আনন্দ দীর্ণ করল আমাকে — মনে রাখতেই হবে কথাটা — খাঁটি বো।

লাইব্রেরীতে যেতাম। পুরনো লাইব্রেরীতে বইয়ের বিরল সম্ভার। কিন্তু কী বিষণ্ণ অযাচিত চেহারা! বাড়িটা পুরনো, অবহেলিত, হলটা বিরাট আর ফাঁকা, দোতলায় যাবার সিঁড়ি ঠাণ্ডা কনকনে, বনাত দেওয়া দরজায় ছেঁড়া অয়েলক্লথ লাগানো। তিনটি ঘরে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত জীর্ণ বইয়ের সারি, লম্বা কাউণ্টার, ছোট একটা ডেস্ক, তদারকের ভার একটি ছোটখাটো, চেপটা বুক, বিরস বেজার মুখের চুপচাপ স্ত্রীলোকের ওপর — পরনে তার কালো ঘোলাটে রঙের কী একটা পোশাক, হাতদুটো বিবর্ণ অস্থিচর্মসার, মধ্যম আঙুলে কালির দাগ। ধূসর স্মক-পরা ঝোড়োকাকের মতো দেখতে একটি ছোকরা তার ফাইফরমাস খাটে — ইঁদুরের মতো নরম মাথার চুল কাটা হয় নি অনেক দিন। 'পড়ার ঘরে' যেতাম। ঘরটা গোলপানা, ধোঁয়ার গন্ধ, মাঝখানের গোল টেবিলে 'বিশপ সমাচার'*) ও 'রুশী তীর্থযাত্রী'*)। আর একটি পড়ুয়ার সঙ্গে মোলাকাৎ না হয়ে যেত না — রোগাপানা ছেলেছোকরা

স্কুলের ছাত্রটি খাটো জীর্ণ টপ-কোট গায়ে টেবিলে কাত হয়ে পড়ে ভারি একটা কেতাবের পাতা ওলটাত গোপন রহস্যের ভাবে, বলের মতো গোল পাকানো রুমালে চুপি চুপি বারবার নাক মুছত ছেলেটি।... নিঃসঙ্গতায় আর বইয়ের বাছাইয়ে শহরের মধ্যে অদ্ভুত আমরা দু'জনে — আমরা ছাড়া সেখানে কে আর বসে থাকবে? ছেলেটি যা পড়ত স্কুলের ছাত্রের পক্ষে আশ্চর্যভাবে বেমানান: 'পরচা'*)। আর গ্রন্থাগারিকা আমারও দিকে একটু অবাক হয়ে প্রায়ই তাকাত যখন চাইতাম 'উত্তরী মৌমাছি'*), 'মস্কো সমাচার'*), 'ধ্রুবতারা'*), 'উত্তরী পুষ্প'*) ও পুশ্‌কিনের 'সমকালীন'*)।... নতুন নানা বইও পড়তাম — 'জীবনী বিচিত্রার': তবে পড়ার উদ্দেশ্য ছিল শুধু কিছু ভরসা পাওয়া তাদের কাছ থেকে, নামকরা লোকদের সঙ্গে নিজের একটা ঈর্ষান্বিত তুলনা করা।... 'নামকরা লোক বটে!' কত অগুনতি কবি, ঔপন্যাসিক ও গল্প লেখকের সঙ্গে দুনিয়ার পরিচয় না হয়েছে, আর টিকেছেন মাত্র কয়েকজন! চিরকাল শুধু কয়েকজনেরই নামডাক! হোমার*), হোরেস*), ভার্জিল*), দান্তে*), পেত্রার্কা*)... শেক্সপীয়র*), বায়রন*), শেলী*), গ্যেটে*)... রাসিন*), মোলিয়ের*)... সেই একই 'ডন কুইক্সোট'*), সেই 'মানন লেস্কট'*)... মনে আছে কী গভীর সম্ভ্রমের সঙ্গে সেই পড়ার ঘরে রাদিশ্চেভ*) প্রথম পড়েছিলাম — 'চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, মানবকুলের দুঃখযন্ত্রণার নিমিত্ত আমার হৃদয় বেদনায় দীর্ণ হইয়া গেল!'*)

দিন শেষ হবো-হবো, তখন লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে

এসে অন্ধকার ঘনিয়ে আসা রাস্তায় আস্তে আস্তে হাঁটতাম। গির্জার ঘণ্টার নরম আওয়াজের রেশ হাওয়ায়। দুঃখ হত নিজের প্রতি, মন কেমন করত ওর জন্য, বাড়ির জন্য, ঢুকতাম গির্জায়। সেখানেও সেই একই একটা অযাচিত ভাব: শূন্য অন্ধকার, কয়েকটি টিমটিমে মোমবাতি, কয়েক জন বুড়ো-বুড়ী। চাষার মতো মাথার মাঝখানে টেরি কাটা গির্জার ওয়ার্ডেন মোমবাতির কাউণ্টারের পেছনে ধর্মাবেগে নিশ্চল দাঁড়িয়ে বণিকজনোচিত তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে চোখ বুলিয়ে নিত সমবেত উপাসকমণ্ডলীর ওপর। চেপটা পা অতি কষ্টে টেনে দারোয়ান ঘুরে বেড়াত, হেলে পড়া, অতি তাড়াতাড়ি গলে যাওয়া একটা মোমবাতি ঠিক করে দাঁড় করিয়ে দিত, পুড়ে নিঃশেষ একটা বাতি ফুঁ দিয়ে দিল নিভিয়ে — পোড়া পোড়া মোমের গন্ধ উঠত ঘরে, বাতির শেষটা নিয়ে অন্য সব বাতির টুকরোর সঙ্গে মিশিয়ে বুড়ো হাতে দলা পাকিয়ে মোমের একটা তাল বানাত। তাকে দেখে বোঝা যেত আমাদের এই পার্থিব বিদ্‌ঘুটে জীবন নিয়ে তার কত অবসাদ, কত না অবসাদ আমাদের নানা ক্রিয়াকর্মে — দীক্ষা, খ্রীষ্টের শেষ ভোজন পর্বানুষ্ঠান, আমাদের বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, বছরের পর বছর পালা করে আসা ভোজন ও উপবাস উৎসব। হাতাবিহীন জোব্বায় অদ্ভুত রোগা, অনাবৃত মাথা, মেয়েলিভাবে এলোমেলো চুল এলানো যাজক বেদীর বন্ধ সিংহদ্বারের দরজার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এত নীচু হয়ে প্রণাম জানাচ্ছেন যে বুক থেকে আলখাল্লা খস্‌ করে মেঝেতে ঝুলে পড়ল। দীর্ঘশ্বাসের উচ্চকিত সুরে তিনি বলছেন: 'হে স্বর্গপতি, মোর জীবন মরণের অধিপতি...' ব্যাকুল অনুতপ্ত

আঁধারে, বিষাদাচ্ছন্ন রিক্ততায় প্রতিধ্বনি উঠল তাঁর কণ্ঠস্বরের। নিঃশব্দে গির্জা থেকে বেরিয়ে এসে, আঁধার-হয়ে-আসা ধোঁয়াটে আকাশের দিকে তাকিয়ে আবার বুক ভরে নিলাম শীতের হাওয়া, বসন্তের প্রতিশ্রুতি যাতে। একটি ভিখিরি ভুয়ো বিনয়ে ঘন পাকাচুল মাথা আমার সামনে নামিয়ে পাঁচ কোপেকের মুদ্রার আশায় হাত পাতল, পয়সা পেয়ে হাতের মুঠো শক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলে তাকালে হঠাৎ খুব অবাক হলাম — লোকটার জোলো, ফিরোজা নীল চোখদুটো একেবারে পাঁড় মাতালের, স্ট্রবেরির মতো প্রকাণ্ড নাকে তিনটে যেন বড়ো থাক থাক সচ্ছিদ্র স্ট্রবেরি। আবার মনে আনন্দের কী জ্বালা: ভেবে দেখুন একবার, তিন থাকের স্ট্রবেরিসুলভ একটা নাক!

আঁধার-হয়ে-আসা আকাশ, আকাশের গায়ে পুরনো ছাদের কালো রেখা — দেখতে দেখতে চললাম বল্‌খোভ্‌স্কায়া স্ট্রীট হয়ে, আর রেখাগুলির দুর্জ্ঞেয় সান্ত্বনার মাধুর্যে মন ভরে উঠল যন্ত্রণায়। মানুষের একটা পুরনো চালা — কেউ কি কখনো লিখেছে এ বিষয়ে? রাস্তায় রাস্তায় আলো জ্বলে উঠল। দোকানের জানলায় উষ্ণ দীপ্তি, ফুটপাথে হাঁটছে নানা কালো মূর্তি, আকাশ হয়ে উঠল আরো ঘন গভীর নীল, শহর আরো মধুর ও আরামের।... কখনো কালো মূর্তিগুলোর একে, কখনো অন্যকে অনুসরণ করলাম গোয়েন্দার মতো, ওদের পিঠের দিকে, গ্যালোসের দিকে তাকিয়ে চলেছি, ওদের কিছুটা বোঝার, ধরার, একেবারে ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করছি।... আমি চাই লিখতে! লেখা উচিত এই সব

ছাদ, গ্যালোস আর পিঠের বিষয়ে। তবে 'স্বেচ্ছাচারী শাসন ও জুলুমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, পদদলিত নিঃসম্বল মানুষের রক্ষা, জলজ্যান্ত চরিত্র অঙ্কন, সমসাময়িক পৃথিবী, সাধারণের মনোভাব ও ধারার বিরাট চিত্রাঙ্কন' আমার উদ্দেশ্য নয়! পা চালিয়ে গেলাম অর্লিকের দিকে। সন্ধ্যা শেষ হয়ে রাত্রি নেমেছে, সেতুতে ইতিমধ্যে জ্বলেছে গ্যাসের দীপ্ত আলো। আলোর নীচে অনাবৃত লাল পা বরফে রেখে দাঁড়িয়ে আছে এক ছন্নছাড়া ভবঘুরে — ব্রণ-পড়া, ফোলা-ফোলা মুখ, বিরস ক্ষীণদৃষ্টি চোখ, পরনে কেবল একটা ছেঁড়া সুতির শার্ট আর লাল রঙের ছোট পাজামা, শার্টে হাত গুঁজে, নিজেকে জড়িয়ে টলছে লোকটা, কুকুরের মতো চোখ মেলে তাকাচ্ছে আমার দিকে, কুকুরের মতো কাঁপছে ঠক ঠক ক'রে, কেঠো গলায় বিড় বিড় করে বলছে: 'হুজুর, হুজুর!' চোরের মতো তার ছবিটা চট করে পাকড়ে লুকিয়ে ফেললাম মনের মধ্যে, আর সেজন্য তাকে ছুঁড়ে দিলাম পুরো দশ কোপেকের একটা মুদ্রা। কী ভয়ঙ্কর জীবন! কিন্তু সত্যিই কি 'ভয়ঙ্কর'? হয়ত 'ভয়ঙ্কর' কথাটা এ ক্ষেত্রে চলে না একেবারে — প্রয়োজন সম্পূর্ণ অন্য কোনো একটা শব্দের? এই সেদিন এরই মতো একটা ছন্নছাড়া গরীব লোককে পাঁচ কোপেক ছুঁড়ে দিয়ে ছেলেমানুষের মতো চেঁচিয়ে বলেছিলাম: 'সত্যিই কী ভয়ঙ্কর তোমার বেঁচে থাকার ধরনটা!' আমার বোকামিতে হঠাৎ রেগে উঠে কী বেয়াড়া দৃঢ়ভাবে আমাকে জবাব দিয়েছিল লোকটা ভাঙা গলায়: 'এতে ভয়ঙ্কর কিছুই নেই, বাবু!' সেতু পেরিয়ে চোখে পড়ল বড়ো একটা বাড়ির একতলায় মাংস বিক্রেতার পুরু

কাঁচের জানলায় চোখ-ধাঁধানো আলো — জানলায় অজস্র ধরনের সসেজ ও হ্যামের এত ছড়াছড়ি ও সমারোহ যে দোকানের সাদা ঝকঝকে ভেতরটা প্রায় চোখে পড়ে না, সেখানেও গাদাগাদি করে সজেস ও হ্যাম ঝোলানো। জানলার রক্তাভ আলো আমার ওপর পড়ল, পাশ দিয়ে যেতে যেতে আক্রোশে ভাবলাম: 'সামাজিক বৈষম্যই বটে!' যেন কাউকে হুল ফোটানোর মতলব। যেতাম গাড়োয়ানদের চায়ের আড্ডায় মস্কোভ্স্কায়া স্ট্রীটে। সেখানে হৈচৈ, ঠেসাঠেসি ও ভ্যাপসা গরমের মধ্যে বসে চেয়ে চেয়ে দেখতাম মাংসল টকটকে লাল মুখ, লালচে বাদামী দাড়ি, সামনে রাখা রঙচটা মরচে ধরা ট্রেতে দুটো সাদা চায়ের কেটলি, হাতল ভিজে জবজবে সুতোয় বাঁধা ঢাকনিতে। জনগণের জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ করতাম ভাবছেন? মোটেই নয় — দেখতাম শুধু ট্রেটা, ভিজে জবজবে সুতোটা!

১২

মাঝে মাঝে হাঁটতাম রেলওয়ে স্টেশনের দিকে। বিজয় তোরণ পেরোলে রাস্তাঘাট অন্ধকার, ছোট শহরের রাত্রির সেই ঘোলাটে অন্ধকাব। তারপর দেখতাম ছোট একটি মফস্বল শহর — অজানা, শুধু আমার কল্পনাপ্রসূত, কিন্তু এত জলজ্যান্ত যে মনে হয় সারা জীবন কাটিয়েছি সেখানে। দেখতাম বরফচাপা চওড়া রাস্তা, বরফের কালো কালো হতচ্ছাড়া কুঁড়ে, একটা জানলায় টিমটিমে লাল আলো।... বিমুগ্ধ হয়ে নিজেকে বলতাম বারবার: এই ঠিক, এই ঠিক লেখা উচিত ঠিক এইভাবে, কয়েকটি মাত্র কথায়: বরফ

কুঁড়ে, সাঁঝের বাতি... আর কিছু নয়! — মাঠ থেকে ঠান্ডা হাওয়ায় ভেসে আসত ইঞ্জিনের চীৎকার ও ফোঁসফোঁসানি আর কয়লার সেই মধুর গন্ধ যা অন্তরের অন্তঃস্থল আলোড়িত করে অনুভূতি আনে সুদূরের, আদিগন্তের। দেখতাম যাত্রী নিয়ে ছেকরা গাড়ির কালো মূর্তি ছুটে আসছে আমার দিকে — মস্কোর মেলট্রেন এরই মধ্যে এসে গিয়েছে? সত্যিই এসেছে কেননা স্টেশনের রেস্তোরাঁ গরম ও গুমোট হয়ে উঠেছে লোকের ভিড়ে, আলোয়, রান্নাঘরের গন্ধে, সামোভার জ্বালানোয়। কোটের পেছনকার ঝুল উড়িয়ে ছুটোছুটি করছে তাতার ওয়েটারেরা — প্রত্যেকের পা বাঁকা, রঙ ময়লা, চোয়ালের হাড় উঁচু, চোখের কোটর ঘোড়ার মতো, কামানের গোলার মতো নীলচে কামানো মাথা। বড়ো টেবিলটায় ভিড় করে বসে সওদাগরের গোটা একটি দল মুলোর আচার দিয়ে ঠান্ডা স্টার্জন মাছ খাচ্ছে। তারা সবাই খোজা ধর্মসম্প্রদায়ের* লোক — জাফরান রঙা বড়ো ভারিক্কি মেয়েলি মুখ, সরু সরু চোখ, ওভারকোটে শেয়ালের চামড়ার আস্তরণ দেওয়া।... স্টেশনের বইয়ের দোকানটায় সর্বদা আমার গভীর আগ্রহ, সুভরিনের বইয়ের*) হলদে ও ছাই-রঙা মলাটের নামগুলো পড়ে নেবার জন্য চোখ মেলে তাই ঘুরতাম ক্ষুধিত নেকড়ের মতো। আর সব মিলে ঘুরে বেড়ানো ও ট্রেনের জন্য আমার তীব্র অশেষ

* অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাশিয়ায় খোজা ধর্মসম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। দৈহিক সুখভোগের বিরোধী এই ধর্মসম্প্রদায়ের লোকেরা মুষ্কচ্ছেদের আশ্রয় নিত।

আকাঙ্ক্ষাকে এত বেশী চাগিয়ে তুলত, সেই যার সঙ্গে অসীম সুখে কোথাও চলে যেতে পারতাম, তার জন্য এত ব্যাকুলতা হত যে তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে শ্লেজে চেপে ছুটতাম শহরে, ফিরে যেতাম অফিসে। হৃদয়বেদনা ও গতিবেগ সুন্দর জোড় খায় হামেশা! শ্লেজটার সঙ্গে আমিও ধাক্কা খেয়ে গর্তে পড়তাম আর উঠতাম, আমি বসে বসে ওপরে হঠাৎ চেয়ে দেখতাম চাঁদ উঠেছে আকাশে: শীতের ভাসমান ঝাপসা মেঘের পেছন থেকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে, ঝলকাচ্ছে ফ্যাকাসে সাদা একটি মুখ। আকাশের কত উঁচুতে সে মুখ, সব কিছুতে কত উদাসীন! উড়ন্ত মেঘের ফাঁকে কখনো দেখা যাচ্ছে নিমেষের জন্য, ঢেকে যাচ্ছে আবার, কিন্তু কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই তার, ওদের নিয়ে পরোয়া নেই কোনো। ঘাড় উঁচু করে রাখাতে শেষ পর্যন্ত ব্যথা ধরে যেত, কিন্তু চোখ ফেরাতাম না চাঁদ থেকে, মেঘমুক্ত ঝকঝকে রূপে যখন সবটা দেখা যায় তখন কিসের মতো চেহারা তার বোঝার চেষ্টা করতাম প্রাণপণে। সে কি মৃতের সাদা মুখোস? জানি ভেতরকার আলোয় দীপ্ত সে, কিন্তু কোন মালমশলায় তৈরী? পারাফিনে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই হবে অবশ্য! কোথাও এটার উল্লেখ না করলে নয়। অফিসের হল-ঘরে দেখা হয়ে গেল আভিলভার সঙ্গে। সে বিস্মিত ও খুশি হয়ে বলে উঠল, ‘বা, কী ঠিক সময়ে এসে গেছ! চলো আমার সঙ্গে জলসায়!’ — লেস-দেওয়া কালো একটা পোশাক তার গায়ে — এত সুন্দর যে আরো ছোট আর সুঠাম দেখাচ্ছে তাকে। কাঁধ, হাত আর স্তনের নরম ঢালু অনাবৃত; কেশকারের দোকান ঘুরে এসেছে — কেশবিন্যাস নিখুঁত,

মুখে পাউডার দেওয়াতে চোখদুটো যেন আরো কালো, আরো দীপ্ত। ফার-কোটটা ওর গায়ে জড়িয়ে দিতে দিতে ভয়ংকর ঘনিষ্ঠ তার নগ্ন কাঁধ ও কোঁকড়ানো, সুগন্ধি চুলে চুমো খাবার হঠাৎ ঝোঁক চাপলাম কষ্টে।... রাজধানীর নামকরা গাইয়ে বাজিয়েদের আসর বসেছে অভিজাতদের ক্লাবে, সেখানকার হল-ঘরে ঝাড়ের আলোর ফোয়ারা ছুটেছে। সুন্দরী গায়িকা একটি আর একজন কালো চুলের প্রকান্ড গায়ক — অন্যান্য সব গাইয়েদের মতো আশ্চর্য স্বাস্থ্য ও জোয়ান ঘোড়ার বর্বরোচিত অপরূপ শক্তির প্রতিমূর্তি। পেল্লায় পেটেণ্ট লেদারের জুতোয়, সুন্দর মানানসই ড্রেস-কোটে। সাদা শার্টে, সাদা টাইয়ে একেবারে চোখ ঝলসানো চেহারা, বাজখাই, প্রাণবন্ত, শাসানোগোছের একরোখা গলায় স্পর্ধা ও বীরোচিত দুঃসাহস। মেয়েটি কখনো গলা নামিয়ে, কখনো তার সুরে সুর মিলিয়ে সাড়া দিচ্ছে দ্রুতছন্দে, বাধা দিচ্ছে স্নিগ্ধ ভর্ৎসনায় ও অনুযোগে, তীব্র বিষাদে ও উচ্ছ্বসিত আনন্দে. ক্ষিপ্র মধুর গিটকিরিতে হেসে উঠছে।...

১৩

প্রায়ই ভোরবেলায় জেগে উঠতাম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখতাম — সাতটা বাজে নি! ভয়ঙ্কর ইচ্ছে হত আবার কম্বল মুড়ি দিয়ে গরম বিছানায় শুয়ে থাকি আরো কিছুক্ষণ। ঘরের আলো হিম ধূসর, ঘুমন্ত হোটেলের নিঃশব্দতা ভাঙত শুধু খুব ভোরের দিকের একটা শব্দে — গলি-বারান্দার শেষে কোট ঝড়ো বুরুশের খসখস

আওয়াজ, বোতামে বুরুশ ঠেকার শব্দ। কিন্তু আর একটা দিন পাছে বৃথায় যায় বলে এত শঙ্কিত আমি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লেখা নিয়ে — সত্যি মন দিয়ে লেখা নিয়ে — বসার জন্য এত ব্যগ্র, যে ঘণ্টার দড়িতে জোরে টান দিতাম — একরোখা, করুণ, কম্পিত একটা সাড়া উঠত গলি-বারান্দায়। সব কিছু কী পরদেশী ও বিশ্রী এখানে — এই হোটেলখানা, কাপড়ঝাড়ার বুরুশ খস খস করে চালানো নোংরা চাকরটা, কনকনে ঠান্ডা জল তেরছা ফিনকিতে মুখে পাঠানো টিনের হতকুচ্ছিৎ মুখ-ধোবার জায়গাটা! রাত্রির পাতলা শার্টে কী করুণ আমার যৌবনসুলভ কৃশ দেহ, জানলার বাইরের ধারিতে দানা দানা বরফে ঠান্ডায় ছোট বলের মতো কুঁকড়ে জমে যাওয়া পায়রাটা কী বিষণ্ণ! হঠাৎ হৃদয় রাঙিয়ে উঠত আনন্দেভরা দুঃসাহসী একটা সঙ্কল্পে: এখখুনি, আজকেই এখানকার পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যাওয়া যাক বাতুরিনোতে, আমার আপনার, আদরের বাড়িতে! কিন্তু তাড়াতাড়ি চা গিলে ভাঙ্গাচোরা সেই টেবিলটায় — যেটা মুখধোবার জায়গায় পাশে ঠেলে একটা দরজার গায়ে লাগানো, যার ওদিকের ঘরটায় থাকত একটি ম্রিয়মাণ, উদাসসুন্দরী ভদ্রমহিলা আর তার আট বছরের বাচ্ছা — সেই টেবিলটায় আমার গুটিকতক বই ঠিক করে গোছানোর একটা ভাব আনার পর আমি আবার বরাবরকার মতো মগ্ন হয়ে যেতাম আমার সেই ভোরবেলাকার কাজে: লেখার জন্য আমার সেই প্রস্তুতি, আমার মধ্যে কী আছে তার বিশ্লেষণের চেষ্টা, আমার ভেতরকার কী একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে রূপ নেবো-নেবো হয়েছে, তার সন্ধান।... বসে থাকতাম সেই মুহূর্তটির আশায় —

ভয় হত আবার হয়ত কিছু মিলবে না, শুধু বসে থাকা সার হবে, ক্রমশ বাড়ন্ত উত্তেজনায়, হাত ঠান্ডায় হিম হয়ে যাবে, তারপর গভীর হতাশা, আবার রাস্তায় ছুটে বেরিয়ে অফিস যাওয়া। চিন্তাধারা গোলমেলে হয়ে যেত, সাবলীল অসংলগ্নতার ভারে ব্যথিয়ে উঠত মন — সে মনে কত বিচিত্র অনুভূতি, চিন্তা ও কল্পনার ভিড়।... সর্বদা প্রধান বিষয়বস্তু হল আমি, আমার ব্যক্তিত্ব; সত্যি কথা বলতে যতই আগ্রহভরে অন্যদের খুঁটিয়ে দেখি না কেন আসলে তাদের বিষয়ে কোনো উৎসাহ ছিল না আমার। ভাবতাম, বেশ তাহলে স্রেফ নিজের বিষয়ে একটা গল্প লিখলেই হয়। কিন্তু লিখি কী করে? 'শৈশব, কৈশোর'*) গোছের কিছু একটা! অথবা আরো সহজভাবে? 'অমুক জায়গায়, অমুক সময় আমি জন্মগ্রহণ করি...' কিন্তু হা ভগবান, এসব কী নীরস, কী খেলো আর কী কৃত্রিম! আমার অনুভূতি তো একেবারে অন্য রকমের! বলতে লজ্জিত ও বিব্রত হয়ত লাগবে, তবু ব্যাপারটা তো তাই: আমার জন্ম মহাবিশ্বে, দেশ ও কালের অসীমে, যেখানে একদা দানা বাঁধে কী একটা সৌরজগত, তারপর যাকে আমরা বলি সূর্য, তারপর পৃথিবী... কিন্তু ব্যাপারটার মানে কী দাঁড়ায়? এ বিষয়ে ফাঁকা কথা ছাড়া আমার আর কী জানা আছে? সৃষ্টির প্রারম্ভে পৃথিবী ছিল জ্বলন্ত গ্যাসের পুঞ্জ... তারপর কোটি কোটি বছরের পর, গ্যাস পরিণত হল তরল পদার্থে, তরল পদার্থ ঘন হল আর, মনে হয়, আরো বিশ লক্ষ বছর কেটে যাবার পর পৃথিবীতে দেখা দিল প্রোটোজোয়া: অ্যালগা, ইন্‌ফুজোরিয়া... তারপর মেরুদণ্ডহীন প্রাণী: কৃমি.

খোলাবিশিষ্ট জন্তু... তারপর উভচর প্রাণী... তাদের পর এল বিরাট উরোগামী প্রাণী... আর তাদের পর কোন এক গুহামানুষ আগুন আবিষ্কার করল যে... তারপর ক্যাল্‌ডিয়া*), আসিরিয়া*) ও মিসর, পিরামিড বানানো ও মমির তদারক ছাড়া আর কী করেছে তারা আমার মনে নেই... আর্টাক্‌জার্কাস নামের কে একজন হুকুম দিলেন হেলেস্‌পন্ট*) জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবার... পেরিক্লিস*) ও আস্‌পেসিয়া*), থার্মোপলির যুদ্ধ*), মারাথনের যুদ্ধ...*) যা হোক, এসব ঘটার অনেক আগে উপকথার সেই যুগে ভেড়ার পাল নিয়ে এব্রাহামের আবির্ভাব ঘটে*), তিনি গেলেন প্রতিশ্রুত পূত দেশে... 'যখন ডাক পড়ল সেই দেশে যাবার, যে দেশ পরে তিনি পাবেন উত্তরাধিকারসূত্রে। বিশ্বাসভরে ডাক মেনে নিলেন এব্রাহাম, রওনা হলেন তিনি, কোথায় যাচ্ছেন না জেনে...' না, কোথায় যাচ্ছেন জানতেন না তিনি। আমারও জানা নেই! 'বিশ্বাসভরে...' কিসে বিশ্বাস? ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রেমময় দয়ালুতায়? 'কোথায় যাচ্ছেন না জেনে...' সত্যি, তিনি জানতেন: তিনি যাচ্ছিলেন সুখের দিকে, মানে এমন কিছু একটার দিকে যেটা তাঁকে দেবে আনন্দ ও পরিতৃপ্তি — অন্য কথায় বলতে গেলে, প্রেম ও জীবনের দিকে।... কিন্তু আমিও তো ঠিক এভাবে বরাবর থেকেছি, বেঁচেছি শুধু তারই জন্য যা জাগায় প্রেম ও আনন্দ।...

আমার ছোট টেবিলের পেছনের দরজার ওধার থেকে কানে আসে মহিলাটি ও শিশুটির কণ্ঠস্বর, শুনতে পাই মুখ-ধোবার জায়গার পাদানির ঘটাং-ঘটাং শব্দ। জলের ছলাং ছলাং, চা তৈরী হওয়ার আওয়াজ, আর শিশুটিকে

খেতে বলার অনুরোধ: 'কোস্তিয়া, লক্ষ্মীসোনা, রুটিটা খেয়ে নে!' উঠে পড়ে পায়চারি শুরু করতাম। আবার এই সোনা কোস্তিয়া... তাকে সকালের খাওয়া দিয়ে মা সাধারণত চলে যেত দুপুর পর্যন্ত। ফিরে এসে কেরোসিনের স্টোভে কিছু একটা রেঁধে ছেলেকে দুপুরের খাওয়া দিয়ে বেরিয়ে যেত আবার। কী যন্ত্রণা এই ছোট্ট কোস্তিয়াকে লক্ষ্য করা — হোটেল-শিশু গোছের চীজে সে পরিণত হয়েছে, সারাদিন এঘর-ওঘর করে, ঘরে কেউ থাকলে উঁকি মেরে দেখে ভীরুভাবে কথাবার্তা বলে, ঘরের লোকের আদর কাড়াবার, তার মন-জোগানোর জন্য কিছু বলতে চায়, কিন্তু কেউ কান দেয় না তার কথায়, কেউ কেউ এমনকি তাড়িয়ে দিয়ে বিড় বিড় করে বলে: 'কেটে পড়, বাছাধন। আমাকে রেহাই দাও, বাবা!' একটি ঘরে থাকতেন ছোট একটি বুড়ী — অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির শ্রদ্ধাস্পদা মহিলাটি হোটেলের আর কাউকে সমকক্ষ গণ্য করতেন না, গলি-বারান্দা হয়ে যাবার সময় কৃপাদৃষ্টি ফেলতেন না কারো দিকে, আর প্রায়ই, বড়ো বেশী ঘন ঘন গোসলখানায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে সশব্দে জলকেলি করতেন। ভদ্রমহিলার একটি বড়ো, চওড়া-পিঠ, খাঁদানাক কুকুর ছিল, গণ্ডেপিণ্ডে খেয়ে তার ঘাড়ে থাকে থাকে চর্বি জমেছে; বড়ো কুলের মতো রঙের চকচকে চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে, কুৎসিত নাকের মাঝখানটা অশ্লীলভাবে চাপা, নীচের চোয়াল আত্মগম্ভীরতায় ও তাচ্ছিল্যে এগোনো, শ্বদন্তের মাঝখানে ধরাপড়া জিভটা যেন ব্যাঙের। কুকুরটার মুখের ভাব সবসময় এক রকমের — হুঁশিয়ারি ঔদ্ধত্যের একটা ভাব — কিন্তু তবু অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির সে।

আর তাই কোস্তিয়া কারো ঘর থেকে বিতাড়িত হয়ে গলি-বারান্দায় তার সামনে পড়লে তক্ষুনি কানে আসত কুকুরটার চাপা বুনো আওয়াজ, গলা দিয়ে বেরোত ঘড়ঘড় ফোঁসফোঁস শব্দ, সেটা রাগের উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে শেষ হত প্রবল হিংস্র ঘেউ ঘেউ-এ, আর কোস্তিয়া হাউমাউ ক'রে একসার হত মৃগী রোগীর মতো।...

চেয়ারে আবার বসে পড়তাম। জীবন কত দীনহীন, কত খেলো, তবু কত ব্যথাময় জটিল ভেবে মন খারাপ হয়ে যেত। মনে হত লিখি ক্ষুদে কোস্তিয়াকে নিয়ে বা ওধরনের কিছু একটার বিষয়ে। যেমন সেই প্রবীণা মেয়ে-দর্জিটি, একবার যে হপ্তাখানেক ছিল নিকুলিনার বোর্ডিং-হাউজে, সারাক্ষণ কাপড়ের ফালি গাদা করা টেবিলে কী একটা কেটে যেত সে, তারপর জোড় দেওয়া ফালিগুলো জড়ো করে সেলাই-এর কলে রেখে দিত কল চালিয়ে।... হাতের কাঁচির গতি কীভাবে সে বড়ো শুকনোটে হাঁ-মুখ বেঁকিয়ে কুঁচকিয়ে দেখত সেটা মনে রাখার যোগ্য। রসিয়ে রসিয়ে চা খেতে কী ভালো লাগত তার! নিকুলিনাকে মিষ্টি কিছু বলার জন্য সর্বদা তার কী চেষ্টা আর আগ্রহ! ভান করে, খুব চাঙ্গা হয়ে কথাবার্তা চালাতে চালাতে শ্রমজীর্ণ তার বড়ো হাত আপনা থেকে যেন চলে যেত সাদা রুটির ফালির টুকরিতে, জ্যামের কাঁচের পাত্রের দিকে ঘন ঘন তাকাত আড়-চোখে। আর সেদিন ক্রাচহাতে যাকে দেখেছিলাম কারাচেভ্স্কায়া স্ট্রীটে, সেই খোঁড়া মেয়েটি? খোঁড়া আর কুঁজোরা হাঁটে উদ্ধত, কুছ পরোয়া নেই ভাবে। কিন্তু সেই মেয়েটি খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমার কাছে এল সলজ্জ ভাবে; দুটো হাতের

কালো ক্রাচে ভর দিয়ে ধরা বাঁধা মাত্রায় লাফিয়ে, কাঁধ ঝটকিয়ে এল, বগল থেকে উদ্যত ক্রাচের কালো বাঁট। একাগ্রদৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে।... পরনের কোটটা খাটো, শিশুদের যেমন হয়, গাঢ় বাদামি চোখজোড়া বুদ্ধিদীপ্ত, শুচি ও উজ্জ্বল, যেমনটা হয় শিশুদের, অথচ জীবনকে, জীবনের দুঃখ ও প্রহেলিকাকে সে চোখ জানে।... সত্যি, এসব দুর্ভাগাদের কয়েকজন কী সুন্দর, ওদের মুখে চোখে ফুটে ওঠে অন্তরের প্রতিচ্ছবি!

কীভাবে শুরু করব আমার জীবন বর্ণনা সেটা ঠিক করে নেবার জন্য আবার চেষ্টা করতাম একাগ্রচিত্ত হবার। সত্যি, কীভাবে! যা হোক একটা কিছু দিয়ে শুরু না করলে তো নয়। বিশ্বজগত, যেখানে নির্দিষ্ট একটি মুহূর্তে আমি ভূমিষ্ঠ হই, না হয় সেটা গেল, অন্তত রাশিয়া দিয়ে শুরু করলে হয়: যে দেশে আমার বাস, যে পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেছি তার একটা ধারণা পাঠককে না দিলে তো চলে না। কিন্তু এর বিষয়ে আমি কী জানি? স্লাভ্‌দের পুরাতন নানা উপজাতি, সেসব উপজাতিদের মধ্যে নানা বিবাদ। দীর্ঘ দেহ, সোনালি চুল, সাহস ও অতিথিবৎসলতার জন্য স্লাভ্‌দের নামডাক ছিল, তারা উপাসনা করত সূর্যদেবের, বজ্রের ও বিদ্যুতের, সমীহ করত অরণ্যের জলাভূমির প্রেতযোনি ও মৎস্যকন্যাদের, 'সব কিছুতে মোটের ওপর প্রকৃতির প্রপঞ্চ ও শক্তিতে'... আর কী? রাজন্যদের আমন্ত্রণ জানানো*), রাজা ভ্লাদিমির সমীপে জারগ্রাদের রাজদূতবৃন্দ*), রোরুদ্যমান লোকজনের সামনে সিংহাসনচ্যুত বজ্র দেবতা পেরুনকে নীপারে নিক্ষেপ...*), প্রাজ্ঞ ইয়ারস্লাভ*), তাঁর সন্তান ও দৌহিত্রদের

মধ্যে বিবাদ... মনে পড়ে 'সুবৃহৎ নীড়' ভ্‌সেভলদের কথা...*) কিন্তু সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হল এই, সমসাময়িক রাশিয়া সম্বন্ধে একেবারে কিছু জানা নেই আমার। অবশ্য আছে বটে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারবর্গ ও ভুখা কিষান, আছে গাঁয়ের কর্মকর্তা, সশস্ত্র পুলিস, সাধারণ পুলিস, ও গাঁয়ের যাজক সব — লেখকদের মতে যাদের ওপর সর্বদা সুবৃহৎ সংসারের চাপ।... আর কী? আছে ওরিওল, রাশিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন শহরের অন্যতম — ওরিওলের জীবনযাত্রা ও অধিবাসীদের বিষয়ে কিছুটা অন্তত জানা উচিত ছিল, কিন্তু কী জানি? শুধু রাস্তা, গাড়োয়ান, খাতকাটা বরফ, দোকান পাট, সাইনবোর্ড — খালি সাইনবোর্ড আর সাইনবোর্ড... আর্চবিশপ, প্রদেশপাল... জান্তব, নিষ্ঠুর, বিরাটদেহ, সুদর্শন সেই পুলিস ইন্সপেক্টর রাশেভ্‌স্কি... আছে বটে পালিৎসিন, ওরিওলের গৌরব যে, তার একটা থার্মবিশেষ, সেই সব পাগলাটে মহিষদের একজন যাদের জন্য স্মরণাতীত কাল থেকে রাশিয়া বিখ্যাত: কুলীনবংশ জাত বৃদ্ধটি, আক্‌সাকভ ও লেস্‌কভের*) সেই বন্ধুপ্রবর থাকেন যে বাড়িতে সেটা দেখতে প্রাচীন রুশী প্রাসাদের মতো — ঘরে ঘরে কাঠের দেয়ালে বিরল আইকনের বাহার। রঙীন মরক্কোর পাড় দেওয়া বিচিত্র ঢিলে একটা কোট তিনি সর্বদা পরেন, বাবরি-কাটা চুল, মুখটা ভারি ও ঘন, ফালি ফালি চোখ, তাঁর বুদ্ধি প্রখর, লোকে বলে পড়াশোনা করেছেন অনেক।... কিন্তু পালিৎসিন নামের এই মানুষটির বিষয়ে আর কিছু কি জানি? কিছু না, একেবারে কিছু না!

এতে হঠাৎ চটে উঠলাম: সত্যি তো, কাউকে বা কিছুকে সমগ্রভাবে জানার প্রয়োজন কী আমার, যেভাবে যা জানি, বুঝি, সেইভাবে লিখব না কেন! আবার তড়াক করে উঠে পায়চারি শুরু করতাম। চটে যে উঠেছি তাতে খুশি, রাগটাকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরেছি যেন তাতেই আমার মুক্তি। আর হঠাৎ চোখের সামনে দেখতাম স্ভিয়াতগর্স্কি মঠ*⁾, যেখানে গিয়েছিলাম আগের বসন্তে, দেখতাম দনেৎসের তীরে মঠের দেয়ালের সামনে নানা জায়গা থেকে আসা তীর্থযাত্রীরা সমবেত হয়েছে। বলে কয়ে যদি রাত কাটাতে পারি তার নিষ্ফল চেষ্টায় যাজকটির পিছু ঘুরছি চত্বরে, আর সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে দৌড়িয়ে কেটে পড়ল সব কিছু যেন হাওয়ায় ছড়িয়ে — হাত, পা, চুল আর জোব্বার প্রান্তদেশ। কী পাতলা নমনীয় দেহ তার! মেচেতা-পড়া কিশোরের মতো মুখ, সন্ত্রস্ত সবুজ চোখ, ফিকে সোনালী, নরম ফোলা ফোলা কোঁকড়ানো চুলের কী সুন্দর, অসাধারণ সম্ভার!... তারপর মনে পড়ত নীপারে আমার যাত্রার সেই বাসন্তী দিনগুলো। তখন মনে হয়েছিল সে যাত্রার শেষ নেই। স্তেপের কোথাও ভোর।... তারপর ট্রেনের শক্ত বেঞ্চে ঘুম ভেঙে গেল, কাঠ কাঠ বিছানা ও ঠাণ্ডায় সারা শরীরটা আড়ষ্ট। তাকিয়ে দেখলাম জমে যাওয়া সাদা জানলা দিয়ে কিছু চোখে পড়ে না — কোথায় এসে পড়েছি জানি না। মনে হল এই অনিশ্চয়তার মতো অপরূপ জিনিস আর কিছু নেই।... ভোরের সজাগতায় সমস্ত ইন্দ্রিয় শক্তি ধারালো। লাফিয়ে উঠে জানলা খুলে কনুইয়ে ভর দিলাম। সাদা সকাল, ঘন

সাদা কুয়াসা, বাসন্তী প্রভাত আর কুয়াসার গন্ধ, ট্রেন ছুটে চলেছে, আমার হাতে-মুখে ঝাপট মারছে যেন ভিজে কাপড়।...

১৪

একদিন কেন জানি না ঠিক সময়ে ঘুম ভাঙল না। জেগে উঠে নড়াচড়া না করে সামনে, জানলার দিকে, শীতের দিনের প্রশান্ত সাদা আলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম, বিরল একটা শান্তির বোধ, মন ও অন্তর ধীরস্থির, চারি-দিকের পরিবেশ অদ্ভুত ক্ষুদ্র ও সহজ বোধ হল। অনেকক্ষণ শুয়ে রইলাম এভাবে, ঘরটা ভারাক্রান্ত করল না আমার মনকে, অনুভব করলাম -- আমার চেয়ে অনেক ক্ষুদ্র সেটা, আমার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটা জিনিস। উঠে পড়ে মুখ-হাত ধুয়ে অভ্যাসমতো সস্তা লোহার খাটের শিয়ারে ঝোলানো ছোট আইকনটাকে প্রণাম জানালাম: আশ্চর্য ব্যাপার, সেই আইকনই এখনও আমার ঘরে: কালের প্রকোপে কঠিন, মসৃণ ঘন সবুজ কাঠের টুকরোয় সস্তা রুপোর কাজ করা, উঁচু জায়গাগুলো হল এব্রাহামের সঙ্গে খেতে বসা তিনটি দেবদূত — তাদের প্রকট প্রাচ্য, চকচকে চোখ রুপোর গোল গর্তগুলো থেকে চেয়ে আছে আমার দিকে অন্ধকার দৃষ্টিতে। আইকনটি আমার মা'র পরিবারে পুরুষানুক্রমে এ হাত থেকে ও হাতে চলে এসেছে, এটি তিনি আশীর্বাদ হিসেবে আমাকে দিয়েছিলেন যখন পৃথিবীতে যাত্রা শুরু করি, পিছনে যখন ফেলে রেখে আসি আমার শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের সেই কিছুটা কৃচ্ছ্রের বছরগুলি, আমার পার্থিব জীবনের

সেই অস্পষ্ট গোপন অধ্যায়টি, যেটি এখন আমার কাছে মনে হয় অত্যন্ত অসাধারণ, পুণ্য ও উপকথাসুলভ, কালের গুণে যেটি এখন একেবারে অন্য একটি জীবনে পরিণত হয়েছে, যে জীবনের কাছে এমনকি নিজেকে মনে হয় পরদেশী।... প্রণাম জানিয়ে বাইরে গেলাম কী একটা কিনতে, শুয়ে থাকার সময় সেটা কেনার কথা ভেবে-ছিলাম, পথে মনে পড়ে গেল গতরাত্রে দেখা একটি স্বপ্নের কথা: পিঠে পরবের সপ্তাহ, আবার আমি রস্তভ্‌ৎসেভ্‌দের সঙ্গে আছি, আর বাবা ও আমি সার্কাসে বসে কালো টাট্টু ঘোড়ার একটা দল দেখছি, মায় ছ'টা ঘোড়া দৌড়িয়ে এল খেলা-দেখানোর জায়গায়।... তাদের সবায়ের গায়ে ঝকঝকে তামা আর ঠুনঠুনে ঘণ্টা দেওয়া ছোট শৌখীন জিনসাজ, লাগাম মুখে জোর করে আঁটা, লাল মখমলের রাশ শক্তভাবে বাঁধা জিনে — মোটা ছোট ঘাড় বেঁকাচ্ছে তারা, ছাঁটা কেশর কালো বুরুশের মতো খোঁচা হয়ে উঠেছে ঘাড়ে, ঝুঁটিতে গোঁজা লাল পালক।... কদম চালে তাল রেখে পাশাপাশি ছুটেছে তারা — ঘণ্টা বাজিয়ে, কালো ঘাড় একরোখা রাগের ভাবে বেঁকিয়ে। আকারে ও রঙে সবাই খাপ খেয়েছে চমৎকার — প্রত্যেকের গা চওড়া, পা ছোট — হঠাৎ একগুঁয়ের মতো দাঁড়িয়ে পড়ে তারা খলীনে দাঁত বসিয়ে নাড়াতে লাগল পালক-গুলো।... ড্রেস-কোট পরা ম্যানেজারের বহু হাঁকডাকে ও বারবার চাবুক ঝাপটানোর চোটে অবশেষে তারা হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে দর্শকদের অভিবাদন জানাল, তারপর হাঁফ ছেড়ে বাদ্যযন্ত্রে হঠাৎ বেজে উঠল দ্রুত কদমচালের উচ্চকিত সুর আর ঘোড়াগুলো সার বেঁধে খেলা-

দেখানোর জায়গায় চক্কর মারতে লাগল, যেন বাজনা পিছু ধাওয়া করেছে এমনভাবে।... দোকানে গিয়ে কালো অয়েলক্লথের মলাট দেওয়া ভারি একটা খাতা কিনলাম। ঘরে ফিরে চা খেতে খেতে ভাবলাম: 'যথেষ্ট হয়েছে। এবার থেকে শুধু পড়ব আর মাঝে মাঝে নোট রাখব — বিভিন্ন চিন্তাভাবনা, অনুভূতি ও মন্তব্য — কোনো বিষয়ে দাবিদাওয়া না করে।...' কালিতে কলম ডুবিয়ে প্রথম পাতায় বড়ো বড়ো স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখলাম:

'আলেক্সেই আর্সেনিয়েভ। সংক্ষিপ্ত মন্তব্য।'

তারপর খাতায় কী লিখব অনেকক্ষণ ভাবলাম চুপচাপ বসে থেকে, সিগারেটে জোর টান দিলাম, কিন্তু মনে কোনো জ্বালা নেই — বিষণ্ণতা ও স্তব্ধতা শুধু, আর কিছু নয়। অবশেষে শুরু করলাম লিখতে:

'নামকরা তলস্তয়পন্থী প্রিন্স ন. পত্রিকা অফিসে এসে তুলায় ভুখা লোকেদের জন্য চাঁদা ও খরচের বিষয়ে তাঁর রিপোর্ট ছাপাতে বললেন। লোকটি বেঁটে, মোটাগোছের। ককেশাসী চেহারার বিচিত্র নরম টপবুট, আস্ত্রাখানী টুপি, ভেড়ার লোমের কলার দেওয়া ওভারকোট, — সব কিছু পুরনো, জীর্ণ কিন্তু দামী ও ফিটফাট — ছাই-রঙা ফিনফিনে শার্ট চামড়ার বেল্ট দিয়ে আঁটাতে গোলগাল ভুঁড়িটা স্পষ্ট, সোনালি প্যাঁশনে চোখে। বেশ বিনীত ভঙ্গি, কিন্তু দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার খারাপ লাগল তাঁর জমকালো চেহারা, দুধের মতো ধবধবে সাদা মাজা ঘষা মুখ আর শীতল চোখের দৃষ্টি। তক্ষুনি বিতৃষ্ণা হল লোকটির প্রতি। আমি অবশ্য তলস্তয়ের চেলা নই, তবু লোকে যা ভাবে তাও আমি নই। আমি চাই দুনিয়া ও

দুনিয়ার লোকে সুন্দর হোক, প্রেম ও আনন্দের খোরাক জোগাক, আর যা কিছু এর অন্তরায় তাতে আমার বিরাগ।

'সেদিন নল্‌খোভ্‌স্কায়া স্ট্রীটে হাঁটছি, দেখলাম: অস্তগামী সূর্য, পশ্চিমে হিম আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে, আর সেই সবুজ স্বচ্ছ হিম আকাশ থেকে সন্ধ্যার শুচি আলোর বন্যায় সারা শহর প্লাবিত — সে আলোর অদ্ভুত ব্যাকুলতা ভাষায় অবর্ণনীয়; আর ফুটপাথে ছিন্নভিন্ন জামাকাপড়ে শীতে কালিয়ে যাওয়া একটি বুড়ো অর্গান-বাদক দাঁড়িয়ে, অথর্ব যন্ত্রটার বাঁশির মতো শিসে, ঝংকারে আর হাঁপিয়ে পড়া আওয়াজে মুখর হয়ে উঠেছে হিম সন্ধ্যা, বেরিয়ে আসছে একটি রোমাণ্টিক সুর — সেই সুদূরের, সাবেক কালের বিদেশী সুরে মন ব্যথায় ভরে যায় অদ্ভুত স্বপ্নে আর অনুতাপে।...

'যেখানেই যাই, হয় বিভীষিকা নয় ব্যথা। দু'সপ্তাহ আগে দেখা একটি জিনিস এখনো স্পষ্ট মনে আছে। তখনো সন্ধ্যেবেলা, কিন্তু মেঘলা অন্ধকার। কিছু না ভেবে ছোট পুরনো একটি গির্জায় ঢুকে দেখলাম প্রার্থনাবেদীর কাছে অন্ধকারে মোমবাতির টিমটিমে আলো বেশ নীচুতে; আরো কাছে গিয়ে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে পড়লাম: তিনটি মোমবাতির ক্ষীণ বিষণ্ণ আলো পড়েছে পাশে কাগজের ফুল লাগানো একটি ছোট গোলাপী কফিনে, আলো হয়ে উঠেছে সেখানে শায়িত একটি ঢিপকপাল, ময়লা রঙের শিশু। মনে হত সে ঘুমিয়ে আছে যদি না চোখে পড়ত তার মুখের সেই চীনামাটিসুলভ রঙ, স্ফীত নিমীলিত চোখের পাতায় বেগনী ছোপ আর মুখের ত্রিভুজ, যদি তার মুখাবয়বে না থাকত ধরাধামের সব

কিছু থেকে সেই অতল শান্ত শাশ্বত বিচ্ছেদের ভাব!

'দুটো গল্প লিখেছি, ছাপা হয়েছে সেগুলো, কিন্তু দুটোরই সব কিছু কৃত্রিম ও অপ্রীতিকর: একটি হল ভুখা চাষীদের বিষয়ে, যাদের কখনো নিজের চোখে দেখি নি বলে সত্যিকার করুণা হতে পারে না, আর একটি ধ্বংসপ্রায় জমিদারের সেই খেলো প্রসঙ্গ — প্রথমটির মতোই অবাস্তব; অথচ আমি শুধু লিখতে চেয়েছিলাম গরীব একটি জমিদার, র.-মশাইয়ের সদর বাগানে দেখা প্রকাণ্ড রুপোলি পপলার গাছটির কথা, আর তাঁর পড়ার ঘরে বইয়ের আলমারির ওপর সেই খড়ঠাসা শিকারী বাজের কথা — নিশ্চল পাখিটা চিত্রবিচিত্র তামাটে ডানা মেলে চকচকে হলদে কাঁচের মতো চোখে তাকিয়ে থাকে, সর্বক্ষণ শুধু তাকিয়ে থাকে লোকের দিকে।... দেউলিয়াপনার কথা লিখতে হলে আমি শুধু লিখতাম তার কাব্যময়তার কথা। ছন্নছাড়া মাঠঘাট, কোনো জমিদার-বাড়ি ও বাগানের দীন ধ্বংসাবশেষ — চাকরবাকর, ঘোড়া ও শিকারী কুকুরের বিশেষ বালাই নেই, বুড়ো-বুড়ীরা, অর্থাৎ 'প্রবীণ মালিকেরা', জীবনের শেষ কটা দিন কাটাচ্ছে অন্দরের সংকীর্ণ ঘরে, কমবয়সীদের ছেড়ে দিয়েছে সামনের ঘরগুলো — এসব কিছু করুণ ও মর্ম-স্পর্শী। আর 'আলালের ঘরের দুলালেরা' কেমন ধরনের চীজ বর্ণনা করতাম — নিরক্ষর অকর্মণ্য তারা, ভিখারীর সামিল, তবু তারা ভাবে শুধু তাদেরই ধমনীতে প্রবহমান নীল রক্ত, তারাই হল সবচেয়ে উঁচু দরের একমাত্র কুলীন। তাদের টুপি, তেরছা কলারের শার্ট, সালোয়ার ও টপবুট।... একসঙ্গে জড়ো হলেই মদ্য ও

ধূমপান আর হামবড়াই। শ্যাম্পেনের পুরনো সুন্দর গেলাসে ভোদ্‌কা পান, বন্দুকে ফাঁকা গুলি ভরে জ্বালানো মোমবাতির দিকে চালানো হাসির হর্‌রার মধ্যে। 'আলালের ঘরের দুলালদের' একজন, প.-মশাই, তার লাটে-ওঠা জমিদারি ছেড়েছুড়ে দিয়ে বহু দিন অব্যবহৃত একটি জল-কলে গিয়ে কাঠের ঘরে বাসা বাঁধল রক্ষিতার সঙ্গে — মাগীটার নাক বলে পদার্থ প্রায় ছিল না। প.-মশাই হয় খড় বিছানো কাঠের তক্তায় বা 'বাগানে', অর্থাৎ কুঁড়েঘরের পাশে একটি আপেল গাছের তলায় রাত কাটাত তার সঙ্গে। আপেল গাছের একটি ডালে টাঙ্গানো ভাঙা আয়নায় প্রতিফলিত হত সাদা মেঘ। আর কিছু করার ছিল না বলে লোকটি বসে বসে জল-কলের পাশের পুকুরে চাষীদের হাঁস লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়ত, যতবার ঢিল পড়ত জলে ততবার হাঁসের ঝাঁক পাখা ঝাপটে উঠে ভয়াবহ চিৎকারে পাড়া কাঁপিয়ে উড়ে যেত পুকুরের ওপর দিয়ে।

'বুড়ো, অন্ধ, আমাদের এককালে ভূমিদাস গেরাসিম অন্য সব অন্ধদের মতো মুখ তুলে হাঁটত, যেন যেতে যেতে কী একটা শুনছে কান পেতে। গাঁয়ের শেষে একটা ছোট কুঁড়েঘরে একেবারে একা থাকত সে, সাথী বলতে ছিল শুধু গাছের ছালের খাঁচায় অস্থির একটি ভারুইপাখি — দিনের পর দিন খাঁচা থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টায় ও মাথা ঠুকে ঠুকে চলল। চোখে দেখতে না পেলেও গ্রীষ্মকালের প্রতিটি দিন ভোরবেলায় ভারুই ধরতে যাওয়া চাই গেরাসিমের। অন্ধ মুখে নরম হাওয়ার স্পর্শ, মাঠঘাট থেকে ভেসে আসছে তাদের ডাক, ভারি ভালো লাগত

তার। সে বলত দুনিয়ার সবচেয়ে মধুর জিনিস হল সেই রোমাঞ্চকর মুহূর্তগুলি যখন ভারুই পাখি জালের কাছে এসে থেকে থেকে ডাকে আরো জোরে, আরো তীব্র আবেগে, পাখি-ধরিয়ের পক্ষে আরো ভয় ধরিয়ে। সত্যিকার কবি ছিল বটে গেরাসিম!'

১৫

অফিসে গিয়ে লাঞ্চ খেতে ইচ্ছে হল না। গেলাম মস্কোভ্স্কায়া স্ট্রীটের একটি পান্থশালায়। কয়েক গেলাস ভোদ্কা ও একটি হেরিং মাছ খেলাম, প্লেটে মাছটার চেপটা মাথা দেখে ভাবলাম: 'হেরিংয়ের গাল যেন মুক্তো, এটা টুকে না রাখলে চলবে না।' তারপর খেলাম চড়বড়ে সোলিয়ান্কা*। জায়গাটা ভিড়-ঠেসা, নীচু ঘরটায় গোলাপিঠে, ভাজা মাছ ও জ্বলন্ত চর্বির গন্ধ, পিঠ বেঁকিয়ে, নেচে, মাথা পেছনে হেলিয়ে ছুটোছুটি করছে ওয়েটাররা, আর তাদের মালিক—মূর্তিমান রুশী চরিত্র—কাউণ্টারের পেছনে ছবির মতো ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে প্রত্যেককে দেখছে তীক্ষ্ন তেরছা নজরে, ধর্মভীরু কড়া গোছের লোকের যে ভূমিকা এতদিন তার বেশ রপ্ত তারই ঢং-এ; দাঁড়কাকের মতো দেখতে কালো পোশাক পরিহিতা ছোটখাটো মঠবাসিনীরা চামড়ার ফিতের বাঁধন লাগানো ভারি জুতো পায়ে ব্যবসায়ীদের টেবিলগুলোর মাঝখানে আস্তে আস্তে গিয়ে মাথা নীচু করে নিঃশব্দে এগিয়ে ধরছে মলাটে রুপোলি ক্রুশ

* বাঁধাকপি ও মাংস অথবা সসেজের রান্না একটা পদ।

আঁকা তাদের ছোট ছোট কালো পুস্তিকা*, আর ব্যবসায়ীরা ভুরু কুঁচকে সবচেয়ে খারাপ কোপেকগুলো বের করছে ব্যাগ থেকে।... মনে হল এসব কিছু আমার স্বপ্নের খেই টেনে চলেছে; আর ভোদ্‌কা, সেলিয়ান্‌কা ও শৈশবস্মৃতির ভারে একটু বুঁদ হওয়াতে চোখে প্রায় জল এসে গেল।... হোটেলে ফিরে গেলাম, শুয়ে পড়ে ঘুম বিষাদ ও ঝাপসা অনুতাপে ভরা মনে যখন জেগে উঠলাম তখন গোধূলি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে অপ্রসন্নভাবে লক্ষ্য করলাম চুল বড়ো লম্বা আর কবি-কবি গোছের। নাপিতের দোকানে গেলাম। দেখলাম সাদা কাপড় চাপানো বেঁটে মতো একটি লোক — মাথায় টাক, কানদুটো উঁচনো — ঠিক যেন বাদুড় — তার ঠোঁটের ওপর আর গালে নাপিত অদ্ভুত পুরু ফেনা তুলে সাবান ঘষছে। ওস্তাদের মতো ক্ষুর দিয়ে সমস্ত সাদা জিনিসটা সরিয়ে আর একবার মুখে সাবানের স্বল্প প্রলেপ দিয়ে দাড়ি কামানো হল আবার, এবার বেপরোয়া, সংক্ষিপ্ত ওপর পোঁচে। বাদুড়প্রবর পা ফাঁক করে উঠে সাদা কাপড়টা সুদ্ধ টেনে এক হাতে সেটাকে বুকে চেপে অন্য হাতে টকটকে লাল মুখটা ধুয়ে ফেলল।

'একটু ও-ডি-কলোন দেব নাকি, স্যার?' নাপিত জিজ্ঞেস করল।

'ঢাল,' বলল বাদুড়প্রবর।

* এই মঠবাসিনীরা মঠের প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহ করত। যে পুস্তিকার কথা এখানে বলা হয়েছে তা ছিল এক ধরনের প্রমাণপত্র।

সেণ্টের স্প্রে হিস্‌হিসিয়ে উঠল, তারপর ন্যাপকিন দিয়ে বাদুড়ের ভিজে গাল আস্তে ঘষল নাপিত।

'বাস,' চটপটভাবে বলে সাদা কাপড়টা ঝট করে সে সরিয়ে নিল। বাদুড়প্রবর উঠে দাঁড়াতে ভয়াবহ চেহারাটা স্পষ্ট দেখা গেল: লম্বকর্ণ বিরাট মাথা, লাল মরক্কো রঙের চওয়া রোগা মুখ, দাড়িগোঁফ পরিষ্কার কামানো সে মুখের চোখদুটো শিশুর চোখের মতো জ্বলজ্বলে, হাঁ-টা কালো গর্তের সামিল, লোকটা বেঁটে, চওড়া কাঁধ, মাকড়সা গোছের খর্ব দেহ আর লিকলিকে পা, পাদুটো তাতারদের মতো বেঁকা। নাপিতের হাতে বখশীশ গুঁজে দিয়ে উৎকৃষ্ট কালো একটা ওভারকোট ও বোলার টুপি চাপিয়ে লোকটি চুরুট ধরাল, তারপর গেল বেরিয়ে। আমার দিকে ফিরে নাপিত বলল:

'এঁকে চেনেন নাকি? ইনি হলেন ব্যবসাদার ইয়েমা-কভ। এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড়লোক। জানেন, হামেশা কত বখশীশ দেন আমাকে? এই দেখুন।'

আঙুল ফাঁক করে দেখিয়ে ফুর্তির হাসি হেসে বলল:

'পুরোপুরি দু'কোপেক!'

আমি তারপর অভ্যেসমতো রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। গির্জা একটি চোখে পড়াতে ভেতরে ঢুকলাম। নিঃসঙ্গতা ও বিষাদের ফলে গির্জায় যাওয়া অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ভেতরটা গরম, উজ্জ্বল মোমবাতির দরুন একটা উদাস উৎসবের ভাব, নকল রুবি বসানো তামার ক্রুশ প্রার্থনা পাঠের ও সঙ্গীতের ডেস্কে, চারধারে দীর্ঘ বাতিদানে মোমবাতির ঝাড়ের ঝকঝকে আলো, ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে যাজক ও ডিকনরা করুণ টানা

টানা সুরে বলে চলেছে: 'হে স্বর্গাধিপতি, ভক্তি জানাই তোমার ক্রুশকে...' দরজার ধারে অন্ধকারে লম্বা সুতির কোট গায়ে চামড়ার জুতো পায়ে একটি বৃদ্ধ। বুড়ো ঘোড়ার মতো বলিষ্ঠ ও কর্কশ লোকটি (যেন কাউকে নৈতিক উপদেশ দিচ্ছে) যাজকদের প্রার্থনায় ধুয়া ধরে কঠোর গুনগুনানিতে। ডেস্কের কাছে ভিড়ের মধ্যে মোমবাতির উষ্ণ সোনালী আলোয় স্নাত একটি বৃদ্ধ তীর্থযাত্রী দাঁড়িয়ে। সন্ন্যাসীর মতো ক্ষীণদেহ তার, প্রাচীন আইকনের মতো কালো ও সূক্ষ্ম তার মুখ প্রায় ঢাকা পড়েছে দু'গালে আদিম শুচিতায় ঝুলে পড়া দীর্ঘ কালো মেয়েলি চুলের গোছায়: বাঁ হাতে দৃঢ় মুঠিতে ধরা লম্বা লাঠি — বহু বছর ব্যবহারের ফলে মসৃণ চকচকে, কালো চামড়ার থলি পিঠে; সকলের থেকে দূরে সে দাঁড়িয়ে আছে, কোনো নড়াচড়া নেই, সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন। তার দিকে তাকিয়ে আমার চোখ জলে ভরে এল — আমার দেশ রাশিয়ার কথা ভেবে, প্রাচীন অন্ধকার রাশিয়ার কথা ভেবে মন কেমন করে উঠল, আচ্ছন্ন হয়ে গেল বিষাদে। কে যেন মোমবাতি দিয়ে পিঠে অল্প টোকা দিল: ঘুরে দেখলাম — আনত দেহ একটি বৃদ্ধা, পরনে তার ক্লোক ও শাল, খালি মাড়ি থেকে উঁচিয়ে আছে একটি শুধু দাঁত: 'ক্রুশের জন্য কিছু দাও, বাছা!' খুশি হয়ে ব্যগ্রভাবে, তার নীলচে নখ ঠাণ্ডা অসাড় হাত থেকে মোমবাতিটি নিয়ে চোখ-ঝলসানো বাতিদানির দিকে এগোলাম অস্বস্তিভরে, আর লজ্জা হল অস্বস্তির জন্য। কোনোক্রমে মোমবাতিটা অন্যান্য মোমবাতির মধ্যে দাঁড় করিয়ে হঠাৎ ভাবলাম: 'ভেগে যাই!' প্রার্থনার ডেস্ক থেকে

সরে এসে, ক্রুশে প্রণাম জানিয়ে দ্রুত সাবধানে গেলাম অন্ধকার দরজার দিকে, পিছনে পড়ে রইল গির্জার স্নিগ্ধ মধুর আলো ও উষ্ণতা। বাইরে বিরস অন্ধকার, উপরে হাওয়ার হাহাকার।... 'আমি চললাম!' — মনে মনে বলে টুপিটা পরলাম। ঠিক করলাম স্মলেন্‌স্কে*) যাব।

স্মলেন্‌স্কে কেন? তার কারণ হল ব্রিয়ান্‌স্ক, ব্রিয়ান্‌স্কের অরণ্য*) ও ব্রিয়ান্‌স্কের ডাকাতদের বিষয়ে আমার স্বপ্ন।... কোন এক গলিতে একটি সরাইখানায় ঢুকে পড়লাম। একটা টেবিলে হতচ্ছাড়া গোছের একজন প্রায় শুয়ে পড়ে গলা ফাটিয়ে গান গাইছে, ভাবখানা তার মাতালের — নিজের সর্বনাশে কাঁদুনে আনন্দের যে অভিনয় রুশীদের অতিশয় প্রিয় তার মহড়া চলেছে — তারস্বরে গাইছে: 'সর্বনেশে ভুলের ফলে ভাই হাতে পড়েছে হাতকড়া!' পাশের টেবিলে মাথা খাড়া করে কালো ফাঁকা ফাঁকা গোঁফ একটি লোক বিতৃষ্ণাভরে তাকে দেখছে; লম্বা গলা ও পাতলা চামড়ার নীচে নড়ন্ত তার বড়ো, খুঁচিয়ে ওঠা কণ্ঠা থেকে মনে হয় লোকটা নির্ঘাত চোর। বারের কাছে নেশায় বুঁদ হয়ে দুলছে লিকলিকে পায়ে সাপটে বসা জীর্ণ পোশাকে একটি ঢ্যাঙ্গা মেয়েমানুষ — ধোবানী হবে সম্ভবত: কে একটা লোক কত নচ্ছার সেটা বোঝাবার চেষ্টা করছে বারের লোকটিকে বার-কাউন্টারের ওপর হাত চাপড়ে — বড়ো বেশী কাচা-ধোওয়ার ফলে নখগুলো কাঁচের মতন চকচকে; কাউন্টারে এক গেলাস ভোদ্‌কা, মাঝে মাঝে সেটা তুলে না খেয়েই ধরে থেকে — আবার নামিয়ে বকে চলেছে কাউন্টারে আঙুলের টোকা দিয়ে। ভেবেছিলাম বিয়ার

নেব, কিন্তু জায়গাটার আবহাওয়া অত্যন্ত ভ্যাপসা ও নোংরা, বাতির আলো বড়ো টিমটিমে, আর ছোট, জমে-যাওয়া জানলাগুলোর ধারিতে পচধরা কয়েকটা ময়লা কাপড়ের টুকরো চুইয়ে গলন্ত বরফের জল ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ছে মেঝেতে।...

দুর্ভাগ্যক্রমে ডাইনিং-রুমে আভিলভা কয়েকটি অতিথিকে আপ্যায়ন করছিল। — 'এই যে, আমাদের প্রিয় কবি দেখছি!' — সে বলে উঠল। — 'আলাপ নেই?' — তার হাতে চুমো খেলাম, সবায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল আমাকে। তার পাশে সকালের কোট ও সাদা সিল্কের ওয়েস্ট-কোট পরিহিত একটি কুঞ্চিতচর্ম বৃদ্ধ — খাসা ছাঁটা গোঁফে বাদামি কল্প, টেকো মাথা ঢাকা বাদামি পরচুলায়; চটপট দাঁড়িয়ে উঠে মহাসৌজন্যে যেরকম ক্ষিপ্রভাবে নীচু হয়ে অভিবাদন জানালেন সেটা তাঁর বয়সের পক্ষে আশ্চর্য। তাঁর কোটের প্রান্তদেশ কালো সুতোর বিনুনিতে মুড়ি দেওয়া — জিনিসটা আমার পছন্দ বরাবর, যাঁদের এরকম কোট আছে তাঁদের ওপর হিংসে হত, আমারও ওরকম একটা হবে স্বপ্ন দেখতাম। বৃদ্ধের পাশে বসে একটি মহিলা চালাক চতুর কথাবার্তার অনর্গল ফোয়ারা বইয়ে দিয়েছেন — শক্ত গোলগাল হাত এগিয়ে দিলেন আমার দিকে, যেন সেটা সীলমাছের ডানা, চকচকে মেদল হাতে দস্তানার ধারের খাঁজের ছাপ। কথাবার্তা ভালোই বলেন ভদ্রমহিলা, ক্ষিপ্র ও সামান্য হাঁপ-ধরাভাবে; গলা বলে পদার্থের বালাই নেই, গায়ে চর্বি একটু বেশী, বিশেষ করে পেছন দিকটায় বগলের কাছে, কটিরেখা কর্সেটের চাপে পাথরের মতো গোল আর কঠিন, কাঁধে

ঝুলিয়েছেন ধোঁয়াটে-তামাটে রঙের ফার, তার গন্ধ পশমের পোশাক ও উষ্ণ দেহ সেণ্টের মধুর সৌরভের সঙ্গে মিশে অত্যন্ত গুমোট।

দশটার সময় অতিথিরা উঠে গৃহকর্ত্রীকে অনেক কিছু মিষ্টি কথা বলে বিদায় নিলেন।

'বাঁচলাম, বাবা!' খুশির হাসি হেসে বলে উঠল আভিলভা। 'চলুন, আমার ঘরে গিয়ে বসা যাক। এখানকার জানলাটা খুলে দেওয়া উচিত।... কিন্তু, বলুন তো, আপনার কী হয়েছে?' স্নিগ্ধ ভর্ৎসনার সুরে বলল, দুটো হাত আমার দিকে বাড়িয়ে।

হাতে চাপ দিয়ে বললাম:

'কাল চলে যাচ্ছি।...'

সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল সে:

'কোথায়?'

'স্মলেন্স্কে।'

'কেন?'

'এভাবে থাকা আমার আর চলে না।...'

'কিন্তু স্মলেন্স্কে কেন? বসুন।... আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না।...'

সোফায় দু'জনে বসলাম, সোফায় পাতলা ডোরাকাটা গ্রীষ্মকালীন একটা ঢাকনা।

'এই ঢাকনাটা দেখছেন?' আমি বললাম। 'রেলের সীটের ঢাকনার মতো। ধীরভাবে এটার দিকে তাকাতে পর্যন্ত আমি পারি না, এত ইচ্ছে হয় চলে যাবার।'

আভিলভা সোফায় হেলে আরো ভালো করে বসাতে ওর পাদুটো চোখে পড়ল।

'কিন্তু স্মলেন্স্কে কেন?' বিস্মিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করল।

'সেখান থেকে ভিতেব্স্ক*)... পলোৎস্ক...*)'

'কিন্তু কেন?'

'জানি না। প্রথমত, জায়গাগুলোর নাম আমার সুন্দর লাগে: স্মলেন্স্ক, ভিতেব্স্ক, পলোৎস্ক...'

'তামাসা রাখুন, সত্যি বলুন তো কেন?'

'তামাসা করছি না। কয়েকটা শব্দের আওয়াজ কী অদ্ভুত সুন্দর, জানেন তো? আগেকার দিনে স্মলেন্স্ক কতবার দগ্ধ, কতবার না ঘেরাও হয়েছে।... কেন জানি না, সত্যি মনে হয় শহরটার সঙ্গে আমার যোগসূত্র আছে। জানেন, একবার ওখানকার ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রাচীন কয়েকটি দলিলপত্র পুড়ে যায়, ফলে আমাদের বংশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়ভাগ ও বিশেষ অধিকার আমরা হারাই।...'

'দিন আর কাটে না! ওর জন্যে খুব মন কেমন করছে বুঝি? আপনাকে চিঠিপত্র দেয় না?'

'না, লেখে না, কিন্তু সেটা বড়ো কথা নয়। মোটামুটি ওরিওলের জীবনযাত্রা আমার ধাতে সয় না। 'যাযাবর হরিণ জানে কোথায় তার চারণভূমি।...' আমার সাহিত্যিক চেষ্টাও একেবারে কাজ দিচ্ছে না। সারা সকাল ওখানে বসে থাকি, মাথায় ছাইভস্ম ছাড়া কিছু নেই, যেন পাগল। আর কিসের দরুন বেঁচে আছি, জানেন? আমাদের ওখানে বাতুরিনোতে একটি দোকানদারের যে কন্যা আছে, বিয়ের আশা সে বিলকুল ছেড়ে দিয়েছে, বেঁচে আছে শুধু তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে মন্দ দেখার বুদ্ধিতে। আমারও হাল সেরকম।'

'আপনি এখনো নেহাৎ শিশু!' সস্নেহে বলে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল আভিলভা।

'একেবারে নীচু স্তরের প্রাণীরাই তাড়াতাড়ি বড়ো হয়.' আমি বললাম। 'তাছাড়া, শিশু কে বা নয়? একবার ইয়েলেৎস্ক মহকুমা আদালতের একটি সদস্যের সঙ্গে ওরিওল পর্যন্ত একসঙ্গে গিয়েছিলাম — বেশ মানী, গম্ভীর প্রকৃতির ভদ্রলোক, দেখতে ইস্কাপনের রাজার মতো।... বসে বসে 'নোভয়ে ভ্রেমিয়া'*) পড়ছিলেন, তারপর উঠে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে উধাও হয়ে গেলেন। চিন্তিত বোধ করে আমিও বাইরে গিয়ে কামরার শেষে বারান্দার দরজাটা খুললাম। ট্রেনের গর্জনের দরুন ভদ্রলোক আমার উপস্থিতি টের পেলেন না — কী দেখলাম জানেন? খুব ক্ষিপ্র তালে নাচছিলেন, ট্রেনের চাকার শব্দে তাল রেখে অত্যন্ত জটিল সব পায়ের কাজ দেখাচ্ছিলেন।'

আমার দিকে চোখ তুলে সে হঠাৎ বলল নরম গলায়, অর্থঘন সুরে:

'আমার সঙ্গে মস্কো যাবেন?'

ভীষণ আতঙ্কের একটি রোমাঞ্চকর অনুভূতি বোধ করলাম।... লাল হয়ে উঠে আমতা-আমতা ক'রে বললাম 'না' আর ধন্যবাদ জানালাম।... আজও সেই মুহূর্তটি মনে পড়ে বিষম লোকসানের যন্ত্রণায়।

১৬

পরের দিন রাত্রে চলেছি, ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর একটি নির্জন কামরায়। একেবারে একা, একটু ভয় হচ্ছে এমনকি।

কাঠের বেঞ্চে কে'পে কে'পে পড়ছে একটি লণ্ঠনের অস্পষ্ট বিষণ্ণ আলো। কালো জানলার সামনে দাঁড়িয়ে দু'হাতে আলো থেকে মুখ আড়াল করে একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছি রাত্রির দিকে, বনের দিকে, কালো জানলার অদৃশ্য ফুটো থেকে আসছে কনকনে ঠাণ্ডা তাজা হাওয়া। ঝাঁকে ঝাঁকে লাল মৌমাছি হাজারে হাজারে উড়ে চলে যাচ্ছে, তীরের মতন উড়ে গিয়ে ছাড়াছাড়ি হয়ে মিশে যাচ্ছে শীতের ঠাণ্ডায়, সে ঠাণ্ডায় ধূপ ও ইঞ্জিনের পোড়া কাঠের গন্ধ।... আরণ্যক এই রাত্রিটা রূপকথার মতো কী অন্ধকার, কী মহিমময়, কী কঠোর! অন্তহীন সংকীর্ণ পথ বন কেটে গেছে, দু'ধারে নিবিড় বনের ঘনিষ্ঠ সারিতে জমাট বহু প্রাচীন গাছের বিরাট অন্ধকার প্রেতমূর্তি। লাইনের পাশে বনের পাদদেশে সাদা বরফের স্তূপে আড়াআড়িভাবে পড়ছে জানলার আলোকিত আয়তক্ষেত্র, থেকে থেকে ক্ষিপ্র গতিতে ছুটে চলে যাচ্ছে টেলিগ্রাফের খুঁটি — আর ওপরে ও দূরে সব কিছু অন্ধকারে ও রহস্যে সমাবৃত।

সকালে ঘুম ভাঙল হঠাৎ, শক্তির একটা উচ্ছ্বাসে: চারিদিক ফরসা ও চুপচাপ, ট্রেন থেমেছে, স্মলেন্স্কে এসে গেছি, স্টেশনটা বড়ো। ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে লোভীর মতো বুক ভরে নিলাম টাটকা হাওয়া।... স্টেশনের কাছে কী একটা ঘিরে ঠেসাঠেসি লোকের ভিড়। তাড়াতাড়ি গেলাম সেখানে: বুনো শুয়োর একটা, শিকারে মারা পড়েছে — প্রকাণ্ড বলিষ্ঠ জানোয়ারটা ঠাণ্ডায় জমে আড়ষ্ট, দেখতে তবু ভয়ংকর, সারা শরীরে পাঁশুটে রঙের খোঁচা খোঁচা ঘন লোমের দীর্ঘ ডগায় শুকনো বরফের গুঁড়ো; চোখদুটো পোষা শুয়োরের মতো, চাপা মুখ থেকে

বেরিয়ে আছে দুটো ধারালো সাদা দাঁত। 'এখানে থেকে যাব?' ভাবলাম। 'না, আরও দূরে যাওয়া যাক, ভিতেব্স্কে!'

সেখানে যখন পৌঁছলাম তখন হিমেল স্বচ্ছ সন্ধ্যা। সব কিছু গভীর তুষারাবৃত, নিঃশব্দ, পরিষ্কার ও অপাপবিদ্ধ, শহরটাকে দেখে মনে হল প্রাচীন ও অরূশী: দীর্ঘ সব বাড়ি, সেগুলো মিলেছে তীক্ষ্মাগ্র ছাদে। ছোট ছোট জানলা, একতলার মেঝেতে বেশ খানিকটা কেটে বসানো অর্ধবৃত্তাকার মোটা ফটক। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে লম্বা ফ্রক-কোট, সাদা মোজা ও ফিতে-দেওয়া বুট পরিহিত কয়েকটি বৃদ্ধ ইহুদী, তাদের জুলফি ভেড়ার বাঁকা বাঁকা শিঙের মতন, মুখ তাদের নিরক্ত বিষণ্ণ, জিজ্ঞাসু চোখ প্রায় যেন কালো। শহরের প্রধান রাস্তাটা হেঁটে বেড়াবার জায়গা — ফুটপাথে গজেন্দ্র-গমনে চলেছে বিস্তর গোলগাল মেয়ে, মফস্বলের ইহুদীসুলভ জাঁকে তারা সজ্জিত ফিকে নীল, বেগুনি বা গার্ণেট পাথরের মতো লাল পুরু মখমলের কোটে। তাদের পিছু পিছু কিন্তু সাবধানে দূরত্ব রেখে হাঁটছে যুবকেরা — মাথায় বোলর টুপি পরলেও জুলফি তারা ছাড়ে নি, ছোকরাদের মুখের প্রাচ্য সৌন্দর্যে কুমারীসুলভ একটা পেলব সুডৌল ভাব, গালে দাড়ির রেশমী রেখা, চোখ হরিণের মতো অলস।... মন্ত্রমুগ্ধ যেন চললাম ভিড়ের মধ্যে, সুন্দর অভিনব শহরটাকে মনে হচ্ছিল কত প্রাচীন।

অন্ধকার ঘনিয়ে এল, একটা চকে এসে দেখলাম একটি হলুদ রোমান-ক্যাথলিক গির্জা। তাতে দুটি ঘণ্টাঘর। ভেতরে ঢুকে দেখি আধো-আলোয় বেঞ্চের সারি, আর

সামনে উপাসনার টেবিলে অর্ধবৃত্তাকারে রাখা ছোট ছোট মোমবাতি। তক্ষুনি ওপর থেকে কানে এল অর্গানের মন্থর আত্মনিমগ্ন শব্দ — স্নিগ্ধ মসৃণ তার প্রবাহ। তারপর আওয়াজটা বেড়ে ক্রমশ উঁচু, কর্কশ ও ধাতব হল — কাঁপা কাঁপা, ঘষার মতো একটা আওয়াজ, যেন দম বন্ধ করা কী একটার হাত এড়াবার চেষ্টা করছে শব্দগুলো, তারপর হঠাৎ হাত ছিনিয়ে মহান, স্বর্গীয় সঙ্গীতে মুখর হয়ে উঠল।... সামনে যেখানে প্রদীপের কম্পমান শিখা সেখানে অনুচ্চ কণ্ঠের ওঠানামা, আনুনাসিক সুরে লাটিন ভাষায় আবৃত্তি। প্রদোষের আলোতে বুঝতে পারলাম কয়েকটি বর্মাবৃত প্রতিমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে পাথরের থামগুলোর দু'পাশে কালো প্রেতের মতন সার বেঁধে, থামগুলো অদৃশ্য হয়েছে ওপরের অন্ধকারে। বেদীর ওপর অনেক উঁচুতে রঙীন কাঁচের বড়ো জানলাটা আধো-অন্ধকার হয়ে উঠছে।...

১৭

সেদিন রাত্রেই পিতার্সবুর্গে রওনা হলাম। গির্জা থেকে বেরিয়ে পলোৎস্কের ট্রেন ধরার জন্য ফিরে গেলাম স্টেশনের দিকে: ইচ্ছে ছিল সেখানে কোনো পুরনো হোটেলে থেকে যাব, কেন জানি না মনে হয়েছিল সেখানে দিন কতক কাটাই সম্পূর্ণ নিরালায়। বেশ রাত্রে ছাড়ার কথা পলোৎস্কগামী ট্রেনের। স্টেশনটা ফাঁকা, অন্ধকার। কাউন্টারে একটি মাত্র নিদ্রালস বাতির আলোয় রেস্তোরাঁটা আলোকিত, এত ছেড়ে ছেড়ে দেয়াল-ঘড়ির টিক্ টিক্

শব্দ হচ্ছে যে মনে হল সময়ের স্রোতটা শেষ হতে চলেছে। গুমোট স্তব্ধতায় সেখানে একেবারে একা বসে রইলাম কত কাল। অবশেষে সামোভার জ্বালানোর গন্ধ এল, আলো ও জীবনের সাড়া শুরু হল স্টেশনে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে, কী করছি না জেনেই পিতার্সবুর্গের টিকিট কাটলাম।

ভিতেব্স্ক রেলওয়ে স্টেশনে পলোৎস্কের ট্রেনের জন্য অন্তহীন প্রতীক্ষায় বসে থাকার সময় চারিপাশের সব কিছু থেকে আমার ভয়াবহ বিচ্ছিন্নতা টের পেয়েছিলাম, অবাক ও বিব্রত লেগেছিল — এসবের মানে কী, কেন আমি এসবের মধ্যে বসে আছি, কেন? নিঃশব্দ, আবছা অন্ধকার সেই রেস্তোরাঁ, কাউণ্টারে নিদ্রালস বাতির আলো, ডাইনিং-রুমের ছায়াচ্ছন্ন বিস্তার, তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ, সব রেলওয়ে স্টেশনে যেমন, তেমনি কুরুচির সঙ্গে সাজানো টেবিলটা ঘরের মাঝখানের প্রায় সমস্তটা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে, বেখাপ্পা ঝুলে-পড়া টেল-কোট গায়ে ঘুম জড়ানো সেই বক্রদেহ বুড়ো ওয়েটার সামোভার জ্বালানোর ঝাঁঝালো গন্ধ ঘরে ছড়িয়ে পড়াতে পা টেনে টেনে বেরিয়ে এল কাউণ্টারের পেছন থেকে, বুড়োদের আক্রোশ ভরা বেঢপ ভঙ্গিতে দেয়ালের গায়ে সার বেঁধে দাঁড় করানো চেয়ারগুলোতে উঠে কম্পিত হাতে ম্যাড়মেড়ে কাঁচের গ্লোবে দেয়াল-বাতিগুলো জ্বালিয়ে দিল।... তারপর দীর্ঘদেহ এক সশস্ত্র পুলিস অবজ্ঞাভাবে বুটের কাঁটা খটখটিয়ে রেস্তোরাঁ হয়ে বেরিয়ে গেল প্ল্যাটফর্মে, তার মেঝে পর্যন্ত লম্বিত ফৌজী ওভারকোটের ফাঁকটা দেখে মনে পড়ে গেল দামী পালের ঘোড়ার লেজের কথা — অর্থ কী এসবের? কেন এসব? কিসের জন্য? আর বাইরে

যাবার সময় পুলিস দরজা খোলাতে ঘরে ঢুকল ঠাণ্ডা তুষার রাত্রির যে তাজা ঝলক, তার সঙ্গে এসবের কোনো মিলই নেই। সেই মুহূর্তে, আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়ে হঠাৎ, অজ্ঞাত কোনো কারণে ঠিক করে ফেললাম পিতার্সবুর্গে যাব।

শীতের বৃষ্টি নেমেছে পলোৎস্কে, রাস্তাগুলো ভিজে, কুৎসিত। দুটি ট্রেনের ফাঁক দিয়ে শহরটি দেখে নিজের হতাশায় খুশি লাগল। ট্রেনে যেতে যেতে লিখলাম: 'দিনটার শেষ নেই। তুষার ও অরণ্যাবৃত অন্তহীন প্রসার। জানলার বাইরে শুধু পাণ্ডুর আকাশ ও বরফ। বনে ঢুকলে ট্রেনের ভেতরটা অন্ধকার, তারপর ট্রেন আবার বেরিয়ে আসে তুষারাবৃত সমভূমির বিরস বিস্তারে, আর চোখে পড়ে দূর দিগন্তে অরণ্যপুঞ্জের ওপর আনত আকাশে সীসের মতো ঝাপসা কী একটা ভেসে আছে। সবকটা স্টেশন কাঠের তৈরী।... উত্তর, উত্তরাঞ্চল!'

সুদূর উত্তরাঞ্চল মনে হল পিতার্সবুর্গকে। ঘনীভূত তুষার-ঝড়ের মধ্য দিয়ে গাড়োয়ান সবেগে গাড়ি হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে লিগভ্কা স্ট্রীটে নিকলায়েভ্স্কি স্টেশনের*) দিকে। রাস্তাগুলোর সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য অসাধারণ মনে হল। সবে বেলা দুটো, কিন্তু স্টেশনের ইমারতে গোল ঘড়িটা আলোকিত হয়ে ঝকঝক করছে তুষার-ঝড়ে। থামলাম ঠিক বাড়িটার সামনে, লিগভ্কার অন্য দিকটায়, খাল বরাবর। জঘন্য জায়গাটা — কাঠের গুদাম, গাড়োয়ানদের আস্তানা, চায়ের দোকান, সরাইখানা ও বিয়ার খাবার জায়গা। গাড়োয়ান যে হোটেলটার গুণগান করেছিল, সেখানে অনেকক্ষণ বসে

রইলাম ওভারকোট না খুলে, ছ'তলার অসম্ভব বিরস জানলা থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে রইলাম গোধূলির আলোয় ঘোলাটে বরফের দিকে। ট্রেনের দোলায় ক্লান্তিতে মাথা ঘুরছিল।... এই তাহলে পিতার্সবুর্গ! অত্যন্ত প্রখরভাবে মনে হল: অন্ধকার ও ভয়ঙ্কর মহিমায় আচ্ছন্ন এই শহরে তাহলে আমি উপস্থিত। পশমের পুরনো পর্দা, তারই সঙ্গে রঙ মেলানো সোফার চাদরের, ও হোটেলের শস্তা ঘরে যে লাল জিনিস দিয়ে মেঝে পালিশ করা হয়, তার কটুগন্ধে ঘরটা অত্যন্ত গরম ও গুমোট। বাইরে গিয়ে খাড়া সিঁড়ি ধরে তড়তড় করে নেমে গেলাম। রাস্তায় যেতেই দুর্ভেদ্য, ঘুরপাক-খাওয়া বরফের হিম আঘাত, তুষার-ঝড়ের ঝাপসা অন্ধকারে একটা স্লেজ দেখতে পেয়ে সেটা নিয়ে তীরের মতন গেলাম ফিনল্যান্ড স্টেশনে, বিদেশের অনুভূতি লাভের জন্য। সেখানে চটপট নেশায় বুঁদ হয়ে ওকে একটা টেলিগ্রাম করে দিলাম:

'পরশুদিন আসছি।'

বিরাট, প্রাচীন ও জনসংকুল মস্কো আমাকে অভ্যর্থনা করল ঝকঝকে আলো, গলন্ত বরফ, জলধারা ও ডোবা, ঘোড়ার টানা ট্রামের উচ্চকিত ঘড়ঘড়, পদচারী ও নানা গাড়ির গোলমেলে বিশৃংখলা, জিনিসপত্রে বিষম বোঝাই কত না মালবাহী স্লেজ, নোংরা সরু গলি, প্রাচীর, প্রাসাদ ও অন্যান্য বাড়িসুদ্ধ মনোহরা ছাপা ছবির মতো ক্রেমলিন, আর গির্জার ঝকঝকে সোনালি গম্বুজের ছড়াছড়ি দিয়ে। অবাক লাগল সেন্ট বাসিলের গির্জা*) দেখে, ক্রেমলিনের নানা ক্যাথিড্রালে গেলাম, লাঞ্চ খেলাম অখৎনি রিয়াদের*) বিখ্যাত ইয়েগরভ রেস্তোরাঁয়। চমৎকার জায়গাটা: নীচে

সাধারণ লোকের উপস্থিতিতে একটু ধূসর ও কোলাহলমুখরিত — কিন্তু ওপরের নীচু ঘরদুটো পরিষ্কার, চুপচাপ ও ভব্য — এমনকি ধূমপান পর্যন্ত নিষিদ্ধ। উঠোন থেকে ছোট জানলা দিয়ে সূর্য উঁকি মারাতে বেশ আরামের, খাঁচায় গাইছে একটি ক্যানারি; কোণে একটি বাতির সাদা ঝিলিক, একটা দেয়ালের ওপর দিক জুড়ে হলদে-তামাটে বার্নিশ করা একটি কালো ছবি: তাতে দেখা যায় বন্ধুর ছাদ ওপরে উঠেছে বেঁকে, লম্বা বারান্দায় পীতমুখ অস্বাভাবিক বড়োসড়ো কয়েকটি চীনে চা খাচ্ছে — পরনে সোনালী পোশাক, সবুজ টুপি, শস্তা বাতির ঢাকনির মতো দেখতে।... সেদিনই সন্ধ্যাবেলায় মস্কো ছাড়লাম।

আমাদের শহরে এরই মধ্যে স্লেজের জায়গা নিয়েছে গাড়ি। আজও সমুদ্র থেকে দুরন্ত দামাল হাওয়া রাজত্ব করছে স্টেশনে। বরফের ভারমুক্ত খটখটে প্ল্যাটফর্মে সে দাঁড়িয়ে আমার জন্য। বসন্তকালীন টুপিতে হাওয়ার ঝাপট — আমাকে দেখা মুশকিল তার পক্ষে। দূর থেকে দেখলাম তাকে — হারিয়ে-যাওয়া গোছের ভাব, হাওয়ায় চোখ কুঁচকে চলন্ত বগিগুলোর একটায় আমাকে দেখার চেষ্টা করছে। ছাড়াছাড়ির পর প্রিয়জনের মধ্যে যে করুণ ও মর্মস্পর্শী একটা ভাব সর্বদা আমাদের নাড়া দেয়, সেই ভাব তার চেহারায়। আগের চেয়ে রোগা হয়ে গেছে, সাদাসিধে জামাকাপড় গায়ে। ট্রেন থেকে লাফিয়ে নামলাম, ঠোঁটের ওপর থেকে ওড়না ছাড়াবার চেষ্টা করল ও, পারল না, ওড়না না সরিয়েই চুমু খেল বেখাপ্পাভাবে, মৃতের মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর মুখ।

গাড়িতে হাওয়ার মুখে নিঃশব্দে মাথা হেঁট করে তিক্ত, বিরস গলায় কয়েকবার বলল:

'আমার কী দশা তুমি করেছ, কী দশা করেছ!'

তারপর সমান বিরস গলায় বলল:

'স্তরিয়ান্‌স্কায়া হোটেলে যাচ্ছ? তোমার সঙ্গে যাই, চলো।'

ঘরে গিয়ে — দোতলার একটা বড়ো ঘর, পাশে ছোট আর একটা ঘর — ও সোফায় বসে দেখতে লাগল দারোয়ান কেমন বোকার মতো আমার স্যুটকেসটা ঘরের মাঝখানে কার্পেটের ওপর ধড়াস করে বসাল। তারপর আর কিছু চাই কিনা জিজ্ঞেস করল।

'না, আর কিছু চাই না,' আমার হয়ে ও বলল। 'যেতে পারো।...'

তারপর টুপির পিন খুলতে লাগল।

'তুমি এত চুপচাপ কেন? কিছু বলছ না কেন?' কম্পিত ঠোঁট চেপে জিজ্ঞেস করল উদাসীন সুরে।

ওর সামনে নতজানু হয়ে বসে ওর হাঁটু জড়িয়ে ধরলাম, কাপড়ের উপর মুখ রেখে তাতে চুমু খেয়ে কেঁদে ফেললাম। আমার মাথা তুলে ধরল ও — আবার আমার ঠোঁটে অনুভব করলাম ওর প্রিয়, অবর্ণনীয় মধুর ঠোঁট, শুনতে পেলাম আমাদের স্পন্দমান হৃদয় স্বর্গসুখে স্তব্ধ হয়ে এসেছে। লাফিয়ে ওঠে দরজায় চাবি দিয়ে জানলার ফুলে-ওঠা সাদা পর্দা কনকনে হাতে নামিয়ে দিলাম — বাইরে হাওয়ায় দুলছে একটি কালো নিষ্পত্র গাছ, তার ডালে একটি দাঁড়কাক মাতালের মতো দুলে দুলে ডাকছে ঊর্ধ্বস্বর আতঙ্কে।...

'বাবা শুধু চান আমরা বিয়েটা মাস ছয়েক পিছিয়ে দিই,' পরে, বিশ্রামের আলস্যে শুয়ে মৃদুকণ্ঠে ও আমাকে বলল। 'সবুর করা চাই, আমার জীবন তো এখন সম্পূর্ণভাবে তোমার, তা নিয়ে যা খুশি করতে পারো।'

ড্রেসিং-টেবিলে দীর্ঘ সাদা মোমবাতি কয়েকটি, স্থির পর্দাগুলোয় নিষ্প্রভ সাদা ঝিলিক, আর খড়ির মতো সাদা সিলিং থেকে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে পলেস্তারার বিচিত্র কারুকার্য।

১৮

উপরাশিয়ার* একটি শহরে আমরা যাব, খারকভ থেকে আমার ভাই গেওর্গি সেখানে এসেছে ইউনিয়ন বোর্ডের পরিসংখ্যান বিভাগের ভার নিতে, সেখানে আমাদের দু'জনেরই চাকরি হবার কথা। খৃষ্টের পুনরুত্থান পর্বের আগেকার সপ্তাহ ও ইস্টার আমরা কাটালাম বাতুরিনোতে। আমার মা ও বোন তাকে নিয়ে মুগ্ধ, বাবা তাকে আদর করে 'তুমি' বলে ডাকতেন, রোজ সকালে স্বেচ্ছায় তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিতেন চুমো খাবার জন্য, তার প্রতি শুধু আমার ভাই নিকলাইয়ের ব্যবহার গম্ভীর ও অতি ভদ্র গোছের। আমাদের সংসারের একজন সে, ব্যাপারটা অভিনব বলে ও শান্ত আর কোমলভাবে সুখী, আমাদের বাড়ির, ভিটেমাটির, যৌবনে যে-ঘরে আমি থাকতাম আর যে-ঘর তার কাছে এখন সুন্দর ও মরমী মনে হল তার একজন, আর আমার বইগুলোর, যেগুলো ভীরু

ইউক্রেনের প্রাচীন নাম।

আনন্দে সে দেখত উল্টে-পাল্টে।... তারপর আমরা বাতুরিনো ছাড়লাম।

ওরিওলে যেতে একটি রাত্রি। সকালে খার্‌কভের ট্রেনে ওঠা।

রোদেভরা একটি সকালে ট্রেনের গলি-বারান্দায় তপ্ত জানলার সামনে দু'জনে দাঁড়িয়ে।

'সত্যি, কী আশ্চর্য, ওরিওল ও লিপেৎস্ক ছাড়া আর কোথাও কখনো যাই নি,' ও বলল। 'এর পরে বুঝি কুর্স্ক? আমার কাছে এরই মধ্যে দক্ষিণী দেশ শুরু হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, আমার কাছেও।'

'কুর্স্কে লাঞ্চ খাব? জানো, স্টেশনের রেস্তোরাঁয় কখনো লাঞ্চ খাই নি।...'

কুর্স্কের পর যত এগোই তত উষ্ণ ও প্রসন্ন। লাইনের ধারে ধারে তখনই ঘাসের ঘন সম্ভার, ফুল ও সাদা প্রজাপতি — আর প্রজাপতির মানে হল গ্রীষ্মকাল।

'গ্রীষ্মকালে ওখানে অসম্ভব গরম হবে!' মৃদু হেসে ও বলল।

'আমার ভাই লিখেছে গোটা শহরটা বাগানের মতো।'

'তা বটে, উপরাশিয়া কিনা। এর আগে কখনো ভাবি নি।... দেখ, দেখ, কী বড়ো বড়ো পপ্‌লার গাছ! আর সবুজ এরই মধ্যে! এত হাওয়া-কল কেন?'

'হাওয়া-পাম্প, হাওয়া-কল নয়। এবার চোখে পড়বে খড়ির পাহাড়, আর তারপর বেল্‌গোরদ।'

'এখন তোমাকে বুঝতে পারছি, সত্যি, রোদের এই ঘটা ছেড়ে উত্তরে আমিও পারতাম না টিকতে।'

জানলা নামিয়ে দিলাম। রৌদ্রোজ্জ্বল হাওয়ার গরম

ঝলক, ইঞ্জিনের ধোঁয়ার কয়লার গন্ধ, আর দক্ষিণের চকিত আভাস। ও চোখ অর্ধেকটা বুজল, সূর্যের আলো তপ্ত রেখায় সঞ্চারিত হল ওর মুখে, কপালে খেলা-করা কালো নবীন কেশে, সাদাসিধে ছিটকাপড়ের ফ্রকে; রোদে গরম হয়ে উঠে চোখ ঝলসে দিচ্ছে ফ্রকটা।

বেল্‌গোরদের কাছে উপত্যকায় খুশিতে ফুলফোটা চেরি বাগান ও চুনকাম করা কুটিরের মধুর সাদাসিধে ছাপ। বেল্‌গোরদের স্টেশনে রুটি-বেচা ইউক্রেনীয় স্ত্রীলোকদের মন-জুড়ানো বকরবকর।

দর কষাকষি করে কয়েকটা ও কিনল, নিজের গেরস্থালি ও ইউক্রেনীয় শব্দের ব্যবহারে ভারি খুশি।

সে রাত্রে আবার ট্রেন বদলালাম খার্‌কভে।

গন্তব্যে পেঁছাব ভোরে।

ও তখনো ঘুমিয়ে। কামরায় মোমবাতির আলো প্রায় শেষ, স্তেপে তখনো রাত্রি, আবছা-আঁধার, কিন্তু স্তেপের ওপারে সুদূর, আনত. গোপন পূর্বাশা। আমরা যেখানে থাকি তার থেকে কত আলাদা। এ জায়গাটার চেহারা — ধূসর-সবুজ উঁচু ঢিবিসুদ্ধ এই রিক্ত, সীমাহীন সমভূমি! একটা ঘুমন্ত সাবস্টেশন এক নিমেষে পার হয়ে গেলাম — ঝোপঝাড়, গাছ নেই একটিও, আর ঊষার এই রহস্যময় জন্মমুহূর্তে সে স্টেশনটাও কেমন নীলচে-সাদা পাথুরে রিক্ত: এখানকার ছোট ছোট স্টেশনগুলো কী নিঃসঙ্গ!

দিনের আলো ঢুকছে ট্রেনেও। নিচে, মেঝেতে তখনো ছায়া, কিন্তু আরো ওপরে আধো-আলো। ঘুমের মধ্যে ও বালিশের নিচে মাথা গুঁজে পা গুটিয়ে নিল। মা যে শালটা ওকে দিয়েছিলেন তা দিয়ে সাবধানে ওকে ঢেকে দিলাম।

১১

স্টেশনটা শহর থেকে দূরে, প্রশস্ত একটি উপত্যকায়। হাসিমুখ ওয়েটার, অমায়িক কুলি ও দুঘোড়ার চওড়া গাড়ির সীটে বসা দিলদরাজ গাড়োয়ান, সব মিলিয়ে ছোটখাটো জায়গাটি প্রীতিকর।

ঘন বাগানের ছড়াছড়ি, পাহাড়ের ঢালুতে একটি ক্যাথিড্রাল, শহরটি পাহাড় থেকে চেয়ে আছে পূর্বে ও দক্ষিণে। পূর্বের উপত্যকায় এক টিলার চূড়ায় প্রাচীন একটি মঠ, তার ওপারে সবটা সবুজ আর ফাঁকা সমভূমি, উপত্যকা ক্রমশ ভিড়েছে স্তেপে। দক্ষিণে, নদী ও উজ্জ্বল মাঠের ওপারে দৃষ্টি হারিয়ে যায় চোখ-ঝলসানো রোদে।

বাগান ও তক্তা-বাঁধানো পথের দু'ধারে সার বেঁধে দাঁড়ানো পপ্‌লারের ভিড়ে শহরের অনেক রাস্তা যেন কোণঠেসা; কাঠের 'ফুটপাথে' ঘন ঘন দেখা হয়ে যায় উন্নত-বুক উদ্ধত মেয়েদের সঙ্গে, স্কার্ট আঁটো হয়ে বসেছে নিতম্বে, দুটো বালতি লাগানো ভারি বাখারি তাদের বলিষ্ঠ কাঁধে। অসাধারণ দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ আকারের পপ্‌লার গাছগুলি মন কাড়ে আমাদের, তখন মে মাস, প্রায়ই বৈশাখী ঝড় ও মুষলধারে বৃষ্টি, শক্ত সবুজ চিকচিকে পাতাগুলো ছড়াত আলকাতরার তাজা সুগন্ধ! — এখানে বসন্ত সর্বদা দীপ্ত ও হাসিখুশি, গ্রীষ্ম গুমোট, হেমন্ত দীর্ঘ ও স্বচ্ছ, আর জলো হাওয়ায় মোলায়েম শীতকাল — স্লেজের ছোট ছোট ঘণ্টার চাপা আওয়াজ চমৎকার।

এরকম একটা রাস্তায় আমরা বাড়ি নিলাম। আমাদের বাড়িওয়ালা কভান্‌কো — তামাটে রঙের বড়োসড়ো বুড়ো,

ছোটো ছোটো করে ছাঁটা পাকা চুল, রীতিমত জোতদার সে: একটা আঙিনা, একটা বার-বাড়ি, মূল বাড়ি ও তার পেছনের বাগান। সে নিজে থাকত বার-বাড়িতে, বাড়িটা আমাদের ভাড়া দিল। চুনকাম করা বাড়ির সামনের ছায়াচ্ছন্ন জায়গাটা। কোথায় যেন সে কাজ করত; কাজ থেকে বাড়ি ফিরে ভালো করে ডিনার খেয়ে গড়িয়ে নিত একটু, তারপর সাজগোজের তোয়াক্কা না রেখে খোলা জানলার সামনে বসে পাইপ খেতে খেতে গুন গুন করে ইউক্রেনীয় গান গাইত: 'পাহাড়ের গায়ে ফসল কাটছে চাষীরা...'

বাড়ির ঘরগুলো নীচু ও সাদাসিধে; বারান্দায় রঙীন সুতোয় গুণ-সেলাই করা কোড়া কাপড়ে ঢাকা একটা অতি পুরনো সিন্দুক। একটি কসাক মেয়ে আমাদের কাজ করত — তার রূপে নোগাইসুলভ* কী যেন ছিল।

আমার ভাইয়ের ব্যবহার আরো মিষ্টি, আরো সহৃদয়। মিছে ভাবি নি, লিকা ও তার মধ্যে শীগ্গিরই খুব ভাব জমে গেল; ওদের কারও সঙ্গে আমি ঝগড়া করলে এ-ওর পক্ষ নিত।

আমাদের সহকর্মী ও বন্ধু চক্র (ডাক্তার, উকিল, ইউনিয়ন বোর্ডের লোক) খারুকভে আমার ভাইয়ের বন্ধু চক্রের মতো — এদের হালচালের সঙ্গে সহজে খাপ খাইয়ে নিলাম, খুব খুশি হলাম লেওস্তভিচ ও ভাগিনকে দেখে—

* নোগাই — স্তাভ্রপোল অঞ্চলে, দাগেস্তান ও চেচেনো-ইন্‌গুশেতিয়ায় বসবাসকারী জনসম্প্রদায়। এখানে পরোক্ষে 'বন্য' অর্থে ব্যবহৃত।

তারাও খার্‌কভ থেকে চলে এসেছে, খার্‌কভের চক্রের সঙ্গে এদের একটি মাত্র পার্থক্য — সেটি হল এদের মতামত আরো নরমপন্থী, ছোট শহরের স্বাচ্ছন্দ্যে এদের জীবনযাত্রার ধরনটা প্রায় শহুরে, শুধু যে অন্য শহর থেকে আসা লোকজনের সঙ্গে এদের অমায়িক মেলামেশা তা নয়, এমনকি স্থানীয় পুলিসের কর্তার সঙ্গেও।

আমাদের আড্ডা সাধারণত বসত ইউনিয়ন বোর্ডের একটি কর্মকর্তার বাড়িতে। ভদ্রলোকের সাড়ে বার শ' একর জমি, দশ হাজার ভেড়া — পরিবারের খাতিরে বাড়িটা রেখেছিলেন জমকালো, আতিথেয়তায় উচ্ছল নিজে তিনি ছোটখাটো চেহারার সাদাসিধে মানুষ, ভালো জামাকাপড়ের বালাই নেই, এককালে ইয়াকুৎস্কে গিয়েছিলেন, নিজের বাড়িতে তাঁকে মনে হত গরীব অতিথির মতো।

২০

আমাদের আঙিনায় পাথরের একটা পুরনো কুয়ো। বার-বাড়ির সামনে দুটো সাদা বাবলা গাছ, আর বাড়ির দাওয়ার পাশে বাদাম গাছের কালো চূড়ার ছায়া পড়ত বারান্দার ডান দিকটায়। সকাল সাতটার মধ্যে সব কিছু রোদে ভরে গিয়ে তপ্ত উজ্জ্বল, উঠান থেকে আসা মুরগির একটানা, উৎকণ্ঠিত ডাকে সাড়া পড়ে যেত। কিন্তু বাড়িতে, বিশেষ করে বাগানের দিকের ভেতরের ঘরগুলো তখনো ঠান্ডা, মুখ-ধোবার জায়গার সামনে ছোট তাতারি চটি পায়ে, ঠান্ডায় আড়ষ্ট বুকে যেখানে ও জল ছড়াত

সেই শোবার ঘরে জল ও সাবানের টাটকা গন্ধ; ঘাড়ে চুলের নীচে সাবানের ফেনা, সলজ্জে ভিজে মুখ আমার দিকে ফিরিয়ে পা ঠুকে বলত, 'যাও বলছি এখান থেকে!' বারান্দার ঘর থেকে তারপর আসত সদ্য তৈরী চায়ের সুগন্ধ — নাল-লাগানো জুতো ঠকঠকিয়ে কসাক মেয়েটি সেখানে কাজকর্মে ব্যস্ত; খালি পায়ে জুতো, মোজা নেই, জাত-ঘোড়ার মতো সরু গোড়ালি স্কার্টের নীচে চিকচিক করত প্রাচ্যসুলভ একটা মসৃণ দীপ্তি দিত; এম্‌বার নেকলেস পরা সুডৌল গলাও চিকচিকিয়ে উঠত, কালো চুলের বেড়ে মুখ সজীব ও ভাবপ্রবণ, ব্যগ্র আগ্রহে ঝকঝকিয়ে উঠত বাঁকা চোখ, নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুলে উঠত নিতম্বদেশ।

ছোট হাজরির সময় হাজির হত আমার ভাই — হাতে সিগারেট, মুখের হাসিটা ও হাবভাব বাবার মতো; বেঁটে শরীর মোটা হয়ে যাচ্ছে, দেখতে বাবার মতো নয় বটে. তবে বাবার অভিজাত হালচালের কিছুটা বর্তেছে ছেলেতে; শৌখীন জামাকাপড়ের দিকে ঝোঁক, বেশ চালের মাথায় সিগারেট ধরায় ও পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে; এক কালে সকলের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, সে বিষয়ে তারও কোনো সন্দেহ ছিল না, কিন্তু এই সুদূর ইউক্রেনীয় শহরে এখনকার কাজে সে পুরোমাত্রায় সন্তুষ্ট। চোখে খুশির ঝিলিক নিয়ে আসে ছোট হাজরিতে: সুস্থসবল বহাল তবিয়তে, তার সংসার মানে আমরা — আমাদের প্রতি তার প্রবল অনুরাগ, আর অফিসে রোজ হাজিরা দেবার মানে বেশীর ভাগ সময় সিগারেট ফোঁকা ও আড্ডা মারা, যেমনটা হত খার্‌কভে — সেটা তার মনের

মতো ব্যাপার। শেষে গরমকালের খুশির পোশাক পরে বাইরে যাবার জন্য যখন আসত লিকা তখন ভ্রাতৃবর আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে চুমু খেত ওর হাতে।

রোদে ঝকঝকে সুন্দর পপ্‌লার গাছ ছাড়িয়ে, বাড়িগুলোর গরম দেয়াল ও রৌদ্রদীপ্ত বাগানের কাছঘেঁষা তপ্ত কাঠের ফুটপাথ হয়ে আমরা যেতাম; ঘন নীলে ফেঁপে ফুলে উঠত ওর ফিকে সিল্কের ছাতা। রোদে-পোড়া একটা চক পার হয়ে যেতে হত ইউনিয়ন বোর্ডের হলদে বাড়িতে। একতলায় দারোয়ানদের টপবুট আর গুঁছা তামাকের গন্ধ। আলপাকাব কোট গায়ে রাজ্যের মুন্‌শী আর কেরানী — বাহ্যত সরল কিন্তু আসলে সেয়ানা ঘুঘুর জাত — ব্যস্তসমস্ত ভাবে কাগজপত্র নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করত, মাথা হেলাবার ভঙ্গিটা তাদের ইউক্রেনীয়। সিঁড়ির পাশ কাটিয়ে আমরা যেতাম একেবারে একতলার ভেতর দিকের নীচু ঘরগুলোয়, সেখানে আমাদের বিভাগ। কর্মীদের দরুন জায়গাটা বেড়ে — কর্মীরা হলেন সরস সজীব বুদ্ধিজীবী, পোশাকে আশাকে, হাবে-ভাবে ঠাট নেই তাদের।... সেসব ঘরে লিকা বসে নানা ধরনের খোঁজখবরের তালিকা বেছে খামে ভরছে জেলায় জেলায় পাঠাবার জন্য, দেখে অদ্ভুত লাগত।

দুপুরবেলায় শস্তা প্লেটে লেবুর টুকরো আর শস্তা গেলাসে আমাদের চা দিয়ে যেত দারোয়ানরা, প্রথম প্রথম এসবের নৈর্ব্যক্তিক দিকটায় এক ধরনের আনন্দ পেতাম। এ সময় অন্যান্য বিভাগ থেকে আমাদের বন্ধুরা আসতেন সিগারেট খেতে, গল্পগুজব করতে। আসতেন সুলিমাও — ইউনিয়ন বোর্ডের সেক্রেটারী। চেহারাটি ভালো, একটু

কোল-কুঁজো, সোনার ফ্রেমের চশমা, জমকালো কালো চুল ও দাড়ি মখমলের মতো চকচকে, নরম চুপিসার তাঁর হাঁটার ভঙ্গিটা, কৃপা করা গোছের, হাসি ও কথা বলার ধরনও তেমনি; মুখে সর্বদা হাসি লেগেই আছে, সর্বদা এই অলস অনুগ্রহের ভান তিনি করেন। মানুষটা রীতিমতো শিল্পরুচিবিলাসী, টিলার চূড়ার মঠটাকে তিনি বলতেন 'জমে-যাওয়া সুর'। প্রায়ই আসতেন আমাদের বিভাগে। লিকার প্রতি তাঁর তাকানোর ধরনটা উত্তরোত্তর সহৃদয় ও রহস্যময় হয়ে উঠল; তার ডেস্কে গিয়ে হাতের ওপর ঝুঁকে অভিবাদন জানিয়ে চশমা কপালে উঠিয়ে মুখের দিকে তাকাতেন, মিষ্টি হেসে মোলায়েম সুরে বলতেন, 'এখন কী পাঠানো হচ্ছে, শুনি?' কথাটা শুনে খাড়া হয়ে বসে লিকা চেষ্টা করত যতটা সম্ভব ততটা মধুর ও খোলাখুলি জবাব দিতে। আমি এসবে ভ্রূক্ষেপ করতাম না, ঈর্ষার ছোঁয়াচ আর লাগত না আমার।

আবার আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার পরোয়া না করে বেশ একটা অভিনব অবস্থা হল আমার — ঠিক ওরিওলে 'গোলস' পত্রিকার অফিসে যেমন, কর্মী হিসেবে আমার প্রতি লোকের মনোভাব ছিল সহৃদয় ব্যঙ্গের। ধীরেসুস্থে নানা রিপোর্ট সংগ্রহ করতাম — অমুক মহকুমায়, অমুক জেলায় কতটা তামাক ও শালগম চাষ করা হয়েছে তার হিসেব, ফসলের পক্ষে হানিকর কীট-পতঙ্গের বিরুদ্ধে কী 'বন্দোবস্ত' করা হয়েছে তার বিবরণ নোট করে রাখতাম, মাঝে মাঝে আবার আশেপাশের কথাবার্তায় কর্ণপাত না করে বসে বসে বই পড়তাম। নিজের একটা ডেস্ক আছে, ফরমাশ করে যত খুশি নতুন নিব, কলম, পেন্সিল

ও লেখার চমৎকার কাগজ আনাতে পারি অফিসের গুদাম থেকে, বেড়ে লাগত ব্যাপারটা।

বেলা দুটো পর্যন্ত কাজ; তারপর আমার ভাই চেয়ার ছেড়ে উঠে হেসে হাঁকত — 'এবার বাড়ি যাওয়া যাক!' — আর সবাই তাড়াহুড়ো করে দৌড়ত গ্রীষ্মকালীন ক্যাপ বা টুপি রাখার জায়গায়, ভিড় করে রৌদ্রোজ্জ্বল চকে দৌড়িয়ে বেরিয়ে, পরস্পরের করমর্দন করে, ছড়ি দোলাতে দোলাতে, সিল্কের ঝিলিক মেরে যেতাম যে যার পথে।

২১

বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত শহরের পথঘাট জনহীন, রোদে পুড়ত বাগানগুলো। আমার ভাই ঘুমোত, আর আমরা দু'জনে গড়াগড়ি খেতাম লিকার বড়ো বিছানায়। বাড়ির চারপাশ ঘুরে সূর্য বাগানের গাছের ফিকে-সবুজ পত্রপুঞ্জ ভেদ করে উঁকি দিত শোবার ঘরের জানলায়, পত্রপুঞ্জের ছায়া পড়ত মুখ-ধোবার জায়গার ওপরকার আয়নাটায়। এ শহরে এককালে ছাত্র হিসেবে ছিলেন গোগল*), আশেপাশের সমস্ত জেলা জানা ছিল তাঁর — মিরগোরদ*), ইয়ানভ্‌শ্চিনা, শিশাকি, ইয়ারেস্কি। আমরা অনেক সময় হেসে আবৃত্তি করতাম: 'উপরাশিয়ায় গ্রীষ্মের দিন কী সুন্দর, কী দীপ্ত উজ্জ্বল!'*)

'যাই বলো, বড্ডো গরম কিন্তু!' খুশির দীর্ঘশ্বাস ফেলে উপুড় হয়ে শুয়ে বলত ও। 'আর কত মাছি! আচ্ছা, সব্জী বাগানের বিষয়ে কী বলেছেন?'

''নানা-রঙা সব্জী ছোপের উপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হচ্ছে

এই সব অলৌকিক কীটপতঙ্গের মরকত, পোখরাজ ও চুনি পাথর।...''*)

'মায়াবিনী সৌন্দর্য একটা এতে আছে, সত্যি! মিরগোরদ যেতে পারলে কী ভালো না লাগবে! এক দিন ওখানে না গেলে নয়, কী বলো? দোহাই তোমার, চলো না! কিন্তু কী অদ্ভুত মানুষ উনি ছিলেন, কী অপ্রীতিকর। কখনো কাউকে ভালোবাসেন নি, এমনকি যৌবনেও নয়।...'

'সত্যি, যৌবনে একটিমাত্র বোকার মতো কাজ করেছিলেন — সেটি হল লিউবেকে যাওয়া।'

'পিতার্সবুর্গে তোমার যাওয়ার মতো।... ঘুরে বেড়াতে তোমার এত ভালো লাগে কেন?'

'তোমার চিঠি পেতে এত ভালো লাগে কেন?'

'আজকাল কে আর আমাকে চিঠি লেখে!'

'তবু চিঠি পেতে তো তোমার ভালো লাগে। প্রীতিকর বা চিত্তাকর্ষক কিছু একটা ঘটার প্রতীক্ষায় আমরা সবাই থাকি। স্বপ্ন দেখি আনন্দের, কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনার। সেটাই হল পথে চলার মোহ। তাছাড়া, মুক্তির, ছাড়া পাওয়ার একটা বোধ।... সেই অভিনবত্ব যেটা সর্বদা আনে ছুটির মেজাজ, বাড়িয়ে দেয় জীবন উপভোগের শক্তি, ঠিক এটাই তো আমরা সকলে চাই, খুঁজি যেকোনো গভীর আবেগের মধ্যে।'

'তা বটে।'

'পিতার্সবুর্গের কথা তুমি বলো। যদি জানতে অবস্থাটা কী জঘন্য ছিল, কী তাড়াতাড়ি আমার চরম উপলব্ধি হল যে শরীরে ও মনে আমি হলাম খাঁটি দক্ষিণের লোক!

গোগল একবার ইতালি থেকে লেখেন: 'পিতার্সবুর্গ, বরফ, বদমায়েস, দপ্তর — এসবের স্বপ্ন দেখলাম: ঘুম ভাঙল আবার নিজের দেশেই।'*) আর আমিও জেগে উঠেছি এখানে। রোমাঞ্চ হয় যখন শুনি: চিগিরিন, চের্কাসি, খরল, লুবনী, চের্তম্‌লীক, দিকয়ে পোলে*), যখন দেখি নলখাগড়ায় ছাওয়া এখানকার চাল, চাষাদের কদমছাঁট মাথা, হলুদ ও লাল বুট পরা মেয়েদের, এমনকি বাঁকে করে যেসব ঝুড়িতে ওরা প্লাম আর চেরি নিয়ে যায় সেগুলো দেখলে পর্যন্ত রোমাঞ্চ হয়। 'যাতনায় পাক খেয়ে হাহাকারে কাঁদে পাখি সন্তানের তরে; স্তেপের উপরে হাওয়ার উত্তরীয়, দীপ্ত সূর্য মধ্যাকাশে...' শেভ্‌চেন্‌কোর*) কবিতা — কী অদ্ভুত প্রতিভা তাঁর! ইউক্রেনের মতো সুন্দর জায়গা পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। আর সবচেয়ে বড়ো কথা হল, ইউক্রেনের ইতিহাস বলে আর কিছু নেই এখন — অনেক, অনেক কাল আগে ফুরিয়ে গেছে তার ইতিহাস। শুধু আছে অতীত, আছে আগেকার দিনের গান ও উপকথা — সময়ের স্রোত নিথর যেন। সবচেয়ে বেশী আমার মন ভোলায় এটা।'

''মন ভোলায়', 'মন-ভোলানো' তুমি বড্ডো বেশী ব্যবহার করো, তাই না?'

'জীবন তো মন-ভোলানো হওয়া উচিত।'

সূর্য নেমে যেতে শুরু করত। খোলা জানলা দিয়ে দরাজ আলোর বন্যা পড়ত রঙ-করা মেঝেতে, খেলা করত ছাদে আয়নার প্রতিবিম্বের সঙ্গে, জানলার ধারিগুলো ক্রমশ উজ্জ্বল আর গরম হয়ে উঠত, মহানন্দে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছির গুঞ্জন সেখানে। লিকার শীতল নগ্ন কাঁধে কামড়াত

তারা। একটা চড়ুই হঠাৎ জানলার ধারিতে বসে চারিদিক দেখে নিয়ে আবার ওপরে উঠে মিলিয়ে গেল গাছের দীপ্ত সবুজে, বিকেলের আকাশের গায়ে নকসা কেটেছে গাছগুলো।

'আচ্ছা, অন্য কিছু বলো তো এবার,' ও বলত। 'বলো তো, আমাদের কখনো ক্রিমিয়া যাওয়া হবে নাকি? কী স্বপ্ন দেখি যদি জানতে! স্বপ্ন দেখি তুমি একটা গল্প লিখবে — সুন্দর হবে গল্পটা মনে হয় — আর তখন কিছু টাকাকড়ি হাতে পেয়ে যেতে পারব বেড়াতে।... লেখা ছেড়ে দিয়েছ কেন? সত্যি, তুমি একটা উড়নচণ্ডী, নিজের সব ক্ষমতা নষ্ট করছ!'

'জানো তো এককালে কিছু কসাক ছিল যাদের বলত 'ভবঘুরে', তারা শুধু ঘুরে বেড়াত বলে। মনে হচ্ছে, হয়ত, আমিও 'ভবঘুরে'। 'ঈশ্বর কাউকে দেন প্রাসাদ, আর কাউকে পথ।' গোগলের নোটবুকে আমার যেটা সবচেয়ে ভালো লাগে সেটা হল: 'রাস্তা থেকে আকাশে উঠল স্তেপের একটি গাংচিল, মাথার ঝুঁটিটা তার দেখতে বন্ধনীর মতো।... সারা রাস্তা জুড়ে কাঁটা ঝোপের সবুজ একটি বেড়া, আর তার ওপারে শুধু অন্তহীন সমভূমি।... বেড়া ও খানাখন্দের ওপর সূর্যমুখী ফুল, নিখুঁত প্রলেপ দেওয়া কুটিরের খড়-ছাওয়া চাল, সুন্দর জানলা ঘিরে আঁকা লাল একটি রেখা।... তুমিই রাশিয়ার প্রাচীন উৎসমূল, যেখানে অনুভূতি আরো হৃদ্য, স্লাভ স্বভাব আরো স্নিগ্ধ!'*)'

খুব মন দিয়ে শুনে হঠাৎ লিকা বলে উঠল:

'আচ্ছা, বলো তো, গ্যেটের লেখার সেই জায়গাটা আমাকে কেন পড়ে শুনিয়েছিলে? ওই যে, যেখানে

ফ্রেদেরিকাকে ছেড়ে যাবার পর হঠাৎ মানসচক্ষে দেখলেন একটি ঘোড়সওয়ার সোনালি জরি দেওয়া ধূসর কোট পরে কোথায় যেন যাচ্ছে? কী লিখেছিলেন?'

''সে ঘোড়াসওয়ার আমি নিজে। পরনে সোনালি জরি দেওয়া ধূসর কোট, যেরকম কোট কখনো ছিল না আমার।'*)'

'হ্যাঁ, সত্যি, সবটা কী অদ্ভুত আর ছমছমে! তারপর তুমি বললে যৌবনের কল্পলোকে সবাই দেখে স্বপ্নকোট... তিনি ফ্রেদেরিকাকে ত্যাগ করলেন কেন?'

'তিনি বলতেন ভেতরকার 'দানব' তাঁকে সর্বদা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।'

'তা সত্যি, আর তুমিও তো শীগ্‌গিরই আমাকে আর ভালোবাসবে না। আচ্ছা, ঠিক করে বলো তো, — সবচেয়ে বেশী করে কিসের স্বপ্ন দেখ?'

'কিসের স্বপ্ন দেখি? ক্রিমিয়ার প্রাচীন কোনো বাদশা*) যেন হই, আর তোমাকে নিয়ে থাকি বাখ্‌-চিসারাই প্রাসাদে*)।... বাখচিসারাই জায়গাটার সমস্তটা অগ্নিকুণ্ডের মতো গরম একটা পাথুরে গিরিপথ, কিন্তু প্রাসাদটা সর্বদা ছায়ায় ভরা, ঠাণ্ডা তার ফোয়ারা, জান-লার বাইরে তুঁত গাছ।...'

'সত্যি বলছ?'

'সত্যি। জানোই তো আমার মনে সর্বদা ভয়ঙ্কর আবোলতাবোল জিনিসের ভিড়। স্তেপের গাংচিলটার কথা ধরো, সমুদ্র ও স্তেপের মিশেল যেটা।... মনে আছে নিকলাই হেসে বলত আমি জন্মে বোকা, শুনে ভয়ানক কষ্ট হত; শেষে একদিন হঠাৎ পড়লাম ডেকার্ত*) নিজে

বলতেন যে তাঁর মানসিক জীবনে স্বচ্ছতা ও বুদ্ধিবৃত্তির স্থান ছিল সবচেয়ে গৌণ।'

'আচ্ছা, প্রাসাদটায় হারেম আছে নাকি? এটা কিন্তু বেশ গুরুতর ব্যাপার। মনে আছে, তুমি আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করতে পুরুষের প্রেম হল রকমারি প্রেমের পাঁচমিশেলী, বলতে যে নিকুলিনা ও পরে নাদিয়ার প্রতি তোমার মনোভাব সেরকম ছিল।... জানো, তুমি মাঝে মাঝে আমার সামনে বড্ডো বেশী নিষ্ঠুর খোলাখুলি কথা বলো। সেদিন কসাক মেয়েটির বিষয়েও ও ধরনের কী একটা বললে।'

'খালি বলেছিলাম ওর দিকে যখন চেয়ে দেখি তখন ভীষণ ইচ্ছে হয় লবণাক্ত স্তেপের কোনোখানে গিয়ে তাঁবুতে দিন কাটাই।'

'এই তো, নিজেই স্বীকার করছ যে ওর সঙ্গে তাঁবুতে থাকার ইচ্ছে তোমার।'

'ওর সঙ্গে থাকার কথা বলি নি।'

'তবে কার সঙ্গে? মাগো, আবার চড়ুই! ঘরে ঢুকে যখন আয়নায় ঠোক্কর খায় তখন ভীষণ ভয় হয়।'

ভড়াক্ করে উঠে ও হাততালি দিল তাড়াতাড়ি, বেখাপ্পাভাবে। ওকে ধরে চুমু খেলাম নগ্ন কাঁধে, পায়ে।... সবচেয়ে বেশী আমাকে বিচলিত করত ওর শরীরের উষ্ণ ও ঠান্ডা জায়গাগুলোর পার্থক্য।

২২

সন্ধ্যার দিকে ঠান্ডা। বাড়ির পেছনে সূর্য নেমে আসত, বারান্দায় উঠানের দিকের খোলা জানলাগুলোর পাশে

বসে চা খাওয়া। হালে অনেক পড়ত ও, চায়ের পর সাধারণত আমার ভাইকে নানা বিষয়ে জিজ্ঞেস করত, ভ্রাতৃবর ওকে জ্ঞানালোক বিতরণ করতে পেয়ে মহা খুশী। সন্ধ্যেবেলাগুলো একেবারে স্তব্ধ ও চুপচাপ — শুধু উঠানে সোয়ালো পাখি এদিক-ওদিক চকিতে ঘুরে তারপর উড়ে অদৃশ্য হয়ে যায় অতল আকাশে। ওরা দুজনে কথাবার্তা বলত, আমি বসে বসে শুনতাম কে যেন গাইছে: 'পাহাড়ের গায়ে ফসল কাটছে চাষীরা...' পাহাড়ের ওপর ফসল তোলার গান — বিরহের বিষণ্ণতায় মসৃণ মন্থর সে গানের প্রবাহ, তারপর মুক্তি, শৌর্য, সুদূরের মোহ, দুঃসাহস ও ফৌজী সুরে তার শক্তি ও মাত্রা বেড়ে যায়:

নীচে, পাহাড়ের নীচে,
ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে,
বীর কসাকেরা!

টানা-টানা বিষণ্ণ সুরে গান তন্ময় হয়ে উঠত উপত্যকায় কসাকদের রণযাত্রায়, দলের নেতা হল দুঃসাহসী দরশেন্‌কো*), গানটা বলত, তার পিছু পিছু আসছে সাগাইদাচ্‌নি*), —

কী চাই তোমার
হে বিচিত্র বীর কসাক,
কনে, না তামাকের পাইপ...

এই বিচিত্র মানুষটির' প্রতি সগর্ব বিস্ময়ে ছেদ পড়ত মুহূর্তের, তারপর আনন্দের আপনহারা উচ্ছ্বাসে আবার ফেটে পড়ত গানে:

বৌয়ের ঝামেলা
সইবে না!
তবে তামাক আর পাইপ
দূর যাত্রায় কসাকের
কাজে লাগবে!

গান শুনতে শুনতে বিষণ্ণ মধুরতায় কিসের প্রতি যেন ঈর্ষা বোধ করতাম।

সূর্যাস্তের সময় বেড়াতাম, মাঝে মাঝে যেতাম শহরে, নয়ত পাহাড়ের ওপর ক্যাথিড্রালের পেছনের বাগানে, নয়ত শহর ছাড়িয়ে মাঠেঘাটে। শহরে কয়েকটা বাঁধানো রাস্তা, সেখানে ইহুদী দোকানদারদের বেসাতি: অগুনতি ঘড়ি, তামাক আর ওষুধের দোকান। এসব রাস্তায় বাড়িগুলো সাদা পাথরের, দিনের উত্তাপ ফুটে বেরোত সন্ধ্যাবেলায়, কোণে কোণে চালা-ঘরের দোকানে বিক্রী হত ফুঁসে-ওঠা জলের সঙ্গে নানা রঙের সিরাপ: সব কিছুতে দক্ষিণের ছাপ, ইচ্ছে হত আরো দক্ষিণে যাই। মনে আছে খালি ভাবতাম কের্চের*) কথা তখন — শুধু কের্চ কেন, জানি না। ক্যাথিড্রালের বাগান থেকে নীচের উপত্যকার দিকে চেয়ে কল্পনা করতাম যাচ্ছি ক্রেমেন্‌চুগে*) বা নিকলায়েভে*)। খোলা মাঠে, শহরের বাইরে যেতাম পশ্চিম উপকণ্ঠ পার হয়ে — সেখানটা তখনও পুরোপুরি গেঁয়ো। কুটির, চেরি বাগান ও ফুটির ক্ষেত গিয়ে পড়েছে সমভূমিতে, তীরের মতো সোজা মিরগোরদ সড়কের মুখোমুখি। টেলিগ্রাফের খুঁটি লাগানো সড়কে অনেক দূরে চোখে পড়ত মন্থরগতি একটা ইউক্রেনীয় গাড়ি — জোয়ালে দুলতে দুলতে টেনে চলেছে দুটো বলদ, মাথা

নামিয়ে, মন্থর গতিতে চলে, গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে যেত টেলিগ্রাফের খুঁটিগুলোর সঙ্গে — যেন সমুদ্রের গর্ভে আর ঝাপসা দূরে শেষ খুঁটিগুলো প্রায় দেখা যায় না, দেশলাই-এর খাড়া কাঠির মতো দেখতে তারা। রাস্তাটা গিয়েছে ইয়ানভূশিচনা, ইয়ারেম্কি, শিশাকিতে।...

শহরের পার্কে প্রায়ই সন্ধ্যা কাটাতাম। ব্যান্ডের বাজনা, রেস্তোরাঁর আলোকিত বারান্দা থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চের মতো চারিদিককার অন্ধকারের মধ্যে চোখে পড়ত অনেক দূরে থেকে। আমার ভাই সটান যেত রেস্তোরাঁয় আর আমরা দু'জন মাঝে মাঝে যেতাম পার্কের একেবারে শেষে, পাহাড়চূড়ার কিনারায়। গভীর কালো ও উষ্ণ রাত্রি। নীচে কোথায় যেন অন্ধকারে ছোট ছোট আলো। বন্দনার মতো মিলিত কণ্ঠে সুষম গান ভেসে আসত আমাদের কানে, ক্ষীণ হয়ে যেত মিলিয়ে — শহরতলির ছোকরাদের গান। সে গান মিশে একাকার হয়ে যেত অন্ধকারে ও স্তব্ধতায়। গুরুগুরু ধ্বনিতে ছুটে যেত আলোকিত জানলার ট্রেন, তখন বিশেষভাবে মনে নাড়া দিত — উপত্যকাটি কী গভীর ও অন্ধকার। ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসত গুরু গুরু ধ্বনি, ঝাপসা হয়ে যেত ট্রেনের আলো, যেন অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে পাতালে। আবার কানে বাজত গান, উপত্যকার ওপারে প্রসারিত দিকচক্রবাল স্পন্দিত হয়ে উঠত ব্যাঙের অবিশ্রান্ত ডাকে, মনে হত সে ডাক এই স্তব্ধতা ও অন্ধকারকে সম্মোহিত করেছে, চিরকালে বেঁধে রেখেছে মায়ামন্ত্রে বিমুগ্ধ করে।

উপত্যকার অন্ধকারের পর রেস্তোরাঁর ভিড়-ঠেসা বারান্দা বেশ মধুর সংকীর্ণ ও চোখ-ধাঁধানো মনে হত। ভাগিন,

লেওন্তভিচ ও সুলিমার সঙ্গে একটা টেবিলে বসা আমার ভাইয়ের তখনি নেশা ধরে গেছে, শুরু হয়েছে ভাবালুতা, সে চটপট দাঁড়িয়ে হাত নাড়িয়ে ডাকত আমাদের। বেশ সবর অভ্যর্থনা, আনতে বলা হত আরো সাদা মদ, গেলাস ও বরফ। তারপর ব্যান্ডের বাজনা শেষ হত, পার্ক শূন্য ও অন্ধকার, ফুরফুরে হাওয়া উঠে ইতস্তত পোকা ছড়ানো, কাঁচের ঢাকনির ভেতরে মোমবাতির শিখাগুলিকে জ্বালাতন করত, কিন্তু সবাই বলত এত তাড়াতাড়ি যাবার সময় হয় নি, তাই বসে থাকতাম আমরা। শেষাশেষি যখন সবাই একমত: যাবার বেলা হয়েছে, তখনো চট করেই চলে যেতাম না। দল বেঁধে ফিরতাম, উচ্চকণ্ঠে চলত আলাপ, কাঠের ফুটপাথে পায়ের খট্‌খট্‌ শব্দ। ঘন বাগানগুলি ঘুমন্ত, রহস্যে কালো কালো গভীর রাতের নীচু চাঁদের নরম আলোয় স্নাত। অবশেষে আমরা ছাড়া পেয়ে পৌঁছতাম আমাদের আঙিনায়, সেখানে চাঁদের আলো চিক চিক করছে বারান্দার কালো জানলাগুলোয়; একটি ঝিঁঝিঁর শান্ত ডাক; বার-বাড়ির সাদা দেয়ালে আশ্চর্য স্পষ্টভাবে নিথর কালো ছায়ায় আঁকা বাবলা গাছের প্রত্যেকটি ছোট পাতা, প্রত্যেকটি ডাল।

ঘুমোবার আগের মুহূর্তগুলিই সবচেয়ে ভালো। বিছানার পাশের টেবিলে একটি মোমবাতির নরম আলো। নবীনতা, যৌবন, স্বাস্থ্যের পুলকে খোলা জানলা দিয়ে আসত ঠান্ডা আমেজ। ড্রেসিং-গাউন পরে বিছানার ধারে ও বসে থাকত কালো চোখ মোমবাতির শিখার দিকে মেলে, বাঁধত স্বল্প চিকচিকে চুল।

'আমার পরিবর্তন নিয়ে তুমি সবসময় ভাবো,' ও বলত।

'কিন্তু তুমি নিজে কতটা বদলেছ তা তো জানো না। আজকাল ক্রমশ কম নজর দাও আমার দিকে, বিশেষ করে আমরা ছাড়া অন্য কেউ থাকলে! ভয় হচ্ছে শীগ্‌গিরই তোমার কাছে হাওয়ার মতো জিনিস হয়ে দাঁড়াব: হাওয়া ছাড়া লোক বাঁচে না বটে, কিন্তু তবু হাওয়ার কথা ভাবে না কেউ। কথাটা সত্যি, তাই না? তুমি বলো এই হল আসল প্রেম। কিন্তু আমার মনে হয় এর মানে হল এই যে তুমি আমাকে ছাড়া আরো কিছু চাও।'

'সত্যি, আমি আরো চাই, আরো কিছু চাই,' হাসতে হাসতে জবাব দিতাম। 'আমার এখন কিছুতেই মন ওঠে না!'

'সেটাই তো বারবার বলি: তোমার মন সবসময় উড়ু উড়ু। তোমার ভাই বলেছেন সফরদার পরিসংখ্যানীদের সঙ্গে যাবার অনুমতি চেয়েছ তাঁর কাছে। কেন চাইতে গেলে? গরমে আর ধুলোয় গাড়িতে ঝাঁকুনি খেতে খেতে যাওয়া; তারপর ভ্যাপসা একটা জেলা অফিসে বসে দিনের পর দিন আমারই পাঠানো প্রশ্নাবলী নিয়ে ইউক্রে-নীয়দের অশেষ জিজ্ঞাসাবাদ করা।... কেন?..'

আমার চোখে চোখ রেখে, বিনুনীটা পেছনে ছুঁড়ে দিয়ে বলল:

'কী টানে তোমাকে?'

'আমি সুখী বলে কিছুই এখন যথেষ্ট ঠেকে না আমার কাছে, তাই।'

আমার হাত নিজের হাতে রেখে ও শুধাল:

'সত্যি তুমি সুখী?'

২৩

আমার প্রথম সফর সেই রাস্তাটা ধরে যাতে ওর যাবার এত আগ্রহ ছিল — মিরগোরদ সড়ক। শিশাকিতে ভাগিনের কী একটা কাজ ছিল, সে আমাকে সঙ্গে নিল। মনে আছে ঠিক সময় যদি সেদিন ঘুম না ভাঙে, সেই ভেবে কী অস্থির ছিলাম আমরা — গরম হবার আগেই সকাল সকাল আমাদের রওনা হবার কথা — কেমন সস্নেহে ও আমাকে জাগিয়ে দিল, ভোর হবার আগে ঘুম থেকে উঠেছে, ছোট হাজরি তৈরী করেছে এরই মধ্যে, আমার সঙ্গে যেতে না পারার হতাশার ভাব কাটিয়ে। সকালটা মেঘলা, ঠাণ্ডা, বারবার জানলা দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছে ও, অস্বস্তি পাছে বৃষ্টিতে আমার সফরটা মাঠে মারা যায়। আজও অনুভব করি বাইরে গাড়ির ঘণ্টা শুনে কেমন স্নিগ্ধ উত্তেজিতভাবে দুজনে উঠে পড়েছিলাম অস্থিরতায়, গভীর আবেগে আলিঙ্গন সেরে দৌড়িয়ে গিয়েছিলাম ফটকে, যেখানে ভাড়া গাড়িতে বসে ছিল ভাগিন — পরনে তার লম্বা ঢিলে ওভারঅল, মাথায় গ্রীষ্মকালের ছাই-রঙা টুপি।...

পরে বিরাট আকাশের প্রসারে কেমন চাপা লেগেছিল গাড়ির ঘণ্টা, শুকনো ও তপ্ত হয়ে উঠেছিল রোদ-ওঠা দিনটা, রাস্তার জমাট গভীর ধুলো ভেঙে গাড়িটার মসৃণ গতি, আর আশেপাশের সব কিছু এত একঘেয়ে হয়ে গেল যে কিসের জন্য একাগ্র প্রতীক্ষায় সেই নিদ্রালস বিবর্ণ দূর সীমায় চেয়ে থাকা অসহ্য হল। দুপুরবেলায় পাকা গমের তপ্ত সমুদ্রে একটা জিনিস চোখে পড়ল যেটা

আমাদের নিয়ে গেল যাযাবরদের কালে: সেটা হল কচুবেইয়ের*) অসংখ্য ভেড়ার খোঁয়াড়। গাড়ির ঝাঁকুনির মধ্যে সময় করে লিখে রাখলাম: 'দুপুর, ভেড়ার খোঁয়াড়। উত্তাপে ধূসর আকাশ, বাজপাখি আর আকাশে ডিগবাজী খাওয়া বিচিত্র বর্ণের পাখির দল।... আমার সুখের সীমা নেই!' ইয়ানভ্‌শিচনাতে লিখলাম: 'ইয়ানভ্‌শিচনা, পুরনো সরাইখানা -- ভেতরটা কালো, ঠান্ডা আধো-আলো; ইহুদীটা বলল বিয়ার নেই, 'পানীয় শুধু আছে।' — 'সেটা আবার কী?' — 'কেন, পানীয়, বেগুনি পানীয়!'' অস্থিচর্মসার ইহুদীটি সাবেকী কেতায় লম্বা ফ্রক-কোটে সজ্জিত, কিন্তু পেছনকার ঘর থেকে পানীয় এনে দিল অসাধারণ মোটা একটি ছোকরা — তার ছেলে, হাই-স্কুলের ছাত্র — ফিকে ছাই-রঙের টিউনিকে আনকোরা নতুন একটা চামড়ার বেল্ট উঁচু করে লাগানো, কিন্তু দেখতে ভারি সুন্দর, মুখের ধাঁচটা পারসীক। শিশাকি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল গোগলের নোটের কথা: 'সমতল রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ গভীর ফাঁক — যেন পাতালের খাড়া পাড়; আর সে গভীরে বন পেরিয়ে আরো বন, সামনের গুলো সবুজ, দূরের গুলো ঘন নীল, আর তাদের ছাড়িয়ে বালুর বিস্তার, রুপোলি খড়-রঙা... কিঁচকিঁচে হাওয়া-কল ডানা নাড়ছে খাড়া পাড়ের উপরে।...'*) উপত্যকার গভীরে, খাড়া পাড়ের নীচে, প্‌সিওল নদী*) অর্ধবৃত্তাকারে বাঁক নিয়েছে, সেখানে বাগানে সবুজ একটি গন্ডগ্রাম। জনৈক ভাসিলেন্‌কোর সঙ্গে ভাগিনের কাজ ছিল — লোকটির খোঁজে সে গ্রামে অনেকক্ষণ কাটালাম, তার বাড়ি খুঁজে

বের করবার পর জানা গেল সে নেই, তাই তার বাড়ির কাছে একটা লাইম গাছের নীচে বসে রইলাম — চারিধারে শুধু স্যাঁতসেঁতে উইলো আর ব্যাঙের ডাক। ভাসিলেন্‌কো এলে সারা সন্ধ্যে সেখানে বসে বসে বাড়িতে তৈরী নানা মদ ও খাবার খেলাম; টেবিলে রাখা বাতির আলো পড়ল লাইম গাছের পাতায়, এদিকে গ্রীষ্মরাত্রির দুর্ভেদ্য অন্ধকার জমাট হয়ে উঠল চারিধারে। হঠাৎ একটা বেড়ার দরজার ধড়াম শব্দ অন্ধকারে, আর পাউডার মেখে সীসের মতো বিবর্ণ মুখে একটি মেয়ে এল আমাদের টেবিলে জম-কালোভাবে — ভাসিলেন্‌কোর বান্ধবী, ইউনিয়ন বোর্ডের কম্পাউন্ডার সে। শহর থেকে আগত অতিথিদের আপ্যায়ন চলেছে সেটা চটপট বুঝে প্রথমে তার অত্যন্ত অস্বস্তি, কেমন ধারা ব্যবহার করা উচিত ভেবে না পেয়ে মনে যা এল তাই বলে বসল; কিন্তু তারপর আমাদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে গেলাসের পর গেলাস সাবাড় করতে লাগল, আমার প্রতিটি ইয়ার্কিতে ক্রমশ সশব্দ তার তীক্ষ্ণ হাসি। মেয়েটি অত্যন্ত ছটফটে প্রকৃতির, চোয়ালের হাড় চওড়া, তীক্ষ্ণ কালো চোখ, শিরাবহুল হাতে সেণ্টের কড়া গন্ধ, কণ্ঠার হাড় উদ্‌গত, পাতলা নীল ব্লাউজের নীচে ভারি বুক আনত, কোমর সরু, পাছা ভারি। মাঝরাতে বাসায় পেঁৗছিয়ে দিলাম তাকে। দুর্ভেদ্য অন্ধকারে শুকিয়ে শক্ত খড়খড়ে চাকার দাগের ওপর দিয়ে হেঁটে ঢুকলাম একটা গলিতে। কঞ্চির বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে সে আমার বুকে মাথা রাখল। অনেক কষ্টে ভেতরে যাবার ইচ্ছে সামলালাম।...

পরের দিন বেশ দেরীতে ভাগিন ও আমি বাড়ি

ফিরলাম। লিকা তখনি একটা বই নিয়ে শুয়ে পড়েছে। আমাকে দেখে অবাক খুশিতে উঠে বসল, চেঁচিয়ে বলল, 'এরই মধ্যে ফিরে এসেছ?' আমার সফরের কথা তাড়াতাড়ি বলে যখন হাসতে হাসতে কম্পাউন্ডার মেয়েটির কথা জানালাম, তখন বাধা দিয়ে ও বলল:

'ওটা আমাকে না বললেই নয়?' ওর চোখে দেখা দিল জল।

'সত্যি কী নিষ্ঠুর তুমি!' বালিশের নীচে রুমালটা তাড়াতাড়ি হাতড়াতে হাতড়াতে বলল। 'আমাকে একলা ফেলে গেছ তাতেও তোমার পোষাল না।...'

জীবনে পরে কতবার না মনে পড়েছে সেই অশ্রুর কথা! যেমন, বিশ বছর পরে একদিন তখন বেসারাবিয়ায় সমুদ্রের ধারে বাগানবাড়িতে আছি। সাঁতার সেরে পড়ার ঘরে এসে শুয়েছি। দামাল হাওয়ার তপ্ত মধ্যদিন: সিল্কের মতো খসখসে গরম জোরালো হাওয়ার মুখর শব্দ বাড়ির চারপাশে মাঝে মাঝে মিলিয়ে গিয়ে আবার তীব্র দাপটে ভেঙে পড়ছে, গাছে গাছে আলো-ছায়ার লুকোচুরি, নরম নুয়ে পড়া ডালপালার দোলন।... আবার তীব্র জোরালো হয়ে উঠল হাওয়া — জানলার সামনে গাছের সবুজ পর্দা হঠাৎ ছিন্ন হয়ে দেখা গেল এনামেলের মতো চকচকে, গুমোট আকাশ, তক্ষুনি ঘরের সাদা ছাদে দেখা দিল একটা ছায়া, ফিকে বেগুনি রঙ ধরল ছাদটা। তারপর আবার সব কিছু শান্ত, হাওয়া ছুটে গিয়ে মিলিয়ে গেল বাগানের গভীরে, সমুদ্রের ধারে খাড়া পাড়ে তাকিয়ে থেকে কান পেতে শুনছি, হঠাৎ মনে হল: কোথায় যেন, বিশ বছর আগে, ইউক্রেনের অনেকদিন ভুলে-যাওয়া সেই শহরে,

যেখানে আমরা শুরু করেছিলাম যুগল জীবনযাত্রা, এসেছিল এমন একটি দুপুর; আমার ঘুম ভাঙল দেরীতে — ও তখন অফিসে চলে গেছে — বাগানের দিকের জানলা খোলা, বাইরে গুঞ্জরিত ও দোলন্ত গাছগুলো ঠিক এমনিভাবে আঁধার ও আলো হয়ে যাচ্ছিল নিমেষে নিমেষে, আর ঘর ভরে গিয়েছিল দুনিয়ার সেই রকম সুখের হাওয়ায় যাতে ভেসে আসে ছোট হাজরির আভাস ও ভাজা পেঁয়াজের সুগন্ধ। চোখ মেলে, বুক ভরে হাওয়া নিয়ে, বালিশটা একটু উঁচু করে, শুয়ে তাকিয়ে রইলাম অন্য বালিশের দিকে — তাতে তখনো লেগে আছে ওর সুন্দর কালো চুলের ক্ষীণ বেগুনি সুরভি আর ছোট্ট সেই রুমালটির গন্ধ যেটা আমাদের ভাব হবার পরও অনেকক্ষণ ও হাতের মুঠোয় ধরে ছিল। এসব যখন মনে পড়ে গেল, মনে পড়ে গেল যে তারপর ওকে ছাড়া আমার জীবনের অর্ধেক কাটিয়ে দিয়েছি, ঘুরেছি সারা দুনিয়ায়, পৃথিবীতে চোখ মেলে এখনও বেঁচে আছি, আর ও নেই এখানে, অনন্তকাল ধরে নেই, তখন আমার শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহ থেমে গেল, সোফা থেকে চকিতে পা নামিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, যেন শূন্যে ভাসতে ভাসতে অম্লতরুর বীথি ধরে গেলাম ঢালুর খাদটার দিকে, তাকিয়ে রইলাম নীচে হিরাকসের মতো সবুজ এক টুকরো সমুদ্রের দিকে — হঠাৎ মনে হল এই সমুদ্র করাল ও অপরূপ, আদিম ও নতুন।...

সে রাত্রে আমি ওর কাছে শপথ করেছিলাম আর কখনও ওকে ছেড়ে যাব না। কয়েক দিন পরে আবার পথে বেরিয়ে পড়লাম।

২৪

বাতুরিনোতে থাকার সময় আমার ভাই নিকলাই বলত: 'তোমার জন্যে ভয়ানক দুঃখ হয়। তুমি নিজেকে শেষ করে দিয়েছ অত্যন্ত অকালে।'

আমার কিন্তু মোটেই মনে হত না যে নিজেকে শেষ করে দিয়েছি।

কাজটাকে আবার মনে হত সাময়িক একটা ব্যাপার, নিজেকে বিবাহিত লোক বলে ভাবতে পারতাম না। ওকে ছেড়ে থাকতে হবে ভাবলেই ভয়াবহ লাগত বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সারা জীবন একসঙ্গে থাকার কথাটা মনে হলে অবাক বোধ করতাম: সত্যি কি আমরা বরাবরের জন্য বাঁধা পড়েছি একসূত্রে, এভাবে কাটবে বার্ধক্য পর্যন্ত, অন্য সকলের মতো ঘর বেঁধে পুত্রকন্যাদি নিয়ে থাকব? শেষের ব্যাপারটা — ঘর বাঁধা ও পুত্রকন্যাদি বিশেষ করে অসহ্য মনে হত।

'এক দিন তো আমাদের বিয়ে হয়ে যাবে,' স্বপ্নালসভাবে ও আমাকে বলত। 'সত্যি, বিয়ে করতে ভয়ানক মন চায়। গির্জায় গিয়ে বিয়ে করার চেয়ে সুন্দর জিনিস আর কীই বা হতে পারে! আমাদের হয়ত বাচ্চা একটা হবে।... তোমার ভালো লাগবে না?'

গোপন মধুর বেদনায় মনটা মুচড়ে উঠত, কিন্তু সেটা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলতাম:

'"অমর জনেরা সৃষ্টি করেন, আর মরণশীল মানুষ নিজেদের মতো লোকের জন্ম দেয়।"'

'আর আমি?' ও শুধাল। 'যখন আমাদের ভালোবাসা

আর যৌবন শেষ হয়ে যাবে, যখন আমাকে তোমার আর ভালো লাগবে না, তখন কী নিয়ে বাঁচব?'

কথাটায় অত্যন্ত বিষাদের রেশ, তাই গভীর আবেগে ঘোষণা করলাম:

'কিছুই শেষ হবে না, তোমাকে চাওয়ার শেষ আমার কখনো হবে না!'

সব কিছুতে আমার স্বাধীনতা ও প্রাধান্য বজায় রেখে এখন আমি চাই ভালোবাসা পেতে ও ভালোবাসতে (ঠিক ও যেমন চেয়েছিল ওরিওলে)।

সবচেয়ে বেশী আমার মনে নাড়া দিত ও যখন শোবার সময় বিনুনি বেঁধে আমার কাছে এসে চুমু খেয়ে শুভরাত্রি জানাত; দেখতাম উঁচু হিল না থাকলে ও কত না ছোট — আমার চোখে চোখ রাখার জন্য মাথা বেশ উঁচু করতে হয় ওকে।

কিন্তু ওকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতাম সেই সব মুহূর্তে যখন আমার প্রতি একনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়ে নিজের সাধ ও ইচ্ছে বরবাদ করে অনুভূতি ও কাজের একটা স্বকীয় বিশিষ্টতায় আমার অধিকার ও মেনে নিত।

ওরিওলে কাটানো সেই শীতকালের কথা, কী করে ছাড়াছাড়ি হল, কী করে আমি চলে গেলাম ভিতেব্‌স্কে — সেসব কথা প্রায়ই আমরা মনে করতাম; আমি তখন বলতাম:

'পলোৎস্ক জায়গাটার কী মোহ ছিল সত্যি আমার কাছে? জানো পলোৎস্ক শব্দটা বহুকাল ধরে আমার মনে জড়িত প্রাচীন কিয়েভের প্রিন্স ভ্‌সেস্লাভের*) বিষয়ে একটি উপকথার সঙ্গে — স্কুলে যখন ছিলাম তখন কোথায়

যেন উপকথাটি পড়ি: প্রিন্স ভ্সেস্লাভকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর ভাই, আর তিনি 'পলোৎস্কবাসীদের অন্ধকার দেশে' পালিয়ে গিয়ে জীবন শেষ করেন 'মিতব্যয়ী দারিদ্র্যে', কৃচ্ছ্রসাধনায়, প্রার্থনায়, পরিশ্রমে ও 'মোহাচ্ছন্ন স্মৃতিতে': 'তিক্ত মধুর অশ্রুজলে' ভোর হবার এক ঘণ্টা আগে ঘুম ভাঙত তাঁর, মনে লেগে থাকত রঙীন স্বপ্ন যে আবার তিনি কিয়েভে, আছেন 'তাঁর সেই সত্যিকার রাজকীয় মর্যাদায়', প্রভাত প্রার্থনার এই ঘণ্টাধ্বনি মোটেই পলোৎস্কে নয় — কিয়েভের সেণ্ট সোফিয়া ক্যাথিড্রালের।*) আর এটা পড়ার পর থেকে তখনকার দিনের পলোৎস্ক তার প্রাচীনতা ও বর্বরতায় আমার কাছে সর্বদা নিখুঁত অপরূপ ঠেকেছে: মানসচক্ষে দেখতাম শীতের একটি অন্ধকার হিংস্র দিন, কাঠের গির্জা ও ঝুলকালো কুটিরসুদ্ধ কাঠের তৈরী একটি ক্রেমলিন,* ঘোড়ার খুরে আর ভেড়ার চামড়ার কোট ও গাছের ছালের জুতো পরিহিত লোকেদের পায়ে বরফ দলিত।... তারপর যখন সত্যিকার পলোৎস্কে হাজির হলাম তখন অবশ্য আমার কল্পলোকের পলোৎস্কের সঙ্গে বিন্দুমাত্র মিল দেখলাম না। তবু তখন থেকে আমার কাছে দুটো পলোৎস্ক আছে — স্বপ্নের পলোৎস্ক আর বাস্তব পলোৎস্ক। এখনো কল্পনার জালের ভেতর দিয়ে দেখি আসল পলোৎস্ককে: শহরটা বিরস, স্যাঁতসেঁতে, ঠাণ্ডা, বিষণ্ণ, কিন্তু রেলওয়ে স্টেশনের বড়ো অর্ধচক্রাকার জানলাসুদ্ধ প্রকাণ্ড হলটা গরম; সবে দিনের আলো ম্লান

* প্রাচীন রুশ শহরগুলির অভ্যন্তরে যে নগরদুর্গ থাকত তাকে 'ক্রেমলিন' বলা হত।

হয়ে যেতে শুরু করেছে বটে, তবু বাতির ঝাড়ে আলো জবালানো হয়েছে, ফৌজী ও বেসামরিক পোশাকে সজ্জিত লোকেদের ভিড় সে ঘরে, পিতার্সবুর্গগামী ট্রেন আসার আগে তাড়াহুড়ো করে তারা খেয়ে নিচ্ছে, কণ্ঠস্বরে, প্লেটে ছুরি লাগার শব্দে, ট্রে'তে করে সুগন্ধি বাঁধাকপির সুপ নিয়ে যাওয়া ওয়েটারদের ছুটোছুটিতে হৈচৈ পড়ে গেছে সবখানে।...

এরকম ভাবে যখনি কথা বলি ও গভীর আগ্রহে শোনে, থামলে পরে বিশ্বাসের সুরে বলে ওঠে: 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝতে পারছি!' আর এ সুযোগ হাতছাড়া না করে আমি ওকে বোঝাতাম:

'গ্যেটে বলেছেন: 'আমাদের নিজেদের সৃষ্টির কাছেই আমরা পরাধীন।'*) কয়েকটা ভাবাবেগ আছে যাদের হাত আমি কিছুতেই এড়াতে পারি না, তাদের কাছে অসহায় ঠেকে নিজেকে: থেকে থেকে কোনো একটা জিনিস সম্পর্কে আমার কল্পনা সেখানে যাবার জন্যে এমন একটা যন্ত্রণাকর ব্যাকুলতা আনে, কল্পিত সেই জায়গায় যাবার — মানে সে কল্পনার আড়ালে যা আছে — বুঝেছ তো: আড়ালে! সে তোমাকে বোঝাতে পারব না!'

নীপার উপত্যকার প্রাচীন একটি গ্রাম কাজ্যাচি ব্রদী। উসুরি জেলায়*) আস্তানা বাঁধতে যাচ্ছিল সেখানকার লোকে, তাদের বিদায় জানাতে একবার ভাগিন ও আমি গেলাম সেখানে। ভোরবেলায় ট্রেনে করে ফিরে এলাম একদিন। বাড়িতে পেঁছিলাম যখন, সে ও আমার ভাই অফিসে চলে গেছে। রোদে পুড়ে বেজায় প্রাণবন্ত ও যুৎসই লাগছিল, নিজেকে নিয়ে বেজায় খুশি, অদ্ভুত যে দৃশ্য দেখেছি তার

কথা ওদের বলার জন্য অধৈর্যে অস্থির: দেখেছি দলে দলে লোক যাচ্ছে উপকথার সেই দেশে, কাজাচি ব্রদী থেকে সাত হাজার মাইল দূরে দূরান্তরের! সবকটা ঘর দ্রুত পদক্ষেপে পার হই — ঘরগুলো ফাঁকা, গোছানো। মুখহাত ধুয়ে জামাকাপড় বদলানোর জন্য ঢুকলাম শোবার ঘরে। ড্রেসিং টেবিলে ওর টুকিটাকি জিনিস, বড়ো বালিশের ওপর রাখা লেস-কাটা ওর ছোট্ট বালিশটা দেখলাম আনন্দের অদ্ভুত একটা ব্যথায় — সব কিছু কী অসীম প্রিয় ও নিঃসঙ্গ মনে হল, ওর প্রতি অপরাধ করার চরম সুখের একটা ভাবে মনটা কী তীব্র ব্যথিয়ে উঠল — হঠাৎ চোখে পড়ল বিছানার পাশের টেবিলে একটা খোলা বই। একটু দাঁড়ালাম। তল্‌স্তয়ের 'সুখের সংসার'*), দাগ দেওয়া আছে এই জায়গাটায়: 'আমার তখনকার সমস্ত ভাবনা, তখনকার সমস্ত অনুভূতি আমার নয় — তার। সেগুলি হঠাৎ কখন যেন আমার নিজের হয়ে গেছে।...' গোটা কতক পাতা উলটে দেখলাম আরো কয়েকটা লাইনের নীচে দাগ কাটা: 'সে গ্রীষ্মে আমি প্রায়ই যখন শোবার ঘরে আসতাম তখন আগেকার কামনার জ্বালা ও ভবিষ্যতের আশার বদলে প্রায়ই আমাকে পেয়ে বসত বর্তমানে সুখের জন্য উৎকণ্ঠা।... এইভাবে কাটল গ্রীষ্ম আর নিজেকে আমার মনে হতে লাগল নিঃসঙ্গ। ও সর্বদাই সফরে যেত, আমায় একলা ফেলে রেখে যেতে ওর কষ্ট হত না, ভয় হত না।...'

কয়েক মুহূর্ত স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। বুঝলাম এর আগে কখনো আমার হুঁশ হয় নি যে, আমার জানা নেই এমন কোনো গোপন মনোভাব ওর থাকতে পারে

(এবং আছে)। তার চেয়ে বড়ো কথা, সেসব মনোভাব ও চিন্তা বিষণ্ণ, তারা প্রকাশিত হয়েছে অতীতবাচক ক্রিয়ারূপে! 'আমার **তখনকার** সমস্ত ভাবনা, **তখনকার** সমস্ত অনুভূতি... সে গ্রীষ্মে আমি প্রায়ই **আসতাম**...' শেষ কথাগুলোই অপ্রত্যাশিত: 'এইভাবে কাটল গ্রীষ্ম আর নিজেকে আমার মনে হতে লাগল নিঃসঙ্গ...' তার মানে, সে রাত্রে শিশাকি থেকে আমার ফেরার পর ওর অশ্রুজল দৈবাৎ-গোছের ব্যাপার নয়?

বড়ো বেশী খোশমেজাজের ভান করে অফিসে ঢুকে ফুর্তিতে চুমু খেলাম ওকে ও ভাইকে, বকবকানি, হাসিঠাট্টা চালালাম। মনে গোপন ব্যথা নিয়ে এভাবে চালালাম যতক্ষণ না ওকে একলা পেলাম, আর তক্ষুনি কোনো ভণিতা না করে কর্কশ সুরে বললাম:

'বেশ, আমি যখন ছিলাম না তখন 'সুখের সংসার' পড়া হচ্ছিল, তাই না?'

লাল হয়ে উঠে ও বলল:

'হ্যাঁ। কেন?'

'যেসব লাইনে দাগ দিয়েছ দেখে অবাক হয়ে গেছি!'

'কেন?'

'কেননা তা থেকে এটা স্পষ্ট যে তুমি ইতিমধ্যে আমাকে নিয়ে অসুখী, ইতিমধ্যে তোমার নিঃসঙ্গ ও হতাশ লাগছে।'

'সবসময়ই তোমার বাড়াবাড়ি!' ও বলল। 'হতাশ হব কেন? শুধু মন একটু খারাপ হয়েছিল, আর সত্যি একটা সাদৃশ্য ধরা পড়েছিল আমার কাছে।... কিন্তু তুমি যা ভাবছ মোটেই তা নয়, সত্যি বলছি।'

কাকে বোঝাবার চেষ্টা ও করল? আমাকে না নিজেকে?

যা হোক, যা বলল তা শুনে বেশ খুশি হলাম — ওকে বিশ্বাস করায় আমার একান্ত আগ্রহ, ওকে বিশ্বাস করাটা আমার পক্ষে বেশ যুৎসই। 'রাস্তা থেকে আকাশে উঠল স্তেপের ঝুঁটিওয়ালা গাংচিল।... ও চলেছে তাড়াতাড়ি, কোমরে আঁটো করে জড়ানো নীল একটা কাপড়, পাতলা ব্লাউজের তলায় স্পন্দিত বুক কাঁপছে, পায়ে জুতো নেই, হাঁটু পর্যন্ত নগ্ন পা নবীন রক্তে আর স্বাস্থ্যে জীবন্ত।...' এসবের 'আড়ালে' কতটা ছিল! কী করে নিজেকে বঞ্চিত করি এসব থেকে! তাছাড়া আমার বিশ্বাস ছিল এসব কিছু পেয়েও ওকে রাখতে পারি নিজের কাছে। ছুতো পেলেই ওকে শুধু একটি কথাই বোঝাতাম: ওর উচিত বাঁচা আমার জন্য, আমার মধ্যে, স্বাধীনতা ও খামখেয়াল থেকে আমাকে বঞ্চিত করা উচিত নয় — তোমায় আমি ভালোবাসি আর এর জন্য আরো বেশী ভালোবাসব তোমায়। মনে হত ওকে এত ভালোবাসি যে আমার যা খুশি তাই করা সাজে, সবই আমার মার্জনীয়।

২৫

'তুমি অনেক বদলে গেছ,' ও বলত। 'আজকাল তোমার পৌরুষ আরো বেশী, আরো সহৃদয় ও মধুর তুমি। তাছাড়া আরো হাসিখুশি।'

'তাহলে দেখছ তো! আর আমার ভাই নিকলাই ও তোমার বাবা কিনা সবসময় বলতেন আমরা দু'জনে খুব অসুখী হব!'

'তার কারণ প্রথম থেকেই আমাকে পছন্দ হয় নি

নিকলাইয়ের। বাতুরিনোতে ওর নিষ্প্রাণ ভদ্রতার জন্যে আমার কত কষ্ট হয়েছিল তুমি ভাবতে পারো না।'

'ঠিক তার উল্টো। ও তোমার কথা বলত অত্যন্ত সস্নেহে। আমাকে বলেছিল: 'ওর জন্যে ভয়ানক দুঃখ হয়, বয়স এত কম ওর, আর তোমাদের দু'জনের কপালে কী আছে যখন ভাবি: বছর কয়েক পরে মফস্বলের আবগারি কর্মচারীর জীবনযাত্রার সঙ্গে কী পার্থক্য থাকবে তোমার?' মনে আছে, নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি ঠাট্টা করে কীভাবে আঁকতাম? তিন ঘরের একটা হতচ্ছাড়া ফ্ল্যাট, বেতন মাসে পঞ্চাশ রুব্ল।...'

'ও দুঃখ পেত শুধু তোমার জন্যে।'

'ভারি ওর দুঃখ — বলত, ওর একমাত্র আশা যে আমার 'অসংযম' শুধু হয়ত আমাদের দু'জনকে উদ্ধার করবে, বলত, আমার এই যা চাকরী তাও আমার পক্ষে বড্ডো বেশী হবে, আর বেশীদিন যেতে না যেতে বিচ্ছেদ হবে আমাদের, ও বলত: হয় নিষ্ঠুরতার বশে তুমি ওকে ছেড়ে চলে যাবে, নয় সুমধুর পরিসংখ্যানে কিছুকাল কাটিয়ে ও টের পেয়ে যাবে কী জীবনের নিগড়ে ওকে বেঁধেছ, আর নিজেই ছেড়ে চলে যাবে।'

'আমার ওপর ভরসা না রাখলেও পারত। আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যাব না। তখনি শুধু যাব যদি বুঝি আমাকে তোমার আর দরকার নেই, আমি তোমার পথের কাঁটা, তোমার স্বাধীনতার, তোমার ভবিষ্যতের অন্তরায়।...'

দুর্বিপাকে পড়লে মানুষ বারবার ফিরে আসে সেই একই যন্ত্রণাকর অর্থহীন চিন্তায়: কিসে সূত্রপাত হয়েছিল দুর্বিপাকের? কখন? ছোটখাটো সেসব জিনিস

কী, আর কেন চোখে পড়ে নি সেসব হুঁশিয়ারি সংকেত? 'তখনি শুধু যাব যদি...' কেন মন দিই নি কথাগুলোতে, কেন ধরা পড়ে নি যে ও একটা 'যদি'র সম্ভাবনা বাদ দেয় নি?

নিজের 'ভবিষ্যৎকে' বড়ো বেশী মূল্যবান মনে করতাম। আমার স্বাধীনতার প্রয়োগে অসংযম উত্তরোত্তর বেড়ে চলল — ঠিকই বলেছিল নিকলাই। বাড়িতে থাকা ক্রমশ কষ্টকর হয়ে উঠল: ছুটি পেলেই কোথাও না কোথাও চলে যেতাম, নয়ত ঘুরে বেড়াতাম উদ্দেশ্যহীনভাবে।

'রোদে রঙ এত পোড়ালে কোথায়?' বড়ো হাজিরির সময় ভাই জিজ্ঞেস করত। 'আবার কোথায় যাওয়া হয়েছিল?'

'গিয়েছিলাম মঠে, নদীতে, স্টেশনে।...'

'আর সবসময় একলা,' ভর্ৎসনার সুরে ও বলল। 'কতবার না কথা দিয়েছ আমাকে মঠে নিয়ে যাবে! এতদিনের মধ্যে শুধু একটিবার ওখানে গিয়েছি। জায়গাটা কী সুন্দর, দেয়ালগুলো কী পুরু, সোয়ালো পাখি, মঠবাসী!...'

ওর দিকে চোখ তুলে তাকাতে লজ্জা ও কষ্ট হল। কিন্তু আমার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবার ভয়, তাই শুধু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম:

'মঠবাসীদের নিয়ে তোমার হবে কী?'

'আর তোমার?'

কথাবার্তার মোড় ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম।

'ওখানে কবরখানায় বড়ো অদ্ভুত একটা জিনিস আজ দেখলাম: ফাঁকা একটা কবর! সন্ন্যাসী ভাইদের একজন নিজের জন্যে সেটা খুঁড়িয়ে রেখেছে আগে থেকে। কবরের মাথায় এমনকি একটা ক্রুশ বসানো, মায় সমাধিলিপি

পর্যন্ত আছে, লোকটার নাম, জন্মের তারিখ, এমনকি 'মৃত্যু' কথাটি পর্যন্ত বসানো, খালি ভবিষ্যৎ মৃত্যুর তারিখের জায়গাটা ফাঁকা। চারিদিক ছিমছাম, সযত্নে রক্ষিত, সুন্দর হাঁটার পথ, ফুল — আর হঠাৎ প্রতীক্ষারত কবরটা।'

'দেখলে তো?'

'দেখার কী আছে?'

'তুমি ইচ্ছে করে আমাকে ভুল বুঝতে চাইছ। যাক, কিছু এসে যায় না। তুর্গেনেভ সত্যি বলেছিলেন।...'

বাধা দিলাম ওকে।

'আমার মনে হয় তোমার সব পড়ার মোদ্দা কথাটা এখন হল তোমার ও আমার বিষয়ে কিছু খুঁজে বের করা। তবে সব মেয়েরাই পড়ে এভাবে।'

'বেশ, আমি না হয় মেয়েমানুষ, কিন্তু তোমার মতো স্বার্থপর নই।...'

সস্নেহে বাধা দিত আমার ভাই:

'ব্যস, ব্যস, হয়েছে!'

২৬

গ্রীষ্মের শেষাশেষি অফিসে আমার হালও এমনকি আরো সুবিধাজনক হয়ে দাঁড়াল: আগে শুধু 'যোগ' ছিল অফিসের সঙ্গে, এখন স্টাফে নিয়ে নতুন একটা কাজ দেওয়া হল আমাকে — আমার পক্ষে এর চেয়ে বেশী যুৎসই কাজ আর হতে পারে না: ইউনিয়ন বোর্ডের লাইব্রেরীর ভার দেওয়া হল আমাকে। লাইব্রেরী মানে গুদামে প্রশাসনিক নানা বিষয়ে ছাপা বইয়ের স্তূপ। সুলিমার মাথা থেকে উদ্ভাবিত নতুন কাজের দরুন আমাকে এসব বই বাছাই

করে একটা ঘরে সুশৃংখলভাবে সাজিয়ে রাখতে হবে। তার জন্য ঘরটা সাফ করা হল বিশেষ করে — মাটির নীচে খিলান-দেওয়া লম্বা ঘরটাতে যেমন-যেমন দরকার তাক আর বুকশেল্ফ। সাজানোর পর বইগুলোর দেখাশোনা করা, আর কোনো বিভাগের কখনও দরকার হলে পড়তে দেওয়া। বাছাই করে তাকে গুছিয়ে রেখে তাদের দেখাশোনা করা ও ধার দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলাম। কিন্তু শুধু হেমন্তকালে ইউনিয়ন বোর্ডের বাৎসরিক মিটিং-এর আগে গুটি কতক বই দেওয়া ছাড়া আর কখনও বই দিতে হত না কাউকে। তাই করার মধ্যে কেবল রইল তাদের দেখাশোনা, অর্থাৎ কোনো কাজ নেই, কেবল মাটির নীচের ঘরটায় বসে থাকা। ঘরটাকে ভারি ভালোবেসে ফেললাম -- দুর্গপ্রাকারের মতো পুরু অসাধারণ তার দেয়াল, খিলান-দেওয়া ছাদ, গভীর স্তব্ধতা — কোনো শব্দ কখনো ঢোকে না সেখানে — অনেক উঁচুতে ছোট জানলাটা দিয়ে সূর্যের আলো আসে ও চোখে পড়ে বাড়িটার পেছনে পরিত্যক্ত জমিতে নানা ঝোপঝাড় ও ঘাসের মূলের আভাস। আমার স্বাধীনতা আরো বেড়ে গেল: সারাদিন এই সমাধিমন্দিরে বসে একেবারে নিরালায় লেখাপড়া, আর যখন মর্জি তখনি হপ্তা খানেকের জন্য কেটে পড়া, ওক-কাঠের নীচু দরজায় তালাচাবি লাগিয়ে বেরিয়ে যাওয়া, যেখানে মন চায় সেখানে ঘুরে আসা।

কেন জানি না গিয়েছিলাম নিকলায়েভে। প্রায়ই হেঁটে যেতাম উপকণ্ঠের একটা খামার বাড়িতে — সাধু জীবন

অতিবাহিত করার জন্য সেটা ভাড়া নিয়েছিল তলস্তয়পন্থী দুই ভাই। কিছুদিন প্রতি রবিবার কাটালাম শহরের পরের স্টেশন পেরিয়ে একটি বড়ো ইউক্রেনীয় গ্রামে, ফিরে আসতাম রাত্রের ট্রেনে।... এসব হাঁটাহাঁটি ও ভ্রমণের কী মানে? আমার ঘুরে-বেড়ানোর পিছনে সব কিছু বাদ দিয়ে গোপন যে জিনিসটি ছিল সেটি টের পেত লিকা। শিশাকির সেই মেয়ে-কম্পাউন্ডারটির বিবরণে তার মনে এত যে দাগ কেটেছিল ভাবি নি।

এর পর থেকে তাকে হানা দিতে লাগল ঈর্ষা; দমনের চেষ্টা করত বটে, তবু লুকিয়ে রাখতে পারত না। যেমন শিশাকির ঘটনা তাকে বলার প্রায় দু'সপ্তাহ পরে হঠাৎ এমন একটি কাজ সে করে বসল যেটা তার উদার, মহৎ ও তখনো কুমারীসুলভ স্বভাবের বিরুদ্ধে, যেটা বরং মানায় সাধারণ 'গিন্নীবান্নি গোছের স্ত্রীলোককে' — কী একটা ছুতো বের করে কর্কশ দৃঢ়তায় ছাড়িয়েছিল কসাক সেই মেয়েটিকে যে আমাদের কাজ করত:

'খুব জানি, তুমি ব্যথা পেয়েছ,' আমাকে বলল বিচ্ছিরিভাবে। 'ব্যথা না পেয়ে উপায় কী: তুমি যাকে বলো 'মেয়ে-ঘোড়া', কেমন জুতোর গোড়ালি 'খটখটিয়ে' সে এঘর-ওঘর করে, সত্যি ওর পায়ের গোড়ালি কত সুঠাম, কী ঝকঝকে বাঁকা চোখ! কিন্তু ভুলে যাচ্ছ কেন যে 'মেয়ে-ঘোড়াটি' বেয়াড়া আর একগুঁয়ে। আমার ধৈর্যের তো একটা সীমা আছে।...'

আমি জবাব দিলাম অকপটভাবে, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে:

'আমাকে নিয়ে কী করে তোমার ঈর্ষা হতে পারে? এই

তো আমি চেয়ে চেয়ে দেখছি তোমার অনবদ্য বাহু আর ভাবছি: দুনিয়ার সবকটা সুন্দরীর বদলেও দেব না এই বাহু! কিন্তু আমি কবি, শিল্পী, আর গ্যেটে বলছেন সব শিল্পই ইন্দ্রিয়পরায়ণ।'

২৭

আগস্টের একটি সন্ধ্যায় প্রায় দিন শেষে রওনা হলাম তলস্তয়পন্থী দু'জনের কুটিরের দিকে। সে গুমোট প্রহরে শহরের পথঘাট জনহীন, তাছাড়া সেদিন শনিবার। ইহুদীদের বন্ধ দোকান ও চালার সারি হেঁটে পার হলাম। সান্ধ্যপ্রার্থনার মৃদু ঘণ্টাধ্বনি উঠছে, গাছ ও বাড়িগুলোর ছায়া তখনই দীর্ঘ হয়ে এসেছে, তবু গ্রীষ্মশেষে পড়ন্ত বেলায় দক্ষিণী শহরগুলোর বিশিষ্ট গুমোটভাব আবহাওয়ায়, পার্কে ও বাড়ির সামনের বাগানগুলোয় পর্যন্ত দিনের পর দিন রোদে তেতে সব কিছু খরা, আর সব কিছু সর্বত্র — শহরে, স্তেপে, তরমুজ ক্ষেত্রে অলস তন্দ্রায় মগ্ন গর্মিকালের দীর্ঘ উত্তাপে।

চকে. শহরের কুয়োর পাশে, দাঁড়িয়ে একটি ইউক্রেনীয় মেয়ে — যেন খোদাই করা দেবীমূর্তি — মোজাবিহীন পা ইস্পাতের নাল দেওয়া জুতোয় আচ্ছাদিত; চোখজোড়া বাদামি, ভুরুতে সেই বিশেষ একটি শুচিতা যেটা দেখা যায় ইউক্রেন ও পোল্যাণ্ডের মেয়েদের মধ্যে। চক থেকে উপত্যকার দিকে নেমে-যাওয়া রাস্তাটা দক্ষিণ দিগন্তের সান্ধ্য বিস্তারের মুখোমুখি, ছোট ছোট পাহাড় প্রায় দেখা যায় না। বড়ো রাস্তা থেকে মোড় নিলাম একটা সরু গলিতে — উপকণ্ঠে মধ্যবিত্ত সব বাড়ির মাঝখান দিয়ে চলে গেছে

পথটা। ঘাসের মাঠে বেরিয়ে এলাম পাহাড়ে উঠে স্তেপে নামার জন্য। ক্ষেতে, মাড়াইয়ের জায়গায়, নীল ও সাদা কুঁড়েঘরগুলোর মাঝে মাড়াইয়ের লাঠির ঝিলিক: গ্রীষ্মের রাত্রে যেসব ছোকরারা মুখ দিয়ে অদ্ভুত বুনো আওয়াজ করে বা স্তোত্রের মতো গান গায় এত চমৎকার, তারাই এখন মাড়াইয়ের কাজে ব্যস্ত। পাহাড়ের চূড়া থেকে যতদূর চোখ যায় ততদূর সারা স্তেপে সোনালি শস্যের ঘন নাড়া। চওড়া রাস্তায় নরম ধুলো এত গভীরভাবে বসেছে যে মনে হয় মখমলের সোল দেওয়া জুতো পরে হাঁটছি। আর চারপাশের সব কিছু — গোটা স্তেপ, আর সমস্ত হাওয়াটা পর্যন্ত — অস্তরবির চোখ-ধাঁধানো আলোয় ঝলকিত। রাস্তার বাঁ দিকে, উপত্যকার ওপর পাহাড়ে চুনকালি খসা সাদা দেয়াল দেওয়া একটা কুটির: এখানেই থাকে তল্‌স্তয়পন্থীরা। রাস্তা ছেড়ে শস্য কাটা মাঠের ওপর দিয়ে চললাম সে দিকে। কিন্তু গিয়ে দেখি কেউ নেই। খোলা জানলার দিকে তাকাতে চোখে পড়ল — অসংখ্য ভনভনে কালো মাছি ভিড় করেছে দেয়ালে, ছাদে, তাকে রাখা ভাঁড়গুলোর ভেতরে। গোয়ালের খোলা দরজায় উঁকি মেরে দেখলাম — শুকনো গোবরে সূর্যের লাল আভা, আর কিছু না। তরমুজ ক্ষেতে গিয়ে দেখি কনিষ্ঠ ভাইটির স্ত্রী — বসে আছে একটি আলে। কাছে গেলাম — কিন্তু হয় সে আমাকে দেখতে পেল না, নয় না দেখার ভান করল: পাশ ফিরে, একেবারে নড়াচড়া না করে, খালি পা ছড়িয়ে বসে আছে ছোটখাটো নিঃসঙ্গ মেয়েটি, এক হাতে মাটিতে ভর দিয়ে, অন্য হাতে এক টুকরো খড়, সেটা চিবোচ্ছে।

'নমস্কার,' কাছে গিয়ে বললাম। 'আপনাকে এত মনমরা দেখছি কেন?'

'নমস্কার, বসুন,' মৃদু হেসে, খড়ের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রোদে তামাটে হাত বাড়িয়ে দিল।

বসে পড়ে তার দিকে তাকালাম: তরমুজ ক্ষেত্রে নজর রাখা ছোট্ট গেঁয়ো মেয়ের মতো দেখতে অবিকল! রোদে চকচকে চুল, গলাখোলা, কিষানিসুলভ ব্লাউজ গায়ে, জীর্ণ কালো স্কার্ট আঁটো হয়ে বসেছে রমণীসুলভ ভরা পাছায়। ছোট ছোট খালি পা ধুলোয় ভরা, রোদে পুড়ে শুকনো ও কালো খালি পায়ে কী করে হাঁটে কাঁটার মতো ঘাস আর গোবরের ওপর দিয়ে অবাক হয়ে ভাবলাম। আমাদের শ্রেণীর মেয়েরা পা ঢেকে রাখে লোকচক্ষুর আড়ালে, সেই শ্রেণীর মেয়ে ও, তাই ওর পায়ের দিকে তাকাতে ইচ্ছে হত; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তি বোধ করতাম। আমি চেয়ে আছি টের পেয়ে মেয়েটি পাদুটো গুটিয়ে নিল।

'আর সবাই কোথায়?' জিজ্ঞেস করলাম।

আবার মৃদু হাসল সে।

'যে যেখানে খুশি গিয়েছে। পুণ্যাত্মাদের একজন মাঠে গেছেন মাড়াই করতে, কোনো গরীব বিধবাটিধবাকে সাহায্য করছেন আর কি, আর একজন শহরে গেছেন গুরুদেবকে লেখা চিঠি ডাকে দিতে: চিঠিগুলো হল আমাদের পাপবুদ্ধি, প্রলোভন, মরদেহের সব দুর্বলতা জয়ের সাপ্তাহিক হিসেব। তাছাড়া — আমাদের হালের একটা 'অগ্নিপরীক্ষার' কথাও জানাতে হবে কিনা: খারকভে পাভ্‌লভস্কি-ভাই ধরা পড়েছেন লিফলেট বিলি

করার জন্যে — তাতে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়ার নিন্দে ছিল বৈকি!'

'আপনার মেজাজ কেমন যেন বিগড়ে আছে দেখছি।'

'অরুচি ধরে গেছে,' মাথা ঝাঁকিয়ে পেছনে হেলিয়ে সে বলল। 'আর পারি না,' মৃদু কণ্ঠে যোগ ছিল।

'কি পারেন না?'

'সব কিছু অসহ্য। একটা সিগারেট দিন তো।'

'সিগারেট?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সিগারেট!'

সিগারেট দিয়ে দেশলাই জ্বালালাম, মেয়েটি বেখাপ্পাভাবে তাড়াতাড়ি সিগারেট ধরাল। অস্থিরভাবে থেকে থেকে টান দিয়ে, আর সব মেয়েদের মতো ঠোঁট ফুলিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে চুপ করে গেল সে, তাকিয়ে রইল উপত্যকা ছাড়িয়ে। দিগন্তের সূর্য তখনি তপ্ত হয়ে উঠেছে আমাদের পিঠে, আমাদের পাশের ভারি ভারি লম্বাটে তরমুজের ওপর — সেগুলোর চাপে মাটিতে দাগ পড়েছে, তাদের শুকনো ডাঁটা সাপের মতো জড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। হঠাৎ মেয়েটি সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমার কোলে মুখ রেখে ফোঁপাতে শুরু করল লোভীর মতো। আর যেভাবে তাকে সান্ত্বনা দিলাম, রোদের গন্ধভরা চুলে চুমো খেলাম, কাঁধে চাপ দিয়ে তাকিয়ে রইলাম পায়ের দিকে, তা থেকে আমার কাছে জলের মতো স্পষ্ট হয়ে গেল তলস্তয়ের চেলাদের প্রতি আমার এত টানের কারণটা কী।...

আর নিকলায়েভ? সেখানে যেতাম কেন? পথে যেতে যেতে লিখেছিলাম:

'সবে ক্রেমেন্‌চুগ ছেড়েছি, সন্ধ্যা নেমেছে। ক্রেমেন্‌চুগ স্টেশনে, প্ল্যাটফর্মে, রেস্তোরাঁয় লোকের ভিড়, দক্ষিণী গুমোট, দক্ষিণী ঠেলাঠেলি। ট্রেনে সেই একই ব্যাপার। বেশীর ভাগই ইউক্রেনের মেয়ে, সবায়ের সোমত্ত বয়স, সবাই রোদে তামাটে, ছটফটে, যাত্রা আর গরমের ঠেলায় উত্তেজিত — চলেছে দক্ষিণে, কাজ করতে। ওদের দেহ আর চাষীর পোশাক-আশাকের গরম গন্ধ মনকে এত নাড়া দেয়, এত বকবকানি ওদের, এত খানাপিনা, বাদাম-রঙা চোখের এত ঝিলিক, তড়বড়ে বুলিতে এত ফষ্টিনষ্টি যে বেশ একটা কষ্ট হয়।...

'নীপারের ওপর দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ একটি সেতু, ডাইনের জানলা দিয়ে আসছে টকটকে লাল চোখ-ঝলসানো সূর্যের আলো, নীচে বিস্তৃত ফেঁপে ওঠা হলুদ জল। বালুময় তীরে অনেক মেয়ে একেবারে অবাধে সব জামাকাপড় খুলে নগ্ন হয়ে স্নান করছে নদীতে। একটি মেয়ে সেমিজ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দৌড়িয়ে বেঢপভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়ল জলে, পা ছুঁড়ে জলে সে কি লণ্ডভণ্ড।...

'নীপার অনেকক্ষণ ছাড়িয়ে এসেছি। কাটা ঘাসের গুচ্ছ ও শস্য নাড়ায় আবৃত নিরানন্দ পাহাড়ে সন্ধ্যার ছায়া। কেন জানি না মনে পড়ে গেল অভিশপ্ত স্ভিয়াতপল্‌কের কথা*) : ছোট একটা দলের আগে আগে এই উপত্যকা হয়ে এরকম একটা সন্ধ্যায় ও ঘোড়ায় চেপে চলেছে — যেন দেখতে পাই — কোথায় চলেছে? মনে কী চিন্তা ওর? আর সেসব তো হাজার বছর আগেকার কথা, এখনও পৃথিবীতে সব কিছু কত সুন্দর! না, স্ভিয়াতপল্‌ক নয়, এ হল বুনো চেহারার একটি চাষী — অবসন্ন ঘোড়ায় চেপে মন্থর

গতিতে চলেছে পাহাড়ের মধ্যকার ছায়ায়, তার পেছনে একটি স্ত্রীলোক — হাতদ্বটো পেছনে বাঁধা, এলোমেলো চুল, জোয়ান পাদ্বটো হাঁটু পর্যন্ত নগ্ন, দাঁতে দাঁত চেপে লোকটার মাথার পেছন দিকটায় চেয়ে রয়েছে, আর লোকটির তীক্ষ্ম দৃষ্টি নিবদ্ধ সামনে।...

'ভিজে, চাঁদনী রাত। জানলার বাইরে স্তেপের সমভূমি, রাস্তার কালো কাদা। সমস্ত ট্রেন ঘুমিয়ে পড়েছে, ধুলো পড়া লণ্ঠনে পোড়া মোমবাতির মোটা টুকরো। ভেজানো জানলা দিয়ে ক্ষেতের স্যাঁতসেঁতে ঝলক এসে বেমানানভাবে মিশছে ট্রেনের ভেতরকার ভারি দুর্গন্ধের সঙ্গে। কয়েকটি ইউক্রেনীয় স্ত্রীলোক হাত ছড়িয়ে একেবারে চিৎপাত হয়ে ঘুমোচ্ছে — মুখ হাঁ হয়ে গেছে, ব্লাউজের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে বুক, স্কার্টে লেপটে আছে গুরু নিতম্ব।... একটি এইমাত্র জেগে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। সবাই ঘুমোচ্ছে — বারবার মনে হতে লাগল এই বুঝি ও আমাকে ডাকবে ফিসফিসিয়ে রহস্যভরে।...'

যে গ্রামে রবিবারগুলো কাটাতাম সেটা স্টেশন থেকে বেশী দূর নয়—বিস্তৃত নীচু একটা উপত্যকায়। একদিন ট্রেনে চেপে উদ্দেশ্যহীনভাবে সেই স্টেশনে গিয়ে নামলাম, হেঁটে চললাম গ্রামের দিকে। সন্ধ্যে হয়ে গেছে, দূরে দেখলাম ফলের বাগান ঘেরা কুটিরগুলোর সাদা অস্পষ্ট ছোপ, আরো কাছে বারোয়ারী জায়গাটায় ভেঙে-পড়া হাওয়া-কলের কালো মূর্তি উদ্যত। কাছাকাছি লোকের ভিড়, বেহালায় কিঁচকিঁচিয়ে বেজে উঠল সরস নাচের সুর, শুনলাম কে যেন নাচছে পা ঠুকে।... তারপর কয়েকটি রবিবারের সন্ধ্যা কাটালাম সেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে,

মাঝরাত পর্যন্ত বেহালার বাজনা, নাচন্ত পায়ের শব্দ, একঘেয়ে টানা-টানা গেয়ে-যাওয়া মিলিত কণ্ঠস্বর শুনলাম: কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম একটি মেয়ের পাশে — ভরাট বুক তার, লালচে চুল, পুরু ঠোঁট, হলদে চোখে বিচিত্র দীপ্ত দৃষ্টি, আর ভিড়ের সুবিধের অপব্যয় না করে সঙ্গে সঙ্গে চুপিচুপি হাতড়াতাম এ-ওর হাত। স্থিরভাবে দু'জনে দাঁড়িয়ে থাকতাম পরস্পরের দিকে তাকাবার চেষ্টা না করে; জানতাম যদি গাঁয়ের ছেলেছোকরারা টের পায় কেন শহুরে বাবুটি তাদের আড্ডায় আসতে শুরু করেছেন ঘন ঘন, তাহলে আর রক্ষে নেই। নেহাৎ দৈবক্রমে আমাদের দেখা হয়ে যায় প্রথমবার, কিন্তু তারপর থেকে আমি আসার সঙ্গে সঙ্গে ও ঘুরে গিয়ে নিমেষে বুঝে নিত আমি অত্যন্ত কাছে আছি, আমার হাতটা নিয়ে ধরে থাকত সারা সন্ধ্যা। যত অন্ধকার হত তত শক্তভাবে চাপ দিত আমার হাতে, তত কাঁধ ঘেঁষে দাঁড়াত। রাত্রি গভীর হলে লোকজনের ভিড় কমে যেত, তখন ও চুপিচুপি হাওয়া-কলের অন্য দিকে গিয়ে লুকিয়ে পড়ত তার আড়ালে, আর আমি আস্তে আস্তে রাস্তা ধরে যেতাম স্টেশনে, হাওয়া-কলের আশপাশ থেকে সকলে চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে, একটু নীচু হয়ে দৌড়িয়ে ফিরে আসতাম। ব্যবস্থাটা দু'জনের কেউ কথা বলে ঠিক করে নি। হাওয়া-কলের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে — দু'জনে নিঃশব্দ আনন্দের উচ্ছ্বাসে যন্ত্রণা পেতাম। একদিন রাত্রে আমার সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত গেল মেয়েটি। আধ-ঘণ্টা পরে ট্রেন আসার কথা। অন্ধকার ও স্তব্ধ স্টেশন — শুধু ঝিঁঝিঁ পোকার মন-জুড়ানো ডাক। গ্রামের ওপর অনেক দূরে, অন্ধকার বাগানের ওপর

ঘন রক্তাভায় চাঁদ উঠল মন্থর গতিতে। সাইডিং-এ দরজা খোলা একটি মালগাড়ির কামরা। ঝোঁকের মাথায়, কী করছি তাতে নিজেই ভয় পেয়ে কামরাটার দিকে তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে ভেতরে ঢুকলাম, পিছু পিছু এসে সে আমার গলা আঁকড়ে ধরল। কোথায় আছি দেখার জন্য দেশলাই জ্বালিয়ে — হটে এলাম বিভীষিকায়: দেশলাইয়ের আলোয় দেখা গেল মেঝের মাঝখানে লম্বা সস্তা একটা কফিন। বুনো ছাগলের মতো চট করে বেরিয়ে গেল মেয়েটি, আমিও লাফ মারলাম তার পিছু পিছু। কামরা থেকে বেরিয়ে এসে সে বারবার অন্ধকারে হোঁচট খেতে লাগল, হাসিতে দম বন্ধ হয়ে এসেছে, বারবার আমাকে চুমো খাচ্ছে পাগলের মতো আত্মহারা হয়ে, এদিকে আমার একমাত্র ইচ্ছে সেখান থেকে চলে যাওয়া। তারপর সে গ্রামের মুখো আর কখনো হই নি।

২৮

বছরের শেষাশেষি শহরে উৎসব গোছের যে পর্ব শুরু হয় সর্বদা, তার অভিজ্ঞতা হল হেমন্তে — প্রদেশের বাৎসরিক অধিবেশনের সময় সেটা, সারা প্রদেশ থেকে নানা শহরের পৌরসভার সভ্যরা আসেন তখন। শীতকালটাও বেশ ফুর্তিতে কাটল: ইউক্রেনীয় থিয়েটারের সঙ্গে সফরে এল জান্‌কভেৎস্কায়া*) ও সাক্সাগান্‌স্কি*), রাজধানীর নামকরা লোক — চের্নভ*), ইয়াকভ্‌লেভ*) ও ম্রাভিনার*) জলসা, ছিল বেশ কয়েকটা বলনাচ, মুখোস-পরে উৎসব আর সম্বর্ধনা। বাৎসরিক অধিবেশনের পর

একবার মস্কোয় গেলাম তল্স্তয়কে দেখতে। ফিরে এসে বেশ রসিয়ে গা ভাসিয়ে দিলাম পার্থিব আনন্দে। আর পার্থিব আনন্দের ফলে আমাদের জীবনের বাহ্যিক দিকে এল বিশেষ পরিবর্তন। যতদূর মনে পড়ে, একটি সন্ধ্যাও আমরা বাড়িতে কাটাই নি। এসবের ফলে আমাদের সম্পর্কে যে পরিবর্তন অলক্ষিতে এল সেটা শুভ নয়।

'তুমি আবার কেমন যেন বদলে যাচ্ছ,' একদিন ও বলল। 'তুমি এখন রীতিমতো জোয়ান। আর কেন জানি মুখে ফরাসীমার্কা নুর রাখতে শুরু করেছ।...'

'কেন, নুরটা তোমার অপছন্দ?'

'ভালো লাগবে না কেন? তবে সব কিছু এত ক্ষণিকের ব্যাপার!'

'তা বটে। তোমাকেও সোমত্ত যুবতীর মতো দেখাতে শুরু করেছে। চেহারাটা আগের চেয়ে পাতলা আর সুন্দর হয়েছে।'

'আর তোমার মধ্যে আবার হিংসা দেখা দিয়েছে। এখন একটা কথা বলতে কিন্তু ভয় করছে আমার।'

'কী বলো তো?'

'পরের বারের মুখোস-পরা উৎসবে একটা ফ্যান্সি ড্রেস পরতে পারলে ভালো হত। দামী নয়, খুব সাদাসিধে। কালো লেসের মুখোস আর সঙ্গে কালো লম্বা ঢলঢলে একটা কিছু।...'

'কী সাজবে?'

'নিশা।'

'আবার ওরিওলের মতো ভাবসাব দেখছি, তাই না? নিশা! ওটা একটু শস্তাগোছের ব্যাপার।'

'শস্তা বা খারাপ কিছু আমি তো দেখছি না,' শুকনো, স্বাবলম্বী গলায় জবাব দিল ও। আমার বুকটা দমে গেল। ওর এই শুকনো স্বাবলম্বী ভাবে সত্যি সত্যি এমন কিছু একটা টের পেলাম যেটা ওরিওলের সেই সব দিন ফিরিয়ে আনল। — 'তোমার আবার হিংসে শুরু হয়েছে, এই যা।'

'আবার হিংসুটে হলাম কেন?'

'তা জানি না।'

'জানো বৈকি। কারণ হল তুমি আবার আমার কাছ থেকে সরে যাচ্ছ, আবার তুমি চাও লোকে তোমাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে প্রেম নিবেদন করুক।'

ও বিদ্বেষের হাসি হাসল:

'এটা বলা তোমার সাজে না। গোটা শীতটা তো চের্কাসভার পাশ ছাড়া হও নি একেবারে।'

লাল হয়ে উঠলাম।

'পাশ ছাড়া হই নি বটে! আমরা যেখানে যাই সেখানেই ও হাজির হয়, সেটা কি আমার দোষ? আমার সঙ্গে তোমার ব্যবহার আগেকার মতো খোলাখুলি নয়, যেন কী একটা গোপন কথা আছে, এতেই আমার সবচেয়ে কষ্ট লাগে। সোজাসুজি বলো তো, কথাটা কী? কী গোপন কথা পুষে রেখেছ?'

'কী লুকিয়ে রেখেছি?' ও বলল। 'আমাদের আগেকার প্রেম আর নেই, সেই দুঃখ। কিন্তু এ নিয়ে কথা বলে কী লাভ।...'

একটু থেমে আরো বলল:

'আর মুখোস-পরা উৎসব, সেটা যদি তোমার এত খারাপ

লাগে তাহলে একেবারে ছাড়ান দিতে তৈরী আছি। আমার প্রতি তুমি বড্ডো কড়া, আমার সব মনের সাধকে শস্তা বলো, সব কিছু থেকে আমাকে বঞ্চিত করো অথচ নিজে কিছু করতে ছাড়ো না।...'

সেই বসন্ত ও গ্রীষ্মে আবার অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম। শরতের গোড়ার দিকে আবার দেখা হয়ে গেল চের্কাসভার সঙ্গে (তখন পর্যন্ত সত্যি সত্যি আমাদের মধ্যে কিছু ঘটে নি), শুনলাম ও চলে যাচ্ছে কিয়েভে।

'আপনাকে চিরদিনের জন্য ছেড়ে চলে যাচ্ছি, প্রিয় বন্ধু, বাজপাখির মতো তীক্ষ্ন চোখে আমার দিকে চেয়ে চের্কাসভা বলল। 'স্বামী অধীর হয়ে পড়েছেন আমার প্রতীক্ষায়। ক্রেমেন্‌চুগ পর্যন্ত আমার সঙ্গে যাবেন কি? অবশ্য, একেবারে জানাজানি না করে। ওখানে স্টীমারের প্রতীক্ষায় আমাকে পুরো একটা রাত কাটাতে হবে।...'

২৯

এটা ঘটে নভেম্বরে। আজও দেখি, আজও অনুভব করি বিরস ইউক্রেনীয় শহরটিতে সেই গতিহীন গম্ভীর দিন ক'টি, কাঠের সংকীর্ণ ফুটপাথ ও জনহীন রাস্তা, বেড়ার ওধারে কালো বাগান, বুল্‌ভারের দু'পাশে দীর্ঘ নিষ্পত্র পপ্‌লার গাছ, শহরের রিক্ত পার্ক, গ্রীষ্মকালীন রেস্তোরাঁর জানলা বন্ধ, সেসব দিনের ভিজে হাওয়া, পাতা পচার কবরখানাসুলভ গন্ধ — আর রাস্তায় ও পার্কে বিরস উদ্দেশ্যহীনভাবে আমার ঘুরে বেড়ানো, মনে একই নাছোড়বান্দা চিন্তা ও স্মৃতির ভার... স্মৃতির ভার — সত্যি

স্মৃতি এত বেদনাকর, এত ভয়ংকর যে তার হাত থেকে রেহাই পাবার একটি বিশেষ প্রার্থনাও আছে।

যে গোপন যন্ত্রণার আভাস মাঝে মাঝে সে দিত সেগুলি একদিন নিদারুণ একটি মুহূর্তে পাগল করে দিল ওকে। সেদিন আমার ভাই গেওর্গি কাজ থেকে ফিরেছে দেরীতে, আমার ফিরতে আরো দেরী হল — আমাদের দু'জনের যে দেরী হবে ও জানত, কারণ বোর্ডে তখন বাৎসরিক অধিবেশনের প্রস্তুতি চলেছে। বাড়িতে একেবারে একলা থাকত ও, প্রত্যেক মাসে সাধারণত যেমন, কয়েকদিন বেরোয় নি মোটে, এবং সে সময়টায় সাধারণত যেমন হত, ও ঠিক আত্মস্থ ছিল না। নিশ্চয় শোবার ঘরে সোফায় বরাবরকার মতো পা গুটিয়ে অনেকক্ষণ শুয়ে শুয়ে একটার পর একটা সিগারেট খেয়েছে — এভাবে সিগারেট খাওয়া হালের অভ্যেস, অভ্যেসটা ওর পক্ষে ভালো নয় বলে ছেড়ে দেওয়ার আমার সব অনুরোধ ও উপরোধে ও কান দেয় নি — মনে হয়, সামনে চোখ মেলে অনেকক্ষণ ধরে, হঠাৎ উঠে পড়ে এক টুকরো কাগজে কয়েকটা লাইন আমাকে লেখে ধীরস্থির হাতে; অফিস থেকে ফিরে আমার ভাই ফাঁকা ঘরে কাগজের টুকরোটা দেখে তার ড্রেসিং টেবিলে — তারপর তাড়াহুড়োয় কয়েকটা জিনিস গুছিয়ে — বাকি সব ফেলে রেখে যায় — ঘরের এদিকে-ওদিকে যেমন-তেমন করে ছড়ানো সেসব জিনিস তুলে লুকিয়ে রাখার সাহস আমার হয় নি অনেকক্ষণ। রাত্রে বাপের বাড়িতে যাবার পথের অনেকটা সে চলে গেছে ততক্ষণে।... কিন্তু তখনি ওর পিছু ধাওয়া করলাম না কেন? লজ্জিত বোধ করেছিলাম, সেজন্য হয়ত, তাছাড়া

ভালো করে জানতাম জীবনের কয়েকটি মুহূর্তে ও নাছোড়বান্দা, সেজন্য হয়ত। আমার কয়েকটা টেলিগ্রাম ও চিঠির জবাব অবশেষে এল, কয়েকটি মাত্র শব্দ: 'আমার মেয়ে চলে গেছে, কোথায় আছে কাউকে জানাতে বারণ।'

আমার ভাই না থাকলে প্রথমে আমার কী হত জানি না (যদিও তার অবস্থাটা অত্যন্ত গোলমেলে ও অসহায় গোছের)। রাতারাতি পালিয়ে যাবার কারণ বোঝাবার জন্য লেখা চিঠিটা পর্যন্ত আমাকে দেয় নি, আমাকে আগে থেকে তৈরী করার চেষ্টা করল — আর তাও আনাড়ির মতো – অবশেষে বলে ফেলবে বলে ঠিক করে এক ফোঁটা তিক্ত চোখের জল ফেলে চিঠিটা আমাকে দিল। কাগজের টুকরোয় ধীরস্থির হাতে লেখা: 'তুমি যে ক্রমশ আমার কাছ থেকে আরো দূরে সরে যাচ্ছ সেটা আর সইতে পারি না। ক্রমশ বেশী করে আমার ভালোবাসাকে এমন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করাটা আমার সহ্যের বাইরে, আমার অন্তরের প্রেমকে আমি শেষ করে দিতে পারি না, তবু না জেনে আমার উপায় নেই যে গ্লানির শেষ সীমায় পেঁৗছিয়েছি। আমার সব ছেলেমানুষি সাধ আর স্বপ্ন পেঁৗছিয়েছে মোহভঙ্গের শেষ সীমায়, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আমাদের ছাড়াছাড়ি সহ্য করার, আমাকে ভোলার, তোমার এখন সম্পূর্ণ মুক্ত নতুন জীবনে সুখী হবার শক্তি যেন তোমার হয়...' এক নিঃশ্বাসে সবটা পড়ে ফেললাম। মনে হল পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে, মুখ ও মাথার চামড়া জমে শক্ত হয়ে যাচ্ছে, তবু নিষ্ঠুরের মতো বললাম:

'তা বৈকি, এসব যে হবে জানা উচিত ছিল, 'মোহভঙ্গের' সেই মামুলি ব্যাপার!'

এর পর সাহস করে শোবার ঘরে গিয়ে নির্বিকার মুখে সোফায় শুয়ে পড়লাম। অন্ধকার হয়ে এল, সাবধানে ঘরে উঁকি মারল আমার ভাই — আমি ঘুমের ভান করে রইলাম। কিছু একটা দুর্ঘটনার মুখোমুখি হলেই ওর অবস্থাটা হত বাবার মতো কাছাখোলা, এসব ওর সহ্য হত না। তাই তাড়াতাড়ি নিজেকে বিশ্বাস করাল যে আমি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছি, আর বোর্ডের একটা মিটিং-এ সেই রাত্রেই যাবার আবার বাধ্যবাধকতার সুযোগ নিয়ে চুপচাপ জামাকাপড় পরে ও চলে গেল।... মনে হয় সে রাত্রে নিজেকে গুলি করি নি শুধু এই জন্য যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আজ না হলেও কালকে নিশ্চয় আত্মহত্যা করব। দুধের মতো জ্যোৎস্না বাগান ভাসিয়ে দিতে ঘর আগেকার চেয়ে আলো হয়ে উঠল, ডাইনিং-রুমে গিয়ে বাতি জ্বালিয়ে আলমারির পাশে দাঁড়িয়ে পুরো এক গেলাস ভোদ্‌কা খেলাম, তারপর আর এক গেলাস।... বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম — কী ভীষণ সব: কী বোবা, উষ্ণ আর স্যাঁতসেঁতে, চারিদিকের সব কিছুতে, রিক্ত বাগানে আর বীথিকার পপ্‌লারগুলোর ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলোর সঙ্গে একাকার ঘন সাদা কুয়াসা। কিন্তু আরো ভীষণ ব্যাপার ফিরে যাওয়া, শোবার ঘরে গিয়ে বাতি জ্বালিয়ে ক্ষীণ আলোয় সেই চোখে পড়া চারিদিকে ছড়ানো মোজা, জুতো, গ্রীষ্মকালীন ফ্রক আর সেই ছোট্ট সুন্দর ড্রেসিং-গাউনটা, দেখা ঘুমতে যাবার আগে যেটাতে ঢাকা তার দেহ আমি আলিঙ্গন করতাম, মুখে লাগত তার উষ্ণ নিঃশ্বাস, আত্মসমর্পণে মুখ ও তুলে ধরত, আমি চুমো খেতাম। এই বিভীষিকা থেকে আমাকে

মুক্তি দিতে পারে শুধু ওর সঙ্গে, ওর সামনে ফেলা ক্ষিপ্ত অশ্রুধারা, কিন্তু ও তো আর নেই!

আর একটি রাত এল। শোবার ঘরের বোবা স্তব্ধতায় মোমবাতির সেই ক্ষীণ আলো। কালো জানলার বাইরে রাত্রির অন্ধকারে গহন হেমন্তের মুষলধারা বৃষ্টির একটানা শব্দ। শুয়ে শুয়ে তাকিয়ে রইলাম ঘরের কোণে— ওখানকার পুরনো আইকনটার সামনে রোজ রাত্রে ও প্রার্থনা করত: যেন ঢালাই করা পুরনো তক্তা সিঁদুর রঙে রাঙা, আর লাল রঙে বার্নিশ করা এই পটে সোনালি বেশভূষায় কুমারী মেরির কঠোর বিষণ্ণ মূর্তি, টানা টানা কালো চোখ তাকিয়ে আছে সুদূর পরপারে—চোখের চারপাশে কালো রেখা! এই কালো রেখা কী ভয়াবহ। আর কী ভয়াবহ আমার কালাপাহাড়ি ভাবানুসঙ্গ: ও — আর কুমারী মেরি, এই প্রতিমূর্তি — আর পালানোর জন্য পাগলের মতো তাড়াহুড়োয় চারদিকে ছড়ানো তার সব মেয়েলি টুকিটাকি জিনিস।

এক সপ্তাহ কাটল, আরো একটি সপ্তাহ, কেটে গেল একটি মাস। অনেক দিন কাজ ছেড়ে দিয়েছি, কোথাও যাই না, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত চেষ্টা করি একটির পর একটি স্মৃতি থেকে মুক্তি পেতে — আর কেন জানি মনে হত: এককালে কোথায় যেন স্লাভ্‌রা ঠিক এইভাবে এক ঘাট থেকে আরেক ঘাটে বনের পথে, খানাখন্দের ওপর দিয়ে 'গুণ টেনে' নিয়ে যেত তাদের মালবোঝাই নৌকো।

৩০

বাড়ি ও শহরের সর্বত্র ওর উপস্থিতির যন্ত্রণা আরো এক মাস সইলাম। অবশেষে মনে হল এ যন্ত্রণা আর সইতে পারি না, ঠিক করলাম যাব বাতুরিনোতে — কিছু দিন কাটাব, ভবিষ্যতের ভাবনা পরে ভাব যাবে।

তাড়াতাড়ি শেষ বার ভাইকে আলিঙ্গন করে বিদায় নিয়ে চলন্ত ট্রেনের কামরায় উঠে পড়লাম — অত্যন্ত বিচিত্র মনে হল কামরায় ঢুকে নিজেকে বলা: এই তো দেখো, আবার পাখির মতো তুমি স্বাধীন! শীতের রাত্রিটা অন্ধকার, বরফ নেই, শুকনো হাওয়ায় ট্রেনের সশব্দ ঘড়ঘড়ানি। স্যুটকেশ নিয়ে কোণে দরজার কাছে একটা জায়গা পেলাম, বসে মনে পড়ে গেল ওর সামনে কত ভালো লাগত পোল্যান্ডের প্রবাদটির পুনরুক্তি করতে: 'সুখের তরে মানুষের সৃষ্টি, ওড়ার তরে যেমন পাখির' — আর গর্জিত ট্রেনের কালো জানলার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম যাতে আমার চোখের জল কেউ না দেখে ফেলে। খারকভে যেতে একটি রাত্রি।... আর খারকভ থেকে দু'বছর আগে চলে আসার সেই আর একটি রাত্রি: বসন্তকাল, ভোরবেলা, দিনের আলো উঁকি দিচ্ছে ট্রেনে আর কী গভীর ঘুমে তখনো সে আচ্ছন্ন।... লণ্ঠনের টিমটিমে আলোয়, ঠেসাঠেসি দুর্গন্ধ কামরায় বসে রইলাম অধীরভাবে, কখন ভোর হবে, কখন খারকভে দেখব লোকজন, চলাফেরা, কখন স্টেশনে খাব এক গেলাস গরম কফি।...

কুর্স্ক এসে পড়ল, স্মৃতিভরা আর একটি শহর: বসন্তের দুপুরে স্টেশনে ওর সঙ্গে লাঞ্চ খাওয়া, ওর আনন্দ:

'জীবনে এই প্রথম স্টেশনে লাঞ্চ খাচ্ছি!' আর এখন এই ধূসর ও অত্যন্ত ঠান্ডা দিনের শেষে, অতিরিক্ত লম্বা ও অস্বাভাবিক মামুলি আমাদের প্যাসেঞ্জার ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে সেই স্টেশনে, বড়ো বড়ো জগদ্দল তৃতীয় শ্রেণীর কামরার অন্তহীন সারি যার জন্য বিখ্যাত কুর্স্ক-খারকভ-আজভ রেলপথটি। নেমে তাকিয়ে দেখলাম। ইঞ্জিনের কালো মূর্তি এত দূরে যে প্রায় চোখে পড়ে না। কেটলি হাতে লোকে ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে গরম জলের জন্য দৌড়চ্ছে রেস্তোরাঁয়, সবক'টি লোকের চেহারা সমান কুৎসিত। আমার কামরার সহযাত্রীদের দেখা গেল প্ল্যাটফর্মে: অস্বাস্থ্যকর মেদে পরিশ্রান্ত উদাসীন চেহারার একটি ব্যবসায়ী, আর ভয়ানক ও অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসু একটি যুবক, যার মুখ আর ঠোঁটের মামুলি শুকনোটে ভাব সারা দিন বিতৃষ্ণা জাগাল আমার মনে। আমার দিকে চকিত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে যুবকটি তাকাল। সারা দিন আমিও তার চোখে পড়েছি, সে ভেবেছিল নিশ্চয়: জমিদার-নন্দন না কী, কে জানে, মুখে দেখছি কথাটি নেই! — যা হোক, হৃদ্যতায় দ্রুত উচ্চারিত একটি মন্তব্য করে সে আমাকে জানিয়ে দিল:

'এখানে হাঁসের রোস্ট কিন্তু হামেশা জলের দরে পাওয়া যায়, বুঝেছেন!'

দাঁড়িয়ে থেকে ভাবলাম সেই রেস্তোরাঁটির কথা যেখানে আমার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব, সেখানে সেই টেবিলটার কথা, আমরা দু'জনে যেখানে একবার লাঞ্চ খেয়েছিলাম। তখনো বরফ পড়ে নি তবু রুশী শীতের রুক্ষ গন্ধ হাওয়ায়। বাতুরিনোতে কী বিরস বিরক্তিতে দিন কাটবে! বাবা ও

মা বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন, অসুখী বোনটি শুকিয়ে যাচ্ছে, দারিদ্র্য-প্রীড়িত জমিদারি, দারিদ্র্যের ছাপ বাড়িতে, কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার দমক রিক্ত নীচু বাগানে, শীতকালের বিশেষ একটা সুরে কুকুরের ঘেউ-ঘেউ — এরকম হাওয়ায় সে ডাকে সর্বদা থাকে কেমন একটা নিষ্প্রয়োজন রিক্ত ভাব।... ট্রেনের পেছন দিকটারও যেন শেষ নেই। প্ল্যাটফর্মের বেড়া পেরিয়ে চোখে পড়ে নিষ্পত্র পপ্‌লারের উঁচু চূড়া আর গাছ পেরিয়ে জমে-যাওয়া পাথরের রাস্তায় সওয়ারীর প্রতীক্ষায় মফস্বলের ছেকড়া ঘোড়ার গাড়ি, যাকে কুস্কর্ বলা হয়, তার বিরস বিরক্তি ও বিষণ্ণতা ফুটে উঠেছে গাড়োয়ানদের চেহারায়। প্ল্যাটফর্মে পপ্‌লার গাছগুলোর তলায় স্ত্রীলোকেরা দাঁড়িয়ে, মাথায় আঁটো করে জড়ানো শালের খুঁট বুকে আড়াআড়ি করে ঝুলিয়ে কোমরে বাঁধা, মুখ ঠাণ্ডায় নীল — ঘ্যানঘেনে উপরোধের সুরে লোককে ডেকে কিনে নিতে বলছে জলের দরের সেই হাঁসগুলো — বেজায় বড়ো বড়ো ফুসকুড়ি-ওঠা চামড়া ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট। যারা কোনক্রমে গরম জলে কেটলি ভরে নিতে পেরেছে তারা চাঙ্গা হয়ে ফিরছে ট্রেনের কামরার উষ্ণতায়; ঠাণ্ডার মৌজে এখন খুশিতে কাঁপছে তারা, দ্রুত পায়ে ফিরতে ফিরতে তালজ্ঞান হারিয়ে দর কষাকষি করছে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে।... অবশেষে নারকীয় বিষাদের একটা হুঙ্কার বেরোল দূরের ইঞ্জিন থেকে, আরো অনেক পথ এখনো পড়ে আছে আমার সামনে, তার শাসানি সে হুঙ্কারে।... ও কোথায় গেছে জানি না, তাই আমার দুর্দশা এত অতল। তা না হলে লজ্জাশরম এড়িয়ে যেকোনো মূল্যেই হোক, অনেক দিন আগেই খুঁজে

পেতে ওকে ফিরিয়ে আনতাম; যাই ঘটুক না কেন — ওর পালিয়ে যাওয়াটা পাগলামির ঝোঁক মাত্র সন্দেহ নেই, শুধু লজ্জার দরুন অনুশোচনার কোনো লক্ষণ ও দেখাচ্ছে না।

বাড়িতে ফিরে এলাম, তিন বছর আগেকার সেই ফিরে আসার সঙ্গে কোনো মিল নেই। সব কিছু দেখলাম আলাদা চোখে। পথে আসতে আসতে বাতুরিনোর বিষয়ে যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে আরো বেশী ছন্নছাড়া সব কিছু: গাঁয়ের সেই সব জরাজীর্ণ কুঁড়েঘর, বুনো ঝাঁকড়া-লোম সব কুকুর, গোবরাটগুলো বসে গেছে শক্ত মাটিতে, তার সামনে বরফে-ঢাকা বর্বর জলের গাড়ি, বাড়িতে যাবার পথে সেই কাদার ঢিবি, বিষন্ন জানলাসুদ্ধ বেজার বাড়িটার সামনের ফাঁকা উঠান, পিতামহ ও প্রপিতামহের আমলের সেই বেঢপ উঁচু ভারী চাল, নীচু চালায় ছায়াচ্ছন্ন দুটি অলিন্দ — কালের প্রকোপে তার কাঠ অঙ্গার-নীল। সমস্ত কিছু পুরনো, পোড়ো, অর্থহীন। দামি ফার গাছটার উঁচু মাথা নুইয়ে দেওয়া হাওয়ার কনকনে ঠাণ্ডা দমকেরও কোনো অর্থ নেই, বাড়ির ছাদের চেয়ে লম্বা গাছটা শীতের রিক্ততায় করুণ চেহারার বাগানের আর সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে। দেখলাম সংসারের জীবনযাত্রায় যে দারিদ্র্য এসেছে তাতে কোনো লুকোচুরি নেই — ইঁটের চুল্লির ফাটলগুলোর উপর মাটি লেপে জোড়াতালি দেওয়া, গরমের লোভে চট বিছানো হয়েছে মেঝেতে।... বাবা শুধু তাঁর হালচালে এসব কিছুকে ছাপিয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন। রোগা আর ছোট হয়ে গেছেন তিনি, চুল একেবারে পাকা, আজকাল তিনি দাড়িগোঁফ কামানোয় কখনো ত্রুটি করেন

না — চুল ভালোভাবে আঁচড়ানো, পোশাকের বিষয়ে সেই পুরনো নিস্পৃহতার ভাব আর নেই। বার্ধক্য ও দারিদ্র্যের এই ওমবাহি প্রয়াস দেখলে কষ্ট হয়। অন্য সকলের চেয়ে বাবা সবল ও হাসিখুশি (আমার খাতিরে নিশ্চয়, আমার কলঙ্ক ও দুর্বিপাকের দরুন)। কম্পিত, ইতিমধ্যে শুকিয়ে যাওয়া হাতে সিগারেট ধরে, আমার দিকে সস্নেহ বিষণ্ণভাবে তাকিয়ে একবার তিনি বলেন:

'তা বেশ, বাছা, সব কিছু নিয়মবাঁধা — যৌবনের সব উত্তেজনা, সব দুঃখ আর সুখ, বার্ধক্যের শান্তি আর স্বস্তি।... লেখাটা কী যেন?' চোখে হাসির ঝিলিক এনে তিনি বললেন: ''শান্তি ভরা আনন্দের', নিপাত যাক সব:

ভীত, নিঃসঙ্গতার এই গহনে
আমাদের গরীবখানায়
বুক ভরে নিই মুক্ত মাঠের নিঃশ্বাস,
স্বাদ পাই শান্তি ভরা আনন্দের।...'

বাবার কথা যখনই ভাবি, অনুশোচনার হাত এড়াতে পারি না — বারবার মনে হয় তাঁর কদর পুরো বুঝি নি, যথেষ্ট ভালোবাসি নি তাঁকে। তাঁর জীবনের, বিশেষ করে তাঁর যৌবনের বিষয়ে কত অল্প জানি — বেশী জানার সুযোগ যখন ছিল তখন আগ্রহ দেখিয়েছি অত্যন্ত কম, তাই সর্বদা নিজেকে দোষী ঠেকে। বারবার চেষ্টা করেও বুঝতে পারি না তিনি ঠিক কী ধরনের মানুষ ছিলেন — একেবারে ভিন্ন যুগের, ভিন্ন জাতের মানুষ, তাঁর গোটা স্বভাবের প্রতিভাশীলতার অবলীলা ও বৈচিত্র্য কেমন বন্ধ্যা

অথচ বিস্ময়কর, কী বিস্ময়কর তাঁর উষ্ণ হৃদয় আর খর বুদ্ধি, যার কাছে ধরা পড়ত সব কিছু, আভাসমাত্রে করায়ত্ত করে নিত সমস্ত কিছু, তাতে ছিল চিত্তের বিরল অকপটতা ও সংগোপনতা, বাহ্যিক সারল্য ও অন্তরের জটিলতা, দৃষ্টির ধীর তীক্ষ্নতা ও হৃদয়ের সুরেলা রোমাণ্টিকতা। সেই শীতকালে আমি বিশে পা দিয়েছি, আর তাঁর বয়স ষাট। এখন বিশ্বাস করা কঠিন যে আমার বয়স কোনো কালে বিশ ছিল, সব কিছু সত্ত্বেও যৌবনের নানা শক্তির বিকাশ তখন সবে শুরু হয়েছিল আমার মধ্যে! আর তাঁর সমস্ত জীবন তো তখনি পিছনে পড়ে রয়েছে। তবু সে শীতকালে আমাকে যা সইতে হয় সেটা তাঁর চেয়ে ভালো করে আর কেউ বোঝে নি, সত্যি, মনে হয় আমার অন্তরে বিষাদ আর যৌবনের সেই সংমিশ্রণ তাঁর মতো করে অনুভব আর কেউ করে নি। আমরা বসেছিলাম তাঁর পড়ার ঘরে। রোদে ভরা স্তব্ধ প্রশান্ত দিন, তখনি বরফে-ঢাকা উঠানের কোমল ঝিলিক দেখা যাচ্ছে কামরার নীচু জানলা দিয়ে, ঘরটা গরম, ধোঁয়াটে ও অগোছালো; অগোছালো আরাম ও কখনো অদলবদল না করা সাদাসিধে আসবাবপত্রের জন্যই ঘরটা আশৈশব আমার প্রিয়, আসবাবপত্রগুলো আমার কাছে মনে হত বাবার নানা অভ্যেস ও রুচি, তাঁর বিষয়ে এবং আমার নিজের ছেলেবেলাকার নানা স্মৃতি থেকে অভিন্ন। 'শান্তি ভরা আনন্দের' কথা বলার সময় সিগারেট রেখে দিয়ে তিনি দেয়াল থেকে নিজের গিটারটি নামিয়ে একটি প্রিয় সুর বাজালেন — লোকসঙ্গীত একটি; তাঁর চোখের দৃষ্টি হয়ে এল ধীরস্থির, খুশিতে ভরা, কী একটা যেন গোপন

সে দৃষ্টিতে — আর সাথে সাথে সে দৃষ্টি জোড় খেল গিটারের কোমল আনন্দের সঙ্গে। তিক্ত উদাস রবে গিটারটা গুন গুন করে চলেছে কী একটা হারানো রতনের বিষয়ে, আমাদের জীবনে সব কিছু শেষ পর্যন্ত ক্ষণভঙ্গুর, চোখের জল ফেলার যোগ্য কিছু নেই, তার বিষয়ে।...

বাড়িতে আসার কিছুদিন পর অনুভূতির তাড়নায় হার মেনে পাগলের মতো ছুটে গেলাম শহরে। সে দিন সন্ধ্যাবেলাতেই ফিরে এলাম খালি হাতে: কেননা ডাক্তার মশাইয়ের বাড়িতে আমাকে ঢুকতে দেওয়া হয় নি। পরিচিত, কিন্তু এখন ভয়ংকর সেই দরজার সামনে শ্লেজ থেকে লাফিয়ে নেমেছিলাম হতাশার দুঃসাহসে, বিভীষিকায় একবার চেয়ে দেখলাম পর্দা আধো-নামানো ডাইনিং-রুমের জানলাগুলোর দিকে, যে ডাইনিং-রুমে এককালে সোফায় ওর সঙ্গে বসে কেটেছে কত সন্ধ্যা, হেমন্তের সেই সব দিন, আমাদের প্রথম দিককার দিনগুলো! — তারপর ঘণ্টায় টান দিলাম জোরে।... খুলে গেল দরজা, মুখোমুখি ওর ভাই, ফ্যাকাসে হয়ে গিয়ে সে পরিষ্কার করে বলল:

'বাবা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান না। আর জানেন তো, ও চলে গেছে।'

এই স্কুলের ছেলেটিই তো সেই হেমন্তে ভল্‌চকের সঙ্গে পাগলের মতো সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করত। আর এখন দেখলাম সামনে দাঁড়িয়ে আছে বেজার চেহারার, বেশ ময়লা রঙের একটি ছোকরা, অফিসারি কায়দার সাদা শার্ট গায়ে, উঁচু বুট পায়ে, ঠোঁটের ওপর নতুন গোঁফের কালো রেখা, ছোট কালো চোখে বিদ্বেষের একগুঁয়ে দৃষ্টি, রোদে তামাটে মুখ এত ফ্যাকাসে যে সবজে একটা ভাব।

'দয়া করে চলে যান,' নীচু গলায় সে বলল, পাতলা শার্টের ভেতর দেখলাম বুক ধক ধক করছে।

তবু সারা শীতকাল প্রতিদিন ওর চিঠির আশায় রইলাম নাছোড়বান্দার মতো — বিশ্বাস করতে পারি নি ও এত নির্দয় হতে পারে পাথরের মতো।

৩১

সে বছরের বসন্তকালে শুনলাম ও বাড়ি ফেরে নিউমোনিয়া নিয়ে, এক সপ্তাহের মধ্যে মারা যায়। আরো শুনলাম ও বলে গিয়েছিল যতদিন সম্ভব ওর মৃত্যুর কথা আমাকে যেন জানানো না হয়।

বাদামি মরক্কোয় বাঁধানো সেই নোটবুকটি এখনও আমার কাছে আছে, প্রথম মাইনে যে দিন ও পায়, যে দিনটি বোধ করি ওর জীবনে সবচেয়ে মর্মস্পর্শী, সেই দিন আমাকে উপহার দিয়েছিল। দেবার সময় প্রথম পাতায় তার লেখা কয়েকটি কথা এখনও পড়া যায় — উত্তেজনায়, তাড়াহুড়োয়, লজ্জায় যাতে দুটি ভুল থেকে গেছে।...

* * *

কিছুদিন আগে রাত্রে ওকে স্বপ্নে দেখি — ওর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর আমার সুদীর্ঘ জীবনে ওই প্রথম। যখন দু'জনার জীবন ও যৌবন অচ্ছেদ্য ছিল ঠিক তখনকারই মতো নবীনা, কিন্তু এরই মধ্যে মুখে এসেছে ঝরা রূপের লাবণ্য। শীর্ণ দেহ, শোকের পরিচ্ছদের মতো

কী একটা পরনে। ওকে দেখলাম ঝাপসাভাবে, কিন্তু দেহে ও মনে এত ঘনিষ্ঠ প্রবল অনুরাগে এবং আনন্দে যে সেরকম অনুভূতি কখনও আর কারো প্রতি হয় নি আমার।

মারিটাইম আল্‌প্‌স, ১৯৩৩

ছায়া বীথি

হেমন্তের ঠাণ্ডা বাদলা দিন। তুলা শহরে চাকার অসংখ্য কালো গভীর খাঁজ-পড়া একটি বৃষ্টিসিক্ত সড়ক ধরে ছুটে এল তিন ঘোড়ার একটি কাদামাখা ত্রোইকা-গাড়ি, আর পাঁচটার মতো দেখতে তিনটে ঘোড়ার লেজ একটু তুলে বাঁধা যাতে বরফ-কাদা না লাগে; গাড়ির হুড অর্ধেক তোলা। ত্রোইকাটি থামল একটি কাঠের লম্বা বাড়ির সামনে। বাড়ির একদিকে সরকারী গাড়ির ঘাঁটি, অন্যদিকে একঘরের একটি ব্যক্তিগত সরাইখানা — সেখানে যাত্রীরা জিরোয়, রাত কাটায়, সামোভার আনতে বলে। গাড়ির কোচবাক্সে যে লোকটি বসে ছিল সে বড়োসড়ো, তাগড়া চেহারার চাষী — তার ওভারকোটটি বেল্ট দিয়ে শক্ত করে বাঁধা, ময়লা গম্ভীর মুখে পাতলা কুচকুচে কালো দাড়ির দরুন চেহারাটা আগেকার দিনের ডাকাতদের মতো, গাড়ির ভেতরে দোহারা চেহারার একটি বৃদ্ধ — মাথায় বড়ো টুপি,

ছাই-রঙা অফিসারী ক্লোকে বীবরের লোমে তৈরী কলারটা ওলটানো। ভদ্রলোকটির ভুরুজোড়া কালো বটে, কিন্তু গোঁফ এরই মধ্যে পাকা, গোঁফের কোণ ছোঁওয়া জুলফির রঙও তাই। থুতনি পরিষ্কার কামানো, আর সব মিশিয়ে চেহারাটা দ্বিতীয় আলেক্সান্দরের*) মতো। তাঁর আমলে এ কেতাটা খুব চালু ছিল অফিসারদের মধ্যে। ভদ্রলোকটির চোখের দৃষ্টিও সেরকম — জিজ্ঞাসু, কঠোর অথচ শ্রান্ত।

গাড়ি থামল; বেশ খাপসই ফৌজী বুট পরা একটি পা বাড়িয়ে, শাময় চামড়ার দস্তানামোড়া হাতে ক্লোকটার আঁচল ধরে তিনি প্রবেশপথের সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে উঠলেন।

'বাঁ দিকে, হুজুর,' কর্কশগলায় কোচবাক্স থেকে হাঁকল গাড়োয়ান। বেজায় লম্বা বলে ভদ্রলোকটি দরজায় একটু হেঁট হয়ে ভেতরে ঢুকে বাঁ দিকের ঘরে ঢুকলেন।

জায়গাটা গরম, শুকনো ও পরিচ্ছন্ন। বাঁ কোণে নতুন একটি আইকনের সোনালি আভা, তার নীচে পরিষ্কার কড়া কাপড়ে ঢাকা একটি টেবিল, চারপাশে সার বাঁধা পরিষ্কার মাজাঘষা বেঞ্চি; ঘরের ডান দিকের কোণ জুড়ে চূণকাম করা চুল্লিটি নতুন দেখাচ্ছে। আরো কাছে বিচিত্র রঙের মোটা কাপড়ে ঢাকা খাটের মতো কোন কিছু চুল্লির গায়ে লেগেছে। উনুনের ঢাকনির ওদিক থেকে আসছে সুপের মিঠে মিঠে গন্ধ — ভালো করে সেদ্ধ বাঁধাকপি, মাংস আর তেজপাতার গন্ধ।

আগন্তুক বেঞ্চের ওপর ক্লোকটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন — টিউনিক ও টপবুটের জন্য তাঁকে দেখাল আরো খাড়া, আরো ছিমছাম। তারপর দস্তানা ও টুপি খুলে ক্লান্ত ভঙ্গিতে চুলে পাতলা ফ্যাকাসে হাত একবার বুলিয়ে

নিলেন। কপাল থেকে চোখের কোণে টেনে বুরুশ করা তাঁর পাকা চুল অল্প কোঁকড়ানো, সুন্দর, দীর্ঘ, কালো-চোখ মুখের এখানে-সেখানে বসন্তের ছোট ছোট দাগ। ঘরে কেউ নেই বলে দরজাটা অল্প ফাঁক করে বিরক্তির সুরে হাঁকলেন:

'এই যে, কেউ আছে নাকি এখানে?'

ডাক শুনে ঘরে ঢুকল কালো-চুল একটি স্ত্রীলোক। ভুরুজোড়া ভদ্রলোকটির মতোই কালো, আর তাঁরই মতো একটি সৌন্দর্য এখনো তার চেহারায় রয়ে গেছে যেটা তার বয়সের পক্ষে বেমানান। ঠোঁটের ওপর ও গালের পাশে পাতলা লোমের দরুন চেহারাটা মাঝবয়সী জিপসী মেয়ের মতো দেখায়, শরীর ভারি হলেও চালচলনের ভঙ্গিটা হালকা, লাল ব্লাউজের নিচে বড়ো বুক, আর হাঁসের পেটের মতো ত্রিকোণ পেট কালো পশমের স্কার্টে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'আসতে আজ্ঞা হোক, হুজুর,' স্ত্রীলোকটি বলল, 'দয়া করে কিছু খাবেন, না একটা সামোভার এনে দেব?'

স্ত্রীলোকটির সুডৌল কাঁধ ও জীর্ণ লাল তাতারি চটি পরা পাতলা পায়ের দিকে এমনিতে একবার তাকিয়ে আগন্তুক উদাসীন সুরে সংক্ষেপে বললেন:

'সামোভার। তুমি হোটেলওয়ালী না ঝি?'

'হোটেলওয়ালী, হুজুর।'

'তার মানে সরাইখানা তুমিই চালাও?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। নিজেই চালাই।'

'তা কী করে হয়? তুমি কি বিধবা-টিধবা যে একলা কারবার চালাচ্ছ?'

'আমি বিধবা নই, হুজুর, কিন্তু বেঁচে থাকতে হবে তো। তাছাড়া কারবার আমার ভালো লাগে।'

'তাই বুঝি। বেশ তোমার ঘরটা কিন্তু বেশ পরিষ্কার আর খাসা।'

স্ত্রীলোকটি একটু কোঁচকানো চোখ ভদ্রলোকটির মুখে নিবদ্ধ রাখল, উৎসুক সে দৃষ্টি।

'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আমার ভালো লাগে,' সে বলল, 'যাই হোক না কেন, আমি তো বাবুদের সেবা করে মানুষ হয়েছি। নিজের বাসা কী করে গুছিয়ে রাখতে হয় আমার জানা উচিত, নিকলাই আলেক্সেয়েভিচ।'

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকটি সোজা হয়ে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে লাল হয়ে উঠলেন।

'নাদেজ্‌দা, তুমি?' তাড়াতাড়ি শুধালেন।

'হ্যাঁ, নিকলাই আলেক্সেয়েভিচ,' জবাবে স্ত্রীলোকটি বলল।

'হে ভগবান, হে ভগবান,' বেঞ্চে বসে পড়ে এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলে উঠলেন ভদ্রলোক। 'কে ভাবতে পারে ব্যাপারটা! কত বছর আমাদের দেখা হয় নি? প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর?'

'তিরিশ বছর, নিকলাই আলেক্সেয়েভিচ। আমার বয়স এখন আটচল্লিশ, আর আপনি ষাটের কাছাকাছি?'

'তা হবে।... হে ভগবান, কী আশ্চর্য!'

'আশ্চর্য কিসের, হুজুর?'

'সব কিছু, সমস্ত... বোঝা উচিত তোমার!'

তাঁর ক্লান্তি ও ঔদাসীন্য উধাও হয়ে গেল, উঠে পড়ে দৃঢ় পদক্ষেপে তিনি পায়চারি শুরু করলেন মেঝের দিকে

তাকিয়ে। তারপর থেমে পড়ে কথা বলতে লাগলেন, পাকা জুলফি ভেদ করে আস্তে আস্তে দেখা দিল রক্তাভা:

'তারপর থেকে তোমার কোনো খোঁজখবর পাই নি। এখানে এলে কী করে? মনিবদের সঙ্গে থেকে গেলে না কেন?'

'আপনি চলে যাওয়ার পর ওঁরা আমাকে মুক্তি দেন।'

'তখন কোথায় গেলে?'

'সে অনেক কথা, হুজুর।'

'তুমি বলছ বিয়ে করো নি?'

'না, বিয়ে হয় নি।'

'কিন্তু কেন? তখন তো তোমার চেহারা ভারি সুন্দর ছিল।'

'বিয়ে আমি করতে পারি নি।'

'কেন নয়? কী বলতে চাইছ তুমি?'

'বলার আর কী আছে? আপনাকে কতো ভালোবাসতাম সেটা আশা করি আপনার মনে আছে।'

ভদ্রলোক এত লাল হয়ে উঠলেন যে চোখে জল এসে গেল। ভুরু কুঁচকিয়ে তিনি আবার পায়চারি শুরু করলেন।

'কিছুই থাকে না গো,' অনুচ্চকণ্ঠে বললেন, 'প্রেম, যৌবন — কিছুই থাকে না। মামুলি, খেলো ব্যাপার এটা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু শেষ হয়ে যায়। জোবের কাহিনীতে কী যেন লেখা? 'স্মরণ করবে বয়ে যাওয়া জলের মতো'।'

'সবই দয়াময়ের ইচ্ছে, নিকলাই আলোক্সেয়েভিচ।

আমাদের যৌবন ফুরিয়ে যায়, কিন্তু ভালোবাসা — সেটা অন্য জিনিস।'

মুখ তুলে তার সামনে দাঁড়িয়ে ক্লিষ্ট হাসি হেসে তিনি শুধালেন:

'কিন্তু সারা জীবন তুমি নিশ্চয়ই আমাকে ভালোবাসো নি?'

'বেসেছিলাম, কত সময় কেটে গেছে, শুধু সেই চিন্তা নিয়েই থেকেছি। জানতাম আপনি অনেক দিন আগেই বদলে গিয়েছেন, সে ভালোবাসার অর্থ আপনার কাছে অত্যন্ত কম, যেন কখনো ঘটে নি জিনিসটা, তবু... অনুযোগ-অভিযোগের সময় আর নেই, তবু এটা সত্যি যে আপনি আমাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে ছেড়ে দেন। আর সব কিছু বাদ দিন, এত কষ্ট হত যে মাঝে মাঝে ভাবতাম আত্মহত্যা করি। নিকলাই আলেক্সেয়েভিচ, একসময় তো আপনাকে আদর করে নিকলেন্‌কা বলে ডাকতাম, আর আপনি আমাকে কী বলে ডাকতেন — মনে আছে? আপনি তো হামেশা হরেক রকমের 'ছায়া বীথি' নিয়ে কবিতা পড়ে শোনাতেন, মনে আছে?' বিষাদের হাসি হেসে সে শুধাল।

'আর সেসব দিনে তোমার কী রূপ!' মাথা নেড়ে তিনি বললেন। 'কী গভীর আবেগ ছিল তোমার! কী সুন্দর ছিলে! কী শরীর, কী চোখ! সকলে তোমার দিকে কীভাবে চেয়ে থাকত, মনে আছে?'

'মনে আছে, হুজুর। আপনারও চেহারা অসাধারণ সুন্দর ছিল। আর আপনার কাছেই উজাড় করে

দিয়েছিলাম আমার সৌন্দর্য আর বাসনা, জানেন তো। কী করে ভুলি সে কথা!'

'হায়! সব কিছু ফুরিয়ে যায়! লোকে ভুলে যায় সব কিছু।'

'সব কিছু ফুরিয়ে যায় বটে, কিন্তু সব কিছু লোকে ভোলে না।'

'যাও,' ঘুরে জানলার দিকে যেতে যেতে তিনি বললেন, 'দয়া করে চলে যাও।'

রুমাল বের করে চোখ চেপে দ্রুত কণ্ঠে যোগ করলেন:

'আশা করি ভগবান আমাকে ক্ষমা করবেন। তুমি তো ক্ষমা করেছ দেখছি।'

দরজার কাছে গিয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল:

'না, নিকলাই আলেক্সেয়েভিচ, ক্ষমা আমি করি নি। মনের কথা যখন শুরু হয়েছে তখন স্পষ্ট বলি: আপনাকে কখনো ক্ষমা করতে পারি নি। দুনিয়ায় আপনার চেয়ে দামী রতন কখনো পাই নি — তখনো না, পরেও নয়। আর তাই আপনাকে ক্ষমা করা যায় না। যাক গে, সেসব ভেবে কী লাভ, মরা মানুষকে তো আর কবর থেকে ফেরানো যায় না।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসবের কোনো মানে হয় না, ওদের বলো ঘোড়া জুততে,' জানলা থেকে সরে আসতে আসতে তিনি বললেন, এবার তাঁর মুখের ভাব কঠোর। 'তোমাকে শুধু একটা কথা বলি: জীবনে কখনো সুখী হই নি, কখনো যে হয়েছি সেটা দয়া করে ভেবো না। মাপ করো আমায়, হয়ত তোমার আঁতে ঘা লাগতে পারে, কিন্তু তোমাকে সোজাসুজি বলি: স্ত্রীকে আমি ভালোবাসতাম পাগলের

মতো। তবু সে আমাকে ঠকাল, তোমাকে যেভাবে আমি ছেড়ে দিই তার চেয়ে বেশী উদ্ধতভাবে আমাকে ছেড়ে সে ভেগে গেল। আমার ছেলে যখন নেহাৎ শিশু তখন তাকে কী না ভালোবাসতাম —তাকে নিয়ে আমার কত না আশা ছিল! কিন্তু বড়ো হয়ে সে হল বদমায়েস, লম্পট, নীচ একটা লোক — হৃদয়, সম্মানবোধ বা বিবেক বলে কিছু নেই... যাক গে, এটাও সবচেয়ে মামুলি আর খেলো কাহিনী। তোমার মঙ্গল হোক, বন্ধু। মনে হয় তোমার মধ্যে যেটা হারাই সেটা হল আমার জীবনের সবচেয়ে দামী জিনিস।'

মেয়েটি কাছে এসে তাঁর হাতে চুমো খেল, তিনিও চুমো খেলেন তার হাতে।

'ওদের বলো আমি তৈরি...'

গাড়িতে যেতে যেতে বিরস মুখে তিনি ভাবলেন: 'কী মধুর ছিল ও এককালে! কী যাদু করা লাবণ্য!' যাবার আগে তাকে যা বলেছে, তার হাতে যে চুমো খেয়েছে মনে পড়াতে লজ্জা হল, সঙ্গে সঙ্গে লজ্জাবোধের জন্যই লজ্জিত লাগল। 'আমার জীবনের সেরা মুহূর্ত দিয়েছিল ও. কথাটা কি সত্যি নয়?'

পশ্চিম আকাশে নীচের দিকে দেখা দিল বিবর্ণ সূর্য। গাড়োয়ান ঘোড়াগুলোকে চালাচ্ছে কদম চালে — কখনো এ কালো খাঁজ, কখনো অন্যটার ওপর দিয়ে, যেগুলোতে কম কাদা সেগুলো বেছে। সেও কী যেন একটা ভাবছে। তারপর স্থূল ও গম্ভীর ভাবে বলল:

'আমরা যখন চলে যাচ্ছি ও জানলা দিয়ে খালি তাকাচ্ছিল, হুজুর। ওকে অনেকদিন চেনেন বুঝি?'

'অনেকদিন, ক্রিম।'

'বেশ বুদ্ধিশুদ্ধি আছে ওর। লোকে বলে দিনে দিনে ওর টাকা বাড়ছে। লোকজনকে ধার দেয়।'

'তাতে কিছু এসে যায় না।'

'এসে যায় না কেন! ভালোভাবে থাকতে কে না চায়? সুদ নিয়ে কড়াকড়ি না করলে বিশেষ ক্ষতি নেই। লোকে বলে, সে বিষয়ে ও অন্যায় করে না। কিন্তু তাহলেও কড়া বটে! সময়মতো ধার শোধ করতে না পারলে — দোষটা নিজেরই।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দোষটা নিজেরই।... একটু তাড়াতাড়ি চালাও তো, ট্রেন ধরতে পারলে হয়।...'

জনহীন মাঠে হলদে আলো ছড়াল অস্তগামী সূর্য। কাদাজল ভেঙে চলেছে ঘোড়াগুলো সমান গতিতে। ভদ্রলোক কালো ভুরু কুঁচকে, অন্যমনস্কভাবে সামনের ঘোড়ার খুরের চকিত ঝিলিকের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলেন:

'হ্যাঁ, দোষটা শুধু নিজেরই। হ্যাঁ, তা বটে, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত। আর শুধু শ্রেষ্ঠই নয়, সত্যিকার মোহিনী মুহূর্তগুলি। 'চারিদিকে ফোটে বুনো গোলাপের ঝাঁক, বীথিতে লাইম বৃক্ষের ঘন ছায়া...' কিন্তু, হে ভগবান, পরে কী বা ঘটত? যদি ওকে ছেড়ে না দিতাম, তাহলে কী হত? হে ভগবান, কী বাজে কথা! এই নাদেজ্‌দা মেয়ে-মানুষটি — রাস্তার ধারের হোটেলওয়ালী না হয়ে যদি হত আমার স্ত্রী, পিতার্সবুর্গে আমার সংসারের গৃহিণী, আমার ছেলেমেয়েদের মা?'

চোখ বুজে মাথা নাড়তে থাকেন তিনি।

২০. ১০. ১৯৩৮

দাঁড়কাক

বাবা দেখতে ছিলেন দাঁড়কাকের মতো। কথাটা মনে হয়েছিল ছেলেবেলায়। একদিন 'নিভা'য়*) একটা ছবি দেখেছিলাম নেপোলিয়নের — শৈলশিরার ওপর দাঁড়িয়ে আছেন, সাদা ভুঁড়িপেট, গায়ে হরিণের চামড়ার কোট, পায়ে ছোট কালো বুট, আর হঠাৎ বগ্‌দানভের*) 'মেরু ভ্রমণ'-এর একটা ছবি মনে পড়ে যাওয়াতে খুশিতে হেসে উঠলাম — নেপোলিয়নকে দেখাচ্ছে ঠিক পেঙ্গুইনের মতো — তারপর বিষণ্ণভাবে মনে হল: আর বাবা দাঁড়কাকের মতো।...

আমাদের মফস্বল শহরে বাবা বেশ উঁচু পদের একটা চাকরী করতেন, সেটা আরো বেশী করে তাঁর ক্ষতি করে। সরকারী চাকুরেদের যে গোত্রের লোক তিনি, মনে হয় না এমনকি তাঁদের কেউ ধীরসুস্থ বচনে ও কাজে তাঁর চেয়ে বেশী উদ্ধত, বেজার, স্বল্পভাষী ও নিস্পৃহ নিষ্ঠুর

ছিলেন। সত্যি তাঁকে দেখাত দাঁড়কাকের মতো — বেঁটে, গাঁট্টাগোঁট্টা, অল্প কুঁজো, খড়খড়ে কালো চুল, বড়ো নাক, লম্বা মুখ, দাড়ি-গোঁফ কামানো, শ্যামল বর্ণ — আরো বেশী দেখাত সেরকম যখন জনহিতার্থে প্রদেশপালের স্ত্রীর দেওয়া কোনো বল-নাচে গিয়ে তিনি রুশী কুঁড়েঘরের মতো সাজানো কোনো স্টলের কাছাকাছি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতেন কুঁজো হয়ে, দাঁড়কাকসুলভ বড়ো মাথা ঘুরিয়ে দাঁড়কাকের মতো চকচকে চোখে তেরছাভাবে তাকিয়ে দেখতেন নৃত্যরত যুগলদের, স্টলের কাছে আসা লোকজন আর সেই ভদ্রমহিলাটির দিকে, যিনি মধুর হাসি হেসে, বড়ো হাতে হীরের আংটি ঝকঝকিয়ে সরু গেলাসে শস্তা হলদে শ্যাম্পেন দিতেন — দীর্ঘাঙ্গী ভদ্রমহিলাটি পরতেন সাবেকী মস্তকাবরণ, পরনে জরির গাউন, নাকটি পাউডারে এত সাদাটে-গোলাপী যে নকল মনে হত। বাবা বহুদিন বিপত্নীক, ছেলেপিলে বলতে দু'জন — আমার আট বছরের বোন লিলিয়া আর আমি — আর সরকারী একটি বাড়ির দোতলায় আমাদের সরকারী ফ্ল্যাটের প্রকাণ্ড, চকচকে পালিশ করা ঘরগুলো জ্বলত কেউ-না-থাকার নিরাসক্ত জাঁকজমকে। বাড়িগুলোর মুখ ক্যাথিড্রাল ও শহরের প্রধান রাস্তার মাঝখানে পপ্‌লার ছাওয়া এ্যাভেনিউর দিকে। কপাল ভালো, বছরের বেশীর ভাগ আমার কাটত মস্কোয়। সেখানে কাৎকভ লাইসিতে*[1] পড়তাম, বাড়িতে আসতাম শুধু বড়দিন ও গরমের ছুটির সময়ে। সে বছর বসন্তে স্কুলের পড়া শেষ করে যখন বাড়িতে এলাম, আমার জন্য অপেক্ষা করছিল একেবারে অপ্রত্যাশিত একটা ব্যাপার।

মস্কো থেকে এসে একেবারে হতবুদ্ধি লাগল: কবরখানার

মতো নিরানন্দ আমাদের ফ্ল্যাটে যেন হঠাৎ সূর্যের আলো ফেটে পড়েছে — হাসিখুশি কমবয়সী একটি মেয়ের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে ঘরদোর আলোকিত। লিলিয়ার বুড়ী আয়ার বদলে তাকে সবে নেওয়া হয়েছে; লম্বা, শুকনো সে বুড়ীটা দেখতে ছিল মধ্যযুগীয় কোনো পুণ্যবতী কাষ্ঠমূর্তির মতো। মেয়েটি গরীব, আমার বাবার অধীনস্থ একজন কর্মচারীর কন্যা, স্কুল ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন ভালো একটা কাজ জুটিয়েছে আর আমি এসে পড়াতে সমবয়সী সঙ্গী একজন পাবে বলে তার আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু, মা গো, কী ভীরু মেয়েটি! পোশাকি ডিনারের সময় বাবার সামনে কী তার ভয়। কালো-চোখ লিলিয়াকে নিয়ে কী তার উৎকণ্ঠা। লিলিয়াও চাপা, কিন্তু তার এই চাপা ভাবেও কী তীব্রতা, যেমন তীব্রতা তার প্রত্যেকটি নড়াচড়ায় — সর্বদা যেন কিছুর প্রতীক্ষায় আছে এমন ভাবে কালো-চুল মাথা বেপরোয়াভাবে এদিক-ওদিক ঘোরাত শুধু! ডিনারের সময় বাবাকে আজকাল আর চেনা যায় না: সাদা বোনা দস্তানাপরা বুড়ো গুরিই যখন খাবার দেয় তখন তার দিকে আর বেজার দৃষ্টি হানেন না; মাঝে মাঝে কথা বলেন — একটু কষ্ট করে টেনে টেনে, তবু সেটা তো কথা বলা — আর অবশ্য সবসময় বলেন মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে, অতি ভদ্রতা করে ডাকেন তার পিতৃনাম ধরে — 'প্রিয় ইয়েলেনা নিকলায়েভনা' ব'লে — এমনকি ইয়ার্কি বা হাসির চেষ্টা পর্যন্ত চলে। তাতে অত্যন্ত বিব্রত হয়ে মেয়েটি শুধু হাসত ক্লিষ্টভাবে, পেলব পাতলা মুখে দেখা দিত টকটকে লাল ছোপ — সে মুখটা রোগাসোগা, সোনালি-চুল একটি মেয়ে, সাদা ব্লাউজ

বগলের নীচে কমবয়সের গরম ঘামে কালচে, সে ব্লাউজের নিচে বুকজোড়া ছোট, প্রায় দেখা যায় না। ডিনারের সময় আমার দিকে মুখ তুলে তাকাবার সাহস ছিল না তার, সে সময় ওর কাছে আমি এমনকি বাবার চেয়েও ভীতিকর। কিন্তু আমার দিকে না তাকাবার যতই চেষ্টা সে করুক, আমার দিকে বাবার তির্যক দৃষ্টিপাত ক্রমশ কঠিন হয়ে যেত: শুধু তিনি নন, আমিও অনুভব করতাম যে আমার দিকে দৃষ্টিপাত না করে বাবারই কথা শোনায় তার কষ্টকৃত চেষ্টা এবং বদস্বভাব, চুপচাপ অথচ ছটফটে লিলিয়াকে দেখাশোনা করার আড়ালে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের একটি ভয় চাপা আছে — একসঙ্গে থাকলে আমরা দু'জনে যে আনন্দ বোধ করি, তারই থরোথরো ভয়। সন্ধ্যেবেলায় স্টাডিতে কাজ করার সময় বাবাকে সর্বদাই চা দেওয়া হত সোনালি কিনারের বড়ো একটি কাপে, তাঁর কাজের টেবিলে। কিন্তু এখন তিনি চা খান আমাদের সঙ্গে ডাইনিং-রুমে; সামোভারে চা বানানোর ভার মেয়েটির হাতে, সে-ই ঢেলে দিত — লিলিয়া ততক্ষণে শুয়ে পড়েছে। লাল-পাড় দেওয়া ঢিলে লম্বা একটি জ্যাকেট পরে বাবা পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিজের আরামকেদারায় বসে কাপটা এগিয়ে দিতেন তাকে। কানায় কানায় ভরে — বাবার পছন্দ সেটা — কম্পিত হাতে কাপটা তাঁকে দিয়ে আমার ও নিজের জন্য চা ঢালত, তারপর চোখ নামিয়ে সেলাইয়ের কাজ নিয়ে পড়ত। এদিকে বাবা, অভ্যাসমতো ধীরেসুস্থে যা বলতেন — তা ভারি অদ্ভুত:

'ইয়েলেনা নিকলায়েভ্না, যাদের সোনালি চুল, তাদের সবচেয়ে ভালো দেখায় হয় কালো, নয় টকটকে লাল

পোশাকে।... এই ধরো, খুব উ'চু আর খাড়া কলার দেওয়া, ছোট ছোট হীরে বসানো, 'মেরি স্টুয়ার্ট'*⁾ ধাঁচের কালো সাটিনের গাউনে তোমাকে চমৎকার মানাবে।... কিম্বা চুনির ছোট ক্রুশের সঙ্গে সামান্য বুক-খোলা টকটকে লাল মখমলের মধ্যযুগীয় কোনো গাউন।... ফার-দেওয়া লিওনের নীল মখমলের ওভারকোট আর ভেনিসের টুপিও তোমাকে মানাবে।... এসব অবশ্য শুধু আকাশকুসুম,' মৃদু হেসে তিনি বলতেন, 'তোমার বাবাকে আমরা মাইনে দিই মাসে মাত্র প'চাত্তর রুব্‌ল, তুমি ছাড়া আরো পাঁচটি ছেলেমেয়ের ভরণপোষণ তাকে করতে হয়, সবকটাই ছোট — তাই খুব সম্ভব তোমাকে সারা জীবন কাটাতে হবে দারিদ্র্যে। কিন্তু তবু আমি হামেশা বলি — আকাশকুসুম ভাবলে ক্ষতিটা কি? তাতে মনটা ভালো হয়, শক্তি ও আশা পাওয়া যায়। তাছাড়া, মাঝে মাঝে এমনটি তো হয় যে স্বপ্ন হঠাৎ সত্যি হয়ে গেল — তাই না? ক্বচিৎ কখনো অবশ্য, কদাচিৎ বলতে হবে, তবু হয় তো।... এই ধরো, কুর্স্ক স্টেশনের সেই রাঁধুনেটা দু'লক্ষ রুব্‌লের লটারির টিকিট টেনে বসল — সাধারণ রাঁধুনে তাও!'

এসব শুধু সহৃদয় ঠাট্টাতামাসা হিসেবে নিচ্ছে, ভান করত মেয়েটি। জোর করে মুখ তুলে বাবার দিকে তাকিয়ে হাসত, এদিকে যেন কোনো কথা কানে আসছে না এমন ভাব করে আমি পেসেন্স খেলে যেতাম। আর বাবা, একবার তিনি তো আরো দূর এগোলেন। আমার দিকে মাথা নাড়িয়ে হঠাৎ বলে বসলেন:

'এই যে ছোকরা, এ-ও হয়ত নানা স্বপ্ন দেখে। ভাবছে পেয়ারের বাপ একদিন তো মারা যাবে, তখন এত সোনার

মোহর পাবে যে গোনা ভার! সত্যি বটে, সে গুড়ে বালি, গোনার মতো কিছুই থাকবে না! বলা বাহুল্য অবশ্য যে, ওর বাপের কিছু কিছু সম্পত্তি আছে — যেমন সামারা প্রদেশে আড়াই শ' একর কালো মাটির সেই ছোট জমিদারিটা — কিন্তু আমার ঘোরতর সন্দেহ বাছাধন সেটা পাবে কিনা। বাপের প্রতি ওর অনুরাগ তো বিশেষ নেই. আর যতদূর বুদ্ধি — ও একেবারে পয়লা নম্বরের নিষ্কর্মা হয়ে দাঁড়াবে।...'

শেষ কথাবার্তা হয় সেণ্ট পিটার দিবসের আগের সন্ধ্যায়, যে দিবসটি আমার পক্ষে অত্যন্ত স্মরণীয়। পরের দিন ভোরবেলায় বাবা বেরিয়ে গেলেন, প্রথমে — ক্যাথিড্রালের উপাসনায়, তারপর প্রদেশপালের সঙ্গে লাঞ্চ খেতে — সেদিন তাঁর জন্মদিন। কিন্তু এমনিতে রবিবার বাদে বাবা কখনো বাড়িতে লাঞ্চ খেতেন না, সেজন্য বরাবরকার মতো আমরা তিন জনে ছিলাম শুধু। খাওয়া শেষ হয়ে এসেছে, তার প্রিয় নির্মাকির বদলে লিলিয়াকে চেরির জেলি দেওয়াতে সে গুরিইকে উদ্দেশ্য করে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে, টেবিলে ঘুষি মেরে প্লেটটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল, মাথা ঝটকে কাঁপিয়ে রাগে ফুঁপিয়ে ককিয়ে উঠল। আমরা কোনোক্রমে তাকে তার ঘরে নিয়ে গেলাম, খালি আমাদের হাত কামড়াচ্ছিল আর পা ছুঁড়ছিল, সাধ্যসাধনা করলাম ঠান্ডা হতে, বললাম রাঁধুনেকে এর জন্য কঠিন সাজা দেওয়া হবে, অবশেষে স্তোক দিয়ে ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিলাম কোনো রকমে। আর লিলিয়াকে ঘরে নিয়ে যাবার জন্য আমাদের শুধু এই একত্র প্রচেষ্টায়, মাঝে মাঝে দু'জনের হাতে হাত লেগে

যাওয়াতে কী থরোথরো সোহাগেই না আমাদের মন ভরে গেল! বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি, অন্ধকার ঘরে বারবার বিদ্যুতের ঝিলিক, বাজের শব্দে জানলার শার্সির খটখটানি।

‘ঝড় বিদ্যুতের জন্য ও এত অস্থির হয়ে পড়েছে,’ বারান্দায় বেরিয়ে আসার পর খুশিতে ফিসফিসিয়ে ও বলল, তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে কান পেতে শুনতে লাগল।

‘ওরে বাবা, কোথায় আগুন লেগেছে!’ বলে উঠল।

ডাইনিং-রুমে ছুটে গিয়ে জানলা ঘটাং করে খুলে দেখলাম এ্যাভেনিউতে গড়গড় শব্দে দমকল ছুটে চলে গেল আমাদের বাড়ি পেরিয়ে। পপ্‌লারগুলোর ওপর খর বৃষ্টিধারা — ঝড় বিদ্যুৎ আর নেই, যেন বৃষ্টিতে নিভে গেছে — হোজপাইপ আর মই বোঝাই লম্বা লম্বা গাড়ি ছুটোছুটি করছে। এগুলোর হৈচৈ-এর মধ্যে দুষ্টুছেলের খেলার মতো নরম হুঁশিয়ারির সুরে দমকলের বাঁশী বেজে উঠল, গাড়িতে কালো কালো ঘোড়ার কেশরের ওপরে ডাণ্ডায় লাগানো ঘণ্টার বাজনার মাঝে পেতলের শিরস্ত্রাণ পরা দমকালের লোকে দাঁড়িয়ে; কানে এল পাথরের রাস্তায় ঘোড়ায় দ্রুত টানা গাড়িগুলোর ধাতব মুখর ধ্বনি।... তারপর যোদ্ধা সেণ্ট জন গির্জার*) ঘণ্টাঘরে বিপদসূচক ঘণ্টার দ্রুত, অতি দ্রুত টঙ্কার।... দু'জনে কাছাকাছি জানলার ধারে দাঁড়িয়ে, জানলা দিয়ে আসছে জল, বৃষ্টি-ধোওয়া রাস্তা আর ধুলোর গন্ধ, আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি শুধু দেখা ও শোনার জন্য চরম উত্তেজনায় জ্যাবদ্ধ। তারপর প্রকাণ্ড লাল একটা জলের ট্যাঙ্কসুদ্ধ শেষ গাড়িটা

এসে ঘড় ঘড় করে চলে গেল, হৃৎস্পন্দন আমার দ্রুততর, কপালের চামড়াটা যেন শক্ত করে বসেছে — নেতিয়ে পড়া ওর হাত হাতে নিয়ে মুখের পাশে তাকালাম মিনতির ভঙ্গিতে আর — ও ফ্যাকাসে হয়ে ঠোঁট ফাঁক করে, গভীর নিঃশ্বাস নেওয়াতে বুক উঁচু হয়ে উঠল। যে নির্মল চোখ আমার দিকে ফেরাল তাতে অশ্রু ও আবেদন একটা। ওর কাঁধ ধরে জীবনে এই প্রথম মেয়ের ঠোঁটের অপরূপ স্নিগ্ধতায় আপনহারা হয়ে গেলাম।... এর পর থেকে এমন কোনো দিনের এমন কোনো ঘণ্টা যায় নি যে ওর সঙ্গে দেখা হয় নি, হঠাৎ যেন, হল ড্রয়িং-রুমে, নয় বল-রুমে, বারান্দায় — কিম্বা বাবার পড়ার ঘরে — বাবার ফিরতে দেরী হত সর্বদা। সংক্ষিপ্ত দেখা সেগুলো, মরিয়ার মতো দীর্ঘ অতৃপ্ত চুম্বন, সে চুম্বন সমাধানহীনতায় তখনি সহ্যের বাইরে। আর বাবা, একটা কিছু আঁচ করে তিনি আবার ড্রয়িং-রুমে সন্ধ্যেবেলায় আমাদের সঙ্গে চা খাওয়া ছেড়ে দিলেন, আবার মনমরা ও স্বল্পভাষী তাঁর ভাবখানা। কিন্তু তাঁকে আমাদের আর ভ্রূক্ষেপ নেই, ডিনারের সময় মেয়েটির হাবভাবে এল আরো শান্তি ও স্থৈর্য।

জুলাই মাসের গোড়ায় অতিরিক্ত রাস্প্‌বেরি খাওয়ার ফলে লিলিয়া অসুখে পড়ল; বিছানায় শুয়ে শুয়ে আস্তে আস্তে সেরে উঠছে, সারা দিন একটা ছোট ডেস্কে লাগানো বড়ো বড়ো কাগজে রঙীন পেন্সিল দিয়ে উপকথার শহরের ছবি সে আঁকে; তাই লিলিয়ার পাশে সময় কাটানো ছাড়া তার গত্যন্তর রইল না। বসে বসে নিজের জন্য একটা ইউক্রেনীয় ব্লাউজে সূচীর কাজ করত — জায়গাটা ছেড়ে যাওয়া সম্ভবপর নয়, কেননা লিলিয়া সবসময় কিছু-না-

কিছু চাইত। আর ফাঁকা নিঃশব্দ বাড়িতে আমি একেলা থেকে তাকে দেখার, চুমু খাবার ও ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনের অবিরত বাসনায় দগ্ধে মরতাম। বাবার পড়ার ঘরে গিয়ে বসতাম। আলমারি থেকে এলোপাথারি বই টেনে নিয়ে পড়ার জোর চেষ্টা করতাম। সেদিনও ঠিক তাই করছি। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। হঠাৎ কানে এল তার লঘু দ্রুত পদধ্বনি। বই ছুঁড়ে ফেলে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম:

'ও ঘুমিয়ে পড়েছে?'

অসহায় ভঙ্গি একটা সে করল।

'ঘুমোবে আবার! ওকে তুমি চেনো না — পাগলের মতো দু'রাত্তির না ঘুমিয়ে কাটালেও ওর কিছু এসে যায় না! আমাকে বাবার ডেস্ক থেকে হলদে আর কমলা রঙের গোটা কতক পেন্সিল খুঁজে পেতে বের করে নিতে পাঠিয়েছে।...'

কেঁদে ফেলে কাছে সরে এসে আমার বুকে মুখ রাখল:

'হে ভগবান, কখন এসবের শেষ হবে? ওঁকে বলো না কেন যে আমাকে ভালোবাসো, আমাদের আলাদা রাখতে পারে দুনিয়ায় এমন কিছু নেই!'

অশ্রুসিক্ত মুখ তুলে গভীর আবেগে আমাকে জড়িয়ে রুদ্ধশ্বাস চুম্বনে আঁকড়ে রইল। ওর সমস্ত শরীর আমার দেহে চেপে সোফার দিকে নিয়ে গেলাম — সে মুহূর্তে অন্য কিছু মনে করার বা ভাবার সাধ্য কি আমার? কিন্তু কানে এল দোরগোড়ায় কার মৃদু গলা খাঁকারি: ওর কাঁধের ওপর থেকে চেয়ে দেখলাম — বাবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছেন। তারপর ঘুরে, কুঁজো হয়ে তিনি চলে গেলেন।

সে রাত্রে ডিনারের সময় দু'জনের কেউই দেখা দিল না। পরে গুরিই আমার দরজায় টোকা দিয়ে বলল:

'বাবা আপনাকে বলছেন ওনার ঘরে যেতে।' পড়ার ঘরে গেলাম। ডেস্কের সামনে আরামচেয়ারে তিনি বসে ফিরে না তাকিয়ে বলতে শুরু করলেন:

'কাল তুমি সামারার জমিদারিতে রওনা দেবে, বাকি গ্রীষ্মটা সেখানে থাকতে হবে। শরতে হয় মস্কো নয় পিতার্সবুর্গে গিয়ে একটা চাকরীর চেষ্টা করবে। যদি আমার কথা না শোনার মতো স্পর্ধা হয়, তাহলে তোমাকে ত্যাজ্যপুত্র করে দেব। কিন্তু এ-ই সব নয়: কাল প্রদেশপালকে বলব যেন তোমাকে দেশে নির্বাসিত করে রক্ষীর সঙ্গে সেখানে পাঠিয়ে দেন। যাও এখন, আর কখনো যেন তোমাকে না দেখি। কাল সকালে ট্রেনের ভাড়া আর কিছু পকেট খরচা লোক মারফত পাবে। মস্কো বা পিতার্সবুর্গে প্রথম কয়েকটা দিনের খরচা বাবদ টাকা দেবার জন্যে কাছারি-বাড়িতে শরৎ নাগাদ লিখব। যাবার আগে ওর সঙ্গে দেখা করার কোনো আশা রেখো না। ব্যস। যাও।'

সেই দিন রাত্রেই আমি ইয়ারস্লাভ্‌ল্‌ প্রদেশে রওনা হয়ে গেলাম, সেখানে স্কুলের একটি বন্ধুর সঙ্গে সারা গ্রীষ্ম গ্রামে কাটল। শরতে তার বাবার সাহায্যে পিতার্সবুর্গে পররাষ্ট্র দপ্তরে একটি চাকরী পেয়ে বাবাকে লিখলাম তাঁর সম্পত্তিতে আমার অধিকার চিরকালের জন্য ত্যাগ যে করছি শুধু তা নয়, তাঁর কাছ থেকে কোনো সাহায্যেরও প্রয়োজন আমার নেই। শীতকালে শুনলাম চাকরীতে অবসর গ্রহণ করে তিনিও পিতার্সবুর্গে চলে এসেছেন, সঙ্গে আছে

'তাঁর লাবণ্যময়ী নবীনা বধূ'। একদিন রাত্রে যবনিকা ওঠার কয়েক মিনিট আগে মারিইন্স্কি থিয়েটারের স্টল্সে যেতে যেতে হঠাৎ দেখলাম দু'জনকে। স্টেজের কাছে একটা বক্সে তারা, ঝিনুকের অপেরাগ্লাস কার্নিসে রেখে বসে আছে সামনের সীটে। ড্রেসকোটে দাঁড়কাকের মতো দেখতে তিনি কুঁজো হয়ে একটা চোখ কুঁচকে অনুষ্ঠান-লিপি পড়ছেন একাগ্র মনে। আর সে — সোনালি চুল চুড়ো করে বাঁধা, লাবণ্যভরে বসে ব্যগ্র চোখে দেখছে উষ্ণ, উজ্জ্বল আলোকিত, মৃদু গুঞ্জরিত নীচের প্রেক্ষাগৃহ, বক্সে বসা লোকেদের সান্ধ্য গাউন, ড্রেসকোট ও ইউনিফর্ম। বুকের ওপর চুণির একটা ছোট ক্রুশের অন্ধকার রক্তাভা, সরু কিন্তু এর মধ্যেই নিটোল হয়ে ওঠা হাত নগ্ন, আর টকটকে লাল মখমলের ওড়নার মতো কী একটা চুণিবসানো ব্রোচ দিয়ে কাঁধে আটকানো।...

১৮. ০৫. ১৯৪৪

টীকা-টিপ্পনী

১৮৭০ সালের ২২ অক্টোবর ভরনেজে এক পড়তি অবস্থার প্রাচীন অভিজাত ভূস্বামী পরিবারে ইভান আলোক্সেয়েভিচ বুনিনের জন্ম। তাঁর ছেলেবেলা কাটে ওরিওল প্রদেশের বুতিরকি গ্রামে — পৈতৃক জমিদারীতে। ১৮৮১ সালে তিনি ইয়েলেৎস উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন, কিন্তু চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ সমাপ্ত না করেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন, তারপর তাঁর বিদ্যাচর্চা চলে দাদা ইউলির পরিচালনায়। দাদা ছিলেন নির্বাসনদণ্ডপ্রাপ্ত বিপ্লবী, 'নারোদনায়া ভোলিয়া' (গণমুক্তি পার্টি)-র সদস্য। ১৮৮৯ সালে বুনিন পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে রুজি রোজগারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন 'পৃথিবীর পথে'। ১৮৮৭ সালে তাঁর প্রথম রচনার প্রকাশ। ১৮৯১ সালে ওরিওলে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কবিতাবলী'।

তাঁর কাব্যগ্রন্থ ও গদ্যরচনা 'উন্মুক্ত আকাশ' ও

পুশ্‌কিন পুরস্কার প্রাপ্ত 'ঝরাপাতা' (১৯০১) রুশ সাহিত্যের জগতে তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। ১৮৯৫ সালের ডিসেম্বরের দিকে চেখভের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন, ১৮৯৯ সালে তাঁর পরিচয় হয় মাক্সিম গোর্কি'র সঙ্গে। মাক্সিম গোর্কি তাঁকে 'জ্‌নানিয়ে' (জ্ঞান) প্রকাশনসংস্থার কাজে টেনে আনেন। এই কাজের ফলে তরুণ সাহিত্যিকের গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশের সহায়ক হয়। 'গ্রাম' (১৯১০) নামে উপাখ্যান থেকেই ব্যাপক সামাজিক সমস্যার প্রতি বুনিনের মনোযোগের সূচনা। এই পর্বে তাঁর প্রতিভা সর্বজনীন স্বীকৃতি অর্জন করে। ১৯০৯ সালে বিজ্ঞান আকাদমি তাঁকে সম্মানিত সদস্যপদ দান করে।

অক্টোবর বিপ্লবের প্রতি বৈরভাবাপন্ন বুনিন ১৯২০ সালে দেশ ছেড়ে ফ্রান্সে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। সেখানে তিনি 'আর্সেনিয়েভের জীবনবৃত্তান্ত' নামে উপন্যাস, প্রেমবিষয়ক গল্পগুচ্ছ 'ছায়া বীথি' ও 'তল্‌স্তয়ের মুক্তি' নামে গবেষণামূলক দার্শনিক নিবন্ধ রচনা করেন। ১৯৩৩ সালে 'পরম নিষ্ঠাবান শিল্পপ্রতিভার গুণে সাহিত্যিক গদ্যে রুশ চরিত্রের আদর্শ প্রতিরূপ পুনঃসংস্থাপনের জন্য' তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের অধিকারী হন।

প্যারিসে ১৯৫৩ সালের ৮ নভেম্বর বুনিনের মৃত্যু হয়।

আপেলের সৌরভ

'আপেলের সৌরভ' বুনিনের সূচনাপর্বের রচনার শিখরদেশ, তাঁর পরবর্তীকালের আর সমস্ত পরম ক্ষমতাসম্পন্ন দৃষ্টির অগ্রদূত। 'আপেলের সৌরভ' রচনা

থেকেই অভিজাতদের পুরনো বাসার গুণকীর্তনকারী এবং তার জন্য বিলাপকারী বলে, ম্লানিমা ও বিবিক্তির গায়ক বিশেষণে বুনিন চিরতরে চিহ্নিত হয়ে গেলেন। স্বয়ং বুনিন তাঁর প্রথম দশকের সাহিত্যকর্মের স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে ১৯১৫ সালে লিখেছেন: 'আমার প্রথম দিককার রচনা সম্পর্কে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের বেশির ভাগই আমাকে কোন একটা কোঠায় ফেলার জন্য বড় বেশি তাড়াহুড়োর পরিচয় ত দিয়েইছেন ...উপরন্তু আমার প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যও নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে আমার চেয়ে শান্ত প্রকৃতির লেখক ('হেমন্তের গায়ক', 'বিষণ্ণতার গায়ক', 'অভিজাতদের বাসার গুণকীর্তনকারী' ইত্যাদি) এবং আমার চেয়ে নির্দিষ্ট ও নিরীহ ধরনের মানুষ আর হয় না। অথচ আসলে কিন্তু আমি মোটেই শান্ত প্রকৃতির লোক নই।... আমার মধ্যে ছিল আনন্দ ও বিষাদের, ব্যক্তিগত অনুভূতির এবং জীবনের প্রতি গভীর আগ্রহের এক তীব্র সংমিশ্রণ, মোটের ওপর আমার তখনকার প্রকাশিত লেখার মধ্যে আমার যে সামান্য প্রকাশ ঘটেছিল তার চেয়ে শতগুণ জটিল ও কঠিন জীবন ছিল আমার।' জমিদারগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবন ও রীতিনীতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান এবং সেই এক মন্থরগতি গ্রামীণ জমিদারী জীবনের ছন্দের সঙ্গে তাল রেখে নিজের অভিজ্ঞতাকে সুললিত ভঙ্গিতে শব্দপ্রকাশের ক্ষমতা মাক্সিম গোর্কির কাছে পরম সমাদর লাভ করেছিল। তাঁর কথায়: 'এটা ভালোই বলতে হবে।' বুনিন এখানে গান গেয়েছেন নবীন রূপধারী ঈশ্বরের মূর্তিতে। তাঁর সে গান হয়েছে সুন্দর, রসে ভরপুর, অন্তরের গান।'

পৃষ্ঠা ২৭

'অভিজাত দার্শনিক' — ফিওদর ইভানভিচ দ্মিত্রিয়েভ-মামনভের (১৭২৮-আনুঃ ১৭৯০) লেখা বই, লেখকের ছদ্মনামও বটে। ১৭৯৬ সালে স্মলেন্স্কে প্রকাশিত।

এরাস্মাস — নবজাগরণযুগের বিখ্যাত মানবতাবাদী এরাস্মাস রটেরডামাস (১৪৬৮-১৫৩৬), 'মূর্খতার গুণকীর্তন' (১৫০৯) নামে ব্যঙ্গরচনার লেখক।

পৃষ্ঠা ২৮

সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিনার... — রুশ সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ইয়েকাতেরিনার (১৭৬২-১৭৯৬) রাজত্বকাল।

'আলেক্সিসের গুপ্তকথা' — ফরাসী লেখক ফ্রাঁসোয়া দিউক্রে-দিউমেনিলে'র (১৭৬১-১৮১৯) লেখা উপন্যাস: 'আলেক্সিস বা অরণ্যে বাসা'। ১৭৯৪ সালে মস্কো থেকে রুশ ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

'ভিক্তর বা অরণ্যে শিশু' — ওই একই লেখকের আরেকটি উপন্যাস। ১৭৯৯ সালে রুশ ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

জুকোভ্স্কি — ভাসিলি আন্দ্রেয়েভিচ জুকোভ্স্কি (১৭৮৩-১৮৫২) — বিশিষ্ট রুশ কবি ও অনুবাদক, বহু কবিতা ও গাথার রচয়িতা।

বাতিউশ্কভ — কন্স্তান্তিন নিকলায়েভিচ বাতিউশ্কভ (১৭৮৭-১৮৫৫) — রুশ কবি, আলেক্সান্দর পুশ্কিনের পূর্বসূরী, তাঁর সমকালীনও বটেন।

জিমনাসিয়ামের ছোকরা ছাত্র পুশ্কিন — রুশদেশের

মহাকবি আলেক্সান্দর প‌ুশ্‌কিনের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় ১৮১৪ সালে। তখন কবির বয়স পনেরো, তিনি ছিলেন জিমনাসিয়ামের ছাত্র।

'ইয়েভ্‌গেনি ওনেগিন' — র‌ুশ মহাকবি প‌ুশ্‌কিনের (১৭৯৯-১৮৩৭) কাব্যোপন্যাস।

স‌ুখদল

'স‌ুখদল' উপাখ্যানের উচ্চ স্থান নির‌ুপণ করে গোর্কি মন্তব্য করেছেন, 'এটি র‌ুশ ভাষায় রচিত সবচেয়ে ভয়াল গ্রন্থগ‌ুলোর একটি।'

জমিদারী জীবনযাত্রার অবক্ষয়, অধঃপতন ও বর্বরতার, তার অস্বাভাবিকতার ছবি এ'কেছেন ব‌ুনিন। কাল্পনিক কতকগ‌ুলি চরিত্র ও তাদের আবেগ-অন‌ুভূতি নিয়ে এই রচনা, কিন্তু তা হলেও মনগড়া তাকে বলা চলে না — এর বিষয়বস্তু পারিবারিক কাহিনী থেকে, অর্থাৎ বাস্তব জীবন থেকে গ‌ৃহীত। যেমন, তোনিয়া পিসীর চরিত্রের আদর্শ ব‌ুনিনের আপন পিসী ভারভারা নিকলায়েভ্‌না। ভ. ন. ম‌ুরোম্‌ৎসেভা-ব‌ুনিনা এ প্রসঙ্গে লিখছেন: 'নিকলাই কাকার রেজিমেণ্টের বন্ধ‌ু জনৈক অফিসার তাঁর পাণিপ্রার্থী হলে তিনি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং উন্মাদ হয়ে যান।... তখন ডাক্তার বৈদ্য ও ওঝা দিয়ে তাঁর চিকিৎসা করা হয়।...' পিওত্‌র কিরিলীচের চরিত্রে আরোপিত হয়েছে লেখকের পিতৃব্য নিকলাই দ্‌মিত্রিয়েভিচের চরিত্র বৈশিষ্ট্য ও জীবনের কাহিনী। স্ত্রীর অকাল ম‌ৃত্যুতে তিনি এত মনমরা হয়ে পড়েছিলেন, এমনকি এত বেশি স্পর্শকাতর

হয়ে পড়েছিলেন যে প্রসঙ্গত, এমন কথাও বলা হয়, 'সেভাস্তোপল অভিযানের সময় নাকি... একবার তিনি মধ্যাহ্নভোজের পর যখন আপেল গাছের তলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েন, এমন সময় ঘূর্ণিঝড় উঠতে কতকগুলো বড় বড় আপেল তার মাথায় এসে পড়ে... তার পরই নাকি তিনি সম্পূর্ণ পাগল হয়ে যান।' খ্রুশ্চভ্‌দের পরম নিশ্চিন্ত ও আকর্ষণীয় পিতার মধ্যে লেখকের পিতৃদেবের কিছু কিছু চরিত্রবৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, যার পরিণতি লক্ষ করা যায় বুনিনের 'আর্সেনিয়েভের জীবনবৃত্তান্ত' উপন্যাসে।

পৃষ্ঠা ৩৯

আমাদের নাম আছে অভিজাতদের ষষ্ঠ কুলপঞ্জীতে... — প্রাচীন কুলীন বংশের মতো বুনিনদেরও নাম ছিল অভিজাতদের কুলপঞ্জীতে। সেখানে বিশেষ করে বলা হয় যে গ্র্যান্ড ডিউক ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচের দরবারে পোল্যান্ড থেকে আগত জনৈক সম্ভ্রান্তবংশীয় কর্মবীর সিমেওন বুন্‌কোভ্‌স্কির থেকে বুনিন বংশের উদ্ভব।

পৃষ্ঠা ৪১

জাদন্‌স্ক — দন নদের তীরে ওরিওল প্রদেশের একটা ছোট শহর।

পৃষ্ঠা ৪৬

সুজ্‌দালে আঁকা... — সুজ্‌দাল — রাশিয়ার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এই শহর প্রাচীন রুশ আইকনশিল্পের অন্যতম

কেন্দ্র ছিল। বিশেষ শিল্পশৈলীর জন্য সুজ্দালের আইকনশিল্পধারার খ্যাতি ছিল ।

স্লাভোনিকে লেখা — প্রাচীন রুশ লিখনরীতি অনুযায়ী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং পবিত্র তাৎপর্যবাচক বস্তু ও নাম সংক্ষেপে লেখা হত। সংক্ষিপ্ত শব্দগুলির উপর বিশেষ চিহ্ন ব্যবহৃত হত।

পৃষ্ঠা ৬৯

আলতা জবার সেই রূপকথার... — রুশ লেখক সের্গেই তিমফেয়েভিচ আক্সাকভের (১৭৯১-১৮৫৯) লেখা 'আলতা জবা' রূপকথা। রূপকথার নায়িকা তাঁর বাবার কাছে উপহার চায় আলতা জবা, যার চেয়ে সুন্দর ফুল দুনিয়ায় আর হয় না।

পৃষ্ঠা ৭৬

ওগিন্স্কি — পোল সুরকার মিখাইল ক্লেওফাস ওগিন্স্কি (১৭৬৬-১৮৩৩)।

পৃষ্ঠা ৮২

'লিউদ্মিলা' (১৮০৯) — ভাসিলি আন্দ্রেয়েভিচ জুকোভ্স্কির গাথা (৪০০ পৃষ্ঠার টীকা দ্রঃ)।

'...প্রতিজ্ঞার পূত বন্ধনে তুমি বাগদত্তা মৃতের কাছে...' — রুশ মহাকবি মিখাইল লেরমন্তভের (১৮১৪-১৮৪১) 'মৃতের প্রেম' কবিতার ঈষৎ বিকৃত উদ্ধৃতি।

পৃষ্ঠা ৮৪

সুখদলের এই পারসীক... — পারসীক — পারস্যের অগ্নি-উপাসক সম্প্রদায়। বর্তমানে ভারতে বসবাসকারী। এরা জরাথুস্ত্র মতাবলম্বী (খ্রীষ্টপূর্ব আনু ১০০০ অব্দ)।

পৃষ্ঠা ৮৮

মার্তিন জাদেকার... — মার্তিন জাদেকার নামে ১৭৭০ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার নানা রকম ভবিষ্যদ্বাণী ও স্বপ্নাদেশ বিষয়ক বই প্রকাশিত হত।

পৃষ্ঠা ৯১

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে স্বেচ্ছায় যোগদান... — ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (১৮৫৩-১৮৫৬) — রাশিয়ার সঙ্গে তুরস্ক, ইংলন্ড, ফ্রান্স আর সার্ডিনিয়ার জোটের যুদ্ধ। এই যুদ্ধের প্রধান স্থল ছিল ক্রিমিয়া, যেখানে ১১ মাস ধরে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে রুশ সৈন্যদল সেভাস্তোপল শহর রক্ষা করে।

পৃষ্ঠা ১০০

পচায়েভে যবন আক্রমণ... — পশ্চিম ইউক্রেনের পচায়েভের মঠ। কিংবদন্তীর মতে এখানে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তাতার-মঙ্গোল আক্রমণের সময় প্রথম সন্ন্যাসীদলের আবির্ভাব ঘটে।

পৃষ্ঠা ১১৮

কিয়েভ মঠ — এই মঠ রুশভূমির (কিয়েভের) প্রাচীনতম গ্রীক অর্থডক্স মঠ। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে এই গুহামঠের প্রতিষ্ঠা।

সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোক

'আমার গল্পরচনার উৎস' নামে বৃত্তান্তে স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে বুনিন লিখেছেন: '...পনেরো সালের গ্রীষ্মকালে... মস্কোর এক বইয়ের দোকানের শো-কেস্-এ... আমি টমাস মান্-এর 'ভেনিসে মৃত্যু' উপন্যাসের রুশ ভাষায় একটা সংস্করণ দেখতে পাই।... ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বরের শুরুতে যখন আমি আমার খুড়তুত বোনের জমিদারীতে কাটাচ্ছি সেই সময় কেন যেন আমার মনে পড়ে গেল ওই বইটার কথা আর কোন এক আমেরিকান ভদ্রলোকের আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনা। সেই বছর আমরা কাপ্রিতে 'কুভিসিসান্স্' নামে যে হোটেলে ছিলাম ভদ্রলোকও সেখানেই উঠেছিলেন। তক্ষুনি 'কাপ্রিতে মৃত্যু' লেখার সংকল্প নিলাম, চার দিনের মধ্যে লিখেও ফেললাম।... 'কাপ্রিতে মৃত্যু' শিরনাম আমি অবশ্য 'সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোক'-এর প্রথম ছত্র লেখার সঙ্গে সঙ্গে কেটে দিলাম।... সান-ফ্রান্সিস্কো ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপার (কোন এক আমেরিকান যে লাঞ্চের পর সত্যি সত্যি 'কুভিসিসান্স্'-এ মারা গিয়েছিলেন, এই ঘটনাটা ছাড়া) আমার মনগড়া।' বুনিন তাঁর ডায়রীতে লিখেছেন: '১৪-১৯ আগস্ট তারিখে 'সান-ফ্রান্সিস্কোর ভদ্রলোক' গল্প লিখলাম। উপসংহার লিখতে গিয়ে কেঁদেছি।' জার্মান লেখক টমাস মান (১৮৭৫-১৯৫৫) বুনিনের গল্প পড়ে মুগ্ধ হন, তিনি লেখেন যে বুনিনের এই রচনাটি 'তার প্রবল নীতিধর্ম ও লালিত্যগুণে তলস্তয়ের 'পলিকুশ্কা' ও 'ইভান ইলিচের মৃত্যুর' মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোন

কোন রচনার সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হওয়ার যোগ্য।'

পৃষ্ঠা ১৫৬

লয়েড্‌স — ইংলন্ডের বৃহত্তম বীমা কোম্পানি — সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনাকালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত।

পৃষ্ঠা ১৬২

টাইবেরিয়াসের প্রাসাদ... — টাইবেরিয়াস (খ্রীঃ পূঃ ৪২-৩৭ খ্রীষ্টাব্দ) — রোম সম্রাট, পৃথিবীর ইতিহাসে নৃশংস, রক্তপিপাসু ও মানববিদ্বেষী নৃপতি বলে পরিচিত।

পৃষ্ঠা ১৭২

ইব্‌সেনের মতো... — হেন্‌রিখ ইব্‌সেন (১৮২৮-১৯০৬) — নরওয়েজীয় নাট্যকার। বিশ্ব নাট্যসাহিত্য ও নাট্যকলা জগতে তাঁর রচনার প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

লঘু নিশ্বাস

বুনিন লিখেছেন, ''লঘু নিশ্বাস' গল্পটা আমি লিখেছিলাম ১৯১৬ সালের মার্চ মাসে, ভাসিলিয়েভ্‌স্কয়ে-তে। 'রুশ বাণী' পত্রিকা তার ঈস্টার-সংখ্যার জন্য আমাকে একটা কিছু লেখার অনুরোধ জানায়। অনুরোধ ঠেলি কী করে? 'রুশ বাণী' তখনকার দিনে আমাকে পংক্তি পিছু দু'রুব্‌ল করে পারিশ্রমিক দিত। কিন্তু কী দিই?

এমন সময় আমার মনে পড়ে গেল একদিন শীতকালে নেহাৎই দৈবক্রমে আমি কাপ্রির একটা ছোট কবরখানায় এসে পড়ি, সেখানে হঠাৎ আমার চোখে পড়ে যায় একটা কবরের ওপর ক্রুশের গায়ে লাগানো বেশ বড় চীনেমাটির পদকে কোন এক বাচ্চা মেয়ের একটি ফোটো — চোখদুটো তার আশ্চর্য জীবন্ত, হাসিখুশি। তৎক্ষণাৎ এই মেয়েটি আমার মানসলোকে রুশী মেয়ে ওলিয়া মেশ্চের্স্কায়া হয়ে ধরা দিল, আমি কালিতে কলম ডুবিয়ে তাকে নিয়ে গল্প বানাতে শুরু করলাম; পুলকিত হয়ে এত দ্রুত আমি লিখে বললাম যে আমার লেখক জীবনের পরম সুখের মুহূর্তগুলিতেই তা সম্ভব।'

পৃষ্ঠা ১৯২

ফাউস্ট আর মার্গারেট — যোহান ভল্ফ্গাং গ্যেটের (১৭৪৯-১৮৩২) 'ফাউস্ট' ট্র্যাজিডির চরিত্র।

সার্দিগর্মি

বুনিনের 'ছায়া বীথি' নামে যে গ্রন্থে প্রেমের ট্র্যাজিক দর্শনের নানা প্রকারভেদ দেখানো হয়েছে 'সার্দিগর্মি' গল্পটি তারই পূর্বসূরী। প্রবাসী সমালোচকমহল এই গল্পটির নবত্ব স্বীকার করে মন্তব্য করেছেন যে 'মহাপ্রতিভাধর মানে ও ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীরা সূর্যের রঙের প্রায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে রূপ সঞ্চারে সক্ষম হয়েছেন, সাহিত্যে, তেমন দেখা যায় নি। উপলব্ধির প্রাবল্য, পরিপূর্ণ বর্ণসুষমা, প্রেমের সুখদুঃখ আর প্রবল

প্রাণোচ্ছ্বাসের গুণে এই ছোট্ট গল্পটি একটি আশ্চর্য সৃষ্টি।'

পৃষ্ঠা ১৯৯

'সামোলিওৎ' — ভোল্‌গায় রুশ জয়েণ্টস্টক স্টীমার কোম্পানি।

পৃষ্ঠা ২০৬

তুর্কিস্তান — উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে বিংশ শতাব্দীর সূচনায় মধ্য এশিয়ার তুর্ক জাতিসত্তা অধ্যুষিত ভূখণ্ডের নাম।

'ছায়া বীথি' সংকলন থেকে
লিকা

'লিকা' পৃথক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে ব্রাসেল্‌সের 'পেত্রপোলিস' প্রকাশনালয় থেকে। লেখকের স্ত্রী ভেরা নিকলায়েভ্‌না মুরম্‌ৎসেভা-বুনিনা লিখেছেন: 'ইভান আলেক্সেয়েভিচ 'লিকা' পৃথক ভাবে প্রকাশ করেন একমাত্র এই কারণে যে 'আর্সেনিয়েভের জীবনবৃত্তান্ত' ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়ে গেছে; কিন্তু প্রথম সুযোগে 'লিকা'কে তাঁর 'আর্সেনিয়েভের জীবনবৃত্তান্ত' উপন্যাসের পঞ্চম অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করেন।' ১৯৫২ সালে নূ্য ইয়র্কের চেখভ প্রকাশনালয় 'আর্সেনিয়েভের জীবনবৃত্তান্ত: যৌবন' নাম দিয়ে উপন্যাসের প্রথম পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশ করে।

ইয়েলেৎসের জনৈক চিকিৎসকের কন্যা ভারভারা পাশ্চেঙ্কো উপন্যাসে লিকার আদর্শ ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বুনিনের দেখা ওরিওলে, সেখানে তাঁরা একসঙ্গে 'ওরিওল বার্তা' পত্রিকায় কাজ করতেন। পাশ্চেঙ্কো 'নীতিগতভাবে', 'আনুষ্ঠানিক বিবাহ ছাড়া' তাঁর সঙ্গে জীবনযাপন করতে সম্মত হন; কিন্তু পরে তাঁর জীবনসঙ্গী নির্বাচন কতটা নির্ভুল হয়েছে এই নিয়ে মনের ভেতরে সবসময় একটা খটকা বেধে থাকে — তাঁর কাছে বুনিন ছিলেন একজন নিঃস্ব ব্যক্তি, বুনিনের মধ্যে বিশেষ কোন ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও তিনি দেখতে পান নি। তাঁর এই মনোভাব দু'জনের সম্পর্কের ওপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাঁদের মিলিত জীবন বছর পাঁচেক স্থায়ী হয়। ১৮৯৪ সালে ভারভারা ভ্লাদিমিরভ্‌না বুনিনকে পরিত্যাগ করেন, বুনিনেরই এক বন্ধু জনৈক ধনী জমিদারনন্দনের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ভেরা মুরম্‌ৎসেভা-বুনিনা লিখেছেন লিকার মধ্যে 'তরুণ বুনিনের প্রেম, তাঁর শক্তি ও আবেগ, অনুভূতির পুনরুজ্জীবন ঘটেছে। যত নারীকে তিনি ভালোবেসেছিলেন লিকার মধ্যে আমি তাদের সকলকে দেখতে পাই।'

পৃষ্ঠা ২১২

তুর্গেনেভ্‌কে আপনার ভালো লাগে? — ইভান সের্গেয়েভিচ তুর্গেনেভ (১৮১৮-১৮৮৩) — যশস্বী রুশ লেখক। জীবনের একটা অংশ তিনি ওরিওল প্রদেশের ওরিওল শহরে কাটান।

'বাবুদের বাসা' — ইভান তুর্গেনেভের উপন্যাস (১৮৫৯)।

লিজা, লাভ্রেৎস্কি লেম্ — 'বাবুদের বাসা' উপন্যাসের চরিত্র।

পৃষ্ঠা ২১৪

গুর্জুফে পুশ্কিনের সেই মোহিনী দিনগুলোতে... — ১৮২০ সালে আলেক্সান্দর পুশ্কিন কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী ক্রিমিয়ার গুর্জুফ পল্লীতে তাঁর বন্ধুপরিবার রায়েভ্স্কিদের সঙ্গে কয়েক মাস কাটান।

পৃষ্ঠা ২২৩

চাইকোভ্স্কির 'প্রভাত' — প্রথিতযশা রুশ সুরকার পিওত্র ইলিচ চাইকোভ্স্কির (১৮৪০-১৮৯৩) একটি রচনা।

পৃষ্ঠা ২২৭

'চলল শেয়াল নিয়ে, কালো বন দিয়ে, খাড়া পাহাড় পারে...' — 'শেয়াল আর মোরগ' নামে রুশ লোককথায় মোরগের বিলাপ গীতের প্রথম পংক্তি।

পৃষ্ঠা ২৩১

সবে একারম্যান পড়েছি তখন... — যোহান পিটার একারম্যান (১৭৯২-১৮৫৪) — জার্মান স্মৃতিকথা লেখক, গ্যেটের সচিব ছিলেন। 'গ্যেটের জীবনের শেষ বছরগুলিতে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা' নামে যে স্মৃতিকথা তিনি লেখেন তাতে গ্যেটের বহু আপ্তবাক্য সংগৃহীত।

পৃষ্ঠা ২৩১

নেক্রাসভ — নিকলাই আলেক্সেয়েভিচ নেক্রাসভ (১৮২১-১৮৭৭/৭৮) — রুশ কবি। বাস্তববাদী।

পৃষ্ঠা ২৩২

মহতী সংস্কার যুগ... — ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। এই সময়, ১৮৬১ সালে রাশিয়ার আইনের সংস্কার করে ভূমিদাস প্রথা তুলে দেওয়া হয়, ১৮৬৪ সালে গ্রামীণ শাসনপরিষদ (জেম্‌স্ত্‌ভো)-র ক্ষেত্রে, তাছাড়া আরও কিছু কিছু স্থলে সংস্কার সাধিত হয়।

বাস করছি চেখভের 'গোধূলি'তে... — ১৮৮৭ সালে রুশ লেখক আন্তন চেখভের (১৮৬০-১৯০৪) 'গোধূলি' নামে সঙ্কলনগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের জন্য ১৮৮৮ সালে চেখভ বিজ্ঞান আকাদমির পুশ্‌কিন পুরস্কারের অর্ধাংশ অর্জন করেন।

মার্কাস্‌ ওরেলিয়াস... — মার্কস ওরেলিয়াস আন্তোনিন (১২১-১৮০) — রোম সম্রাট, স্টোইকবাদী দার্শনিক। 'নিভৃতে আপন মনে' নামে যে গ্রন্থ তিনি লেখেন তাতে বহু নৈতিক সমস্যা আলোচিত হয়েছে।

পৃষ্ঠা ২৩৩

পিয়ের বেজুখভ ও আনাতোলি কুরাগিন — প্রাতঃস্মরণীয় রুশ লেখক লেভ তলস্তয়ের (১৮২৯-১৯১০) 'যুদ্ধ ও শান্তি' (১৮৬৩-১৮৬৯) উপন্যাসের দুটি চরিত্র।

'পাক্ষিরাজ' গল্পের... — লেভ তল্‌স্তয়ের একটি বড় গল্প।

ইভান ইলিচ — তল্‌স্তয়ের 'ইভান ইলিচের মৃত্যু' গল্পের প্রধান চরিত্র।

'কী তাহলে করা যায়?' — লেভ তল্‌স্তয়ের একটি প্রবন্ধ (১৮৮৫)।

'মানুষের কতই বা জমি চাই' — তল্‌স্তয়ের একটি ছোট গল্প (১৮৮৬)।

'কসাক' — তল্‌স্তয়ের উপন্যাস (১৮৫২-১৮৬২)।

পৃষ্ঠা ২৩৯

'ঘোড়ার খুরের শব্দ। ধুধু চারিদিক...' — বহু কবিতা ও গাথার রচনাকার, বিখ্যাত অনুবাদক ভাসিলি জুকোভ্‌স্কির (১৭৮৩-১৮৫২) 'স্‌ভেৎলানা' গাথা থেকে অশুদ্ধ উদ্ধৃতি।

পৃষ্ঠা ২৪৫

'আমার হৃদয়কে নিয়ে যাও দূরে...' — রুশ কবি আফানাসি আফানাসিয়েভিচের ফেত্‌-এর (১৮২০-১৮৯২) 'কোন এক গায়িকার প্রতি' কবিতা থেকে অশুদ্ধ উদ্ধৃতি।

পৃষ্ঠা ২৪৬

'পথ চোখে পড়ে না আর হায়!...' — ফেত্‌-এর নামহীন এক কবিতা থেকে। এই ছত্রগুলো দিয়েই কবিতাটার শুরু।

'স্লেজের চাকুনির নিচে'... — রুশ কবি ইয়াকভ পেত্রোভিচ পলোন্‌স্কির (১৮১৯-১৮৯৮) 'শীতের পথ' কবিতা থেকে অশুদ্ধ উদ্ধৃতি।

পৃষ্ঠা ২৪৭

'মেঘের ফাঁকে উঠল সূর্য...' — ফেত্-এর কবিতা থেকে অশুদ্ধ উদ্ধৃতি।

পৃষ্ঠা ২৪৮

'সুদূর গভীর বনে মধ্যরাত্রি নামল'... — ফেত্-এর কবিতার প্রথম পংক্তি।

পৃষ্ঠা ২৫১

নগরপাল, খ্লেস্তাকভ, ওসিপ — নিকলাই গোগলের (১৮০৯-১৮৫২) 'ইন্স্পেক্টর জেনারেল' (১৮৩৬) নাটকের চরিত্র।

রেপেতিলভ, চাৎস্কি, ফামুসভ — রুশ নাট্যকার লেখক ও কূটনীতিবিদ আলেক্সান্দর সের্গেয়েভিচ গ্রিবোয়েদভের (১৭৯৫-১৮২৯) 'বুদ্ধি বিপদ আনে' (১৮২৪) কমেডির চরিত্র।

পৃষ্ঠা ২৫২

দাঁড়িয়ে আছেন রিগোলেত্তো... — ইতালীয় সুরকার, অপেরা-রচয়িতা জুসেপ্পে ভের্দির (১৮১৩-১৯০১) 'রিগোলেত্তো' (১৮৫১) অপেরার প্রধান চরিত্র।

সুসানিন — বিখ্যাত রুশ সুরকার মিখাইল ইভানভিচ গ্লিন্কার (১৮০৪-১৮৫৭) 'ইভান সুসানিন' অপেরার প্রধান নায়ক। সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনায় পোল দখলদারদের

বিরুদ্ধে যুদ্ধে জনৈক রুশ লৌকিক বীরের আত্মবলিদানের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে এতে।

'মৎস্যকন্যা' — আলেক্সান্দর পুশ্‌কিনের 'মৎস্যকন্যা' নাটক অবলম্বনে রুশ সুরকার আলেক্সান্দর সের্গেয়েভিচ দার্গোমিজ্‌স্কির (১৮১৩-১৮৬৯) অপেরা।

'উন্মাদের দিনপঞ্জি' — নিকলাই গোগলের উপাখ্যান (১৮৩৪)।

লিউবিম তর্ৎসভের... — **লিউবিম তর্ৎসভ** — রুশ নাট্যকার আলেক্সান্দর অস্ত্রভ্‌স্কির 'দারিদ্র্য দোষের নয়' নামে কমেডির প্রধান চরিত্র।

মার্মেলাদভ — বিখ্যাত রুশ লেখক ফিওদর দস্তয়েভ্‌স্কির (১৮২১-১৮৮১) 'অপরাধ ও শাস্তি' উপন্যাসের (১৮৬৬) চরিত্র। একাধিকবার এর নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হয়।

পৃষ্ঠা ২৬৮

লেন্টের প্রথম সপ্তাহে... — লেন্ট — ঈস্টারের অব্যবহিত পূর্ববর্তী চল্লিশ দিন ব্যাপী সংযমব্রতপালনের খ্রীষ্টীয় পর্ববিশেষ।

পৃষ্ঠা ২৭৬

'বিশপ সমাচার' — বিপ্লব-পূর্ব আমলে নিজস্ব গির্জা ও যাজকের ভিত্তিতে রাশিয়ার অঞ্চলগুলির যে যাজনিক বিভাগ (অনেকটা প্রদেশের মতো) হত তারই সরকারী মুদ্রিত মুখপত্র। এগুলিতে ধর্মগুরুদের উপদেশ, নানাবিধ

অনুশাসন এবং ধর্মবিষয় লেখকদের রচনা ইত্যাদি প্রকাশিত হত।

'রুশী তীর্থযাত্রী' — ধর্ম ও নীতিবিষয়ক সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা। মস্কো থেকে প্রকাশিত হত (১৮৮৫-১৮৯৪)। পরবর্তীকালে প্রকাশিত হতে থাকে সেণ্ট পিতার্সবুর্গ থেকে। এই পত্রিকায় সাধুসন্তদের জীবনচরিত, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক নানা প্রবন্ধ এবং ধর্মবিষয়ক লেখকদের রচনাদি প্রকাশিত হত।

পৃষ্ঠা ২৭৭

'পর্‌চা' — ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে রুশ দেশে জমির মালিকানার জন্য ধার্য খাজনার ব্যবস্থা, তৎসংক্রান্ত পুস্তিকা। খাজনা ধার্য হত ইউনিট হিসেবে 4000 থেকে ৬400 বিঘা চাষের জমি অনুযায়ী।

'উত্তরী মৌমাছি' — রাজনীতি ও সাহিত্যবিষয়ক পত্রিকা। ১৮২৫-১৮৬৪ সালে সেণ্ট পিতার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত হত। ১৮২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত উদারনৈতিক মতবাদের পরিপোষক ছিল। পরবর্তীকালে প্রতিক্রিয়াশীল, নীতিবিবর্জিত মুখপত্রে পরিণত হয়।

'মস্কো সমাচার' — সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১৮০৯ সালে অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হত। গণতান্ত্রিক মতাবলম্বী পাঠক সমাজের মুখপত্র ছিল।

'ধ্রুবতারা' — সাহিত্যপঞ্জী (১৮২৩-১৮২৫) ডিসেম্ব্রিস্ট কবি আলেক্সান্দর বেস্তুজেভ ও কন্দ্রাতি রিলেয়েভ-কর্তৃক প্রকাশিত।

'উত্তরী পুষ্প' — সাহিত্য সংকলন পত্রিকা। ১৮২৫-

১৮৩১ সালে সেণ্ট পিতার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত হত। এতে তখনকার দিনের বিশিষ্ট রুশ লেখকদের রচনা প্রকাশিত হত।

পুশ্‌কিনের 'সমকালীন' — প্রগতিশীল রুশ পত্রিকা। ১৮৩৬ সালে কবি আলেক্সান্দর পুশ্‌কিন এর প্রতিষ্ঠা করেন।

হোমার — প্রাচীন গ্রীসের যশস্বী কবি। প্রাচীন গ্রীসের মহাকাব্য 'ইলিয়াড', 'অডিসি' এবং অন্যান্য কাব্য রচয়িতা রূপে পরিচিত।

হোরেস (৬৫-৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) — রোমের কবি ও দার্শনিক।

ভার্জিল (৭০-১৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) — রোমের কবি। তাঁর রচিত বীরগাথা 'ঈনিড' রোমের ধ্রুপদী সাহিত্যের চরম উৎকর্ষরূপে গণ্য।

দান্তে — দান্তে আলিগিয়েরি (১২৬৫-১৩২১) — ইতালীয় কবি, 'ডিভাইন কমেডি'র রচয়িতা।

পেত্রার্কা — ফ্রাঞ্চেস্কো পেত্রার্কা (১৩০৪-১৩৭৪) — ইতালির নবজাগরণ যুগের কবি।

শেক্সপীয়র — উইলিয়ম শেক্সপীয়র (১৫৬৪-১৬১৬) — ইংরেজ নাট্যকার ও কবি।

বায়রন — জর্জ নোয়েল গর্ডন বায়রন (১৭৮৮-১৮২৪) — ইংরেজ রোমাণ্টিক কবি।

শেলী — পার্সি বিশ শেলী (১৭৯২-১৮২২) — ইংরেজ রোমাণ্টিক কবি।

গ্যেটে — যোহান ভল্‌ফ্‌গাং গ্যেটে (১৭৪৯-১৮৩২) — জার্মান কবি ও চিন্তাবিদ।

রাসিন — জাঁ রাসিন (১৬৩৯-১৬৯৯) — ফরাসী নাট্যকার, 'ব্রিটানিক', 'ফেড্রা' ইত্যাদি ট্র্যাজিডির লেখক।

মোলিয়ের — প্রকৃত নাম জাঁ বাতিস্ত পোক্‌লেন (১৬২২-১৬৭৩) — ফরাসী কৌতুক নাট্যকার, অভিনেতা, নাট্যমঞ্চবিশারদ।

'ডন কুইক্সোট' — বিশিষ্ট স্পেনীয় লেখক সাভেদ্রা মিগেল দ্য সের্ভান্তেসের (১৫৪৭-১৬১৬) জগদ্বিখ্যাত উপন্যাস। ১৬০৫ ও ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়।

মানন লেস্কট — ফরাসী লেখক আঁতোয়ান ফ্রাঁসোয়া প্রেভোর (১৬৯৭-১৭৬৩) উপন্যাস।

রাদিশ্চেভ — আলেক্সান্দর নিকলায়েভিচ রাদিশ্চেভ (১৭৪৯-১৮০২) — রুশ বিপ্লবী, স্বৈরতন্ত্র ও ভূমিদাসপ্রথার বিরোধী লেখক। 'সেন্ট পিতার্সবুর্গ থেকে মস্কো ভ্রমণ' (১৭৯০) গ্রন্থের লেখক।

'চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম...' — রাদিশ্চেভের 'সেন্ট পিতার্সবুর্গ থেকে মস্কো ভ্রমণ' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি।

পৃষ্ঠা ২৮২

সুভোরিনের বইয়ের... — আলেক্সান্দর সের্গেয়েভিচ সুভোরিন (১৮৩৪-১৯১২) — সাংবাদিক ও বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক।

পৃষ্ঠা ২৮৬

'শৈশব, কৈশোর' গোছের কিছু একটা... — 'শৈশব', 'কৈশোর' ও 'যৌবন' — লেভ নিকলায়েভিচ তলস্তয়

রচিত (১৮৫১-১৮৫৬) আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস-ত্রয়ী।

পৃষ্ঠা ২৮৭

ক্যাল্‌ডিয়া — ব্যাবিলনিয়া — খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে মেসোপটামিয়ায় উদ্ভূত প্রাচীন দাসপ্রথাভিত্তিক রাষ্ট্র।

আসিরিয়া — খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের শেষে মেসোপটামিয়ায় উদ্ভূত প্রাচীন দাসপ্রথাভিত্তিক রাষ্ট্র।

আর্টাক্‌জার্কাস নামের কে একজন হুকুম দিলেন হেলেস্‌পণ্ট জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবার... — প্রাচীন পারস্যসম্রাট আর্টাক্‌জার্কাস দ্বিতীয় মনেমন (৪০৫-৩৫৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) হেলেস্‌পণ্ট (দার্দানেল) প্রণালীর তীরে স্পার্টার বিরুদ্ধে করিন্থিয়ার যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন।

পেরিক্লিস (আনুমানিক ৪৯০-৪২৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) — প্রাচীন গ্রীসের রাজনীতিজ্ঞ, দার্শনিক ও বাগ্মী। সে যুগের সাংস্কৃতিক আলোকোন্মেষ তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত।

আস্‌পেসিয়া — পেরিক্লিসের প্রেয়সী।

থার্মোপলির যুদ্ধ — ৪৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের বসন্তকালে গ্রীক ও পারসিকদের মধ্যে যুদ্ধ।

মারাথনের যুদ্ধ — ৪৯০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে অ্যাটিকায় মারাথন প্রান্তরে সংঘটিত গ্রীক-পারসিক যুদ্ধ।

এব্রাহামের আবির্ভাব ঘটে... — এব্রাহাম — বাইবেলের ওল্‌ড টেস্টামেণ্টে উল্লিখিত জনৈক কুলপতি, হিব্রুজাতির প্রতিষ্ঠাতা বলে কথিত।

পৃষ্ঠা ২৯০

রাজন্যদের আমন্ত্রণ জানানো... — কিংবদন্তী অনুযায়ী ৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে রিউরিক নামে জনৈক স্ক্যাণ্ডিনেভীয় রাজন্য তাঁর দুই ভাই সিনেউস ও ত্রুভোর এবং অনুচরবৃন্দ সমভিব্যাহারে নভগোরদে আগমন করলেন, সেখানকার অধিবাসীরা তাঁদের আমন্ত্রণ জানায়।

রাজা ভ্লাদিমির সমীপে জারগ্রাদের রাজদূতবৃন্দ... — 'কিয়েভের মহাসামন্ত' ভ্লাদিমির স্‌ভিয়াতস্লাভিচ (মৃত্যু ১০১৫ খ্রীষ্টাব্দে) বাইজাণ্টাইমের সঙ্গে মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হন, তৎকালীন বাইজাণ্টাইম সম্রাটের ভগ্নীর পাণিগ্রহণ করেন।

পেরুনকে নীপারে নিক্ষেপ — প্রাচীন স্লাভজাতির বজ্রবিদ্যুতের দেবতা পেরুন, যুদ্ধের দেবতাও বটেন। কিয়েভ রুশভূমি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলে (আনুঃ ৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে) পেরুনের বিগ্রহ পুড়িয়ে নীপার নদের জলে ফেলে দেওয়া হয়।

প্রাজ্ঞ ইয়ারস্লাভ — ইয়ারস্লাভ ভ্লাদিমিরভিচ — ১০১৯-১০৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কিয়েভের রাজন্য ছিলেন। 'প্রাজ্ঞ' নামে পরিচিত।

পৃষ্ঠা ২৯১

'সুবৃহৎ নীড়' ভ্সেভলদ — (১১৫৪-১২১২) — ভ্লাদিমিরের মহাসামন্ত। বহু সন্তানের জনক (৮ পুত্র ও ৪ কন্যা) বলে 'সুবৃহৎ নীড়' আখ্যা পান।

আক্সাকভ... — সের্গেই তিমফেয়েভিচ আক্সাকভ (১৭৯১-১৮৫৯) রুশ সাহিত্যিক।

নিকলাই সেমিওনভিচ লেস্কভ (১৮৩১-১৮৯৫) — রুশ লেখক। তাঁর শৈশব ও কৈশোর ওরিওলে এবং ওরিওল প্রদেশে অতিবাহিত হয়।

পৃষ্ঠা ২৯২

স্ভিয়াতগরস্কি মঠ — ১৫৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত পুরুষদের মঠ। বর্তমানে ঐতিহাসিক স্থাপত্য নিদর্শন। আলেক্সান্দর পুশকিনের সমাধি এখানে অবস্থিত।

পৃষ্ঠা ৩০৩

স্মলেন্স্ক — রাশিয়ার ইউরোপীয় অংশের পশ্চিমে একটি শহর।

ব্রিয়ান্স্ক — রাশিয়ার পশ্চিম অংশের একটি শহর, অরণ্য পরিবেষ্টিত। বিশেষত অতীতে সে অরণ্য ছিল গহন ও দুর্গম।

পৃষ্ঠা ৩০৬

ভিতেব্স্ক... পলোৎস্ক — পশ্চিম দ্ভিনা নদীর তীরে বেলোরুশিয়ার দুটি শহর।

পৃষ্ঠা ৩০৭

'নোভয়ে ভ্রেমিয়া' (নতুন কাল) — প্রতিক্রিয়াশীল রুশ অভিজাত ও আমলা সম্প্রদায়ের দৈনিক পত্রিকা। ১৮৬৮

থেকে ১৯১৭ সালে সেণ্ট পিতার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত হত।

পৃষ্ঠা ৩১২

নিকলায়েভ্স্কি স্টেশন — বর্তমানে লেনিনগ্রাদের মস্কো স্টেশন।

পৃষ্ঠা ৩১৩

সেণ্ট বাসিলের গির্জা — পক্রোভ্স্কি ক্যাথিড্রাল নামেও পরিচিত। মস্কোর রেড স্কোয়ারের একটি দেবালয়। প্রাচীন রুশ স্থাপত্যের একটি নিদর্শন। ১৫৫৫ থেকে ১৫৬০ খৃীষ্টাব্দে নির্মিত।

অখৎনি রিয়াদ — তৎকালীন মস্কোর কেন্দ্রীয় অঞ্চলের একটি রাস্তা। বাজারপাড়া। এখানে মাছ মাংস ও শাকসবজির দোকানপাট ছিল।

পৃষ্ঠা ৩২৫

এ শহরে এককালে ছাত্র হিসেবে ছিলেন গোগল... — বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক নিকলাই ভাসিলিয়েভিচ গোগল নেজিন শহরে উচ্চবিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছিলেন (১৮২১-১৮২৮)।

মিরগোরদ — ইউক্রেনের পল্তাভ প্রদেশের একটি শহর। ১৮৩৫ সালে গোগলের যে দ্বিতীয় রচনাসঙ্কলন প্রকাশিত তার নাম ছিল 'মিরগোরদ'।

'উপরাশিয়ায় গ্রীষ্মের দিন কী সুন্দর, কী দীপ্ত উজ্জ্বল!' — নিকলাই গোগলের প্রথম রচনাসঙ্কলন

'দিকান্‌কা সংলগ্ন পল্লীতে সন্ধ্যার' (১৮৩১-১৮৩২) অন্তর্ভুক্ত 'সরোচিন্‌ৎসির মেলা' উপাখ্যানের প্রথম অধ্যায় থেকে।

পৃষ্ঠা ৩২৬

'নানা-রঙা সব্জী ছোপের উপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হচ্ছে এই সব অলৌকিক কীটপতঙ্গের মরকত, পোখরাজ ও চুনি পাথর।...' — ওই একই জায়গা থেকে।

পৃষ্ঠা ৩২৭

'পিতার্স্বুর্গ, বরফ, বদমায়েস, দপ্তর — এসবের স্বপ্ন দেখলাম: ঘুম ভাঙল আবার নিজের দেশেই।' — ১৮৩৭ সালের ৩০ অক্টোবর তারিখে রোম থেকে ভাসিলি জুকোভ্‌স্কিকে লেখা নিকলাই গোগলের একটি চিঠি থেকে ভুল উদ্ধৃতি। গোগলের লেখা চিঠিতে ছিল: 'রাশিয়া, পিতার্স্বুর্গ, বরফ, বদমায়েস, দপ্তর, শিক্ষামণ্ড, থিয়েটার — এসবই স্বপ্ন দেখলাম।'

চিগিরিন, চের্কাসি, খরল, লুব্‌নী, চের্তম্‌লীক, দিকয়ে পোলে — ইউক্রেনের বিভিন্ন শহর ও জনবসতির নাম।

শেভ্‌চেন্‌কো — তারাস গ্রিগোরিয়েভিচ শেভ্‌চেন্‌কো (১৮১৪-১৮৬১) — ইউক্রেনের বিখ্যাত জাতীয় কবি, শিল্পী ও বিপ্লবী-গণতন্ত্রী।

পৃষ্ঠা ৩২৮

'রাস্তা থেকে আকাশে উঠল স্তেপের একটি গাংচিল, মাথার

ঝুঁটিটা তার দেখতে বক্ষনীর মতো।... — গোগলের 'নোটবুক' (১৮৪৬-১৮৫১) থেকে উদ্ধৃতি।

পৃষ্ঠা ৩২৯

'সে ঘোড়সওয়ার আমি নিজে।...' — জার্মান কবি ও চিন্তাবিদ যোহান ভল্ফ্গাং গ্যেটের 'কাব্য ও সত্য' রচনা থেকে।

ক্রিমিয়ার প্রাচীন কোনো বাদশা... — পঞ্চদশ শতাব্দীতে তাতার-মোঙ্গল শাসন অবসানের পর এদের শাসনের সূচনা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ক্রিমিয়া রাজ্য রুশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়।

বাখ্চিসারাই প্রাসাদে — বাখ্চিসারাই ক্রিমিয়ার একটি শহর, এক কালে ক্রিমিয়ার বাদশাদের বাসস্থান ছিল। বাদশাদের প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীতে, অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর অষ্টাদশ শতাব্দিতে পুনর্নির্মিত হয়। বাখ্চিসারাই প্রাসাদ নিয়ে আলেক্সান্দর পুশ্কিনের 'বাখ্চিসারাই ফোয়ারা' নামে দীর্ঘ কাব্য আছে।

ডেকার্ত... — রেনে ডেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০) বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক, গণিতজ্ঞ, পদার্থবিদ ও শারীরতত্ত্ববিদ।

পৃষ্ঠা ৩৩১

দুঃসাহসী দরশেন্কো... — পিওত্র দরশেন্কো (১৬২৭-১৬৯৮) — ১৬৬৫ থেকে ১৬৭৬ সাল পর্যন্ত ইউক্রেনের দক্ষিণ উপকূলবর্তী অঞ্চলের শাসনকর্তা, তুরস্কের সমর্থনপুষ্ট।

সাগাইদাচ্‌নি — পিওত্‌র সাগাইদাচ্‌নি (মৃত্যু ১৬২২ সাল) — ১৬১০ সাল থেকে ইউক্রেনের শাসনকর্তা।

পৃষ্ঠা ৩৩২

কের্চ, ক্রেমেন্‌চুগ, নিকলায়েভ — ইউক্রেনের দক্ষিণের শহর।

পৃষ্ঠা ৩৩৭

কচুবেই — ভাসিলি লেওন্তিয়েভিচ কচুবেই (১৬৪০-১৭০৮) — ১৬৯৯ থেকে ইউক্রেনের বাম উপকূলবর্তী অঞ্চলের প্রধান বিচারপতি।

'সমতল রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ গভীর ফাঁক...' — নিকলাই গোগলের 'নোটবুক' (১৮৪৬-১৮৫১) থেকে উদ্ধৃতি।

প্‌সিওল নদী — রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চল ও ইউক্রেনের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত একটি নদী, নীপারের শাখানদী।

পৃষ্ঠা ৩৪২

প্রাচীন কিয়েভের প্রিন্স ভ্‌সেস্লাভের... — প্রিন্স ভ্‌সেস্লাভ (মৃত্যু ১১০১ সাল) পলোৎস্কের প্রিন্স। ১০৬৮ সালে সাত মাসের জন্য কিয়েভের প্রিন্স ছিলেন।

পৃষ্ঠা ৩৪৩

কিয়েভের সেণ্ট সোফিয়া ক্যাথিড্রাল — ১০৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন রুশ স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন।

পৃষ্ঠা ৩৪৪

'গ্যেটে বলেছেন: 'আমাদের নিজেদের সৃষ্টির কাছেই আমরা পরাধীন।' — গ্যেটের 'কাব্য ও সত্য' রচনা থেকে।

উসুরি জেলা — চীনের সীমান্তে দূর প্রাচ্যের একটি জেলা।

পৃষ্ঠা ৩৪৫

'সুখের সংসার' — ১৮৫৯ সালে লেভ তলস্তয়ের লিখিত উপন্যাস।

পৃষ্ঠা ৩৫৭

অভিশপ্ত স্ভিয়াতপলকের কথা... — অভিশপ্ত স্ভিয়াতপলক (আনুঃ ৯৮০-১০১৯) — প্রাচীন রুশভূমির জনৈক রাজন্য, শাসনক্ষমতা অধিকারের সংঘাতে তাঁর তিন ভাই বরিস, গ্লেব ও স্ভিয়াতস্লাভকে হত্যা করার ফলে 'অভিশপ্ত' আখ্যা পান।

পৃষ্ঠা ৩৬০

জানকভেৎস্কায়া — ইউক্রেনীয় অভিনেত্রী ও রঙ্গমঞ্চশিল্পী মারিয়া কনস্তান্তিনভ্না আদাসোভ্স্কায়ার (১৮৬০-১৯৩৪) ছদ্মনাম।

পানাস কার্পভিচ সাক্সাগানস্কি (১৮৫৯-১৯৪০) — ইউক্রেনীয় অভিনেতা ও পরিচালক।

চের্নভ, ইয়াকভলেভ ও স্লাভিনার জলসা... —

ইয়েগর ইয়েগরভিচ চের্নভ (১৮৪২-১৯০৪) — মঞ্চাভিনেতা।

লেওনিদ গেওর্গিয়েভিচ ইয়াকভ্লেভ (১৮৫৮-১৯১৯) — পিতার্সবুর্গের মারিইন্স্কি থিয়েটারের গায়ক।

ইয়েভ্গেনিয়া কন্স্তান্তিনভ্না ম্রাভিনা (১৮৬৪-১৯১৪) — রুশ অপেরা-গায়িকা।

'ছায়া বীথি' সংকলন থেকে

'ছায়া বীথি' গ্রন্থটি ইভান বুনিনের রচনায় এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত পৃথক গল্পের মধ্যে যে বিষয়বস্তুগত অখণ্ড যোগসূত্র আছে তা হল প্রেম, জীবন ও মৃত্যু।

'ছায়া বীথি' সংকলনটিকে বুনিন তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বলে মনে করতেন। ১৯৫৩ সালের ২৪ জুলাই, মৃত্যুর কিছু দিন আগে এক পরিচিত ব্যক্তিকে এই সংকলনগ্রন্থটি উপহার পাঠানোর সময় লেখেন: ''ছায়া বীথি'কে আমি মনে করি সংক্ষিপ্তভাষণ, প্রাণোচ্ছলতা এবং মোটের ওপর সাহিত্য নৈপুণ্যের বিচারে সম্ভবত আমার শ্রেষ্ঠ রচনা।' 'ছায়া বীথি' গদ্যশিল্পী বুনিনের শেষ রচনা — এই রচনা দিয়ে তাঁর ষাট বছরের সৃজনী পথাযাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটে। বর্তমান সংগ্রহে উক্ত রচনামালার দুটি গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ছায়া বীথি

'আমার গল্প রচনার উৎস' শীর্ষক বৃত্তান্তে বুনিন লিখেছেন:

'ওগারিওভের কবিতা পড়তে পড়তে হঠাৎ তাঁর লেখা এক পরিচিত কবিতায় এসে থমকে গেলাম:

অপরূপ ছিল মধুমাস,
বসেছে যুগলে যেথা শান্ত উপকূল,
যুবকের ওষ্ঠে ক্ষীণ গোঁফের আভাস,
কুমারীর যৌবনের ফুটেছে মুকুল।...
চারিদিকে ফোটে বুনো গোলাপের ঝাঁক,
বীথিতে লাইম বৃক্ষের ঘন ছায়া।...

তারপর কেন যেন আমি মনে মনে কল্পনা করলাম আমার গল্পের সূচনার অংশটা -- হেমন্তকাল, বাদল, বড় রাস্তা, ঘোড়ার গাড়ি, তাতে একজন বৃদ্ধ সৈনিক। বাকি সব কী করে যেন আপনাআপনি এসে গেল, বেশ সহজে, আকস্মিক ভাবে আমার কল্পনায় এসে গেল — আমার বেশির ভাগ রচনার বেলায় যেমন ঘটেছে।'

রুশ কবি ও সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ের লেখক নিকলাই ওগারিওভের (১৮১৩-১৮৭৭) 'একটি সাধারণ কাহিনী' নামে কবিতা থেকে বুনিনের উদ্ধৃতিটি কিঞ্চিৎ অশুদ্ধ।

পৃষ্ঠা ৩৭৮

দ্বিতীয় আলেক্সান্দর (১৮১৮-১৮৮১) — ১৮৫৫ সাল থেকে রাশিয়ার সম্রাট।

দাঁড়কাক

পৃষ্ঠা ৩৮৬

'নিভা' — সাহিত্য শিল্প ও জনবোধ্য বিজ্ঞান বিষয়ক সাপ্তাহিক সচিত্র পত্রিকা। ১৮৭০-১৯১৮ সালে পিতার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত হত।

বগ্দানভের — মদেস্ত্ নিকলায়েভিচ বগ্দানভ (১৮৪১-১৮৮৮) — রুশ প্রাণীতত্ত্ববিদ ও ভূপাঠক। শিশুদের জন্য অনেক রচনা লেখেন।

পৃষ্ঠা ৩৮৭

কাৎকভ লাইসি — যুবরাজ নিকলাইয়ের স্মৃতিতে মস্কোয় প্রতিষ্ঠিত। ১৮৬৮-১৯১৭ সালে অভিজাত ও বৃহৎ বুর্জোয়া পরিবারের সন্তানদের জন্য বিশেষ রাজকীয় উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। রাজনীতি ও সমাজসংক্রান্ত বিষয়ের রুশ লেখক ও প্রকাশক মিখাইল নিকিফরভিচ কাৎকভ (১৮১৮-১৮৮৭) এর প্রতিষ্ঠাতা। এই শিক্ষায়তনে ১১ ক্লাসের শিক্ষাক্রম চালু ছিল (মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮ ক্লাস এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ ক্লাস)। ১৯০৬ সাল থেকে চার বছরের আইনশাস্ত্রের পাঠক্রমও প্রচলিত হয়।

পৃষ্ঠা ৩৯০

মেরি স্টুয়ার্ট (১৫৪২-১৫৮৭) — স্কটল্যান্ডের রানী।

পৃষ্ঠা ৩৯২

যোদ্ধা সেণ্ট জন গির্জা — মস্কোর একটি গির্জা, দিমিত্রভ স্ট্রীটে অবস্থিত।